দায়িত্বশীলদের দৈনিক

দেশ রূপান্তর

ঈদ সংখ্যা
২০২৩

ক্যান্সার চিকিৎসার ঔষধে সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক

BEACON®
Light for life

আধুনিক কৃষির সম্পূর্ণ স

আমাদের রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত কম্বাইন হ

ফার্টিলাইজার, মাইক্রোনিউট্রি

https://www.facebook.com/sqagriculture

daedong ZOOMLION ETIAN-SQTE daedong RICE TRANSPLANTER

Address: 9th Floor, 57 Suvastu Suraiya Trade Center, I

SQ AGRICULTURE
A Valued Concern of SQ Group

সাধান এস কিউ এগ্রিকালচার

ারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার, ট্রাক্টর, সীড,
য়েন্টস এবং সকল কৃষি উপকরণ

Hotline: 01321-219223, 01321-219224, 01321-219225

NEW HOLLAND AGRICULTURE

SHAKTIMAN
MAKING AGRICULTURE MORE ECONOMICAL

SQ FERTILIZER

SQ SEED

Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213

Admission
Summer 2023

SOUTHEAST UNIVERSITY

Undergraduate Programs

BBA, LLB (Fall 2023), BA in Bangla, BA in English, BSS in Economics, EEE, Textile Engineering, CSE, Architecture, Pharmacy (Spring 2024)

Master's Programs

MBA, EMBA, LLM, MA in Bangla, MA in English, MDS

HSC/Equivalent
- ▶ 50% Waiver on Admission Fees

O & A-Level
- ▶ 90% Waiver on Admission Fees

Master's
- ▶ 75% Waiver on Admission Fees for SEU Students & 50% for Other University Graduates

Permanent Campus
252 Tejgaon, Dhaka 1208

01766348518
01632261081

www.seu.edu.bd
seu.official.info

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2022 — NUMBER ONE University in Bangladesh

INTERNATIONAL COLLABORATION

PROFESSIONAL ACCREDITATION

On Campus Job Facilities

Magnificent permanent campus at Tejgaon the heart of Dhaka city

RUPAYAN GRAND

RUPAYAN CITY UTTARA
A premium mega gated community

Think Grand
LIVE GRAND

577 BRAND NEW CONDO

READY to HAND OVER SOON!

BREAK THE SQUARE FEET STORY

Disrupting the current concept of modern living, choose an unbound lifestyle, breaking away from the square feet story. Make your abode in vast openness, blue skies and lush soothing greenery replete with world-class amenities. Live in the charm of grandness with your loved ones at Rupayan Grand.

LIMITED CONDO IS AVAILABLE FOR SALE | SIZE : 2100 - 3070 SFT.

315 brand new CONDO delivered

RUPAYAN Majestic

RUPAYAN CITY
First City Brand in Bangladesh

rupayancity

Call to know more
16504

বসুন্ধরা হাউজিং
হটলাইন ৮৪৩২০০৮

ঈদ মোবারক

ঈদ আপনার জীবনে বয়ে আনুক
অনাবিল সুখ আর সমৃদ্ধি

সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায়
সেরা বিনিয়োগ হোক
বসুন্ধরায়

বসুন্ধরা হাউজিং আন্তর্জাতিক মানের সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে একটি আদর্শ স্মার্ট সিটি। ভাবনাহীন জীবনের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় সকল নাগরিক সুবিধা পেতে রাজউক অনুমোদিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ স্মার্ট সিটি বসুন্ধরা হাউজিংয়ে প্লট কিনে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাড়ি/ ফ্ল্যাট এর মালিক হোন।

বসুন্ধরা হাউজিং কেন একটি সুপরিকল্পিত স্মার্ট সিটি?

- সকল বয়সের নাগরিকদের জন্য ৭৫ বিঘার উপর নির্মিত হচ্ছে নয়নাভিরাম ৩টি Green Park।
- এন্টারটেইনমেন্টের জন্য সর্বশেষ সংযোজন বসুন্ধরা গলফ, বসুন্ধরা টগি ক্লাব, স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং স্পোর্টস সিটি।
- ১০৫ বিঘা জমিতে কবরস্থান, ঈদগাহ, মসজিদ ছাড়াও সৌন্দর্যবর্ধনে রয়েছে ২৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ লেক।
- প্রোজেক্টের সৌন্দর্যবর্ধন ও রাতের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে রয়েছে প্রজাপতি সড়ক বাতি।
- ঢাকা সিটির সাথে সংযোগের জন্য পুরো প্রোজেক্টে রয়েছে ২০০ফিট এর ২টি, ১৩০ ফিট, ১০০ফিট, ৮০ ফিট, ৬০ ফিট ও ৪০ ফিট সহ এক বিস্তীর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক।
- কমার্শিয়াল জোনের পাশাপাশি রয়েছে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, শপিং মল ও কনভেনশন হল।
- ফুড কোর্ট ও কফি শপের সাথে আরো রয়েছে ফিটনেস সেন্টার।

বসুন্ধরা আবাসিক
রাজউক অনুমোদিত
প্রকল্প

ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিমিটেড
(বসুন্ধরা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

বিক্রয়ের আলয়ে
০১৭০০০১৮৪২৯, ০১৭০০০১৮৪৩০
০১৭০০০১৮৪৪৯, ০১৭০০০১৮৪৪৮
০১৭০০০১৮৪৪৪, ০১৮১৯৪৩০১৩২
০১৭০৪৯৯০১২৯, ০১৭০০০১৮৪৪৭

কর্পোরেট অফিস
প্লট ২২৫/এ, ব্লক-এ,
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২২৯
ফোন: ৮৪০২৪৮৫

বনানী অফিস
মুক্তাঙ্গ আহমেদ ভবন, প্লট-৩৯ (৪র্থ তলা),
রোড-১১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০১৭০০০১৮৪৪৪, ০১৭০০০১৮৪৭৮,
৫৫০৪২৭৩৩, ৫৫০৪২৭৩৯

রিয়েলটিক সাইট অফিস
প্লট #২৯৮৬, ব্লক-এ, বসুন্ধরা রিয়ারটিক প্রকল্প,
হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩৯১
ফোন: ০১৭০০০১৮৪৪২, ০১৭০০০১৮৪৪৪

বসুন্ধরা গ্রুপ
দেশ ও মানুষের কল্যাণে

ewpd@bgc-bd.com www.bashundharahousing.com facebook.com/bashundharahousingbd

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মোস্তফা মামুন

ঈদ সংখ্যা সম্পাদক
শিমুল সালাহ্উদ্দিন

শিল্প সম্পাদক
তৌহিন হাসান

ফিচার সমন্বয়
মোহসীনা লাইজু

অলংকরণ
তৌহিন হাসান
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য
রাজীব দত্ত
রাজীব রাজু
বিধান সাহা

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
হারুনুর রশীদ
মিজানুর রহমান

সার্কুলেশন
আবদুল হাকিম

গ্রাফিকস
মোহাম্মদ আলী
মো. মিজানুর রহমান মিঠু

সম্পাদনা সহকারী
বদরুল আলম
নবীউল নেওয়াজ রাসেল

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
গোলাম মোস্তফা
বাবুল দেউড়ি

মূল্য ২০০ টাকা

সম্পাদকীয়

সংবাদপত্র শিল্পের বিরূপ এ সময়ে আমাদের নিরন্তর সংগ্রামের সহযোগী হিসেবে আপনাদের কাছে পেয়ে আমরা এক যুদ্ধে নেমেছি। সেটি সুস্থ চিন্তা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। উন্নত সাংস্কৃতিক বোধ তৈরির লড়াই। আমাদের সামগ্রিক সেই চেষ্টার একটা অংশ এই ঈদ সংখ্যাও।

মুসলমানদের জন্য রোজার ঈদ বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দের উপলক্ষ। একই সঙ্গে বার্ষিক সাহিত্য উৎসবও যেন। সব পত্রিকা-ম্যাগাজিন বের করে বিপুল কলেবরের ঈদ সংখ্যা। দেশ রূপান্তর ঈদ আয়োজনে আকারের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে মানের দিকেও। বিষয়ের বিস্তৃতি এবং সামগ্রিকতায় আমাদের আয়োজনের ভিন্নতা আমরা দাবি করতেই পারি। যেমন বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ লেখকরা লিখেছেন, তেমনি লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছেন সময়ের আলোচিত তরুণরাও। আমরা চেয়েছি এমন কোনো লেখকই বিমুখ করেননি আমাদের। গল্প-উপন্যাস-কবিতার সৃজনশীলতার সঙ্গে আছে বিদগ্ধ পাঠকের বোধকে সমৃদ্ধ করার মতো একাধিক প্রবন্ধ, বৈচিত্র্যে ভরপুর একগুচ্ছ ফিচার। খেলা-ফ্যাশন-বিনোদন-ভ্রমণ-স্মৃতিকথা-অনুবাদ মিলিয়ে ঈদ আনন্দকে পূর্ণতা দেওয়ার এক পরিপূর্ণ সম্ভার।

দেশ রূপান্তর পাঁচে পা দিল এই বছর। খুব বেশি সময় নয় কিন্তু আবার দৈনিক পত্রিকা চিন্তা করলে কমও নয়। দেড় হাজারের বেশি সংখ্যা এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে পাঠকরা যে ভরসা রাখার মতো উপাদান পেয়েছেন সেটা সাড়াতেই বুঝতে পারি। তাতে দায়িত্বশীলদের দৈনিকের দায়িত্ব আরও বাড়ে। সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা চলছে অবিরত। খবরের ধরন, বিন্যাস, পৃষ্ঠাসজ্জা, বিষয়– সবকিছুতেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদল এসেছে। আসছে। এ নির্বাচনী বছরেও থাকবে বড় কিছু চমক। অতীতের মতো সেসব কিছুতেও আপনাদের পাশে পাওয়ার প্রত্যাশা।

তার আগে ঈদ। এ ঈদের আনন্দে জীবন ভরে উঠুক উপভোগের ছন্দে। আর ঈদের ছুটিতে সঙ্গী হোক দেশ রূপান্তর ঈদ সংখ্যা।

দেশ রূপান্তরের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, হকারসহ আমাদের সব শুভানুধ্যায়ীকে ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মোস্তফা মামুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **মোস্তফা মামুন** প্রকাশক : রূপায়ণ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস লিমিটেড এর পক্ষে মাহির আলী খাঁন রাতুল কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত এবং রূপায়ণ ট্রেড সেন্টার, ১১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মোটর, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদকীয়, বার্তা, সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন- ফোন: ০৯৬১০-১১২২৪৪, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৪১০৩০৩১৯-২০
E-mail : events@deshrupantor.com

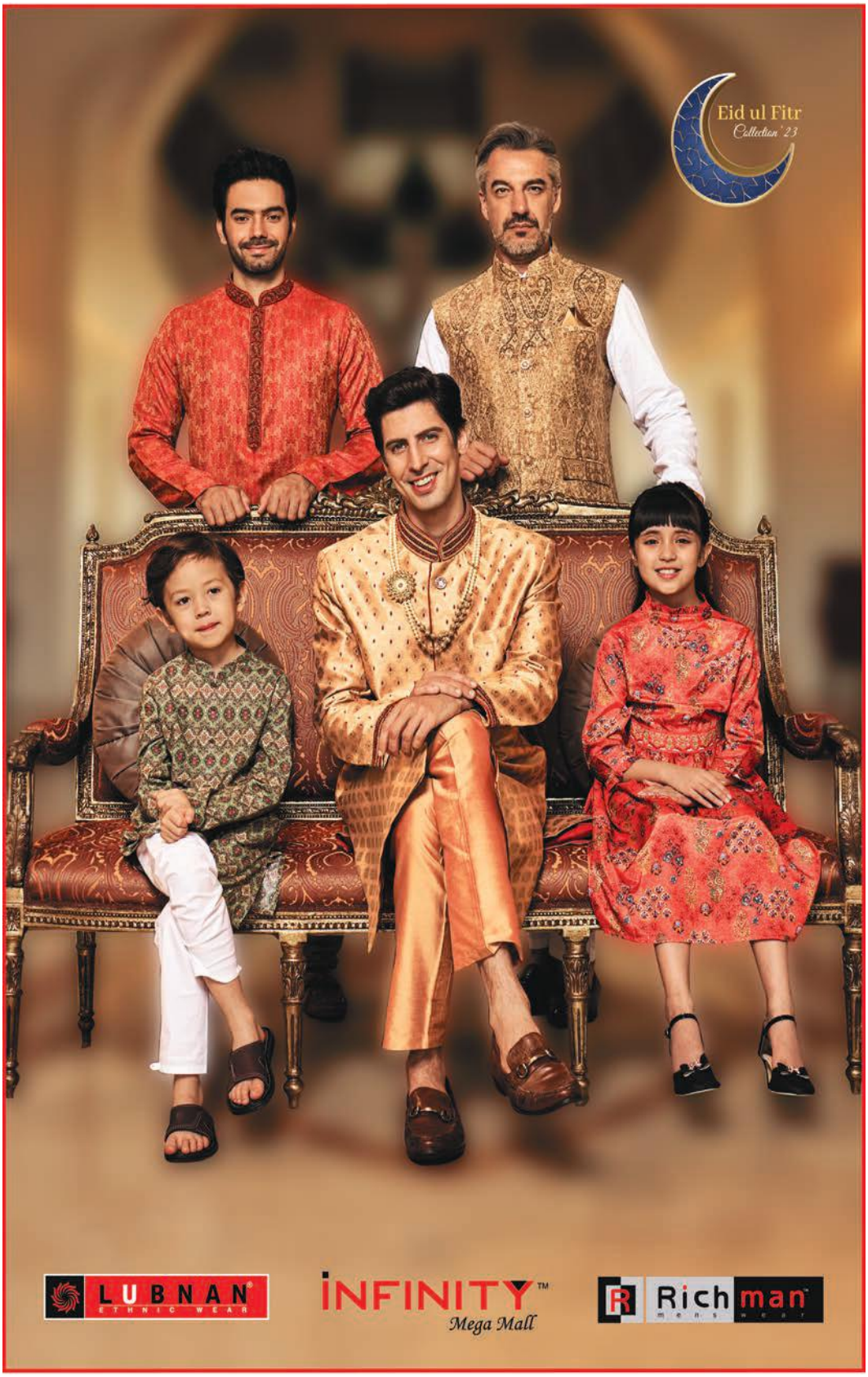
Eid ul Fitr
Collection '23
LUBNAN
ETHNIC WEAR
INFINITY™
Mega Mall
Richman
men's wear

সূচি

কাব্যগল্প
চেয়ে থাকা চোখ — পৃষ্ঠা ১৫
ফারুক মাহমুদ

প্রবন্ধ
শিল্প সাহিত্যের প্রগতিশীলতা — পৃষ্ঠা ২১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

উপন্যাস
নাহিদ নিশতার জাহান — পৃষ্ঠা ৩১
আন্দালিব রাশদী

গল্প
গল্প বদলে যায় — পৃষ্ঠা ৫৫
ওয়াসি আহমেদ

অনুবাদ থ্রিলার
ঝড়ের রাতে — পৃষ্ঠা ৫৮
অনীশ দাস অপু

প্রবন্ধ
ক্রুশেচভের স্মৃতিকথায় পাস্তারনেক ও লেখকের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ — পৃষ্ঠা ৭১
মোরশেদ শফিউল হাসান

কিশোর উপন্যাস
টিটি বেড়াল — পৃষ্ঠা ৭৭
এহসান হায়দার

উপন্যাস
স্তব্ধ পাখসাট — পৃষ্ঠা ৮৫
প্রশান্ত মৃধা

গল্প
অপরূপগঞ্জ ও সুজাতা স্বাধীন — পৃষ্ঠা ১১৯
কাজল শাহনেওয়াজ

বিশেষ রচনা
সমাধি যখন ভাবের দেশ — পৃষ্ঠা ১২৩
সৈয়দ তারিক

প্রবন্ধ
বাংলা, স্প্যানিশ ও বোর্হেসের অনুবাদ — পৃষ্ঠা ১২৯
রাজু আলাউদ্দিন

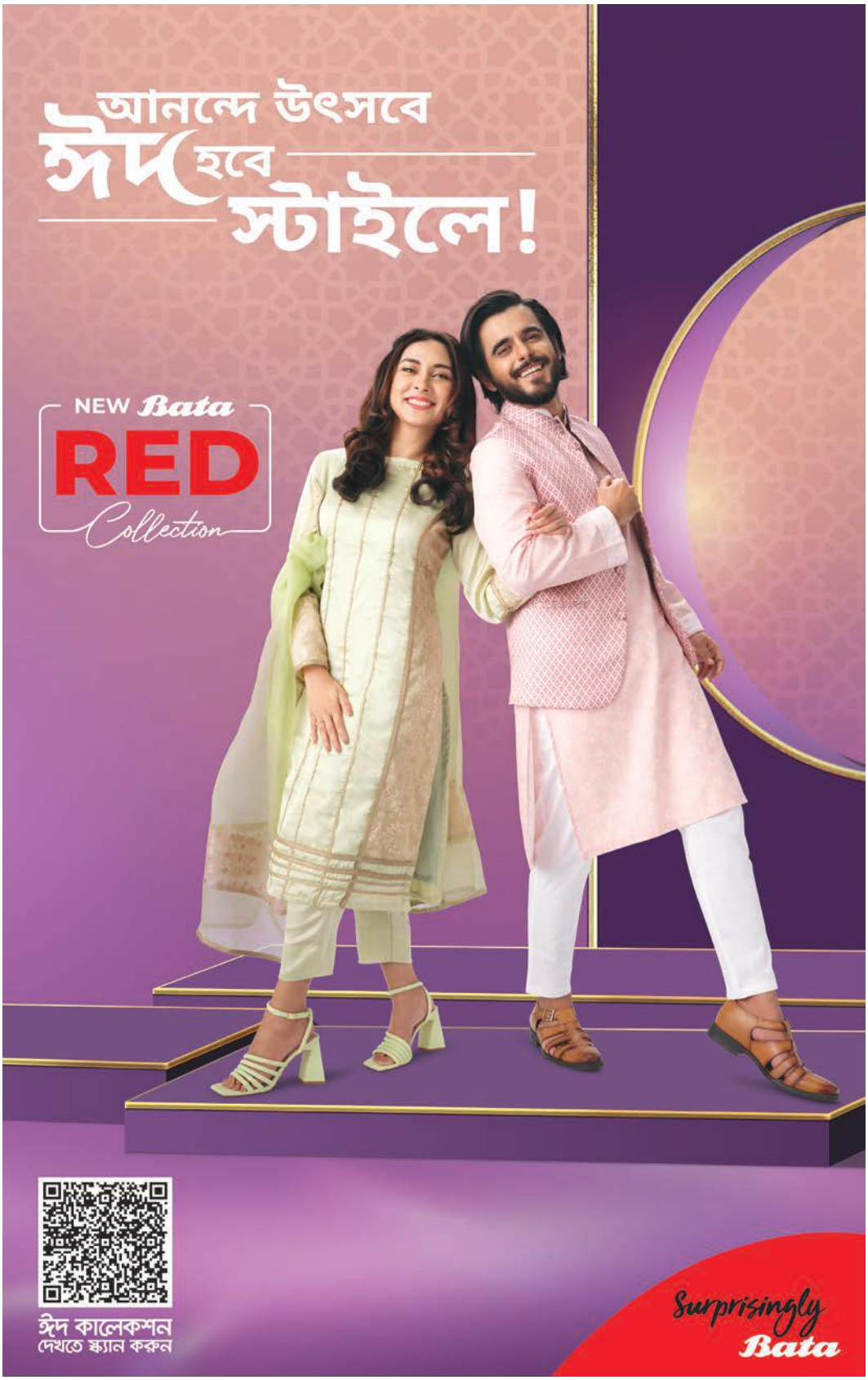
আনন্দে উৎসবে
ঈদ হবে
স্টাইলে!
NEW Bata
RED
Collection
ঈদ কালেকশন
দেখতে স্ক্যান করুন
Surprisingly
Bata

সূচি

গল্প

কালো সে যতই কালো হোক *পৃষ্ঠা ১৩২*
শাহাব আহমেদ

গল্প

ফুডপান্ডার ছেলেটা *পৃষ্ঠা ১৩৫*
জামাল রেজা

কবিতার সময় সময়ের কবিতা *পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৮*
মুহম্মদ নূরুল হুদা
ফেরদৌস নাহার
সাইফুল্লাহ্ মাহমুদ দুলাল
মারুফুল ইসলাম
মারুফ রায়হান
ইরাজ আহমেদ
জুয়েল মাজহার
ফকির ইলিয়াস
হেনরী স্বপন
হাদিউল ইসলাম
চঞ্চল আশরাফ
মোস্তাক আহমাদ দীন
খলিল মজিদ
শাহীন মোমতাজ
মিলটন রহমান
ইকতিজা আহসান
সুভাশিস সিনহা
সোহেল হাসান গালিব
পরাগ রিছিল
কাজী নাসির মামুন
সাঈদ জুবেরী
সরোজ মোস্তফা
তানভীর মাহমুদ
তারিক ঈমাম
আলতাফ শাহনেওয়াজ
আফরোজা সোমা
উম্মে রায়হানা
রাজীব দত্ত
বিধান সাহা
আসমা অধরা
ইফতেখার ইনান

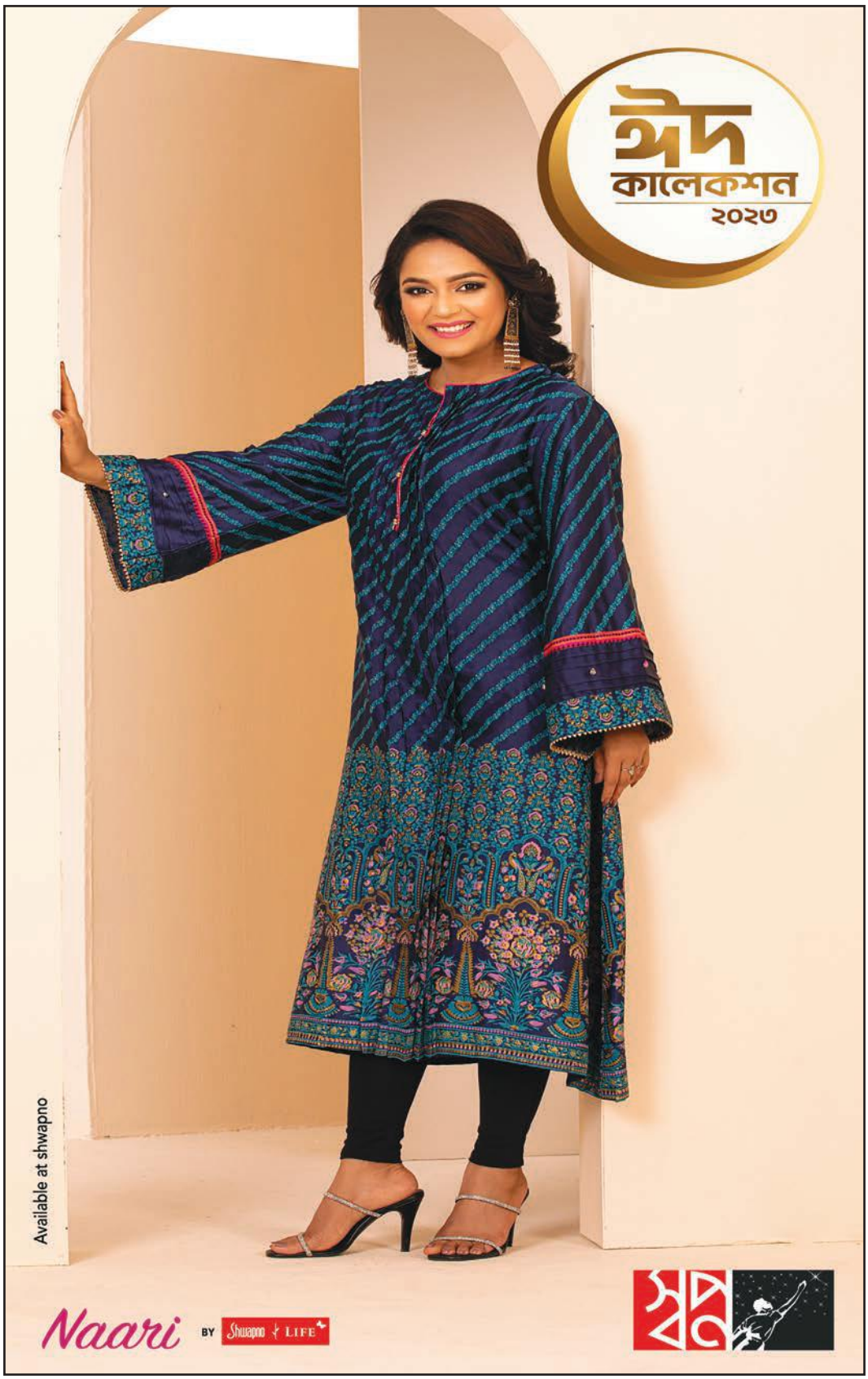
ঈদ
কালেকশন
২০২৩
Available at shwapno
Naari
BY
Shwapno LIFE
ঈদ

সূচি

কবিতার সময় সময়ের কবিতা *পৃষ্ঠা ১৪৮-১৫৩*
খান রুহুল রুবেল
অমিত রেজা চৌধুরী
দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম
নওশাদ জামিল
স্নিগ্ধা বাউল
বিজয় আহমেদ
তৌহিদুল ইসলাম
রাজীব আশরাফ
রওশন আরা মুক্তা
তানিম কবির
সিফাত বিনতে ওয়াহিদ
রিমঝিম আহমেদ
হাসনাত শোয়েব
সালেহীন শিপ্রা
অনুভব আহমেদ
নাদিয়া জান্নাত
ফরহাদ নাইয়া
নাজমুস সাকিব রহমান
ফারজানা হায়দার চৌধুরী
মাসুম মুনাওয়ার
রুবেল সাইদুল ইসলাম
সাজ্জাদ হোসেন

উপন্যাস
ফাগুনের অগ্নিকণা *পৃষ্ঠা ১৫৫*
মনি হায়দার

প্রবন্ধ
সাহিত্য ও ভাষার জগতে অর্থনীতি *পৃষ্ঠা ১৮৯*
মজিদ মাহমুদ

ছড়ায় ছড়াই ভালোবাসা *পৃষ্ঠা ১৯৫-২০৫*
লুৎফর রহমান রিটন
আমীরুল ইসলাম
আনজীর লিটন
রোমেন রায়হান

গল্প
আত্মহত্যা কেন্দ্র *পৃষ্ঠা ২০৬*
ইকরাম কবীর

লড়াইটা এক যুগেরও বেশী

ক্যান্সার আক্রান্ত লাখো মানুষের জীবন বাঁচাতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে। আর এই চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা সবাই। সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে যাবার গল্প যেমন অনেক, তেমন পথও বাকি অনেকটুকু। চলুন, সবাই মিলে লিখি পরিবর্তনের গল্প।

BEACON®

Light for life

সূচি

গল্প

চুল — *পৃষ্ঠা ২১০*
গোলাম কিবরিয়া

প্রবন্ধ

একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা — *পৃষ্ঠা ২১৪*
শিকোয়া নাজনীন

নাটক

নায়ক ও খলনায়ক — *পৃষ্ঠা ২১৮*
মলয় ভৌমিক

সাক্ষাৎকার

বিপণনের ‘হালাল’ নায়ক — *পৃষ্ঠা ২৩৩*
সৈয়দ আলমগীরের মুখোমুখি

সাক্ষাৎকার

আমার ধ্যানজ্ঞান সবই চলচ্চিত্রকে ঘিরে — *পৃষ্ঠা ২৩৯*
নায়ক আলমগীরের মুখোমুখি

প্রবন্ধ

কথায় কথায় আদিবাসী লোককথা — *পৃষ্ঠা ২৪৩*
সালেক খোকন

গল্প

থই থই কামিনী — *পৃষ্ঠা ২৪৮*
আশরাফ জুয়েল

আলোকচিত্র

বিশ শতকের বাঙালি জীবন — *পৃষ্ঠা ২৫৫*
সাহাদাত পারভেজ

গল্প

সরীসৃপ — *পৃষ্ঠা ২৬৪*
সাদাত হোসাইন

উপন্যাস

গিঁট — *পৃষ্ঠা ২৬৭*
হামীম কামরুল হক

চলচ্চিত্র

থিও অ্যানজেলোপুলুসের সিনেমা দর্শন — *পৃষ্ঠা ২৮৬*
সৈকত দে

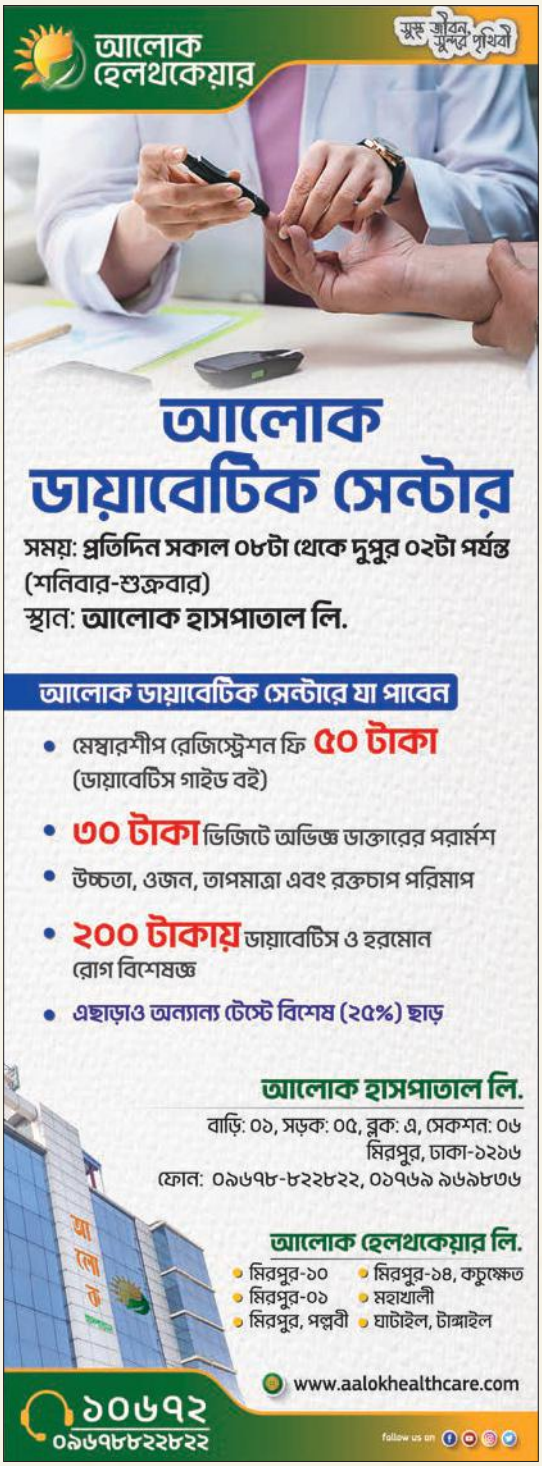

International Leasing
A Financial Institution that Cares

- পুনর্গঠনে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ
- স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- মানসম্মত সেবা প্রদানে সদা সচেষ্ট
- দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ করে গৌরব ও আস্থা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

নতুন সঞ্চিত আমানত
২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগদায়নের
শতভাগ নিশ্চয়তা

যোগাযোগঃ-

প্রধান কার্যালয় ডি আর টাওয়ার (১৪তম তলা), ৬৫/২/২, বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা - ১০০০

+৮৮০ ২২৩৩ ৮১২২৮
+৮৮০ ২২৩৩ ৫৩৪৮৫

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ

www.ilfsl.com
www.facebook.com/International.Leasing

সূচি

গল্প
থ্রি মার্ডার — পৃষ্ঠা ২৯১
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

গল্প
সান্ধ্যমেঘের ভেতর — পৃষ্ঠা ২৯৭
আহমেদ খান হীরক

উপন্যাস
অধরা লগনে — পৃষ্ঠা ৩০৩
আফসানা বেগম

গল্প
অমীমাংসিত — পৃষ্ঠা ৩৩৬
রুমা মোদক

গল্প
ব্যাঙের বিয়ে — পৃষ্ঠা ৩৩৯
কিযী তাহ্‌নিন

উপন্যাস
গোলাপ — পৃষ্ঠা ৩৪২
তৌহিন হাসান

বিশেষ রচনা
বাকশাল: ইতিহাস ও রাজনীতির অলিগলি — পৃষ্ঠা ৩৭০
মারুফ রসূল

গল্প
দরবেশ ও নগরপিতা — পৃষ্ঠা ৩৭৮
সাব্বির জাদিদ

গল্প
সে ছিল সে আছে — পৃষ্ঠা ৩৮৩
সাদিয়া আফরিন

প্রবন্ধ
মেনকীফান্দা আন্দোলন — পৃষ্ঠা ৩৯০
পাভেল পার্থ

প্রবন্ধ
পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক — পৃষ্ঠা ৩৯৪
মযহারুল ইসলাম বাবলা

বিশেষ আয়োজন
ঈদ পোশাকের ফ্যাশন ফটোগ্রাফি — পৃষ্ঠা ৪০১
ঈদের বাহারি আহার — পৃষ্ঠা ৪০৪
ঈদের খাবারের একাল-সেকাল — পৃষ্ঠা ৪১৫
রুপালি পর্দার কালজয়ী জুটি — পৃষ্ঠা ৪১৭
মেসি রূপকথার গল্প — পৃষ্ঠা ৪২৪

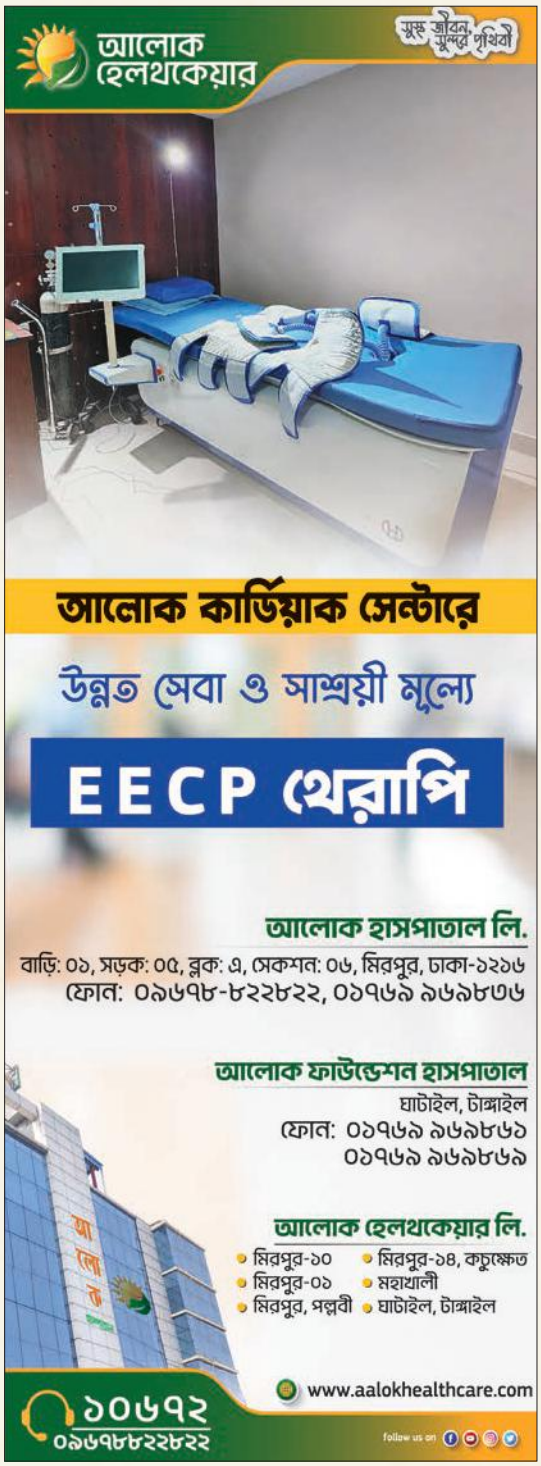

✆10606

LABAID Diagnostics ...Home of Trust

প্রথম বাংলাদেশি ল্যাবরেটরি হিসেবে **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি** পেল

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিকস), ধানমন্ডি

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রথম বাংলাদেশি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি হিসেবে ল্যাবএইড অর্জন করল CAP Accreditation যা বিশ্বের অন্যতম কঠোর ল্যাবরেটরির মান পরীক্ষাকারী সংস্থার স্বীকৃতি।

CAP ACCREDITED

COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS

CAP Accreditation স্বীকৃতি দেয়-

- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
- সঠিক ল্যাব রিপোর্ট
- আন্তর্জাতিক মান
- বিশ্বব্যাপী ডাক্তারদের কাছে রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ
ওয়েব: www.labaiddiagnostics.com

অলংকরণ : তৌহিন হাসান

ফারুক মাহমুদ

চেয়ে থাকা চোখ

কিছুপল আগে-পরে হলে
এ-গল্পের জন্মরেখা ঊহ্য থেকে যেতো

হয়তো হতো অপর গল্প
নতুন চরিত্রচিত্র, ঘটনার অভিনব বাঁক...

আড্ডার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, নারীটি এসেছে
বহু ক'রে চেনা এক দু'তলার ঘরে

বাড়িপ্রধান বাড়িতে নেই
অগত্যা মেয়েটি ফিরে যাচ্ছে

সদর দরজার কাছে যেতে
বাড়িপ্রধানের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়ে গেল
আরো একজন আছে, মেয়েটির পরিচিত নয়

চা-আড্ডার কোনো-এক ফাঁকে,
নারীটি, নিজের সঙ্গে থাকা
ম্যাগাজিন ঘেঁটে
কতিপয় কবিতা শোনাল

শ্রোতাদ্বয় মুগ্ধ...

নারীটির নিজে নিজে বলা--
"পড়ে পড়ে মুগ্ধ হই, কবিকে চিনি না"

বাড়িপ্রধান বলল, "এ-যে দেখি লালনের হাল!"
নারীটির চোখে-মুখে বিস্ময়ের ঘোর--
"তোমার প্যাঁচানো কথা! সোজা করে বলো"
বাড়িপ্রধান কণ্ঠে নিল লালনের গান--
'বাড়ির পাশে আরশি নগর
সেথায় একঘর পড়শি বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে...'

"কথা ভেঙে বলো"

বাড়িপ্রধান হাসে আর হাসে
"কবি তো তোমার পাশে বসা!"

নারীটির চেয়েথাকা চোখ
বারবার বদলে ফেলছে
বিস্ময়ের অবিশ্রান্ত রং
সব রঙে উঁকি দিচ্ছে মুগ্ধতার আলোফোটা আলো

আড্ডা ভেঙে গেল

সদর রাস্তায় এসে
তিনজন তিন দিকে যাবে

নারীটি রিকশায় ওঠে। যেতে যেতে কবির উদ্দেশে
একবার, ছোট্ট করে, হেসে চেয়ে ছিল!

দুই

সাড়ে সাতটার সন্ধেবেলা

নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। কবি হাঁটছেন...

এ সময়টায় ছুটিবারে, এ সময়টায়
গাড়ি, মানুষের চলাচল
ভিড় করে থাকে
বলা যায়--এখন যথেষ্ট ফাঁকা

একটা চাররাস্তার মোড়
সড়ক-বাতির নিচে কবি দাঁড়ালেন
ময়লা আলোয়
পদচারীদের ক্লান্ত, তন্ত্র চলাচল

শহরের কোথাও কি ঝামেলা বেধেছে?

রাস্তার সামান্য পাশে, ভূতপূর্ব পার্কের কঙ্কাল
একটা গাছের নিচে, স্যান্ডেল বিছিয়ে
কবি বসেছেন

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। সব শব্দ প্রায় অন্তগত
এর মধ্যে কানে এলো--"যত পাই, পড়ি,
আপনার কবিতার মধ্যে
বিষাদের দশদিক হতে-হতে আলো হয়ে ওঠে!"

হাঁটাপথে যেতে যেতে নারীটির ছোট্ট উচ্চারণে
'বিষাদসুন্দর' শব্দটিও বারবার যুক্ত হয়েছিল

"কেউ কাছে আছে!
আছে কি কোথাও!?"

"আছে তো, আছেই
যেতে-যেতে নারীটির হেসেথাকা হাসি!!"

মোবাইল সেটের আলো জ্বলল--রাত সাড়ে ন'টা
নারীকণ্ঠ--"এখন কোথায়?"
"অন্ধকারে কোনো 'কোথাও' থাকে না, সব একস্থান"
"ওদিকটায় বিদ্যুৎ নেই?"
"আছে, তবে যথেষ্ট ঘোলাটে"

নারীপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো হাসির আওয়াজ
একটি প্রশ্নও--"পরশু কি আমাদের দেখা হতে পারে?"

কবির চিন্তার স্রোতে 'বিষাদসুন্দর'
চোখে আসে--যেতে-যেতে হেসেথাকা হাসি

তিন

অবশ্য এটাকে কোনো ভূতপূর্ব পার্কের কঙ্কাল
বলার সুযোগ নেই। 'বর্তমানের সুঠাম উদ্যান'

সবুজের কত রং! বাতাসের দোলানো চামর
ফুলের অবাধ হাসি আলোর আকাশ ডেকে আনে
বিকেলের নরম গ্রীবায়

মুখোমুখি নয়, কবি ও নারীটি বসে আছে
মৃদু কাছাকাছি
"জানেন, সেদিন খুব কান্না পেয়েছিল"

নীরবতা সরে গেল। কবি বললেন--
"এমনটা কখনো হয় না?"
"কোন এমনটা!?"
"সেদিন, তুমি রিকশায় যাচ্ছ
ভারী ভারী অন্ধকার আমাকে খুব ঘিরে দাঁড়াল"
"সেদিন, আমি রিকশায় যাচ্ছি
কান্নার অনল-স্রোতে ভেসে গেল আমার সকল

অশ্রু-আয়োজন”
“কেন, এমন কেন হলো! ?”

পাশাপাশি বসেথাকা রেখে
এবার রচিত হলো দুজনের মুখোমুখি বসা
কবির ও নারীটির চোখে
অভিন্ন বিস্ময়-হাসি হেসে চেয়ে আছে
০ ০ ০
আজ যে ‘পরশু’টি এলো, এর জন্য কবির অপেক্ষা
দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে ছিল বহুদিন ও রাত্রির অপেক্ষাটি হয়ে। হিসেব
মেলেনি--
কত ঘণ্টা শেষ হলে এক দিন হয়!
হঠাৎ রাস্তায়, গাড়ি বিকল হওয়ার মতো করে
ঘড়ির কাঁটা কি স্তব্ধ হয়ে গেল!
রাত্রির কি কোনো পাড়সীমা নেই!!
যাক। তবু পরশুটি এলো।
উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় ওরা--কবি ও নারীটি
সময় কাটাল কোনোএক
রেস্তোরাঁর মনখোলা মৃদুআলোকোণে
০০০
কবি ফিরেছেন নিজ ঘরে
আলো জ্বালাবেন
নারীটির ফোন--
“অনেক বছর পর, মনে হলো, আজ করা হলো”
“আজ, কী করেছ?”
“কবির সান্নিধ্যে থেকে নিজর জন্মদিন স্মরণ”
“এটা আগে বললে না কেন?”
“শুনি, বললে কী করতেন?”
“একটা কবিতা লেখা যেতো”
“এখন লিখুন”
“ফোনে ফোনে কি কবিতা হবে!”
“লিখে, রাতে শোনাবেন, রাখি”

প্রায় মধ্যরাত
নারীটির মুঠোফোনে আলো-শব্দ হলো--
“যে ক’টি ফোটার কথা ছিল
তার থেকে একটি ফুল বেশি ফুটুক মনের বাগানে--
সেই ফুলটি তোমার জন্য”

নারীপ্রান্ত ফোন রেখে দিল
০০০
এক দিন শেষ হয়ে দুদিনে গড়ায়
দুদিনও হতে হতে হয়ে ওঠে সাড়ে-ছয় দিন

সন্ধ্যার দিকে, নারীপ্রান্তের ফোন--নিজ থেকে এলো

সরাসরি কথা--
“সত্য ও মিথ্যের মধ্য দিয়ে
চিরকাল একগুচ্ছ নদী বয়ে চলে।
সত্য আবার কল্পনা হয়ে
মিশে যায় নদীদের সরলরেখায়
কোনো কোনো নদীরেখা মিথ্যেস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায়
আছে কিছু নদীরেখা--কল্পনাকে সত্য ক’রে তোলে
কবির কল্পনা আছে, রংতুলি থেকে যায় মনের মুঠোয়
যা ইচ্ছে আঁকেন তাঁরা
নদীরেখা সত্য হয়ে ওঠে
নদীরেখা মিথ্যে হয়ে যায়”

কয়েক সেকেন্ড থেমে, নারীপ্রান্ত উচ্ছলিত হলো--
“আমি কিন্তু নদীরেখা নিয়ে কিছু নতুন ভেবেছি”
“শুনি, কী ভেবেছ?”
এই প্রথম কবির কণ্ঠ
“কাল, সন্ধে সাতটায়, সেই রেস্তোরাঁয়
আমাদের দেখা হবে, তখন বলব”
দেখা হয়েছে, বিস্তর কথা
যেই কথাটি বলার কথা, সেই কথা
ঊহ্য থেকে গেল
আজও রিকশা যেতে-যেতে চেয়েথাকা চোখ
তাকানোটা স্বচ্ছ, তীব্র, আরও আরও তাকানোর ভিড়
“রাতে, ফোনে কথা হবে, আসি”
০০০
আজকাল, প্রায় প্রতিদিন দুজনের দেখা-গল্প হয়
ফোন যায়, ফোন আসে অগণিতবার
‘জরুরি’ কথাটি শুধু বারবার পিছে পড়ে যায়

চার

দুপুর বিকেল সন্ধ্যা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতেও হয়
দেখার আকাঙ্ক্ষার তো কোনো সময়-মান্যতা নেই
দুজনের হাতে-মনে কাজ থাকে, তবু
অবিকল্প, দেখা হতে হয়
রফিক আজাদের একটি কবিতার অংশ যেন
সত্য হয়ে আছে নারী ও কবির প্রতিটি আড্ডায়:
ভালোবাসা মানে ঠাণ্ডা কফির পেয়ালা সামনে
অবিরাম কথা বলা
ভালোবাসা মানে শেষ হয়ে যাওয়া কথার পরেও
মুখোমুখি বসে থাকা।।

রেস্তোরাঁটি নির্দিষ্ট এখন
নির্দিষ্ট টেবিল
টুপটাপ কথা ঝরে, অধিকাংশ সময় ফুরোয়--
কোনো কথা নয়
০০০
নারীপ্রান্ত, কবিপ্রান্ত, বিশেষত রাত্রি ভারী হলে
টেলিফোনে চলে, থামে কবিতার বিবিধ বিষয়
নারীটির স্বচ্ছ কণ্ঠ। আজ সে শোনাল--
সেদিন আগুন ছিল মহাব্যোম, গেরুয়া কাঁকরমাটি
তেতেপুড়ে গনগনে চাটু হয়েছিল,
গ্রীষ্মের রাঢ়দেশ ফালাফালা করছিল উন্মাদ বাতাস,
কৃষ্ণ-রাধাচূড়া মেশা মোরামের রাস্তা যেন বাউল পোশাক,
তখন কোথাও কেউ নেই, সারা বাড়ি
দুপুরঘুমের নিচে গাঢ়, কী আশ্চর্য, কার্নিশে
নিত্যকার পায়রাগুলো ছিল কি না মনে পড়ছে না,
আমি লম্বা ঘোমটা টেনে বউ সেজে কুটনো কুটছি...

জাপটে ধরল কেউ, ও সুগত, আধফোটা স্তনে নখ বসে গেল
নিতান্ত খেলাচ্ছলে যেন কেউ আঁকড়ে ধরল আর
পরমুহূর্তে ঠোঁট থেকে জিহ্বামূলে পৌঁছে গেল লাভা।
ঘুরে উঠল মাথা, মনে হলো পিত্ত যেন উঠে আসবে গলা বেয়ে,
প্রাণপণ ধাক্কায় আমি তাকে সরাতে চাইলাম।
কিন্তু বিফল চেষ্টা, হে অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবন্না,
হে অম্বপালী, ইদিদাসী, হে কিসা গোতমী,
সব ব্যর্থ, আমি তো শ্যামলা মেয়ে
আমারও কাগজশাদা মুখ, আতঙ্কে অবশ শরীর, শুধু
কোমরে ভীষণ ভার মনে আছে, মণিবন্ধ আটকানো,
বুকে জ্বালা...উরুসন্ধিময় চাপ...উঃ, মা...
সে যে কী যন্ত্রণা.....

কী করতে পারতাম আর? আর্তনাদ? চিৎকার?

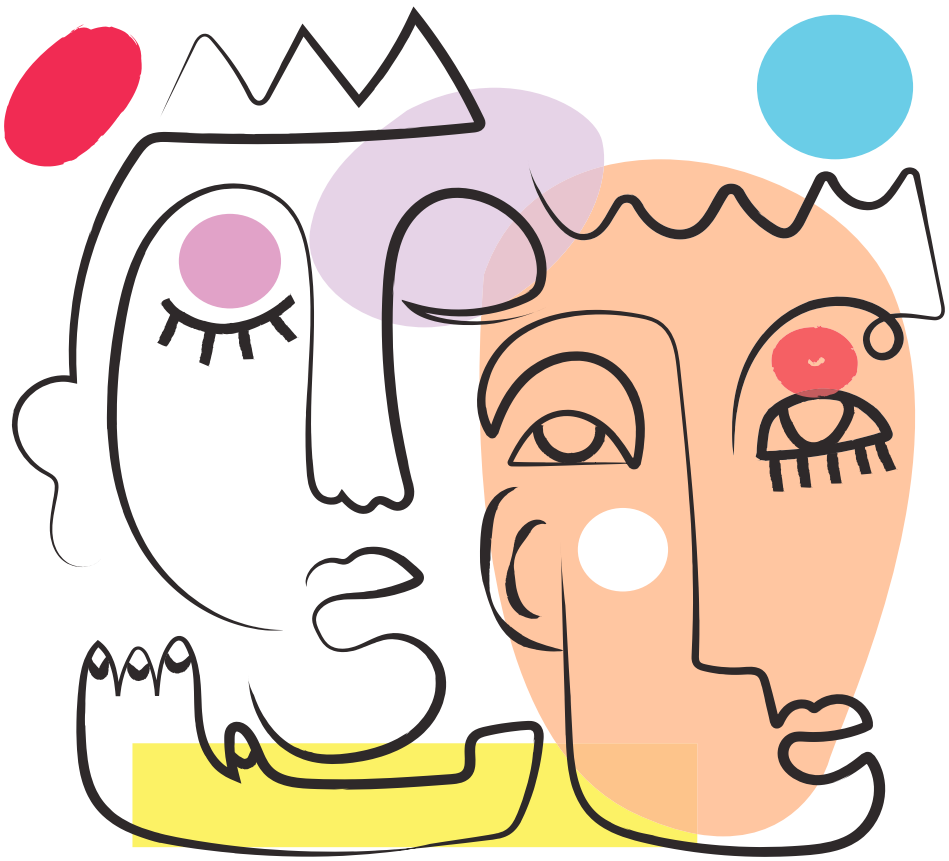

তবে তো সবার ঘুম ভেঙে যেত, জড়ো হতো লোক।
কী এসে দেখত তারা? কী লজ্জা, কী অপমান
আলোকাস কন্যা আমি,
উৎসঙ্গ জাতকে শুধু যার প্রাণ প্রর্থনা করেছি,
তারই হাতে ধর্ষিতা... হায়রে মেয়ের জন্ম,
তারই হাতে, নিজের...

আজও মুখে আনতে পারি না সেই নাম।

কবিতা পাঠের পর নারীকণ্ঠ যথেষ্ট নরম--
"কী এক ভয়াল গল্প লিখছেন জয়দেব বসু!
'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'
হাজার বছর আগে, 'চর্যাগীতিকায়'
'ভুসুকুপা' যে কঠিন সত্য লিখলেন
'মুক্তা'--এক 'থেরী'-নারী, শোনালেন তার
দীর্ঘশ্বাসের বয়ান; শব্দে শব্দে রক্ত
উরুসন্ধি, ঠোঁটে-স্তনে বিষের ছোবল
হাজার বছর আর আড়াই হাজার
সময়ে দূরত্ব আছে, গল্পে ভেদ নেই!"

'আজও তো বিষাক্ত গল্প পূর্ববৎ আছে
শুধু, আছে বলি কেন! আরও বহুমুখী,
সমাজের সহ্য বাড়ে--খুব প্রাত্যহিক!

দূরে যেত হবে কেন, আমি তো নিজেই
এমন গল্পের তীরে বিদ্ধ হয়ে আছি
মৃত্যুর অধিক মৃত্যু, ঘেন্না ধরে গেছে..."

কবিপ্রান্ত ঘুমিয়ে কি! অনিঃশ্বাস--কোনো শব্দ নেই
নারীটি স্থবির হলো, মন্দ নয় পাথরের কাঁড়ি
কী বলবেন, কবির চিন্তার ভিতর আরও আরও
কষ্টচিন্তা ঢুকে যাচ্ছে--কাঁটাকীর্ণ--পরিসীমাহীন

তাহলে! তাহলে!!

দ্বিধা, তীব্র ইচ্ছা, কবি টেলিফোন হাতে...
এত রাতে করাটা কি ভুল করা হবে!
স্বগতোক্তি করেন--
উল্টো ভাবুক, ভুল বুঝুক, রাগ যদি চড়ে বসে
মাথার ওপর...!!
একবার, একবার ক'রে ক'রে সাত/আটবার
কবির বিষণ্ন হাতে টেলিফোন ওঠে
নামিয়ে রাখেন
শূন্যতা এতটা হয়! গভীর ব্যাপক ভেজা ভারী!!
০০০
যখন পরিচয় ছিল না
কবির কবিতা পড়ে শুধু এক মুগ্ধতাকে
জড়িয়ে রেখেছে আরও শত শত হৃদ্-মুগ্ধতায়
এখন স্পষ্ট অন্যরকম
নারীটি আরও গভীর ক'রে ভাবে, দেখে
সকল কবিতা একদিকে...তার দিকে

কবিতা সহজ পথে হেঁটে হবে হৃদয়-গভীর
হৃদয় একটাই, কিন্তু সবদিকে ওর গতায়ত

একজন পাথরকে চিনি--কবি আবুল হাসান
'কেবলি লাবণ্য ধরে, উজ্জ্বলতা ধরে আর্দ্র, মায়াবী করুণ'
তাঁর অজস্র উচ্চারণের মধ্যে আমি কিন্তু আছি!

তখন ছিল বিস্ময়ে দেখা প্রাথমিক 'ঋতু'র বয়স
আবুল হাসান পড়ি বহুমুখী মুগ্ধতার ভিতর:
অতটুকু চায়নি বালিকা!
অত হৈ রৈ লোক, অত ভিড়, এত সমাগম!
চেয়েছিল আরও কিছু কম!

একটি জলের খনি, চেয়েছিল
তাকে দিক তৃষ্ণা এখনি, চেয়েছিল

একটি পুরুষ তাকে বলুক রমণী!

পাঁচ

হেলে পড়া রোদের বিকেল
হ্রদের পারের পার্ক। মুখোমুখি, কাছে...
নারীটি আজ যথেষ্ট নারী। ব্রীড়ানম্র, ঠোঁটে-ওষ্ঠে
ঝিরিঝিরি হাসি হেসে আছে
গতরাতে, টেলিফোনে কুয়াশা ও মরুঝড় ছিল
আজ দেখি--ঋতুপুষ্প, শচীন কর্তার 'শোন গো দখিন হাওয়া'
ঘুরেফিরে কবিতা ও কবিতাবিষয়

"যে-কথা হলো না বলা টেলিফোনে, পাশে বসে থেকে
চিঠি বললে চিঠি, গল্প বললে গল্প
লিখেছি--চিন্তার সব সত্য
পরাজয়, গ্লানি-ঘৃণা, গেড়ে-থাকা ক্লেদ-কুজ্ঝটিকা।

যথাদ্রুত আশা করছি উত্তরচিঠি"
০০০
রাতজেগে কবি পড়েছেন এই দীর্ঘতম চিঠি:
হচ্ছিলাম, বালিকা থেকে রমণী

মুগ্ধতা ও শিহরনে কলি থেকে ফুলফোটা দেখি
পাখি কেন নীড়ে ফিরে আসে
নদীর প্রবল কণ্ঠে কেন গীত হয়
সাগরের আলিঙ্গনস্তুতি
পুরুষ-প্রতীকে পৌঁছে, যুবকের চোখে কেন কুসুমের হাসি

কখন--বুঝিনি। দেখি, হৃদয়ে প্রেমের দিন
পৃথিবীতে তুচ্ছ বলে কোনো বস্তু নেই
রঙের কত যে রং, আকাশে আকাশে দেখি--বিপুল আকাশ
ফুলে কোনো কাঁটা নেই। মানুষের মন থেকে মুছে গেছে সকল কুলিশ

কোনোএক বৃষ্টিদিনে, যার জন্য সকল অপেক্ষা--
সে এসে হাজির। স্থূল, বন্য, এত মোটা দাগে...
প্রেমিক ধর্ষক হলে প্রতিরোধে কোনো প্রাপ্তি মেলে?

প্রশ্ন তো নিজেই বোবা, মনে হলে বমি চলে আসে

তেমন হয় কি কিছু এইসব অর্থহীন বেঁচে থাকা দিয়ে!
মাঝে মাঝে ভাবি--
খুব কি অন্যায় হবে, কোনোএক অন্ধকার রাতে
যদি আমি ঢুকে যাই অন্তহীন ঘুমের ভিতর!?

একরাতে হলো কী জানেন!
খোলা, আধাখোলা, বোজা, দীর্ঘ ঘুমে থাকা
বইয়ের স্তূপের মধ্যে শুয়ে আছি। কবিতা পড়ছি
কুড়িটি ঘুমের বড়ি, ডান পাশে জল রাখা আছে
বাইরে ঝড় ঝড় শব্দ...বাতি নিভে গেল...
হাতড়াচ্ছি, ঘুমের বড়ি...জল?
হঠাৎই মনে হলো--বইয়ের কবিতাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে
পয়ার মহাপয়ার মুক্তক অমিত্রাক্ষর আছে
আছে টানাগদ্যর কবিতা
আরও মনে এলো
কেউ যৌনসন্ত্রাসী, তার পাপের দায় তারই
তার জন্য অন্যকে মরতে হবে কেন? কে বলেছে?

ভালো কিছু কবিতার জন্য
বেঁচে থাকা যায়
নতুন কবিতা হবে, সে আনন্দ নিয়ে
বেঁচে থাকা যাবে...
আলো এলো। আমার হাতে কবিতাগ্রন্থ

যত লিখেছেন সব, সব কবিতা আমার জন্য
পড়ব না! সব ছেড়ে যাব...!!
বুকের মধ্যে কেমন যেন কান্না কেঁদে ওঠে

ছয়

চিঠির উত্তর কী লিখবেন কবি!
আনুষ্ঠানিক লেখায় বহু অংশ ফাঁকা থেকে যায়
(কৃত্রিম হ্রদের জলে উচ্ছ্বাস থাকে না)
অক্ষরে অক্ষর গেঁথে আরোপিত শব্দ হতে পারে
বোবা বন্দি শব্দ দিয়ে পূর্ণপ্রাণ কবিতা হয়
না

সত্যের সান্নিধ্যে থেকে, কবি তবু কিছু লিখলেন:
পত্রিকায় ছাপে, বই হয়, তবে
আমার কবিতা খুব পরিচিত নয়
যখন লিখতে পারি, মনে হয়--এখনো তো আছি
সারাজীবন ভেবেছি একজন মুগ্ধ পাঠকের কথা
যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা
(কবিতাপড়া নারী)
মনে হলো ঘরময় অনেক আগ্রহী আলো হেসে হেসে আছে

সেই যে বললে...
অর্থক কবিতা হলো শুদ্ধঋদ্ধ হৃদয়ের ঘ্রাণ

আমার বলার শক্তি বিলুপ্তির পথে
আসমুদ্রহিমাচল ঝড়...
ফেরার উপায় নেই। মনে মনে বলি--
একপাশে কবিতা থাকুক
অন্যপাশে তুমি

ভালো কিছু কবিতা লেখার জন্য
ভালো কিছু কবিতা পড়ার জন্য
কিছু অপেক্ষাকে আমরা তো জাগিয়ে রাখতে পারি!
কী বলো! পারি না?

মনে মনে দেখি--
জীবনানন্দের 'পাখির নীড়ের মতো'
বিপুল আশ্রয় হয়ে আছে
তোমার এ চেয়েথাকা চোখ
মনে মনে শুনি--
"পারব না কেন! কবিতার জন্য
হেসে হেসে সব দুঃখ...পারি"

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

স্বপ্নবুনন
শিক্ষা বিনিয়োগ প্রকল্প

শিক্ষার অগ্রযাত্রায় স্বপ্নের হাতছানি

দেশ-বিদেশে সহজে উচ্চশিক্ষার জন্য ইসলামী ব্যাংক
আনলো শিক্ষা বিনিয়োগ প্রকল্প- স্বপ্নবুনন

যারা বিনিয়োগ পাবেন

১৮ বছরের অধিক বয়সী শিক্ষার্থী ও অপ্রাপ্ত বয়সী
শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবক

বিনিয়োগ সুবিধা

স্নাতক লেভেল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা এবং মেডিক্যাল ও
বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা

www.islamibankbd.com

Contact Center: 16259 or 02-8331090

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্প-সাহিত্যের প্রগতিশীলতা

মার্কসবাদ সভ্যতার অগ্রগতিতে ও মানবিকীকরণে বিশ্বাসী, আর ওই কারণেই সে শিল্প-সাহিত্যের নিরন্তর অনুশীলন চায়, এবং পথ-উন্মোচন করতে সচেষ্ট থাকে সৃষ্টিশীলতার। একই সঙ্গে চায় অর্জনগুলোকে সর্বজনলভ্য করে তুলতে। শ্রেণির বিভাজন ভেঙে শিল্প-সাহিত্য যাতে সকলের কাছে পৌঁছে যায় এটি মার্কসবাদীদের সংস্কৃতিচর্চার একটি লক্ষ্য বটে। আরও একটা কাজে সাহায্য করে মার্কসবাদ। সেটি হলো শিল্প-সাহিত্যের ভেতরে কী ঘটছে, কেন ঘটছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা।

মার্কসবাদের নানা কৃতিত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে সকল মানবিক কাজের পেছনেই যে ইতিহাস আছে অমোঘ সেই সত্যটিকে বিবেচনায় নিয়ে আসা। মার্কসবাদ ভাববাদী ঈশ্বরের ব্যাপারে উদাসীন; কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে মার্কসবাদীরা ঈশ্বরের জায়গাতে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেটা এই অর্থে যে সব কিছুরই ইতিহাস আছে, ইতিহাসের বাইরে কিছুই নয়, ইতিহাসের ভেতরে থেকে, এবং ইতিহাসের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে নিয়োজিত অবস্থাতেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা কাজ করে। ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। ইতিহাসে থাকে শ্রেণি, থাকে শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব জিনিসটা সর্বত্রই কার্যকর। কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্পর্কটা কাজ করে তার চেয়েও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অনেক বেশি সত্য বটে। দ্বন্দ্ব বাধে অধিপতি শ্রেণির মতাদর্শের সঙ্গে অধিপতিত শ্রেণির মতাদর্শের। বিদ্যমান সমাজে অধিপতিদের মতাদর্শই রাজত্ব করে থাকে। আর এসব দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই ইতিহাস এগোয়।

শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির পেছনে অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই কাজ করে। এমনও মত আছে যে সৃষ্টির কাজটা উন্মাদনার ভেতরেই ঘটে। আরেকটা মত এই যে, শিল্পীরা অনুকরণ করেন। অনুকরণ করেন যা কিছু দেখেন ও কল্পনা করেন তার। কিন্তু এই অনুকরণ কখনোই যান্ত্রিক থাকে না, সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে; শিল্পীর অনুকরণ মানেই নতুন সৃষ্টি। আসলে কিন্তু অনুপ্রেরণা ও অনুকরণ– এই দুই ধারণাই সত্য। দার্শনিক প্লেটো অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন, তার দুর্ধর্ষ ছাত্র অ্যারিস্টটল বলেছেন অনুকরণের কথা। একজন ভাববাদী, অন্যজন বাস্তববাদী। ওই ধারণা দুটি কিন্তু পরস্পরবিরোধী নয়; বরঞ্চ একে অপরের পরিপূরকই। অনুপ্রেরণা ভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি যে সম্ভব নয়; এটা সত্য; আবার অনুপ্রাণিত শিল্পী যেহেতু সমাজে বসবাস করেন, এবং সমাজের বাস্তবতার ভেতরে থেকেই যেহেতু তার শিল্প-সৃষ্টি, তাই সমাজ তার কল্পনাকে ছাড় দেয় না, প্রভাবিত করে। নিয়ন্ত্রিতও করতে চায়। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে শিল্পীরা সেই নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থাকেন, কিন্তু আবার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হন। হতেই হয়। নইলে তো তারা সাধারণদের একজন হয়ে যাবেন। শিল্পী হবেন না। ইতিহাসের উপস্থিতিটা থাকেই।

উদাহরণ নেওয়া যাক। শেকসপিয়র এবং টলস্টয় উভয়েই অতুলনীয় শিল্পী। একজন লিখেছেন নাটক, অন্যজন উপন্যাস। এই যে তারা দুটি ভিন্ন রূপকল্প অবলম্বন করলেন এর পেছনে ইতিহাস কাজ করেছে। নীরবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে। শেকসপিয়রের পক্ষে উপন্যাস লেখা মোটেই সম্ভব ছিল না। নিষেধ ছিল ঐতিহাসিক বাস্তবতার। বাস্তবতা হলো নাটক এসেছে আগে, উপন্যাস পরে। প্রাচীনকালে নাটক লেখা হতো কবিতায়, কারণ কবিতার আগমনই সর্বপ্রথম। গদ্য এসেছে পরবর্তীতে। সেকালে মহাকাব্য ছিল। মহাকাব্য কবিতায় লেখা হতো। মহাকাব্য বীরদের কাহিনি। কিন্তু এক সময়ে টের পাওয়া গেল যে বীরদের আর আগের মতো পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ পাঠক সাহিত্য চাইছে, সে পাঠক আবার মধ্যবিত্ত, কারণ ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। মধ্যবিত্ত ঘরে বসে সাহিত্য পড়তে চায়, থিয়েটারে গিয়ে নাটক দেখবে এমন সুযোগ তার জন্য সীমিত। সাহিত্যের চাহিদাটা তখন বিশেষভাবে এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের কাছ থেকে, যারা লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু থাকে ঘরের ভেতরেই। সাহিত্যিক সেই চাহিদা মেটাবার জন্য আশপাশের মানুষদের নায়ক-নায়িকা করে উপন্যাস লেখা শুরু হলো।

অসামান্য মানের নাটক লিখেছেন শেকসপিয়র। সে সব নাটক মূলত রাজা-রানী, রাজদরবার ও অভিজাতদের নিয়েই। শেক্সপিয়রেরকালে সমাজে এরাই ছিল ক্ষমতাধর। তবে তিনি

Make your happiness
Double with
Mercantile Bank Credit Cards

This Ramadan,

Dine at our partner restaurants and enjoy Buy One Get One free
Iftar followed by Dinner using your MBL cards.

Gold, Platinum & Signature Credit Cards

CROWNE PLAZA AN IHG HOTEL DHAKA GULSHAN
DHAKA REGENCY HOTEL & RESORT
FARS Hotel & Resorts The Art of Welcoming
Holiday Inn AN IHG HOTEL DHAKA-CITY CENTRE
INTERCONTINENTAL DHAKA
Le MERIDIEN Dhaka
PAN PACIFIC SONARGAON
Radisson BLU DHAKA WATER GARDEN
RENAISSANCE DHAKA GULSHAN HOTEL
SHERATON Dhaka
SIX SEASONS
THE WESTIN DHAKA
The Peninsula Chittagong

All Debit, Credit & Prepaid Cards

Best Western PLUS Maya
GOLDEN TULIP THE GRANDMARK - DHAKA
GRACE 21 SMART HOTEL
shinepukur suites
THE RAINTREE DHAKA
THE WAY DHAKA

*Conditions apply

১৬২২৫
24/7
www.mblbd.com
facebook.com/mercantile.bd

বাংলার ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

রাজতন্ত্রের সমালোচনাও করেছেন। তার শ্রেষ্ঠ দুটি নাটকের একটি হ্যামলেট অন্যটি কিং লীয়র। দুটি নাটকেই দেখানো হচ্ছে রাজবাড়ীর রাজনীতিটা কেমন নিষ্ঠুর। রাজপুত্র হ্যামলেট এবং রাজা লীয়র দুজন ভিন্ন ভিন্ন দুই দেশের মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন সময়েরও; কিন্তু তারা উভয়েই নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। উভয়ের পরিণতিই নির্মম। শেকসপিয়র রাজতন্ত্রের ভেতরটাকে একেবারে উন্মোচিত করে দেখাচ্ছেন। কিন্তু তাই বলে রাজতন্ত্রের যে উচ্ছেদ চেয়েছেন তা কিন্তু নয়। হ্যামলেট নাটকে রাজ-পরিবারের সবাই শেষ পর্যন্ত মারা গেল; কিন্তু শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে পাশের দেশের এক রাজপুত্র মঞ্চে প্রবেশ করছে, মঞ্চের ওপর পড়ে-থাকা লাশগুলোকে সরিয়ে নিয়ে দর্শকদের জন্য সে নাটকের যবনিকা টানবে। সেকালের মঞ্চে পর্দা টানার ব্যবস্থা ছিল না, লাশ সরানোর কাজটা ওই রাজপুত্রের সৈন্য-সামন্ত দিয়েই সম্পন্ন করা হলো, আবার একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়াও হলো যে রাজা মারা গেছে সত্য, রাজত্বের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপুত্র হ্যামলেটও শেষ, কিন্তু তাই বলে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে অবসান ঘটল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কিং লীয়র নাটকেও ওই একই আশ্বাস। রাজা লীয়র মারা গেছেন, কন্যারাও কেউ জীবিত রইলো না, তবে মৃত কন্যাদের একজনের স্বামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত, তুলনায় ভদ্র গোছের মানুষ সে; বোঝা যাচ্ছে রাজত্ব চালানোর দায়িত্ব সে-ই তুলে নেবে নিজের কাঁধে। শেকসপিয়র নিজে রক্ষণশীল ছিলেন। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ তিনি, রক্ষণশীলতা তার শ্রেণিরই একটি বৈশিষ্ট্য। এই মধ্যবিত্ত জনতাকে পছন্দ করত না, শেকসপিয়রও করেন না, কিন্তু তবু বড় শিল্পী যেহেতু তাই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নৃশংসতাটাকে না দেখিয়ে পারেননি। সেখানেই তার মহত্ত্ব। রাজতন্ত্র যে টিকবে না সেটা তার ওই উন্মোচন জানিয়ে দিচ্ছে।

টলস্টয়কেও রক্ষণশীল বলতে হবে। শেকসপিয়রের তিনশ বছর পরের মানুষ তিনি। তার সময়ে তার দেশে অত্যাচারী সম্রাটদের রাজত্ব চলছিল, কিন্তু টলস্টয়ের সাহিত্য জগতে তাদের সরাসরি উপস্থিতি নেই। তবে সম্রাটের সহযোগী আমলাতন্ত্র খুবই তৎপর রয়েছে। টলস্টয় উপন্যাস লিখছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, তার দেশে তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। টলস্টয় তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আন্না কারেনিনাতে তার সময়কার বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র ও অভিজাত সমাজের সংকটটা দেখাচ্ছেন। পরিবার ভেঙে পড়ছে। ওদিকে আবার পরিবর্তনের জন্য পথানুসন্ধান চলছে। আন্দোলনও গড়ে উঠছে। আন্না কারেনিনা তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; বিশ্বকথাসাহিত্যেও এই রচনা অনন্যসাধারণ। উপন্যাসের নায়িকা আন্না রূপে-গুণে অসামান্য। বুর্জোয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিই বলা যাবে তাকে, নানা দিক থেকে। কিন্তু নিজের জীবনে ওই নারী চরিতার্থতা পেল না; শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো আত্মহত্যা করতে। বয়সে তার স্বামী আন্নার চেয়ে বিশ বছরের বড়, সামাজিক অবস্থানে আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরে তার প্রতিষ্ঠা; স্বামীর বিপরীতে রয়েছে আন্নার সমবয়স্ক ভ্রনস্কি, যে তার প্রেমিক। সেও আমলাতন্ত্রের লোক, তবে বেসামরিক নয় সামরিক আমলাতন্ত্রের। দুজনের কেউই আন্নাকে চরিতার্থতা দিতে পারে না– না তার স্বামী, না তার প্রেমিক। চলন্ত ট্রেনের নিচে নিজেকে নিক্ষেপ করে আন্না তার অতৃপ্ত জীবনের অবসান ঘটায়। চলন্ত ওই ট্রেন আগ্রাসী পুঁজিবাদের প্রতিনিধি যেন। তার চাকার নিচে পিষ্ট হচ্ছে দেশের সম্পদ ও সম্ভাবনা। পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত মানুষেরাও কিন্তু আছে। আছে লেভিন। প্রতিনায়ক সে। কৃষিতে শ্রমের ভূমিকাকেই সে মুখ্য হিসেবে দেখে। নিজের পরিবারের ভূমিদাসদের সে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। তাই বলে সে যে সমাজবিপ্লবী তা নয়। তবে তার আশপাশেই সমাজবিপ্লবীরা আছে। লেভিনের আপন ভাই যোগ দিয়েছে বিপ্লবীদের গোপন দলে। সে-দল কমিউনিস্টদের। বিপ্লবীদের সন্ধান পাবো টলস্টয়ের অপর উপন্যাস পুনরুত্থানে-এও। সেখানে দেখি বিপ্লবীদের নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে সাইবেরিয়াতে। বন্দিরা বই পড়ে, তারা চিন্তা করে, তাদের একজনের কাঁধের থলির ভেতর থেকে মার্কসের বই উঁকি দেয়। না, টলস্টয় নিজে সশস্ত্র বিপ্লবে আস্থাশীল নন, কিন্তু বিপ্লব যে আসছে তার সংবাদ তিনি দিচ্ছেন। সমাজে দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছিল। টলস্টয় তার সংবাদ পাচ্ছেন এবং পাঠকদের সে-সংবাদ জানাচ্ছেন। এবং বিপ্লব যাতে ঘটে তার জন্য সাহায্যও করছেন, বাস্তবতাকে সবার জন্য উন্মোচিত করে দিয়ে।

রেনেসাঁর সময়ে ইউরোপে চিত্রকলার অত্যাশ্চর্য বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো এমন সব ছবি এঁকে রেখে গেছেন যেগুলো তুলনাহীন। মার্কসবাদ বলবে এর পেছনে ছিল ইতিহাস। রেনসাঁ একটা নবজাগরণ এনেছিল; চিন্তায়, উৎপাদনে ও বাণিজ্যে, এবং স্বভাবতই দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই নবজাগরণেরই প্রকাশ ঘটেছে চিত্রকলাতে। রেনেসাঁর বিশেষ সমৃদ্ধি ইতালিতে। নবজাগরণের প্রথম কেন্দ্র ছিল ওইখানেই। স্থল ও জলপথে ইতালি যুক্ত ছিল অন্য দেশের সঙ্গে; সেখানে বাণিজ্যের চর্চা চলছিল মহোৎসাহে। বাণিজ্য জিনিসটা নিতান্তই ইহজাগতিক; রেনেসাঁও যেমন মতাদর্শিক তেমনি ইহজাগতিক, তাই দেখি তার শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয় নিয়েও যখন ছবি আঁকেন তখন তাতে মনুষ্যজীবনের মহিমা, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অনুভূতির বলিষ্ঠতা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নতুন এক বিশ্ববিভা, শিল্পী ও শিল্প উভয়ের চোখেমুখে।

রেনেসাঁ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মুক্তির; কিন্তু প্রতিশ্রুত সে মুক্তিটা এলো না; কারণ রেনেসাঁ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিকশিত করলো তা পুঁজিবাদী চরিত্রের। পুঁজিবাদ সব মানুষকে সমান করে না, উল্টো মানুষে মানুষে বৈষম্য তৈরি করে। রেনেসাঁর কালে বিকশিত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ গণতন্ত্র দাবি করছিল, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। ব্যাহত-গতি সভ্যতাকে তাই আরও একধাপ এগুবার জন্য সচেষ্ট হতে হলো। প্রয়োজন দেখা দিল সামাজিক বিপ্লবের। ওই অগ্রগতির কারণেই ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে বিপ্লব ঘটে। বিপ্লবের সেই ঘটনার পেছনে ফরাসি লেখকদের দার্শনিক ও সাহিত্যিক রচনার অবদান ছিল। বিপ্লব যখন ঘটলো, ঘটেই গেল, তখন ইংল্যান্ডের তরুণ লেখকদের কেউ কেউ অত্যন্ত উদ্দীপিত হয়েছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো মনে করেছিলেন পৃথিবীতে এসেছে নতুন দিন। বিপ্লবে যোগ দেবেন বলে তিনি ফ্রান্সে রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি ফেরত এসেছেন, তার নিজের শ্রেণির কাছেই। সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণি আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সমাজ বিপ্লবের প্রচণ্ডতা দেখে। ভয় পেয়েছিলেন উদারপন্থি এডমন্ড বার্কও। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়ে বার্ক পার্লামেন্টে উদার কণ্ঠে বক্তৃতা করেছেন, ভারতে কোম্পানি শাসনে দুর্নীতির ঘটনার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন; কিন্তু তাকেই আবার দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবের বিপক্ষে বই লিখতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন, ইংল্যান্ডবাসীকে তারা সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন বিপ্লবের ব্যাধিটি কোনোমতেই যেন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে ঘাঁটি না গাড়ে।

ওদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার নিজের দেশে পুঁজিবাদের উদ্বেগজনক উত্থান-তৎপরতা দেখতে পাচ্ছিলেন। দেখছিলেন গ্রামের কৃষক কীভাবে উৎপাটিত হয়ে শহরে চলে আসছে, এসে পরিণত হচ্ছে মজুরি শ্রমিকে, আবাস খুঁজছে নোংরা বিস্তিতে। এই দৃশ্যে তিনি পীড়িত হয়েছেন। সমাধানটা কি? না, পুঁজিবাদের উচ্ছেদের কথা ভাবেননি; পলায়নই বরঞ্চ করতে চেয়েছেন, প্রকৃতির কাছে। কিন্তু সে তো কবির পলায়ন, মানসিকভাবে; মেহনতি মানুষ যাবে কোথায়? কে দেবে তাকে জীবিকার নিশ্চয়তা? উত্তর নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রগতিশলীতা অনস্বীকার্য। কবিতাকে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে; ঠিক করেছেন সাধারণ মানুষকে নিয়েই লিখবেন। লিখবেন কথোপকথনের ভাষাতে। ঘোষণাটা দিয়েছিলেন নিজের কাব্যযাত্রার একেবারে সূচনালগ্নে। এগিয়ে তিনি গেছেনও। তাতে কবিতার লাভ হয়েছে, মেহনতিদের বড় একটা লাভ হয়নি। পুঁজিবাদের জোয়াল তাদের কাঁধে ক্রমান্বয়ে শক্তই হয়েছে।

ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমসাময়িক। ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনায় তিনি অনেক বেশি রক্ষণশীল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির রক্ষণশীল অংশেরই প্রতিনিধি তিনি। একে তো মহিলা তার ওপর থাকতেন মফস্বলে, সাহিত্যিকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না; নিজে নিজে একাকী চুপিচুপি লিখতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের আগেই তিনি মার্কসবাদী হয়ে গেছেন। প্রেম ও বিবাহের বিষয় নিয়েই সাধারণত লিখতেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে

পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলেন যে মানবিক সম্পর্কগুলো কোনো মতেই অর্থনীতির বাইরে নয়; আবেগ যতই দুর্দমনীয় হোক সম্পত্তি ও অর্থ না থাকলে সম্পর্ক জমে না। কিন্তু তিনি আবার মার্কসবাদীদের থেকে দূরেই থেকে যান যখন সম্পত্তিব্যবস্থাকে মেনে নেন। বাস্তববাদী অবশ্যই, কিন্তু মোটেই বিপ্লবী নন; ফরাসি বিপ্লবের পরে লিখেছেন কিন্তু বিপ্লব তাকে নাড়া দেয়নি। থেকেছেন তিনি গৃহের বন্ধনে, পারিবারিকভাবে যেমন তেমনি মানসিকভাবেও।

তার পরের কালের লেখকরা কেউ কেউ পুঁজিবাদের নৃশংসতার ছবি এঁকেছেন তাদের লেখাতে। যেমন চার্লস ডিকেন্স। অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের হৃদয়বিদারক চিত্র আছে তার উপন্যাসে। সেদিক দিয়ে জেন অস্টেন থেকে তিনি যোজন যোজন দূরের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও ওই মধ্যবিত্তই, সামাজিক পরিবর্তনে অবিশ্বাসী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে পুঁজিবাদের বিস্তর সমালোচনা আমরা পাব। ডিকেন্স তো আছেনই, পুঁজিবাদের সমালোচনা ম্যাথু আর্নল্ডও করেছেন; যেমন করেছেন টমাস কার্লাইল। আর্নল্ড ভাবতেন পালাবেন তিনি প্রাচীন পদী সংস্কৃতির কাছে : কার্লাইল ভাবতেন আশ্রয় নেবেন বীরদের পক্ষপুটে। মুক্তির সোজা পথটা যে সমাজ বিপ্লব সেটা তারা ভাবতে পারেননি। নিষেধ ছিল শ্রেণির। ধরে নিয়েছেন সংস্কারেই কুলাবে। মার্কস কিন্তু ওই সময়েই, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হয়েও, সন্ধান পেয়ে গেছেন এই সত্যের যে ব্যক্তিমালিকানার জায়গাতে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই। এই যে তিনি ভাবতে পারলেন যথার্থ সামাজিক বিপ্লবের কথা, এটা সম্ভব হলো কীভাবে? প্রথমত মেধা ছিল; দ্বিতীয়ত ছিল শ্রেণিচ্যুতির ক্ষমতা। অন্যরা পারেননি, তিনি পেয়েছেন। সমস্যাটিকে তিনি তার নিজের শ্রেণিস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি, দেখেছেন মেহনতিদের দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কসবাদ ওইখানেই বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। মার্কসবাদ জানিয়ে দেয় যে কেবল দেখা নয়, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সেটাই বরঞ্চ অধিক জরুরি। আর দেখাটাই যে যথেষ্ট তাও নয়, প্রয়োজন সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়ানো।

বিংশ শতাব্দীর মস্ত বড় ঘটনা বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়াতে ও চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লব মার্কসবাদীরাই ঘটিয়েছেন। তা বিপ্লবের জন্য শিল্পসাহিত্যে প্রস্তুতিটা কেমন ছিল? ছিল যথোপযুক্ত। রুশ সাহিত্যে তো বটেই, চীনের সাহিত্যেও, বিশেষ করে নবীনদের রচনায়, বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন, এবং চীন বিপ্লবের প্রধান মাও সে তুঙ, দুজনেই যেমন সংগঠক ছিলেন তেমনি ছিলেন লেখকও। কিন্তু অন্যত্র? অন্যসব দেশে? হ্যাঁ, অন্যত্র বিপ্লবী চেতনা নিশ্চয়ই ছড়িয়েছে, এমনকি বিপ্লবও ঘটেছে, কিন্তু রুশ ও চীন বিপ্লবের মতো কোথাও নয়। সত্য এই যে, রুশ বিপ্লব দেখে বিপ্লব-বিরোধীরা একট্টা হয়ে গিয়েছিল। তারা বিরোধিতা করেছে।

এরই মধ্যে অবশ্য নাটক লিখেছেন বার্টল্ট ব্রেখট এবং আর্থার মিলার। এরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন; ব্রেখট স্পষ্ট করে, মিলার অবশ্য অতটা স্পষ্ট নন। আমেরিকায় বসে তারা লিখতেন। কিন্তু পুঁজিবাদী আমেরিকা তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়নি লেখার; পীড়ন করেছে বরঞ্চ। ইউরোপে তরুণ লেখকরা কেউ কেউ বিপ্লবের পক্ষে লিখেছেন, এমনকি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, প্রাণও দিয়েছেন কয়েকজন। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ স্ট্যালিনের তথাকথিত একনায়কত্বকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে সমাজতান্ত্রিক শিবির ত্যাগ করে হয় উদারনীতির পক্ষে, নয় তো সরাসরি রক্ষণশীল শিবিরেই চলে গেছেন।

রুশ বিপ্লব দেখে অনেক বুদ্ধিজীবীই আবার ঘাবড়ে গেছেন। তাদের কেউ চলে গেল ধর্মের আশ্রয়ে, কেউ কেউ অতীত ইতিহাসের কাছে। ভেবেছেন উটপাখির মতো মুখ গুঁজে ঝড় থেকে বাঁচা যাবে। আদিমতার কাছে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও দেখা গেছে। ইংরেজি সাহিত্যে এলিয়ট আনলেন ধর্মের বাণী, লারেন্স দুঃখ পেলেন পুঁজিবাদ মানুষের ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতাকে খাটো করছে দেখে, ইয়েটস ভাবলেন ঠিক আছে জাতীয়তাবাদীই হবেন। ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন তার ভেতরে আধ্যাত্মিকতার যে সুর শুনতে পেয়েছেন সেই সুরের জন্য। ইয়েটসের নিজের কৃত্রিম জগতে সেটি শোনা যাচ্ছিল না। এজরা পাউন্ড তো ঝুঁকে পড়েছিলেন ফ্যাসিবাদের দিকেই। পাঠকরা এগিয়ে গেছে, সে তুলনায় বড় বড় লেখকদের অগ্রগতি ঘটেনি; শ্রেণিগত বিপ্লবভীরুতা তাদের অব্যাহতি দেয়নি। কোথাও কোথাও দেখা গেছে রচনার আঙ্গিক বড় হয়ে উঠতে চাইছে বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে। যার মূল কারণ হচ্ছে বিষয়বস্তুর ভেতর সারবস্তুর সংকোচন। ব্যাধিকে যারা দেখেছেন তারাও ব্যাধির কারণ যে পুঁজিবাদ সেটা ধরতে পারেননি, বা ধরতে চাননি।

একই কারণে চিত্রকলায় দেখা দিয়েছে জীবনমুখিতার বদলে আত্মমুখিতা। এসেছে সুররিয়ালিজম, কিউবিজম, দাদাইজম।

ব্যতিক্রম হচ্ছেন পিকাসো। কিন্তু তিনি তো প্রায় একলা পথিক।
কেউ কেউ অবশ্য ঝুঁকেছিলেন কমিউনিজমের দিকেই। কিন্তু থাকতে পারেননি। শ্রেণি অবস্থান তাদের আর এগোতে দেয়নি। টেনে পেছনে নিয়ে এসেছে। কমিউনিজমকে এরা ঈশ্বর ভেবেছিলেন, পরে ভাবলেন ঈশ্বরের পতন ঘটেছে। বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য জর্জ অরওয়েল যোগ দিয়েছিলেন স্প্যানিশ বিপ্লবীদের সংগ্রামে, কিন্তু বিপ্লবীদের পেছনে তথাকথিত স্ট্যালিনবাদ রয়েছে মনে করে ব্যঙ্গরচনা লিখলেন বলশেভিক বিপ্লবের বিরুদ্ধেই। তার কাছে মনে হয়েছে বলশেভিজমে আর ফ্যাসিজমে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আবার এটাও জানা গেছে যে, শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববিরোধিতার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিশ্বের আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ যেমন কাজ করেছে তেমনি বৈষয়িক পৃষ্ঠপোষকতাও যে তৎপর ছিল না এমনো নয়।

২

রাষ্ট্র ও তার অধীনস্থ আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের চর্চাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ধরা যাক আধুনিক বলে কথিত বাংলা কবিতার কথা। এর উদ্ভব ও বিকাশ ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতের পর থেকেই। দুহাতে কবিতা লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। তার ভাষাটা আধুনিক। সামাজিক অসঙ্গতিকে নিয়ে তিনি চমৎকার হাসিঠাট্টা করেছেন। ইংরেজানুকরণ তার ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাইরে থাকেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে তিনি যেন ইয়ার্কি-ফাজলামো করছেন। যে অভিযোগ তার অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিকতার অন্তরে ছিল অসংশোধনীয় এক রক্ষণশীলতা। সিপাহী অভ্যুত্থানকে নিয়ে তিনি যেভাবে হাস্যকৌতুক করার চেষ্টা করেছেন তার ব্যাখ্যা ওই রক্ষণশীলতার ভেতরেই সংরক্ষিত রয়েছে।
বাংলা গদ্য এসেছে নবীন মধ্যবিত্তের হাত ধরে। এই মধ্যবিত্ত লেখাপড়া শিখেছে, টাকা-পয়সাও করেছে, আনুকূল্য পেয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। শ্রেণিটি ছিল কৃত্রিম ও জনবিচ্ছিন্ন; তাদের তৈরি গদ্যেও ওই দুই জিনিসের ছাপ এসে পড়ল। গদ্যের কৃত্রিমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেল সংস্কৃত ভারাক্রান্ততায়। কৃত্রিম এই ভাষার নাম দেওয়া হয়েছিল সাধুভাষা; অর্থাৎ ভদ্রলোকের ভাষা; চলিত ভাষা নয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা গদ্যকে ওই দুই দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে; তবুও নিস্তার মেলেনি।
কোম্পানি শাসনের সময়ে লালন ফকির গান তৈরি করছিলেন, মেহনতিদের ভেতরে বসবাস করে। কিন্তু সে-রচনা যতই সরল ও স্বাভাবিক হোক সে তো কবিতাই, গদ্য নয়। তদুপরি থাকেন তিনি রাজধানী কলকাতা থেকে অনেক দূরে, শ্রেণিগত পরিচয়ে তিনি দেহাতী মেহনতি বৈ নন। তার ভাষা ভদ্রসাহিত্যের বাহন হয় কী করে? তা ছাড়া লালনের যে গান তাতে মেহনতিদের জীবন ও সংগ্রামের কথা যে খুব একটা ছিল এমনো নয়। ওটা তাই মুখের ভাষা বটে, তবে পুরোপুরি মেহনতি মানুষের ভাষা নয়।
আসলে ভাষা যে কেবল পোশাকে কাটে এমন তো নয়, ভাষার ভরসা ভেতরের বিষয়বস্তুর ওপরই। তাই দেখি পরে যখন সাধুকে সরিয়ে দিয়ে চলিত চলে এলো তখনো যে তাতে কৃষক ও শ্রমিকের জীবনসংগ্রাম, যা আসলে শ্রেণি সংগ্রামই, সেটা জায়গা পেল এমন নয়। গদ্যের ভাষা ও বিষয় রইলো মধ্যবিত্তের দখলেই। যেমন প্রমথ চৌধুরীর। তিনি ছিলেন চলিত ভাষার পক্ষে, কিন্তু তাই বলে তার বিষয়বস্তুতে যে সমাজ বিপ্লবের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো ছোঁয়া ছিল তা নয়। রায়তের কথা তিনি লিখেছেন, তাতে রায়তের দুঃখের কথা আছে, কিন্তু বেচারাদের দুঃখের কারণটা যে-জমিদারি ব্যবস্থা তার অবসান ঘটানোর দাবিটা নেই। বোঝা যায় শ্রেণির সীমা কেমন অলঙ্ঘনীয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণ তো না দিলেই নয়। তার 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে অল্পকথায় কৃষকের জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার খবর যেভাবে উঠে এসেছে সেভাবে অন্য কোথাও এসেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে এসে সিদ্ধান্তটা কী? না, জমিদারি ব্যবস্থাটা থাকবে। কেন থাকবে? কারণ, না থাকলে আধুনিক বঙ্গ সমাজ ভেঙে পড়বে; ভীষণ অরাজকতা দেখা দেবে। আর এটা তো জানা কথাই, বলেছেন তিনি, যে আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। আমরা অর্থ মধ্যবিত্তরা। বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের উদারনীতির প্রান্তসীমা এমন পরিষ্কার ভাবে আর কেউ দেখিয়ে দেননি। অনেক বছর পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য বলে দিয়েছেন, 'সহেনা সহেনা প্রাণে/জনতার জঘন্য মিতালী'। তবে প্রাণাঘাতের সেই আশঙ্কাবাণী তেমন একটা প্রচার পায়নি। অসামান্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভেতর ছিল স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা, কিন্তু পাশাপাশি সাম্যের সুপ্ত ভীতি। এই স্পৃহা, ওই ভীতু এদের ভেতরই চিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে সেকালের এবং একালেরও উদারনীতিকদের বিচরণসীমার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি। এরা ভদ্র, কিন্তু বিপ্লববিরোধী। সেটা ঘটেছে ভদ্রতার খাতিরেই এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'পবিত্রতা' রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধতার কারণেই।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্রোহী ছিলেন। সাহেব হতে গিয়ে তিনি কিন্তু উল্টো ঘটনাই ঘটালেন, বাঙালি হয়ে গেলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে পীড়িত বাংলার আর্তহৃদয় তার মেঘনাদবধ কাব্যে আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু তিনিও দেখা যাচ্ছে তার ওই মহাকাব্যে সতীদাহের মতো নারকীয় ভারতীয় প্রথাকে রীতিমতো আদর্শায়িত করে দিয়েছেন। এবং যদিও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় অসামান্য দুটি প্রহসন লিখেছেন যাতে রক্ষণশীল জমিদারদের প্রজাপীড়নের এবং নব্য সাহেবদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তীব্র পরিহাস করা হয়েছে, তথাপি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা যে সাহিত্যের যথার্থ ভাষা হতে পারে এমন 'অলুক্ষণে' কথা মুখে আনেননি। বলেছেন ও তো জেলেদের ভাষা। যতই বলুন যে তিনি খাঁটি বাঙাল, যশোহরের, শেষ বিচারে তিনি ভদ্রলোকই তো।
রবীন্দ্রনাথ বহু দিক দিয়েই অসাধারণ। প্রায় সব অগ্রগতির সঙ্গেই তিনি যুক্ত থেকেছেন। ভূমিকা রেখেছেন। ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ব্যাপ্ত ও গভীর। শিক্ষিত বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রুচির ব্যাপারে তার কাছ থেকে নিরন্তর শিক্ষা নিয়েছে। কিন্তু শ্রেণিগত সীমা ছিল তারও। কৃষকের জীবনে প্রবেশ করতে পারেননি, সে-কথা অন্যে বলবে কী তিনি নিজেই বলে গেছেন; নিজের ভাষায়, খেদের সঙ্গে। জমিদারি ব্যবস্থা যে অন্যায় সেটা অবশ্যই জানতেন, কিন্তু ওই ব্যবস্থার উচ্ছেদে যে কৃষকের কোনো সুবিধা হবে এমনটা ভাবতে পারেননি। বিপ্লব-পরবর্তী রুশ দেশে গিয়ে, সেখানকার উন্নতি দেখে তো প্রায় অভিভূতই হয়েছিলেন; কিন্তু বিপ্লবের ভেতরে যে বলশেভিক কার্যকরণ ছিল তার প্রশংসা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি বইতে স্ট্যালিন তো নেই-ই, লেনিনও নেই।
রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্বে। বিশ্বযুদ্ধ যখন তুমুল দশা। ঠিক সেই সময়েই জাপান ও আমেরিকায় ভ্রমণে গিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদের নিন্দা জানিয়ে বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু সংকটটা যে পুঁজিবাদের নিজের হাতে তৈরি, ওই জাতীয়তাবাদ যে আসলে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ, এটা পরিষ্কার করে বলেননি। নিন্দা যা প্রাপ্য ছিল সে তো পুঁজিবাদেরই। কিন্তু মনুষ্যত্ববিদ্বেষী ওই শত্রুটিকে পুঁজিবাদ বলে চিহ্নিত করেননি। বাধাটা ছিল বিশ্বকবির অন্তর্গত উদারনীতির। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তদানীন্তন ও ভবিতব্য তাণ্ডব থেকে বের হওয়ার পথটা যে কোথায় তাও বলেননি। ওই পথের পরিষ্কার উন্মোচন ঘটিয়েছিল বলশেভিক বিপ্লবীরা, জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার কয়েক মাসের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতের সমস্যাটা রাজনৈতিক নয়, সামাজিক। তা সামাজিক তো ঠিকই, কিন্তু সমাজ তো থাকে রাষ্ট্রের অধীনেই। রাষ্ট্রের ওই কর্তৃত্বের কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলতে উৎসাহবোধ করলেন না। উৎসাহের অভাবটা তার উদারনীতি থেকেই এসেছে।
১৯২০-৩০-এর আধুনিক লেখকদের অনেকেই নিজেদের আন্তর্জাতিক বলে ভাবতে পছন্দ করতেন। আসলে তারা ছিলেন অধঃপতিত পুঁজিবাদী সংস্কৃতির অনুরাগী। তাদের আধুনিকতা ছিল পশ্চিমী বুর্জোয়াদের অনুকরণের। এদের মধ্যে কারও কারও জন্য যৌবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল জীবনযন্ত্রণা। অগ্রসর যারা, যেমন বিষ্ণু দে, তারা আবার মার্কসবাদকে মেলাতে চাইলেন ঘোরতর রক্ষণশীল

টিএস এলিয়টের সঙ্গে। দুধ ও জলকে এক করার চেষ্টা; তাতে দুধের ক্ষতি, জলের লাভ। কারও কারও আধুনিকতা আবার রওনা দিয়েছে মার্কিনদেশাভিমুখী।

যথার্থ আধুনিক ছিলেন কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম। বলশেভিক বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী যে নতুন এক আন্তর্জাতিকতা তৈরি করেছিল তিনি তাকে ধারণ করেছেন নিজের মধ্যে। কেবল বিদ্রোহী ছিলেন না, বিপ্লবীই ছিলেন। নজরুলের জন্ম ১৮৯৯-তে। একই বছর জন্মেছেন স্পেনের লোরকা এবং চিলির পাবলো নেরুদা। পুঁজিবাদবিরোধিতার যে আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতা তা এদের তিনজনের মধ্যেই ছিল। তবে বাস্তব ঘটনা তো এই যে লোরকা ও নেরুদা যে ধরনের ইউরোপীয় পরিসর পেয়েছিলেন নজরুল তা পাননি, তবুও আবদ্ধ দেশে এবং দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও নিজের ভেতরে তিনি একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। নজরুল, লোরকা ও নেরুদা– তিনজনই ছিলেন মার্কসবাদী।

নজরুল এবং জীবনানন্দ দাশের জন্ম একই বছরে। নজরুল এতটাই প্রবল এবং জীবনানন্দ এমনই গ্রহণ-মনস্ক ছিলেন যে, জীবনানন্দের প্রথম জীবনের কবিতায় নজরুলের প্রভাব বিলক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মৌলিক মনীষা-সম্পন্ন ছিলেন যেহেতু, তাই ওই প্রভাবে তিনি আবদ্ধ থাকেননি; বের হয়ে গেছেন অচিরেই। জীবনানন্দও পুঁজিবাদকে চিনেছিলেন, নিজের জীবনাভিজ্ঞতা ও পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে। পুঁজিবাদ তাকে খাপ-খাওয়া মানুষ হতে দেয়নি। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ জীবনানন্দ দাশ। পরিবারে সাহিত্যচর্চা ছিল, তার মাতাও কবিতা লিখতেন। কিন্তু জীবিকার অনিশ্চয়তায় তাকে ভুগতে হয়েছে। তার কবিতায় ও গল্পে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরোধিতা আছে, যদিও তিনি বিপ্লবী ছিলেন না মোটেই। সার্বক্ষণিক যন্ত্রণা তাকে বিষণ্ন করে রাখত।

জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে তার মিল আছে মনে হবে, কারণ দুজনেই গ্রামবাংলা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু পার্থক্য একেবারেই মৌলিক। জসীমউদ্‌দীন পুঁজিবাদের মোকাবিলা করেননি, জীবনানন্দ করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের বাংলা-ভূখণ্ডও পুঁজিবাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, কিন্তু লেখেন তিনি গ্রামীণ জীবনের কথাই। ইতিহাসের যে চেতনা জীবনানন্দের কবিতাকে গভীরতা দিয়েছে জসীমউদ্‌দীনের কবিতাতে তা থাকার কথা নয়, থাকেওনি।

নজরুল যে শেষাবধি টিকতে পারলেন না, নির্বাক হয়ে গেলেন অকালে, তার প্রধান কারণ পুঁজিবাদী নিষ্পেষণ। সংসারে অনটন ছিল, তার মধ্যে আবার দেখা দিল শোক ও ব্যাধি। আরেকটি কারণ সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে অগ্রসর হতে না-পারা। এ প্রসঙ্গে সমর সেনের কথা আসে। তিনিও বিপ্লবী ধারাতেই থাকতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আন্দোলন যে এগোচ্ছে না সেটা বুঝতে পারছিলেন, এবং টের পেলেন যে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেলানো যাচ্ছে না। নিজের সীমানা তার জানা ছিল, সে জন্য ১৯৪৬-তে এসে কবিতা লেখাই ছেড়ে দিলেন। এরপরও অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু কবিতা থেকে গেল পেছনেই। সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের থামবার কথা নয়, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে তার যোগ ছিল একেবারে প্রত্যক্ষ; ওই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাংগঠনিকভাবে ব্যস্ত ছিলেন, অঙ্গীকার ছিল খুবই দৃঢ়। কিন্তু সুকান্ত তো মারা গেলেন ১৯৪৭ সালে পৌঁছেই, মাত্র একুশ বছর বয়সে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও আন্দোলনে ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি, দলত্যাগ করে চলে গেছেন রক্ষণশীলদের দলে। শ্রেণিগত অবস্থানকে তিনি ত্যাগ করবেন ভেবেছিলেন, চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষাটা হয়নি। অবিকল না হলেও আর, একই রকমের ঘটনা কিন্তু ঘটেছে সমরেশ বসুর বেলাতেও। মেহনতিদের জীবন নিয়ে তিনি 'গঙ্গা' লিখেছেন ১৯৫৫-তে। মনে হচ্ছিল আরও এগোবেন। পারলেন না। শ্রেণি তাকে আটকে দিল। ১৯৬৫-তে তাকে লিখতে হয়েছে 'বিবর', গঙ্গা থেকে সে অনেক দূরের। ঢাকার সোমেন চন্দ মনেপ্রাণে যুক্ত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে, কিন্তু তিনিও সুকান্তের মতোই বেঁচে ছিলেন ওই একুশ বছরই। নিহত হয়েছেন জাতীয়তাবাদীদের হাতে। জাতীয়তাবাদে সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্বটা তখন বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধদেব বসু ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম একই বছরে, ১৯০৮ সালে। কিন্তু পার্থক্য অনেক। একজন মূলত কবি, অপরজন পুরোপুরি কথাসাহিত্যিক। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যবধান একেবারে গোড়াতেই। বুদ্ধদেব ভাববাদী, মানিক বস্তুবাদী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দুই উপন্যাস, পুতুল নাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝি, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা; সে দুটি উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মেহনতি মানুষদের জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি আছে; কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরে তিনি যা লিখেছেন সে রচনা অন্যরকম, সেখানে শ্রেণি তো আছেই সঙ্গে রয়েছে মেহনতি মানুষের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগ্রামের কথা। এই লেখাগুলো কিন্তু তেমন প্রচার পায়নি; কারণ বুর্জোয়াভাবাপন্ন গণমাধ্যমের জন্য এরা উপাদেয় বস্তু ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৮ বছর।

নজরুল যে শেষাবধি টিকতে পারলেন না, নির্বাক হয়ে গেলেন অকালে, তার প্রধান কারণ পুঁজিবাদী নিষ্পেষণ। সংসারে অনটন ছিল, তার মধ্যে আবার দেখা দিল শোক ও ব্যাধি। আরেকটি কারণ সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে অগ্রসর হতে না-পারা। এ প্রসঙ্গে সমর সেনের কথা আসে। তিনিও বিপ্লবী ধারাতেই থাকতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আন্দোলন যে এগোচ্ছে না সেটা বুঝতে পারছিলেন, এবং টের পেলেন যে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেলানো যাচ্ছে না। নিজের সীমানা তার জানা ছিল, সে জন্য ১৯৪৬-তে এসে কবিতা লেখাই ছেড়ে দিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় গণনাট্য সংঘ ছিল। সংঘের কর্মীরা গান লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, তাদের কাজ যথেষ্ট চাঞ্চল্য এমন কি উদ্দীপনারও সৃষ্টি করেছিল। গণনাট্য সংঘ কিন্তু যথার্থ অর্থে বিপ্লবী সংগঠন ছিল না। সে জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিরোধও দেখা দেয়; শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র আলাদা হয়ে যান, হেমাঙ্গ বিশ্বাস বের হয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন গড়েন, সলিল চৌধুরীকে বোম্বে-কলকাতা করতে হয়, ভুপেন হাজারিকা শেষ পর্যন্ত শামিল হন বিজেপিতে। এসবের পেছনে বড় একটা কারণ তাদের আনুকূল্য দেওয়ার মতো জোর ছিল না তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের।

৩

বিপ্লবী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সাতচল্লিশের দেশভাগে। পূর্ববঙ্গের ক্ষতিটাই বেশি। অখণ্ড বাংলাতে যে সাংস্কৃতিক জীবন ছিল পূর্ববঙ্গ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। পূর্ববঙ্গে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আগ্রাসন ক্রমাগত শক্তিশালী হলো। দেশভাগের সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বয়স মাত্র পঁচিশ। ওই বয়সেই তিনি পাকিস্তান যে কেমন রাষ্ট্র হবে সেটা বুঝে ফেরেছিলেন; স্বাধীনতা লাভের আনন্দে-উল্লসিত তার শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ যেটা বুঝতে পারেনি। লালসালু উপন্যাসে তো কেবল একটি পশ্চাৎপদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ছবি নেই, আছে ধর্মকে ব্যবহার করে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাসও। পূর্বাভাসটি সত্য হতো, যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি গড়ে না উঠত। শ্রেণির সীমা

অতিক্রম করেই ওয়ালীউল্লাহ লালসালু লিখেছিলেন। কিন্তু ওই রকমের ও সমান গভীরতার উপন্যাস তিনি আর লিখতে পারেননি; শ্রেণিই বাধা দিয়েছে। তাকে বিদেশে চলে যেতে হয়েছে। থাকতে হয়েছে সেখানেই। স্ত্রী ছিলেন বিদেশিনী। একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে প্রবাসেই ছিলেন; ভেতরে রক্তক্ষরণ ঘটেছে এবং দেশ-স্বাধীন হওয়ার অল্পদিন আগে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। স্মরণ করা যাক শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাও। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে হৃদয়স্পর্শী ছোট গল্প লিখেছেন তিনি। পাকিস্তান হওয়ার পরে লিখলেন কাশবনের কন্যা। কিন্তু তার শ্রেণি ঠেলে দিল তাকে ইতালির রোম শহরে। সেখানেই রয়ে গেলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। রাজনীতির লোক সত্যেন সেনের কাছ থেকে উপন্যাস প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে ছিলেন; সে কারণে জেল খেটেছেন ১৭ বছর; সাতচল্লিশের আগে ৬ বছর, পরে ১১ বছর। কিন্তু এর ভেতরই তিনি লিখেছেন, এবং লেখাকে রাজনৈতিক কর্মের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শ্রেণি তাকে নিষেধ করেছে রাজনীতিতে যুক্ত হতে, সে নিষেধ তিনি মানেননি; এবং রাষ্ট্র আনুকূল্য দেবে কী পীড়ন করে তার সৃষ্টিশীলতাকে নষ্ট করতে চেয়েছে। সৃষ্টিশীলতা তবু অক্ষুণ্ন ছিল; তবে শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখক ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। তাকেকও রাষ্ট্র পীড়ন করেছে, আটক করে রেখেছে, এবং রাষ্ট্রের ভৃত্যরা তাকে হত্যা করেছে একাত্তরে। কথাসাহিত্যিক শহীদ সাবের তাৎপর্যপূর্ণ লেখা রেখে গেছেন। আরও নিশ্চয়ই লিখতেন, কিন্তু রাষ্ট্র তার অনুকূলে ছিল না। অল্পবয়সে জেল খেটেছেন, বের হয়ে এসে সেই আন্দোলনকে আর খুঁজে পাননি কৈশোরে, যা তাকে প্রাণিত করেছিল রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে। একাত্তরে প্রাণ হারিয়েছেন হানাদার পাকিস্তানিদের তাণ্ডবে।

চিত্রকলায় চাঞ্চল্যকর কাজ করেছেন জয়নুল আবেদিন; দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে। ভারতীয় চিত্রকলার তথাকথিত রীতির বেষ্টনী ভেঙে তিনি বের হয়ে এসেছেন, সরাসরি চলে গেছেন সমাজবাস্তবতার কাছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমাজবাস্তবতার ওই নতুন ধারাতেই ছবি এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন, তার সহকর্মীরা এবং তাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। মনে পড়ে ১৯৫০ সালে ঢাকায় প্রথম যখন প্রদর্শনী হয় এই শিল্পীদের কাজের তখন আমরা চমকে গেছি, বিশেষ করে তাঁদের ছবিতে সমাজবাস্তবতার মান ও বৈচিত্র্য দেখে। তবে তরুণরা সবাই যে ওই ধারায় থেকেছেন তা কিন্তু নয়। মধ্যবিত্তের জন্য রাষ্ট্র কিছু কিছু সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। মেধাবানদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিদেশ গমনের। তরুণ শিল্পীরা অনেকেই বিদেশে গেছেন; এবং ফিরে এসেছেন চিত্রকলা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তারা নিজের মতো করে এঁকেছেন। ওদিকে দেশে শিল্পকলার চাহিদাও কিছুটা বেড়েছে। পঞ্চাশ সালে যে নতুন যুগ এসেছে বলে মনে হয়েছিল, সেটা ঠিক ওই ভাবে এগোল না। মূল কারণ সমাজ এগোল পুঁজিবাদী ধারায়, তার প্রভাব শিল্পকলার ক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে না কেন? পড়লা। ব্যতিক্রম হচ্ছেন এসএম সুলতান। তিনি ছিলেন জয়নুল আবেদিনের সমসাময়িক। তার ভেতরে এক ধরনের বিদ্রোহ ছিল। সে জন্য দেখা গেল কৃষক ও কৃষকের জীবন-সংগ্রামকে তিনি চিত্রকলায় নিয়ে এসেছেন; কিন্তু ওই কৃষক বাস্তবের কৃষকের মতো শীর্ণকায় নয়; বলিষ্ঠ, পেশিবহুল, সংগ্রামী মানুষদের যে রকমের হওয়াটা উচিত সে রকমের। এককালে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন কামরুল হাসান ও আবুল কাসেম; পরে এঁকেছেন শিশির ভট্টাচার্য; কিন্তু তারা সুযোগ পাননি অনেক বেশি আঁকার। কারণ রাষ্ট্র বদলেছে, কিন্তু আবার বদলায়ওনি, রয়ে গেছে তার স্বৈরশাসন। এবং সে রাষ্ট্র চিত্রকলার জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতে প্রস্তুত থাকলেও, ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করার মতো নৈতিক সাহস রাখেনি। বলাবাহুল্য, রাখছে না সে এখনো। বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন কার্টুনশূন্য। যারা হাসতে জানে না, কিংবা কেবলি অট্টহাসি শোনে, তাদের জন্য কান্না ছাড়া উপায় কি?

চলচ্চিত্রে চেষ্টা হয়েছে সমাজবাস্তবতাকে নিয়ে আসার। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। তবুও এগিয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে ছবি করেছেন জহির রায়হান; ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের উপস্থিতি আছে তার জীবন থেকে নেয়া ছবিতে; একাত্তরের যুদ্ধের ভেতর থেকেই ছবি তৈরি করেছেন স্টপ জেনোসাইড। কিন্তু তার পরে তো থেমে গেলেন। তাকে থামিয়ে দেওয়া হলো। তাকে হত্যাই করা হয়েছে। একাত্তরে নয়, তার পরে; নিহত হয়েছেন তিনি ঘাতকদের হাতে; একাত্তরে হারিয়ে-যাওয়া তার ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে

16434
aibl.com.bd

এ আই বি এল
হজ্জ
ডিপোজিট স্কিম
চলো কা'বার পথে, আল-আরাফাহ্‌র সাথে
পবিত্র স্বপ্নপূরণে হজ ডিপোজিট স্কিম নিয়ে
এআইবিএল আছে আপনার পাশে।

এআইবিএল
র‍্যাপিড
একাউন্ট খুলুন
দিন-রাত ২৪ ঘন্টা
যেকোনো জায়গায়

এআইবিএল
হোম
ইনভেস্টমেন্ট
আপনার বাড়ি
একসাথে গড়ি
দ্রুত ইনভেস্টমেন্ট প্রসেসিং ও
সুবিধাজনক রেট অফ রিটার্নে
আজই নিন এআইবিএল
হোম ইনভেস্টমেন্ট।

এ চালান
এর মাধ্যমে
সরকারি রাজস্ব ও
ফি জমা দিন
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক-এর
সকল শাখা ও উপশাখায়

আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংক লিঃ

aibl
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
Al-Arafah Islami Bank Limited
সর্বদাই শরীয়াহ

খুঁজতে গিয়ে। আশা করা গিয়েছিল যে একাত্তরের পরে নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে উঠবে। কিন্তু উঠল না। কারণ পুঁজির সেবক জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় এলো, এবং সর্বত্র যেমন চলচ্চিত্রেও তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা হয়ে দাঁড়াল প্রধান সত্য। তা ছাড়া চলচ্চিত্র তো কেবল পুঁজি চায় না, চায় উপযুক্ত দর্শকও। সেই দর্শক ক্রমে হারিয়ে গেল, প্রথমে টেলিভিশনের কারণে এবং পরে স্থূল বিনোদনপ্রার্থীদের দাপটে।

স্বাধীনতার পরে বেশ নাড়াচাড়া দিয়ে একটি গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশি দূর এগোল না। একটা কারণ মৌলিক নাটকের সরবরাহ ক্রমে কমতে থাকল। সমাজে দেখা দিয়েছিল একদিকে অস্থিরতা অন্যদিকে বন্ধ্যত্ব; তার প্রভাব অন্যত্র পড়েছে, নাটকলেখার ক্ষেত্রেও চলে এসেছে। ওদিকে গ্রুপের চেয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠতে থাকল। যেটা অবশ্য পুঁজিবাদেরই অবদান। শিল্পীরা অনেকেই স্টার হয়ে চলে গেলেন টেলিভিশনে, কেউ কেউ গেলেন চলচ্চিত্রেও। গ্রাম থিয়েটার টিকল না। সাড়া-শব্দ করে গড়ে-ওঠা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যে শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন এক সংস্থায় পরিণত হবে সেটাও ছিল অবধারিত। মূল কারণ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যাবার যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তার আগমন, সে প্রতিশ্রুতি সে ভুলে গেল; অনুগামী হয়ে পড়ল রাষ্ট্রের শাসকদের।
মনে হয়েছিল স্বাধীন দেশে গান পাওয়া যাবে নতুন নতুন রকমের এবং প্রচুর পরিমাণে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গাওয়া গান স্বাধীন বাংলায় আরও অবাধ হবে। উদ্দীপক হবে। সেটাও ঘটল না। গানের ক্ষেত্রে ব্যান্ড এলো, ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত গড়ে উঠল, কিন্তু সেই গান পাওয়া গেল না যে গান উদ্দীপ্ত করবে মানুষকে, নতুন সমাজ গড়ার জন্য। ওই উদ্দীপনাটা সমাজে ছিল না। সমাজে ছিল ব্যবসা। ব্যবসা চলে এসেছে সংগীতেও।
ওদিকে জনগণের পক্ষে দেশে সংবাদপত্র নেই। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন যারা করেন তারা নির্যাতিত হন রাষ্ট্রের দ্বারা, অবহেলা পান সংবাদপত্রের কাছ থেকেও। টেলিভিশনেরও ওই একই দশা। সরকারি টেলিভিশনের তো কথাই নেই, বেসরকারি টেলিভিশনও সরকারবিরোধী উপস্থাপনা পছন্দ করে না। সরকারবিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; দমনপীড়ন ভীতিপ্রদর্শন সমানে চলতে থাকে। সমাজবাস্তবতা অনুপস্থিত রয়ে যায় গণমাধ্যমে। ক্ষমতাবানরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন; কিন্তু তাদের দৃঢ় অবস্থান থাকে সমাজ পরিবর্তনকামী শক্তির বিরুদ্ধে; তাদের বিরুদ্ধাচরণ শিল্পসাহিত্যেও এসে পড়ে। বছরে একবার বইমেলা হয়। কিন্তু সে মেলা শিল্পমেলা হওয়ার দিকেই ধাবমান। শিল্পমেলাতে তবু পণ্যের কেনাবেচাটাই মুখ্য থাকে, বইমেলাতে বইয়ের কেনাবেচার চেয়ে ঢের বেশি ঘটে সামাজিক মেলামেশা। বইয়ের বেলাতে প্রধান যে অসুবিধা তা হলো প্রকাশক তবু আছে, কিন্তু বিপণনের ব্যবস্থা খুবই সংকীর্ণ। বইমেলার দিকে প্রকাশকরা তাকিয়ে থাকেন; কারণ তারা জানেন অন্য সময়ে বইয়ের খবর যে লোকের কাছে পৌঁছে দেবেন, পাঠকের হাতে যে বই সরাসরি তুলে দেবেন, তেমন সুযোগ অত্যন্ত অপ্রতুল।
সাহিত্যের কথা যখন ওঠে তখন অনুবাদের প্রসঙ্গটাও আসে। অনুবাদের কাজটা মোটেই সহজ নয়। ভাষাজ্ঞান তো লাগেই, প্রয়োজন হয় অন্যকে দেখিয়ে নেওয়ার, অনুবাদ ঠিক হয়েছে কিনা সেটা বুঝে নেওয়ার। সবটা মিলিয়ে অনুবাদ একটি সমবায়ী কাজ। একা একা করা মোটেই সম্ভব নয়। সমবায়ী উদ্যোগ চাই। সমবায়ী ওই চেষ্টার জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন, আগ্রহও প্রয়োজন। অভাব কিন্তু দুটিরই। ফলে নিজেদের সাহিত্যকে আমরা বিশ্বের কাছে নিয়ে যেতে পারছি না; আবার বিশ্বের সাহিত্যকে যে কাছে নিয়ে এসে ভাষার ধারণ ও প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করব, শিল্পগত উৎকর্ষের নিরিখকে আত্মস্থ করব সেই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।
এর সঙ্গে বলতেই হবে যে জ্ঞানের চর্চা ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। জ্ঞান না থাকলে শিল্প-সাহিত্যের সারবস্তুতে ঘাটতি ঘটে। জ্ঞানের চর্চা বাংলাদেশে উৎসাহ পাচ্ছে না। এমনকি যথার্থ বিদ্যাচর্চাও অবহেলিত। বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হতে চলেছে। বিশেষভাবে অবহেলিত হচ্ছে ইতিহাসের চর্চা। ইতিহাসের জ্ঞান না থাকলে অন্যজ্ঞান শুকনো হয়ে পড়ে। পড়ছেও।

৪

মূল সত্যটা দাঁড়ায় এই যে শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যেকটি রূপকল্পেরই নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে; কিন্তু তাদের ইতিহাস আবার সমাজের ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্প-সাহিত্য মহৎ হয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। সমাজের বিন্যাসের সঙ্গে তাকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। দ্বন্দ্ব না থাকলে অস্তিত্ব হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকে না। বিক্ষিপ্তভাবে এসব কথা অন্যত্র যে পাওয়া যায় না এমন নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পাওয়া যায় মার্কসবাদে। সেখানেই সে অত্যন্ত বিশিষ্ট।
মার্কসবাদ এই সত্যটাকে ধরিয়ে দেয় যে শিল্পীরা শ্রেণির ভেতরে থেকেই কাজ করেন। কিন্তু শ্রেণির বন্ধন ডিঙিয়ে তারা হতে চান সর্বজনের, আকাঙ্ক্ষা থাকে হবেন সর্বকালীন। সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা শ্রেণি-উত্তরণের দরুনই ঘটে। এই উত্তরণকে শ্রেণিচ্যুতি বললেও অন্যায় হবে না। শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তিরই সৃষ্টি, কিন্তু ওই সৃষ্টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে না, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় সামাজিক মালিকানায়। তৎকালীন এবং অনেককালীন মালিকানায়। আর সর্বকালীন হলে তো কথাই নেই। সেখানে তো অমর সৃষ্টি। চরম সার্থকতা।
পৃথিবীজুড়ে এখন পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য চলছে। পুঁজিবাদ ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফায় বিশ্বাস করে এবং সবকিছুকে পণ্যতে পরিণত করে ফেলবে ভাবে। পুঁজিবাদ মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত বাড়াতে থাকে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ এখন মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির পথে অন্তরায় শুধু নয়, শত্রুপক্ষেই পরিণত হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের কাজ ঐক্যের বন্ধনকে, সহমর্মিতার অনুভবকে শক্তিশালী করা। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তাই পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব চলছে।

জনগণের পক্ষে দেশে সংবাদপত্র নেই। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন যারা করেন তারা নির্যাতিত হন রাষ্ট্রের দ্বারা, অবহেলা পান সংবাদপত্রের কাছ থেকেও। টেলিভিশনেরও ওই একই দশা। সরকারি টেলিভিশনের তো কথাই নেই, বেসরকারি টেলিভিশনও সরকারবিরোধী উপস্থাপনা পছন্দ করে না। সরকারবিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; দমনপীড়ন ভীতিপ্রদর্শন সমানে চলতে থাকে।

এই ব্যবস্থাটিকে ভাঙা চাই। শিল্প-সাহিত্য একাই যে একে ভাঙতে পারবে তা মোটেই নয়। তবে শিল্প-সাহিত্য অনুপ্রেরণা ও শক্তি জোগাতে অবশ্যই পারবে সেই আন্দোলনকে। বদলাবে মানুষই, কিন্তু বদলাবার জন্য শক্তি চাই। সে শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকারীদের নয়, তার বিপরীতে দাঁড়ানো মেহনতি মানুষের। মার্কসবাদ এই সত্যটাকেই বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয় এই কথাটাও যে, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা যেমন ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি ইতিহাস নিজেও এগোয় শিল্প-সাহিত্যের অগ্রসরমানতার কারণে। সেই সঙ্গে বলে যে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস সামনের দিকেই যাবে, পেছন মুখো হবে না।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫
বছর পাশে আছি
সবসময়

লংকাবাংলা™
ফাইন্যান্স

ঈদের
খুশি এবার
বেশি বেশি

ঈদের খুশিতে কেনাকাটা করুন আকর্ষণীয় অফারে

এই ঈদে লংকাবাংলা ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে দেশব্যাপী আমাদের
পার্টনার আউটলেট সমূহে উপভোগ করুন আকর্ষণীয় সব অফার

অফার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.lankabangla.com/eid-ul-fitr-offer

অথবা স্ক্যান করুন

www.lankabangla.com
ISO 27001:2013 Certified
PCI DSS Compliant

বিস্তারিত জানতে
১৬৩২৫

VISA

ঈদ সংখ্যা ২০২৩ ■ দেশ রূপান্তর

আন্দালিব রাশদী

নাহিদ নিশতার জাহান

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতিটা আর একটু প্রীতিকর হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কিংবা প্রীতিকর যেগুলো ছিল স্মৃতি হিসেবে জমা থাকেনি। আনন্দের টুকরোগুলো পানিতে কিছুক্ষণ ভেসে থাকা বুদ্বুদের মতো, একটু চমক লাগিয়ে মিলিয়ে যায়, কিন্তু দুঃখটা পানিতে ভাসমান অপরিশোধিত তেলের বিন্দু, কেবলই ভাসে আর ভাসে, মেলাতে চায় না, ঢেউ দিলে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু দানায় বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে যায়। তেলের ছোঁয়া লাগা জলসীমা আরও বেড়ে যায়, এটা শৈশবের বেদনার মতোই।

আমার স্মৃতি আমার কোঁকড়া চুল নিয়ে। আমার বয়সী অন্য ছেলে বা মেয়েদের চুলের চেয়ে আমার চুলের ধরনটা যে ভিন্ন, আমি বেশ বুঝতাম। আয়নায় নিজে দেখেছি, নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যদেরও দেখিয়েছি। আমার খালাতো ভাই সানি তার চুল আমার চুলের মতো 'কার্লি' করে দেওয়ার জন্য তার মাকে বলেছে। মা তা করে দিতে না পারায় ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে। কামড় সম্ভবত অসহ্যই ছিল। খালা অন্য হাত ঘুরিয়ে সজোরে চড় বসায়। কামড় ছেড়ে সানি ছিটকে পড়ে। তিন-চার দিন পর যখন দেখা হয়– সানি সরাসারি রায় দেয়, তোর চুল পচা। তুই পচা, তোর বাবা পচা। তোর মা পচা।

কয়েক দিনের মধ্যে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে। আমার চুলের দিকে ইঙ্গিত করে সবারই এক বক্তব্য, তোর চুল পচা।

একমাত্র আমার মা-ই পক্ষে দাঁড়ায়। আমাকে বলে, ওদের তো এমন সুন্দর কোঁকড়া চুল নেই, সে জন্য তোকে হিংসে করে ওসব বলে। যারা হিংসে করে তাদের বলে হিংসুটে, হিংসুটে মানে জেলাস; হিংসুটে মানুষের মনে শান্তি থাকে না।

মার শেষ বাক্যটা তখন আমার জন্য দুর্বোধ্য ছিল। সাড়ে তিন বছর বয়সে অশান্তি ব্যাপারটা হয়তো অনুভব করা যায়, কিন্তু সেটা যে শান্তি নয়, এটা বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন কাজ।

আমার হিংসুটে খালাতো ভাই, আমার বয়সী হিংসুটে প্রতিবেশী শিশুদের সাথে অসম বয়সী আরও একজন যোগ হলো। দুর্ভাগ্যবশত নতুন যোগদানকারী লোকটি আমার বাবা।

হয়তো ঝগড়াটা অনেকক্ষণ ধরেই চলছিল, আমি টের পাইনি। হঠাৎ বাবা আমাকে হ্যাঁচকা টানে বিছানা থেকে তুলে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে তাদের বেডরুমে নিয়ে মাকে বলল, এই দেখো, চুলগুলো দেখো, আমার চুল কি কোঁকড়া? আমার বাবার চুল কি কোঁকড়া? আমার ভাই, এমনকি চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুপোতো ভাইদের কারও চুল কি কোঁকড়া? আমার চৌদ্দ গোষ্ঠীতে কারও কোঁকড়া চুল নেই। তাহলে?

বাবা চিৎকার করে বলল, তাহলে বল হারামজাদি, এই কোঁকড়া চুল কোত্থেকে এলো।

মা-ও চিৎকার করে বলল, তুমি এ কী করছ! আমার ছেলেকে ছাড়ো, ও ব্যথা পাচ্ছে, ছাড়ো বলছি।

বাবা ছাড়ে না। আবার এমন নয় যে বাবা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে, তবে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

বাবা বলল, বেশ আমার গোষ্ঠী বাদ দিলাম। এবার বল, তোর বাবার চুল কি কোঁকড়া? প্রশ্নই আসে না, তার তো মাথায় চুলই নেই। তোর তিন ভাইয়ের কারও মাথার চুল কি কোঁকড়া? তারাও টেকো। বল তোর দিক থেকে রক্তের সম্পর্ক আছে, এমন কার চুল কোঁকড়া?

মা এসব প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাবা মাকে কাছে আসতে দেয় না। শরীর ঘুরিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখে।

মা খুব নরম স্বরে বলে, সাজ্জাদ, তোমার দোহাই লাগে, আমার বাবুটাকে ছেড়ে দাও। এমন করলে ও মরে যাবে। তোমার যদি কোঁকড়া চুল ভালো না লাগে তাহলে আমি সব সময় অরূপের মাথা ন্যাড়া করে রাখব।

বাবার হাতের সেই বেড়ের ভেতর থেকে আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, স্পষ্টতই এটা মার বিরুদ্ধে বললাম, আমি কখনো আমার চুল কাটাব না। আমার চুল ন্যাড়া করতে দেব না।

তারপর হঠাৎ তাদের ঝগড়াটা থেমে যায়।

বাবা আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি লাফিয়ে আমার ট্রাই-সাইকেলে উঠি। তারপর হর্ন বাজাতে থাকি। মুখেই পো পো শব্দ করতে করতে এই রুম থেকে ওই রুম চার-পাঁচবার চক্কর দিতে দিতে পেটের ভেতরটা মোচড় দিল। আমি দ্রুত ছুটলাম। কমোডের পাশে একটা ছোট লাল মোড়া ছিল, আমি মোড়ায় পা দিয়ে কমোডে বসি। তারপর পা দুলিয়ে দুলিয়ে কাজটা সেরে একসময় চেঁচিয়ে ডাকি, মা, মা, আমার হয়ে গেছে, ওয়াশ করে দাও।

মা আসে। আমাকে ঠিকঠাক ধুয়ে-মুছে অন্য একসেট কাপড় পরিয়ে দিয়ে বলে, ব্যথা পেয়েছিলি লক্ষ্মী সোনা?

কিসের ব্যথা?

তোকে যে এভাবে ধরে আনল?

না তো, আমি যে সুপারম্যান। এ জন্য ব্যথা একটুও পাইনি, একটুও কাঁদিনি।

ওহ আচ্ছা।

কিন্তু তুমিই তো আমাকে ন্যাড়া করার কথা বলেছ? বাবা তো বলেনি।

মা বলল, তার মানে আমি খারাপ আর তোর বাবা ভালো।

তুমি যদি আমার চুল কাটার চেষ্টা না করো, তাহলে তুমি ভালো। তবে বাবা একটু হিংসুটে। আমার মতো তার কোঁকড়া চুল নেই তো সে জন্য। হিংসুটে মানে হচ্ছে জেলাস।

আমি আমার ট্রাইসাইকেলে আবার উঠি, এই রুম থেকে ওই রুম– এভাবে বেশ কয়েকটা চক্কর লাগাই। তারপর পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাই। সে বছরই আমার একটা ভাই আসে, মানে জন্ম হয়। অনেক দিন পর পুরোনো প্রসঙ্গটা আবার ওঠে। মানে অপরূপ নিশ্চিত করে যে আমার চুল নিয়ে সমস্যা আছে। তার চুল কোঁকড়া নয়। অতএব বাবার আর বলার সুযোগ নেই তার চৌদ্দগোষ্ঠীতে এমন সাধারণ চুলের কেউ নেই। অপরূপের চুলের ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়ার পর আমি সম্ভবত বাবার কাছে উপেক্ষিত হতে থাকি। তবে আমি ধরেই নিই ওটা বাবার জেলাসি।

আমার বয়স যখন বারো ছুঁই-ছুঁই, অপরূপ আটের কাছাকাছি, বাবা ও মার ঝগড়া এবং একজন অন্যজনকে সহ্য না করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। বাবার মেজাজ আমার ও অপরূপের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে।

সমস্যাটা অপরূপের চুল বা তাকে নিয়ে নয় এবং বাবা যে তাকে অনেক ভালোবাসে, এটাও স্পষ্ট। ছোটদের একটু বেশি ভালোবাসতেই হয়, এটাই নিয়ম। তবুও বাবার উচ্চ স্বর কথা শুরু হলেই সে দুকানের দুপাশে দুটো বালিশ চেপে বসে থাকে, কোনো কোনো দিন কাঁদেও।

বাবার চিৎকার মার জবাব এবং বাবার বিকৃত আওয়াজের ডায়লগ আমার কানে সয়ে গেছে। যে বিষয় নিয়েই ঝগড়া শুরু হোক না কেন, মারই তো জেতার কথা। কিন্তু শেষ দিকে এসে মনে হয় মা হেরে যাচ্ছে যখন বাবা প্রশ্ন করে, কোঁকড়া চুলের লোকটি কে?

মা জবাব দেয়, কোঁকড়া চুলের লোক আবার কে?

বাবা বলে, তুই শুয়েছিস তার সাথে, নাম পরিচয় বল, ছেলেকে তার কাছে রেখে আসি।

মা বলে, সাবধান, বাজে কথা বলবে না, অরূপ আমার ছেলে।

তোর ছেলে তো হবেই। আমি তো না বলিনি; কিন্তু আমার ভূমিকাটা কে পালন করল? আমি তার নাম শুনতে চাই।

আমার বাবা সমুদ্র থেকে অনেক বড় পাইপ দিয়ে তেল তোলার বড় কারিগরদের একজন। তার সাথে অনেক বিদেশি চাকরি করে। তার কোম্পানির নাম শেল। তেল বঙ্গোপসাগরের কোথায় কোথায় আছে বাবা তার খোঁজ করছে।

একদিন বাবা দুজন বিদেশি ও দুই বোতল হুইস্কি নিয়ে সূর্য ডোবার খানিক আগে ঘরে ঢুকল। ঘরে মদ খাওয়া দেখতে মা মোটেও আগ্রহী ছিল না। আমরাও যেন না দেখি এটাই তার চাওয়া। সুতরাং তার অফিস শেষ হওয়ার পর সাড়ে ছয় কি পৌনে সাতটা, আমাদের দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ি নেয়নি।

ড্রাইভারকে বলল, সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, রাতে না-ও ফিরতে পারি। মা প্যান প্যাসিফিক হোটেলে চাকরি করে। কখনো সকাল থেকে, কখনো দুপুর থেকে। আবার দু-এক দিন রাতেও কাজ করে।

আমরা রিকশায় বেরোলাম। একটা সিনেপ্লেক্সে এলাম এবং ১০৫

মিনিটের একটি হরর সিনেমা দেখে সেখানকার ফুডকোর্টেই ডিনার সারলাম। মা জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাই?

তোমার যেখানে ইচ্ছে মা, আমরা দুজন একই রকম জবাব দিয়েছি। মা আমাদের হোটেল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিতে নিয়ে এলো। রাতটা আমরা সেখানেই কাটাই। ডাবল বেড এক রুম ষোলোতলায়। এত ওপর থেকে জানালা দিয়ে আমি মানুষ ও গাড়ি কখনো দেখিনি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। সকালে মা বলল, আজকে আমার ছুটি। তোদেরও তো ছুটি। আমরা সারা দিন ঘুরে বেড়াব। রাতে খেয়ে বাসায় ফিরব।

অপরূপ বলল, তাহলে আজ গোসল করতে হবে না। ভালো আমি একদিন পর পর গোসল করতে চাই।

মা বলল, বড় হোটেলের রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম তিন থেকে চার গুণ, আমরা স্টারের ২০০ টাকা দামের প্ল্যাটার খাব। তিন-চারটে আইটেম থাকে। আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করি। স্টারে নাশতা সারি। মা বেশ দরাদরি করে কয়েক ধরনের ফল নেয়। একটা উবার ডাকে, আমরা উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে যাব। মা বলল, আমরা তার একজন অসুস্থ বসকে দেখতে যাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করি, কী অসুখ?

মা বলল, প্যারালাইজড, স্ট্রোক করেছিল। কিডনির সমস্যাও আছে। কোথাও নিয়ে গেলে কেমন আচরণ করতে হবে মা তার একটা ছোট্ট ব্রিফ দিতে থাকে। মা বলল, জুতা বাইরে রাখতে হবে। বসের রুমটাকে হাসপাতালের কেবিনের মতো করে সাজানো হয়েছে, একটা লিভার চেপে বিছানার মাথার দিকটা ওঠানো-নামানো যায়। দরজার বাইরে স্যানিটাইজার ও মাস্ক আছে। হাত স্যানিটাইজ করবে, মাস্ক লাগাবে, ভেতরে ঢুকে শুদ্ধভাবে সালাম দেবে। স্লামালেকুম জাতীয় অশুদ্ধ সালাম তিনি পছন্দ করেন না। ভালোভাবে বলতে না পারলে গুড মর্নিং বলবে। আমরা তো ১০টার মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি। কোনো একজন ভিআইপির জন্য আধা ঘণ্টারও বেশি সময় রাস্তায় আটকা পড়ে থাকতে হলো। এতে যে জ্যাম সৃষ্টি হলো, সেটাতে আরও সময় গেল, পৌনে ১১টায় পৌঁছালাম। বাড়িটার নাম মাইলস টু গো। এমন আজব নামের কোনো বাড়ি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

একজন নার্স আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। আগে সালাম দিল অপরূপ, তারপর আমি দিলাম। শুধু মুখের দিকে তাকালে তাকে অসুস্থ মনে হয় না। চুল সব সাদা, দাড়ি সাদা, চেহারাটা গোলগাল। সান্তা ক্লজের পোশাক পরিয়ে দিলে খুব মানাত।

তিনি কিছুক্ষণ অপরূপের হাত ধরে রাখলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবে?

আমি কিছু বলার আগেই তিনি নার্সকে বললেন, ওদের পিস্তাচিও আইসক্রিম দাও। মা ভেতরে থাকল, আমরা পাশের করিডরে পাতা চেয়ারে এসে বসলাম।

অপরূপ ছোঁচার মতো নার্সকে বলল, আন্টি, আমাকে বেশি করে আইসক্রিম দেবেন।

কিছুক্ষণ আমরা ওদিক-ওদিক তাকিয়ে আইসক্রিম খেতে শুরু করলাম। এর মধ্যেই মার চড়া গলা শুনতে পেলাম। মা কি অসুস্থ বুড়টার সাথে ঝগড়া করছে? মা একটু ঝগড়াটেই।

আমার সাথে অপরূপও কান খাড়া করল। ঝগড়াই। সেই বুড়োর কণ্ঠও শুনি, মাকে বলছে, গেট আউট।

মা-ও চেঁচিয়ে বলল, আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। তুমি দেবে না তোমার বাপ দেবে।

বুড়ো সান্তা বললেন, আমার যা দেওয়ার যখন সময় হবে, আমি নিজেই দেব। আমি দর-কষাকষি পছন্দ করি না।

মা একঝটকায় রুম থেকে বেরিয়ে এসে করিডরের এক প্রান্তে রাখা সেলাইন স্ট্যান্ডের সাথে ধাক্কা খেল, মা হুমড়ি খেতে খেতে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু স্ট্যান্ডটা পড়ে গেল। তখনো সান্তা ক্লজ বলে চলেছে, ইউ মাস্ট গেট আউট।

আমাদের পিস্তাচিও আইসক্রিম খাওয়া শেষ হয়নি। মা ভীষণ ক্রুদ্ধ অবস্থায় বেরিয়ে এলেও আমাদের হাত ধরে টেনে বের করেনি। বলেনি চল, আইসক্রিম খাওয়া লাগবে না। মা এসে পাশে বসল। পিয়নটাকে বলল, এক গ্লাস পানি দাও।

আমি শিখেছি বড়দের কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। কিন্তু অপরূপ তো ছোট, এখনো এটা জানে না। বলল, মা ওই বুড়োটা আসলে পাগল নাকি?

মা বলল, ঠিক পাগল না, তবে মাঝে মাঝে একটু পাগলামি করে, তখন ধমক দিতে হয়। তোদের মতোই, ধমকে কাজ না হলে মার।

আমরা দুজনই অবাক হই, মানে তুমি কি বুড়োকে মারো?

মা চুপ। আমি বলি, অপরূপ বুড়োকে বলেছে সান্তা ক্লজ। কিন্তু চিৎকার করার পর বলেছে পাজি সান্তা। তোমাকে গেট আউট বলেছে নাকি? কী শুনলাম।

মা কিছু একটা এড়াতে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, মানে না, এটা অবশ্য মিন করেনি। বুড়োদের এসব সমস্যা লেগেই থাকে।

আমাদের আইসক্রিম আর একটু বাকি। এমন সময় নার্স এসে মাকে বলল, ম্যাডাম, নিচে গাড়ি আছে, স্যার আপনাকে এ গাড়িতে ড্রপ নিতে বলেছেন। ড্রাইভার বাদশাহ আকবর নিয়ে যাবে। ম্যাডাম, আপনাকে একটু আইসক্রিম দেব? কিংবা অন্য কিছু?

মা বলে, লাগবে না, থ্যাংক ইউ।

নার্স বলে, ম্যাডাম, স্যার তো মাঝে মাঝে অকারণেই চটে যান। আগেও ব্যাপারটা ছিল; কিন্তু ইদানীং প্রকোপটা বেড়েছে। আপনি তো তবুও কিছু বলেন, অন্য কেউ তো মুখও খুলতে পারে না।

নার্স আমাদের দুজনের হাতে হাজার টাকার দুটো নোট দিয়ে বলে, স্যার দিতে বলেছেন, ওদের যেভাবে ইচ্ছে, সেভাবে খরচ করবে।

হাতে টাকা পেয়ে আমাদের মুখে হাসি ফোটে। অপরূপ বলে, খুব দামি ইয়ার প্লাগ কিনবে যেন মা-বাবার ঝগড়াটা শুনতে না হয়। আমি বললাম, আরও কিছু টাকা হলে একটা ভালো অডিও রেকর্ডার, যাতে মা-বাবার ঝগড়াটা রেকর্ড করে রাখা যায়।

অপরূপ জিজ্ঞেস করে, তাতে লাভ?

পরে যখন বাজাব, শুনে দুজন লজ্জা পাবে।

অপরূপ বলল, তাহলে তো আমাকে সারা দিনই ইয়ার প্লাগ কানে ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

আবার বুড়ো সান্তা ক্লজের চিৎকার শোনা যায়, এখনো যায়নি, তাহলে পুলিশ ডাকো? আমাকে হাইকোর্ট দেখাতে চায়।

ড্রাইভার বাদশাহ আকবর জুতার শব্দ করে স্যালুট ঠুকে মাকে জিজ্ঞেস করে, ভালো আছেন ম্যাডাম?

আকবর তুমি কেমন আছ? মা জিজ্ঞেস করে, আমার সাথে তিন-চার ঘণ্টা থাকতে পারবে তো?

জি ম্যাডাম, রাত ১২টা পর্যন্ত থাকতে পারব। আজ কোনো ডিউটি নেই।

তাহলে বাদশাহ আকবর, আমরা কাশিমপুর যেতে চাই। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, অনেক দিন যাইনি। গাড়িতে তেল-গ্যাস ঠিকঠাক আছে তো?

জি? ম্যাডাম।

গাড়ি পৌনে ১টার দিকে যখন কারাগারের গেটে পৌঁছে, অপরূপ তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মা বলল, থাক ডাকার দরকার নেই। একটু ঘুমাক।

ড্রাইভারকে বলল, এসি বন্ধ করো না, তাহলে গরমে ঘুম ভেঙে যাবে, আমাদের সব মিলিয়ে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

কিন্তু লেগে গেল দেড় ঘণ্টারও বেশি। মার চেনাজানা কেউ একজন ছিল, নাম নুরুল কাদের। হাত মুঠো করে মা তার হাতে কিছু একটা গুঁজে দিল। কোত্থেকে যেন একটু ঘুরে এসে বলল, কয়েদিরা লাঞ্চে আছে, দেড়টার আগে ডাকা যাবে না। তাই হলো।

মা আর আমি, আমরা দুজন একটা ছোট জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ভেতরে কী আছে দেখার কৌতূহল নিয়ে আমি যখন মার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছিলাম, কালো স্ট্রাইপের পায়জামা ও ফতুয়া পরা লম্বা একজনকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। গায়ের রং ফরসা, চোখে চশমা। তিনি আমাদের কাছাকাছি হলেন, সম্ভবত চোখাচোখিও, তিনি দ্রুত উল্টো দিকে ফিরে গিয়ে মিনিট পাঁচেক পর যখন ফিরলেন, তার মাথায় একটি ছেঁড়া গামছা প্যাঁচানো। মা জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

মা সম্ভবত আমাকে দিয়ে তাকে সালাম দেওয়ানোর জন্য একদিকে সামান্য সরে গেল, আমি সহি উচ্চারণে সালাম দিলাম।

তিনি মাকে বললেন, অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

আমি পেছন দিকে সরে আসি। মার সাথে তার ফিস ফিস করে কথা চলে। কী কথা তা এত পেছন থেকে শোনা সম্ভব নয়।
কয়েক মিনিটি পরই আমাদের জন্য বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে গেছে– এমন একটা বার্তা দিলেন একজন কারারক্ষী। মা বলল, সালাম দিয়ে বিদায় নাও। আমি আবার আগের মতো একই কায়দায় সালাম দিই। তিনি ইশারায় যা বললেন, তার মানে আমি যেন জানালার নিচু ফাঁক দিয়ে আমার হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই। আমি তাই করলাম। তিনি আমার ডান হাতের তালুতে ক্রমাগত চুমো খেতে থাকলেন। যখন হাতটা ভেজা ভেজা মনে হলো, ভাবলাম লালা নয় তো? পরে বুঝতে পারি একই সঙ্গে তার চোখ বেয়ে কান্নাও ঝরেছে।
মা বলল, হয়েছে, চল।
আমি জিজ্ঞেস করি, কে?
মা বলল, রিলেটিভ।
আমি বললাম, ওহ আচ্ছা। ক্রিমিনাল নাকি?
মা বলল, ওনলি গড নোজ।
আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম।
অপরূপ ঘুম থেকে উঠেছে। আমাদের ফিরতে দেরি হওয়ায় চটেছে। কারণ অনেকক্ষণ আগেই তার খিদে লেগেছে।
মা রাস্তার পাশের দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট চিপস কিনে আমাদের হাতে দিয়ে বলল, খাবার পেতে আর একটু দেরি হবে। এটা খেয়ে খিদেটাকে ধরে রাখ। আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাছে পর্যটনের রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি। জায়গাটা সুন্দর।
আমরা কেবল খেতে শুরু করেছি, তখন মার মোবাইল নম্বরে ফোন আসে। মা, তাই নাকি, তখন আচ্ছা, ঠিক আছে, আসছি। আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাছে এসে পড়েছি, মা ফোনে এ ধরনের কিছু কথা বলল। ওপাশে কে কী বলেছে, আমি শুনিনি। শোনার কথাও নয়।
মা কী শুনেছে জানার আগ্রহ আমাদের কম নেই, কিন্তু মা-ই শিখিয়েছে বড়দের কোনো ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে নেই। অপরূপ জানতে চাইলে অপরাধ কম হতো। কারণ তার বয়স কম। আমার বেলায় মোটেও মানানসই হবে না।
সুতরাং আমি খাওয়া চালিয়ে যেতে থাকি। আমাদের পাশের টেবিলে বসে রাদশাহ আকবরও খাচ্ছে।
খাওয়া শেষ করে মৌরি মুখে দিয়ে আমরা হেলেদুলে গাড়িতে উঠি।
মা বলল, আমার ইচ্ছে ছিল তোদের আশুলিয়া ওয়াটার ফ্রন্ট ঘুরিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না।
অপরূপ বলল, সম্ভব হতে হবে।
মা বলল, না। ঢাকা থেকে ফোন করে তোদের বাবার ড্রাইভার বলেছে, গতকাল দুজন বিদেশিকে নিয়ে যেসব ছাইপাঁশ খেয়েছে, তাতে ফুড পয়জনিং হয়ে তার অবস্থা খুব কাহিল। হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
অপরূপ বলল, কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি গেলে বাবার কী লাভ হবে? আমরা কেউ তো ডাক্তার নই।
মা বলল, তোর বাবার শরীর খারাপ আর তুই তাড়াতাড়ি যাবি না, এটা একটা কথা হলো?
অপরূপ বলল, ওয়াটার ফ্রন্ট দেখে রাতে গেলে সমস্যা কী?
মা বলল, সমস্যা আছে। যদি এর মধ্যে একটা কিছু হয়ে যায়!
একটা কিছু মানে কী? সোজাসুজি বলো, বাবা যদি মরে যায়!
হ্যাঁ তাই, যদি মরে যায়।
বেশ, আর যদি ফিরে গিয়ে দেখো পরের দিনও মারা যায়নি তখন? তখন কি মনে হবে না ওয়াটার ফ্রন্ট ঘুরে যাওয়াই ভালো ছিল।
মা বলল, তুই কি আমার বেলাতেও এ রকমই করবি?
অপরূপ বলল, না মা, তোমার বেলায় এমন করার সুযোগই পাব না। তুমি থাকবে বাংলাদেশে আমি থাকব আমেরিকায়। আমি মন খারাপ করতে পারি এই ভেবে কেউ তো তোমার খবরই জানাবে না। অবশ্য না জানানোই ভালো।
মা এবার চটে যায়, তুই কি মানুষ না পাষাণ?
অপরূপ কোনো জবাব দেয় না, আমাকে তো জিজ্ঞেসই করেনি।
মা বলল, বাদশাহ আকবর, সরাসরি হৃদরোগ হাসপাতালে।
করোনারি কেয়ার ইউনিটের ৩ নম্বর বেডে বাবা। আমাকে ও অপরূপকে ঢুকতে দেয়নি শুধু মা গেছে। দুই মিনিটের মধ্যেই মা যখন ফিরে এলো, তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারি বাবার সাথে সাক্ষাৎটা বরং মার মেজাজ খারাপ করিয়ে দিয়েছে।
মা অপরূপের হাত ধরে টেনে বলল, চল চল, দেখা হয়ে গেছে। মরুক আমার কিছুই এসে-যায় না।
দ্রুত আমরা নেমে যাই, সেই গাড়িই আমাদের বাসায় পৌঁছে দেয়। মা বাদশাহ আকবরকে একটি পাঁচ শ টাকার নোট বকশিশ দিতে গেলে তিনি তা নেননি। বলেছেন, আপনি স্যারের আপন মানুষ, অন্য কেউ দিলে নিতাম, আপনার কাছ থেকে নেওয়া সম্ভব নয়।

(দুই)

মা চাবি দিয়ে সামনের দরজার তালা খোলে।
আমরা তিনজন যখন ঘরে ঢুকি, মা স্বগোতক্তি করে, ওদিকে তার দম যায় যায় আর আমাকে বলে, গেট আউট।
আমি ও অপরূপ দুজনই ভাবি, মা নিশ্চয়ই বুড়ো সান্তা ক্লজের কথা বলছে।
অপরূপ বলল, ডন্ট গো টু সান্তা ক্লজ, এগেইন।
মা বলল, আরে ধ্যাৎ কিসের সান্তা ক্লজ। একটু আগে যেটাকে দেখতে গেলাম, সাজ্জাদ সাহেবও আমাকে বলে, গেট আউট।
অপরূপ বলল, সে জন্যই তো বলেছিলাম, ওয়াটার ফ্রন্ট হয়ে আসি। আগে এসে তোমার কী লাভ হলো? বাবাও মরল না আমারও ওয়াটার ফ্রন্টে যাওয়া হলো না– মাঝখান থেকে তুমি শুনলে এক দিনে দুবার গেট আউট।
মা আর কোনো কথা বলল না, ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হচ্ছিল মা বোধ হয় আমার কাছে নালিশ জানাচ্ছে, ওকি এসব ঠিক বলছে?
আমিও মার দিকে তাকাই এবং অপরূপকে বলি, এসব তোর বলা ঠিক হচ্ছে না। তুই কি বাবা মারা গেলে খুশি হতি? বাবা না থাকলে যে তোকে-আমাকে না খেয়ে মরতে হবে, তোর কি সে ধারণা আছে?
কেন থাকবে না, মাত্র কয়েক বছর না খেয়ে থাকতে হবে, তারপর আমি যখন কামাই করতে শুরু করব, তখন তো তোমাকেও খাওয়াতে পারব। আমি কি বলেছি যে আমি চাই বাবা মারা যাক?
বেশ আজ রাত থেকে মাত্র এক দিন না খেয়ে দেখা তো, পারলে বুঝব তুই কয়েক বছর না খেয়ে থাকতে পারবি।
শোনো ভাইয়া, আমি ভালো করেই জানি তুমি বাবার দালাল, মারও দালাল। তুমি যদি তখন বলতে ওয়াটার ফ্রন্টে আগে যাবে, তাহলে কি ড্রাইভারের বাদশাহ সোজা হাসপাতালে আসতে পারত?
মা এবার বলল, আকবর ড্রাইভারের বাদশাহ নয়, ড্রাইভারই আকবর বাদশাহ।
একই কথা মা, ড্রাইভার তোমার দালাল, ভাইয়াও তোমার দালাল।
মা জিজ্ঞেস করল, দালাল মানে কী?
অপরূপ বলল, সেটা আমি কী জানি? আমাকে সাত দিনের মধ্যে ওখানে নিয়ে যেতে হবে।
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে বাবার ২১ দিন লেগে যায়। ব্যাপারটা শুধু ফুড পয়জনিং ছিল না, হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। দুটো ব্লক অপসারণ করতে হয়। বেরোবার সময় যেসব বিষয় বাবার জন্য নিষিদ্ধ করা হয় তার মধ্যে ছিল ধূমপান, মদ্যপান। মেজাজও ঠিক রাখতে বলেছে। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক তা মেনে আবার বার-এ যেতে শুরু করে। বাসায় বসে খাবার জন্যও বোতল আনতে শুরু করে। মা বাধা দেয়। বাবা সেই বোতল নিয়ে বাইরে কোথাও বসে খায়, ফেরার পথে টলমলে পা, তাকে খাড়া রাখতে পারেনি। বাবা ওয়াসার স্যুয়ারেজ ড্রেনে পড়ে যায়। যারা তুলে আনে, তাদের কাছে নালিশ করে স্ত্রী তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। বিব্রতদশা কাটাতে মা বাবাকে বোতল আনার অনুমতি দেয়। তার এ অবস্থাটি কিন্তু নিত্যদিনের নয়। তেল উত্তোলনের সম্ভাবনা পরীক্ষায় আবার কোম্পানিতে ডাক পড়ে, বাবা হাত-পা ঝেড়ে মদের ঘোর কাটিয়ে কাজের মানুষ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম যায়, কক্সবাজার যায়। কক্সবাজারে গেলে একনাগাড়ে অন্তত পাঁচ-ছয় দিন কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মাতারবাড়ী আর বঙ্গোপসাগর ডিপ সি, মানে গভীর সমুদ্রে কাটিয়ে তবে বাড়ি ফিরে আসে। কদিন পর আবার যায়। আবার যখন ফিরে

আসে, আমাদের ভয় বাড়তে থাকে, তখন তার আচরণ বদলে যায়। এমনি একদিন কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বাবা মাকে জিজ্ঞেস করে সত্যি করে বল, অরূপের কোঁকড়া চুল কেমন করে এলো?

মা বলল, কোঁকড়া চুলে তোমার সমস্যা কী? অরূপের তো এ নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তোমার এই সমস্যাটার কথা কি ডাক্তারকে বলেছ?

বাবা চেঁচিয়ে উঠল। আগে তো বলবি বাচ্চাটা কার? কোঁকড়া চুল আমার বাচ্চা হতে পারে না।

অবশ্যই তোমার।

বাবা ভয়ংকার হিংস্র হয়ে বলল, মোটেও আমার না, যদি নাম না বলিস আজই তোকে শেষ করে দেব। বাবার পরবর্তী পদক্ষেপ বোঝার আগে শুধু শুনলাম মার চিৎকার, আমাকে মেরে ফেলল রে।

আমি রুম থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠলাম বাবার জন্য, মার জন্য নয়। খালি গা আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরা বাবার পেটের এক দিকে রক্তে ভিজে যাচ্ছে। আমি বললাম, বাবা তো মরে যাবে। অ্যাম্বুলেন্স লাগবে।

মা তখন আমার কাছেই নালিশ করছে : আরে এই ডাকাত আমার গলাটিপে ধরেছিল, আর একটু হলেই আমি মরে যেতাম।

একটু দূরে রক্তাক্ত কিচেন নাইফ হাতে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ। অসহায়ের মতো বিশালদেহী বাবাও আমাকে বলছে, দেখ, ওরা আমাকে খুন করতে চেয়েছে। আমি দ্রুত আমার ঘরে ঢুকে আমার ভারী একটি তোয়ালে এনে বাবার পেট আর কোমরের কাছে চেপে ধরে বললাম, তুমি ধরে রাখো, আমি ড্রাইভার আংকেলকে ডাকছি। খোলা গ্যারেজের ভেতর ড্রাইভিং সিট রিক্লাইন করে হরিপদ আংকেল ঘুমোচ্ছেন। আমি জোরে ডাকলাম। আংকেল, গাড়ি সামনে আনেন, বাবার অবস্থা খারাপ। হাসপাতালে নিতে হবে। হরিপদ হুড়মুড় করে উঠে পড়েন। আমি ঘরে যাই, মা ও অপরূপ ঠিক পূর্ব অবস্থানে। বাবা বেডরুমে ঢুকেছে। আমিও ঢুকি। বাবা ম্যান সাইজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চামড়া ফাঁক করে দেখছে কতটা কেটেছে। বাবা এক হাতে তোয়ালে চেপে ধরেই শার্ট পরল, মানিব্যাগ হাতে নিল। বোতল থেকে এক ঢোক হুইস্কি খেল। তারপর হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে এসে বলল, হরিপদ, একটা ক্লিনিকে নিয়ে চলো, দু-তিনটে স্টিচ দিতে হবে, বড় কিছু হয়নি। বাবা গাড়িতে ওঠে, আমিও তার সাথে উঠতে চাই। বাবা বলল, থ্যাংক ইউ, তোমার যেতে হবে না, আমিই পারব।

বাবা, আমাকে সাথে নাও, তুমি কিন্তু মরে যাবে, এ কথা বলে আমি কেঁদে ফেলি।

গাড়ি আমাকে রেখে চলে যায়। আমি চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকি। ঢুকেই দেখি অপরূপ তখনো ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে। আমি এগোতেই হুমকি দিল, আই অ্যাম অ্যা ডেঞ্জারম্যান। আমার কাছে আসবি না, তাহলে তোর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেব। মা রুম থেকে বেরিয়ে এলো এবং আমাদের দুজনকে হুকুম দিল যার যার বইপত্র আর দু-এক সেট কাপড় নিয়ে তাড়াতাড়ি রেডি হও। সাজ্জাদ সাহেব আসার আগে আমাদের বাসা ছাড়তে হবে।

কেন ছাড়তে হবে এ প্রশ্ন আমাকে করতে হয়নি। অপরূপ জিজ্ঞেস করল, এক শব্দের ইংরেজি বাক্য; হোয়াই?

মা বলল, সাজ্জাদকে আমি চিনি, রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য তোদের খুন করবে।

অপরূপ বলল, ইম্পসিবল, পারবে না। ছুরি যেটুকু ঢুকেছে সেটা কম নয়, বাসায় আর আসতে পারবে না। দু-চার দিনের মধ্যে এমনিই মারা যাবে। আর প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

আমি তাকে ধমক দিই, ডন্ট টক রাবিশ। বাবা বলেছে, সামান্য একটু চামড়া কেটেছে। দুটো স্টিচ দিয়ে চলে আসবে। এক ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে দেখিস।

অপরূপ আমাকে ধমক দিল, তুই বাবার দালাল। তোর কথা কে বিশ্বাস করবে? তুই একটা ছাগল।

ছাগল অপরূপের প্রিয় গালি। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা দেখে দেখে ঠিকমতো পড়তে পারছিল না। নিজের ওপর রেগে বলল, রবীন্দ্রনাথ একটা ছাগল। এডিসন মুরগির বাচ্চা ফোটানোর জন্য ডিমে তা দিয়েছে শুনে বলেছে, টমাস আলভা এডিসন একটা ছাগল। তার ক্লাস টিচার সম্পর্কেও বলেছে, মিস আইরিন একটা ছাগল।

মা স্যুটকেস গোছাচ্ছে। রুম থেকে চেঁচিয়ে বলল, আমি ওবার ডাকছি, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমি চাই না অপরূপ সাজ্জাদের হাতে খুন হোক কিংবা আমি খুন হই। অরূপও খুন হবে।

তখন কলিং বেল বাজে।

মা চেঁচিয়ে বলে, দেখ, ডাকাতটা ফিরে এসেছে কি না। আজকে শেষ করে ফেলবে।

দরজা আমাকেই খুলতে হবে। পিপহোল দিয়ে দেখি লোকটা বাবা কি না।

বাবা নয়, এমনকি কোনো পুরুষ মানুষও নন। সাদা অ্যাপ্রোন পরা মার চেয়ে কম বয়সী একজন নারী। নার্স কিংবা মেডিকেল স্টুডেন্টও হতে পারে। অবশ্য যারা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, তারা অনেকে একই ধরনের অ্যাপ্রোন পরে।

আমি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করি, কে? কী চাই?

দরজার ওপাশ থেকে তিনি বললেন, ম্যাডাম, আমি সিস্টার অনিতা রোজারিও। আপনি স্মিয়ার টেস্ট সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। খুবই ভালো করেছেন, এটাতে লজ্জার কিছু নেই। এটা নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টেস্ট। যোনিমুখ ও জরায়ুমুখ আপনার থেকে খুব সহজে কিছু টিস্যু নিয়ে...।

তার এই জবাব শুনে আমি কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সিস্টার অনিতা আমাকে ম্যাডাম বললেন। আমার কণ্ঠস্বর কি মেয়েলি ধরনের? যোনিমুখ আবার কি জিনিস?

আমি দরজা খুলি।

তিনি বললেন, আমি এতক্ষণ যার সাথে কথা বলছিলাম তিনি কোথায়?

আপনি তো আমার সাথে কথা বলছিলেন। আপনি আবার বলুন, সব কথা আমি বুঝতে পারিনি।

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তোমার মাকে ডাকো, দুনিয়ার সবকিছু পোলাপানের বোঝার জন্য নয়।

যে মুহূর্তে আমি তাকে বললাম, মা বাসায় নেই, তখনই মা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, অরূপ, দরজায় কে? কার সাথে কথা বলছ? তাড়াতাড়ি রেডি হও।

আমার মিথ্যাচার ধরা পড়ে যাওয়ায় আমি বিব্রত বোধ করি। আমি মাকে বলি তোমাকে এক্ষনি দরজায় গিয়ে কথা বলতে হবে। আমি তো বলেছিলাম তুমি নেই, তুমি চেঁচাতে গেলে কেন?

মা খুব স্বাভাবিকভাবেই গেল। তাকে বলল, নেক্সট উইকে একদিন আসবেন। আমার হাজব্যান্ড কিছুক্ষণ সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট করেছে, আমাকে হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। সি ইউ নেক্সট উইক।

তিনি বলেন, গড ব্লেস ইয়োর হাজব্যান্ড।

মা দরজা বন্ধ করে দেয়। নিজে নিজেই বলে, আমার পাসপোর্টটা কোথায় রেখেছি পাচ্ছি না কেন?

অপরূপ বাবার বেডরুম থেকে একটা বালিশ এনে বালিশের ভেতর একটু পর পর ছুরি ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং ঢোকানোর সময় বলছে, ইয়াহু।

মা শুধু বলল, আর ইউ অল রেডি? আমি পাসপোর্টটা পেলেই বেরিয়ে যাব।

চার-পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে আবার কলিং বেল। পিপহোল দিয়ে দেখি হরিপদ আংকেল।

আমি জোরে ডাকি, মা, হরিপদ আংকেল এসেছেন।

মা তখন তার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কথা বলছিল। দরজার কাছে এসে মা ফোনে বলল, আমি একটু পর আবার করব। ফোন ধরো কিন্তু।

হরিপদ আংকেল মাকে যা বললেন তার আসল কথা হচ্ছে, ক্লিনিক বাবাকে রাখতে চায়নি। বলেছে নেচার অব ইনজুরি গ্রিভিয়াস। হঠাৎ বিডিং বেড়ে যেতে পারে। বাবা তার বিদেশি বন্ধুদের সাথে কথা বলেছে। তারা অ্যাম্বুলেন্সে বাবাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যেতে বলেছে। যারা ছুরি মেরেছে, তাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি মামলা করতেও বলেছে।

www.sjiblbd.com
মুদারাবা
মাসিক আমানত
প্রকল্প
প্রতি মাসে স্বল্প সঞ্চয়
এক সাথে অনেক
টাকা দেবে নিশ্চয়
প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার
যে-কোনো পরিমাণ টাকা জমা করে বিভিন্ন মেয়াদে
অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের অর্থ (প্রাক্কালীন)
Shahjalal Islami Bank
L I M I T E D
Committed to Cordial Service
শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক
লি মি টে ড
আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মা জিজ্ঞেস করল, কী মনে হয় সাহেব কি আজ ফিরতে পারবেন?
হরিপদের জবাব, সাত দিনে ফিরতে পারবেন কি না, দেখেন।
মা বলল, তা তাহলে তাড়াহুড়ো করার আর কিছু না।
হরিপদ বলল, স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাড়ি থেকে কাপড়চোপড় চাদর– এসব কিছু আনতে হবে কি না।
স্যার বললেন, আপাতত কিছুই লাগবে না। ফোন খোলা রেখো, ফোনে যেন চার্জ থাকে। ওদের আমি তোমার নম্বরটাই দেব। যেভাবে বলে সেভাবেই করবে।
তারপর নিজে থেকেই একটি স্বগোতক্তি করল, দেরি হওয়ায় ভালো হয়েছে। ছেলের ওপর স্যারের রাগটা তত দিনে পড়ে যাবে।
হরিপদ আংকেলকে বাবা বিশ্বাস করে, মা-ও বিশ্বাস করে। আমাদের মানে ছোটদের বিশ্বাস করা বা না করায় কী এসে-যায়।
ছুরি হাতে অপরূপ দরজায় আসে এবং হরিপদকে হুকুম দেয় আজ আমাকে আশুলিয়া ওয়াটার ফ্রন্টে নিয়ে যেতে হবে।
হরিপদের জবাব, আমার হসপিটাল ডিউটি আছে, আজ সম্ভব নয়। অন্য একদিন যাব।
অপরূপ বলল, আপনি যে না বলবেন, সেটা আমি জানতাম। কারণ আপনি একটা ছাগল। তুমি শুধু ঘাস খাবে।
মা ধমক দেয়, বাজে কথা বলবে না।
অপরূপ বলে, তাহলে পেটের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে দেব।
ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর মা কাউকে ফোন করে বলল, আজ বেরোচ্ছি না। ছয়-সাত দিন হাসপাতালে থাকবে। তাহলে ফিরে আসুক। এসপার-ওসপার করে তবে আসি।
ফোন শেষ করে মা স্বর চড়িয়ে বলল, আমরা আজ যাচ্ছি না। তবে শিগগিরই যেতে হবে। এখানে থাকাটা ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
আমি বললাম, বাবার জন্য এখানে থাকাটা তোমার চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আজ দেখলেই তো।
পঞ্চম দিনই হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়। বাবার একজন বিদেশি ও একজন দেশি কলিগ সাথে আসেন, তারা সাথে একজন নার্সও আনেন। নার্স বাবাকে সেদিন থেকে মোট পাঁচ দিন অ্যাটেন্ড করবে। বাবার কোম্পানি নার্সের টাকা দেবে। রাতে ঘুমোবে বাবার রুমের ভেতরে বাইরে একটি থ্রি সিটার্স সোফায়। বাবার হাতে থাকবে একটা কলিং বেল।
বাবা যখন আসে আমিই দরজা খুলি, না খুললেও সমস্যা ছিল না। বাবার প্যান্টের পকেটে নিশ্চয় একটা চাবি আছে। মা তখন অফিসে থাকার একটা ভালো দিক হচ্ছে বাবা ও নার্সের সেটেল করা সহজ হয়েছে।
বিকেলের দিকে অপরূপকে দেখি বাবার রুমের বাইরে ঘুরঘুর করছে। আমার ভয় লাগছে বাবাকে যদি একটা কিছু করে ফেলে। হঠাৎ দেখি বাবার রুমে ঢুকে পড়েছে। আমি দরজার পাশে উঁকি দিই। ছুরি বের করতে চেষ্টা করলে আমি তখনই গিয়ে খপ করে হাত ধরে ফেলব, আর চিৎকার করব।
বাবার চোখ বন্ধ। হয়তো ঘুমোচ্ছে।
অপরূপ পা টিপে টিপে বিছানার কাছে গেল। বাবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে চুমো খেল এবং বলল, বাবা, অ্যাম সরি।
বাবার এক হাতে স্যালাইন চলছিল। অন্য হাতে অপরূপের মাথাটা টেনে তার বুকের কাছে চেপে ধরল।
কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থেকে অপরূপ মাথা তুলল এবং বাবাকে বলল, ঘুম পাচ্ছে। আমি তোমার ওপাশটাতে শুতে পারি?
বাবা মাথা নাড়ল।
আমি দেখলাম ইয়াহু বলে সে ফ্লোরে একটা লাফ দিল এবং আরেক লাফে বাবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। মাথার নিচে কোনো বলিশ নেই।
মার কথা যদি সত্যি হয় বাবার তাহলে এখনই রিভেঞ্জ নেওয়ার সময়। আরেকটু পরে অপরূপ ঘুমিয়ে পড়লে এক হাতেই গলাটিপে ধরবে এবং দারুণ একটা প্রতিশোধ নেবে।
কিন্তু আমি ভালো করেই জানি বাবা প্রতিশোধ নেবে না। প্রতিশোধের চিন্তাটা মার, বাবার নয়। মা ছোটটাকে হয়তো একটু বেশিই ভালোবাসে। সে জন্য দুশ্চিন্তা করতে পারে। সে জন্য মাকে দোষ দিচ্ছি না। আর বাবা যে এটা করবে না, এমনকি চড়-থাপ্পড়ও মারবে না, এটা আমি নিশ্চিত।
নিশ্চিত বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি। এখন পর্যন্ত বাবা আমার গায়ে কখনো হাত তোলেনি।

(তিন)

আমার কোঁকড়া চুল নিয়ে বাবার যে সমস্যা এটা আমি জানতাম কিন্তু বুঝতাম না, এখন আমি জানি এবং বুঝি। বোঝার জন্য হয়তো আমার বয়সটা একটু কমই কিন্তু আমি একজন টিচার পেয়েছি আমার অলিভ আপু। সেই টিচার না বোঝা এবং অস্পষ্ট অনেক কিছু কিছু মুখে বলে, কিছু কিছু হাতে-কলমে দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়েছে। আমি এখন জানি কেমন করে মানুষের জন্ম হয়। আমি বুঝতে পারি কোঁকড়া চুলের বাবু পেতে খাড়া নাক বাবু পেতে কী লাগে। আমার জানার সবটাই যে খাঁটি এমন না-ও হতে পারে, এখনো অনেক বিষয় মানুষের অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।
বাবার সন্দেহ, বাবা আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার নন, কেবল আমার মায়ের হাজব্যান্ড হওয়ার কারণে বাবা বড়জোর আমার লিগ্যাল ফাদার। তাহলে আমার একজন বায়োলজিক্যাল ফাদার অন্য কোথাও থাকতে পারে। থ্যাংক ইউ অলিভ আপু, তুমি খুব ঠান্ডা মাথায় আমাকে সামান্য বিচলিত না করে একটা অদ্ভুত আনন্দ শিহরণ মাখিয়ে ব্যাপারটা তুমি আমাকে বুঝিয়েছ। তুমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ দুজনের সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে, তাহলে আরও বড় বড় অসামঞ্জস্য চোখেও পড়ে না। কিন্তু সম্পর্কের ভাঙনে উইপোকার ঢিবিকেও হিমালয় পর্বতমালার মতো অতিকায় মনে হয়।
বাবা আমার কোঁকড়া চুলের কারণে যে সন্দেহটা মনে লালন করছে, সে জন্য বারবার মাকে বলছে, বল তুই, মানুষটা কে? আমাকে কিন্তু কখনো তাচ্ছিল্য করেছেন বলে আমি অনুভব করিনি। কিন্তু করার কথা ছিল।
আমার অলিভ আপুর কথাটাও পরে বলব। এখন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমি জিজ্ঞেস করেছি তারপরও যদি এমন হয় বাবা আমাকে বের করে দিল, মা আমার জন্য কিছু করতে পারল না, আমি কি তারপর টোকাইদের মতো হোটেল-রেস্তোরাঁর সামনে ঘুর ঘুর করব, একটা ঠান্ডা পরোটা চুরি করে দৌড় দেব, বিয়েবাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে নেড়ি কুত্তার সাথে ফাইট করব? আমি জানি, আমি বাঁচতে পারব, তারপরও আমার কম্পিউটার, আমার ট্যাব, আমার নিনটেনডো, আমার অয়েল পেইন্টিং, পেইন্টিং ব্রাশ, আমার অ্যাটলাস, আমার গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এগুলোর কথা মনে হলে একটু খারাপ লাগবে হয়তো।
অলিভ আপু আমাকে বলেছে, এ রকম কিছু একটা হলেই তো আমার জন্য সবচেয়ে ভালো, তোকে আমি সারা জীবনের জন্য নিয়ে নেব।
মা যখন কলিং বেল টিপল, তখন সাড়ে ছয়টা।
মাকে আগে থেকে একটি ধাক্কা খেতে তৈরি হওয়ার জন্য বললাম, বাবার অবস্থা কিন্তু খারাপ। বাবাকে হাসপাতাল থেকে নার্স দিয়ে দিয়েছে। তার কাজ বাবাকে ২৪ ঘণ্টা অবজার্ভেশনে রাখা।
মার প্রথম কথা, সেই নার্স কোথায়? এখন কি সে তোর বাবার সাথে শুয়ে আছে?
আমি বললাম না মা, ছয়টার বেরিয়ে গেছে, একেবারে ডিনার সেরে ১০টার ফিরে আসবে।
মা বলল, তাহলে ২৪ ঘণ্টার অবজার্ভেশন কেমন করে হবে? এখানেই তো চার ঘণ্টা বাদ হয়ে গেল। তাদের উচিত ছিল, প্যাশেন্টের অবস্থা যখন এতই খারাপ, দুটো নার্স দেওয়া।
মা বাবার জন্য দুটো নার্স অনুমোদন করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন, তবুও মা তো বলেছে।
মা বলল, বেশ ঠিক আছে রাত ১০টায় আমি বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেব, সকালের নাশতা, স্কুলের টিফিন, ড্রাইভারের খাবার আমি রেডি করে যাচ্ছি, মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিস। আর বুয়াকে বলিস, দুপুর আর রাতের রান্না করে রাখতে।
হঠাৎ মার মনে হলো, অপরূপের কথা তো জিজ্ঞেস করেনি? ছেলেটা কি এই বুড়ো ডাকাতটার হাতে মারা পড়বে?

অপরূপ কোথায়?
আমি বললাম, বাবার সাথে এক বিছানায় ঘুমোচ্ছে।
মা বলল, ওহ মাই গড! আমার ছেলেটা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে গলাটিপে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। ছুরি খাওয়ার প্রতিশোধ নেবেই।

মা আবারও বলল, তুই দেখে আয় আমার অপরূপটা এখনো বেঁচে আছে না রাক্ষসের বিছানায় শুধু শরীরটা পড়ে আছে?
বললাম, সব ঠিক আছে, ভালো আছে।
রাক্ষসের সাথে আবার ভালো থাকে কেমন করে? যা সোনা, ওকে রাক্ষসের বিছানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আয়।
মাকে বিব্রত করতে আমি ইচ্ছে করি বলি, যাও না মা, প্লিজ, তুমি তুলে নিয়ে এসো। আমি গেলে আমার পেটে ছুরি বসিয়ে দেবে।
সাথে সাথে মা বলল, এ কী সর্বনাশ! তাহলে তো সেই ছুরি দিয়েই আমার ছেলের গলা কাটবে।
আমি স্কুলের ব্যাগ গোছাতে চলে যাই। আমি এটাও জানি মা বাবার রুম থেকে অপরূপকে আনতে যাবে না।
অপরূপ নিজেই মাকে বাঁচিয়ে দেয়। খিদে লেগেছে, তাই ঘুম থেকে উঠে আসে।
মা বেশি ভালো বাসতে বাসতে যেসব বোকামি করে থাকে, তার একটা করে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, লোকটা কি তোর গলাটিপে ধরেছিল? অমনি পকেট থেকে একটি চাইনিজ টু-ইন-ওয়ান নেলকাটার ও ছুরি বের করে ছুরির ডগাটা খুলে মাকে দেখায়, এরপর এটা তোমার পেটে ঢুকিয়ে দেব। বাবাকে যতটুকু ঢুকিয়েছি, তার চেয়ে বেশি ঢোকাবে তোমাকে।
তার কথা বলার ধরন দেখে এটাকে ফাজলামি মনে করার কোনো কারণ নেই। সে সিরিয়াসলি বলেছে। সুতরাং মা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।
মাস্তানদের মতো টেবিলের ওপর ভাঁজখোলা ছুরিটা রেখে বলে, আমি সেদ্ধ ডিম খাব না, এখনই পোচ করে আনো।
অন্য সময় হলে সেদ্ধ ডিমই তাকে একথা-ওকথা বলে খাওয়াত; কিন্তু তার কথা শুনে নির্বাক মা দ্রুত কিচেনে গিয়ে তিনটা ডিম পোচ করে নিয়ে আসে। আমাদের প্লেটের দিকে এগিয়ে দিয়ে মা বলে, একটা খাবে অরূপ আর দুটো খাবে অপরূপ।
আমি একটা তুলে নিই। অপরূপও একটা নেয়। মা রাতে এসব ট্র্যাডিশনাল ডিনার খায় না, তার খাওয়াটা এক ঘেয়ে দুধ আর কোয়েকার ওটমিল। এতে শরীরে চর্বি জমে না, ফিগারটা ঠিক থাকে। মার ফিগারের প্রশংসা সবাই করে। অলিভ আপুও বলেছে, দারুণ ফিগার। তোর বাবার সাথে ম্যাচ করে না।
অপরূপ আরেকটা ডিম নিতে বললে অলিভ জবাব দিল, অবশ্যই নেব, কিন্তু আমার ভাগের এই ডিমটা বাবাকে খাওয়াব।
মার জন্য এটাও ছিল একটা আঘাত। অপরূপের চোখের সামনে বাবা মার গলাটিপে ধরল, মাকে বাঁচাতেই সে বাবার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল আর এখন সে তার ডিম পোচ বাবাকে খাওয়ানোর জন্য রেখে দিয়েছে।
আমি আর অপরূপ একই রুমে পূর্বে-পশ্চিমের দেয়ালের সাথে লাগানো দুটো সিঙ্গেল খাটে ঘুমাই। মাস্টার বেডে মা বাবার একসাথে থাকার কথা থাকলেও শুধু মা-ই থাকে। দুই নম্বর বেডরুমটা বাবার, তিন নম্বরটা আমাদের, অবশ্য কখনো কখনো আমি ছোট গেস্টরুমটাতেও ঘুমাই। এটা মার পছন্দ নয়, দুই ভাই একই রুমে থাকতে হবে। অপরূপের একটা অসুখ আছে, ঘুমের মধ্যে মাথার বালিশ হাতে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায়, লিভিংরুমের কার্পেটের ওপর আবার শুয়ে পড়ে। মা মূলত তার কারণেই ঘরটা ভেতর থেকে তালা দিয়ে চাবিটা একেবারে দরজার ওপরের চৌকাঠে লাগানো একটা আংটায় ঝুলিয়ে রাখে। এত উঁচুতে তার হাত যাবে না, নতুবা হয়তো হেঁটে বাইরে চলে যেত। এই হাঁটাটাও কিন্তু ঘুমেরই মধ্যে। মার এটাও নির্দেশ ও কখনো স্পি ওয়াকিং করে খেয়াল রাখবি। এক রুমে থাকলেও আমি কখনো ওকে বালিশ নিয়ে বিছানা থেকে নামতে দেখিনি।
খাবার পর মা তার নিত্যদিনের কয়েকটা ওষুধ খেয়ে নিজের রুমে চলে গেল। তার সম্ভবত মনে হচ্ছিল, বেশিক্ষণ এখানে থাকলে ছোট ছেলের কাছে আরও অপমানের শিকার হবে। ও যে সাফল্যের সাথে বাবাকে ডিম পোচটা খাইয়ে আসবে– এ দৃশ্যটা মা দেখতে চাচ্ছে না।
কিন্তু সে রাতে আবার একটা স্লিপ ওয়াকিংয়ের ঘটনা ঘটাল। আমি কিছুই টের পাইনি। সকালে ঘুম ভাঙলে অপরূপের বিছানায় দেখিনি, তার শিয়রের বালিশও নেই। আমাদের রুম লাগোয়া বাথরুম তো বন্ধই আমি রুমের বাইরে এখানে-ওখানে কার্পেটের ওপর খুঁজি। শেষ পর্যন্ত পাই বাবার সাথে ঘুমোচ্ছে, তখন মাথার নিচে কোনো বালিশ ছিল না, এখন নিজের বালিশ।
হঠাৎ ঘুম ভাঙলে কিংবা ঘুম না এলে আমরা দুজনই বহুবার মার রুমে গিয়ে শুয়েছি, ঘুমিয়েও পড়েছি, কিন্তু স্লিপওয়াক করে কেউ কখনো মার বিছানায় যাইনি।
(চার)
এ বছরের প্রথম দিকেই এ লেভেল পাস করা অলিভিয়া নুজহাত আরেফিনকে আমার টিউটর নিয়োগ করা হয়। আগামী বছর আমি ও লেভেল দিতে বসব। টিউটর আমাকে ফিজিকস-কেমেস্ট্রি পড়াবে, একটু একটু ম্যাথস দেখিয়ে দেবে। বাবা টাকা না-ও দিতে পারে কিংবা আমাকে পড়িয়ে টাকা নেওয়া ঠিক হবে কি না, এ রকম একটা দ্বিধায় আমাকে পড়াতে রাজি হচ্ছিল না। মা-ই সমস্যাটা মেটাল। খামের ভেতর পাঁচ হাজার টাকা ভরে তার হাতে দিয়ে বলল, তোমাকে পড়িয়ে টাকা নিতে হবে না, তুমি আগে টাকা নেবে, তারপর পড়াবে। এটা জানুয়ারির। ফেব্রুয়ারিরটা পাবে এ মাসের শেষ দিন, মানে ৩১ তারিখে। সপ্তাহে চার দিন।
বাসায় এসে পড়াবে, কোনো সমস্যা থাকলে আমি যাব। আমরা তো একই বিল্ডিংয়ে থাকছি। আমরা তিনতলায়, অলিভ আপুরা পাঁচতলায়। অলিভ আপুর মা বাবার বড়, আমার ফুফুদের মধ্যে দুই নম্বর। আমার বাবা ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, দুই ভাইয়ের একজন। ভাইবোন সবাই তার চেয়ে বড় একসময় সবার স্নেহেরই ছিল, কিন্তু ভারসাম্যহীন আচরণের কারণে বাবার কাছ থেকে সবাই সরে গেছে। বাবাকে তার কাছাকাছি বয়সীরা ডাকে পিকিউ, পিকিউলিয়ারের সংক্ষিপ্ত রূপ।
বাড়িটার নাম স্পেরোস লজ, চড়ুইয়ের বাসা। দুই ভাইয়ের চারটা অ্যাপার্টমেন্ট, তিন বোনের তিনটা। বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে প্রেটি হোম বিল্ডার্স। বিল্ডার্স তাদের ভাগের অ্যাপার্টমেন্টগুলো আগেই বেচে দিয়েছে। বাবার দুটোর একটাও বেচতে হয়েছে। সেটা কিনেছে অলিভ আপুর বাবা, আমার মেরিনা ফুপুর হাজব্যান্ড তৌফিক ফুপা। বাবাকে ঠকায়নি, পুরো দামই দিয়েছে; কিন্তু বাবা তার বোনকে জিজ্ঞেস করেছে বাড়ি কেনার টাকা তার স্বামী কোথায় পায়? বেতন কত? নিশ্চয়ই অনেক ঘুষ খায়। এ ধরনের কথার পর সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হতে যাচ্ছে।
অলিভ আপু আমাকে আমাদের ঘরেই পড়াচ্ছিল। হঠাৎ বাবা মার রুম থেকে চিৎকার করে বেরোলে বল, কোঁকড়া চুল কেমন করে হলো? আমার চৌদ্দগোষ্ঠীতে কারও কোঁকড়া চুল নেই। কাকে দিয়ে এই কোঁকড়া চুলের বাচ্চা বানিয়েছিস, ঠিক করে বল!
সম্পর্ক ভালো না থাকলেও বাবার এই প্রশ্নটির ব্যাপারে অলিভ আপুরা অবহিত ছিলেন। বাবা সেদিন এমনকি অলিভকে বলেছে, তুই না ভালো ছাত্রী, তুই বল কোঁকড়া চুল কেমন করে হয়।
অলিভ আপু অস্বস্তি বোধ করছিল বলেই হয়তো আমাকে বলে থাকবে, চল, পাঁচতলায় আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে, এখানে পড়ানোর পরিবেশ নেই।
আমি সাথে সাথে বইপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে মাকে বললাম, এখানে অলিভ আপুর পড়াতে অসুবিধে হচ্ছে। আমি তার সাথে ওপরে চলে যাচ্ছি। বাবার কথায় আমি হয়তো বিচলিত হয়ে থাকতে পারি এই ভেবে অলিভ আপু আমার কোঁকড়া চুলের ভেতর তার ডান হাতের মিহিন আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দেয়। বলে, তোর চুলগুলো অনেক সুন্দর। আমারগুলো কোঁকড়া হলে ভালো হতো, তোর সাথে এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব হলে তাই করতাম। আমি হিট কার্লার ব্যবহার করে আর সি সল্ট স্প্রে করে দেখেছি, তাতে অল্প সময় কোঁকড়া থাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

তার কথা আমার চুল নিয়ে সমস্যাটিকে আরও উসকে দেয়। তাহলে বাবা এমন করছে কেন?
অলিভ আপুর রুমটা ছোট। মানে গেস্টরুমটাকে নিজের রুম করে নিয়েছে আর তিন বেডের তিন নম্বর বেডরুমটাকে বানিয়েছে স্টাডিরুম। রুমটাকে অলিভ আপুর বাবা একটা সুন্দর লাইব্রেরি বানিয়ে দিয়েছে। ফ্লোর থেকে ওপরের দিকে ছয় তাকের আলমারি। একটা দুটো নয়, রুমের ভেতর এমন ছয়টা আলমারি। বই কেনার জন্য টাকা দিতে অলিভ আপুর বাবা এতটুকুও কৃপণতা করে না। কিন্তু আর সব খরচের ব্যাপারে একেবারে কনজুস।
বেডরুমেও অলিভ আপুর একটা ছোট পড়ার টেবিল আছে। টেবিলে একটা ল্যাপটপ সুইচ অন করা অবস্থায়ই থাকে। স্টাডিরুমের ঠিক মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর তিনটে চেয়ার। চারটে নয় কেন, টেবিলটার ওপরের কাচ আর নিচে কাঠের পায়ের ধরন দেখলেই বোঝা যায় প্রায় ১২৭ ডিগ্রি প্রসারিত প্রতিটি স্পেসের জন্য একটা চেয়ার নির্ধারিত করা হয়েছে, বৃত্তাকার কাচটার কেন্দ্র থেকে তিনটি ভাগ দেখানো আছে। প্রতি ভাগে যে ১২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি, টেবিলের কাচে তা লেখাও আছে। অলিভ আপুর উপস্থিতিতে আমার চুল নিয়ে মার সাথে বাবার বাজে আচরণটি আমাকে পড়ানোর দ্বিতীয় মাসের ঘটনা। তারপর থেকে আপু আর নিচে আসে না, আমাকেই ওপরে যেতে হতো। পৌঁছার পর পরই আমার চুলে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে একধরনের বিলি কাটাত।
এমনি আঙুল চালনার সময় জিজ্ঞেস করি, বাবা আসলে কী বলতে চায়, আমার কোঁকড়া চুল কে দিয়েছে?
আপু বলল, আরেকটু বড় হলে তুই নিজেই বুঝতে পারবি।
কতটুকু বড়?
এই ধরে নে ক্লাস টুয়েলভ, মানে এ লেভেল।
সে তো অনেক দেরি। কিন্তু আমি যে এখনই বুঝতে চাই। হয়তো বাবা ঠিক কথাই বলছে।
অলিভ আপু বলল, ঠিক হতেও পারে, না-ও হতে পারে। দুটোর সম্ভাবনাই আছে।
আমি বুঝতে চাই, ভালো করে বুঝতে চাই। যেভাবে আমার চুল কোঁকড়া হোক আমাকে তো বাবা কখনো এ জন্য পানিশমেন্ট দেয়নি, ধমকও লাগায়নি। যা কিছু ঘটেছে পুরোটাই মার সাথে।
আমি অলিভ আপুকে জিজ্ঞেস করি, বই পড়ে কি এটা জানা যাবে?
কোন বই?
আলিভ বলে, পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব কোনো না কোনো বইয়ে আছে।
আমার চুলের ব্যাপারটা
ঠিক চুলের ব্যাপারটা নয়, তবে একজন মানুষ দেখতে কেন অন্যজনের মতো কিংবা অন্যজনের মতো নয়, এসব এগুলো একটু সিরিয়াস ব্যাপার। তার আগে জানা দরকার, মানুষের জন্মটা কেমন করে হয়।
এই জন্মের একটা ব্যাপার তো আমি ভালো করেই জানি। মায়ের পেটে হয়। আমিও ছিলাম, সিজার করে আমাকে বের করা হয়েছে। মার পেটে সিজারের লম্বা কাটা দাগটা এখনো আছে।
কিন্তু মায়ের পেটে ঢুকলি কেমন করে?
এ প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি অভূতপূর্ব এক শিহরনের উৎস। সেই উৎসের নাম অলিভ আপু।
অলিভ আপু আমাকে স্টাডিরুমে নিয়ে যায়। আমার সামনে যে ইংরেজি বইটি রাখে পাতা উল্টে সম্পূর্ণ নগ্ন পুরুষ বাম দিকে আর ডান পাতায় সম্পূর্ণ নগ্ন নারী, দুটোই রঙিন ফটোগ্রাফ। দেখে মনে হচ্ছে না ছবি তোলার সময় তারা কেউ লজ্জা পেয়েছে, কিন্তু আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমি চোখ তুলে অলিভ আপুকে দেখি। বুঝতে পারি আপুও আমাকেই দেখছে, ছবি দেখে আমার কী রিঅ্যাকশন তা দেখছে। দুজনেরই গোপন জায়গায় চুল দেখে আমি অবাক হই।
বলল, পাতা ওল্টা।
ডানে পুরুষ, বায়ে নারী, এটা ড্রয়িং। আমি আবার ফিরে আসি আগের ছবিতে। আমি চুলের ওপর আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করি, এখানে এসব কেন?
অলিভ বলে, কয়েক বছর পর তোরও হবে।
আমি জিজ্ঞেস করি, তোমারও হয়েছে?
হয়েছে।
সত্যিই?
মিথ্যা হবে কেন? এটাই নিয়ম।
বিশ্বাস করি না।
দেখলে বিশ্বাস হবে তো? বেশ, দেখিস একদিন।
আমি ছবি ছেড়ে অলিভ আপুকে আঁকড়ে ধরি, আমার শরীরে শিহরন চলছে, আমি বই রেখে অলিভ আপুকে একটুখানি আলিঙ্গন করে বলি, সত্যিই দেখাবে! সো গ্রেট অব ইউ!
কিন্তু কোনো দিন কাউকে বলা যাবে না।
আমি অবশ্যই বলব না। আমার টিচার অলিভ আপু মনে হলো একদিনে আমাকে হাজার বছরের শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলেছে। আমি পাতার পর পাতা ওল্টাই। পরের দিন সময়ের আগে টিচারের কাছে হাজির হই।
আপু তার মোবাইল ফোনে গুগল সার্চ করে মানুষের রিপ্রোডাকটিভ প্রসেস নামের একটি ভিডিও দেখায়। আমি অবাক হই। তাহলে বড়রা ন্যাংটা হয়ে এসব করে, ওহ মাই গড।
অলিভ আপুর সাথে আমার একটি দারুণ সম্পর্কের সূচনা এখানেই। অলিভ বুঝিয়ে দেয় বাচ্চাটা, মানে বাচ্চার বীজটা যে ভেতরে ঢোকাচ্ছে এবং বাচ্চাটাকে যে লালন করছে তাদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো বাচ্চা পায়। এ দুজনের কারও কিংবা তাদের মা-বাবার কিংবা ভাইবোন কারও যদি কোঁকড়া চুল থাকে, তাহলে সহজেই বলা যায় এটা বাবার দিকের না মায়ের দিকের। যদি দুজনের কারও মতোই না হয়, তাহলে হয়তো অন্য আর একজন বাবা এ কাজটা করেছে। সেই বাবাই হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ফাদার। তাহলে কি আমাকে অন্য কেউ মায়ের পেটে ঢুকিয়েছে? বাবা নিশ্চয়ই তার কথা বলেই ঝগড়া শুরু করে।
অলিভ আপু বলে, ছোট মামা এটাই সন্দেহ করে।
তুমিও কি সন্দেহ করো?
আমি যে এটা নিয়ে কখনো ভাবিনি। আমি এটা নিয়ে রিসার্চ করলে অবশ্য তোর বাবা আর মায়ের দিককার বহু মানুষের চুল পরীক্ষা করতাম; একজনও না পেলে তখন হয়তো সন্দেহ করতাম। এখন তো বায়োলজিক্যাল ফাদার নিশ্চিত করা খুব সোজা– ডিএনএ টেস্টে মিল পেলেই হলো।
তাহলে বাবা কার কথা বলতে চাচ্ছে?
আমার মনে হয় না কারও কথা বলতে চাচ্ছে; বরং জানতে চাচ্ছে কে?
আমি বলি, মা নিশ্চয়ই জানে।
হ্যাঁ, জানতেও পারে, নাও জানতে পারে।
মানে?
জার্মানের চ্যান্সেলর ছিলেন উইলি ব্রান্ডট। তার মা ছিলেন জার্মানির একটি পোর্টের সেক্স ওয়ার্কার। প্রতিদিন অনেকের সাথে তাকে থাকতে হয়েছে। বন্দরের লোক প্রতিদিনই বদলেছে। কোনো দিনের কোনো লোকটার সাথে ওরকম একটা কাজ করার পর বাচ্চাটা যে লেগেছে, এটা তো তার মা-ও বলতে পারবে না। এটা বলতে না পারার আফসোস তার ছিল।
আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আপু, তুমি এত কিছু জানো?
আর কিছু দিন পর তুইও সব জানবি। হয়তো আমার চেয়ে বেশিই জানবি। আমার মনে হলো কোঁকড়া চুলের রহস্য আমি যতটা বুঝেছি, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি যে ভিন্ন কিছু পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠেছি।
আমি আমার টিচার অলিভ আপুকেই চাই।
অলিভ আপু কথা রেখেছে, একদিন দেখিয়েছে।
কিন্তু আমি যে আরও দেখতে চাই, প্রতিদিনই দেখতে চাই।
অলিভ আপু বলল, পড়াশোনা কিন্তু কমে যাচ্ছে। আমি পরীক্ষা নিতে শুরু করব। সিক্সটি পার্সেন্ট পেলে পাস। ফেল করলে কিন্তু আমি তোকে পেটাব।
পেটাও সমস্যা নেই, কিন্তু আমাকে একটু দেখতে দিয়ো।

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(এক)

আমার বিরুদ্ধে চারটা মামলায় রায় হয়ে গেছে। দুটোর বিরুদ্ধে আপিল হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। একটি এখনো আপিল কোর্টে পড়ে আছে। একটিতে আর আপিল করিনি। আরও দুটি মামলায় বিচার চলছে। ওসব নিয়ে এখন আর আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এক মামলায় আসামির ফাঁসি যদি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে বহালই থাকে তাহলে অন্য সব মামলায় তার খালাস পেলেও যা, চব্বিশ বছরের কারাদণ্ড হলেও তাই। আমার ফাঁসি হয়নি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। বাকি মামলাগুলোকে যত বছর ইচ্ছে কারাদণ্ড দিক, যাবজ্জীবনের চেয়ে বেশি কিছু তো আর নেই। আমি এখন সেটাই খাটছি।

আমার নামেই অফিসটা পরিচিত ছিল কাজি শরফুল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। শুরুতে ইনডেন্টিং সাথে যোগ করি ম্যানপাওয়ার এক্সপোর্ট, তারপর মেডিকেল ইমেজিং ইকুইপমেন্টস সাপ্লাই, আরও কিছু চেষ্টা করি। যাবজ্জীবন যখন খাটছি অস্বীকার করে আর কী হবে। ড্রাগ-ট্রাগ এসবের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম, টাকাপয়সাও হয়েছিল। সে টাকারই কিছুটা খরচ করে সরকারের গুণকীর্তন করার জন্য নামে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হলেও আসলে একটা প্রোপাগান্ডা অফিস বানিয়েছিলাম। সরকারের মন্ত্রী-টন্ত্রীরা আসতেন। এটা-ওটা বলতেন। বেশ একটা নামডাক হয়ে গেল প্রতিষ্ঠানটির : জনতা কোন দিকে? এটাই প্রতিষ্ঠানের নাম। ব্র্যাকেটে লেখা মুক্তব্বাক প্ল্যাটফর্ম। জাতীয় চেতনার চর্চা হয় আমার প্রতিষ্ঠানে। মূল প্রতিষ্ঠান কাজি শরফুল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের সিস্টার কনসার্ন জনতা কোন দিকে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে এখানকার অনুষ্ঠানগুলোতে আমিই সভাপতি, আমিই সঞ্চালক। একজন মন্ত্রী তো থাকবেনই, কখনো কখনো আমার দুই পাশে দুজন মন্ত্রী, হাফ কিংবা ফুল। সপ্তাহে অন্তত একবার পত্রপত্রিকায় আমার নাম ও ছবি ছাপা হচ্ছে, কাজি শরফুল মওলা সেলেব্রিটি হওয়ার পথে। টেলিভিশনে জনতা কোন দিকে– এ নিয়ে পাক্ষিক প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করি। শুভ্যানুধ্যায়ীরা বললেন, টেলিভিশনের পেছনে খুচরো পয়সা খরচ না করে একটা চ্যানেল কিনে ফেলো। তাই করলাম, সরকারি দলের একজনের সাথে পার্টনারশিপে একটা চ্যানেল কিনে নাম দিলাম জনতা টিভি। এটা তেমন লাভজনক ছিল না, তবে জনতা টিভিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সরকারি দলের মন্ত্রীরা নিজেরাই তদবির করত। অভিযোগও শুনতে হতো: পশুমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিলে কুড়ি মিনিট আর আমার পাঁচ মিনিট– এটা কোনো ন্যায়বিচার হলো, কিংবা আমি আসল কথাটা বলার আগেই তোমার রিপোর্টার সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিল। শালাকে জুতিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ ধামাধরা হিসেবে আমার মর্যাদা বাড়ল, আমাকে সমীহ করা লোকের সংখ্যাও বাড়ল, কিন্তু আমার বিজনেস পার্টনার সরকারি দলেরই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আতিকুর রহমান এমপি ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করলেন না।

জনতা কোন দিকে মুক্তব্বাক প্ল্যাটফর্মে কো-অর্ডিনেটর পদে যোগ দিল নাহিদ নিশতার জাহান। ইংরেজিতে অনার্স করেছে, বিয়েও ঠিক হয়ে আছে, পাত্র মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, পড়াশোনা করেছে মস্কোতে, পেট্রোলিয়াম ড্রিলিংয়ের ওপর ফিনল্যান্ডে নয় মাসের কোর্সে আছে, ফিরতে আরও ছয় মাস। নাহিদের বাবা কলেজে গণিতের শিক্ষক। তিন সন্তান আর তাদের জননীকে রেখে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের পড়া তার এক কৃষ্ণবর্ণ ছাত্রীকে নিয়ে ভেগে যান। তার বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা হয়, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, কিন্তু তাকে আর পাওয়া যায়নি।

বছর সাতেক পর এক ছেলে ও এক মেয়ে কোলে সেই ছাত্রী খুলনা থেকে তার বাবার বাড়ি ফিরে আসে। তার আর বিকল্প কিছু ছিল না। তার স্বামী খালিশপুরের অবাঙালি পরিবারের অর্ধশিক্ষিত একটি মেয়েকে নিয়ে আবার ভেগেছেন। পাঁচ মাস স্বামীর অপেক্ষায় থেকে নিজের হাতের টাকা প্রায় সব খরচ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সে বুঝতে পারল বাচ্চা দুটোকে মানুষ করতে হলে বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। রায়হানা নামের এই ছাত্রী দুই সন্তান নিয়ে নাহিদের মায়ের কাছে এসেছে, যদি তাদের কাছে কোনো খবর থাকে। তিনি বলেছেন, খবর নেই, তার খবর নেওয়ার কোনো আগ্রহও নেই। বাচ্চারা জানে, তাদের বাবা মারা গেছে। মরা মানুষ তাজা করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

রায়হানা বলল, তারপরও যদি কোনো কারণে তিনি যোগাযোগ করেন, দয়া করে যদি আমাকে একটা ফোন দেন কৃতজ্ঞ থাকব। আমি থাকি পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বর। একটা ফোন পেলে এক ঘণ্টার মধ্যে এসে হাজির হব। তাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করে সাথে সাথেই চলে যাব। আমারও তাকে দরকার নেই।

এ কথা শোনার পরপর নাহিদের মা কৌতূহলী হলেন। জানতে চাইলেন, প্রশ্নটা কী?

রায়হানা বলল, তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর চামড়ার একটি থলে তাকে দিয়ে বলেছিলেন, মানুষের বিপদ-আপদের কথা তো বলা যায় না, এর ভেতরে ১৩ ভরি সোনার বিভিন্ন ধরনের অলংকার আছে। কোনো কারণে আমি না থাকলে একটা একটা করে এগুলো বেঁচে বছর তিনেক বেঁচে থাকতে পারবে। কখনো বিপদে পড়লে কাজে লাগবে, সে জন্য একটা অলংকার এক দিনের জন্যও পরিনি। মানুষটা গায়েব হওয়ার পর দেখি আমার লুকোনো চামড়ার থলেটা নেই। আমার ১৩ ভরি অলংকারের একটিও নেই। একদিনও সেই অলংকার পরিনি, কেন জানেন? মনে হয়েছে আমার গায়ের কালো চামড়ায় লেগে যদি অলংকারের উজ্জ্বলতা কমে যায় তাহলে স্বর্ণের দাম কমে যাবে।

আচ্ছা, আমি তাহলে আসি, কষ্ট দিয়ে গেলাম। রায়হানার এ কথা শোনার পর নাহিদের মা বলল, এখনই যেও না। বাচ্চা দুটোকে একটু খাইয়ে নিয়ে যাও। দুপুরের খাবার সময় হয়েছে।

এই আমন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যাশিত। রায়হানা কেঁদে ফেলল। বলল, আমি আপনার সর্বনাশ করেছি, আপনি আমাকে আপনার পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে মারেন।

নাহিদের মা দুই বাচ্চার প্লেটে মুরগির দুটি রান তুলে দেন। রায়হানা তখন ফোঁপাচ্ছে। তিনি বললেন, শোনো, ওই চামড়ার থলেতে স্বর্ণ ছিল মোট ১৩ ভরি ৪ আনা ৩ রতি। আমি একবার মাপিয়ে ছিলাম, একদিনই মাত্র, একদিন সব অলংকার পরে স্টিলের আলমারিতে লাগানো লম্বা আয়নায় নিজেকে দেখে বুঝতে পেরেছি এসব আমাকে মানায় না। তা ছাড়া ওজনও বেশি। তার সামনেই একটা একটা করে সব অলংকার খুলে থলেতে ভরে বলেছিলাম, রেখে দিচ্ছি, জীবনে যদি কখনো বিপদে পড়ি, এগুলো কাজে দেবে। তোমার সাথে ভেগে যাওয়ার অন্তত দুই মাস পর সেই আলমারি খুলে, ভেতরের সেকেন্ড লকার খুলি। আশ্চর্য, আমার চামড়ার থলেটা নেই। সেই দিন ঘরে তার যা কিছু চিহ্ন ছিল সব কালো গারবেজ ব্যাগে ভরে একবার ভেবেছিলাম সামনে দাঁড়িয়ে সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়িতে তুলে দেব। কিন্তু এগুলো তো কারও না কারও কাজেও লাগবে এই চিন্তা করে 'মানবতার দেয়াল' লেখা একটি মুক্ত চ্যারিটের দেয়ালের সামনে ঢেলে দিয়েছি, যার যা লাগে নিয়ে যাক।

খাওয়া শেষ হলেও মেয়েটি তার হাতের রানটি ছাড়তে রাজি ছিল না। তার মতোই একগুঁয়ে স্বভাবের নাহিদ। একটু এগিয়ে এসে দেখল মেয়েটি দেখতেও নাহিদের মতোই একটু লম্বাটে মুখ, চোখগুলো বড়, রংটা শ্যামলা ও ফর্সার মাঝামাঝি।

রায়হানা যখন যাওয়ার জন্য দরজায় পা বাড়িয়েছে, নাহিদের মা বলল, এটাই যেন তোমার শেষ আসা হয়। আর কখনো আসবে না। তাকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। হাতে কেবল মুরগির রানের হাড়, ছোট মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আমি এক শবার আসব। আমাকে আরও মুরগির রান দিতে হবে।

মেয়ে নাহিদকে এটা নিয়ে বলেছিলেন, সেয়ানা বটে কুমিরের এক বাচ্চা বারবার দেখিয়েছে। তার পরিবারের আর সবার অজানা কাহিনিটি তিনিই মেয়েকে শুনিয়েছেন। গণিতের এই অধ্যাপক যখন তাকে বিয়ে করেন, তিনিও টুয়েলভ ক্লাসের ছাত্রী। তাকে পালাতে হয়নি, কারণ মেয়ের যে বিয়ে হচ্ছে তাতেই নাহিদের নানা সন্তুষ্ট ছিলেন। যৌতুক দেওয়া কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠান করে লোক খাইয়ে হইচই করার মতো টাকাও তার ছিল না।

প্রেম পর্ব চলাকালেই তিনি বলেছিলেন, ঘটনাচক্রে নাকি তাকে এক

ধনীর মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল। তার সাথে তেমন শোয়া-বসা হয়নি। মেয়েটি বদমেজাজি। সুতরাং ঘর করা হয়নি। কলেজে একদিন পুলিশ এসেছিল, সম্মান করে তাকে হাত কড়া পরিয়ে নেয়নি। তিনিই সাথে সাথে গিয়েছেন। অনেক দিন পর একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ফটোকপি তার কোটের পকেটে পাওয়া যায়। এতে দুটি ধারার কথা লেখা ছিল: দণ্ডবিধি ৩৭৯ ও ৪১৭। সংখ্যা দুটি মাথায় গেঁথে যায়, অনেক দিন পর নাহিদের মা যখন নিজের পায়ে অনেকটাই দাঁড়িয়ে গেছেন, হাতের সামনে আইনকানুনের বাংলা বই পেয়ে দণ্ডবিধি নামের এক বই উল্টে পেলেন ৩৭৯ ধারা হচ্ছে চুরি আর ৪১৭ হচ্ছে প্রতারণা। তিনি নিশ্চিত হন স্বর্ণের থলেটা আসলে সেই মেয়েটির, এই চোরাই মালটা কিছুকাল তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তাকে বিয়ের সময় বলেছেন কিছুই দিতে পারব না, তারপরও ১৩ ভরি ৪ আনা ৩ রতি স্বর্ণ তো অবিশ্বাস্য মনে হওয়ার কথা। নাহিদের মা মেয়েকে বলেছেন, আসলে আমি একটা চোর ও প্রতারককে বিয়ে করেছিলাম।

এই কাহিনি নাহিদের কাছ থেকে শোনা।

নাহিদের মায়ের নাম নিশতার জাহান। মা-ই তাদের লালন করেছে। এসএসসির রেজিস্ট্রেশনের সময় সে নিজের নামের কিছুটা ছেঁটে মায়ের নামের পুরোটাই নিজের সাথে যোগ করেছে, নাহিদ নিশতার জাহান। নিজের নামের যেটুকু বাদ দিয়েছে তা হচ্ছে দৌলা। বাবা ইতিমাদ দৌলার নামের অংশ।

নাহিদ যোগ দিয়েই অফিসের চেহারা বদলে দিল। সপ্তাহে এক দুদিন আমি ঢুঁ দিই।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যে করিডর দিয়ে আমার অফিসে ঢুকতে হয় তার দুই পাশে ছয়-ছয় ১২টি বর্ণিল পাতাবাহারের টব। আমার রুমের চেয়ার-টেবিলের অবস্থান বদলে গেছে। এত দিন আমার বসার চেয়ার বরাবর টেবিলের ওপারে সংযুক্ত বাথরুমের দরজা ভারী পর্দায় ঢাকা ছিল। এখন ঠিক বাঁ দিকে আমার চেয়ার থেকে ৬০ ডিগ্রি কোণে সোফাটা ডান দিকে, সামনে একটি বড় অংশ একেবারে শূন্য রুমটা আগের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে।

কম্পিউটার স্টার্ট বাটন টিপতেই টেবিলে হাতের বাঁদিকে স্ক্রিনে কলকল শব্দ করে একটা পাহাড়ি ঝরনা দেখা দেয়; পানিটা এমনভাবে পড়ছে হঠাৎ চোখ পড়লে মনে হবে স্ক্রিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিল ভিজিয়ে দেবে। মাউস ক্লিক করতেই কার যেন সেতার বাদন।

এখানে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, আমার আরও অনেক কাজ আছে। যদিও এটা আমার লুজিং প্রজেক্ট, যারা এখানে কাজ করছে তাদের দক্ষতার কমতি নেই। ইশারা দিলেই তারা বুঝে নেয় কী করতে হবে। তিন দিনের মধ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন কাগজে প্রচারণা, গ্রাফিকসের সুন্দর ডিজাইন এমনকি নিজেরাই তারিখ নির্ধারণ করে আমার জন্য হেভিওয়েট দু-একজন বাদ দিয়ে অতিথি নিমন্ত্রণের কাজটাও সেরে রাখে। আমাকে একটা ব্রিফ দেয়। আমি বলি বাহ! আমাদের নেতার শাশুড়িও যে এত গুণের এটা তো তার শ্বশুরও জানতেন না! এই মুহূর্তেও কর্মসূচি তিন দিনের মধ্যে আয়োজন শেষ করে চতুর্থ দিন উদযাপন: গণতান্ত্রিক উত্তরণে নেতার শাশুড়ির ভূমিকা।

নাহিদকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে বলে দিলাম বেতন কিন্তু মাত্র পনেরো হাজার। এর মধ্যে তোমাকে সামলাতে হবে, নিজের অফিস যতটা পারো গোছগাছ করে নেবে। আমি বেরিয়ে যাবার আগে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কেউ কেউ আমার সাথে দেখা করল। কো-অর্ডিনেটর বড় কোনো পদ নয়, তার আসার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আমিই ডাকলাম। বললাম, দারোয়ানটা বলল, তুমি আমার রুমে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলেছ?

সব করতে পারিনি স্যার। ওকে বলে যান, আমাকে যেন হেল্প করে। আপনার ড্রয়ারে ককরোচ ড্রপিংস। টেবিলের নিচে উল্টো হয়ে আছে একটা স্পাইডার, এগুলোতে কেন থাকতে হবে। আপনিই তো বলেছেন, আমার অফিস ঠিক করে নিতে। আমার অফিস মানে তো শুধু আমার রুম নয়, পুরোটাই আমার অফিস।

এটা ঠিক, সবটাই তোমার অফিস।

আমি বেতনের টাকা প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলেছি। ফুলের টব, আমার রুমের পর্দা কিনেছি। বাথরুমটার অবস্থা খারাপ।

তুমি তো বেতন পাবে এক মাস পরে, সেটা তো তোমার পারসোনাল টাকা।

সেই টাকাটাই মায়ের কাছে থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছি, বেতন পেলে মাকে দিয়ে দেব। এখন অফিস ঠিক করতে আরও টাকা লাগবে, কার কাছে টাকা চাইব?

আমি নাহিদকে বখে যাওয়া একটি মেয়ে হিসেবে ধরে নিলেও তাকে অভিভূত করে রাখতে চাই। সুতরাং আমার ব্রিফ কেস খুলে ৫০০ টাকা ১০০ নোটের একটা বান্ডিল তার হাতে দিয়ে বলি, তুমি যে টাকাটা খরচ করেছ, আগে নিয়ে নাও। সব খরচের ভাউচার রাখবে, অপ্রয়োজনীয় কোনো খরচ করবে না।

তার চাকরির তৃতীয় দিন মুখের ওপর আমাকে বলল, গণতান্ত্রিক উন্নয়নে নেতার শাশুড়ির ভূমিকা এটা কি কোনো প্রয়োজনীয় প্রজেক্ট?

আমি সতর্ক করে দিলাম, তোমার নিজের জন্য যে কাজটা নির্ধারণ করা হয় তার বাইরে অন্য কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে যেয়ো না। তাতে তোমার শত্রু বাড়বে, চাকরির আনন্দটা হারাবে। চাকরিটাও চলে যেতে পারে।

নাহিদ বলল, ওহ্ আচ্ছা গণতান্ত্রিক উন্নয়নে শাশুড়ির ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ, এটা বুঝতে পারিনি। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

নাহিদ তার রুমে ফিরে যায়।

যাবার সময় কী যে এক সুঘ্রাণ ছড়িয়ে যায়!

আমার ফোন আসে। বেনাপোলে আমার একটা চালান আটকে দিয়েছে শুল্ক বিভাগ। ঢাকায় ফোন-টোন করে মালটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। কাঁকড়া এক্সপোর্টের একটা কাজও হাতে নিয়েছি। যাবে হংকং। এত দিন ভালোই চলছিল, আমি যখন ব্যবসায়ে নামলাম পরিবহন খরচ বাড়ল, এমনকি এ-ও শুনছি পানির ছিটা লেগে নাকি উড়োজাহাজে মরচে পড়তে শুরু করেছে। মরচে মেরামত করা তো সহজ কাজ নয়। আমি মাত্র দুই চালান পাঠিয়েছি এতেই উড়োজাহাজ করোসনের মানে মরচে ধরার মিলিয়ন ডলারের দায় আমাকে বহন করতে হবে নাকি?

সেই ঘ্রাণ আমাকে আবার ডাকে। আমি তিন দিন পর আবার যাই। আমি নিজের রুমে ঢুকি। তালা মারা ছিল। পিয়ন তৈমুর চাবি দিয়ে খুলে দেয়। কিন্তু ভেতরে এসে আমার মনে হলো আমি তরতাজা সেই গন্ধটা পাচ্ছি, তার মানে একটু আগে সে এখানে ঢুকেছিল।

আমি তৈমুরকে ডাকি, আমার রুমে আজ কি কেউ ঢুকেছিল?

তৈমুর বলে, না স্যার, কেমন করে ঢুকবে? চাবি তো আমার কাছে? গতকাল কি কেউ ঢুকছিল?

না, পরশুদিনও না। তার আগের দিন নতুন ম্যাডাম বেরোবার পর তো আপনি বেরোলেন। তখন থেকে তো চাবি আমার কাছেই।

ঠিক আছে যাও। কো-অর্ডিনেটরকে গিয়ে বলো ঠিক আধঘণ্টা পর অফিসারদের সবাইকে যেন কনফারেন্স রুমে হাজির হতে বলে। একটা স্যান্ডউইচ আর এক কাপ চা দেবে। আমি ওখানেই চা খাব। এখন কিছু দিতে হবে না।

আমি ভাবি তিন দিন আগের ঘ্রাণটাই এখনো আমর রুমে আটকা পড়ে আছে!

আমি অন্তত পাঁচটা ফোন করি। এ খবর সে খবর দিতে ও নিতে আধঘণ্টা কেটে যায়। দরজায় নক করলেও খোলার জন্য অপেক্ষা করেনি নাহিদ। বলল, স্যার, মিটিং রেডি চলুন।

আমি আবার টেনে ঘ্রাণটা নিই। বলি, জাস্ট অ্যা মিনিট। বেনাপোল ফোন করি। জবাব আসে, হচ্ছে স্যার, মাল ছেড়ে দেবে।

তারপর নাহিদকে অনুসরণ করি।

কনফারেন্স টেবিল দুটি সামনে-পেছনে কিছুটা বাঁকা হয়ে মিশে গেছে, মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা, আমার চোখে পড়ল নিচ থেকে টেবিল ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে একটি বড় ক্যাকটাস গাছ। কাঠের আবরণে একটি বড় টব। ভালোই লাগছে।

শুরুতে এ কাজ-সে কাজের একটা অগ্রগতি রিপোর্ট নিলাম। স্যান্ডউইচ সার্ভ করা হলো। র‍্যাপার খুলে এক কামড় বসিয়ে বললাম, এবার গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি। 'জনতা কোন দিকে' আমাদের প্ল্যাটফর্মের সাফল্য দেখে সরকারি দলেরই একজন ভুয়া ডক্টরেট গণতন্ত্রের শামিয়ানা নামে আমাদেরটার মতো

PREMIER CARDS
প্রিমিয়ার ব্যাংক
সেবাই প্রথম
প্রিমিয়ার কার্ডে
ঈদ হোক আনন্দের
এই ঈদে আকর্ষনীয় ডিসকাউন্ট উপভোগ করুন প্রিমিয়ার কার্ডে
Platinum
Premier Bank
VISA
mastercard
MENZ KLUB ১০% ডিস্কাউন্ট
ZARA ২০% ডিস্কাউন্ট
১৫% ডিস্কাউন্ট
TWELVE ১০% ডিস্কাউন্ট
MEHJABIN ২০% ডিস্কাউন্ট
Leatherex ১০% ডিস্কাউন্ট
SPARK GEAR ১০% ডিস্কাউন্ট
RED ORIGIN ১০% ডিস্কাউন্ট
NABILA ১০% ডিস্কাউন্ট
১০% ডিস্কাউন্ট
বিস্তার ১০% ডিস্কাউন্ট
SaRa ১০% ডিস্কাউন্ট
sailor. ১০% ডিস্কাউন্ট
Priyo ১০% ডিস্কাউন্ট
১০% ডিস্কাউন্ট
বিস্তারিত জানতে
customer care 16411
ওভারসিজ নম্বর: +৮৮০৯৬৯২০৯৬৪৯৯
*শর্ত প্রযোজ্য
/ThePremierBankLimited www.premierbankltd.com
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

একটা অর্গানাইজেশন করতে চাচ্ছে, টাকাপয়সাও বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়েছে। শিগগিরই আপনাদের কাছেও, বিশেষ করে যারা ক্রিয়েটিভ, চাকরির অফার আসবে। বেতন বেশি দেবার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দেবে, নতুবা আপনাদের সাড়া কেমন করে পাবে? আমার অবস্থানটা পরিষ্কার করে জানাতে চাই অন্য ব্যবসার টাকা এনে ভর্তুকি দিয়ে এটা চালাই। আপনারা যে বেতন পাচ্ছেন, এ বছর বেতন এক টাকা বাড়ানো সম্ভব হবে না। যদি অফার আসে, যদি ভালো মনে করেন যেতে পারেন, আমি আপত্তি করব না। তবে গণতন্ত্রের শামিয়ানা কত দিন টিকে থাকবে নিশ্চিত না হয়ে সম্মতি দেবেন কি না, ভেবে দেখবেন। একবার যে আমাকে ছেড়ে যায় নীতিগতভাবে আমি আর তাকে গ্রহণ করি না। যদি যান, আমিও আশা করব তিন মাস বা চার মাস পর আপনাদের যেন আমার কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য ফিরে আসতে না হয়। টিকে থাকার মতো কাজ তো আমরাই পাচ্ছি না, গণতন্ত্রের শামিয়ানা কীভাবে টিকবে তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

উপস্থিত একজনও বললেন না, চিন্তা করবেন না স্যার। আমরা আপনার সাথে আছি।

আমার পেছন পেছন রুমে এলো নাহিদ।

আমাকে বলল, স্যার, আমি যদিও ক্রিয়েটিভ কেউ নই, গুরুত্বপূর্ণও নই, আমি থেকেই যাব। আর বেতন দিতে যদি অসুবিধে হয় আমার সামান্য সেভিংস দিয়ে পাঁচ-ছয় মাস চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট।

আমার হুমকিতে কোনো কাজ হয়নি। গণতান্ত্রিক উত্তরণে শাশুড়ির ভূমিকাই আমার শেষ ক্রিয়েটিভ কাজ। পরবর্তী দেড় মাসের মধ্যে আমার পিয়ন তৈমুর এবং কো-অর্ডিনেটর নাহিদ ছাড়া সবাই আমাকে ছেড়ে গেল। আকস্মিকভাবে জনতা টিভিতে আমার টেলিভিশন প্রোগ্রামটাও ছাঁটাইতে পড়ে গেল।

যদিও কল্যাণীর সাথে আমার সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। আমরা এখনো একই বাড়িতে থাকছিও না; তবু গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে রিপোর্ট করানো হলো আমার শ্বশুর বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। সুতরাং আমার সাথে বিরোধীদের সুসম্পর্ক, মানে একধরনের যোগসাজশ রয়েছে। অতএব আমি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নই।

সত্যিটা হচ্ছে, আমার শ্বশুর আমার বিয়ের অন্তত দশ বছর আগে মারা গেছেন। তবে তার বড় ভাইয়ের চাচা শ্বশুর আসলেই ডেপুটি স্পিকার ছিলেন।

প্ল্যাটফর্মটি থাকবে কিন্তু খরচ বাঁচাতে অফিস গুটিয়ে নেব। চুক্তিমতো তিন মাসের নোটিশ দিয়ে দিই। কেউ যদি ডেকোরেশনসহ ভাড়া নেয় তাহলে আমি কিছু পাব, নতুবা এগুলো ভেঙে নিতে হবে এবং স্পেসটা আগের অবস্থায় এনে দিতেও যথেষ্ট খরচ করতে হবে।

আমার রুটিন বদলে যায়। কর্মহীন শূন্য অফিসে কেবল তৈমুর আর নাহিদ। আমি যেখানেই থাকি দেড়টার মধ্যে এখানে চলে আসতে চেষ্টা করি। নাহিদ বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসে, অফিসে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ আছে। তার সাথে খাই। আমার সব নেশা কাটতে থাকে নতুন এক নেশায়, নাম নাহিদ নেশা। একবার ভাবি আমার টেলিভিশন অফিসে তাকে স্থানান্তর করি, একবার ভাবি ম্যানপাওয়ার অফিসে। কিন্তু এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কোথায় পাব।

আমি বললাম ঠিকই আছে, তোমার খনি বিজ্ঞানী আসতে তিন মাস, আমাদের এখানে প্রায় তিন মাস থেকে বাসায় একটু বিশ্রাম তার জন্য নিজেকে রেডি করতে থাকো। তারপর থেকে আমি তো একজন অচেনা মানুষ।

নাহিদ বলল, কল্যাণীকে কাগজে-কলমে ছেড়ে আসো, আমি কালই তোমাকে বিয়ে করব।

আমি সেদিন শুধু জড়িয়ে ধরেছি, এর বেশি কিছু নয়। তাকে বলেছি, আমার সামনে একটা বড় বিপদ। একটা কনসাইনমেন্টে বড় ওজনের ইয়াবা পাওয়া গেছে। আমার নামটা এসে যাচ্ছে। এরপর কী হবে বুঝতে পারছি না। আমার দেওয়া দুটো চেক তিনবার করে ডিজঅনার করিয়ে এক পার্টি মামলা দিয়েছে। আমার টিভি চ্যানেলের পার্টনারের হাবভাব বদলে গেছে। ইয়াবার মামলায় আমি যেন ফেঁসে যাই, সেই তদবিরই সে করছে।

আমি যখন নাহিদকে আঁকড়ে ধরে আছি, অকারণে দরজা ঠেলে তৈমুর ঢুকল। আমি নাহিদকে ঠেলে সরাতে চাই। নাহিদ বলল, তৈমুর যখন দেখতে চেয়েছে দেখুক, এই বলে আঁকড়ে থাকল।

জিজ্ঞেস করি, কিছু চাই তৈমুর।

তৈমুর বলল, জি, চাই। এই মাসের বেতনটা দিয়ে দেন স্যার, আমি দেড় গুণ বেতনে গণতন্ত্রের শামিয়ানায় কাল জয়েন করব, কথা দিয়ে ফেলেছি।

আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, হারামজাদা অকৃতজ্ঞ কুকুর। শুধু কল্যাণীর কারণে তোকে নর্দমা থেকে তুলে এনে চাকরি দিয়েছি। ইউ গেট আউট। এক পয়সাও দেব না আর এ অফিসের ধারেকাছে যদি দেখি গুলি করে মারব।

রাগটা সামলাতে পারা উচিত ছিল, পারিনি।

পরদিন কল্যাণী হাতেনাতে ধরতেই এসেছিল ঠিক দেড়টায়। আমি ফোনে আগেই নাহিদকে বলেছিলাম আমার তিনটা বেজে যাবে। চেক জালিয়াতির মামলায় আমি কোর্টে সারেন্ডার করে জামিন নিয়ে আসছি।

কল্যাণী কলিং বেল টেপে। গায়ে গতরে নাহিদের প্রায় দ্বিগুণ কল্যাণীর ছবি আমি তাকে দেখিয়েছি। দরজা খুলতেই তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বলে, আমার হাজব্যান্ড কোথায়?

কল্যাণী এ রুম-সে রুম, কনফারেন্স রুম, বাথরুম সব খুঁজল এবং নাহিদের দিকে ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরে বলল, বল, বেশ্যামাগী ও কোথায়? হকচকিত নাহিদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না, অথচ চাকরির শুরুতেই কথা বলে আমাকে নাস্তানাবুদ করেছে। চিৎকার করে বলে, তৈমুরকে তোরা দিতি নয় হাজার টাকা বেতন, শুধু তোদের ওপর নজর রাখার জন্য আমি দিতাম মাসে দশ হাজার। কাল দুপুরে কী করেছিস বল? তারপর শক্তিতে যেভাবে কুলায় তাকে মারধর করেছে এবং শিগগির মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেছে।

আমার আসতে আসতে সাড়ে তিনটা। হাতের চাবি দিয়েই দরজা খুলে ডাকতে থাকি নাহিদ নাহিদ...ওহ্ মাই গড। চোখ ফুলে আছে বিধ্বস্ত নাহিদ আমার রুমে সোফার ওপর কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে।

বলে, কিছু না, সেরে যাবে। তুমি হটপট থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নাও। আমি খেতে পারব না, মুখের ভেতর রক্ত জমে আছে।

কে তোমার এ অবস্থা করেছে? কারা এসেছিল?

একজনই। কল্যাণী। বলে গেছে আর একদিন এসে মেরেই ফেলবে।

আমি বলি, অসম্ভব, তার আগেই সে খরচের খাতায় চলে যাবে।

সে রাতে নাহিদের পক্ষে বাসায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। তার মাকে ফোন করে এবং বলে বাজে কিছু ভেবো না, অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যেতে হচ্ছে। পরশু ফিরব। একদম চিন্তা কোরো না।

ও প্রান্তে তার মা কী বলছিল, তা তো আর শুনিনি। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নাহিদ মাকে বলল, তুমি যদি আমার ওপর এত খবরদারি করো আমি আর বাসায়ই ফিরব না। কাল রাতেই পতেঙ্গা সি বিচ দিয়ে সমুদ্র নেমে পড়ব। আর উঠব না। ফোন রাখি।

নাহিদকে নিয়ে বেরিয়ে যাই, আমার ছোটবেলার বন্ধু সেলিমকে ফোন করে অনেক কিছুই খুলে বলি। সেলিম বলে, নো প্রবলেম, আমার ওয়াইফ হলি ফ্যামিলির মেট্রন। সব সামলে নেবে, তুই শুধু রেখে চলে যাস, থাকিস না। আমি বলব ওর হাজব্যান্ড পিটিয়েছে, ভাই দিয়ে গেছে, একটু ঠিকঠাক হলে নারী নির্যাতন আইনে মামলা দেবে।

সেলিমের বউ শুকতারা নাকি নাহিদকে বলেছে, তোমার বরটা মানুষ না জানোয়ার। ছেড়েছুড়ে চলে এসো, আমরা তোমাকে আবার বিয়ে দেব। আমার হাতে একটা ভালো পাত্র আছে, বউটা ক্যানসারে ভুগছে, আজ যায় কাল যায় এমন অবস্থা।

তৃতীয় দিন আমিই নাহিদকে বাসার কাছাকাছি নামিয়ে দিই। বেতনের নাম করে হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুঁজে দিই। সিদ্ধান্ত হয় বন্ধ হবার আগের দিন পর্যন্ত সে সেই অফিসেই যাবে, পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে, তারপর বাড়ি ফিরবে। অফিসে থাকার সময় দরজা

খুলবে না। কেউ ধাক্কাধাক্কি করলে আমাকে ফোন করবে, দরকার মনে করলে পুলিশকে জানাবে। আমার টিভি চ্যানেলের পার্টনার তার নামে লাইসেন্স করা পিস্তলটা বিপদাপদ ঠেকাতে আমাকে দিয়েছিলেন। লোডেড পিস্তলও রেখে যাই সোফার নিচে, অবস্থা বেগতিক হলে গুলি করবে।

নাহিদ বলে কিছু লাগবে না। সেদিন তো বসের বউ ভেবে ছাড় দিয়েছিলাম, এখন আর ছাড় পাবে না।

একটার দিকে আমি যখন আসতাম একটা গার্ড সাথে আনতাম দরজার বাইরে থাকবে, কাউকে এমনকি কলিং বেল টিপতেও দেবে না।

মাসের পাঁচ দিন থাকতে বাড়িওয়ালার কাছে চাবি হস্তান্তর করব, এটাও সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। বাড়িওয়ালা ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হসপিসে শেষ দিন গুনছেন। তার স্ত্রী বলে দিয়েছে কেয়ারটেকারকে বাসা বুঝিয়ে দিতে হবে। কেয়ারটেকার তার মামাতো ভাই, যা করার সে-ই করবে।

মাসটা ছিল ৩১ দিনের। হিসাবমতো ২৬ তারিখে চাবিটা কেয়ারটেকারকে দেব। ২৪ তারিখে খবর পেয়েছি ইয়াবা মামলায় আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। আমি উকিলকে ফোন করি। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, আরে ভাই, মাসেখানেক খেটে আসুন। তখন জামিনে বের করে নিয়ে আসব। এখনো চাইব, কিন্তু জামিন দিতে বুকের পাটাও লাগে। এসব মামলায় পয়সা নিতেও ভয় পায়। রিজেক্ট করে দেবে।

***

এত দিন আমি একবারও কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করিনি তুমি কি আমার অফিসে গিয়েছিলে? কিংবা কল্যাণীও আমার দিকে রেগে তেড়ে আসেনি, কিছুই বলেনি। এত বড় বীরত্বপূর্ণ আবিষ্কার আর সাহেবের অফিসের নারী কর্মচারীকে পেটানোর মতো দুর্দান্ত কর্মের অহংকারও করেনি কিংবা আমার চরিত্র নিয়েও কথা বলেনি।

কিন্তু আমি আর ছাড় দিতে পারছিলাম না। বানিয়েই বললাম, আমার অফিসের ভেতরের ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার কিছু ক্লিপ নিয়ে একজন মহিলা কর্মচারী তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, আজকালের মধ্যে তুমি অ্যারেস্ট হচ্ছ। তারপর কীভাবে সামলাবে তোমার ব্যাপার। এসবের মধ্যে আমাকে টেনো না। ছবিতে বোঝা গেছে, এটা অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। খুনের চেষ্টা। শরীরে অনেক ইনজুরি আছে।

কল্যাণী প্রথমে বলল, তোমার অফিসে আবার সিসিটিভি আছে নাকি?

অবশ্যই আছে।

তাকে আতঙ্কিত মনে হলো। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল, ওটা তো বেশ্যা। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ্যার সাথে আমার কী সম্পর্ক, জবাব এখনই দিতে হবে নতুবা আমাকে মেরে ফেলবে।

পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসবে শুনেই সে হিস্টেরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

মূলত তার হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমাকে কাজটা করতে হয়। নাহিদকে আক্রমণের মজাটাও তাকে টের পেতে হবে।

পরিবাগের এই অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া। ক্রিসেন্ট হ্যাবিটাটের চৌদ্দতলা ভবনের একেবারে সর্বোচ্চ তলায়। আমি এত ওপরে যেতে চাইনি। কল্যাণীই বলেছে, যত ওপরে উঠবে, ততই ভালো, নিচের মানুষকে লিলিপুট মনে হবে। আমি সাধারণত তার পছন্দের বাইরে যাই না। ধরা যাক আমি অন্য যেকোনো একটি ফ্লোর পছন্দ করলাম। সেই ফ্লোরে কোনো একটি অ্যাপার্টমেন্টে একজন সুন্দরী নারী থাকতেই পারে। কিন্তু হেলেন বলবে তুমি আগে থেকে জানতে সে জন্যই এখানে ভাড়া নিয়েছ। এই মুহূর্তে চৌদ্দতলা ক্রিসেন্ট হ্যাবিটাট অ্যাপার্টমেন্টসের চৌদ্দতলা চারটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি অনেক দিন ধরে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে, বুড়োবুড়ি অস্ট্রেলিয়ায় মেয়ের কাছে গেছেন। একটির জন্য নিচে টু লেট নোটিশ আছে দুই মাস ধরে খালি, ভাড়াটে এত ওপরে যেতে চাচ্ছে না। একটাতে তিন বিদেশি অধিকাংশ সময়ই রাতে ফেরে না। যেদিন ফেরে দেড়টা-দুটোর আগে না। একটাতে আমরা। আমাদের সম্পর্ক ভালো বলার কোনো সুযোগ নেই। আমার শেষ দেখবে বলে কল্যাণী রয়ে গেছে। যত সহিংসই হোক মূলত ভীতু। তার স্বজনরা তার সাথে থাকতে আগ্রহী নয়, আবার একা থাকার সাহসও তার নেই। তবুও আমার সাথে থাকার এটাই কারণ।

পাসপোর্টটা সাথে নিলাম। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার ভিসা আছে। চেকবই, ক্যাশ টাকা, ক্যাশ ডলার এবং ভিসা কার্ডও সাথে নিচ্ছি। একটা ট্রলিব্যাগও। ড্রাইভারকে গাড়ি লাগাতে ফোন দিই। গন্তব্য মুক্তবাক প্ল্যাটফর্ম আমার স্বপ্নায়ু সেই অফিস। বাসা আর অফিসের মাঝামাঝি একটি রেস্তোরাঁর কাছাকাছি নামি। ড্রাইভারকে বলি, এক বন্ধু এসে আমাকে এখান থেকে তুলে নেবে চট্টগ্রাম যাচ্ছি, বিকেলের ফ্লাইটে ফিরব। অফিসে থেকো। অফিস মানে টিভি চ্যানেল। প্রায় সব গাড়ি ওখানেই থাকে।

আমি রেস্তোরাঁয় ঢুকি, আমার গাড়ি চলে যায়।

রুটি পরোটা মিলে এক ডজন নিই, সাথে মাংস সবজি ও মুগের ডাল। ব্যাগে ভরে আমার ট্রলিসহ রিকশায় উঠি। অফিসের ঠিক সামনে নামি। সোয়া আটটা বাজে। নাহিদ আসতে অন্তত পৌনে দুই ঘণ্টা।

আমি একটা পরোটা আর একটু মুগের ডাল খেয়ে সোফায় শুয়ে পড়ি। এখানেই আহত শরীর গুটিয়ে নাহিদ অর্ধমৃতের মতো পড়েছিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙে চুলের আঙুল দিয়ে বিলি কাটছে নাহিদ। আমি প্রথম দিনের সেই ঘ্রাণটা পাচ্ছি। ঘড়ি দেখি, সোয়া এগারোটা। নাহিদকে জিজ্ঞেস করি, কখন এসেছ?

সাড়ে দশটায়।

তুমি?

বললাম, রাতে ঘুম হয়নি, ভাবলাম সকাল সকাল সোফার ওপর একটা ঘুম দেব। আমি ঠিক সোয়া আটটায় ঢুকেছি। নাশতা নিয়ে এসেছি, খাও।

নাহিদ বলল, আমি তোমার জন্য বড় চিংড়ি এনেছি। লাঞ্চের সবটাই আমি নিজে রেঁধেছি। এক সাথে খাব।

আমরা আর একপ্রস্ত নাশতা খাই। নাহিদ বলে, পরোটা বেশি খেয়ো না, তাহলে লাঞ্চটা ভালো লাগবে না। এত খাবার কেন এনেছ? ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি।

আমি ওয়াশরুম ঘুরে আসি। প্রশ্রাবটা হলদে হয়ে গেছে। জন্ডিস হবার কারণ নেই। গতকাল পানি কম খেয়েছি, টেনশন বেশি করেছি, রাতে ঘুমাইনি, এমন হতেই পারে। নাহিদ খাবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে পানি গরম করার জন্য ইলেকট্রিক কেটলির সুইচ অন করে। আমি কড়া কফি খাব।

আমি ট্রলিটা কাছে টেনে আনি, চেক বইটা বের করি। নাম লিখি নাহিদ নিশতার জাহান। ৫ লাখ টাকা, কথায়ও লিখি, শেষে বসাই মাত্র। জিজ্ঞেস করি অ্যাকাউন্ট পেয়ি করে দেব না সরাসরি তুলবে? মানে?

তোমার বিয়ের বাকি এক সপ্তাহ। আমি যে তখন থাকতে পারব না। এ জন্য গিফটা আগেই দিচ্ছি।

আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি আমাকে রিজেক্ট করলে, তাই তো?

আমি বলি, হ্যাঁ বলাই ভালো। আমার যে কোনো বিকল্প নেই। আমার বিরুদ্ধে ইয়াবা মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। যেকোনো সময় অ্যারেস্ট হয়ে যাব। আরও একটা বড় মামলায়, ফেঁসে যাবার আশঙ্কা আছে। আমি পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়েছি। ট্রলিব্যাগ নিয়ে কখনো আমাকে দেখেছ, আমি আসলে পালাচ্ছি। তোমাকে ভোগাতে চাচ্ছি না।

আমি চেকের আরেকটা পাতায় সই করে এটাও তার হাতে তুলে দিয়ে বলি ব্যাংকে আরও কিছু থাকার কথা। কোনোভাবে ব্যালেন্সটা জেনে একটা অ্যামাউন্ট বসিয়ে দিয়ো।

নাহিদ চেকের পাতা দুটি ছুড়ে ফেলল। বলল, আমি টাকা দিয়ে কী করব? আমি তোমাকে চাই। তুমি পালিয়ে গেলে তোমার বাচ্চা আমাকে দিয়ে যাও। বাচ্চার টানে ফিরে আসবে, আসতেই হবে আমি জানি।

আমার শরীরে অদ্ভুত ধরনের একটা কম্পন হয়।

নাহিদ টেনে আমার প্যান্ট খোলে, শার্ট খোলে, নিজেকে নির্বসন করে বলে, আমাকে তোমার বেহায়া মনে হচ্ছে? হোক আমার কিছু এসে-যায় না। আমাকে তোমার বাচ্চা দিয়ে যাও।

নাহিদের কথা মনে হলেই শরীরের জাগরণের জোয়ার আসত। আজ কী কিছুই হবার নয়? আমি তো এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলাম।

নাহিদ আমাকে তুলে নিল তার ওপর। আমি সব দুশ্চিন্তা কয়েক মুহূর্তের জন্য সরিয়ে দিলাম, আমি পেরেছি। সম্ভবত আমি সন্তানের বীজ বপন করতে পেরেছি। পরক্ষণেই শত বছরের ক্লান্তি নেমে আসে আমার শরীরে। আমার কারণেই তেমন আনন্দপ্রদ কিছু না হলেও নাহিদের চোখে অভূতপূর্ব তৃপ্তি। বলল, এভাবে আরও কিছুক্ষণ থাকি। নাহিদ আমার বাহুর একটা অংশ সদ্য দাঁত ওঠা শিশুর মতো চুষতে শুরু করল, কামড়ও বসাল।

আমি জানি, আমাকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে।

বললাম, নাহিদ, চিংড়ি মাছের লাঞ্চ সার্ভ করো।

নির্ভীক নগ্ন এক মৎস্য কন্যার মতো আমার ওপর দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল। একইভাবে যখন ফিরল আমি থ হয়ে তাকিয়ে থাকি এমন চোখ ঝলসে দেওয়া সুন্দর আমি কখনো দেখিনি।

আমাদের খাওয়া হলো। বললাম, ফ্রিজে যা কিছু আছে বের করে একটা ব্যাগে ভরে নাও। আমার ড্রয়ারে একটা ল্যাপটপ আছে, এটাও নাও। এখানে তোমার আর আসা হবে না, হয়তো আমারও না। আমি যাবার সময় বাড়িওয়ালার কেয়ারটেকারের হাতে চাবি দিয়ে যাব। এখানকার জিনিসপত্রের জন্য কিছু একটা বলে যাব, কোথাও রাখার জন্য কিছু টাকা দেব।

তারপর কোনো একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ড যেখানকার টিকিটই পাই আমি আজ-কালের মধ্যেই বাংলাদেশ ছাড়ছি। তুমি আগে বের হও, সোজা বাসায় যাবে। আমি মিনিট দশেক পরে বের হব। এই মুহূর্তে তোমার সাথে কেউ আমাকে দেখুক, এটা চাচ্ছি না।

নাহিদ চেয়ারে বসল। আমাকে বলল, কাছে এসো, ইঙ্গিত করল, ফ্লোরে বসো। তারপর আমার মাথাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইল। এবার পেটের খানিকটা অংশ উদোম করে বলল, তোমার বাচ্চাকে চুমো দাও। আমি তা-ই করলাম। তারপর নাহিদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তারপর নাহিদ এক পা এগোয় আবার আমাকে ফিরে দেখে আবার এগোয় আবার ফিরে দেখে। আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, ডন্ট লুক ব্যাক।

মিনিট পনেরো পর আমি বের হলাম। সব ঠিকঠাকমতো সেরে মালয়েশিয়ার টিকিট নিয়ে রাত এগারোটার দিকে এয়ার এশিয়ার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিম লাইনারে উঠে বসলাম। উড়োজাহাজে তখনো বোর্ডিং ব্রিজ ছেড়ে যাইনি। চারজন সাদাপোশাকের মাঝবয়সী মানুষ উড়োজাহাজে উঠে আমার কাছাকাছি এসে বলল, স্যার, আপনাকে উঠতে হবে। আমি দাড়িওয়ালা মানুষটির দিকে তাকাই। তিনি বলেন, সরি স্যার, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। আপনার হ্যান্ড লাগেজ নামান।

আমাকে নামানোর এক মিনিটের মধ্যেই ড্রিম লাইনার বোর্ডিং ব্রিজ ছেড়ে যায়।

(দুই)

কেফায়েতউল্লাহ প্যান প্যাসিফিকের চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডের আমিই ছিলাম প্রধান। অ্যালান টার্নার সিইও হয়ে এসেছে। তার সাথে এক্সিকিউটিভ কাম পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসার কথা ছিল করপোরেট হেডকোয়ার্টার্সের আমান্দা ইসাবেলা হো নামের লাতিন আমেরিকান মা ও জাপানি বাবার একটি মেয়ের। সব ঠিকঠাক ছিল, টার্নার সাহেবের সাথেই আমান্দা

আসবেই কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভয়ংকর এবং বিব্রতকর একটি সমস্যা সৃষ্টি করল টার্নার সাহেবের স্ত্রী শার্লট। করপোরেট চেয়ারম্যানকে বলল, দুজনের যেকোনো একজন যাবে। অ্যালান যদি আমান্দাকে নিয়ে যেতে চায় তাহলে আমাকে ডিভোর্স করে তার সম্পত্তি এবং ভবিষ্যৎ আয়ের অর্ধেক ভাগ দিয়ে যেতে হবে। আমি তাহলে তাকে একেবারে দায়মুক্ত করে দেব। তা যদি না হয় তবে নয় বছর বয়সী মেয়ে মেরিল আর পেটে তার যে বাচ্চা তাদের যেকোনো ধরনের সর্বনাশের দায় তাকে নিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা নোট লিখে যাব, আমি মেরিলকে মেরে ফেলছি। পেটের বাচ্চাসহ মরার জন্য আমি বার্বিচুরেট খাচ্ছি, চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম, সমস্যাটি তিনি মেটাননি। তিনিও রেস্পন্সিবল।

যত ব্যক্তিগত বিষয় হোক না কোনো কোম্পানির জন্য বিব্রতকর হতে পারে এমন কিছুতে তিনি জড়াবেন না। করপোরেট সিইওকে বলে দিলে আমান্দাকে এটা নয়, নেক্সট কোনো ওভারসিস পোস্টিংয়ের জন্য তৈরি হতে বলো, বাট নট ইন সাউথ এশিয়া। ওখানে অ্যালান লোকালি অ্যারেঞ্জ করে নেবে।

বাংলাদেশে এসে অ্যালান টার্নার প্রথম দিনই আমাকে বলল, আমান্দাকে আনতে পারিনি এটা ঠিক, কিন্তু তার বদলে পেয়েছি একটা দুর্লভ ফেয়ারওয়েল কিস। আমার ওয়াইফ শার্লট আমাকে সি অফ করতে এয়ারপোর্ট এসেছিল এবং একটা প্যাশনেট ফেয়ারওয়েল কিস দিয়েছে।

অট্টহাসি দিয়ে ফেটে পড়া মোটাসোটা অ্যালান টার্নার বলল, শার্লট জানতই না, আমিও জানতাম না যে বাংলাদেশে পোস্টিং অর্ডার বাতিল করার জন্য আমান্দা রিপ্রেজেন্টশন দিয়েছে। আমাদের হেড অফিসে এত ইয়ং ছোঁকরা থাকতে একজন বুড়োর সাথে সে কেন ঢাকা যাবে? ভেতরের কাহিনিটা ভিন্ন, আমান্দা করপোরেট থেকে বেরিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছিল। হার্ভার্ডে বড় ধরনের একটা বৃত্তি জুটিয়েছে, মাস্টার্স করবে। অক্টোবর থেকে সেশন। এক মাস ছুটিতে থেকে পরের মাসে চাকরি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেবে। টিচিং এবং রিসার্চে ক্যারিয়ার গড়বে। ইটস অ্যা ব্রিলিয়েন্ট ডিসিশন।

নিজের কথা অবলীলায় বলে যান অ্যালান, আমান্দা আমাকে বলেছে তোমার মতো একটা আলুর বস্তার সাথে থাকলে আমি কিছু বাড়তি টাকা আর সেক্স ছাড়া কী পাব? তোমার ওয়াইফ শার্লট একজন ভয়ংকর নারী। আমার টাকার চাহিদা কম আর সেক্স এখন আগের মতো এনজয়েবল মনে হয় না। নেভার মাইন্ড। আমি তোমাকে একেবারে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি যোগাযোগ রাখব। ঢাকা থেকে আমাকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।

অ্যালান আমাকে বলল, মেয়েটাকে অবশ্যই হাসিমুখ হতে হবে। শার্লটের গোমড়া মুখ দেখতে দেখতে নারী জাতি সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছিল। আমি পুরনো ধারণাটা ফিরে পেতে চাই। আমার মা খিলখিল করে হাসত। অতটা না হলেও চলবে কিন্তু মুখে হাসি থাকতে হবে। আর একটা জিনিস চাই, জোক বুঝতে হবে।

বললাম, দেখি দুই সপ্তাহ সময় দাও, খুঁজে দেখি।

অ্যালানের পছন্দ পুরুষ নয়, তার মুখে যত হাসিই থাকুক। হাসিমুখ মেয়ে কিন্তু জোক শুনে মুখভঙ্গির সামান্য পরিবর্তনও ঘটায় না এমনও আমি পেয়েছি। আমরা কয়েক দফা বাছাই করে তিনজনকে একে একে অ্যালানের সামনে হাজির করলাম, আমি পাশেই ছিলাম। দ্বিতীয় প্রার্থী রিশতা হায়দার যোগ্য তো বটেই, সুন্দরীও। পালমোলিভ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার্সআপ। প্রথম প্রার্থী নাহিদ নিশতার জাহান দেখতে ভালোই, তবে রিশতার মতো বুকে ধুকপুক সৃষ্টি করা কেউ নয়। তৃতীয়জন ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রেস অ্যাটাশের কন্যা ওরেলিয়া হার্স্ট। সুন্দর চটপটে এবং রসিক। অ্যালান প্রত্যেককেই একটা করে জোক শোনাতে বলল। তিনজন বেশ মজার জোক শোনাল। আমি ধরে নিলাম অ্যালান রিশতাকে পছন্দ করেছে। যদি তাকে বাদ দিতে হয় তাহলে ওরেলিয়া হার্স্ট। আমরা বলেছিলাম অপেক্ষা করো, একজনকেই সিলেক্ট করা হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব জয়েন করতে হবে, কাল হলে আরও ভালো।

যখন তিনজন অপেক্ষা করছে তাদের কফিও সার্ভ করা হয়েছে। আমি অ্যালানকে বললাম, কে তোমার পছন্দ বলো।

অ্যালান ছোট বাচ্চাদের মতো আওড়ে গেল: ইনি মিনি মাইনি মো/ ক্যাচ দ্য টাইগার বাই দ্য টো- তারপর খপ করে নিজের একটি আঙুল আঁকড়ে ধরে বলল, ইটস নম্বর ওয়ান।

তার মানে নাহিদ নিশতার জাহান।

অ্যালান বলল, তুমি ভেবেছিলে আমি বিউটি কুইনের কথা বলব! আসলে তিনজনের বলা কৌতুকের মধ্যে আমার ভালো লেগেছে এক নম্বরেরটা। ইংরেজিতে বলা নাহিদের জোকটার ভাষান্তর হবে এমন:

সংসারজীবনে হতাশ তিন বন্ধুর একজন ফ্রেঞ্চ, একজন জার্মান, একজন ইংলিশ।

ফ্রেঞ্চ বলল, আমার সংসার টিকবে না, আমার স্ত্রী ইলেকট্রিশিয়ানের প্রেমে পড়েছে।

ইংলিশ বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কেমন করে বুঝলে?

বেডরুমে খাটের নিচে ইলেকট্রিক টেস্টার আর কিছু তার পেয়েছি।

জার্মান বলল, আমার স্ত্রী তারকারিওয়ালার প্রেমে পড়েছে। আমি খাটের নিচে কিছু গাজর, শালগম আর ওজন নেবার পাল্লা-পাথর পেয়েছি।

ইংরেজ বলল, তোমরা তবুও ভাগ্যবান। আমার স্ত্রী ঘোড়ার প্রেমে পড়েছে।

ফ্রেঞ্চ ও জার্মান সমস্বরে বলল, কেমন করে বুঝলে?

হঠাৎ এক দুপুরে বাসায় ফিরে দেখলাম, খাটের তলায় সহিস লুকিয়ে আছে।

এই কৌতুকের কথা মনে করে অ্যালান হো হো করে হেসে উঠল এবং বলল, এই পাজি মেয়ে এক ঘা মেরে আমাদের দুই শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে। সে একই সঙ্গে ইংলিশ হিসেবে আমাকে অপমান করার জন্য এবং আমার সেন্স অব হিউমার পরীক্ষা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা বলেছে। কাজেই আমি তাকেই চাই।

আমি অপেক্ষামাণ রিশতা হায়দার ও ওরেলিয়া হার্স্টকে নাম ধরে ডেকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং নাহিদকে বলি, তোমাকে এখনই ধন্যবাদ বলতে পারছি না। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে অ্যাপায়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে যাও। এর সাথে একটা সম্মতিপত্র আছে। ইচ্ছে করলে এখনই সই করে রেখে যেতে পারো। নাহিদ বলল, উইকএন্ড কাটিয়ে প্রথম উইক ডে-তে জয়েন করবে, মানে তিন দিন পর।

প্রায় এক মাস পর অ্যালান বলল, নাহিদ তাকে আর একটা মজার জোক শুনিয়েছে। প্যান প্যাসিফিক হোটেলের বলরুমে একটা ফ্যাশন শো হয়ে গেল। চিফ গেস্ট হয়ে এলেন নাসির উদ্দিন হোজ্জা। সুন্দর শাড়ি পরে তেরো জন সুন্দরী ক্যাটওয়াক করল, প্যারেড করল। অনুষ্ঠান শেষে হোজ্জাকে উপহার দেওয়া হলো দুটো শাড়ি। হোজ্জা চটে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশের মানুষ প্রতারক, এ দেশে আর কখনো আসব না। আমাকে দেখাল সুন্দর মেয়ে আর দিল শাড়ি।

অ্যালানের আগে ছিল ম্যাকপারল্যান্ড। অফিসে মুখ ভার করে বসে থাকত। অ্যালান পরিবেশটা বদলে দিল। বলল, ম্যাকপারল্যান্ডকে তোমরাই ভুল বুঝেছ। ও ক্রনিক কনস্টিপেশনের রোগী। এটাই আসলে তার আনন্দময় চেহারা।

চতুর্থ মাসের শুরুতে বলল, নাহিদ ঠিকই বলেছিল। আমার স্ত্রী শার্লট ঘোড়ার প্রেমে পড়েছে। আমাকে অবশ্যই ফিরে গিয়ে খাটের তলা থেকে সহিসটাকে বের করতে হবে।

মানে?

এমন কিছু নয়। শার্লট হাসপাতালে। ভারী পেট নিয়ে বারে গিয়ে ভরপেট বিয়ার খেয়ে তার পুরনো এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে নাচতে শুরু করেছিল, তারপর বিডিং, তারপর হাসপাতাল। আমি হেড অফিসে কথা বলেছি, তোমাকে অ্যাকটিং সিইও করা হচ্ছে। আমি না ফেরা পর্যন্ত চালিয়ে যাও। টেক কেয়ার অব দ্য গার্ল নাহিদ।

আমি অ্যালান টার্নারের মতো রসিক ধাঁচের মানুষ নই। অ্যালান রাতে ঢাকা ছেড়েছে, সে দিনই লন্ডন থেকে আমাকে ভারপ্রাপ্ত সিইও করার আদেশ এলো। ম্যাকপারল্যান্ডের চলে যাওয়া আর অ্যালানের আসার মাঝে পঁচিশ দিন আমি ভারপ্রাপ্ত সিইও ছিলাম।

তাতে বলা ছিল আমি কেবল সিইও ও রুটিন দায়িত্বগুলো পালন করব। এবারের আদেশের ধরনটা ভিন্ন। আমাকে সিইওর ক্ষমতা পূর্ণ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। পরদিন সকালেই আমার আগে অফিসে আসা নাহিদ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে রিসেপশনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, অ্যালান টার্নার চলে গেছে। সকালেই আমাকে তার চেয়ারে বসিয়ে দিতে হবে। সিইওকে সিইও-ও রুমেই বসতে হয়, নতুবা অথোরিটি এক্সারসাইজ করা যায় না।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ নাহিদ, অ্যালান যদি না-ও ফেরে, সাদা চামড়ার কোনো না কোনো সাহেব আসবে। আমার চাকরি আর দেড় বছরও নেই, বয়স হয়েছে। বড় চেয়ারে বসা আবার চেয়ার ছেড়ে ছোট চেয়ারে যাওয়া আমার জন্য খুব অ্যামবারসিং হবে।

নাহিদ জোর খাটাল, আপনাকে বসতেই হবে স্যার। অ্যালান আমাকে বলে গেছে যদি তার আসা না হয়, তাহলে তো করপোরেট হেড কোয়ার্টার্সেই থাকবে। অন্য কারও পোস্টিং যাতে না হয়, সেটা ঠেকাবে। অ্যালানের সাথে আমার লাস্ট মোমেন্ট আলাপে বলেছে তার না ফেরার সম্ভাবনা নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট। অ্যালানের ফ্যামিলি লাইফ ভালো যাচ্ছে না।

এটুকু বলে নাহিদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কারই বা ভালো যাচ্ছে, আমিও তো কোনোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

নাহিদ হয়তো ভুল বলেনি। আমারটা তুলনামূলকভাবে ভালো বলা যায়। কারণ আমরা প্রায় এক যুগ একত্রে থাকছি না। ঢাকা থেকে অন্তত সাড়ে তেরো হাজার কিলোমিটার দূরে আটলান্টিক পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছাতে হয়। ছেলে ডাইভার্সিটি ভিসা পেয়ে আমেরিকা গেছে। নিজের অবস্থান পোক্ত করে, বাবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাকে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি তিনবার গিয়েছি মায়মুনার সাথে আসলে থাকা হয়নি। এই রাজ্য, সেই রাজ্য ঘুরে দিনের অনেকটা সময় গাড়িতে কাটিয়ে কখনো দুই সপ্তাহ, কখনো তিন সপ্তাহ পর ফিরে এসেছি। আমার আরেক ছেলে ড্রিঙ্ক ড্রাইভ করে ঢাকাতেই এয়ারপোর্ট রোডে রাস্তার মিডিয়ানে গাড়ি তুলে দিয়ে মারাত্মক জখম নিয়ে তিন দিন হাসপাতালে কাটিয়ে বিদায় নিয়েছে। সাথে এক গার্লফ্রেন্ডকেও নিয়ে গেছে। উত্তরার প্লট রাজউকের লটারিতে পেয়েছি। ডেভেলপারকে না দিয়ে নিজেই করতে চেষ্টা করে ভুল করেছি। তিনতলার অর্ধেক করে থমকে গেছি, আর এগোতে পারছি না।

নাহিদ আমাকে সিইওর চেয়ারে বসালোই। পরবর্তী এক দেড়-ঘণ্টার মধ্যে আমার পুরনো রুমের চেয়ার-টেবিল শেলফ ছাড়া প্রায় সবই এখানে স্থানান্তরিত করল। আমি বুঝতে পারি নাহিদের ইশারাতেই অফিসের লোকজন আমাকে অভিনন্দন জানাল, পুষ্পস্তবক দিয়ে গেল। আমাদের পাবলিক রিলেশনস অফিসার প্রেস রিলিজ বানিয়ে নিয়ে এলো। বলল, তার কাছে আমার ভালো কোনো ছবি নেই। ভালো ছবি মানে আমাকে এখন যেমন দেখায় সেটা নয়, বছর কুড়ি আগে যেমন দেখাত সে ধরনের ছবি। কিছুটা কুঁচকে যাওয়া কপাল ছবিতে ফুটে ওঠায় বলল, রিটাচ করতে হবে, ইমপ্রোভাইজেশন লাগবে। কিন্তু তাতে কী লাভ?

নাহিদ এখন আমার সহকারী।

নাহিদ বলল, এটাই নিয়ম। সহকারীকে ব্যক্তিগত সব বিষয় জানাতে হয়। আপনি নিয়মিত কোন কোন ওষুধ কখন কখন খান, এটা আমাকে জানাতে হবে। ওষুধ খাবার কথা আমাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

আমি বাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ খাই, রক্ত পাতলা করার ওষুধ খাই, কিডনিকে চালু রাখার ওষুধ খাই, পোস্টেট গান্ড বড় হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এটা সামাল দিতে ওষুধ খাই। রাতে খাবার পর একবার খাই, সকালে নাশতার পর কয়েকটা খেতে হয়। একটা ভালো দিক আছে, আমি ডায়াবেটিক নই। মিষ্টি আর ঝাল দুই-ই খেতে পারি এবং খাইও।

পরের ছয় মাসে আমি পুরোপুরি নাহিদনির্ভর হয়ে পড়ি। নাহিদ শুধু আমার ব্যক্তিগত বিষয় শোনে এমন নয়, তার ব্যক্তিগত বহু বিষয় আমিও জেনে গেছি। কেবল সে নয়, আমিও যে তার ব্যক্তিগত সহকারী হয়ে পড়েছি।

নাহিদ বলেছে, ছেলেটা তার জন্য সার্বক্ষণিক যাতনার কারণ। ঠিক ছেলেটি নয়, তার কোঁকড়া চুল। তার হাজব্যান্ড সন্দেহ করে ছেলে তার নয়, অন্য কারও। সে কে তার নাম না বললে তাকে পয়েন্ট ব্যাঙ্ক গুলি করে হত্যা করবে—এ কথাও বলেছে।

আমি বলি এক বাচ্চায় থেমে আছ কেন? আরও বাচ্চা নাও। দশ-পনেরো বছর পর চাইলেও তো বাচ্চা নিতে পারবে না।

নাহিদ বলে, আসলে ওর সাথে শুতে আমার ইচ্ছে করে না, হয়তো আমার সাথে শুতে তারও ইচ্ছে করে না।

আমি বলি, শরীরের দাবিটা উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

নাহিদ বলে, হয়তো কখনো কখনো তা মেটানো হয়। আমি সতর্ক থাকি, ডেঞ্জার পিরিয়ডে এগোই না, সে এগোলে আমি সরে যাই।

এসব আলাপ করতে করতেই আমার নির্মাণাধীন বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাই। আধঘণ্টার মধ্যে আমার ঘরের চেহারা বদলে দেয়। অন্ধকার গুমোট ভাবটা কেটে গেছে, বেশ আলোকিত মনে হচ্ছে বেডরুম। নিজেই বিড় বিড় করে বলল, আমাকে সপ্তাহে এক দিন আসতেই হবে।

আমি অর্থনীতির ডিপেন্ডেন্সি থিওরি পড়েছি, কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বকথার ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছি। ঋণের আসল টাকা পরিশোধের পরও, আফ্রিকা কেমন করে পশ্চিমের কাছে সুদের বিলিয়ন ডলার ঋণী সে ব্যাখ্যা পাঠ করেছি, শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী পদ্ধতির পাকে বাঁধা পড়ে প্রান্তিক দেশগুলোর কেমন নাভিশ্বাস উঠেছে, তাও দেখছি।

আমার নাভিশ্বাস ওঠেনি এখনো, কিন্তু আমি ক্রমেই নাহিদের ওপর ডিপেনডেন্ট হয়ে পড়ছি। আমিই ফোন করে বলেছি আমার প্রেশারের ওষুধ পাচ্ছি না, আমার পাসপোর্ট তো ব্রিফকেসে ছিল, দেখছি না কেন? আমার ভিসা কার্ড কোথায়?

নাহিদ বলেছে, চিন্তা করবেন না, সবই আছে। আমি বের করে দেব। সত্যিই বের করে দেয়। পাসপোর্ট ব্রিফকেসে ছিল না, ছিল অফিসের ড্রয়ারে আর প্রেশারের ওষুধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভিসা কার্ড মানি ব্যাগেই ছিল।

বাড়ির বিদ্যুতের বিল দিতে দেরি করে ফেলেছি, সারচার্জ দিতে হয়েছে। আমার প্রতিটি ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে নাহিদ আমার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা হরণ করতে থাকে।

নাহিদ ওষুধ কেনার দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

নাহিদ ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্বও নেয়। দূরে থাকলে মনে করিয়ে দেবার দায়িত্ব তারই।

নাহিদ আমার পাসপোর্টের পাতা উল্টে চেঁচিয়ে ওঠে, ওহ মাই গড, পাসপোর্ট তো এক মাস আগেই ইনভ্যালিড হয়ে গেছে। রিনিউ করাতে হবে।

নাহিদ আমার পাসপোর্টের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। আমার ফরেন কারেন্সির ছোট স্টকটা নতুন করে গুনে একটা খামে ঢুকিয়ে ওপরে পরিমাণটা লিখে রাখে।

নাহিদ ছেলেকে নিয়ে বাসায় আসে। অরূপ তার নাম, মাথায় সুন্দর কোঁকড়া চুল। মানে হচ্ছে বেশ লম্বা হবে। আমিও তার চুলে হাত দিয়ে বলি কেমন করে এত সুন্দর কার্লি হেয়ার করলে? আমারটা করে দিতে পারবে?

অরূপ বলল, কার্লি চুলের বেবি হলেই বড় হলে চুল কার্লি থাকে। তুমি কি জাস্টিন টিম্বারলেককে চেনো? তার চুল ব্লন্ড কার্লি।

আমি জাস্টিন টিম্বারলেকের নামও শুনিনি।

তুমি তার গান শোনোনি? আচ্ছা বলো তো দেখি, বব ডিলানের কি কার্লি হেয়ার?

আমি বব ডিলানের নামটা শুনেছি, কিন্তু তার চুল কার্লি কি না, জানি না।

নাহিদ বলে, আমার ছেলের চুল অনেক সুন্দর তাই না?

আমি বলি, অফকোর্স। তোমার ছেলে কি গায়ক হবে?

অরূপই উত্তর দেয়, আমি তো এখনো অনেক ছোট। আমার শুধু একটা মাউথ অর্গান আছে। মা প্রমিজ করেছে আমি যখন স্ট্যান্ডার্ড সিক্সে পড়ব, তখন একটা গিটার কিনে দেবে। কিন্তু হাওয়াইয়ান গিটার না, স্প্যানিশ।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম আর তবলা-ডুগি ছাড়া আমি কিছুই চিনি না। কোনটা সেতার আর কোনটা সরোদ বলতে পারব না।

আমরা যখন কথা বলছি, নাহিদ কিচেনে একটা কিছু করছে। এক প্লেট চিকেন নাগেট নিয়ে এসে বলল, এটা আমার ছেলের প্রিয় খাবার, কিন্তু আমরা সবাই শেয়ার করব।
অরূপ বলে, নো প্রবলেম।
নাহিদ আমাকে হঠাৎ ধমকে উঠে বলে, বাথরুম স্যাঁতসেঁতে কেন। একবার পিছলা খেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না।
আমি কী খাব, এটাও তার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।
বাড়ির কর্তৃত্ব এত দিন ছিল আবু নছর নামের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের হাতে। মায়মুনার দিককার আত্মীয় তার রাজ্যে নাহিদের হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করল না। নাহিদ তার বাজারের হিসাব পরীক্ষা করে দেখল জিনিসপত্র কেনাকাটায় দাম একটু বাড়িয়ে লিখে, এটা ক্ষমা করে দেওয়া যায়। কিন্তু খরচের যোগফলে অন্তত এক হাজার বেশি লেখে। দোতলার দুই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়ার নগদ টাকাটা কখনো কখনো পাশের একটা ব্যাংকে আমার একটা অ্যাকাউন্টে জমা দিতে নসরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। অ্যাকাউন্ট অনেক পুরনো। তখন যে ফোন নম্বর ছিল তা আর ব্যবহার করি না। ফলে টাকা যে জমা হয়েছে, সেই মেসেজও পাই না। জমা রিসিট দেখে নাহিদ সন্দেহ করল, ছবি তুলে ব্যাংকে পাঠাল। জবাব পেল টাকা জমা হয়নি। বলল, আবু নসরকে জেলে দেওয়া দরকার।
সেদিন রাতেই নসর রুমে ঢুকে ক্ষিপ্তস্বরে বলল, বেটি মানুষের অধীনে আমি চাকরি করি না। নিজের মান-সম্মানটা বড় কথা। সম্মান থাকতে বিদায় নিচ্ছি, তবে শুনে রাখেন, এই বেটি আপনাকে গিলে খাবে।
আমি নসরের ছোট ছোট চুরি টের পাচ্ছিলাম, কিন্তু মায়মুনার আত্মীয় বলে আসতে নিষেধ করতে পারছিলাম না। নিজে থেকেই যাচ্ছে, যাক।
আমার মনে হচ্ছিল নসর আমেরিকায় ফোন করে মায়মুনাকে নালিশ জানাবে। মায়মুনা আমাকে বলবে, বাড়িতে নাকি আজকাল মেয়ে মানুষ আসছে? নসর থাকলে অসুবিধে হয় তাই না?
কিন্তু পরবর্তী তিন মাসেও সে রকম কোনো ফোন আসেনি। ওদিকে ব্যাংকের একজন অফিসার এসে হাজির। বলল, এ ধরনের আরও চারটা জমা স্লিপ তারা পেয়েছে, একই অভিযোগ। সিলটা ব্যাংকের, সইটাও আমাদের একজনের বলে সন্দেহ করছি। ব্যাংকের বদনাম এড়াতে আমরাই মামলাটা করব, শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। আপনার টাকাটা যে জমা দিত তার পার্টিকুলার্স দয়া করে দেবেন।
আমি বলি, যা হবার হয়েছে। থাক, বেচারা নসরেরও একটা সংসার আছে।
কিন্তু তার নাম-ঠিকানা আমাকে দিয়ে লেখালেন এবং সই নিলেন। এক মাসের মধ্যে আবু নসর গ্রেপ্তার হলো। পুলিশের মার খেয়ে অপরাধ স্বীকার করল। ব্যাংকের কাউসার হামিদের সাথে ফিফটি ফিফটি ভাগ করে টাকা নিয়েছে, রিসিট ব্যাংকারই বানিয়ে দিয়েছে। আমিই নাহিদকে বললাম, বড় কিছু ঘটার আগে ভাগ্যিস তুমি ধরে ফেলেছ। নতুবা হয়তো দলিল বানিয়ে সত্যিই আমার সই নিয়ে এই বাড়িটাই দখল করে নিয়ে আমাকে বের করে দিত।
নাহিদ বলল, নসর ছিঁচকে নেচারের চোর এত বড়টার সাহস পেত না।
নাহিদের যত্নে আমি অভিভূত ছিলাম। নাহিদ অবলীলায় বলে গেল নিজের কথা, মায়ের সংগ্রামী জীবনের কথা, বাবার পালিয়ে যাবার কথা। খনি প্রকৌশলী যে কদিন বাড়ির বাইরে থাকে, সে কটা দিনই তার ভালো কাটে, তার বাড়িতে থাকা দিনগুলোতে নির্যাতনের শিকার হয়, কোঁকড়া চুল নিয়ে আজেবাজে কথা বলে। বাসায় যতক্ষণ থাকে মদের ওপরই থাকে, খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে ঘুর ঘুর করে দু-একবার মারও খেয়েছে, নাহিদ একবার এমন ধাক্কা মেরেছে যে বেসামাল শরীর নিয়ে ওয়ার্ডরোবের ওপর ছিটকে পড়ে। কপালের কাছে কেটেও যায়। কতক্ষণ থ হয়ে চেয়ে থাকে, নাহিদ তাকে পাল্টা আঘাত করতে পারবে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ডেটল তুলো নিয়ে নাহিদ এগিয়ে যায়, চেপে ধরে রাখে। রক্ত বন্ধ হয়। দুটো প্যারাসিটামাল খাইয়ে দেয়। পরদিনই তাকে কুতুবদিয়া যেতে হয়, ডিপ সিতে তেল পাবার সম্ভাবনার সমীক্ষা চালাবে।
আমি অফিসেই ছিলাম। হঠাৎ একটু ঝিমুনি লাগতেই চোখটা বন্ধ করে চেয়ারে মাথাটা ঠেস দিয়ে রাখি। দু-এক মিনিটের মধ্যে শরীরের ভেতর জ্বলুনি শুরু হয়, মনে হয় আগুনের হলকা পায়ের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠছে। আমার কী হচ্ছে এমন একটা চিৎকার দিয়ে আমি চেয়ার থেকে পিছলে মেঝেতে পড়ে যাই। এরপর যখন জ্ঞান ফেরে, আমি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে।
ছয় দিন পর ফিরে যাই। পনেরো দিনের জন্য চুপচাপ শোয়া-বসা ছাড়া আর কিছু করতে পারব না, এটাই নির্দেশ। যেটা জানতে পারি, আমার হার্ট অ্যাটাক করেছিল। দুটো রিং পরিয়ে আমাকে আইসিইউ থেকে বের করা হয়েছে। অপারেশনের আগে ডাক্তারদের দায়মুক্ত করে কাগজে সই করতে হয়। আমার ক্ষেত্রে স্ত্রী বা সন্তান সেটা করতে পারত। সই করেছে নাহিদ নিশতার জাহান। কী হিসেবে করেছে, আমি জানি না।
ইন্টারকমে নাহিদ আমাকে একটি ওষুধ খাবার কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল। বারবার ফোন করার পরও না ধরায় রুমে এসে দেখে চেয়ারে আমি নেই। হঠাৎ নিচের দিকে চোখে পড়ে প্যান্ট পরা এক জোড়া পা। তারপর যা যা করার নাহিদই করেছে। তখন থেকে পরবর্তী পনেরো দিন আমি চোখ খুললেই নাহিদকে পেয়েছি। একদিন কোঁকড়া চুলের ছেলেটাকেও দেখেছি।
আমি ষোলোতম দিনে অফিস করার সিদ্ধান্ত নিই। আধবেলা অফিস করব। পুরো বিষয়টা নাহিদ ফোনে হেড অফিসকে জানিয়ে রেখেছে। অফিস ভালোই চলেছে। ঢিলেঢালাভাব আসতে পারত, আসেনি। কারণ যাদের ফাঁকির প্রবণতা ছিল তারা নাহিদকে সিইও-ও স্পাই বিবেচনা করত। ফলে অফিসের সময় নাহিদের উপস্থিতি সিইওর উপস্থিতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
আরও এক মাস কেটে যায়। নাহিদের ওপর আমার নির্ভরতা এতটাই বেড়েছে যে এক কাপ চা খাব কি না, তাও জিজ্ঞেস করি। এই বিপন্ন দশায় একদিন ছেলের ফোন পাই। শুরুতেই বলল, বাবা, তুমি এসব কী আরম্ভ করে দিলে? আমেরিকায় আসতে না চাও তো বেশ, বাংলাদেশেও সম্মানজনক জীবন যাপন করা যায়।
আমি জিজ্ঞেস করি, মানে?
ছেলে বলে, মানে আর তোমাকে কীভাবে বোঝাব? কোনো একটা বাজে মেয়েকে বাসায় ঢোকানোর জন্য নসর মামুর মতো একজন বিশ্বস্ত মানুষকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ। আবার সেই মেয়ের কথায় তুমি তাকে জেলে ঢুকিয়েছে, যাতে আর ফিরতে না পারে। তুমি কী মনে করো বাবা? আমরা আমেরিকায় থাকি বলে কি বাংলাদেশের কোনো খবরই রাখি না! এসব ছাড়ো বাবা, ভালো হয়ে যাও।
আমি খুব ঠান্ডা মাথায় বলি, থ্যাঙ্ক ইউ বাবা। কষ্ট করে অনেক দিন পর ফোন করেছিস, কী বলেছিস সেটা নয়, আমি যে তোর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি, এটাই আমার জন্য হাজার।
আমি ফোন রাখিনি, ছেলেই রেখে দেয়।
মন খারাপ হয়ে যায়। জীবনে যা আয় করেছি তার অর্ধেকের বেশি খরচ করেছি তাকে দাঁড় করাতে। এখন মনে হচ্ছে ছেলে আমার ভালোই দাঁড়িয়েছে। আগে নিউইয়র্কে ক্যাব চালাত, এখন বার্গারের দোকান দিয়েছে। ভালোই করছে। এর হাতে কিছু, ওর হাতে কিছু, হুন্ডি করে কিছু ডলার দুই বছর আগেও পাঠিয়েছি। একসময় বলেছি আর পারছি না। আমার নিজের চিকিৎসার জন্য বুড়ো বয়সে চলার জন্য কিছু টাকা তো হাতে রাখতে হবে।
ছেলে বলল, হু কেয়ার্স ফর ইউর মানি? তোমার টাকার জন্য আমার বয়েই গেছে।
এটা সত্যি, এ কথা বলার পর আর টাকা চায়নি।
***
সাড়ে তিনটা বেজে গেছে, চারটায় বেরোব।
সকালের পর নাহিদকে আর দেখিনি। অন্যদিন এতক্ষণে তিন-চার বার ঢুঁ দেয়। ফাইল সই করাতে নিয়ে আসে। আমি ইন্টারকম তুলে নিই, ফোন বাজে, কেউ ধরে না।
ফোনে একটা খুদে বার্তা ঘণ্টা দুয়েক আগেই এসেছে, দেখিনি। নাহিদের মেসেজ, মাথা ব্যথা করছে। না বলে চলে যাচ্ছি। জরুরি তেমন কিছু নেই।

নাহিদ আমাকে না বলে যাচ্ছে!
তার মানে আমাকে উপেক্ষা করার মতো সক্ষমতা সে অর্জন করেছে। উপেক্ষাটা যৌবনে তেমন টের পাওয়া যায় না, বার্ধক্যে বেশ কষ্ট দেয়।
কিন্তু নাহিদই আমাকে বলেছে, মেনে নিতে শিখুন। মেনে নিলে ঝামেলা কমে যায়। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে কথাটা বলেছে, এখন আর মনে করতে পারছি না।
বেশ মেনে নিলাম।
পাঁচটার দিকে বেরোবার ঠিক আগমুহূর্তে ফোন করি নাহিদকেই। প্রথমবার ধরেনি। দ্বিতীয়বার অন্তত পাঁচবার রিং হবার পর ধরেই বলল, সরি, বলে আসিনি।
আমি বললাম, তোমাকে দেখতে আসছি, ড্রাইভার বাসা চেনে অসুবিধে হবে না।
নাহিদ বলল, আমার অসুবিধে হবে, আমার হাজব্যান্ড বাসায়।
বললাম, থাকুন তিনি, সমস্যা নেই। আমিও তো তার সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারি। এটা আমাদের বিজনেস প্রমোশনের অংশ। তুমি বলে রেখো, আমি আসছি। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাব।
না এলে ভালো হতো।
খারাপই হোক, তবু আসি।
আমি কিছু ফল কিনি, নাহিদের ছেলের জন্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব ফানি থিঙ্গস নামের একটা মোটাসোটা বই কিনি, এক প্যাকেট সিগার নিই তার হাজব্যান্ডের জন্য।
বেল টিপতে দরজা খোলেন, সেজেগুজে অপেক্ষা করা মানুষটি। আমাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিয়ের এত বছরে এই প্রথম খুকুর একজন বসকে দেখলাম।
খুকু!
ততক্ষণে নাহিদ এসে গেছে। বলল ও আমাকে সব সময় ইনম্যাচুরড ভাবে খোকা-খুকুদের মতোই, সে জন্য খুকু ডাকে।
ছেলেটা এসেই বইটা ছোঁ মেরে নিয়ে তার রুমে চলে গেল।
বললাম, কোন বস যদি তার লেডি কলিগের মঙ্গল কামনা করেন, তাহলে তার হাজব্যান্ডকে আর যা-ই হোক সিগার কখনো দেবেন না। কিন্তু আমি যে এক প্যাকেট হাভানা সিগার নিয়ে এসেছি।
তিনি বললেন, সো থটফুল অব ইউ। আমার কাছে হুইস্কি আছে শিভাস রিগাল এইটি ইয়ার ওল্ড। খুব ম্যাচ করবে। বসুন, এখনই আনছি। আমার কাছে বাউমোর টুয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড হুইস্কিও আছে।
খেতে পারলে ভালোই হতো কিন্তু আমার হার্ট মাত্র দুটো রিং পরেছে। একটু দম নিয়ে নিই।
নাহিদ জিজ্ঞেস করে স্যার কি আমার বিরুদ্ধে আমার হাজব্যান্ডের কাছে কোনো অভিযোগ করতে এসেছেন? মানে আজকাল কাজে ফাঁকি দিচ্ছি!
পুরোটা না হলেও খানিকটা তো সত্য। আজই তো তাই করলে।
স্যার, কার কাছে অভিযোগ দেবেন? আমার হাজব্যান্ড! তার কাজ ফাঁকি দেবার অজুহাত শুনুন। বলে হুইস্কি কম হয়েছে কাজের মুড আসছে না। আবার বলে হুইস্কি বেশি হয়েছে, হ্যাঙ্গওভার কাটতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা, তারপর গোসল করে ঘুম দিতে হবে। তার মানে যাবে না।
নাহিদ বলল, স্যার, আপনাকে কিছু খেতে দেব না। শুধু একটু অ্যাপ্রিকট জুস। আমি জানি, হার্ট পেশেন্টকে ডায়েটিং চার্ট মেনে খেতে হয়।
আমি বলি, আপনি তো শেলের গ্যাস আর তেল এক্সপ্লোরেশনে আছেন। আমি জানি আপনাদের লোকজন র‍্যাডিসনে উঠছে। আমাদের ফরেনার অকুপেন্সি রেট নেমে গেছে। জ্যাম একটা বড় কারণ। যদি আপনাদের কিছু লোক পাঠাতে পারতেন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় দিতে পারতাম।
আমার কথায় কোনো কাজ হবে না। হোটেল খরচ দেবে কোম্পানি তাহলে সেভ করে তাদের কী লাভ। তবুও খবর নেব। আমি কাল খুব ভোরই বেরোব। টুইন অটার অ্যাম্ফিবিয়ান প্লেনে কুতুবদিয়া যাব। আমরা ছয়জন। ওয়াটার ল্যান্ডিংটা বেশ মজার।
আমাদের কথা আর বেশি এগোয়নি। আমি অ্যাপ্রিকট জুস খেয়ে বেরিয়ে আসি। রাতে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে নাহিদ যথাসময়ে আমাকে ফোন করেনি। আমার মনে ছিল তবুও অভ্যাসবশত প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু মধ্যরাতে ফোন এলো। ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ওষুধ খেয়েছেন?
পরদিন শুক্রবার ছুটি। আমি বিছানা ছাড়তে চাচ্ছিলাম না, তবুও কলিং বেল উঠতে বাধ্য করল। নাহিদ বলল, কাল আমার ছেলে বারোটার দিকে ফোন দিয়ে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, প্রস্টিটিউট বলেছে। যদিও সেও তাকে কিছু বলতে ছাড়েনি; তবুও ফোনটা পাওয়ার পর থেকে মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং বাড়তে থাকে। অফিসের কেউ একজন তাদের স্পাই হিসেবে কাজ করছে। আমি কটায় আপনার রুমে যাই, কটায় বেরোই সব খবরই তারা পায়।
কাল সন্ধ্যায় আমি ফেরার পর খনি প্রকৌশলী নাহিদকে চেপে ধরে বলে, এর চুল ঠিক আছে। কোঁকড়া চুলেরটা কোথায়? তারপর চিৎকার করে গায়ে হাত তোলে, একটা সিগার পায়ে পিষে গুঁড়ো করে।
গতকাল আমাকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে সে কথার একটিই জবাব : নাহিদকে বিয়ে করা।
আমি নাহিদকে কাছে টানি এবং আমার বার্ধক্য যদি তার জন্য শরীরিক ও মানসিক বাধা হয়ে না দাঁড়ায় আমি তাকে বিয়ে করব, কোঁকড়া চুলের ছেলেকে অ্যাডপ্ট করব।
নাহিদ আমার আরও কাছে আসে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত মিষ্টি ঘ্রাণ পাই, একটু বেশি পরিমাণেই; মনে হয় হাত থেকে পড়ে একটা দামি পারফিউমের বোতল ভেঙে গেছে। দরজাটা ভেতর থেকে সে-ই লক করে। আমি বহু বছর আগের শিহরণ শরীরে ফিরে পাই।
নাহিদ আমাকে জড়িয়ে ধরে পাশে শোয় এবং সতর্ক করে দেয় হার্টে রিং পারছ মাত্র কদিন হয়েছে। আগে এটা স্ট্যাবল হোক। আমাকে কিছুক্ষণ আঁকড়ে থেকে নাহিদ উঠে যায়, দরজা খোলে। আমার শিহরন মিলিয়ে যায়। আমি ধরে নিই নাহিদ সম্মতি দিয়েছে। আমার সময় ও সুযোগমতো বিয়েটা করব। অফিসে আমাদের নৈকট্য কমিয়ে আনি।
আরও দুই মাস কেটে যায়। কোঁকড়া চুলের মানুষটাকে হাজির করতে তার হাজব্যান্ড সময় বেঁধে দেয় দুই মাস। এক সকালে জখম নিয়ে নাহিদ হাজির হয়। আমি বলে উঠি, মানুষ না জানোয়ার।
সেই সকালে নাহিদের সাথে আমার ব্যাপারটা ঘটে। পারব কি না, আমিই সন্দিহান ছিলাম। যতটা পেরেছি আমি সন্তুষ্ট। বোঝাপড়ার একটা ব্যাপার আছে। তাতে এসবের গুণগত মানও বাড়ে। দ্বিতীয়বার নাহিদের অংশগ্রহণ ব্যাপারটাকে আরও তৃপ্তিকর করে তোলে।
দ্বিতীয় মাসের শেষ দিকে নাহিদ জানায় তার হাজব্যান্ডকে প্যাথলজি সেন্টারে পাঠিয়ে নিজের ইউরিন টেস্ট করিয়ে এনেছে। রেজাল্ট পজিটিভ। সম্ভবত খুশিতেই সে মিষ্টি ফল আর ফল নিয়ে বাসায় ফিরেছে।
একেক দিন তার আনন্দ প্রকাশের এক একটি ঘটনা শোনাচ্ছে। তার বাড়তি যত্ন নিচ্ছে, অফিস থেকে ছুটি নিতে বলেছে, বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। নাহিদ গর্ভাবস্থার তৃতীয় মাসে তিন সপ্তাহ ছুটি কাটিয়েছে। তার অনুপস্থিতির সময় আবদুর রব মুন্সি নামের একজন সিইওকে সহায়তা করছে।
গর্ভধারণ করা এবং সন্তান প্রসব করা এই সময়ের মধ্যে মাত্র একবারই এসেছিল। আমাকে বলে গেছে থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কাইন্ড গিফট। বাচ্চাটা ওকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে, হুইস্কি খাওয়া কমিয়েছে, আমার সেবাযত্ন করছে, কোঁকড়া চুলের ছেলের সাথে বসে মনোপলি খেলছে। না বলতেই টাকা দিচ্ছে। নাহিদকে দেওয়া আমার প্রস্তাবটা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে যায়।
বাচ্চা হবার পর তার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়, চুল মোটেও কোঁকড়া নয়, এবার আর সন্দেহের কারণ নেই।
আমি উপেক্ষাটাকে মেনে নিতে চেষ্টা করছি। যে কারণেই হোক নাহিদ যে আগের চেয়ে ভালো আছে, এটা তো আমার জন্য খুশির খবরই হবার কথা।
আমার রিটায়ারমেন্টের তারিখ এসে যায়। তার আগেই ঢাকায় এসে যোগ দেয় র‍্যায়মন্ড আন্ডারউড জুনিয়র। প্যান প্যাসিফিকের ব্যবসা

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
www.pubalibangla.com
63 Years in Banking 1959 - 2022

"পূবালী ব্যাংকে সঞ্চয় করুন
নিরাপদে থাকুন"

সর্বাধিক শাখা । সর্ববৃহৎ অনলাইন নেটওয়ার্ক
সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি । সর্বাধুনিক তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ফ্রি অনলাইন । ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং । ফ্রি ইজিপি

- অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, সমৃদ্ধ মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার যথার্থ পরিপালন।
- ডাবল এ প্লাস (**AA+**) ক্রেডিট রেটিং।

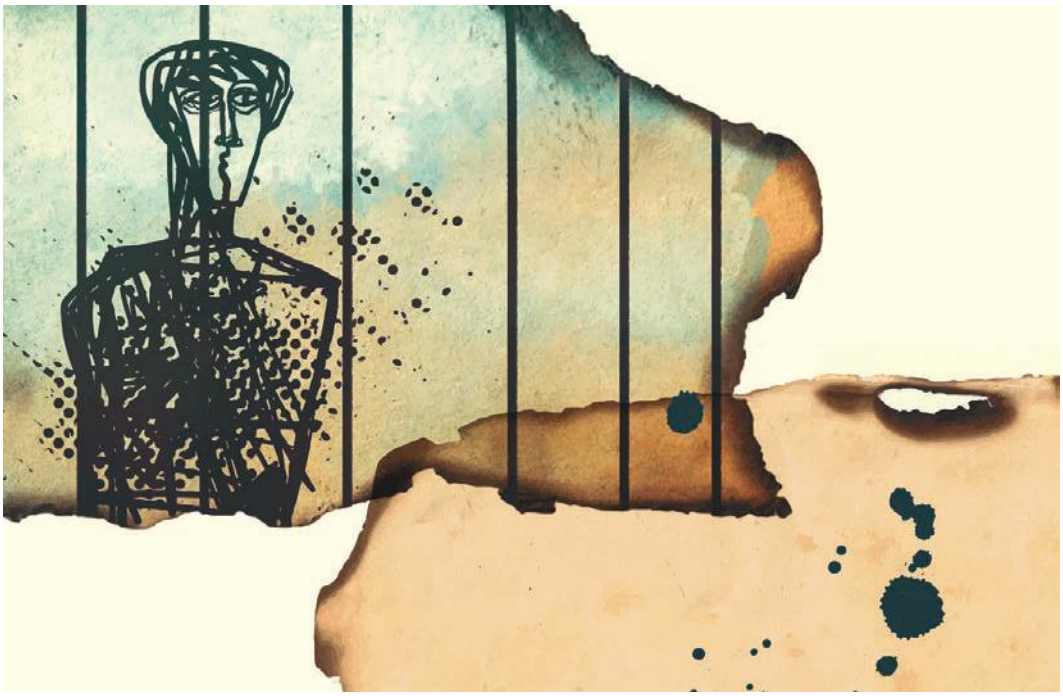

খারাপ। হেডকেয়ার্টার্স থেকে ফর্টি পার্সেন্ট জব কাটের নির্দেশ আসে। রিডানডেন্সি বেনেফিট নিয়ে নাহিদ ঘরে ফেরে। বাচ্চা বড় হোক, এখন আর চাকরি করবে না। তা ছাড়া তার হাজব্যান্ডের বাইপোলার ডিজঅর্ডার শনাক্ত হয়েছে। দুই মাস ভালো তো এক মাস নিজেকে পুরো গৃহবন্দী করে রাখছে। কোনো সহিংসতা নেই, তবুও সময়মতো ওষুধটা তো খাওয়াতে হবে।

আমার রোগটার নাম অস্টিওনেক্রোসিস, আরও আগেই হতে পারত। দুই পায়ে হাঁটুর ওপর বড় ও লম্বা যে দুটি হাড় একদিকে হিপ ও অন্যদিকে হাঁটুকে ধরে রাখছে, দুই প্রান্তে রক্ত সরবরাহ কমে গেছে। হাতের বাহুর হাড়েও একই অবস্থা। চিকিৎসা চলছে, কিন্তু আমি জেনে গেছি সেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। তীব্র ব্যথা হয়। মনে হয় হাড় ভেঙে পড়বে। দিনের একটা বড় সময় কাটে হুইলচেয়ারে।

নাহিদ মাসে অন্তত দুবার আসে। মন ভালো থাকলে কথা বলি, মেজাজ খারাপও থাকে। দুর্ব্যবহারও করি। সে মেনে নিতে জানে।

নাহিদ ছোটটার নাম রেখেছে অপরূপ। আমি বলেছি একদিন নিয়ে এসো দেখি। নাহিদ বলেছে, ওটা তো গিফট। গিফট ফেরত দেওয়া হয় না। ওর হাজব্যান্ড জানে এটা তার সন্তান, এটা কার্লি হেয়ার বেবি নয়।

আমিও তো কার্লি হেয়ার কেউ নই। তিনি এমন অন্যদের কেন সন্দেহ করছেন না? এটা ঠিক নয়।

(তিন)

ইয়াবার চালানে বিস্ময়কর লাভ আমার সরকারি দলের টেলিভিশন চ্যানেলের পার্টনার সহ্য করতে পারছিলেন না। আমি তাকে পার্টনারশিপে আমন্ত্রণ জানালাম, কিন্তু তাতেও সাড়া দিলেন না। তার চাওয়া আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারলে চ্যানেলটার পুরো মালিকানা তারই হয়ে যাবে। সুতরাং কয়েক লাখ টাকা খরচ করে মামলাটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আমাকে কুয়ালালামপুরগামী উড়োজাহাজ থেকে নামিয়ে আনালেন।

আমাকে নিয়ে হরেক রকম দর-কষাকষি চলল, আমাকে আদালতেও চালান দেওয়া হলো না। এমনকি গুম করে ফেললে বিষয়টা আলোচনায় আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু উড়োজাহাজ থেকে ধরে আনা মানুষকে গুম করে রাখা খুব সহজ নয়। খবরের কাগজে সংবাদ হয়ে গেল, উড়োজাহাজের সেই চোরাচালানি গেল কোথায়?

আমাকে আদালতে আনা হলো এবং সত্য উদঘাটনের জন্য সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়া হলো। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমার ভাই, ক্রসফায়ার দেখিয়ে আমাকে খরচ দেখিয়ে দাও। কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের। আমার জন্য মামলা করার মতো কেউ নেই।

সত্যিটাই বলতে হবে, আমি যথেষ্ট খরচ করেছি। আমাকে মারধর করেনি, ফ্যানে পা বেঁধে ঘোরায়নি, আঙুলে সুচবিদ্ধ করেনি, পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে গরম ডিম প্রবিষ্ট করায়নি। আমি মন্ত্রীর মর্যাদার হলে হয়তো করাত।

আমার পেছনে কে লেগে আছেন তা স্পষ্ট। সুতরাং বলে দিলাম পার্টনারের নাম, তিনি আমার ইয়াবা ব্যবসায়েরও পার্টনার কিন্তু রাজনীতি করেন বলে নিজের নামটা আড়ালে রাখতে চান। আগের চালানের সব টাকা নিয়েছেন। এই চালানের সব আমার হবার কথা ছিল, কিন্তু তা হলো না।

তিনি গ্রেপ্তার হচ্ছেন না দেখে খবরের কাগজ লিখল, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় মূল আসামি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছেন, টেলিভিশন চালাচ্ছেন, জুনিয়ার পার্টনার রিমান্ডে। শেষ পর্যন্ত তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। কিছু দিন পর অদৃশ্য হস্তক্ষেপে আমাদের দুজনের জামিন হয়ে গেল। হলফ করে বলতে পারি, এ জন্য আমি এক পয়সাও খরচ করিনি। যেহেতু তাকে জামিন পেতেই হবে, আমি মাঝখান থেকে ফাও পেয়ে গেছি।

***

এর মধ্যে তেরোতলায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে কার্পেটের ওপর নারীর প্রায় পচন ধরা মৃতদেহ। প্রথম দিনের সংবাদ স্বামী পলাতক। দ্বিতীয় দিনের সংবাদ চোরাচালানি ও খুনি একই ব্যক্তি, তৃতীয় দিনের সংবাদ ইয়াবার টাকার ভাগ নিতে তেরোতলার অ্যাপার্টমেন্টে হামলা, বাধাদানকারী গৃহবধূ নিহত। চতুর্থ দিন লেখা হলো, কল্যাণীর প্রকৃত হত্যাকারী কে? স্বামী আগে থেকেই পুলিশ হেফাজতে। নিহত নারীর পাশে একটি পিস্তল পাওয়া যায়। এটি আত্মহত্যা নয় তো? আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যখন এই পিস্তলের মালিকের নাম জানা যায়। মালিক অবশ্যই শরফুল নয়, মালিক তার জনতা টিভির ব্যবসায়িক পার্টনার ।

এখানেও পুলিশকে আমার বক্তব্য : ধরা পড়া চালানের আগাম

টাকা বাড়িতে রেখেছিলাম, আমি তো ইয়াবা মামলায় ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে আগেই পালিয়েছিলাম এবং বিদেশ চলে যাচ্ছিলাম। আমার টাকা কোথায় এ-সম্পর্কে আমার পার্টনারের ধারণা থাকতে পারে। হয়তো আমার স্ত্রী কল্যাণী বাধা দিয়েছে, সে জন্য এই পরিণতি। পার্টির সম্মান বাঁচাতে কয়েকটি কমিটির প্রধান কিংবা উপপ্রধানের পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। আমাদের টাওয়ারে বসবাসকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বশিরুল হক অতি উৎসাহী হয়ে হত্যার রহস্য ভেদ করার কাজে লেগে যান। গেটের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখান আমার পার্টনার বা অন্য অপরিচিত কেউ ভবনে আসেননি; বরং সকালে ট্রলিব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছে কাজি শরফুল আলম। আরও একটি বিষয় সামনে আসে জমাট রক্তের ওপর একটি জুতোর ছাপ। ছাপের ধরন এবং আমার পায়ের জুতোর তলদেশের মিল পায় ফরেনসিক বিশ্লেষক। একসময় আমার পার্টনার জামিন পেলেও আমি বেরোবার আর সুযোগ পাইনি।

আমার শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, আপিল খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে, আমি ছাড়া পাইনি।

আমার কারাবাসের পঞ্চম বছর কুমিল্লা কারাগারে বোরকা পরে আমাকে দেখতে আসে নাহিদ নিশতার জাহান। আমাকে বলে ছেলেটার চুল কোঁকড়া, এ জন্য সাজ্জাদের লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। আমি খুব পুলকিত হই। আমার সন্তানকে কি একবারও দেখতে পাব না। নাহিদ প্রতিজ্ঞা করে আমাকে দেখাবে। নাহিদ দুটো চেক আমার সামনে তুলে ধরে। একটি পাঁচ লাখ টাকা, একটি কেবল ব্লাঙ্ক।

আমি জিজ্ঞেস করি, টাকা তোলোনি কেন?

নাহিদ বলেছে, আমি তো তোমার কাছে টাকা চাইনি, বাচ্চা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

অনেক বছর পর নাহিদ আসে। যতটুকু দেখা যায় দূর থেকে কোঁকড়া চুলের লম্বা ছেলেটিকে দেখে আমি পিছিয়ে যাই। একটি ছেঁড়া গামছা দিয়ে আমার কোঁকড়া চুল বেঁধে সামনে আসি। কোনো কথা হয়নি নাহিদের সাথে। মাথা নুইয়ে জানালার তলা দিয়ে ঢোকানো ছেলের হাতে শুধু কয়েকটি চুমু খেয়েছি।

ছেলে ভালো থাকুক। নাহিদও ভালো থাকুক।

(চার)

অপরূপের জন্ম আশীর্বাদ হয়ে এলো। সাজ্জাদ তার চুলের সাথে নিজের চুল মিলিয়ে বলে, দেখলে হুবহু আমার মতো। আমার লাঞ্ছিত হওয়া অনেকটাই কমল, সাজ্জাদের হুইস্কিও নেশাও নিয়ন্ত্রিত হলো, কিন্তু দেখা দিল বাইপোলার ডিজঅর্ডার। নিজে বিদেশি তেল কোম্পানিতে কাজ করে কিন্তু বলে বেড়াতে শুরু করল দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে জেনেশুনে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের তেল-গ্যাস সবই। দেশটাকে নাইজেরিয়া বানিয়ে ফেলছে।

নাইজেরিয়া সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তেল-গ্যাস সম্পর্কেও না। তার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি একবার প্রকল্প গুটিয়ে নেওয়ায় বড় ধরনের রিডানডেন্সি-ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে বিদায় করেছে। এই কোম্পানিরই একটি সাবসিডিয়ারি আবার কাজ পেয়েছে সাজ্জাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। বেতন-ভাতার দরকষাকষির বৈঠক হবে কক্সবাজার। কোম্পানি বলল, কাজ এগিয়ে রাখি, এখানে সময় নষ্ট না করে কুতুবদিয়ার কাছাকাছি ডিপ সি-তে আমাদের এক্সপ্লোরেশন জাহাজে চলো। খাবে, ড্রিংক করবে, বেতন ঠিক করবে, আমাদের কমান্ড এরিয়ায় একটা চক্করও মারবে। সাজ্জাদের সাথে তার কাজের ও বোতলের বন্ধু মশিউরও ছিল। বাকিটা শুনেছি মশিউর ভাইয়ের কাছে।

অন্যবারের মতো এবার সাজ্জাদ অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট টাইপের আচরণ করল না, গভীর সমুদ্রে কোম্পানির কর্মকর্তাদের সাথে ঝগড়া লাগিয়ে বলল, তোমরা আমাদের করাপ্ট অফিশিয়ালদের মুখে ললিপপ ঢুকিয়ে বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেবে, তা হবে না। সে নিজের জন্য বেতন চাইল আগের ডাবল দ্য অ্যামাউন্ট। তারা নীতিগতভাবে রাজি হলো। তারপরও বলল, এত দিন দেশকে ব্রিটে করেছি আর নয়। গুস্তাফ, ওদের ম্যানেজার বলল, সাজ্জাদ আরও দু-চার পেগ হুইস্কি মেরে দাও মাথা খুলে যাবে। তখন যা বলার বলো। মশিউর বলল, আকাশটা অন্ধকার ছিল। রেলিংয়ের পাশে গুস্তাফ, এমানুয়েল এনদেঙ্গো আর আমি, সাজ্জাদ তো ছিলই। নতুন একটা বোতল খোলা হলো। সাজ্জাদ বলল, চলো, সমুদ্রদেবী নিম্ফ-এর নামে টোস্ট করি। তারপর এক হাতে গ্লাস অন্য হাতে বোতল নিয়ে আমাদের চোখের সামনে সাজ্জাদ অন্ধকার সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল।

এ অংশটাতে হাঙরের দ্রুতগতি সাঁতার দেখা যায়। সাজ্জাদকে নিশ্চিহ্ন করতে তাদের বেশি সময় লাগার কথা নয়।

আমি সাজ্জাদের খবরটা দিতেই গেলাম। আমার সাবেক সিইও রেফায়েত উল্লাহ আমাকে ভুল বুঝলেন। বললেন, আমার দিন শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে বিয়ের কথা ভেবেছিলাম। বলেছিলাম, রাজি হওনি। এখন বলেও লাভ নেই। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, গেট আউট।

(পাঁচ)

অ্যালান টার্নার পর্বের শুরু

আমি যেদিন ঢাকা ছেড়ে আসি, আমাকে সি অফ করতে নাহিদ এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসেছিল। হাসতে হাসতে বললেও আমি মনের কথাটিই বলেছিলাম, তোমার মতো একটা রসিক মেয়ে আমার বউ হলে ভালো হতো।

নাহিদ বলল, বউ হলে যে আর কেউই আগের মতো ভালো থাকে না। তবুও ঝগড়া যদি রসাল হয়, এনজয় করা যায়।

নাহিদের সাথে আমার যোগাযোগটা অব্যাহত ছিল।

সর্বশেষ যে জোকটা আমাকে পাঠিয়েছে সেটা বলি :

অফিসের বস লাঞ্চের পর বেরিয়ে গেল, বলল আর আসবে না।

ফ্রেঞ্চ কর্মচারী একটু আয়েশ করে ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে চলে গেল।

চাইনিজ কর্মচারী একটু কুংফু কারাতে প্র্যাকটিস করতে জিমনেশিয়ামে গেল।

স্প্যানিশ কর্মচারী ষাঁড়ের লড়াই দেখতে স্টেডিয়ামে ঢুকল।

ইংলিশ কর্মচারী ঠিক করল বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে একটা চুমো খেয়ে ফিরে আসবে।

দরজা খুলে একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। বস এবং তার স্ত্রী দুজন দিগম্বর ও অন্তরঙ্গ অবস্থায়। বস তাকে দেখার আগে ইংরেজ দ্রুত বেরিয়ে এসে দৌড়াতে দৌড়াতে অফিসে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল।

দুদিন পর একই সময় বস বললেন, বিকেলে আর আসছি না।

তিনজন এসে ইংরেজ সহকর্মীকে বলল, চলো, এক রাউন্ড ঘুরে আসি।

ইংলিশ কর্মচারী বলল, অসম্ভব। সেদিন আর একটু হলেই বসের কাছে ধরা পড়ে যেতাম যে আমি অফিস ফাঁকি দিয়েছি।

কদিন আগে নাহিদ জানিয়েছে তার হাজব্যান্ড সাজ্জাদ বঙ্গোপসাগরে হাঙরের ডিনারে পরিণত হয়েছে।

তার কার্লি হেয়ার সন্তানের বাবা সেন্ট্রাল জেলে লাইফ টার্ম খাটছে। আর সোজা চুলের ছোট ছেলের বাবা মৃত্যুর দিন গুনছে এবং তাকে বলেছে গেট আউট। সুতরাং বাংলাদেশে তার আর কোনো বন্ধন নেই।

আমি শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির অর্ধেক ও আমার সন্তানদের স্ত্রী শার্লটের হাতে তুলে দিয়ে ডির্ভোস চূড়ান্ত করেছি। আমার গার্ল ফ্রেন্ড আমান্দা আগেই বিদায় নিয়েছে। আমারও কোনো বন্ধন অবশিষ্ট নেই। খুচরো কিছু সম্পর্ক আমার আগেও ছিল, এখনো আছে, তবে কারও জন্যই আমার তেমন কোনো টান নেই। কমিটমেন্টও নেই।

নাইটব্রিজের ব্রম্পটন রোডে বাড়িটি প্রায় এক মাস লাগিয়ে ঝকঝকে তকতকে করেছি। চারটা বেড রুম, চিলেকোঠা একটা। সরাসরি এখানেই উঠবে।

দুপুর সোয়া বারোটায় এমিরেটসের ঢাকা ফ্লাইট হিথ্রোতে অবতরণ করবে। আমার পরবর্তী স্ত্রী নাহিদ নিশতার জাহান ও দুটি ছেলেকে আনতে আমি এখন এয়ারপোর্টের পথে।

আমি ঠিক করে ফেলেছি, ব্যাপারটা আজই হবে, উইদাউট অ্যানি প্রোটেকশন। নাহিদ বলেছে, এখন ডেঞ্জার পিরিয়ড চলছে। খুব ভালো, আমিও একটা বাচ্চা চাই, নিজের।

ভবিষ্যৎ
জীবনের
সুরক্ষায়
এসবিএসি ব্যাংক
আপনার
পাশে সবসময়
নির্ধারিত মেয়াদ
শেষে
১০
লাখ
টাকার মালিক
সুরক্ষা
মিলিওনিয়ার স্কিম
24/7
16327
মেয়াদ
৩ বছর
৫ বছর
৭ বছর
১০ বছর
মাসিক জমা
২৪,৮৮১/-
১৩,৮৭৪/-
৯,১৯৬/-
৫,৭৩৬/-
আমানত পণ্যসমূহ
স্পেশাল বেনিফিট
ডাবল বেনিফিট/৯.১১ বছরে
ট্রিপল বেনিফিট/১৫.৯ বছরে
মাসিক মুনাফা/লাখ টাকা
৩ বছর মেয়াদে ৳ ৬০৪/-
৫ বছর মেয়াদে ৳ ৬০৪/-
মাসিক সঞ্চয় স্কিম
৫০০/যেকোনো গুণিতক
৩ বছরে ৳ ২০,০৯৫/-
৫ বছরে ৳ ৩৬,০৩৮/-
লাখোপতি সঞ্চয় স্কিম
৩ বছর মেয়াদে মাসিক জমা ৳ ২,৪৮৯/-
৫ বছর মেয়াদে মাসিক জমা ৳ ১,৩৮৮/-
১০ বছর মেয়াদে মাসিক জমা ৳ ৫৭৪/-
• সরকারি বিধি মোতাবেক কর কর্তনযোগ্য
SBAC
BANK
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ
www.sbacbank.com

ওয়াসি আহমেদ

গল্প বদলে যায়

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

এত এত দিন ধরে একট ভুল গল্প ...

খুব ছোটবেলায় যখন দুলু চাকমা তার দাদিমার কাছে গল্পটা শুনত, ভালোই লাগত। গল্পটা দাদিমা কোথায় পেয়েছিল কে জানে! জানতে চাইলে সুন্দর কিন্তু অচেনা একটা জায়গার নাম বলত– চম্পকনগর। সেটা কোথায়? বুড়ি ফোকলা মুখে পানের ছিবড়া গালের একপাশে জিভে ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে চোখ টানটান করে বলত– চৈম্পানগো। মাথামুণ্ডু না বুঝে দুলু আর তাকে ঘাঁটাতে যেত না। চাপাচাপি করলে হয়তো নতুন কিছু বলত, সেটা হতে পারত আরও মাথামুণ্ডুহীন। তবে দুলু জানত গল্পটা সে একাই শোনেনি, তার বয়সী আশপাশের বাচ্চারাও বড়দের কাছে শুনেছে।

সে সময় মনে হতো গল্পটা নিশ্চয় ওদেরও ভালো লাগে, তার যেমন লাগত। আশ্চর্য যা, সে-গল্পটা যাকে নিয়ে তার নামও দুলু– তবে দুলু চাকমা না, দুলু হুমোরি। গল্পের সেই দুলুর ছিল সাত-সাতজন জোয়ান ভাই। ভাইয়েরা তাকে খুব ভালোবাসত, বয়সে সে ছিল সবার ছোট। তো বছর দশ-এগারোর দুলু হুমোরি যেমন সাত ভাইয়ের দেদার আদর-সোহাগ পেত, তেমনি সে নিজেও ভাইদের আদর কাড়তে সময়-সুযোগমতো নানা বাহানা ধরত। ভাইয়েরা যখন দল বেঁধে জঙ্গলে কাট্টনে যেত, সে জেদ ধরত সঙ্গে যাবে। ভাইয়েরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার জন্য এটা আনবে ওটা আনবে বলে তাকে শান্ত করত। সাত ভাই ছাড়া বাড়িতে আরেকজন ছিল– সব বড় ভাইয়ের বউ, দুলুর ভুজি। ভুজিও দুলুকে কম ভালোবাসত না। একবার সাত ভাই জঙ্গলে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, দিনকয়েক থাকতে হবে বাড়িছাড়া। কাঠ, বাঁশ, ফল-মূল, তরিতরকারি জোগাড় করতে হবে। পাহাড়ি ছড়ায় মাছ, কাঁকড়া, আর টিলার খানাখন্দে কচ্ছপের ডিম পেলে তো কথাই নেই। আবার অসুখ-বিসুখ সারাতে গাছপালার ছাল, শেকড়বাকড়ও। দুলু বরাবরের মতো জেদ ধরল সঙ্গে যাবে। ভাইয়েরা বোঝাল– অনেক কষ্ট, সে পারবে না, তাছাড়া সে চলে গেলে তার ভুজি বাড়িতে একা পড়ে থাকবে। তারা ফেরার সময় তার প্রিয় সিমেআলু নিয়ে আসবে, নারেং কমলা, তরুঞ্জা নিয়ে আসবে। দুলু নিরস্ত হলো। ভাইয়েরা বিদায় নিল।

বাড়িভরা ছিল মানুষ, থাকল মাত্র দুজন– দুলু আর তার ভুজি। ভুজির কাজ-কর্ম থাকলেও দুলুর কাজ বলতে কিছু নেই, সে একমনে বাড়ির সামনে ইজোরের পাশে এক্কাদোক্কা খেলে, কখনো ভুজির সঙ্গে ঘুঁটি খেলায়ও মেতে ওঠে। একদিন দুলু ইজোরের পাশে মাটিতে ঘর কেটে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কাদোক্কায় মত্ত, এমন সময় ভুজির নজরে পড়ল মস্ত ডানা ছড়ানো একটা চিল মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। তাকিয়ে থেকে চিলের নখে আটকানো শুকনো মাছের বড়সড়, চ্যাপ্টা টুকরার মতো কিছু একটা খেয়াল করামাত্র তার চোখ স্থির হয়ে গেল। খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো টুকরাটা মাছেরই, সাগরের আঙ্গর মাছের। ভুজির লোভ হলো, মাছের এমন একটা চওড়া টুকরা যদি পেত! সাগর সেই কত দূরে, আর দূরান্তের সেই সাগর থেকে চিলটা নিয়ে এসেছে মজাদার মাছ। কত দিন বড় মাছের এজেগুরি খায় না ভুজি! সে তখন ভাবল চিলের কাছে শুধু শুধু চাইলে তো মাছ দেবে না, চিলের গুণগান করলেও কাজ হবে না, বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হবে। কী দেয়? মাছ, সাপ-খোপ, নিদেন ইঁদুর কোথায় পাবে যে চিলকে দিয়ে মন ভজাবে! ভাবতে ভাবতে সে মিটিমিটি হেসে গানের গলায় বলে উঠল, ও চিল, তোর মাছ থুয়ে যা, আর দুলুরে নিয়া যা।

কথার কথা ছাড়া কী! কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তখনই, চিলের নখ খসে বড়সড় শুকনো মাছের টুকরাটা পড়ল এসে তার পায়ের কাছে। হতভম্ব ভুজি কী করে, এক ছুটে টুকরাটা নিয়ে রান্নাঘরে চুলার পাশে গিয়ে বসেছে কি বসেনি, কানে এলো দুলুর ভয়ধরা গলার চিৎকার। বাইরে এসে দুলুকে কোথাও না দেখে সে অবাক হলো। গেল কোথায়? এই তো ইজোরের পাশে লাফালাফি করছিল। সে দৌড়ে-দৌড়ে এদিক-ওদিক খুঁজল, নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করল। নেই। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। দুই দিন পর তার স্বামী ও দেবররা ফিরে আসবে, সে তখন কী জবাব দেবে!

এদিকে সাত ভাই জঙ্গলের কাজ সেরে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে।

বাড়ির কাছাকাছি টিলার ঢাল ভাঙতে ভাঙতে তারা গলা ছেড়ে দুলু দুলু ডাকল। দুলুর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দুলুর জন্য তারা নিয়ে এসেছে কাঁদি-কাঁদি কলা, মিষ্টি আলু, কচ্ছপের টাটকা ডিম। ঘরে এসে তারা হতভম্ব হয়ে শুনল কয়েক দিন ধরে দুলুর পাত্তা নেই, দুলু নিখোঁজ।

সাত ভাই দেরি না করে তখনই ছুটল বোনের খোঁজে। এ-পাহাড় ও-পাহাড়, এ-জঙ্গল ও-জঙ্গল তোলপাড় করে তারা নানাদিকে ছুটল। দিনের আলো নিভে রাত নেমে এলেও মশাল জ্বেলে জঙ্গলের পর জঙ্গল চুঁড়ে বেড়াল। পরদিন ভোর হতে আবার খোঁজ-খোঁজ। জঙ্গলের গভীর থেকে গভীরে পা চালিয়ে আর মুখে দুলু দুলু ডাকতে গিয়ে হঠাৎই একটা মস্ত উঁচু পিটলাং গাছের মাথায় চিলের বাসা থেকে দুলুর কান্নার শব্দে তারা সচকিত হলো। হ্যাঁ, দুলুই। সাত ভাই সঙ্গে সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়-বড়, লম্বা বাঁশ কাটল, মই বানাল, গাছে মই ঠেকিয়ে দুলুকে সাবধানে নামিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফেরার পর ঘটনা জানাজানি হতে ভুজির পিঠে কিছু উত্তম-মধ্যম জুটল– কেন সে মাছের লোভে চিলকে অমন কথা বলেছিল? পরে ভুজি যে এমনি এমনি মজা করে কথাটা বলেছিল তা বেরিয়ে পড়তে ভুজির ওপর থেকে রাগ পড়ে গেল। হারিয়ে যাওয়া দুলুকে ফিরে পেয়ে গোটা পরিবার আনন্দে মেতে উঠল।

কী গল্প! আষাঢ়ে গল্পও হার মানবে। ছোটবেলার গল্প হিসাবে না হয় মানা গেল, কিন্তু এ তো ভুল গল্প। দুলু চাকমা যখন ছোট ছিল তখন ভুলটা নিজে ধরবে কী, অন্য কেউও ধরিয়ে দেয়নি। যাক, সে তখনকার কথা। কিন্তু এখন যখন সে ছোট নেই, বয়স তিরিশ হব-হব, তার খুব অবাক লাগে ভাবতে এই রঙচঙে মিথ্যা গল্পটা কেন বড়রা বাচ্চাদের শোনাত। দাদিমা যখন তাকে বলেছিল, সে কি ভাবেনি এ গল্পের সঙ্গে পাহাড়ের মিল নাই! চিলে মানুষ নিয়ে যাবে, আবার তাকে অক্ষত ফেরত পাওয়া যাবে, এমন গাঁজাখুরি কিসসা পাহাড়ে কে শুনতে চায়! গুম করে গুমকারী ক্ষতি করে না, আবার গুমটাও নিজ উদ্যোগে না, বিনিময় ব্যবস্থায় খেলা-খেলা গুম।

দুলু চাকমা ভাবে গল্পটা যাতে আর কেউ না বলতে পারে সে-ব্যবস্থা যদি করা যায়! ভাবতে বসে সে মনে মনে গল্পটা ভাঙে। মিথ্যাগুলো মুছে নতুন করে বানায়। সাত ভাই তাদের একমাত্র ছোট বোনকে বেজায় ভালোবাসে, ঠিক আছে। ভাই থাকলে বোনকে ভালোবাসবে সত্যি কথা। চিলটাও সত্যি; আর চিল ঘরের ওপরে পাক খাবে এ আরও বেশি সত্যি। চিলের পায়ে বড় বড় লোহার শলার মতো, নৌকার নোঙরের মতো বাঁকানো তীক্ষ্ণ নিশেপিশে নখ, আচমকা ছোঁ-তে কিছু একটা উপড়ে-খুবলে নিতে নখগুলো এই খুলছে এই বন্ধ হচ্ছে। ঘরের ওপরে পাক খেতে খেতে চিলটা তক্কেতক্কে থাকবে কী কায়দায় নতুন দুলু হুমোরির ঘাড়ে-মাথায় দু-পায়ের লোহার শলা বিঁধিয়ে অচিনমুল্লুকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কাজটা অবলীলায় চিলটা করেও ফেলবে। ধরা যাক, নতুন দুলু প্রথম গল্পের দুলুর মতো এক্কাদোক্কা খেলছিল, আর তখনই চিল তার ঘাড়-মাথা নিশানা করে ঝাঁপ দেবে। আচমকা হামলায় দুলু চিৎকার-চেঁচামেচির সুযোগ পাবে না, ভয়ে জ্ঞান হারাবে। চিল তাকে কোন দিকে কোথায় নিয়ে যাবে, কেউ জানবে না। সাত ভাই হন্যে হয়ে বোনকে ফিরে পেতে জঙ্গল-পাহাড় তোলপাড় করে খুঁজবে। দিনের পর দিন এক জঙ্গল ছেড়ে অন্য জঙ্গলে, এক পাহাড় ছেড়ে অন্য পাহাড়ে তন্নতন্ন খুঁজবে। খুঁজেই চলবে।

ভাইদের এমন আদিখ্যেতায় চিল খেপে যাবে, সে তার দলবল নিয়ে ভাইদের মাথার ওপর চক্কর কাটবে। রোদে তাতানো তাদের হিংস্র ডানার ঝাপটায় বিদ্যুৎঝলকের মতো আগুন ঠিকরাবে।

মাথার ওপর পালে পাল রাগী চিল দেখে ভাইয়েরা ভয় পেলেও খোঁজাখুঁজিতে বিরাম না দিয়ে জঙ্গল-পাহাড় ভেঙে পা চালাতে থাকবে। চিলের দল এতে আরও খেপে গিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে পাথর ছুড়তে থাকবে। ভাইয়েরা অবাক হয়ে দেখবে চিলদের ঠোঁট থেকে ধারালো বড় বড় পাথর উড়ে আসছে তাদের দিকে তাক করে। দেখতে না দেখতে একটা পাথর এসে বিকট শব্দে ঠুকরে পড়বে তাদের ছোট ভাইটার কপাল বরাবর। ছিন্নভিন্ন মাথা নিয়ে সে তখনি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

এত দূর এসে দুলু চাকমা একটা নিঃশ্বাস চাপে। বীভৎস গল্প। এ গল্প কেউ বাচ্চাদের শোনাতে যাবে বলে মনে হয় না। যদি কেউ সাহস করে শোনাতে চায়, শোনাক। না শোনালে কিছু করার নাই। আসল কথা, ভুল নেই কোথাও। একটা ভুল গল্প শোনার খেসারত দিতে এ গল্পটা না হয় সে তার নিজের জন্য তুলে রাখবে। তার তখন মনে হলো দুলু হুমোরির নামটা বদলে দেওয়া দরকার। এ তো দুলু হুমোরির গল্প নয়। এ গল্পে লাপাত্তা মেয়েটা লাপাত্তাই থেকে যাবে, ভাইয়েরা খুঁজে পায়নি, অন্যরাও পাবে না। কিন্তু ওর একটা নাম তো দিতে হবে। না হলে কী নামে মাথায় রাখবে! সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে, হতে পারে পাহাড়-জঙ্গল ছাড়িয়ে আকাশে, মেঘের খাঁজে-ভাঁজে। হতে পারে, কোনো এক ফুলবিজুর অপরূপ ভোরে মেঘের ভাজ খুলে সে কাউকে চকিত দেখা দেবে। কী নামে ডাকবে তখন তাকে? চট করে একটা নাম মাথায় খেলে যেতে সে মনে মনে বলে– কল্পনা। পরপরই বিড়বিড় করে নামটা দুই কান ভরে শোনে। এ নাম নিয়ে শুধু দুলু চাকমার না, গোটা পাহাড়ের মানুষের কল্পনায় সে বসত করুক। আর তার মৃত ভাইটারও যে একটা নাম দরকার। চিলের ছোড়া পাথরে মাথা ছাতু হয়ে মরে পড়ে থাকার কথা কে কবে শুনেছে! নামটা রূপম হলে কেমন হয়? গাঢ়-গহন নাম। কল্পনার ভাইয়ের নাম আর কী হতে পারে!

অনীশ দাস অপু

জেমস হেডলি চেজের কাহিনি অবলম্বনে

ঝড়ের রাতে

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

এক

শেষ বিকেলের দিকে লিঙ্কন জেফিন ডি-১২ নিয়ে ডেটোনা বিচের রাস্তায় উঠে এলো রাজিব রায়হান। ধীরগতিতে পাশ কাটাল স্টেডিয়াম আর চমৎকার সাজানো ককুইনা-রক ব্যান্ড স্ট্যান্ড। সাগর সৈকতের দিকে যাচ্ছে মানুষ। তাদের ঈর্ষার চোখে দেখতে দেখতে রাজিব ভাবল এখানেই গাড়ি থামাবে কি-না। চট করে সমুদ্র স্নানটা সেরে নেওয়া যায়। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। নাহ্, এখানে নামলে চলবে না। ওকে যেতে হবে অনেকদূর। ওশান এভিন্যুর দূর প্রান্তে লাল ত্রিভুজ সাইনটা চোখে পড়ল রাজিবের– কনোকা সার্ভিস স্টেশন। ওটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে।

সাদা ইউনিফর্ম পরা তিনজন অ্যাটেনডেন্ট, ব্রেস্ট পকেটে লাল ত্রিভুজ ব্যাজ সেলাই করা, বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। রাজিব গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

'তেল ভরো, ঘষামাজাও করো,' নির্দেশ দিল রাজিব। 'আর গাড়িটার প্রতি খেয়াল রেখো। আমি কিছু খেয়ে আসছি।'

বেঁটে ও মোটা এক লোক, আর্মলেট দেখে বোঝা গেল ফোরম্যান, অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। 'শুভ সন্ধ্যা' রাজিবকে স্বাগত জানাল সে। প্রশংসার দৃষ্টিতে গাড়িটার ওপর চোখ বুলাল, তারপর আবার ফিরল রাজিবের দিকে। খদ্দের ভালোই চেনে সে। রাজিবকে ধরে নিল ভারতীয় মালদার পার্টি হিসেবে, ধারণা করল ছুটিতে বেরিয়েছে এবং এ ধরনের লোকজন খরচের দিকে তাকায় না। ঠিকই অনুমান করেছে লোকটা।

ভারী সোনার কেস খুলে একটা সিগারেট বের করল রাজিব, ধরাল। 'ভালো খাবার কোথায় মিলবে?' জানতে চাইল সে।

রাস্তার ওপারে আঙুল তুলে দেখাল ফোরম্যান। 'ওখানে, স্যার। চেজনির খাবারটা বেশ ভালো, সার্ভিসও দ্রুত।'

রাজিব বলল, 'ঠিক আছে। ওখানে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। গাড়ি যেন রেডি থাকে। এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে।'

'অবশ্যই রেডি থাকবে। মিয়ামি যাচ্ছেন নাকি, স্যার?'

মাথা ঝাঁকাল রাজিব। 'সেরকমই ইচ্ছে। বুঝলে কী করে?'

দাঁত বের হয়ে গেল ফোরম্যানের। 'সবাই এখন ছুটি কাটাতে মিয়ামির দিকেই যাচ্ছে কিনা। বছরের এ সময়টাতে খুব জ্যাম বেঁধে যায় রাস্তায়। শুনলাম ঝড়ও আসছে।'

শ্রাগ করল রাজিব। 'ঝড়টড় কেয়ার করি না।' তারপর লম্বা পা ফেলে এগোল রেস্টুরেন্টের দিকে। চোখ দিয়ে রাজিবকে অনুসরণ করল ফোরম্যান, দেখল চেজনির দরজা খুলে আড়াল হয়ে গেল সে। ফোরম্যান গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, উঁকি দিল ভেতরে। 'সুন্দর গাড়ি,' মন্তব্য করল সে। 'লোকটার নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা।'

উইন্ডস্ক্রিন ন্যাকড়া দিয়ে মুছছিল এক অ্যাটেনডেন্ট, বলল, 'আমারও তাই ধারণা।' রাস্তায় থু করে থুতু ছিটাল। 'তবে লোকটা কিপটে হতে পারে। ইন্ডিয়ানদের হাত তেমন খোলা হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে যত বড় গাড়ির মালিক বকশিশের হাতটাও তার ততই ছোট।'

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান। দৃষ্টি মেয়ে দুটোর দিকে। সার্ভিস স্টেশনের বিপরীত দিকের দোকানে ছাউনির নিচে আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গাড়ির আসা-যাওয়া লক্ষ করছে। রাজিব রায়হানের গাড়িটার ওপর চোখ পড়তে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। দুজনে কী যেন বলছে। খুব সিরিয়াস ভঙ্গির শলাপরামর্শ। একটা অদ্ভুত জোড়া। একটা মেয়ে খাটো, অন্যটা লম্বা। খাটো মেয়েটি ভারি সুন্দরী। এক মাথা সোনালি চুল, পাতলা লাল সোয়েটার আর কোঁচকানো হলুদ স্কার্ট পরনে। শরীরের খাঁজ-ভাঁজগুলো মারাত্মক। পায়ে হলুদ স্যান্ডেল। সূর্যের তাপ আর বাতাসের ঝাপটা চেহারাটাকে ম্লান করে রেখেছে। তার সঙ্গিনী ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা। তবে নারীসুলভ কোনো কমনীয়তা নেই চেহারায়। পোশাক আর আচরণ দেখে ওকে মেয়ে বলেই মনে হয় না। লম্বা মেয়েটা পরেছে রং জ্বলা হলুদ-সাদা ট্রাউজার আর কালো পোলো সোয়েটার। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙ আবলুস কালো।

ফোরম্যান ওদের দেখছে। মেয়ে দুটো মনে হয় একমত হতে পেরেছে। এক সঙ্গে রাস্তা পার হলো, হেঁটে আসছে ফোরম্যানের দিকে।

লম্বা মেয়েটা কোনো ভণিতা না করে জানতে চাইল, 'দুটো অসহায় মেয়ের একটা উপকার করতে পারবে?'

অস্বস্তি লাগল ফোরম্যানের, একটু সরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কী উপকার?'

হাসল মেয়েটা, তবে হাসি তার চোখ স্পর্শ করল না। 'ওই লিঙ্কন গাড়িটা,' বলল সে। 'কোন দিকে যাচ্ছে ওটা?'

ফোরম্যান জবাব দিল, 'মিয়ামি- কেন লিফট দরকার?'

'হ্যাঁ। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'না। এসব কাজ আমরা করি না।'

লম্বা মেয়েটা ঘুরল তার সঙ্গিনীর দিকে। 'তুমি একটু ওদিকে যাও, স্টেলা।' স্টেলা নামের মেয়েটি একটু ইতস্তত করল, তারপর কয়েক কদম সামনে বাড়ল। 'আমার সঙ্গিনী খুব সুন্দরী, না? মেয়েটা লাজুক, তবে তুমি চাইলে ও তোমার জন্য অনেক কিছুই করতে পারে।'

'আচ্ছা?' লোভে চকচক করে উঠল ফোরম্যানের চোখ।

'আমরা ওই গাড়িটাতে চড়তে চাই, প্লেবয়। আর সে ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমার ধারণা স্টেলা তোমাকে অখুশি করবে না।' আবার প্রাণহীন হাসিটা ফিরে এলো মেয়েটার মুখে।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'তোমরা একবার গাড়িতে চড়তে পারলে আমার ফায়দা কী?'

'ফায়দা আছে,' বলল লম্বু। 'ওকে নিয়ে দশ মিনিটের জন্য কোথাও চলে যাও না।'

ঘাম ফুটল ফোরম্যানের কপালে। তাকাল স্টেলার দিকে। শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, 'কিন্তু ও কি রাজি হবে?'

'অবশ্যই হবে,' তীক্ষ্ণ শোনাল তালগাছের কণ্ঠ। 'আরে, তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই নাকি?'

ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল ফোরম্যান অস্বস্তি নিয়ে। 'আ...ইয়ে জায়গা থাকবে না কেন। আমার অফিসেই আসতে পারে।'

'তাহলে অফিসে গিয়ে বসো। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আমাদের লিফটের কিন্তু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, প্লেবয়। নইলে তোমার কপালে খারাবি আছে।' হুমকির মতো শোনাল কথাগুলো।

ফোরম্যান খানিক দোটানায় ভুগল, তারপর পা বাড়াল নিজের অফিসে। চোখ ছলছল করছে, একটু পর তার পিছু নিল স্টেলা।

সার্ভিস-স্টেশনের নিচু দেয়ালটার ওপর উঠে বসল লম্বু, সিগারেট ধরাল একটা। ধীরে ধীরে ধূমপান করছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাস্তার ওপারের রেস্টুরেন্টের দিকে। স্টেশন অফিসের দিকে সে একবারও তাকাল না। মিনিট দশেক পরে রাজিবকে দেখল ওয়েটারকে ডেকে বিল দিচ্ছে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে। পা বাড়াল অফিসে। ঢুকে পড়ল দরজা খুলে। তিন অ্যাটেনডেন্ট ওদের কাণ্ড দেখছিল। মুখে হাসি। লম্বা মেয়েটা পাত্তাই দিল না ওদের। অফিসে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। গলা চড়াল, 'চলে এসো তোমরা। ও এসে গেছে।'

মিনিটখানেক অপেক্ষা করল সে। তারপর আবার ডাকল। অফিসের পেছন দিকের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ফোরম্যান। এখনো হাঁপাচ্ছে। তার ঘাড়ের শিরায় রক্ত দেখতে পেল মেয়েটা। হাসল। বলল, 'এখন যাও, প্লেবয়। লিফটের ব্যবস্থা করে দাও।'

কথা না বলে মেয়েটাকে পাশ কাটাল ফোরম্যান। মেয়েটা পেছনের ঘরে ঢুকল। সঙ্গিনীকে অধৈর্য গলায় বলল, 'এ নিয়ে মাইন্ড করার কিছু নেই। নাও, রেডি হও। আর দয়া করে কান্নাকাটি কোরো না। তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।' আবার অফিসে ফিরে এলো সে, চেহারায় ফুটে আছে রাগ, চোখে হিমশীতল দৃষ্টি।

রাজিব রায়হান নিজের গাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখল, সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। ছেলেগুলো ভালোই কাজ করেছে। খাওয়াটাও জবর হয়েছে। তৃপ্তি বোধ করছে ও। ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কত দিতে হবে?'

অঙ্কটা বলল ফোরম্যান, টাকা দিয়ে দিল রাজিব। সঙ্গে দশ ডলার বকশিশ। 'এটা তোমার ছেলেদের জন্য। ওরা ভালো কাজ করেছে।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ফোরম্যান, আমতা আমতা করে বলল, 'দুটি মেয়ে আমার অফিসে বসে আছে, স্যার। খুব ভালো মেয়ে। মিয়ামি

যাবে। আপনি যদি ওদের একটা লিফট দিতেন...'
'পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল রাজিব। 'আমার গাড়ি কাউকে লিফট দেওয়ার জন্য নয়।'
চেহারা সাদা হয়ে গেল ফোরম্যানের। তো তো করে বলল, 'ওরা খুব বিপদে পড়েই না...আপনি যদি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলতেন...'
'বললাম তো সম্ভব নয়,' গাড়িতে উঠল রাজিব। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। ঠিক তখন অফিস ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো স্টেলা।
সুযোগটা কাজে লাগাল ফোরম্যান। দ্রুত বলে উঠল, 'ওই মেয়েটা সেই দুজনের একজন। খুব সুন্দর, না?'
স্টেলাকে দেখে আগ্রহ বোধ করল রাজিব। এত সুন্দরী মেয়ে লিফট চাইবে ভাবেনি। গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়েও দিল না। তার দ্বিধা লক্ষ করে মনে মনে উল্লাস বোধ করল ফোরম্যান। তবে চেহারাটা আরও করুণ করে বলল, 'মিয়ামি যাওয়া ওদের জন্য খুবই দরকার, স্যার। সেই কখন থেকে চেষ্টা করছে লিফট পেতে। কিন্তু সবগুলো গাড়ি ভর্তি!'
স্টেলা ভীরু পায়ে এগিয়ে এলো। রাজিবের কাছে ওর চোখজোড়া খুবই আবেদনময় মনে হলো। টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে দরজা খুলে দিল সে। 'তুমি লিফট চাইছ?' আবার গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।
রাজিবের চোখে চোখ রাখল স্টেলা। 'আমরা মিয়ামি যেতে চাই,' মৃদু গলায় বলল সে। 'আমরা আপনাকে একটুও বিরক্ত করব না।'
ফোরম্যান লক্ষ করল তালগাছকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে হাসল সে। লম্বু খুব চালাক। যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে যাবে।
রাজিব মাথা দোলাল। 'তোমাকে লিফট দিতে কোনো অসুবিধে নেই আমার।' চারপাশে একবার নজর বুলাল। 'অন্য মেয়েটাকে দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করল সে ফোরম্যানকে।
লম্বা মেয়েটা অফিসেই বসে ছিল। এবার অফিস থেকে বেরিয়ে এলো সে, লম্বা পা ফেলে এগোল গাড়ির দিকে।
রাজিব ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটার দিকে। মনে মনে হতাশ। লম্বুর হাঁটার স্টাইল এবং চাহনি কোনোটাই পছন্দ হয়নি তার।
'তুমি অপর জন?' সামান্য দ্বিধা মেশানো গলায় জানতে চাইল সে। বড় বড় দাঁত বের করে হাসল মেয়েটা। 'জি। আপনাকে ধন্যবাদ। আসুন, আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ও স্টেলা ফ্যাবিয়ান আর আমি গের্ডা তামাভিচ।'
রাজিবের ইচ্ছে করছে না পালোয়ান মেয়েটাকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছে সে। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে, বলল, 'আমি রাজিব রায়হান। নিউ ইয়র্ক থেকে আসছি। তোমরা রেডি তো? তাহলে চলো যাত্রা শুরু করি।'
গের্ডা তাকাল স্টেলার দিকে, গাড়ির সামনের দরজা খুলে ধরল। 'তুমি মি. রাজিবের সঙ্গে বসো। আমি পেছনের সিটে বসছি।' রাজিবের দিকে ফিরল সে চওড়া হেসে। 'আমার পা লম্বা। প্রচুর জায়গা দরকার।'
খুশি হলো রাজিব। লম্বু তার পাশে বসতে চাইলে মেজাজটাই যেত খারাপ হয়ে। স্টেলাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল সে। তারপর বসে পড়ল ওর পাশে। গের্ডা জায়গা নিল পেছনে।
সালাম দিল ফোরম্যান। কিন্তু কেউ ওর দিকে ফিরেও চাইল না। ওশান এভিন্যু ছাড়িয়ে ব্রডওয়াকের দিকে গাড়ি ছোটাল রাজিব।
চৌমাথায় এক ট্রাফিক পুলিশ ইশারা করল ওকে গাড়ি থামাতে। 'ব্যাটা চায় কী?' পুলিশটাকে ওদের দিকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল রাজিব।
মেয়ে দুটির কেউ জবাব দিল না। ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে গেছে দুজনে। দেখছে পুলিশটাকে। গের্ডা একটা রুমাল বের করে মুখ মোছার ছলে চেহারা আড়াল করে রাখল।
রাজিবকে দেখেই বুঝতে পেরেছে পুলিশ এ লোক হোমরাচোমরা কেউ হবে। একটা সেলুট ঠুকে অমায়িক হেসে বলল, 'মিয়ামি যাচ্ছেন নাকি, স্যার?'
মাথা দোলাল রাজিব। 'হ্যাঁ। কেন, যেতে পারি না?'
'পারেন, তবে ঝুঁকি আছে, স্যার,' বলল পুলিশ। 'প্রচণ্ড হারিকেন ঝড় আসছে। ফোর্ট পিয়ার্সে পৌঁছার আগেই হয়তো ঝড়ের কবলে পড়ে যাবেন।'
'জানি,' বলল রাজিব। 'কনোকোর লোকজন বলেছে আমাকে। আমি যাব অনেক দূর, তবে অবস্থা বেগতিক দেখলে ফোর্ট পিয়ার্সে থামব।'
আবার সেলুট করল ট্রাফিক পুলিশ। 'আপনার খুশি, স্যার।' হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদের।
ড্রাইভিং মিররের দিকে তাকিয়ে ঘেউ করে উঠল রাজিব। 'এরা ঝড়ের কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিল।'
সামনে ঝুঁকে এলো গের্ডা। 'আপনি বোধহয় ফ্লোরিডায় এই প্রথম?'
'হ্যাঁ। কেন?'
'না, মানে, এখানকার লোকজন এই হারিকেন ঝড়কে খুব ডরায়।'
হারিকেন নিয়ে কথা বলতে বিরক্ত বোধ করছিল রাজিব। সূর্য এখনো সমানে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে, উপকূল থেকে বইছে মৃদু হাওয়া। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হওয়ার লক্ষণ নেই কোথাও। স্টেলার দিকে তাকাল সে। সিটের এক কোণে সরে বসেছে মেয়েটা। স্টেলার শরীরের গাঁথুনি চমৎকার, মনে মনে স্বীকার করল রাজিব। ভাগ্যিস গের্ডা তার পাশে বসে নেই। সে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই হারিকেন ভয় পাও না।'
রাজিবের দিকে এক ঝলক তাকাল স্টেলা, মাথা নাড়ল। 'না। আমি হারিকেন ঝড় দেখেছি। তবে এই ঝড়ের সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হতে পারে না।'
স্টেলার কণ্ঠ মিষ্টি, ওর বলার ধরনটাও ভালো লাগল রাজিবের। মেয়েটির সুগঠিত নগ্ন হাঁটুর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আসলে কী করো?'
স্টেলাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কলকলিয়ে উঠল গের্ডা, রাজিবের প্রায় কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে। তার কণ্ঠ নিচু, খসখসে। 'আমরা চাকরি খুঁজছি। ডেটোনা বিচে আর ভাল্লাগছিল না। তাই মিয়ামি যাচ্ছি। আশা করি ওখানে কাজ-টাজ জুটে যাবে।'
পুরনো ডিক্সি হাইওয়েতে মোড় নিল রাজিব। রাস্তাটা পোর্ট অরেঞ্জের দিকে গেছে। গ্যাস পেডালে চাপ দিল সে, হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে গতি বেড়ে গেল লিঙ্কনের। কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে বলল, 'আমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তোমরা কি শর্টহ্যান্ড বা এ ধরনের কিছু জানো? তাহলে তোমাদের হয়তো কাজ-টাজ জুটিয়ে দিতে পারব।'
হেসে উঠল গের্ডা। কপালে ভাঁজ পড়ল রাজিবের। মহিলা পালোয়ানের কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে হিসহিস করে হাসার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। 'এতে হাসার কী হলো?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রাজিব।
'না। কিছু হয়নি,' বলল গের্ডা। 'আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি চাকরির খনি। আর ভারতীয়রা খুব উদার হয়। তাই না, স্টেলা?'
'আমি ভারতীয় নই, বাংলাদেশি।' বলল রাজিব। 'বাংলাদেশের নাম জানো?'
'অবশ্যই জানি।' কলকলিয়ে উঠল গের্ডা। 'আমাদের এক বাংলাদেশি বন্ধু আছে। ঢাকায় থাকে।'
'তা তোমরা কী করো বললে নাতো!' চোখের কোণ দিয়ে স্টেলাকে দেখল রাজিব।
চুপ করে রইল স্টেলা। তারপর বলল, 'আমরা গান-বাজনা করি। অভিনয় করি। নটা-পাঁচটা অফিসের কাজ আমাদের পোষাবে না।'
'ও আচ্ছা!' মাথা দোলাল রাজিব। 'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। গান-বাজনা আর অভিনয় করলে ধরা-বাঁধা চাকরির কী দরকার? তা মিয়ামি গেলেই কাজ জুটে যাবে বুঝলে কী করে?'
'জুটে যাবে বলিনি তো,' জবাব দিল গের্ডা। 'বলছি আশা আছে। স্টেলার মতো সুন্দরী মেয়ে থাকতে চিন্তা কী?' আবার হেসে উঠল সে। 'ওর চেহারাটা তো একটা পুঁজি।'
'আর তোমার পুঁজি কী?' ব্যঙ্গ ভরে জানতে চাইল রাজিব। ঠাট্টা গায়ে মাখল না গের্ডা। হালকা গলায় বলল, 'স্টেলা অভিনয় করে। গান গায়। আমি ওর ড্রেসের দিকে খেয়াল রাখি। তাই না, স্টেলা?'
কিছু বলল না স্টেলা। অস্বস্তির ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসল, খাটো

স্কার্টটা উঠে গেল কয়েক ইঞ্চি ওপরে। নির্লোম, ধবধবে উরুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াল রাজিব। গের্ডা না থাকলে মেয়েটাকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যেত, ভাবল সে।

পোর্ট অরেঞ্জ পার হয়ে ইউ.এস হাইওয়ে ওয়ান-এ ঢুকে পড়ল গাড়ি। পুব উপকূলের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ওরা, রাস্তা বাঁক নিয়েছে নিচু জলার মাঝখান দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে ফলভরা ম্যান্ডারিন গাছ, গোলাপি ম্যালোর (লোমশ পাতাঅলা গাছ) সারি। দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগল রাজিবের।

নিউ স্মিরনাতে থামল ওরা পেট্রোল নিতে। সন্ধ্যা নামছে দ্রুত, হলদে আভা গায়ে মেখে আকাশের তটরেখায় ডুব দিতে যাচ্ছে সূর্য। পায়ে খিঁচ ধরে গেছে একটানা গাড়ি চালিয়ে। দরজা খুলে নেমে পড়ল রাজিব। দেখাদেখি মেয়ে দুটিও। ট্রাকের লম্বা একটা সারি দেখল ওরা। আসছে এদিকেই। মেকানিককে জিজ্ঞেস করল রাজিব, 'এত ট্রাক লাইন বেঁধে আসার কারণ কী?'

'হারিকেনের ভয়ে,' জবাব দিল মেকানিক। 'খবরে বলল দ্রুত হামলা চালাবে ঝড়।'

মেজাজ খিঁচড়ে গেল রাজিবের। 'ঝড়ের নিকুচি করি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে। 'আমি আজ রাতের মধ্যে মিয়ামি পৌঁছুবই। ঝড়ের বাবারও সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়। কী বলো?'

পেট্রোল ভরা হয়ে গেছে, লোকটা গ্যাস ট্যাঙ্কের মুখ আটকে নিয়ে সিধে হলো। হোস পাইপটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'সে আপনার ইচ্ছে, স্যার। কুড়ি ডলার দিন।'

রাজিব টাকা দিয়ে মোড়ে এসে দাঁড়াল। মেয়ে দুটি ট্রাকের যাওয়া দেখছে। রাজিব বলল, 'এই ট্রাকগুলো কামার থেকে আসছে। হারিকেনের ভয়ে।'

গের্ডা দৃঢ় গলায় বলল, 'সামান্য বৃষ্টি আর বাতাসের ধার ধারি না। অবশ্য গাড়িটা আপনার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারও আপনার।'

'আমি ঠিক করেছি যাব।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের না খাইয়ে রাখবেন না, মি. রাজিব।' হাসছে গের্ডা।

ভুরু কুঁচকে গেল রাজিবের। 'কেন, তোমাদের কি খাওয়ানোর কথা ও ছিল আমার?'

গের্ডা পা বাড়াল গাড়ির দিকে। 'এমনি বললাম, ভুলে যান।'

রাজিব ফিরল স্টেলার দিকে। 'তোমার কিছু বলার আছে?'

ইতস্তত করে স্টেলা বলল, 'আমাদের এখন একটু টানাটানি চলছে...তবে খাবার আনতে হবে না। আমাদের খিদে পায়নি।'

এক মুহূর্ত কী ভাবল রাজিব। তারপর বলল, 'একটু দাঁড়াও। আসছি এক্ষুনি।'

বাধা দিতে গেল স্টেলা, 'না, মি. রাজিব...

রাজিব ততক্ষণে হাঁটা দিয়েছে কফি শপের দিকে। স্টেলার ডাক শুনলেও কানে তুলল না। একটু পরে দুটো কাগজের ব্যাগ হাতে নিয়ে ফিরে এলো। ব্যাগ দুটো ফেলল সিটের ওপর। বলল, 'এই নাও খাবার। আশা করি ফোর্ট পিয়ার্স পর্যন্ত এ দিয়েই চালাতে পারবে। তারপর ওখানে পেট পুরে খাব আমরা। চলো এখন। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

নিউ স্মিরনা ছেড়ে এলো রাজিব নিঃশব্দে। একটাও কথা বলল না। মেয়ে দুটি চিকেন স্যান্ডউইচ খেল ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে। গের্ডা বলল, 'আপনার কাছে একটা স্কচের বোতল ছিল না?'

বোতল নয়, ফ্লাস্ক। গের্ডার চোখ এড়ায়নি। রাজিব ফ্লাস্কটা কাঁধের ওপর দিয়ে পার করে দিল পেছনে। ভাবছে লম্বু খুব লোভী তো!

ইন্ডিয়ান রিভারের পাশ দিয়ে ওরা এখন চলেছে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে, চিকমিক করছে নদীর পানি, ঢেউ উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হলো পানির ওপর জ্বলে উঠছে আলো। মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে গাড়ি চালাল রাজিব। মাথার ওপর দিয়ে গলা ছেড়ে ডাকতে ডাকতে সাঁঝের আকাশে মিলিয়ে গেল একদল হেরন। কাঠঠোকরারা টেলিফোন লাইনের ওপর বসে ছিল, হঠাৎ রকেটের গতিতে ঝাঁপ দিল শূন্যে।

'এই এলাকাটা ভারি সুন্দর,' রাজিব বলল স্টেলাকে। 'এখানে ছুটি কাটাতে এসে ভালোই করেছি।'

'আপনি একা কেন?' জিজ্ঞেস করল স্টেলা। 'বউ-বাচ্চা নেই?'

'বিয়েই করিনি তার আবার বউ-বাচ্চা,' গলা ছেড়ে হেসে উঠল রাজিব। 'টাকা কামানোর ধান্দায় ব্যস্ত ছিলাম এতদিন। জানো, গত দশ বছরে এই প্রথম সত্যিকার অর্থে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমি।'

গের্ডা রাজিবের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'অনেক টাকা কামিয়েছেন?'

আবার হাসল রাজিব। 'অনেক। আট লাখ ডলার তো হবেই।'

টাকার অঙ্কটা শুনে দম বন্ধ হয়ে এলো গের্ডার। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর গের্ডাই নীরবতা ভাঙল। 'অত টাকা দিয়ে তো আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।'

মুচকি হাসল রাজিব। 'তা তো পারিই।'

অস্ট্রেলিয়ান পাইন উইন্ডব্রেক দেওয়া একটা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল ওরা। উইন্ডব্রেকগুলো হঠাৎ ফুঁসে ওঠা বাতাসের ধাক্কায় দুলছে। স্টেলা বলল, 'দেখেছ, বাতাসের বেগ কী বেড়েছে? গাছগুলো কেমন নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।'

'তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না,' অভয় দিল রাজিব। 'গাড়ির ভেতর আমরা নিরাপদেই থাকব।'

সূর্য আকাশে চাঁদের জায়গা করে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আঁধার এখনো জেঁকে বসেনি পুরোপুরি। তবু হেড-ল্যাম্প জ্বেলে দিল রাজিব। 'অন্ধকারে গাড়ি চালাতে ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে এসব এলাকায়। নদীর দিকে তাকাও। মনে হচ্ছে না আগুন জ্বলছে?'

বাতাসের বেগ সত্যি বেড়েছে। বড় বড় ঢেউ উঠেছে নদীতে। মনে হচ্ছে ঢেউয়ের চূড়ায় আগুনের জিভ লকলক করছে। আসলে ওগুলো ফসফরাসের আলো। চন্দ্রালোকিত আকাশে ছোট ছোট মেঘ, একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মশগুল। ছুটছে দুরন্ত গতিতে। কালো রঙের মেঘগুলো গ্রাস করতে চাইছে গোল থালার মতো চাঁদকে।

'ঝড় এলে প্রয়োজনে ফোর্ট পিয়ার্সে আশ্রয় নেব,' বলল রাজিব। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে লাগেজ টাগেজ নেই?'

'না,' জবাব দিল গের্ডা।

রাজিব কিছু না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে এখন। ভাবছে এই ঝামেলাটা কাঁধে না নিলেই হতো। মনে হচ্ছে এদের কারণে দুর্ভোগ আছে তার কপালে।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা পড়ল উইন্ডস্ক্রিনে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝপ করে নেমে এলো আঁধার। হেডলাইটের শক্তিশালী দুটি আলোক রেখা উজ্জ্বল করে রেখেছে সামনের রাস্তা। আঙ্গুর আর লেবু গাছের সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভুতুড়ে লাগল ওগুলোকে।

ইঞ্জিনের মৃদু গোঙানি ছাড়িয়ে কানে ভেসে এলো বাতাসের আর্তনাদ, সেই সঙ্গে বিকট বজ্রপাতের আওয়াজ চমকে দিল ওদের। বজ্রপাতের শব্দ মিলিয়ে না যেতেই শুরু হয়ে গেল ঝমঝম বৃষ্টি। ওয়াইপার চালু করে দিল রাজিব। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে সামনে কিছু দেখা যায় না। বাধ্য হয়ে গাড়ির গতি কমাতে হলো।

'আশা করি এরচেয়ে বেশি জোরে বৃষ্টি আসবে না,' বলল রাজিব।

'আসবে,' বলল স্টেলা। 'এটা তো মাত্র শুরু।' স্টেলার কথা শেষ না হতেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ তুলে ধেয়ে এলো বাতাস, প্রবল ঝাঁকি খেল লিঙ্কন, প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ইঞ্জিনে আরও গ্যাস ঢোকাল রাজিব, স্পিডোমিটারের কাঁটা বিশের ঘর ছুঁইছুঁই করছে।

'কোথাও থামা দরকার,' বলল রাজিব। 'নিউ স্মিরনাতে রাতটা কাটিয়ে গেলেই ভালো হতো। তোমার দেখো তো আশপাশে বাড়িঘরের হদিস পাও কি না। এই আবহাওয়ায় গাড়ি চালানো ঠিক হবে না।'

'থামবেন না,' চট করে বলল গের্ডা। 'ফোর্ট পিয়ার্স এখান থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূরে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রাজিব। বিদ্যুচ্চমক তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। অন্ধকার আকাশ জুড়ে ফস করে জ্বলে উঠছে বিদ্যুৎ, সেকেন্ডের জন্য রাস্তাঘাট গাছপালা আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে আবার নিভে যাচ্ছে। লিঙ্কন এখন প্রায় খুঁড়িয়ে চলছে, যদিও অ্যাকসিলেটরে পা দাবিয়ে রেখেছে রাজিব। ঘণ্টায় কমপক্ষে একশো মাইল বেগে

বাতাস বইছে, ধারণা করল ও।
গাড়ির ছাদে উদ্দাম নাচছে বৃষ্টির ফোঁটা, বজ্রপাতের আওয়াজ ম্লান করে দিচ্ছে। বাতাস নয় যেন নেকড়ের ডাক। এমন তীক্ষ্ণ শব্দ, হিম হয়ে যায় গা।
একটু পরপর ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। রাজিবের মনে হলো বিদ্যুতের আলোয় এক পলকের জন্য সে বাম দিকে একটা দালান দেখতে পেয়েছে। হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তা মোড় নিয়েছে বামে, হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সরু রাস্তাটাতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল রাজিব। 'ওদিকে একটা বাড়ি দেখেছি। ওখানে শেল্টার নেব।' দালানটার যতটা কাছে সম্ভব গাড়ি নিয়ে এলো রাজিব, তারপর বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।
'সাবধান নামবেন,' উদ্বিগ্ন শোনাল স্টেলার কণ্ঠ। 'নইলে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'
সাবধানে গাড়ির দরজা খুলল রাজিব। পিছলে নেমে এলো গাড়ি থেকে, কুঁজো হয়ে আছে। বৃষ্টি এবং বাতাস হামলে পড়ল ওর ওপর। গাড়ির দরজা ধরা না থাকলে এখনই উড়ে যেত। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল ও কিছুক্ষণ। বাতাস আর বৃষ্টির বেগ সয়ে নিচ্ছে। মুহূর্তে কাক ভেজা হয়ে গেল রাজিব। তারপর প্রকৃতির দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এগোল বাড়িটির দিকে।
বাড়িটির সবগুলো জানালা বন্ধ, সদর দরজায় দমাদম পিটাতে লাগল রাজিব। ওর ভাগ্য ভালো এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে, বাতাসের ঝাপটা লাগছে না বললেই হয়। কড়া নেড়ে দরজায় কিল-ঘুসি মেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রাজিব। কেউ খুলছে না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ও। এক পা পিছিয়ে এসে দড়াম করে লাথি মারল দরজার গায়ে। প্রথম লাথিতে ফাটল ধরল দরজায়, দ্বিতীয় লাথিতে খুলে গেল পাল্লা।
ভেতরে ঢুকল রাজিব। অন্ধকার। বার দুই 'কেউ আছেন' বলে খামোকাই হাঁক ছাড়ল। সাড়া পেল না কোনো। বৃষ্টি আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে নিজের ডাক নিজেই শুনতে পেল না।
পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বের করল রাজিব, জ্বালল। হাতের কাছেই বিদ্যুৎ বাতির সুইচ চোখ পড়ল। জ্বেলে দিল বাতি। দেখল সাজানো গোছানো একটা লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে ও। তিন দিকে তিনটি ঘর। চারপাশে দ্রুত একবার নজর বুলিয়েই বুঝতে পারল কেউ নেই বাড়িতে। সম্ভবত হারিকেনের ভয়ে ফোর্ট পিয়ার্স গেছে এ বাড়ির বাসিন্দারা। তবে ঘরটা বেশ আরামদায়ক এবং সুসজ্জিত। এখন মেয়ে দুটোকে ভেতরে নিয়ে আসতে হবে।
আবার ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল রাজিব, বহু কষ্টে পৌঁছাল গাড়িতে। বাড়িটির দিকে হাত তুলে দেখাল ও, তারপর স্টেলার হাত ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল মেয়েটা, তারপর নেমে এলো গাড়ি থেকে। ওকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে প্রচুর সময় লাগল রাজিবের। ওকে নিয়ে সদ্য তৈরি বৃষ্টির ডোবায় আছাড় খেল ওরা, কাদা আর পানিতে ভিজে সয়লাব।
ঘরে ঢুকে আলোর নিচে বৃষ্টিস্নাত স্টেলাকে দেখে রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়ে উঠল রাজিবের। ভেজা কাপড় গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে স্টেলার, শরীরের প্রতিটি রেখা উদ্ভাসিত। সরু কোমরের নিচে ভারী নিতম্বের দুলুনি আর ভরাট দুই বুকের অপরূপ সৌন্দর্য যেন পাগল করে তুলল রাজিবকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। ঢোক গিলে বলল, 'তোমাকে দারুণ লাগছে।'
অন্য দিকে তাকাল স্টেলা। 'আমাকে দেখার দরকার নেই। দয়া করে গের্ডাকে নিয়ে আসুন।'
গের্ডাকে নিয়ে আসতে হলো না। সে নিজেই চলে এসেছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছিল সে চুপচাপ। ভেজা কাপড়ে তার পুরুষালি শরীরটা যেন আরও প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। গের্ডা বলল, 'আমি গাড়ির দরজা বন্ধ করে এসেছি। বৃষ্টি ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'
'আমাকে আবার গাড়িতে যেতে হবে,' জানাল রাজিব। 'সুটকেসটা নিয়ে আসা দরকার। ওতে গরম জামা-কাপড় আছে। সারা রাত ভিজে কাপড়ে থাকতে পারব না।'
'আপনার সঙ্গে আমিও যাই চলুন,' প্রস্তাব দিল গের্ডা। তারপর দুজনে আবার নেমে এলো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মধ্যে। বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এগুলো। রাজিব লক্ষ করল ঝড়ো বাতাস তেমন কাবু করতে পারছে না গের্ডাকে বরং রাজিব একবার ডিগবাজি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল, গের্ডা ওকে ধরে ফেলল চট করে। মেয়েটার গায়ে কী শক্তি! দুজনে মিলে গাড়ি থেকে বের করল সুটকেস, বন্ধ করল দরজা। তারপর ফিরে এলো বাড়িতে।
'তোমার গায়ে অনেক জোর' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রাজিব, জামার কলার চেপে পানি বের করছে।
জবাবে কিছু বলল না গের্ডা। অদৃশ্য হয়ে গেল রান্নাঘরে। লাউঞ্জে চলে এলো রাজিব। ওখানে খালি একটা ঝাঁঝরির সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল স্টেলা। রাজিবকে দেখে ভেজা শার্টটা ছুড়ে ফেলে দিল মেয়েটা।
'এক ঢোক খেয়ে নাও' স্কচের ফ্লাস্কটি এগিয়ে দিল রাজিব। 'নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' ও নিজেও কাঁপছে।
দুজনেই স্কচ খেলো। বেশ ভালো লাগল গরম জিনিসটা পেটে যেতে।
'ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো।' মুচকি হাসল রাজিব। 'যদিও এতেও তোমাকে বেশ লাগছে।'
লালচে হয়ে উঠল স্টেলার চেহারা।' আপনি মাঝে মাঝে আমাকে খুব অস্বস্তিতে ফেলে দেন, মি. রাজিব। এটা ঠিক না।'
রাজিব আরেক ঢোক স্কচ পান করল। 'তোমাকে আমি অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না' বলল সে। 'কিন্তু এমন সুন্দর ফিগার, তুমিই বরং অন্যদের মাথা গরম করে দাও। এত মারাত্মক ফিগার থাকা ঠিক না।'
গের্ডা কিছু কাগজ আর লাকড়ি নিয়ে ঢুকল ভেতরে। 'ভেজা জামাকাপড় খুলে ফেলো, স্টেলা। বাথরুমটা প্যাসেজের শেষ মাথায়। ইলেকট্রিক গিজারও আছে ওখানে। আমি চালু করে দিয়েছি। তোমার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করছি। জলদি।'
চলে গেল স্টেলা। গের্ডা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আগুন জ্বালাতে। কাগজ আর লাকড়ি দিয়ে দ্রুত আগুন জ্বেলে ফেলল সে ফায়ার প্লেসে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকে দেখল রাজিব। 'খুব কাজের মেয়ে দেখছি।' ঘাড় ঘুরিয়ে রাজিবের দিকে তাকাল গের্ডা। স্থির, সবুজ চোখ। 'আপনারও জামাকাপড় বদলানো দরকার। ভালো কথা, প্যান্ট্রিতে ঢুঁ মেরেছিলাম। কিছু খাবার চোখে পড়ল। রাতটা না খেয়ে কাটাতে হবে না।'
মাথা চুলকাল রাজিব। 'কিন্তু বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া এভাবে তাদের জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হচ্ছে না।'
'আপনার সঙ্গে আমার দর্শন মিলবে না।' ঘুরে দাঁড়াল গের্ডা, পা বাড়াল দরজায়। 'আপনার তো অনেক টাকা, তাই না? ওখান থেকে কিছু ছাড়ুন না। জগতের এটাই নিয়ম। যার আছে তার বেশি বেশি দিতে হয়।'
গের্ডা চলে যাওয়ার পরে দ্রুত ভেজা পোশাক খুলে ফেলল রাজিব। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফ্লানেল ট্রাউজার আর সাদা সিল্কের জামার ওপর ভারী সোয়েটার চাপাল। তারপর ভেজা কাপড়গুলো রেখে এলো বাথরুমে।
গের্ডা টকটকে লাল রঙের ড্রেসিং গাউন পরেছে, লম্বা পায়ে টার্কিশ স্লিপার। রান্না করছে। টেবিলের ওপর তিনটে বড় বড় ককটেল শেকার আর তিনটে গ্লাস।
একটা শেকার তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল রাজিব। 'আরে, তুমি তো রীতিমতো পার্টির ব্যবস্থা করে ফেলেছ।'
গের্ডা রাজিবের দিকে না তাকিয়েই হালকা গলায় বলল, 'আপনি স্টেলাকে খুব পছন্দ করেন, না?'
থমকে গেল রাজিব, একটা গ্লাস তুলতে যাচ্ছিল, হাতটা থেমে রইল ওখানে। 'মানে! কী বলতে চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠ।
'কী বলতে চাই,' গের্ডা গ্রিলে আটকানো মাংসের বড় একটা টুকরো নাড়াচাড়া করছে আগুনের ওপর, 'তা আপনি ভালো করেই জানেন। ওর সঙ্গে শুতে চান?'
অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল রাজিব। ককটেল ঢালল দুটো গ্লাসে, গ্লাস জোড়া নিয়ে চলে এলো গের্ডার পেছনে। একটা রাখল ওর পাশে। 'এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নই আমি' বলল সে। 'এরকম কথা যারা বলে বোঝাই যায় তারা কোত্থেকে এসেছে।'

NRBC
PLANET
প্রবাসীর স্বপ্ন
এনআরবিসি ব্যাংক
NRBC BANK
এনআরবিসি
ইসলামিক ব্যাংকিং
১০ বছর পূর্তি
প্রবাসীর স্বপ্ন
আপনার দুয়ারে ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংকের দশক পূর্তিতে
সম্মানিত সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

গের্ডা নিজের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। 'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না।'

নিজের ড্রিংকটা শেষ করল রাজিব, ঢালল আরেকটা। 'এ ধরনের বিষয় নিয়ে তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কারণ তুমি হচ্ছো থার্ড পার্টি। আর এসব ব্যাপারে তোমার নাক গলাবার বা পরামর্শ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।'

গের্ডা গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে, প্যান্ট্রি থেকে ডিম আনার জন্য পা বাড়াল। ফিরে এসে বলল, 'আমি বোধ হয় আপনাকে ভুল বুঝেছি। তবে স্টেলাকে দেখে অনেক মেয়েরও মাথা ঠিক থাকে না।'

ঠাণ্ডা গলায় বলল রাজিব, 'তুমিও কি তাদের দলে?'

'ওহ্, নো। চাইলে ওরকম হতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলেই ঘিনঘিন করে ওঠে গা। স্টেলা আমাকে খুব ভালোবাসে। তবে আমি ওর ভালোবাসার অন্যায় সুযোগ নিই না।'

একটা সিগারেট ধরাল রাজিব। বলল, 'তুমি জানো, তুমি দেখতে সুন্দর নও। তবে তোমাকে নিয়ে কখনো কটাক্ষ করে থাকলে ক্ষমা চাইছি।'

হাসল গের্ডা। 'ভণিতা করে কী লাভ? আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি স্টেলাকে চাইছেন। আপনার প্রচুর টাকা। আর আমার ফুটো পয়সাও নেই। কিন্তু আমি টাকা চাই। যে কোনো ভাবেই হোক আমাকে টাকা পেতে হবে। এখন বলুন মি. রাজিব, স্টেলাকে আজ রাতের জন্য পেতে কত টাকা খরচ করতে পারবেন আপনি?'

ঝট করে এক পা এগিয়ে গেল রাজিব গের্ডার দিকে। চেহারা লাল টকটকে। 'চুপ করো!' হিসিয়ে উঠল সে। 'তোমার নোংরা মুখ দিয়ে ওসব কথা আর উচ্চারণ করবে না। বুঝেছ?'

স্থির দাঁড়িয়ে রইল গের্ডা, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে।

'বুঝেছি। বুঝেছি। এ আপনার মনের কথা নয়।' একটা প্লেটে এক জোড়া ভাজা ডিম আর হ্যাম সাজিয়ে রাজিবের হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'খেয়ে নিন। আমি যাচ্ছি। গোসল করা দরকার। তাছাড়া স্টেলাকেও তাড়া দিতে হবে।' চলে গেল গের্ডা। বেকুব হয়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল রাজিব।

গের্ডা বাথরুমে ঢুকে দেখল স্টেলা তখনো গোসল করছে। গের্ডাকে দেখে হাসল স্টেলা। 'আমি কি তোমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রেখেছি, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত গিয়ে বুক ঢাকল, শুয়ে পড়ল কনুইতে ভর দিয়ে।

ধবধবে সাদা শরীরটা দেখতে দেখতে বাথটাবের কোনায় বসল গের্ডা। 'না,' জবাব দিল সে। 'যতক্ষণ ইচ্ছে গোসল করো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মুখে আঁধার ঘনাল স্টেলার। 'আবার কী চাও?'

'যাও। ওর সঙ্গে খেলা করো গে। তোমাকে লোকটার খুব পছন্দ হয়েছে। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মাথা নাড়ল স্টেলা। 'না', ঠোঁট কামড়াল সে। 'পারব না আমি-না!'

'পারতেই হবে। খুব সহজ কাজ। আমি বিছানায় ঢুকব আর তুমি ওর ঘরে চলে যাবে। বলবে ঝড়ো বাতাসে তোমার খুব ভয় লাগছে। একটু অভিনয় করলেই চলবে। লোকটা চাইছে শুরুটা তুমিই করো। তারপর আমি এসে পড়ব। তুমি ঘুমাতে যাবে। বেশি কিছু করতে হবে না তোমায়– ওকে একটু গরম করলেই...

'না!' আবার বলল স্টেলা।

'অমত কোরো না, লক্ষ্মীটি' তোয়াজের সুরে বলল গের্ডা। 'রাজি হয়ে যাও। তুমি রাজি হয়ে গেলে অনেকগুলো টাকা পাব আমরা। মিয়ামির সেরা হোটেলে থাকতে পারব, কিনতে পারব সবচেয়ে দামি পোশাক। যা মন চায় তাই খেতে পারব।'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকল স্টেলা। 'তারপর যখন টাকা ফুরিয়ে যাবে আবার আরেকজনের কাছে আমাকে বিক্রি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে তুমি। যেভাবে ডেটোনা বিচে করেছ, করেছ ব্রুকলিন এবং নিউ জার্সিতে। না-না-না!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গের্ডা। 'আমাদের একমাত্র পুঁজি তুমি। তুমিইআমার সঙ্গে আসতে চেয়েছ। চাওনি? আমি কি তোমাকে আসতে বলেছিলাম? তোমার কি ধারণা আমি একা কাজ উদ্ধার করতে পারি না? আমি আগে কীভাবে কাজ করেছি যখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না? কাজ করতে আমি ভয় পাই না। আমার গায়ে শক্তি আছে, তোমার মতো দুর্বল নই। তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছ– তুমি সাহায্য না করলে কি আমি বাঁচব না? তোমাকে সুখী করার জন্য আমি কী না করেছি। সে সব কথা ভুলে যেতে পারো না।'

বাথটাব থেকে নেমে এলো স্টেলা, একটা তোয়ালে পেঁচাল গায়ে। অল্প অল্প কাঁপছে। 'আমাকে আর কতদিন এসব চালিয়ে যেতে হবে?' অভিমানী গলায় জানতে চাইল সে। 'তুমি কি আমাকে আর ভালোবাসো না? এভাবে আমি ব্যবহার হয়ে চলেছি এতে তোমার কষ্ট হয় না?'

গের্ডা স্টেলাকে জড়িয়ে ধরল, আদর শুরু করল। জানে কড়া ডোজের পর আদর করলে সব ভুলে যায় স্টেলা। ওর কথার অবাধ্য হয় না।

দুই

রাজিব খাওয়া শেষ করেছে, এমন সময় হালকা নীল একটা আলোয়ান গায়ে ঘরে ঢুকল স্টেলা। ফর্সা শরীরে দারুণ মানিয়েছে। আবার ককটেল মেশাচ্ছে রাজিব। ছ'টা পান করা শেষ, গরম হয়ে উঠছে গা। স্টেলাকে দেখে হাসল।

'কেমন বোধ করছো এখন?' জিজ্ঞেস করল রাজিব। 'তোমাকে চমৎকার লাগছে। নাও একটা জিন এবং দুবনেট পান করো। চাঙ্গা হয়ে উঠবে। রাঁধতে পারো? আমি পারি না। তোমার খাবার তোমার নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে।'

স্টেলা ড্রিংকসটা নিল। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নার কাজে। 'আপনি গোসল করবেন না, মি. রাজিব?' জানতে চাইল। ডানে-বামে মাথা নাড়ল রাজিব। 'না।'

গ্রিলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্টেলা, ওটা গরম হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজিবের দিকে পেছন ফিরে আছে ও, আলোয়ানটা একবার ঢিলে করল। তারপর, ফুটন্ত তেল যাতে আলোয়ানে না লাগে এমন ভান করে ওটা শক্ত করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল।

রাজিব স্টেলার মেদহীন শরীরের শ্বাসরুদ্ধকর খাঁজ ভাঁজ দেখতে পাচ্ছে, গোল নিতম্বের কার্ভগুলো ওকে সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তুলল। স্টেলা ভীষণভাবে টানছে ওকে। ঘুরে দাঁড়াল রাজিব, আরেকটা ড্রিংকস নিল। 'তোমার কুৎসিত বান্ধবীটা কোথায়?' ফস করে প্রশ্ন করে বসল ও।

আড়ষ্ট হয়ে গেল স্টেলা। 'গের্ডা?' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রাজিবের দিকে। 'ওকে কুৎসিত বললেন কেন?'

শ্রাগ করল রাজিব। 'সরি। ফরগেট ইট। আমি ভুলেই গেছিলাম ও তোমার বন্ধু।'

'গের্ডা গোসল করছে। সহজে বেরুবে না বাথরুম থেকে। গোসল করতে খুব ভালোবাসে ও। বলেছে নিজেই নিজের সাপার বানিয়ে নেবে।'

'তোমার বয়স কত?' স্টোভের গায়ে হেলান দিল রাজিব। এবার স্টেলার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। 'তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি একটি খুকুমণি।'

লাল হয়ে গেল স্টেলা। 'উনিশ। আগামী মাসে কুড়িতে পা দেব।'

'এরকম একটা জীবন যাপন করছো। খারাপ লাগে না? আসলে আমি জানতে চাইছি তোমাকে দেখাশোনার কেউ নেই? বাবা-মা?'

ডিম ভেঙে প্যানে ছেড়ে দিল স্টেলা। 'না আমার কেউ নেই। আসলে এবারই আমরা ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম। ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়িওলি আমাদের জিনিসপত্র রেখে দিয়েছে।'

রাজিব সরে এলো স্টেলার পাশে। 'এই মেয়েটা- গের্ডা। তোমার সঙ্গিনী হিসেবে তাকে মোটেই মানাচ্ছে না। সত্যি করে বলো তো, ওর জন্য কখনো তোমাকে ঝামেলায় পড়তে হয়নি?'

স্টেলা তাকাল রাজিবের দিকে। চোখের তারায় রাগ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। 'গের্ডা আমার খুব ভালো বন্ধু।'

কাঁধ ঝাঁকাল রাজিব, ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না সে। স্টেলাকে তার ভবঘুরে আর সস্তা মনে হয়নি। অমন মেয়ে হতেই পারে না স্টেলা। তাহলে গের্ডা অমন প্রস্তাব দিল কীভাবে? সে কী করে ভাবল স্টেলা রাজি হয়ে যাবে? এমন কি হতে পারে স্টেলা রাজিবকে পছন্দ করতে শুরু করেছে? অনেকগুলো ককটেল গিলে খানিকটা মাতাল হয়ে পড়েছে রাজিব। তার মনে হচ্ছে স্টেলা আসলে তাকে পছন্দ করে। খুব মজা হয় স্টেলাকে নিয়ে এখন কেটে পড়লে। গের্ডা থাকুক এখানে।

স্টেলার পিছু পিছু ডাইনিং রুমে চলে এলো রাজিব, বসল ওর বিপরীতে। স্টেলা খাচ্ছে, বসে বসে তাই দেখল। বাইরে ঝড়ো হাওয়া আর দমকা বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে দেয়ালে, থর থর করে কেঁপে উঠছে বাড়ি। স্টেলার খাওয়া শেষ হলে জোর করে প্লেট নিয়ে গেল রাজিব। ফিরে এলো মেয়েটির জন্য ককটেল-শেকার বানিয়ে। আগুনের ধারে, বড়, গদি আঁটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে আছে স্টেলা। আলোয়ানটা খোলা, নগ্ন পা দেখা যাচ্ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে আলোয়ানটা দ্রুত পেঁচিয়ে নিল গায়ে। কিন্তু এর মধ্যে যা দেখার দেখে ফেলেছে রাজিব। রাজিব টের পেল ওর সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। সে আস্তে গিয়ে বসল স্টেলার পাশে।

স্টেলা বলল, 'ধনী হতে পারা খুব মজার, না?'

অবাক হলো রাজিব। 'অবশ্যই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

'জানেন কিছু কিছু লোকের কাছে টাকা অনেক কিছু। তবে আমার কাছে নয়। একবার এক লোকের কাছে একশো ডলারের একটা নোট দেখলাম। জীবনে ওই প্রথম একশো ডলারের নোট দেখেছি আমি। টাকাটা পেয়ে লোকটার সেকি পাগলামি!'

হেসে উঠল রাজিব। হিপ পকেট থেকে পেট মোটা এক ওয়ালেট বের করল। 'হাজার ডলারের নোট দেখেছ কখনো'? জিজ্ঞেস করল সে ওয়ালেট খুলতে খুলতে। 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি পাগলামি করছি?'

ওয়ালেট খুলে নোটের একটা তাড়া বের করল রাজিব। স্টেলাকে দেখাল ওতে পনেরটা এক হাজার ডলার এবং অনেকগুলো একশো ডলারের নোট আছে। অতগুলো টাকা দেখে চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল স্টেলার। 'ওহ্' বলল সে, 'টাকাগুলো সরিয়ে রাখুন। এগুলো-' এমন সময় গের্ডা পেছন থেকে নরম গলায় বলে উঠল, 'অনেক টাকা। এ টাকায় কয়েক মাস ভালোভাবে থাকা যায়। লিঙ্কন রোডে গিয়ে যা মনে চায় তাই কেনা সম্ভব। অ্যালেন-এ খাওয়া ও ড্যাচেসে যাওয়া...সব এ টাকায় সম্ভব। মিয়ামি আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে।'

পাঁই করে ঘুরল রাজিব, বন্ধ করে ফেলেছে ওয়ালেট। 'তুমি আবার উদয় হলে কোত্থেকে?'

গের্ডা তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সবুজ চোখ চোখ নয় যেন কাচের টুকরো, কঠিন। তবে অভিব্যক্তিশূন্য। 'আপনি খুব ভাগ্যবান মানুষ, মি.রাজিব।' বলল সে। 'আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। কাল বোধ হয় থেমে যাবে ঝড়। তারপর আমরা চলে যাব যে যার রাস্তায়। তবে আপনাকে কোনোদিন ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।' দরজার দিকে পা বাড়াল সে, ঘুরে দাঁড়াল। 'গুড নাইট, মি. রাজিব।' দরজা বন্ধ করে চলে গেল গের্ডা।

রাজিব তাকাল স্টেলার দিকে। 'ও কী বলে গেল কোনোদিন ভুলতে পারবে না। মানে কি এ কথার?'

স্টেলাকে ম্লান আর বিষণ্ন লাগল। 'জানি না আমি,' বলল সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজনে। বাতাসের আর্তনাদ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। রাজিব চেষ্টাকৃত হাসি দিল। 'তোমার বান্ধবী ঘুমাতে গেছে। তুমি আরেকটা ড্রিংকস নেবে?'

মাথা নাড়ল স্টেলা। নেবে না। চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে, ওর হাত ধরে ফেলল রাজিব। 'যেয়ো না' বলল সে। 'তুমি জানো এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমার মিষ্টি কণ্ঠটি শুনতে চাই।' রাজিব উঠে বাতি নিভিয়ে দিল। শুধু ফায়ার প্লেসের আগুনে আলোকিত হয়ে থাকল ঘর। সে বসল স্টেলার প্রায় গা ঘেঁষে।

'এখন আরও রোমান্টিক লাগছে না?' একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল স্টেলার হাতে। 'নাও। এটা খেয়ে নাও। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি। তাছাড়া এখানে ক'দিনের জন্য আটকা পড়ে গেছি কে জানে। পরস্পরকে জেনে নেওয়ার এই সুযোগটা হারাই কেন?'

টেবিলের পাশে গ্লাসটা রেখে দিল স্টেলা। 'আমি যাই। সত্যি, মি. রাজিব, আপনার সঙ্গে আমার থাকা সম্ভব নয়। এটা-এটা ঠিক না।'

'মিস্টার বাদ দাও। আমাকে স্রেফ রাজিব বলে ডাকতে পারো না? অচেনা এক লোকের বাড়িতে এমন ঝড়ের রাতে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, আগুনের সামনে বসে কথা বলছি। ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর লাগছে না তোমার কাছে? আমার কাছে তো রূপকথা মনে হচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারছি, রাজিব। কিন্তু আমার ওখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। গের্ডা হয়তো-'

স্টেলার মাথার পেছনে হাত চালিয়ে দিল রাজিব, ঝুঁকে এলো ওর দিকে। 'গের্ডা গোল্লায় যাক। একটা ঘণ্টা অন্তত সময়টাকে স্থির করে দিতে পারো না? তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা আমাকে বলতে দাও। বলতে দাও এই কুৎসিত পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র সুন্দরী মানবী। তোমার সৌন্দর্যের কাছে বিবর্ণ হয়ে গেছে ঝড়ের শক্তি। আমার দিকে তাকাও, স্টেলা। একটা ঘণ্টার জন্য কি আমরা রূপকথার রাজ্য থেকে ঘুরে আসতে পারি না। তুমি কি ভুলে যেতে

পারো না কে তুমি আর কে আমি। এই পৃথিবীকে ভুলে আমার সঙ্গে আসতে পারো না?' স্টেলাকে নিজের কাছে টেনে আনল রাজিব। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা, কাঁপতে কাঁপতেই নিজেকে সমর্পণ করল রাজিবের কাছে।

রাজিব স্টেলার নরম অধরে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল। সেই মুহূর্তে স্টেলাকে একান্তভাবে পাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে জেগে উঠল মনে। বাতাসের শোঁ শোঁ, বজ্রপাতের গুড়ুম গুড়ুম কোনো কিছুই এখন তার কানে যাচ্ছে না। এত তীব্র আকর্ষণ সে কোনোদিন অনুভব করেনি কোনো মেয়ের প্রতি। আলোয়ানের বাঁধন আলগা করল রাজিব, কাঁধ থেকে খসে পড়তে দিল ওটাকে।

তিন

অন্ধকার ছায়ার মতো ঘরে ঢুকল গের্ডা, দাঁড়াল ওদের পেছনে। আগুনের শিখা ওর চোখে প্রতিচ্ছবি ফেলেছে, রাজিবের কাঁধের ওপর থেকে সঙ্গিনীকে দেখে ফেলল স্টেলা। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, চিৎকার করছে গের্ডাকে হাতে কিছু একটা তুলতে দেখে। ঝিলিক দিয়ে উঠেছে জিনিসটা আগুনে।

স্টেলা শরীরের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল রাজিবকে। তার আগেই ঝিলিক মেরে ওঠা জিনিসটা বিদ্যুৎগতিতে নেমে এলো রাজিবের গলা লক্ষ্য করে, খক করে কেশে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে স্টেলার বুকের ওপর। জান্তব চিৎকার দিয়ে রাজিবকে মেঝের ওপর ঠেলে ফেলে দিল স্টেলা, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এ কি করলে তুমি!' চেঁচাচ্ছে সে গের্ডার দিকে তাকিয়ে। 'এ কি সর্বনাশ করলে!' টলতে টলতে বাতির ধারে গেল স্টেলা, অন করল সুইচ।

ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে আছে রাজিব, কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করছে। একটা লম্বা, সরু ব্লেডের টেবিল-নাইফ তার ঘাড়ের গভীরে গেঁথে আছে। শুধু রুপোলি বাঁটটা বেরিয়ে রয়েছে। দৃশ্যটা দেখে তীব্র আতঙ্কে মুখে হাত চাপা দিল স্টেলা।

রাজিবের সাদা শার্ট লাল হয়ে গেছে রক্তে, এখন মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে। ছুরির বাঁটটা ধরার চেষ্টা করছে রাজিব, যেন এখনো বিশ্বাস হতে চাইছে না মারা যাচ্ছে সে। খুবই নিচু গলায় গোঙাতে গোঙাতে সে গের্ডাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে মারলে?'

গের্ডা কিছু বলল না। স্থির দৃষ্টিতে রক্তের লাল ফিতেটাকে দেখছে। ওটা ক্রিম রঙের কার্পেটটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'তোমাদের বিশ্বাস করে কী যে ভুল করেছি আমি' হাঁপাচ্ছে রাজিব। 'টাকার জন্যই আমাকে মেরেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাদের তো আমার অমন কিছু মনে হয়নি। আমাকে মেরে কী লাভ তোমার? ওভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? একটা ডাক্তার ডাকো। নইলে রক্তক্ষরণেই মারা যাব আমি।'

'হ্যাঁ।' হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল স্টেলা। 'ডাক্তার ডেকে আনো। ফর গডস সেক!'

দাবড়ি দিল গের্ডা। 'শাট আপ!' সে মুখ কুঁচকে সরে গেল রাজিবের পাশ থেকে।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?' আতঙ্ক রাজিবের চোখে। 'আমাকে বাঁচাও। ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। দেখছো না রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছি আমি?'

স্টেলা বেঞ্চির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কেঁদে ফেলল হু হু করে। বাইরে, বাতাসের দাপাদাপি চলছে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দ আর ছাদে বৃষ্টির আওয়াজ। গের্ডা দ্রুত পা ফেলে চলে এলো স্টেলার কাছে। চুলের মুঠি ধরে মুখটা উঁচু করল, তারপর প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল।

চড় খেয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল স্টেলার, থেমে গেছে কান্না। 'তোমাকে চুপ থাকতে বলেছি', হিসিয়ে উঠল গের্ডা। 'কথা কানে যায় না?'

অনেক কষ্টে হাঁটু মুড়ে বসল রাজিব, তারপর একটা চেয়ার ধরে টলতে টলতে সিধে হলো। 'আমাকে বাঁচাও, স্টেলা,' ফোঁপাচ্ছে ও। 'আমাকে মরতে দিয়ো না। স্টেলা-বাঁচাও আমাকে।'

ছুরির হাতলটা ধরল রাজিব, টেনে বের করার চেষ্টা করল। তীব্র ব্যথা ঘাই মারল শরীরে। সহ্য করতে না পেরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও। স্টেলা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এলো তোয়ালে নিয়ে। 'এটা নাও' উন্মাদের মতো বলল সে গের্ডাকে। 'এটা দিয়ে চেপে রক্ত থামাও।'

গের্ডা একটানে তোয়ালেটা ছিনিয়ে নিল স্টেলার হাত থেকে, দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে গেল রাজিবের কাছে। ছুরির বাঁটটা ধরল শক্ত হাতে, টান মেরে ছুটিয়ে আনল ক্ষত থেকে। ঘর ফাটিয়ে চিৎকার দিল রাজিব, ঘাড় থেকে ঝরনার মতো কলকল করে বেরোতে লাগল রক্ত। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও মেঝেতে। খাঁমচে ধরল রক্তাক্ত কার্পেট। কাটা মুরগির মতো পা দাপাল খানিকক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল। মৃত্যুর সময় পাঁচ বছর আগে মৃত মায়ের মুখখানা মনে পড়ল ওর। ওর মা কতবার ওকে বাংলাদেশে যেতে বলেছিলেন। একমাত্র সন্তানকে শেষবার দেখতে চান। কিন্তু টাকা কামাবার নেশায় উন্মত্ত রাজিব দেশে ফেরার কথা কখনোই ভাবেনি। এমনকি মা মারা যাওয়ার পরে লাশটাও দেখতে যায়নি ওইসময় দেশে ফিরলে এক

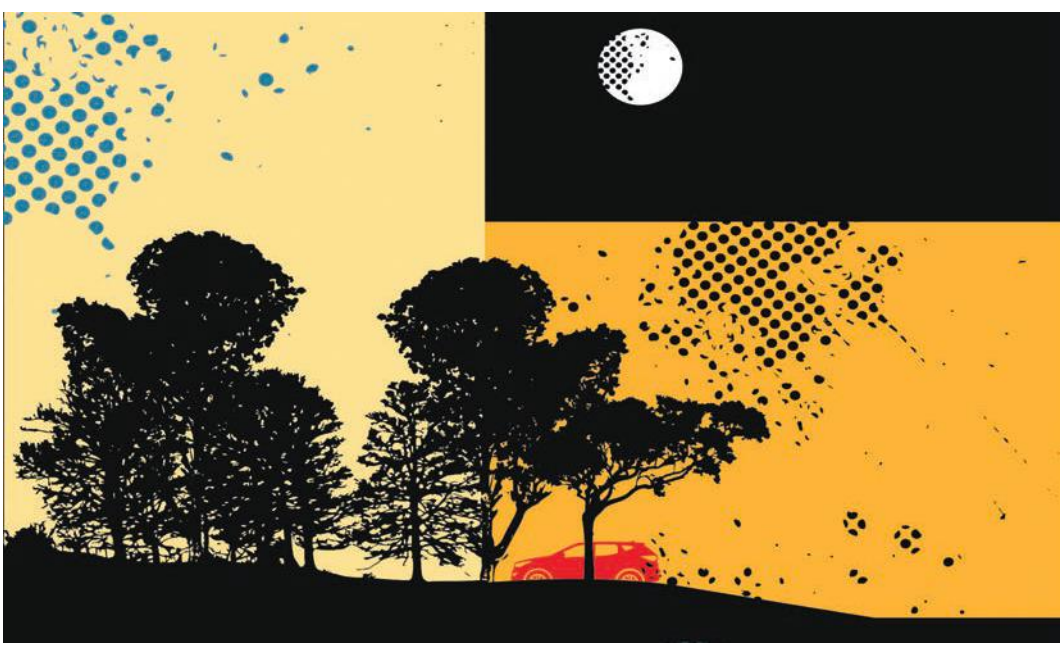

লাখ ডলারের একটা ডিল হাতছাড়া হয়ে যেত বলে!
রাজিবের ঘাড় বেয়ে এখনো সমানে রক্ত বেরুচ্ছে। তারপর এক সময় প্রবাহটা ধীর হয়ে এলো, বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া।
মেয়ে দুটি দেখছিল রাজিবকে। আতঙ্কিত স্টেলা চোখ সরাতে পারছে না।
প্রথমে কথা বলল গের্ডাই, 'মারা গেছে ও। তুমি এখন কিচেনে যাও।'
স্টেলা দৌড়ে এলো। 'না। তুমি কী করবে আমি ভালো করেই জানি। ওর টাকা নিয়ে নেবে। এজন্যই ওকে খুন করেছ।'
'ওর এখন আর টাকার দরকার নেই' বলল গের্ডা। 'তুমি পাশের ঘরে যাও। নইলে কিন্তু খুব রাগ করব।'
স্টেলা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। ও চলে যেতেই কাজে লেগে পড়ল গের্ডা। খুব সাবধানে রাজিবকে ডিঙাল ও, কার্পেটের রক্ত যেন পায়ে না লাগে। তারপর রাজিবের হিপ পকেট থেকে বের করল ওয়ালেট। সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে ওয়ালেটটা রেখে দিল যথাস্থানে। নোটের তাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল গের্ডা। টাকাগুলো মুঠো পাকাল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। অবশেষে আমি মুক্ত, ভাবছে গের্ডা। আর অভাব স্পর্শ করতে পারবে না আমাকে।
স্টেলাকে কিচেনে পেল গের্ডা। নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে, কাঁপছে। ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে আধ শুকনো জামাকাপড় পরতে লাগল গের্ডা। টাকার বান্ডিলটা ঢোকাল ট্রাউজারের পকেটে, নোংরা কালো সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে ফিরল স্টেলার দিকে। 'কাপড় পরে নাও এক্ষুনি' হুকুম করল ও। 'আর প্যানপ্যানানি বন্ধ করো। কেঁদে কোনো ফায়দা হবে না।'
স্টেলা ফিরেও চাইল না। মেজাজ হারাল গের্ডা, স্টেলাকে এক ঝটকায় চেয়ার থেকে দাঁড় করিয়ে রীতিমতো ঝাঁকি দিতে লাগল। 'জামাকাপড় পরতে বলেছি, গাধা মেয়ে' চেঁচাল সে। 'কথা কানে যায় না?'
ফাঁকা চোখে গের্ডাকে দেখল স্টেলা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি শুরু করল।
ওকে ছাড়ল না গের্ডা, এক টানে আলোয়ান খুলে ফেলল গা থেকে, তারপর জোর করে কাপড় পরাতে লাগল। আর জোরাজুরি করল না স্টেলা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে সারাক্ষণ ফুঁপিয়েই চলল। স্টেলাকে জামা পরিয়ে আবার ঝাঁকি দিল। কিন্তু স্টেলা যেন সমস্ত বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। সাড়া মিলল না। ওকে দিয়ে কাজ হবে না বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল গের্ডা।
স্টেলাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানেই থাকো। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না।'
সদর দরজা খুলল গের্ডা। এখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, তবে কমে এসেছে বাতাসের বেগ। সাহস করে বাইরে এলো গের্ডা। দেখল হাঁটতে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না।
আবার বাড়িতে ঢুকল গের্ডা। রাজিবের জামাকাপড়গুলো জড়ো করল। ওগুলো-সহ সুটকেসটা নিয়ে গেল গাড়িতে। পেছনের সিট থেকে বড় একটা কম্বল নিয়ে ফিরে এলো লাউঞ্জে। কম্বলটা দিয়ে মুড়ে দিল রাজিবকে, তারপর পা ধরে টানতে টানতে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলো। লিঙ্কনের পেছনের দরজা খুলে রাজিবের লাশ ঢোকাল ভেতরে। কাজটা করতে সময় লাগল প্রচুর।
একদম ভিজে গেছে গের্ডা, জামাকাপড় লেপ্টে আছে গায়ে। রাজিবকে গাড়িতে তুলতে জান বেরিয়ে গেছে তার। কয়েক ঢোক হুইস্কি গেলার পরে একটু চাঙ্গা লাগল।
এখনতক সব ভালোয় ভালোয় মিটেছে, মনে মনে ভাবল গের্ডা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে। ঘরের এমন দশা রেখে কেটে পড়ার সাহস পাচ্ছে না গের্ডা। যাওয়ার আগে সমস্ত প্রমাণ তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। লিঙ্কনের রানিং বোর্ডে গ্যাসোলিনের অতিরিক্ত একটা ক্যান দেখেছে গের্ডা। ওটা নিয়ে এলো। ক্যানটা লাউঞ্জে রেখে ঢুকল কিচেনে।
স্টেলা আগের মতোই বসে আছে চেয়ারে। কান্না থেমেছে। তবে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠছে। 'এখন চলে যাব' জানাল গের্ডা ওকে। 'ফর গডস শেক, উঠে পড়ো।'
'লিভ মি- গো অ্যাওয়ে! লোকটা বলেছিল তুমি ভালো মানুষ নও। আমি বিশ্বাস করিনি তার কথা। আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল সে। ওহ্, এমন কাজ তুমি করতে পারলে?' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে লাগল স্টেলা।
গের্ডার চেহারায় হঠাৎ অদ্ভুত একটা ভাব ফুটল। ওকে ভীষণ কুৎসিত আর বুড়ি লাগছে। বলল, 'টাকাটা শুধু আমার জন্য নিইনি, তোমার জন্যও নিয়েছি। আমরা এখন ধনী হতে পারব, স্টেলা। আমাদের আর আঁস্তাকুড়ের খাবার খেতে হবে না। কোনো পুরুষের সঙ্গে তোমার আর ছলনাও করতে হবে না। ওই সবই এখন থেকে অতীত। এর কি কোনো মূল্য নেই?'
'তুমি এত নিরুদ্বেগে কথা বলছ কী করে? একটা লোককে মেরে ফেলেছ। তোমার কোনো অনুতাপ হচ্ছে না? তোমার হৃদয় কি এতই পাষাণ যে নিজের কৃতকর্মের জন্য ভয় হচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছ না?'
'লাশটাকে গাড়িতে রেখে এসেছি' বলল গের্ডা। 'নদীতে লাশ-সহ গাড়ি ফেলে দেব। খুব গভীর নদী। লোকটার আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। তারপর আরেকটা গাড়ি চড়ে মিয়ামি চলে যাব। তারপর লোকটার টাকা দিয়ে উপভোগ করব জীবন।'
কটমট করে গের্ডার দিকে তাকাল স্টেলা। 'সে-রকমই ইচ্ছে বুঝি তোমার? বাড়িটার কী হবে? রক্তের দাগ?'
'বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব। লোকে ভাববে বাজ পড়ে পুড়ে গেছে।'
মুখ সাদা হয়ে গেল স্টেলার। 'রাজিব ঠিকই বলেছিল। তুমি আসলেই একটা ডাইনি। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝো না। যাও, যা খুশি করো গে। আমি তোমাকে বাধা দেব না। তবে তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না আমি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব তাও ভালো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর নয়। তোমার চেহারাও আর দেখতে চাই না।'
চিন্তিত চেহারা নিয়ে স্টেলার দিকে তাকাল গের্ডা। 'কিন্তু আমি তো তোমাকে তা করতে দিতে পারি না। তুমি কারও কাছে মুখ খুলতে পারো। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি, স্টেলা। তবে আমারও ধৈর্যের সীমা আছে।' গের্ডার গলা অস্বাভাবিক শান্ত, তবে চোখ জোড়া জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।
মাথা নেড়ে স্টেলা বলল, 'আমি কারও কাছে মুখ খুলব না। সে ভয় তোমাকে পেতে হবে না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। প্রার্থনা করি তোমার সঙ্গে যেন আর কোনোদিন দেখা না হয়।'
স্টেলা এখন অনেকটাই শান্ত। ওর একমাত্র চিন্তা গের্ডার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে সে।
হাত বাড়িয়ে দিল গের্ডা। 'আমরা তো বন্ধু ছিলাম। যাওয়ার আগে হ্যান্ডশেক করে যাও। জানি আমি ভুল করেছি। কিন্তু...' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'যাক, যা গেছে গেছে। এসো, স্টেলা। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও।'
সামান্য ইতস্তত করল স্টেলা। দরজার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এলো আবার। 'গড তোমার সহায় হোন, গের্ডা।'
হাত নয়, স্টেলার নরম গলা ইস্পাতের হুক যেন আটকে ধরল। দু'হাতে ওর গলা চেপে ধরেছে গের্ডা। হিসহিস করে বলল, 'গাধা মেয়ে। ভেবেছিস তোকে আমি বিশ্বাস করব? তুই যে আমার খুনের কথা বলে দিবি তা আমি জানি না ভেবেছিস? আমার পনের হাজার ডলারে ভাগ বসানোর জন্য তোর মতো শত শত মেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। তুই তোর রাজিব নাগরের কাছে যা। যা!'
স্টেলাকে ল্যাং মেরে মেঝেতে ফেলে দিল গের্ডা, বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে গলা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল স্টেলার বুকে। স্টেলা প্রবল ধস্তাধস্তি করছে কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে শক্তি। প্রচণ্ড শক্তিতে স্টেলার গলা চেপে ধরে রাখল গের্ডা। কয়েক মিনিটের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল স্টেলা। স্থির হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গের্ডার দিকে।
ওকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গের্ডা হাঁপাতে হাঁপাতে। আঙুল ব্যথা করছে। স্টেলার দিকে তাকাল ও। দুঃখ লাগল নিষ্পাপ মুখখানার দিকে তাকিয়ে। তাও এক মুহূর্তের জন্য। বাতাস থেমে গেছে। ওর এখনো প্রচুর কাজ পড়ে আছে। প্রতিটি সেকেন্ড এখন মূল্যবান।
স্টেলার লাশ পাঁজাকোলা করে তুলে নিল গের্ডা। তারপর প্রায় ছুটে চলে এলো গাড়িতে। রাজিবের গায়ের ওপর ছুড়ে ফেলল স্টেলাকে, বন্ধ করল দরজা, আবার দৌড়ে ঢুকল বাড়িতে। খুব দ্রুত সব ক'টা

ঘরে গ্যাসোলিন ছিটিয়ে দিল গের্ডা। যখন বেরিয়ে এলো ততক্ষণে জানালার গরাদ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। রাস্তার শেষ মাথায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল গের্ডা, তাকাল পেছন ফিরে। দাউ দাউ জ্বলছে বাড়িটা। ছাদ যেন ফুটো করে আগুনের লম্বা জিভ বেরিয়ে পড়েছে, কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ ছুটে আসছে ওর দিকে। সন্তুষ্টি বোধ করল গের্ডা। অল্প সময়ের ভেতরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাড়ি। সে হাইওয়ের দিকে গাড়ি ছোটাল।

এখনো বৃষ্টি পড়ছে তবে মরে গেছে বাতাস। দূরে ফোর্ট পিয়ার্সের আলো নজরে এলো। দরকার হলে হেঁটে পৌঁছুবে সে ওখানে, সিদ্ধান্ত নিল গের্ডা।

ইন্ডিয়ান রিভার আঁধারেও জ্বলছে, গাড়ি চালাতে চালাতে পছন্দসই জায়গা খুঁজছে গের্ডা। পেয়েও গেল একটা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও। লম্বা, টানা হাইওয়ের দিকে তাকাল। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। লিঙ্কনের পেছন দিকে ফিরে চাইতে সাহস হলো না, হ্যান্ড থ্রটল অ্যাডজাস্ট করার সময় কেঁপে উঠল গের্ডা। রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে গিয়ার অ্যাডজাস্ট করল, গাড়িটা সামনের দিকে লাফ মারতেই চট করে গাড়ি ছেড়ে সরে এলো। দেখছে গাড়ি এবং তার যাত্রীদের অন্তিম দশা।

ঢালু তীরে পৌঁছে যেন ইতস্তত করল লিঙ্কন, তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল। দৌড়ে গেল গের্ডা। ইঞ্জিন বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে গেছে লিঙ্কনে। ডুবে গেল নদীতে।

চার

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে গের্ডা। কোনো গাড়ি পেলে লিফট চাইবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্রাক আসতে দেখল। এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেছে ও। ঠাণ্ডা লাগছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে জামাকাপড় ভেজা। সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে। রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল গের্ডা। হাত তুলল। থামতে বলছে ট্রাকটাকে। ব্রেক কষল ট্রাক। দৌড়ে গেল গের্ডা।

ড্রাইভার উঁকি দিল। তবে তার চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'ফোর্ট পিয়ার্সে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল গের্ডা, ট্রাক ড্রাইভারের চেহারা দেখার চেষ্টা করছে। 'আমাকে একটা লিফট দেবেন?'

'অবশ্যই,' দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। 'উঠে পড়ুন।'

ড্রাইভারের পাশে বসল গের্ডা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল গাড়ি। ড্রাইভার বিশালদেহী। ঘন দাড়ি-গোঁফ মুখে। বানরের মতো লাগছে দেখতে। ড্রাইভারও আড়চোখে ওকে লক্ষ করছে খেয়াল করল গের্ডা।

'কোত্থেকে আসছেন?' ঘড়ঘড়ে, কর্কশ গলা ড্রাইভারের।

'ডেটোনা বিচ থেকে'। দু'হাতের তালু ঘষল গের্ডা, শীতে কাঁপছে। 'ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। এক জায়গায় থেমেছি কিছুক্ষণ। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করেছি।'

'হাহ্,' থু করে একদলা থুথু ফেলল ড্রাইভার রাস্তায়। 'আসার পথে একটা বাড়ি দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাজটাজ পড়েছে বোধহয়।'

গের্ডা কিছু বলল না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ঘুম আসছে।

'এরকম একটা জায়গায় একা একা চলছেন। ভয় করেনি?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার!

শরীর শক্ত হয়ে গেল অর্ডার। 'আমার ডরভয় কম' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। 'এক লোক আমার সঙ্গে একবার ফাজলামি করার চেষ্টা করেছিল। এখনো সে সেদিনের কথা মনে পড়লে আঁতকে ওঠে।'

'খুব কঠিন মানুষ, অ্যাঁ?' খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল ড্রাইভার। 'কঠিন মেয়েমানুষই আমার পছন্দ।'

'মেয়েদের কঠিন হওয়াই দরকার, নয় কি?' হালকা গলায় বলল গের্ডা।

আবার বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসল ড্রাইভার। 'বেশ বেশ। কী রকম কঠিন মেয়ে তুমি দেখি।' ব্রেক কষল সে। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রাক। 'ট্রাকের পেছনে চলো খানিকক্ষণের জন্য।'

'এসব ফাজলামি পছন্দ করি না আমি' তীক্ষ্ণ গলায় বলল গের্ডা। 'গাড়ি ছাড়ো। ফোর্ট পিয়ার্সে পৌঁছে দাও। উপযুক্ত ভাড়া পাবে।'

ঝট করে ঘুরল ড্রাইভার। 'আচ্ছা?' ভয়ংকর শোনাল তার কণ্ঠ। 'মেয়েদের এত তেজ আমার সহ্য হয় না। জলদি ট্রাকের পেছনে যাও। নইলে কপালে খারাবি আছে। আমি তোমাকে যা দেব তা তোমাকে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি মন্দ লাগবে না তোমার।'

গের্ডা খুলে ফেলল দরজা। 'গোল্লায় যাও তুমি' বলে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। দু'কদমও এগুতে পারেনি, হাঁটুর পেছনে প্রচণ্ড বাড়ি খেল ও, ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। এত জোরে লেগেছে, কয়েক মিনিট মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। নড়াচড়ার শক্তিও নেই। চোখ বুজে ছিল গের্ডা, টের পেল শক্তিশালী এক জোড়া হাত ওকে টেনে তুলছে। চোখ মেলে চাইল। ড্রাইভার ঝুঁকে এলো গের্ডার মুখের ওপর।

গের্ডা বুঝতে পারল ট্রাকের পেছনে ওকে নিয়ে এসেছে ড্রাইভার। কয়েক মুহূর্ত ও কথা বলতে পারল না। হাঁপাতেই লাগল।

'কী খেলবে? নাকি আরও কয়েক ঘা লাগাব?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

গের্ডা হাঁপাতে বলল, 'ঠিক আছে। তুমিই জিতলে। আমাকে একটু সুস্থির হতে দাও।'

ড্রাইভার সরে এলো, ট্রাকের দরজার সামনে দাঁড়াল যাতে গের্ডা পালিয়ে যেতে না পারে। 'তাহলে যতটা কঠিন ভেবেছিলাম ততটা তুমি নও, অ্যাঁ?' বলল সে।

গের্ডা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ব্যথায় টন টন করছে শরীর। সিধে হয়েও কিছুক্ষণ হাঁপাল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড ঘুসি তুলল ড্রাইভারের মুখে। ড্রাইভার প্রস্তুত ছিল। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল একপাশে। গের্ডার ঘুসি তার কানে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ থাবড়া খেল গের্ডা মুখে। ঘুরে পড়ে গেল ও। ভয় পেল গের্ডা এই লোক সহজ পাত্র নয় বুঝতে পেরে।

ড্রাইভার মারতে শুরু করল গের্ডাকে। চড় আর থাবড়ার আঘাতে দরদর করে জল ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে। গের্ডা বৃথাই হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। এবার লোহার মতো তর্জনি দিয়ে ভয়ানক গুঁতো মেরে বসল ড্রাইভার গের্ডার পেটে। ব্যথায় দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো। কেঁদে উঠল গের্ডা। 'এবার হয়েছে?' আরও গোটাকতক চড় মারার পর জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

ব্যথায় কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে গের্ডা। নিঃসাড় পড়ে আছে। জানে এবার চূড়ান্ত হামলা আসবে। টের পেল কর্কশ একজোড়া হাত ওর শরীরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, জামা কাপড় খুলে নগ্ন করে ফেলেছে ওকে। কিন্তু বাধা দিতে পারল না গের্ডা। লাল নীল ফুলকি দেখছে সে চোখে, মগজে আগুন ধরে গেছে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল গের্ডা। মনে হলো অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে। শুনল ড্রাইভার বলছে 'ওয়াও'! দারুণ হতাশ বোধ করল গের্ডা ওর টাকার বান্ডিলটা ড্রাইভার পেয়ে গেছে বুঝতে পেরে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল গের্ডা, হাত বাড়াল টাকাটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু ড্রাইভার ওর চেয়ে চালাক। গের্ডাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল সে, সিধে হলো।

'এ জিনিস কোথায় পেলে?' চেঁচিয়ে বলল ড্রাইভার, নোট ধরা হাতটা কাঁপছে।

'ওটা আমার টাকা। দিয়ে দাও।'

'তাই নাকি? প্রমাণ কি তোমার টাকা?'

'আমি বলছি আমার টাকা' রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলল গের্ডা। 'দিয়ে দাও বলছি।'

নোটগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল ড্রাইভারের পকেটে। 'এ টাকা তুমি নিশ্চয়ই কারও কাছ থেকে মেরে এনেছ। সেই জ্বলন্ত বাড়িটা থেকে টাকাটা পেয়েছ কি না ওপরঅলা জানে। তোমার মতো ফকিরনীর কাছে তো এত টাকা থাকার কথা নয়।'

গের্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রাইভারের ওপর, নখ ঢুকিয়ে দিতে চাইল চোখে। গের্ডার দু'চোখের মাঝখানে সজোরে ঘুসি মারল ড্রাইভার, ফ্লোরবোর্ডে ছিটকে পড়ল মেয়েটা। ওকে লাথি মেরে ফেলে দিল ট্রাক থেকে। ধুপ করে কাদার মধ্যে পড়ে গেল গের্ডা। চোখে আবার লাল-নীল ফুলকি দেখল।

গের্ডার পাশে লাফিয়ে নামল ড্রাইভার। গলা বাড়িয়ে বলল, 'টাকা ফেরত চাইলে ফোর্ট পিয়ার্সে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। ওরা হয়তো তোমাকে টাকা দিয়ে দেবে।' হা হা করে হেসে উঠল সে। লাফ মেরে উঠে পড়ল ট্রাকে। তারপর ছেড়ে দিল ট্রাক।

হামদর্দ

১৯০৬ সাল হতে
বিশ্বস্ত নাম, পরীক্ষিত পণ্য

ঈদের উৎসবে
দ্বিগুণ প্রশান্তিতে

শরবত
রুহ্ আফজা®

Scan to Download
Hamdard App

GET IT ON Google play

BSTI
বি ডি এস ৫২৮
সিএম লাইসেন্স নং-৪৫৫

কাগজ ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন থাকুন

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

হেড অফিস: রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, লেভেল: ১২-১৩, ১১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের
৩ টি বিশেষ
ডিপোজিট প্রোডাক্ট

এসআইবিএল
প্রবাসী
ডিপোজিট স্কিম

বার্ষিক ভিত্তিতে
আকর্ষণীয় মুনাফা

এয়ারপোর্ট থেকে
ঢাকা শহরের মধ্যে
যেকোনো গন্তব্যে
পরিবহণ সুবিধা।

এসআইবিএল
রিটায়ার্ড সিটিজেন
মাসিক বেনিফিট স্কিম

মুনাফার পাশাপাশি
এসআইবিএল হাসপাতালে
৪০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা ও
এ্যাম্বুলেন্স/গাড়িতে (ঢাকা শহরের মধ্যে)
বাসা থেকে হাসপাতালে
পরিবহণ সুবিধা।

হকার্স ডিপোজিট ও
ব্যবসা উন্নয়ন স্কিম

ভাসমান হকার ব্যবসায়ীদের
জীবনমানের উন্নয়নে
এই বিশেষ স্কিমটি
চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিক জমার পরিমাণ
১ লক্ষ টাকা হলে
বিনিয়োগ গ্রহণের সুবিধা।

16491
www.siblbd.com

SIBL
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক
লিমিটেড

মোরশেদ শফিউল হাসান

ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথায় পাস্তারনেক ও লেখকের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ

‘রাজনীতিকরা সব দেশেই প্রায় এক রকম। যেখানে নদী নেই, সেখানেও তারা সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন।’

নিকিতা ক্রুশ্চেভ

স্তালিনের পর যে-মানুষটি প্রায় এক দশক অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে নেতৃত্ব দেন তিনি নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৮৯৪-১৯৭১)। স্তালিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে ম্যালেনকভ, বেরিয়া ও মলোটভ এই তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথমে ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং তারপর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের স্বল্পস্থায়ী পর্বটির অবসান ঘটে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ক্রুশ্চেভের পুরো নাম নিকিতা সের্গেয়েভিচ ক্রুশ্চেভ। প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি (১৯৫৩-১৯৬৪) এবং তারপর একই সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৮-১৯৬৪) হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ক্রুশ্চেভ ছিলেন জাতিতে রুশ, তার জন্ম পশ্চিম রাশিয়ায়, বর্তমানের ইউক্রেন সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে। ক্রুশ্চেভের পূর্বসূরি স্তালিন ছিলেন জর্জিয়। আর ক্রুশ্চেভকে সরিয়ে যথাক্রমে পার্টিপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যারা তার স্থলাভিষিক্ত হন সেই লিওনিদ ব্রেজনেভ ও আলেক্সি কোসিগিন দুজনই ছিলেন জাতিগতভাবে ইউক্রেনীয়। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বের কালে বিভিন্ন সময় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতার অন্য দুই অংশীদার নিকোলাই বুলগানিন ও আনাস্তাস মিকোয়েনের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন রুশ এবং দ্বিতীয়জন আর্মেনীয়। ক্রুশ্চেভের জন্ম কৃষিজীবী পরিবারে, আর তার নিজের কর্মজীবনের শুরু একজন ধাতুশ্রমিক হিসেবে। রাজনীতিতে তার পদার্পণও কারখানা শ্রমিক ইউনিয়নে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। রুশ বিপ্লবের সূচনায় বলশেভিকদের পরিবর্তে মেনশেভিকদের প্রতিই তরুণ ক্রুশ্চেভের সহানুভূতি ছিল বলে জানা যায়। বিপ্লবের দু-বছরের মাথায় তিনি কমিউনিস্ট লালফৌজে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে তিনি পার্টির জেলাপর্যায়ের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছরই তিনি মস্কোতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে ভোটাধিকারহীন একজন প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এরপর পার্টি রাজনীতিতে ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি ইউক্রেনে দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের এই পর্বের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি ইউক্রেন ও ইউক্রেনীয়দের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্তালিনের জীবদ্দশাতেই ক্রুশ্চেভ মস্কোর পার্টিপ্রধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। শেষদিকে বেরিয়া, ম্যালেনকভ, মলোটভ, বুলগানিন প্রমুখের সঙ্গে ক্রুশ্চেভও স্তালিনের ডিনার কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত হন। একাধিক সূত্রে জানা যায়, পলিটব্যুরোর সভা আহ্বানের পরিবর্তে স্তালিন এ সময় তার রাতের খাবার টেবিলে এই কজন লোকের সঙ্গে বসেই সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিতেন। ক্রুশ্চেভের একজন জীবনিকারের মতে বেরিয়া ও ম্যালেনকভের প্রভাব খর্ব করতেই স্তালিন ক্রুশ্চেভকে তার ওই নিকট বৃত্তে নিয়ে আসেন। জানা যায়, ভোররাত অবধি গড়ানো স্তালিনের সে ডিনার পার্টিতে যাতে তিনি ঘুমিয়ে না পড়েন, সেজন্য ক্রুশ্চেভ এ সময় দিনের বেলায়ই খানিকটা ঘুমিয়ে নিতেন।

২

ক্রুশ্চেভের এক দশকের ক্ষমতাকালে তার বিভিন্ন ভূমিকা ও বক্তব্যের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে নন্দিত ও নিন্দিত দুই-ই হয়েছেন। অনেক বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। ক্ষমতায় আসার আড়াই বছরের মাথায় ১৯৫৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে ক্রুশ্চেভ তার পূর্বসূরি স্তালিনের একনায়কত্ববাদী ও নিপীড়নমূলক শাসনের সমালোচনা করেন। ক্রুশ্চেভ অবশ্য তার ভাষণটি দিয়েছিলেন কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনে। আর এ ব্যাপারে পেছন থেকে মূল বা তাত্ত্বিকের ভূমিকাটি পালন করেছিলেন নাকি মিকোয়েন। যাই হোক, ক্রুশ্চেভের এ ভাষণটি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যতটা না, তার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি করে, যা পরে এক রকম স্থায়ী রূপ নেয়। কমিউনিস্ট ব্লকের দেশগুলোর মধ্যে চীন ও আলবেনিয়া

এরপর সোভিয়েতবিরোধী অবস্থান নেয়। অন্য অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও এ বিতর্ককে উপলক্ষ করে আগে-পরে বিভক্ত হয়। আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা-সহযোগিতার নীতি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণাও ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি চীন-আলবেনিয়াসহ সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টদের এক বড় অংশকে বিরূপভাবাপন্ন করে তোলে। সোভিয়েতের এ নীতিকে তাদের কাছে মার্কস-লেনিনের শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব থেকে সরে আসা, শোধনবাদের পথ গ্রহণ এবং শেষ বিচারে বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়। আরও পরে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। যদিও চীনের সঙ্গে মতবিরোধ সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, 'উভয়েই আমরা পুঁজিবাদকে খতম করতে চাই। তফাতটা আসলে সে লক্ষ্য অর্জনের উপায় নিয়ে। কেউ অস্ত্র দিয়ে খুন করতে চাই। কেউ শ্বাসরোধ করে মারতে চাই।' স্তালিনের সমালোচনা করার পরও বলেছিলেন : 'সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় আমরা সবাই স্তালিনিস্ট'।

ক্ষমতায় বসার পর তিনবার ক্রুশ্চেভ চীন সফর করেন। প্রথমবার (১৯৫৪) সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে এবং দ্বিতীয়বার (১৯৫৮) তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীও। ১৯৫৯ সালে চীন বিপ্লবের দশক বার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও ক্রুশ্চেভ যোগ দেন। এসব সফরে চেয়ারম্যান মাও ও অন্য চীনা নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠক হয়। এর আগে ১৯৫০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে এক মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে মাও সে তুং মস্কো গিয়েছিলেন। দেশের বাইরে সেটা ছিল মাওয়ের প্রথম সফর। তবে জানা যায়, চীন বিপ্লবের ব্যাপারে যেমন, তেমনি চীনের সঙ্গে এই চুক্তির বিষয়েও প্রথমদিকে স্তালিন তেমন আগ্রহ দেখাননি। ফলে এ ব্যাপারে দেনদরবারের জন্য মাওকে সে সময় মাস দুই সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করতে হয়। উল্লেখ্য, জীবনে দুবারই মাত্র মাও চীনের বাইরে যান। তার দ্বিতীয় সফরটাও ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯৫৭ সালে, সোভিয়েত বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ক্রুশ্চেভ তখন ক্ষমতায়। ক্ষমতায় এসে ক্রুশ্চেভ চীনের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তার জন্য একদল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীকে সেদেশে পাঠান। এ ছাড়া চীনকে আণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করতেও তখন একটি পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের ভাষণ ও অন্যান্য কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে এ সময় দুটি দেশের সম্পর্কের মধ্যে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে রুমানীয় পার্টি কংগ্রেসে উভয় দেশের নেতারা তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ক্রুশ্চেভ চীনের সঙ্গে একটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিলে চীন তা প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৫৯ সালে আমেরিকা সফর শেষে ক্রুশ্চেভ চীন সফরে গেলে সেখানে তাকে শীতল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যার প্রতিক্রিয়ায় ক্রুশ্চেভ তার পূর্বনির্ধারিত এক সপ্তাহের সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করে, তিন দিনের মাথায়, দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে গিয়ে ক্রুশ্চেভ চীন থেকে তাদের প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ক্রুশ্চেভের এই একতরফা সিদ্ধান্তও চীন-সোভিয়েত সম্পর্ককে চরম বৈরিতার দিকে নিয়ে যায়।

হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আধিপত্যবিরোধী অভ্যুত্থান দমনে সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালনা (নভেম্বর ১৯৫৬) এবং পোল্যান্ডে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়াসের গতিরোধ করার কাজ দুটিও ক্রুশ্চেভের আমলেই হয়েছিল। হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের কালে সে দেশের জনগণের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষে দেশটির প্রায় আড়াই হাজার মানুষ নিহত হয়। প্রায় সাতশো সোভিয়েত সেনাও নিহত হয় এ সময়। প্রায় দুই লাখ হাঙ্গেরীয় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর আগে ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পোল্যান্ডে জনপ্রিয়

কমিউনিস্ট নেতা গোমুলকার সমর্থনে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে, পাছে তার ঢেউ সোভিয়েত ইউনিয়নেও এসে লাগে এই আশঙ্কায়, দেশটিতে একদিকে সোভিয়েত সৈন্য পাঠানো হয়। অন্যদিকে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে মিকোয়েন, বুলগানিন, মলোটভ প্রমুখ উচ্চপর্যায়ের সব সোভিয়েত নেতা একযোগে ওয়ারশতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানকার সরকারি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পোল্যান্ড কমিউনিজমের পথ পরিত্যাগ করবে না এবং সোভিয়েতের সঙ্গেই থাকবে, এই শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। এর আগে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ও একাধিকবার কারাবরণকারী গোমুলকাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গোমুলকা ক্ষমতায় ছিলেন। তবে দল বা দেশের গণতন্ত্রায়ণের কোনো উদ্যোগ তিনি আর নেননি। বরং ওয়ারশ জোটের সদস্য হিসেবে পোল্যান্ডকে মস্কোর বিশ্বস্ত অবস্থানে রেখে এবং শেষদিকে কঠোর একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ১৯৬৮ সালে মস্কো চেকস্লোভাকিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে গোমুলকা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং পোলিশ সেনারাও সে অভিযানে অংশ নেয়। তবে সেটা ক্রুশ্চেভ-পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

ক্রুশ্চেভের আমলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম মহাশূন্যে 'স্পুৎনিক' নামে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় (১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর)। এই সাফল্যের পথ ধরেই এরপর 'লাইকা' নামে একটি কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণকালীন কুকুরটির মৃত্যু ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই মহাশূন্য অভিযান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল প্রথম একজন মানুষ ইউরি গ্যাগারিনকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। ভোস্তক-১ নভোযানে সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমণ করে তিনি ফিরে আসেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে প্রথম মানুষ (অ্যালান শেফার্ড) পাঠায় এর মাসখানেক পর। এমনকি মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর ক্ষেত্রেও আমেরিকা সোভিয়েতের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। তারা এক্সপ্লোরার-১ পাঠায় ১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি। অর্থাৎ সোভিয়েতের তিন মাস পর। প্রথম নারী নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভার মহাশূন্যে উড্ডয়নের ঘটনাটিও ঘটে ক্রুশ্চেভের আমলেই, ১৯৬৩ সালের জুনে। ভোস্তক-৬ নভোযানে তিন দিন একাকী অবস্থান এবং ৪৮ বার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমণ করে তিনি ফিরে আসেন।

তবে যে-ঘটনাটি ক্রুশ্চেভকে বিশ্বপরিসরে বিশেষভাবে আলোচনা-সমালোচনার পাত্র করে তোলে তা হলো কিউবা সংকটকালীন (অক্টোবর ১৯৬২) তার ভূমিকা। কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অবরোধ মোকাবিলায় কয়েকটি সমরাস্ত্রবাহী সোভিয়েত জাহাজ এ সময় কিউবার দিকে রওনা হয়। এ ছাড়া কিউবা উপকূলে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রও মোতায়েন করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এ সময় তার দেশের নৌবাহিনীর প্রতি যেকোনোভাবে সোভিয়েত নৌবহরকে ঠেকানো এবং তাতে তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দেন। মার্কিন হুমকির মুখে ক্রুশ্চেভ একেবারে শেষ মুহূর্তে (যখন দু-তরফের যুদ্ধ জাহাজগুলোর মধ্যে আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যবধান) সোভিয়েত নৌবহরকে তার গতিপথ ফেরাতে এমনকি মার্কিন তল্লাশিও মেনে নিতে নির্দেশ দেন। ক্রুশ্চেভের এই একতরফা জাহাজ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সেদিন অনেকের কাছে সাম্রাজ্যবাদী হুমকির কাছে নতিস্বীকার বা আমেরিকার সঙ্গে আপস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার আনআর্মড ভিক্টরি গ্রন্থে (১৯৬৩) ক্রুশ্চেভের এ ভূমিকাকে 'বিনা অস্ত্রে জয়' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, বিশ্বের অন্যতম প্রধান পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্রুশ্চেভ তার এ সিদ্ধান্তের দ্বারা সেদিন মানবসভ্যতাকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। ঠান্ডাযুদ্ধের আবহাওয়ায় ক্রুশ্চেভের এ সিদ্ধান্তকে রাসেল এক সাহসী পদক্ষেপ এবং 'প্রকৃতিস্থতা ও মহানুভবতা'র পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেন।

ক্রুশ্চেভের আমলেই, ১৯৬০ সালের ১ মে, পাকিস্তানের পেশওয়ার সীমান্তবর্তী সোভিয়েত ভূখণ্ডে একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত এবং বিমানের চালককে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটে। এর ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাদাব নামক স্থানে একটি মার্কিন গোয়েন্দা ঘাঁটির অবস্থান এবং সেখান থেকে নিয়মিত সোভিয়েত ইউনিয়নে সিআইএর গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। ক্রুশ্চেভ এ সময় খুব দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রতিবাদে তিনি প্যারিসে চার বৃহৎশক্তির শীর্ষ সম্মেলন বর্জন করেন। মস্কোর হুমকির মুখে পাকিস্তান এ সময় তার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। একান্ত মার্কিন নির্ভরতা থেকে সরে এসে আইয়ুব সরকার এরপর চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে মনোযোগী হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আইয়ুব খান ও তার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর (এপ্রিল ১৯৬৫), দুদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় মস্কোর নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ ও যুদ্ধাবসানে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে মধ্যস্থতা, ১৯৬০ দশকের শেষদিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে ভারত ও পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে 'এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা'র ধারণা প্রচার, এসবই সেই সম্পর্কোন্নয়ন নীতি অনুসারেই ঘটে। ক্রুশ্চেভের পদচ্যুতির পরও ব্রেজনেভের নেতৃত্বে ক্ষমতায় তার উত্তরাধিকারীরা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মোটের ওপর আগের আমলের ধারাবাহিকতাই বজায় রাখেন। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ও মস্কো প্রকাশ্য নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করেছিল। ক্রুশ্চেভ তখন ক্ষমতায়।

ক্রুশ্চেভ তার স্মৃতিকথায় উপরিউক্ত ঘটনাবলির অনেক কটি সম্পর্কেই তার নিজ বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরেছেন। সমকালীন সোভিয়েত ও বিশ্বনেতারা (যেমন মাও সে-তুং, টিটো, সুকর্ণ, নাসের, নেহরু প্রমুখ) সম্পর্কেও বলেছেন। রাজনীতির বাইরেও নানা বিষয়ে মত-মন্তব্য দিয়েছেন। সাহিত্য-শিল্প প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে পাস্তারনেকের নোবেল পুরস্কার লাভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক ও তার উপন্যাস ডাক্তার জিভাগো বিষয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তীকালে ক্রুশ্চেভের নিজস্ব বিচার, কবি ইয়েভতুশেঙ্কো বা সলজেনিৎসিন সম্পর্কে মূল্যায়ন, বিমূর্ত শিল্পকলা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যাবে ক্রুশ্চেভের এ স্মৃতিকথায়। বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আমরা আমাদের আলোচনাকে শেষোক্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

৩

ক্ষমতা থেকে অপসারিত (অক্টোবর, ১৯৬৪) হওয়ার পর ক্রুশ্চেভ আরও প্রায় সাত বছর বেঁচেছিলেন। এ সময় তাকে নির্বাসিত বা প্রায় অন্তরীণ জীবন কাটাতে হয়। মস্কো থেকে মাইল বিশেক দূরে পেত্রোভো দালনিয়ে নামক একটি স্থানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি পল্লীনিবাসে (ডাচা) তাকে থাকতে দেওয়া হয়। তার পত্নী নিনা পেত্রোভনাও ক্রুশ্চেভের সঙ্গে ছিলেন। সরকার থেকে তিনি অবসর-ভাতাও পেতেন। যদিও খুব কম লোকই এ সময় তার সঙ্গে দেখা করতে যেত বা তার সুযোগ পেত। সরকারি গোয়েন্দাদের নজরদারি ছিল তার ওপর। তবে তা খুব কড়া রকমের ছিল না। ক্রুশ্চেভের দিক থেকেও সরকারকে বিব্রত না করার মতো সতর্কতা ছিল। কারণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে তিনি জানতেন। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি বাড়ির প্রাঙ্গণে হাঁটাহাঁটি এমনকি মাঝে মাঝে সেখান থেকে বেরিয়ে আশপাশের গাছপালা পরিবেষ্টিত এলাকায় ঘোরাফেরা করতেন। কখনো বা কাছাকাছি মস্কো নদীর পাড়ে গিয়ে বসতেন। স্থানীয় গ্রামবাসী, সাধারণ পথচারী ও অন্যদের সঙ্গে কুশলবিনিময় ও গল্পগুজব করতেন। কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে এ সময় তার সঙ্গে ছবি তুলত। ক্বচিৎ কখনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে কিংবা ভোট দেওয়ার জন্য সরকারি প্রহরায় ও সরকারের দেওয়া লিমোজিন গাড়িতে চড়ে মস্কো যাওয়ারও সুযোগ হয় তার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কারও কারও মতে, ক্রুশ্চেভ এই সুযোগটা পেয়েছিলেন কারণ স্তালিন আমলের মতো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের জীবননাশ, কারাবন্দি বা নির্বাসনে পাঠানোর পরিবর্তে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যালেনকভ ও মলোটভকে ক্ষমতাচ্যুতির পরও মস্কোয়

থাকতে দিয়েছিলেন। তার দেখানো সে পথই ক্রুশ্চেভ-পরবর্তী নেতৃত্বও তার বেলায় অনুসরণ করেন।

মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে কোনো সম্মান জানানো হয়নি। সরকারের তরফে কেউ তার শেষযাত্রায় শরিক হননি। ক্রুশ্চেভও মনে হয় জানতেন তেমন কিছু হবে না। যদিও সে সময় পলিটব্যুরোসহ সোভিয়েত নেতৃত্বে যারা ছিলেন ব্রেজনেভসহ তাদের অনেকেই ছিলেন তার সাবেক সহকর্মী এবং তার হাত ধরেই তারা ক্ষমতার সিঁড়িতে উঠেছিলেন। যেভাবে তিনি নিজেও একদা স্তালিনের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। ক্রুশ্চেভের সাবেক সহকর্মীদের মধ্যে শীর্ষপর্যায়ের একজনই মাত্র তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন ও তার সমাধিতে পুষ্পস্তবক পাঠিয়েছিলেন। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট মিকোয়েন (তখন তিনিও ক্রুশ্চেভের মতোই অবসরভোগী)

৪

এমনিতে ক্রুশ্চেভ কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন। ক্ষমতায় থাকাকালে তার এই প্রগলভতা অনেক সময় তার বিপক্ষে কাজ করেছে। অবসর জীবনেও পরিবারের সদস্য কিংবা অন্যদের সঙ্গে তিনি পুরনো দিনের গল্প করতে পছন্দ করতেন। সাক্ষাতে দর্শনার্থীদের প্রশ্নের জবাবেও অনেক কথা বলতেন। এভাবেই ১৯৬৭ সালের দিকে কারও অনুরোধে তিনি মুখে মুখে তার স্মৃতিচারণ শুরু করেন। তবে একটানা নয়, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায়, বলা যায় ছাড়াছাড়াভাবে। কখনো টেপরেকর্ডার সামনে ধরে একা একাই তিনি কথা বলে গেছেন, আবার কখনো অন্য কেউ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। প্রথমে একটি পুরনো রাশিয়ান টেপরেকর্ডার যন্ত্রে এবং তারপর অপেক্ষাকৃত ভালো মানের একটি জার্মান টেপরেকর্ডার জোগাড় করা গেলে তাতে সে কথা ধারণ করা হতে থাকে। অতঃপর সেখান থেকে তা একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। তার মৃত্যু অবধি, অর্থাৎ প্রায় চার বছর ধরে, এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। ক্রুশ্চেভের পরিবারের সদস্যরা চেয়েছিলেন স্মৃতিকথাটি রুশ ভাষায় ও প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই প্রকাশিত হোক। কিন্তু ক্রুশ্চেভ স্বয়ং এবং তার শুভার্থীদেরও কেউ কেউ জানতেন, সেটা সম্ভব বা নিরাপদ কোনোটাই হবে না। ক্রুশ্চেভও সে ঝুঁকি নিতে চাননি। ১৯৭০ সালে মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা লিটল ব্রাউন অ্যান্ড কোম্পানি এবং লাইফ ম্যাগাজিন ক্রুশ্চেভের সহযোগীদের কাছ থেকে এই স্মৃতিকথার প্রকাশনা স্বত্ব কিনে নেয়। তবে তা এই শর্তে যে কোথায় কীভাবে এই স্মৃতিকথাটি লিখিত বা গ্রন্থিত হয়েছে এবং কাদের কাছ থেকে কীভাবে তা সংগৃহীত হয়েছে, সেসব কোনো তথ্যই তারা প্রকাশ করবেন না। এর আগে ১৯৬৭ সালেই অবশ্য একটি মার্কিন টিভি চ্যানেলে ক্রুশ্চেভের অবসর বা অন্তরীণ জীবন নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। ঘরোয়া মুভি ক্যামেরায় ধারণ করা এই প্রামাণ্যচিত্রে ক্রুশ্চেভের ওই টেপ রেকর্ডকৃত বক্তব্য থেকেও কিছু কিছু অংশ জুড়ে দেওয়া হয়।

স্মৃতিকথায় ক্রুশ্চেভ সব কথা খুলে বলেননি। সব প্রশ্নের উত্তর কিংবা সব ঘটনার বিশদ বিবরণ দেননি। অনেক ক্ষেত্রে সেটা ঠিক হবে না বলে তিনি মনে করেছেন। একদিকে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অনেক কথা বলে যাওয়া তার কর্তব্য মনে করেছেন। আবার অন্যদিকে সোভিয়েত আইন ও পার্টির বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু বলা থেকেও বিরত থাকতে চেয়েছেন। উপরন্তু যা তিনি বলেছেন, দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ রেকর্ডিংয়ের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সঠিকভাবে উদ্ধার করাও যায়নি। মৃত্যুর বছরখানেক পর তার স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। তিনি যেমন এর চূড়ান্ত রূপটি দেখে যেতে পারেননি, তেমনি এর খসড়া সম্পাদনার সুযোগও তার বা তার পরিবারের কারও হয়নি। তবে ধারণা করা হয়, পাশ্চাত্যে পাচার করার আগে, স্পর্শকাতর কিছু বিষয় সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের বক্তব্য তিনি নিজে, তার পরিবারের তরফে কেউ কিংবা যারা তার বক্তব্য ধারণ ও তার ভিত্তিতে পাণ্ডুলিপি নির্মাণ করেছেন তারা বাদ দিয়েছেন। ঝুঁকি এড়াতেই মূলত এটা করা হয়েছে।

শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে সবার কাছে ক্রুশ্চেভ তার বাকপটুতা, রসবোধ এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা উপস্থিত বুদ্ধির জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন আমেরিকা সফরে যান তখন সেখানে তার তেরো দিন অবস্থানকালে যেভাবে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের মোকাবিলা করেছিলেন, বিভিন্ন সুধী সমাবেশে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, তা অনেককে চমৎকৃত করে। উল্লেখ্য, সেটাই ছিল কোনো কমিউনিস্ট দেশের প্রধানের যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সরকারি সফর। ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথার পাতায় পাতায় তার সে বাকবৈদগ্ধের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। আর সেটাই প্রমাণ করে যে স্মৃতিকথাটি ক্রুশ্চেভেরই। যদিও পাশ্চাত্যে এই স্মৃতিকথার প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এটাকে ভুয়া বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। এমনও বলা হয়, সিআইএ তাদের নিয়োজিত লোকদের দিয়ে এটা লিখিয়েছে। স্মৃতিকথার সে প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ক্রুশ্চেভ মারা যান। বাস্তব কারণেই জীবিতকালে স্মৃতিকথাটিকে তিনি তার নিজের বলে স্বীকার করেননি।

ইংরেজি অনুবাদে ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথাটির নাম 'ক্রুশ্চেভ রিমেমবারস : দ্য লাস্ট টেস্টামেন্ট'। এর ভূমিকা লিখেছেন জেরল্ড এল শেটার। সদ্যপ্রয়াত জেরল্ড শেটার বিভিন্ন সময় টাইম, লাইফ ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালসহ বিভিন্ন নামি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। ছিলেন লাইফ ম্যাগাজিনের কূটনৈতিক সম্পাদক। এর আগে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কোয় টাইম ও লাইফ পত্রিকার ব্যুরোপ্রধান ছিলেন। তার লেখা ভূমিকা থেকে জানা যায়, ক্রুশ্চেভের ১৮০ ঘণ্টার টেপরেকর্ড করা বক্তব্য থেকে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা এবং অন্যান্যভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে তবেই বইটির পাঠ চূড়ান্ত করা হয়েছে। কেবল কয়েকটি ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে ভ্রমসংশোধন এবং বিষয় অনুযায়ী পাঠবিন্যাস ছাড়া সম্পাদনার ক্ষেত্রে অন্য কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ক্রুশ্চেভের বক্তব্য ধারণ করা সবগুলো টেপ এবং রুশভাষায় তার লিখিত পাঠ যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরাল হিস্ট্রি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

৫

আমরা জানি, রুশ সাহিত্যিক বরিস পাস্তারনেক তার ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসটির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এক দশক লাগে তার বইটি লিখতে। শেষ করার পরপরই পাণ্ডুলিপিটি তিনি প্রথমে নোভি মির পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য দেন। নোভি মির ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত রুশ ভাষার প্রধান সাহিত্য মাসিক। উপন্যাসে সোভিয়েত ব্যবস্থার সমালোচনা থাকায়, 'সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরোধী' অভিযোগে, পত্রিকাটি তা ছাপেনি। যদিও তত দিনে স্তালিনের মৃত্যু ঘটেছে, আর ক্ষমতায় তখন ক্রুশ্চেভ। পাস্তারনেক বুঝেছিলেন বই আকারেও স্বদেশে এটির প্রকাশ সম্ভব নয়। এমনকি বিদেশে প্রকাশিত হলেও তিনি তাতে বিপদাপন্ন হতে পারেন। এর আগে পাস্তারনেক তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লেখক ইউনিয়ন কর্তৃক সমালোচিত হন। এমনকি অনুবাদক হিসেবেও যেসব সাহিত্যকর্মকে তিনি অনুবাদের জন্য বেছে নেন তারও সমালোচনা করা হয়। রুশ-বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ দার্শনিক স্যার আইসিয়া বার্লিন ছিলেন পাস্তারনেকদের পারিবারিক বন্ধু। তার মাধ্যমে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি কিংবা তার একটি কপি বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রকাশের জন্য নয়, আসলে সংরক্ষণের জন্য। বার্লিনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে পাস্তারনেকের স্ত্রী এ বিষয়ে তাকে বিশেষভাবে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। তার পরও ১৯৫৭ সালে বইটি ইতালির মিলান থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ফেলত্রিনেল্লি ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বইটি প্রকাশের অপরাধে তাকে অবশ্য পরে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রকাশের পরের বছরই ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসটির জন্য পাস্তারনেককে সেবারের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া দু-বছরের মধ্যে ইংরেজিসহ বিশ্বের চব্বিশটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়।

১৯৫৮ সালের ২৩ অক্টোবর নোবেল কমিটির পাস্তারনেককে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়। সংবাদটি জানার পর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পাস্তারনেক প্রথমে সুইডিশ নোবেল কমিটির কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশে সরকার ও লেখক সংঘের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে চার দিনের মাথায়

কমিটির কাছে আরেক তারবার্তা পাঠিয়ে তিনি পুরস্কার গ্রহণে তার অপারগতার কথা জানান। ইতিমধ্যে পাস্তারনেকের বন্ধু ও লেখক ইউনিয়নের সম্পাদক কনস্তানতিন ফেদিন ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যানের অনুরোধ জানান। লেখক ইউনিয়ন এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডেকে পাস্তারনেককে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় (কবি ইয়েভতুশেঙ্কো সে সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন)। সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয় পাস্তারনেককে দেশ থেকে বহিষ্কার ও তার নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য। পত্রপত্রিকাসহ সোভিয়েত প্রচারমাধ্যমে পাস্তারনেকের বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে। পলিটব্যুরোর নির্দেশে গোয়েন্দারা তার বাসভবন ঘিরে রাখে। এ অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে পাস্তারনেক একটি চিঠি লেখেন ক্রুশ্চেভকে। তাতে তিনি লেখেন, 'মাতৃভূমি ত্যাগ আমার জন্য মৃত্যুরই সমান হবে। জন্ম, জীবন ও কাজের সূত্রে আমি রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত। রাশিয়ার বাইরে আমি আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারি না।' শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভের নির্দেশে পাস্তারনেককে দেশে থাকতে দেওয়া হয়। জানা যায়, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধও এ ব্যাপারে ক্রুশ্চেভকে প্রভাবিত করেছিল।

ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, অন্তত তখন পর্যন্ত ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ তার হয়নি। আর ক্ষমতায় থাকতে বই বা তার লেখক সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছিলেন, তা অন্যদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই। স্মৃতিকথায় এর জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, সৃষ্টিশীল মানুষের বেলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'খুবই ক্ষতিকর' প্রমাণিত হয়। পাস্তারনেকের প্রতিভা বিচারের সামর্থ্য তার নেই জানিয়ে বলেছেন, তবে এ ব্যাপারে অন্য কবিদের মতামতকে তিনি গুরুত্ব দেন, যারা পাস্তারনেকের রচনা ও অনুবাদকর্মের উচ্চ মূল্যায়ন করেছেন। একজন লেখকের রচনার মান যাই হোক, সেটা বিচারের ভার শেষ পর্যন্ত পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে ক্রুশ্চেভ অভিমত প্রকাশ করেছেন। পাঠকরা যাতে এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিষয়টিকে প্রশাসন, পুলিশ বা আইন-আদালতের বিষয় করা উচিত নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, পুরস্কার নিতে পাস্তারনেককে তিনি বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। তার লোকজনকে বলেছিলেন এজন্য সরকার থেকে তার পাসপোর্ট ও রাহাখরচের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তার আগেই 'খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে' পত্রিকায় একটা বিবৃতি দিয়ে পাস্তারনেক জানিয়ে দেন, পুরস্কার নিতে বাইরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। এমনকি এ নিয়ে তার কোনো অভিযোগ-অনুযোগও নেই। এ বিষয়ে সবশেষে ক্রুশ্চেভের মন্তব্য : 'কেউ বলতে পারেন, বইটি প্রকাশ হতে না দেওয়া নিয়ে আমার এই দুঃখ প্রকাশ, এটি খুবই বিলম্বিত। হ্যাঁ, হতে পারে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো।'

ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় থাকতেই ১৯৬০ সালের ৩০ মে ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগে পাস্তারনেকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন তার শেষকৃত্যের দায়িত্ব নিতে চাইলে পাস্তারনেকের

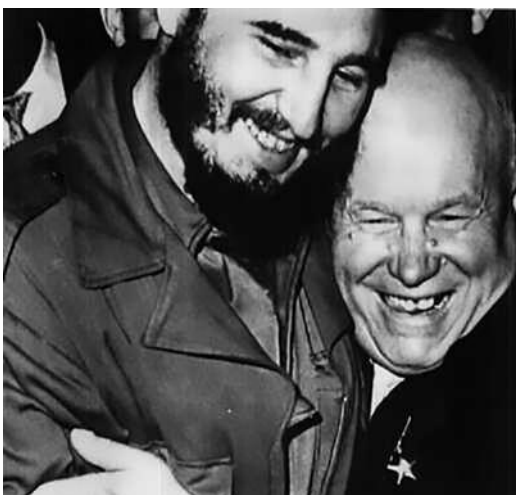

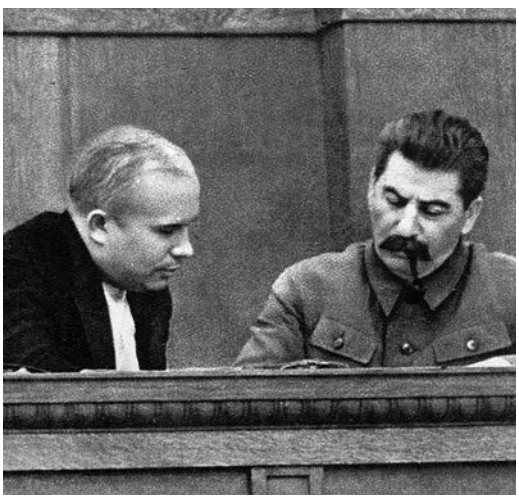

স্ত্রী তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সংবাদপত্রে তার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়নি। একটা ছোট বিজ্ঞাপন ও হাতেলেখা কিছু পোস্টার দেখে হাজার হাজার লোক সেদিন সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল প্রিয় কবি, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদকের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এক দিন যে নোভি মির পত্রিকা পাস্তারনেকের উপন্যাসটি ছাপতে চায়নি, তার মৃত্যুর আঠাশ বছর পর ১৯৮৮ সালে তারাই সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় তখন মিখাইল গর্ভাচেভ।

ননী ভৌমিকের বঙ্গানুবাদে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আলেক্সান্দর ফাদেয়েভের (১৯০১-১৯৫৬) ছত্রভঙ্গ উপন্যাসটি আমাদের অনেকেরই হয়তো এক বয়সে পড়ার সুযোগ হয়েছে। ফাদেয়েভ ছিলেন স্তালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের খুব প্রভাবশালী একজন লেখক। তবে তার এই প্রভাবের মূলে যতটা না তার সৃজনপ্রতিভা তার চেয়ে বেশি কাজ করেছিল ক্ষমতার সঙ্গে তার সংযোগ ও বিনিময়ে পাওয়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। যেমনটা একালে আমাদের সমাজেও আমরা দেখতে পাই। ফাদায়েভ ছিলেন সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘকালীন প্রধান কর্মকর্তা। ছিলেন স্তালিন সাহিত্য পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর একজন। নিজেও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইউক্রেনের একটি অঞ্চলে তরুণ কমসোমল সদস্যদের গোপন প্রতিরোধের কাহিনি নিয়ে লেখা তার ইয়ং গার্ড উপন্যাসটির জন্য ১৯৪৬ সালে স্তালিন পুরস্কার লাভ করেন। এই উপন্যাসটি পরে একই নামে চলচ্চিত্রায়িতও হয়। ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথা পাঠে জানা যায়, স্তালিন পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের সভায় স্বয়ং স্তালিন উপস্থিত থাকতেন। আর কে সেবারের পুরস্কারটি পাবেন, সে সিদ্ধান্তটিও শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকেই আসত। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেখক-শিল্পীদের ওপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ও তাদের নিগ্রহের পেছনে ফাদায়েভের পরামর্শ বা মতামতের একটা বড় ভূমিকা ছিল। একপর্যায়ে লেখালেখির চেয়ে স্তালিন বন্দনা ও সাহিত্য-শিল্পের আমলাগিরিতেই ফাদেয়েভ বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন। যার ফলে ১৯২৮ সালেই 'দ্য লাস্ট অব দ্য উডেগস' নামে যে মহাকাব্যোপম উপন্যাসটি লেখার কাজে তিনি হাত দেন (ছয় খণ্ডে যা সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল) তা তিনি শেষ করতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি 'পৃথিবীর এ যাবৎকালের দেখা শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন।

অন্যান্য সূত্রে যেমন, তেমনি ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথা থেকেও জানা যায়, শেষদিকে ফাদেয়েভ অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। এমনকি পুরস্কার কমিটির সভায় স্তালিনের উপস্থিতিতেও তিনি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেন না। যা দেখে স্তালিন বলতেন, 'দেখ, এতটাই গিলেছে যে দাঁড়াতেও পারছে না।' অনেক সময় প্রহরী পাঠিয়েও তাকে খুঁজে আনতে হতো। স্তালিনের মৃত্যুর পর তাকে লেখক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ইতিমধ্যে মাত্রারিক্ত মদ্যপানের ফলে তিনি যকৃতের ক্যানসারে আক্রান্ত হন। তা ছাড়া স্তালিন আমলে বহুসংখ্যক লেখক-সাহিত্যিকের (যার মধ্যে কেউ কেউ তার বন্ধু ছিলেন) কারাভোগ, লাঞ্ছনা এমনকি মৃত্যুর জন্যও এ সময় তিনি নিজেকে দায়ী ভাবতে থাকেন। কারণ লেখক ইউনিয়নের নেতা হিসেবে তার পরামর্শ বা সম্মতির পেছনে কাজ করেছিল। ২০তম পার্টি কংগ্রেসের পর ক্রমে স্তালিনের নিষ্ঠুরতার তথ্য উদঘাটিত হতে থাকলে, ফাদেয়েভের অপরাধবোধের মাত্রা বেড়ে যায়। ক্রুশ্চেভের মতে, ফাদেয়েভ এ সময় সোভিয়েত পার্টির স্তালিনবিরোধী বক্তব্য ও অবস্থানের যৌক্তিকতা মনে মনে উপলব্ধি করলেও, স্তালিনের স্তাবক ও সহযোগী হিসেবে তার অতীত ভূমিকা এ সময় তাকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দিতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন (১৯৫৬ সালের ১৩ মে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ফাদেয়েভ আত্মহত্যা করেন)।

তার স্মৃতিকথায় ক্রুশ্চেভ ইলিয়া এরেনবুর্গকে একজন 'প্রধান লেখক' ও 'বিরাট প্রতিভা' বলে মূল্যায়ন করেছেন। এরেনবুর্গের সঙ্গে একাধিকবার তার সাক্ষাতের উল্লেখ করে বলেছেন, স্তালিন আমলে এরেনবুর্গ মোটের ওপর সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলেছেন। তবে সে পর্বের একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছেন, অন্তত একবার হলেও তিনি স্তালিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। একটি বিবৃতিতে নাম সই করতে রাজি হননি। স্তালিনের মৃত্যুর পর এরেনবুর্গ 'থ' নামে একটি ছোট উপন্যাস লেখেন। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে, যা বিশেষ পাঠকপ্রিয়তা পায়। পরে উপন্যাসটির নাম বদলে রাখা হয় 'ক্রুশ্চেভের থ'। 'থ' কথাটার বাংলা করা যেতে পারে 'গলে যাওয়া'। স্তালিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তন প্রক্রিয়াটিই এই উপন্যাসের বিষয়। কিন্তু স্মৃতিকথায় বইটি সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে মনে হয়, এরেনবুর্গ পরিবর্তনের তাৎপর্যটা সঠিকভাবে বুঝতে বা তুলে ধরতে পারেননি।

আলেক্সান্দর সলজিনিৎসিনের প্রথম উপন্যাস ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অব ইভান দেনোসভিচ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। স্তালিন আমলে সোভিয়েত শ্রমশিবিরের অভিজ্ঞতাই ছিল লেখকের পরবর্তী অনেক রচনার মতো এ বইটিরও বিষয়। উল্লেখ্য, এর আগে স্তালিনের সমালোচনা করে তাকে একটি চিঠি লেখার অপরাধে সলজিনিৎসিনকে বেশ কয়েক বছর সাইবেরিয়ার একটি দ্বীপে নির্বাসিত এবং সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়। সলজিনিৎসিনের উল্লিখিত প্রথম উপন্যাসটি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই প্রকাশিত হয়, সেটা সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আনুকূল্য লাভের ফলে। ক্রুশ্চেভ নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় 'ইভান দেনিসোভিচের জীবনের এক দিন' নামে সলজিনিৎসিনের এ বইটির একটি অনুবাদ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮ সালে।

কবি মায়াকোভস্কি ও অন্যান্য রুশ ফিউচারিস্টদের সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের অভিমত হলো, তারা ছিলেন তাদের সময়ের বিমূর্ত কলাবাদী। মায়াকোভস্কির কবিতাকে তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কণ্ঠে তার কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন। ইয়েভতুশেঙ্কো সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি একজন প্রতিভাবান কবি ও ভালো মানুষ। যদিও জানিয়েছেন কবির সব কবিতা তিনি পড়েননি। তবে যেগুলো পড়েছেন তার অনেকগুলোই তার ভালো লেগেছে। ইয়েভতুশেঙ্কোর চরিত্রের মধ্যে এক রকম দুর্বিনয় বা অবাধ্যতা ক্রুশ্চেভ লক্ষ করেছেন। তবে সেটা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ সেন্সর বোর্ড যেমনটি চায় ঠিক সেভাবে ইয়েভতুশেঙ্কো লেখেননি। এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের মন্তব্য : 'সবাই যদি একইভাবে লিখত, একই যুক্তি ব্যবহার করত, তবে কীরকম একঘেয়ে ব্যাপারই না হতো সেটা! সৃষ্টিশীলতার কোনো সুযোগই সে ক্ষেত্রে থাকত না। থাকত না একজন লেখকের প্রতিভা বিকাশের, তার লেখনশৈলীকে শানিত করার কোনো সুযোগ। সেটা হতো যেন একটা নলের একধারে দাঁড়িয়ে কেউ একজন কিছু বলছে, অন্যধারে দাঁড়িয়ে আরেকজন সে কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছে।' ক্রুশ্চেভের মতে, সাহিত্যে জাবর কাটার মতো একঘেয়ে ব্যাপার পাঠকের বমনোদ্রেকের কারণ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ আরও বলেছেন, 'সাধারণভাবে আমি মনে করি, সৃষ্টিশীল লোকদের ব্যাপারে আমাদের আরও সহনশীল হওয়া এবং তারা যাতে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।'

আমরা জানি, বিমূর্ত ধরনের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদির ব্যাপারে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র প্রথম থেকেই বিরূপতা দেখিয়ে এসেছে। আর তাদের এই মনোভাব বহুকাল পর্যন্ত বজায় ছিল (যদিও পিকাসোর মতো বিশ্বখ্যাত শিল্পীর বেলায় এই নীতির ব্যতিক্রমও আমরা লক্ষ করেছি)। বিমূর্ত শিল্পের প্রতি একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন ক্রুশ্চেভও। ১৯৫৬ তিনি যখন বুলগানিনকে নিয়ে সরকারি সফরে ব্রিটেনে যান, সেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেনের সঙ্গে তার পল্লীনিবাসে সাক্ষাৎকালে ইডেনের এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, সাহিত্য-শিল্পে বস্তুবাদী ধারাই তার পছন্দ। স্মৃতিকথায় সে ঘটনা স্মরণ করার পাশাপাশি আরেকটি কথাও ক্রুশ্চেভ বলেছেন। তা হলো, চিত্রকলা ভাস্কর্য সংগীত সাহিত্য নাটক বা নৃত্যকলায় বিমূর্তরীতি প্রবর্তন বা এ ধরনের অন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে তিনি নিজে যদিও বা অনাগ্রহী, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা পুলিশি ব্যবস্থার তিনি পক্ষপাতী নন।

এহসান হায়দার

টিটি বেড়াল

অলংকরণ : মামুন হোসাইন

হাঁসুপুর, না গ্রাম না শহর...

হাঁসুপুর। না গ্রাম না শহর। তার একদিকে ধলপাহাড়ি নদী। সে নদী চলে গেছে এঁকেবেঁকে অনেকটা দূরে কমলা নদীর সাথে মিশেছে। এ নদীর []পর দিয়ে নৌকায় চেপে একটা সময় দূর-দূরান্তের মানুষজন আসত হাঁসুপুরের হাটে। হাটবার মানে হাঁসুপুর একেবারে গমগম করত। হাঁসুপুরের পাটের মোকামের সুনাম ছিল দিকে দিকে। সে সময় এ দেশবিদেশের পাট বেপারীদের ছিল নিত্য আনাগোনা। এখন সেই হাট নেই, একেবারে টিমটিমে কুপির মতো কোনোরকমে টিকে আছে। বাংলার পাটের গৌরবও ফিকে হয়ে গেছে পাটকলগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। তাই পাটের ব্যবসায়ীরাও হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে আগের সেই জৌলুশ। এখানে এখন মাছের বড় আড়ত হয়েছে। হঠাৎ করে সেই হাঁসুপুর নিয়ে কথা বলছি কেন তা বলি। হাঁসুপুরে আছে এক আশ্চর্য বেড়াল। সে বেড়ালের অসামান্য কাণ্ডকীর্তি লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

বেড়ালের নাম টিটি। তার কাজ-কারবারে সবাই হাসে, মজাও পায়। অনেকেই আবার টিটিকে দেখতেও গিয়েছে হাঁসুপুরে, অনেকেই তার বিচক্ষণতার তারিফ করেছে। ওমা কী পুঁচকে একটা বেড়াল কিন্তু সেকি সেয়ানা! বেড়ালটা কিন্তু দেখতে ভারি মিষ্টি আর বুদ্ধিতেও সবাইকে হারিয়ে দেবে।

কিন্তু একমাত্র পছন্দ মিঠাইকে। মিঠাই ওর বন্ধু। মিঠাই কখনো কোথাও গেলে সে মিঠাইয়ের পেছন ছাড়ে না। খায় মিঠাইয়ের হাতে, ঘুমোয়ও মিঠাইয়ের রুমেই। মিঠাইদের বাড়ির অন্য কারও কথা ও কানেই তোলে না। দু-বছর হলো টিটি বেড়াল মিঠাইদের বাড়িতে আছে। তার মিঠাইদের বাড়িতে আসবারও একটা কাহিনি আছে। মিঠাই তখন সবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর পড়বার চাপ আর সাথে প্রায় দিনই অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির কাজ লেগেই থাকে। এসব কিছুর পরেও ওর আড্ডা দেওয়া কখনো বন্ধ হয়নি। ছোটবেলা থেকে প্রচুর বন্ধুবান্ধব ওর। ভীষণ আড্ডাবাজ মিঠাই, কিন্তু পাড়ার যেকারও যে কোনো বিপদে সবার আগেই হাজির হওয়ার মেয়ে সে। তার গুণের কোনো কমতি নেই। কী না পারে সে? বাবার কাছে বসে বসে সব শিখে নিয়েছে। ভালো ছবি আঁকতে পারে। মাটি দিয়ে ভাস্কর্য বানাতে পারে। শুধু মাটি? কাঠ আর কাগজ দিয়েও বানাতে পারে ভাস্কর্য। হাঁসুপুরে যে বৈশাখী মেলাটা হয়, গেল বছর সেটার মূল মঞ্চের ইন্টেরিয়র পুরোটাই মিঠাই করেছিল। গানের গলাও ভালো হওয়ার জন্য বাবা নিজে ওকে গান শিখিয়েছেন। বাবা খুব গজল ভালোবাসেন। মেয়ের কণ্ঠে গজল শুনতে শুনতে একটা সময় বিকেল পার করতেন বাবা। মির্জা গালিব মিঠাইয়ের খুব প্রিয়। গালিবের লেখা 'শের' সে এতটাই ভালো আবৃত্তি করে, শুনে বোঝা যাবে না যে মিঠাই বাঙালি মেয়ে। স্বাস্থ্য সচেতন বাবার ছোটবেলা থেকেই ওকে প্রাথমিক চিকিৎসার সবটাই শিখিয়েছেন হাতেকলমে। পাড়ায় কারও ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ করলে, একটু কেটে ছিঁড়ে গেলে সবার আগে আসবে মিঠাইয়ের কাছেই। এ পাড়ার লোকে খুব জরুরি হলেই কেবল হাসপাতালে যায়। মিঠাই হলো ষোলআনা গুণঅলা মেয়ে। ওর নরম কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই যেন অসুখে পড়া মানুষ অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায়। পাড়ায় ওর এমন পরদুঃখে দুঃখী স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসে। আর ভার্সিটিতেও বেশ নাম করে ফেলেছে এরই মধ্যে, সবাই ওকে চেনে। দেখতে খুব সাদাসিধে শ্যামবর্ণের একটা মেয়ে গোল চশমা পরে থাকে। প্রচুর কথা বলতে ভালোবাসে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বসলে সহজে উঠতে চায় না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে একেবারে আড্ডায় মেতে থাকে।

সেদিন ক্লাস শেষে সাইকেলে চড়ে মিঠাই বন্ধু বরেনের সাথে যাচ্ছিল মহেশপুর গ্রামে মামার বাড়ি। সেখানে যেতে গেলে কমলা নদী পার হতে হয়। কমলা নদীর দুপাশ জুড়ে গড়ে উঠেছে ঘনবসতি আর ঝোপজঙ্গল। কিছু পথ যেতেই এক একটা বসতি আবার কিছুটা পথ যেতেই ঘন জঙ্গল না হয় ঝাউয়ের আর ছনের ঝোপ। আড়াআড়ি কিন্তু বেশি বড় নদী নয়, তবে গভীর আর খরস্রোতা। মিঠাই অবশ কখনো নামেনি এ নদীতে। তবে অনেকবার সে ভেবেছে যাবে একবার নেমে দেখবে। নদীটায় খেয়া আছে। খেয়া পার হলে ওপারটা মহেশপুর। মহেশপুরের স্কুলে এক সময় ও পড়েছে। তখন এই মহেশপুরে বেশ কিছু বন্ধু জুটেছে। ওরা যখন খেয়াঘাটে এলো নৌকাটা তখন অন্য পাড়ে ছিল। দেরি হবে দেখে খেয়াঘাটের পাশেই রমজান আলীর চায়ের দোকানে চা খেতে বসল মিঠাই আর বরেন। মিঠাই চা খেতে খেতে লক্ষ করল বেশ কিছু লোক একটা কিছুকে ঘিরে শোরগোল পাকাচ্ছে। চা খাওয়া দ্রুত শেষ করে এগিয়ে দেখতে গেল; কিন্তু শোরগোলটা এমন করে আবদ্ধ লোকজন দ্বারা, কী হচ্ছে জায়গাটায় তা বোঝার উপায় নেই। মিঠাইকে উঠে যেতে দেখে বরেনও সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাইকেলের ওপর উঠে মিঠাই বলল– দেখি তো কী হচ্ছে? দেখতে পেল একটা ছোট্ট বেড়ালের বাচ্চা কাতরাচ্ছে। পিঠের কাছে হালকা রক্তও বেরুচ্ছে। আহা রে, আহা রে, বলে মিঠাই লাফিয়ে পড়ল। তারপর দু-একজন লোকের সাথে একরকম ধাক্কাধাক্কি করে বেড়ালের বাচ্চাটার কাছে গেল। গায়ে হাত দিয়ে ভালো করে দেখল সে বেড়ালটাকে। ঢিপঢিপ করছে বুকের হাপর, এখনো প্রাণ আছে।

মিঠাই ডাকল, বরেন আয় রে। তারপর বেড়ালের বাচ্চাকে নিয়ে আবার সাইকেলে করেই ফিরল ক্যাম্পাসের কাছে। ডাক্তার দেখাল তারপর ওষুধও কিনল। আর মামার বাড়ি যাওয়া হলো না সেদিন ওদের। বাড়িতেই ফিরল, পরদিন ছুটি ছিল, ভেবেছিল মামাতো ভাই-বোনদের সাথে একটু ঘোরাঘুরি করবে, তা আর হলো কই মিঠাইয়ের, পড়ে রইল বেড়ালের অসুস্থ বাচ্চাটাকে নিয়ে। ভার্সিটিতেও যায়নি এরপরের তিনদিন, বেড়ালের বাচ্চা নিয়েই পড়ে ছিল মিঠাই। ওর মা আবার এসব পছন্দ করেন না। ঠাম্মা বরাবরই ওর পক্ষে, ফলে বাচ্চাটাকে মা বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারেননি। তিন দিন পরে যখন বেড়ালছানাটা সুস্থ হলো তখন মিঠাই একটু স্বস্তি পেল, একেবারে হাফ ছেড়ে বাঁচা আর কি! তারপর মিঠাই এই বাচ্চাটার নাম রাখল- টিটি। আচ্ছা টিটি মানে কী? টিটি মানে তো জানোই না, টেকনিক্যাল ট্যালেন্ট! এক সপ্তাহ মিঠাই এই বেড়ালের বাচ্চার সব কাণ্ড দেখেছে, তারপর ওর স্বভাব দেখে মনে হয়েছে প্রকৌশলী বুদ্ধিটা ওর বেশি। ছোট্ট বেড়াল ছানার কৌশল দেখে অবাক হতে হয়। মাত্র ক'দিন আগেই যেন সে নড়তে-টড়তে পারত না এখন একদম মস্ত বুদ্ধির ঝুলি নিয়ে ঘোরে। তাৎক্ষণিক বুদ্ধির রাজা সে এক্কেবারে। যেন প্রযুক্তিবিদদের মতো ওর বুদ্ধির প্রতিভা। শীতের রাত মিঠাই মোজা পরেছে টিটি গিয়ে কী করবে? প্রথমে ওর পায়ের দিকে তাকাবে তারপর এসে মাথাটা ঘষবে মিঠাইয়ের পায়ে, মিঠাই খুব খেয়াল করে দেখে। এসব কাণ্ড দেখে সেও আনন্দ পায়। যতক্ষণ ওর শীতের কাপড় গায়ে না দিয়ে দেওয়া হয় ততক্ষণ সে মিঁয়াউ মিঁয়াউ করে মিঠাইকে জ্বালাতে থাকে। মিঠাইও কম দুষ্টু নয়, ওকে গত সপ্তাহে ভার্সিটিতে নিয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের বলেছিল মিঠাই মোটামুটি পড়ালেখা বেশ ভালোই শিখেছে। তো এই পড়ালেখা কেমন হলো তার একটা পরীক্ষাও ওইদিন দিয়েছে টিটি। দুইটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছে আর স্বরবর্ণ তো সব সে জানে, এমনকি বলেও দিতে পারে টপাটপ। মিঠাইয়েরই কাণ্ড দেখে সবার বদ্ধ ধারণা এমন বুদ্ধিঅলা বেড়াল আর কারও নেই এ তল্লাটে। ছোট পিসির পুঁচকু মেয়েটা হামাগুড়ি দিতে দিতে গিয়ে পুকুরপাড়ে হাজির, কারও খেয়াল হয়নি ওকে; কিন্তু কী কাণ্ড টিটি ঠিকই তক্কে তক্কে রেখেছিল বাচ্চাটাকে, ব্যস সময় মতো মিঠাইয়ের মাকে সেদিন শাড়ির আঁচল কামড়ে টানছিল। মা ভাবছিল কী বিষয়, এ-তো আমার কাছে আসে না- কিন্তু এখন এমন করছে কেন? তারপর টানাটানিতে ওর পেছনে পেছনে গেল পুকুর ঘাটঅব্দি। গিয়ে দেখে কী দশা, চোখ ছানাবড়া মায়ের! ছোট মেয়ে গুঁড়িগুঁড়ি করে হামা দিয়ে পুকুরের পাড়ে হাজির আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান, পড়বেই পুকুরে।

মা অমনি চিৎকার করে উঠল- ওরে ও ছোটকু? কোথায় রে! দ্যাখ

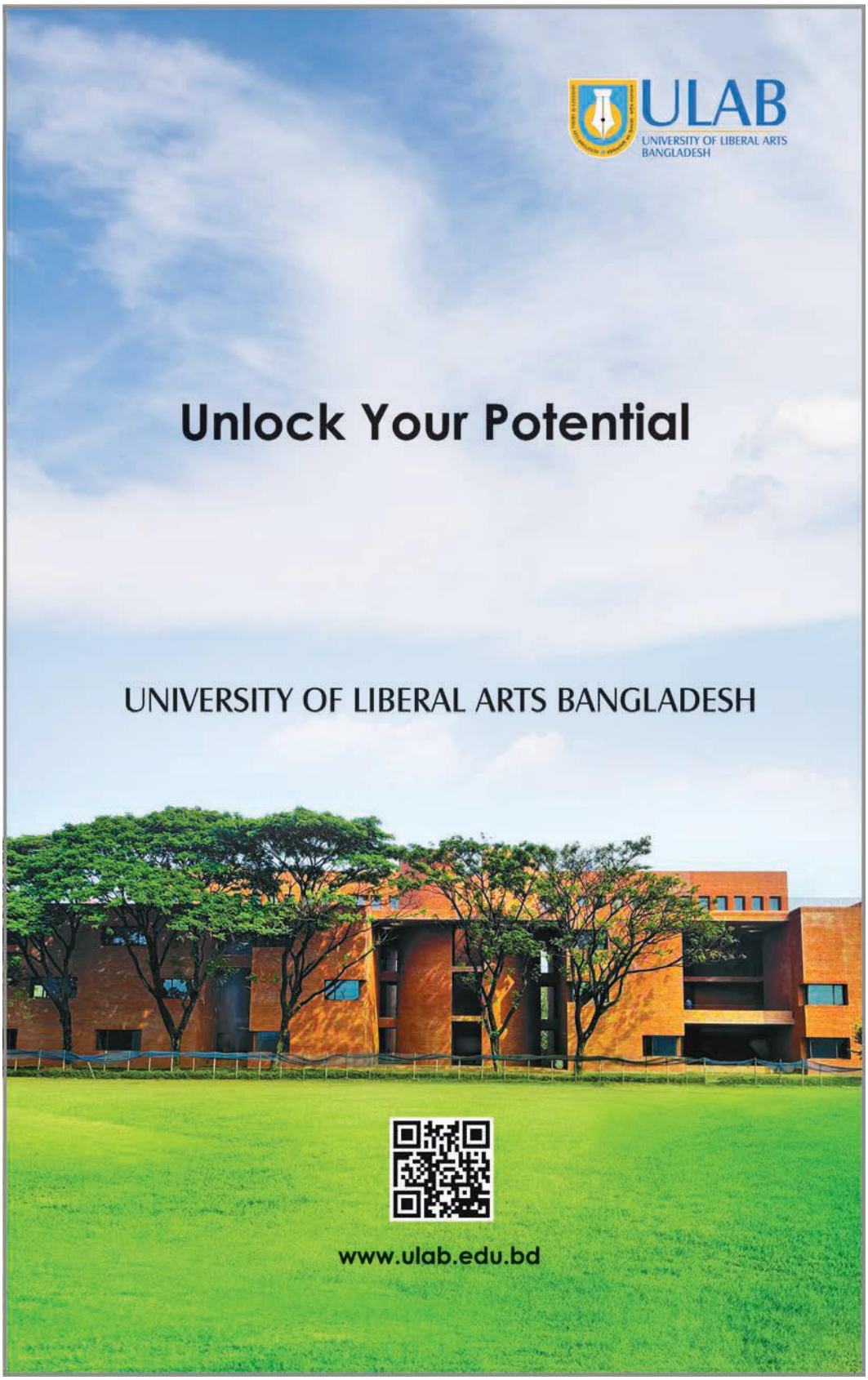
ULAB
UNIVERSITY OF LIBERAL ARTS BANGLADESH
Unlock Your Potential
UNIVERSITY OF LIBERAL ARTS BANGLADESH
www.ulab.edu.bd

দেখি সে কাণ্ড- তোর গুড়গুড়ি পুকুরে নামছে, দেখে যা। মায়ের ডাকে হাজির হলো ছোট পিসি পুকুর ঘাটে, চোখ তারও ছানাবড়া। দূরে দাঁড়িয়ে আছে টিটি বেড়াল। অনেকক্ষণ ধরে টিটি বেড়াল মিঁয়াউ মিঁয়াউ করে করে এখন থেমেছে। মাকে সে দূর থেকে দেখে। মা-ও ওকে দূর থেকে দেখছিল।

এ বাড়িতে দুজন মানুষ তাকে ভালোবাসে এখন। একজন হলো মিঠাই, আরেকজন হলো মিঠাইয়ের ঠাম্মা। আর কেউ টিটির জন্য মায়া করে না, টিটি খেল কি না তা দেখেও না। মিঠাই আগে টিটিকে খাওয়ায় তারপর নিজে খেতে বসে। আর ওরও স্বভাব একটু খারাপ করে দিয়েছে মিঠাই, ওর হাতে খেতে খেতে আর কারও হাতে খেতে চায় না। মিঠাই ভার্সিটিতে থাকে দুপুরে, ওই সময়ে ঠাম্মা খাওয়ায়। তবে ঘুম, স্নান, পটি সব মিঠাই-ই করায়। আরে বাপু কী কাণ্ড, বেড়ালের গলায় কি মাছের কাঁটা বাঁধে কখনো শুনেছো? এই টিটি বেড়ালের কাঁটা বাঁধে! মিঠাই আবার তা বেরও করে। ঠাম্মা তো বলেন, আগের জন্মে এই টিটি বেড়ালটা ছিল মানুষ। না হলে এরকমটা কী করে ঘটে? তার সব স্বভাব বাপু মানুষের মতো। আগে তো মিঠাই ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য ঘড়ির অ্যালার্ম দিয়ে রাখত, এখন তা আর রাখা লাগে না, টিটিই ওকে ডেকে তোলে। ডেকে তোলে মানে- ওর কোলে গিয়ে ঘুমোয় টিটি। তারপর কত কত কাণ্ড করে সে, মিঠাই ওকে বুকে নেয়- আর টিটিও ওর আদর নেয় চোখ বুজে।

তারপর শোনো বলি, ছোট পিসির মেয়ের এই উদ্ধারকাণ্ডের ঘটনা মা সবাইকে বলে দিল- মিঠাইও শুনল বাড়ি ফিরে। টিটিও ছিল যখন মা সবাইকে বলেছিল কথাগুলো। মা যখন টিটির প্রশংসা করছিল, তা টিটি সব বুঝতে পেরে দৌড়ে পালিয়েছিল। তারপর মা একটু পরে ওকে খুঁজে একবাটি দুধ খাইয়ে দিয়েছে। এতদিনে এই প্রথম মায়ের হাতে কিছু খেল সে। ছোট পিসি বলেছিল মিঠাইকে, 'মিঠাই তোর বেড়াল কিনা, টিটি ঠিক তোর মতোই হয়েছে তোর সাথে থেকে থেকে।' সেদিন থেকে বাড়ির সবার আদর পেতে শুরু করে টিটি। বাড়িতে এখন একটা ভরসার নাম এই টিটি। সব কিছুই যেন টিটি খেয়াল করে। টিটির এমন সব বুদ্ধির কাণ্ডে মিঠাই আনন্দ পায়- রাতে শোবার সময় মিঠাই টিটিকে বলে, 'তুই একটা মিত্তি টিটি আমার, তোকে একশ একটা চুমু দিলাম- নে ঘুম দে।' আর টিটি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে যায়।

সামনে পুজো, সবার জন্য নতুন কাপড় কিনছে বাড়িতে কিছু না কিছু। মিঠাই বলেছে টিটির জন্য একটা নতুন বেল্ট আনবে সে- তাতে থাকবে একটা ঝুনঝুনি। টিটি কোথাও গেলে তা শব্দ করে করে বাজবে। কখনো কিছু টিটির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তবে।

গোলপুরের নঁসু

টিটি ইদানীং পাড়ায়ও বেশ কদর বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের। নিজের মন মতো সে বেশ বেড়ায় এদিক সেদিক। টিটি গত মাসে একটা চোর ধরেছে পাড়ায়। তা নিয়ে বেশ হইহুল্লোড়। অন্য বাড়ির বেড়ালগুলো কেউই টিটির মতো নয় বুদ্ধিতে। তা নিয়ে সবার যেমন টিটির ওপর রাগ, তেমন নিজেদের বেড়ালের ওপরও রাগ। টিটির মতো বুদ্ধি কার আছে এমন? মিঠাই তো এমনিতেই সবার কাছে খুব প্রিয়। তার ওপর চোর ধরবার রাতে টিটি যা করেছে পাড়ায়, তাতে সবার চক্ষু চড়ক গাছ। রাত তখন দুটো বাজে। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। চৌকিদার ফটিক কাকাও হুইসেল দিল বাঁশিতে। পাড়াজুড়ে সবাই ঘুমিয়ে, একটা কাকপক্ষীও জেগে নেই। আমাদের টিটিও ঘুমিয়েছে মিঠাইয়ের বুকে। ঘুমোনোর আগে মিঁয়াউ মিঁয়াউ করেছিল কিছু সময়, তারপর ঘুম। মিঠাইয়ের সাথে ছাড়া ঘুমোতে পারে না টিটি।

গোলপুরের নঁসু চোর নাম করা চোর, তার চুরির কেচ্ছা সবার জানা। যে বাড়িতে নঁসু চোর ঢোকে সে বাড়ির মাটির পাতিলও অবশিষ্ট থাকে না। সেই নঁসু চোর ঢুকেছে বদর মাস্টারের বাড়ি। বদর মাস্টার বয়স্ক মানুষ। সে আর তার বউ বাড়িতে থাকে। তার দুই ছেলের এক ছেলে বিদেশে থাকে বউ-বাচ্চা নিয়ে। আরেক ছেলে থাকে ঢাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে সে। নঁসু চোর ঢুকবে কি ঢুকবে না, এই নিয়ে নয়-ছয় করতে করতে বদর মাস্টারের বাড়িতেই ঢুকেছে। পাঁচিল টপকে যখন ঢুকেছে তখন টিটি হঠাৎ শব্দে জেগে গেছে। দেখেছে পাশের জানলা দিয়ে ছায়ার মতো কিছু আস্তে আস্তে করে সরে যাচ্ছে। টিটি অমনি মিঠাইয়ের কোল থেকে সরে গেছে। আস্তে আস্তে সে-ও উঠে গিয়ে মিঠাইয়ের ড্রেসিং টেবিলের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে একটা কালো লোক এদিক ওদিক করছে। তারপর জানালার পাল্লা মাথা দিয়ে সরিয়ে সে দেখে নিচ্ছে। একটু পর নঁসু একটা বড় বস্তা কাঁধে নিয়ে বদর মাস্টারের বাড়ির পাঁচিলের কাছে রাখল। আবার ফিরল কতটা সময় হলো কে জানে, এর ভেতর টিটি বেড়াল মিঠাইকে জাগিয়ে দিল। মিঠাই চোখ ডলতে ডলতে উঠে বলল– কী রে টিটি তুই ঘুমোসনি? টিটি মিঁয়াউ করে একটা আঁচড় দিয়ে জানালার কাছে নিল। মিঠাই দেখেছে একটা কালো লোক দুটো বস্তা কাঁধে নিয়ে বদর কাকাদের গেট খুলে বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। মিঠাই অমনি চোর চোর করে চিৎকার জুড়ে দিল। চিৎকার শুনে ওর মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, এমনকি ঠাম্মাও জাগল। পাশের বাড়ির বদর কাকা, ওপাশের মহেশ দাদুর বাড়ির আলো জ্বলে উঠল। নঁসু ততক্ষণে পগার পাড়। সবাই এসে ভিড় করল ওদের বাড়িতে। মিঠাই তখন বলে দিল বদর কাকার বাড়িতে চোর চুরি করে পালিয়েছে। এদিকে টিটি তো হাওয়া। পাড়ায় হুইসেল বেজেছে চোর চোর বলে শোরগোল চলছে। কোথায় চোর? তা কে জানে? মিঠাই হঠাৎ দেখে টিটি হাওয়া! সে বাবাকে সঙ্গে করেই বেরুল টিটির খোঁজে। আর তারপর কিছু দূর হাঁটতেই দেখে নঁসু কাদায়, রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে আছে- একটু দূরে টিটি চোখ পাকিয়ে বসে আছে। সঙ্গে রয়েছে আরও দুটো ষণ্ডা বেড়াল। টিটি স্থির তার পেছনে বাকি দুজন গরর গরর করে শাসাচ্ছে। তারপর পাড়ার সবাই এলো, নঁসু ধরা পড়ল। রাতে থানা থেকে পুলিশ এসে নঁসুকে নিয়ে গেল। অনেক লোকে যে কাজ পারেনি তা বেড়াল টিটি করে দেখানোয় ওর দাম বেড়ে গেছে পুরোদস্তুর। সবাই ওকে এখন কদর করে খুব। এখন মিঠাই বাড়িতে না থাকলেও টিটির বেশ আদর যত্ন চলে সমানতালে।

ব্যাপারখানা কী আজগুবি

যাকগে সেসব কথা। টিটি ইদানীং পড়ালেখায় বেশ মন দিয়েছে। টিটির পড়ার সময় আশপাশে কেউ এলেও সেদিকে কোনো খেয়াল থাকে না তার, এমন মনোযোগী সে পড়ায়। বেড়াল বইপত্র পড়ে শিক্ষিত হচ্ছে! ব্যাপারখানা কি খুব আজগুবি? একদম তা নয়। টিটি রীতিমতো কসরৎ করে করে তার পড়ায় বেশ এগিয়েছে। অক্ষর দেখলেই বোঝে সে। ইংরেজিতেও সে বেশ ভালো করছে। মিঠাই ওকে মোর্স কোড শেখাচ্ছে। মোর্স কোড শেখা চাট্টিখানি কথা নয় গো, যে এ বিষয়ে জানে সে কম বুদ্ধির লোক নয়।

মিঠাই যে এতকিছু কী করে জানে এটাই রহস্যের। মেয়ের মাথা তো এক্কেরে চক্কির চূড়া। কত কি ওর মাথায় ধরে ওই-ই জানে। ওর মাথার কাছে সব যেন নস্যি বাপু। টিটি বেড়ালটাও হয়েছে ওর মতো। এই বেড়াল অ্যাত্তো বুদ্ধি নিয়ে ঘোরে তা কে জানে? বাবা রে এদের দুটোর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। ক্যাম্পাসের বন্ধুরা এমনিতেই মিঠাইকে সমঝে চলে। টিটি হলো মিঠাইয়ের বেড়াল, সে তো একটু বেশিই সব জানবে, স্বাভাবিক ব্যাপার এটা সবার কাছে। সেই টিটি মোর্স কোড শিখছে বিষয়টা সব্বার পুরো মাথা ঘোরানো ব্যাপার। এটা হয় কী করে, বেড়াল শেখে মোর্স কোড! বিশ্বের ঝানু ঝানু গোয়েন্দাদের কাজ মোর্স কোড শেখা। এতো গোয়েন্দাদের-ই ভাষা। সংকেতের মাধ্যমে মোর্স কোড তৈরি। সেই সব সংকেত এখন বোঝে টিটি, চাট্টিখানি কথা।

মাথায় ঢোকে না কারও। ক্লাসের সব বন্ধুরাই বলতে থাকল মিঠাইকে– 'কী রে তোর বেড়াল কি গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি? ওর আবার মোর্স কোড ক্যানো রে?' এ সমস্ত কথা শুনে মিঠাই কিন্তু থামল না একটুও। সে তার আদরের টিটিকে ঠিকই মোর্স কোড

শেখানোতে মন দিল। এর ফলও একদিন মিলে গেল। মিঠাই স্বপ্নেও ভাবেনি এমন সুযোগ আর এমন দিন তার জীবনে আসবে। টিটি বেড়ালকে মোর্স কোড সেখানোর ফল এত দ্রুত সে পাবে। কী সেই ঘটনা, যার জন্য মিঠাই আর তার আদরের টিটি সবার কাছে নতুনভাবে পরিচিত হয়েছিল?

সেবার শীতের ছুটিতে সবাই বেড়াতে গিয়েছি সুন্দরবনে। সঙ্গে বাবার বন্ধু, পুলিশ কমিশনার ফজল আহম্মেদ। বাবা তার বাল্যবন্ধু ফজল কাকাকে পেয়ে একেবারে সেই ছেলেবেলার দিনে চলে গেছে। দু-বন্ধুতে একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড। দুজনে মিলে নদীতে নেমে সাঁতার কাটছে। আমরা তো আর কেউ সাঁতার কাটতে পারিনে। ফজল কাকার স্ত্রী শিলু কাকিমা তো উনাদের এই কাণ্ড দেখে অবাক। ফজল কাকার ছেলে রোহন পর্যন্ত ওর বাবাকে এমন করে কখনো দেখেনি। সুইমিং স্যুট পরে জাহাজের ডেকে একেবারে দু-বন্ধুতে প্রস্তুত। রূপসা নদী পার হয়ে তখন জাহাজ পশুর নদীতে। আমাদের যাওয়ার গন্তব্য করমজল। করমজলে নেমে সেখানে কৃত্রিম চিড়িয়াখানাটা দেখা যাবে। জঙ্গল ততটা গহিন না হলেও; ওটাও কিন্তু সুন্দরবনেরই শুরু দিকের অংশ। ওখানে একরাত কাটিয়ে তারপর যাব হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর। মা আর শিলু কাকিমা খুব ভাব জমিয়ে গল্প করছে। আমার সঙ্গে বিশেষ ভাব হয়েছে রোহনের। রোহন তো মিঠাই দিদি বলতেই অজ্ঞান। আমরা সবাই মিলে শীতের বিকেলে জাহাজের ডেকে বসে গল্প করছিলাম। মা বিকেলের নাস্তা পরিবেশন করছে। শিলু কাকিমা তা সবার হাতে হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

বাবা এক পর্যায়ে কাকিমাকে বলছে, 'বুঝলেন ভাবি, ফজল ছিল লং জাম্পে ফার্স্ট আর আমি পারতাম হাই জাম্প। দুজনে এই দুই বিভাগের পুরস্কার কখনো অন্য কাউকে নিতে দিতাম না। সাঁতারে আবার দুজনে সমান পারদর্শী ছিলাম। একবার তো দুজনেই যৌথ ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।'

মৌলবী স্যার বললেন- 'তোমরা যুক্তি পাতিয়ে এমন করেছ, আমরা কী করে এখন দুটো চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার দিই বলো তো?'

আমরা দুজনেই বললাম– 'ওটা স্কুলে রেখে দিন, দেবেন তো ওই হারিকেন? ও আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।'

কাকিমা হারিকেনের কথা শুনে বললেন 'ওমা! সে কী, হারিকেন কেন?'

ফজল কাকা বললেন 'বুঝলে না তো শিলু, তখনকার দিনে কোথাও কারেন্ট ছিল না। তাই গ্রামের স্কুলে ফার্স্ট পুরস্কার ওই হারিকেন দিত, আলোকিত হতো সব, ছেলেমেয়েরা পড়তে পারত।' আমরা তো শুনে হাসতে লাগলাম।

বাবা বলল, 'আর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হলে পেত হয় গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা না হয় সঞ্চিতা। এই ছিল নিয়ম আর না হলে দিত দেবদাস, জুলভার্নের গল্প, লুইস ক্যারলের এলিস অ্যান্ড ওয়ান্ডারল্যান্ড, কিংবা ম্যাক্সিম গোর্কির মা।'

এখনকার মতো তখন ডিজিটাল যুগ ছিল না কিংবা মোবাইল ফোনের যুগও ছিল না। ক্যামেরায় একটা ছবি তুলতে যেতে হতো সেই শহরের জ্যোতি স্টুডিওতে। আমরা যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম সেবারই তো সব বন্ধুরা মিলে শহরের স্টুডিওতে গিয়ে একটা গ্রুপ ছবি তুলেছিলাম। আছে হয়তো সেই ছবি আজও সবার কাছে। আমি আর ফজলও তুলেছিলাম আলাদা করে। আমাদের ক্লাসের শিক্ষকরা মানিকজোড় বলতেন। আমাদের সেসব দিন আজ স্মৃতি। প্রিয় শিক্ষকরাও আজ আর কেউ বেঁচে নেই।

দেখতে দেখতে দু-দিনের সুন্দরবন ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরলাম বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে বাড়িতে রয়ে গেল রোহন। ওর স্কুল ছুটি আছে, ক'টা দিন আমাদের এখানে থেকে যাবে এই রকমই কথা হলো। আমরা বেশ খুশিতেই রোজ বাড়িতে হই হুল্লোড়ে কাটিয়ে চলেছি। সঙ্গে রয়েছে টিটি বেড়াল। এরই মধ্যে ১৬ ডিসেম্বর এলো। আমাদের বিজয় দিবস। বিজয় দিবস মানে এখন পত্রপত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের কদর করা। তারপর আবার সেই আগের মতো সারাটা বছর মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ জীবন, নেই আর আলোচনা। অথচ এরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থাকার কথা ছিল। কাল্পনিক গল্পের চেয়ে এদের মুখেই বছরজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শুনতে পারলে এ প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানত।

দাদুর বন্ধুর ডায়েরি

আমার দাদু বেঁচে নেই; কিন্তু দাদুর একটা বাক্স আছে আমাদের কাছে। ওটা ঠাম্মার ঘরে থাকে। ঠাম্মা ওটাকে আগলে রেখেছেন। এবারে বিজয় দিবসের ঠিক তিন দিন আগে আমাদের বাড়িতে এলো দাদুর এক বন্ধুর ছেলে। দাদুর বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। বেশ কিছু বড় বড় সম্মুখযুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্মানসূচক মরণোত্তর বীরউত্তম উপাধিও পেয়েছেন। সেই বন্ধুর ছেলে তিনি। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক। তিনি জেনেছেন আমার দাদুর কাছে তার বাবা মওলা হোসেনের রেখে যাওয়া

মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা একটি ডায়েরি। তিনি সেই ডায়েরি নিতে এসেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি শহীদ হয়েছেন। এর দিন দুয়েক আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন উনার বাবা। বাবার কাছে এসে তিনি তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'ডায়েরিটা তার বড্ড দরকার, ওটা তার মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া বাবার একমাত্র স্মৃতি। তিনি সেটা নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চান পরিবারের জন্য।'

বাবা জানিয়েছেন 'তার কাছে ওরকম কিছু নেই, তবে তার বাবা যদি ওইরকম কিছু রাখেন তা আমার মায়ের কাছে থাকতে পারে, আমি মায়ের কাছে জেনে আপনাকে জানাচ্ছি।' বাবা এই কথা বলে ঠাম্মার কাছে গিয়ে বলল সব কথা, দাদুর বন্ধু মওলা হোসেন সাহেবের কথা। ঠাম্মা সে কথা শুনে ছুটে এলেন বসার ঘরে।

একেবারে হামলে গিয়ে যেন বললেন ''এতদিনে মনে হলো রে বাবা, কাকিমার কথা? তোমার মা কেমন আছেন? বাবার স্মৃতি নিতে চাও নেবে; কিন্তু আমার একটাই শর্ত একটা দিন থেকে যাও। এসেছ তো সেই দূর থেকে। কাল সকালে যেয়ো। তোমার বাবা মওলা ভাই যে কত ভালো মানুষ ছিলেন, কতবার এসেছেন, বেড়িয়েছেন। তুমি আজ থেকে যাও, ডায়েরিটা তোমার কাকা মৃত্যুর আগে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এই ডায়েরিটা আমার বন্ধুর লেখা, ও শহীদ হওয়ার দুদিন আগে দিয়েছিল। বলেছিল আমি যদি না থাকি তবে আমার ছেলে এলে ওকে দিস, ওর খুব দরকার হবে একদিন।' তা তুমি এলে এত বছর পর, বাবা! এসেছ যখন আজ থাকো, কাল ভোরেই যেয়ো।'' কিন্তু লোকটা মোটেও ঠাম্মার কথায় খুশি হলো না যেন।
যখন এত কথা হচ্ছিল তখন টিটি বেড়ালও বসেছিল দাওয়ায়। লোকটার কথা শুনে মিঁয়াউ মিঁয়াউ করে দুটো মোর্স কোডে সিগন্যাল দিল টিটি। যা বলল তার অর্থ হলো 'না, না।' টিটির মোর্স কোড বুঝলাম কিন্তু কী 'না, না' করল তা তো ছাই বুঝতে পারলাম না। এদিকে লোকটাকে একরকম জোর জবরদস্তি করেই যেন রেখে দিল ঠাম্মা। আমিই ওকে থাকার জন্য ঘর দেখিয়ে দিতে গেলাম দোতলার দক্ষিণের ঘরটা। লোকটা বয়সে বাবার চেয়ে দু-তিন বছর কমই হবে। উনার নাম হাবিবুল্লাহ হোসেন। হাঁটতে হাঁটতে হাবিবুল্লাহ সাহেব জানতে চাইলেন– 'তোমার নাম কী?'
'মিঠাই'
'কী পড়ছ?'
'ট্রিপল ই'তে পড়ছি, ফিফথ সেমিস্টার'
'তা ভালো, তা ভালো। একাল তো বিজ্ঞানের, এখন এইসব বিজ্ঞানেই পড়া ভালো।'
কথা বলতে বলতে উনার থাকার ঘরের সামনে এসে গেলাম। বললাম, এই ঘর আপনার থাকার জন্য। ভেতরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। তক্ষুনি লোকটা বললেন, 'তা আবিষ্কারের নেশাটেশা আছে নাকি তোমার?'

আমি উনার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'না তেমন কিছুই নেই। তবে যদি কখনো কিছু করি নিশ্চয়ই আলাদা আর নতুন কিছু করব।' লোকটা আমার কথা শুনে খিক খিক করে হেসে দিলেন। শুনে একেবারে পিত্তি জ্বলে যাওয়ার জো হলো আমার। কুল মিঠাই, কুল... মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বের হয়ে এলাম শেষমেশ।

প্রাণীরা বিপদের সংকেত পায়

মিঠাইকে দেখতে পেয়ে টিটি সোজা একটা ধা করে দৌড় দিল। টিটিকে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে কোলে নিল মিঠাই। তারপর হাত বুলোতে লাগল ওর মাথায়। মিঠাই দেখল টিটি সেই না, না করে মোর্স কোডে বলে যাচ্ছে। শেষে একটু থামল সে। মিঠাই তখন মোর্স কোডে জানতে চাইল 'না কেন, কী হয়েছে?' টিটি ফের চোখের পলক দিয়ে মোর্স কোডে বলল, 'না সে ভালো নয়।' আবার মোর্স কোড 'সাবধান! সাবধান!' টিটির এসব কথায় যেন ও একটু ভাবনায় পড়ে গেল। প্রকৃতিতে কিছু ঘটার আগে প্রাণীরাই জানতে পারে। মিঠাই গত বছর একটা রিসার্চ জার্নালে পড়েছিল, খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৩ সালে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার হেলিস নগরীতে একবার এক মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল। এতে প্রায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও নগরীর কোনো মুক্ত প্রাণীর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কারণ এখানে বসবাসকারী কুকুর, বেড়াল, সাপ, বেজি ছাড়াও অন্যান্য প্রজাতির কিছু প্রাণী ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগেই নগর ত্যাগ করে। ১৮০৫ সালে নেপালে ভূমিকম্প শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে সেখানকার ষাঁড়, ভেড়া, কুকুর, রাজহাঁসগুলো একত্রে চিৎকার করতে শুরু করে। এইরকম দৃশ্য লক্ষ করা যায় ১৯০৬ সালের সান ফ্রান্সিসকো শহরে ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগেও। সেখানকার ঘোড়াগুলো হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াতে শুরু করে। এমনকি ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট সুনামি শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে সেখানকার হাতিগুলো তুলনামূলক উঁচু জায়গায় উঠে আসতে শুরু করে। এই সুনামিতে প্রাণ হারায় প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার মানুষ। অনেক সময় আমাদের পোষা কুকুর বা বেড়ালের অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পাই। হয়তো ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। বিচলিত ভঙ্গিতে নানা রকম ইঙ্গিত দেয়। কিছু আচরণকে আমরা ঝড়ের পূর্বাভাস বলে ধরে নিই। অনেক সময় মিলেও যায়। তেমন কোনো বিপদ আসবে বলে না না করে চলেছে টিটি? মিঠাই জানে গৃহপালিত প্রাণীদের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সাধারণ মানুষ যা টের পায় না, এরা অনায়াসে তা ধরতে পারে। এরা ক্ষীণ শব্দ শুনে বা সামান্য গন্ধ পেয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের কানের এমন গুণ যে দূরবর্তী ঝড়ের শব্দ থেকে তারা ঝড়ের আভাস পায়। আবহাওয়াবিদরাও বলেন, দূরে কোথাও ঝড় হলে ওই এলাকার বস্তুকণার গন্ধ বাতাসে ভেসে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এই গন্ধ কুকুর বা বেড়াল টের পায় এবং তার প্রতিফলন ঘটে তাদের আচরণে। তা ছাড়া ঝড় শুরু হওয়ার আগেই কোনো স্থানের তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতায় তারতম্য ঘটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা এত সামান্য যে মানুষ টের পায় না, কিন্তু ঘরের পোষা কুকুর বা বেড়াল টের পায়। কিছু কিছু পোষা কুকুর বা বেড়াল আসন্ন বিপদের কথা জানান দিতে পারে। এর মধ্যে কোনো অলৌকিকতা নেই।

তারমানে টিটি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। লোকটা সুবিধার নয়। তবে তো রাতে পাহারা দিতে হয়। যে করে হোক লোকটাকে রাতে পাহারা দিতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। পাহারা দিতে হলে তো লুকিয়ে থেকে জানতে হবে। এমনি এমনি বসে থাকলে বুঝে নেবে লোকটা। কোনো অঘটন না ঘটায় শেষে আবার, এইসব ভেবে মিঠাই রাতে খেয়ে বিছানায় গেল। খাবার টেবিলে লোকটা জানিয়ে রাখল একদম সকালেই বের হবেন, ফলে রাতেই যেন তার বাবার ডায়েরিটা ফিরে পান তিনি।

ঠাম্মা লোকটার কথা শুনে বলল, 'সে বাবা তুমি চিন্তা কোরো না। যত ভোরেই বের হও তুমি পেয়ে যাবে ডায়েরি। ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না, তা বাবা তুমি কতদিন আছো দেশে– সুযোগ পেলে এসো আবার।'

হাবিবুল্লাহ সাহেব বললেন, 'না না কাকিমা আমি ঢাকায় কাজ সেরেই আবার ফিরব। তাছাড়া আমাদের কিছু জমিজমার ব্যাপার রয়েছে যা শরিক লোকদের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারার ব্যাপার। ওই নিয়ে একটু সমস্যা চলছে।'

খেতে খেতেই বাবা অতিথিকে বলল, 'বুঝলেন বেশি করে খান, শহরে এসব মাছ পাওয়া যায় না, শহুরে মানুষেরা যে মাছ খায় তা মাছের ফসিল, ওইগুলো মাছ নয়। আমরা গ্রামের মানুষেরা টাটকা সবজি খাই, টাটকা নদীর মাছ, গোয়ালের গরুর দুধ, নিজেদের ঢেঁকিতে ভানা চাল। এসব পাবেন কোথায় বলুন একালে। এখন তো শহর আধুনিক হয়েছে। আমাদের এখানে পারিবারিক যৌথতা এখন আরও দৃঢ় হয়েছে। শহরে এইসব যৌথতা নেই। আমরা এখনো একসাথে বসে খেতে ভালোবাসি, শহরের মানুষের মধ্যে এইগুলো নেই। পুরনো দিন থেকে আপনারা বেরিয়ে এসেছেন, বুঝলেন ভাই।'

বাবার কথা শুনে হাবিবুল্লাহ সাহেব বলে উঠলেন, 'আপনি তো অধ্যাপকদের মতোই বলছেন, শহরে সত্যিই এসব নেই এখন।' খাওয়া শেষে সবাই আমরা যার যার মতো শুতে গেলাম। আমার চিন্তা রইল লোকটাকে পাহারা দিতে হবে। কী করে লোকটা তা দেখতে হবে।

চাঁদের আলোয়

পূর্ণিমার রাত। চারদিকে আলো থৈ থৈ করছে। যেন আলোর বাঁধ খুলে দিয়েছে আজ সব চুক্তি ভঙ্গ করে। বেশ রাত হয়েছে। বাড়ির সবাই শুয়েছে। সব ঘরের আলো বন্ধ। আমার রুমের কেবল দরোজাটা হালকা চেপে রেখেছি। সবাই ঘুমিয়ে গেছে চারদিক সুনসান, কিছু ঘটলে সহজেই বুঝতে পারব এই কথাগুলো মনের মধ্যে সবে আউড়েছি। তখনই দেখছি চাঁদের আলোয় দরজার পাশ দিয়ে কেউ যেন হেঁটে গেল, আমি একটু সতর্ক হলাম। টিটির মাথায় হালকা স্পর্শ করলাম জ্বলজ্বল করে উঠল টিটির চোখ। টিটি জেগে আছে, চল টিটি একটু দেখি কে গেল।

ঘর থেকে আমি আর টিটি বের হলাম। দেখলাম ঠাম্মার ঘরের সামনে একটা ছায়ার মতো কিছু নড়াচড়া করছে। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটু পর ছায়াটা আমাদের দিকেই আসতে থাকল, কী ওটা আসছে টিটির মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম, টিটি চুপ করে পড়ে রইল। আমি আর টিটি বারান্দায় সিঁড়ির গোড়ায় ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। সে কী আমাদের হাবিবুল্লাহ সাহেব! তিনি এত রাতে ঠাম্মার ঘরের সামনে কী করছেন? কেন গিয়েছিলেন বুঝতে পারলাম না! লোকটা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। আমি আর টিটি এবার লোকটার থাকার ঘরের বাইরে গেলাম, জানালার পাশে চুপটি করে বসে রইলাম কান খাড়া করে যেন টুঁ-শব্দটিও শুনতে পাই। দেখলাম লোকটা ঘরে পায়চারী করছে, হাতে একটা মোবাইল তার। কাকে যেন বারবার চেষ্টা করছেন ফোনে। একটু পর আপনা থেকেই ফোনটা বেজে উঠল। লোকটা উদগ্রীব হয়ে ফোনটা তুলতেই ওপার থেকে প্রশ্ন করল সম্ভবত। লোকটা বলল- 'এ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে। ডায়েরিটা ওই বুড়ির ঘরে পুরনো একটা বাক্সে রয়েছে। আমি সব জেনে নিয়েছি। শোন তোরা আগামী আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবি। বুড়িকে অজ্ঞান করলেই হবে। আর সবার ঘরে বাইরে থেকে আমি ছিটকিনি আটকে রাখব কেউ বুঝতেও পারবে না রে। তবে বুড়ি ঝামেলা পাকালে মেরে দিবি, একদম দেরি করা চলবে না। রাতেই কেটে পড়তে হবে যেভাবে হোক কাজ সেরে। ডায়েরিটা আমার চাই-ই। ওটা না হলে আমার সব সম্পত্তি ওরা নিয়ে নেবে। বাইরে থেকে ওরা এসে আমার দখলে থাকা জমি, বাড়ি নেবে তা হতে দেব না। এই ডায়েরি পুড়িয়ে দিলেই সব কেচ্ছা শেষ। যে জমিজমা আর বাড়ি এতদিন ধরে পাহারা দিয়েছি আমি আজ তা চাচার ছেলেদের দিতে পারিনে। তোরা দ্রুত আয়। এসেই আমাকে জানাবি মেসেজে আমি জেগে আছি।'

ফোনে বলা হাবিবুল্লাহ সাহেবের কথা শুনে আমি আঁচ করতে পারলাম লোকটার কূটবুদ্ধি। সে আসল লোক নয়, যেভাবে হোক এ থেকে বাঁচাতে হবে আমাদের সবাইকে। টিটিকে ডেকে মোর্স কোড দিতে গেলাম কিন্তু আমার হাতের শব্দে লোকটা বোধহয় বুঝেছিল। চুপিচুপি বদমায়েশ লোকটা বেরিয়ে এলো, হাতে একটা কালো রিভলবার। আমার দিকে তাক করা, টিটি আমার কোলেই বসে ছিল। লোকটা বলল, 'একটিবার কোনো শব্দ করবে না মেয়ে, সবটাই নিশ্চয়ই শুনে নিয়েছ। তাই তোমাকে ছাড়ছিনে। যতক্ষণ আমাদের অপারেশন শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ তুমি বন্দি। হাতের রিভলবার দেখেই একটু ঘাবড়ে গেলাম; কিন্তু টিটিকে ঠিকই মোর্স কোড দিলাম। টিটি চোখের মাধ্যমে কোডটা এতো ভালো পারে যে অবাক হই নিজেও। টিটি আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শাঁই করে গিয়ে লোকটার হাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রিভলবার পড়ে গেল; কিন্তু লোকটার থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারলাম না। একদম জাপটে ধরে ফেলল, অসুরের মতো শক্তি যেন, সাঁড়াশির মতো শক্তি তার হাতে। আমি আর নড়তে পারলাম, না। উপায়ন্তর না দেখে টিটিকে আবার মোর্স কোড দিলাম, টিটি আর দাঁড়াল না, টিটি পার হয়ে গেল বেলকনিটা। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল, মুখে কাপড়ও গুঁজে দিল। আমি কথা বলতেও পারছিনে। আমার নড়বার শক্তি নেই একদম। লোকটা বলল, দেখো মেয়ে আমার দরকার আমার চাচার ডায়েরি। আমি আমার চাচার সব সম্পত্তি চাই। আমার চাচার ছেলে আর মেয়ে বিদেশ থেকে এসেছে সেসব বেচে দিতে। আমি তা হতে দেব না। এতদিন ধরে আগলে আছি। শুনেছি এই ডায়েরিতে একটা উইলের মতো কিছু লেখা আছে। আমার ওটাই দরকার। তোমরা কোনো দোষ করোনি, তোমাদের সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। গত মাসে খোঁজ পেয়েছি তোমাদের, কাজের জন্য আমি আসতে পারিনি। এখন তো আর সমস্যা নেই, ফোনে কথা বলছিলাম তা শুনেছ যে আমি ওদের সম্পদ নিয়ে নেব। তাই আমি যতটা সময় না যাচ্ছি কাজ সেরে ততটা সময় তুমি এই ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে। বেশি ঝামেলা যদি করো তবে আমি তোমায় এই রিভলবারের গুলি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। আপাতত তোমার হাত-পা বাঁধা থাকছে আর মুখে গুঁজে দিলাম এই যে কাপড়। চুপচাপ বসে থাকো এই চেয়ারে। আমার লোকেরা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। ওরা এলেই তোমার ঠাম্মার ঘরে গিয়ে বাক্স নেব তারপর রাতেই আমরা চলে যাব। সব ঘরের ছিটকিনি বাইরে থেকে আটকে দিয়ে আসি যাতে কেউ বের না হতে পারে। তুমি থাকো এখানে বুঝলে মেয়ে। আমি কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য সব করতে পারি।' লোকটা কথাগুলো বলে ঠিকই চলে গেল সব ঘরের বাইরে থেকে ছিটকিনি দিতে। আমি মনে মনে শুধু টিটিকে স্মরণ করছি, পারবে তো টিটি। হে প্রকৃতি, ওকে সাহায্য করো, সাহায্য করো। এইভাবে ঘুমিয়েছি কখন তা বুঝতেই পারিনি।

বাড়িতে পুলিশের বাঁশি শুনতে পেলাম। অনেক লোকের কথাও শুনছি, কিন্তু কী হয়েছে তা আর বুঝতে পারছিনে, অনেক লোকের জটলা জানালা দিয়ে আলো আসছে এ ঘরে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে কী হলো? একটু পরেই টিটি এলো সঙ্গে দেখলাম বাবা আর সেদিনের সেই থানার পুলিশ অফিসার। বাবা দৌড়ে এসে আমার মুখের কাপড় খুলে দিল। হাতের বাঁধনও খুলে দিল। বাকিটা আমিই মুক্ত হলাম। টিটি পাশে এসে আবার সেই মোর্স কোড দিল আমায়। আমি হাসলাম, কাজ হয়েছে তবে। যাহ, টিটি তুই তবে আজ করে দেখালি। পুলিশ অফিসার তারপর টিটির কাণ্ডটা বললেন– কী করে সে থানায় গিয়েছে, তারপর সব বলেছে।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমি ভাবতেও পারিনি এই অজ-মফস্বলে মোর্স কোড! তাও আবার বেড়াল সেখানে গোয়েন্দা! ভাবা যায়? জানেন তো আমি শিখেছিলাম শখের বসে ট্রেনিংয়ের সময়; কিন্তু এর প্রয়োগ ফল পেলাম আজ।' বাবা এবারে সত্যি অবাক হলো, হাবিবুল্লাহ সাহেবসহ তার আরও তিনজন সহযোগী ধরা পড়েছে। ঠাম্মাকে ওরা ছুরি মেরেছে, এখন ঠিক আছে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। পুলিশ তক্ষুনি সব তথ্য ওদের থেকে জেনে নিয়েছে। ডাকাতির কেসও ফাইল হয়েছে ওদের নামে। পরদিন সকালে সেই দাদুর বন্ধুর ছেলে আর মেয়ে এলো, ওদের বাবার লেখার ডায়েরিটা ওদেরই ফেরত দিল ঠাম্মা। এইদিকে এই ডাকাত ধরার গল্পটা পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সবার মুখে মুখে পৌঁছল, আমাদের বাড়িতে চলে এলো খবরের কাগজের লোকেরা। সেদিন ওরা বেশ ক'বার টিটির সঙ্গে আমার ছবি তুলল। ঠিক বিজয় দিবসের দিন দেখা গেল এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি ডাকাতির পুরো খবর বের হলো। ডায়েরি কিছু অংশও প্রকাশ পেল আর সঙ্গে আমার প্রিয় টিটি বেড়ালের সঙ্গে আমার ছবিও ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। টিটির সেই ছবি তো এখন আমার বন্ধুদের কাছেও আছে খুব যত্নে। আর পাড়ায় মহল্লায় টিটি বেড়াল এখন তো পুরো আইকন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাঁসুপুর মানে সেই গোয়েন্দা বেড়াল তো বিষয়টা এখন এমনই। আমি এখন টিটির জন্য বেশি করে বাড়িতে থাকি, তাছাড়া টিটি এখন ঘুম ছাড়া বাকি সময় আমার সঙ্গেই থাকে।

(সংক্ষেপিত)

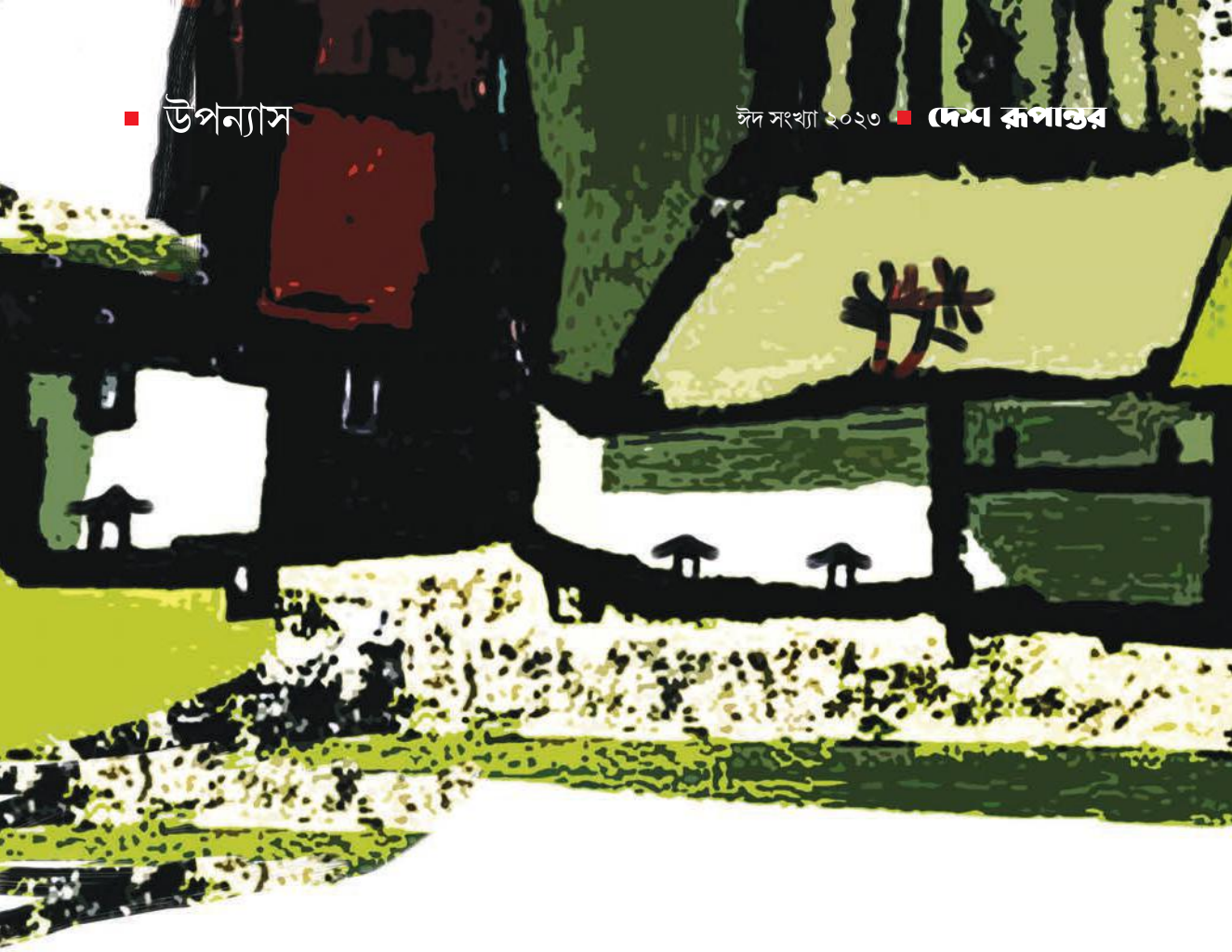

প্রশান্ত মৃধা

স্তব্ধ পাখসাট

অলংকরণ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

দরিয়া আমার সামনের চেয়ারে বসে কথা বলছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, তার দিকের খাটের কোনায় বসলাম। কথা যখন এইভাবে ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় পাক খাচ্ছে, একবার ভাবলাম আবার লায়লার প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করব নাকি। কিন্তু দরিয়াকে যতটুকু জানি, হয়তো বলে বসবে ওই এক বিষয় ছাড়া আর কোনো কথা নেই। হয়তো বলবে, কই আমার কথা তো কিছুই জানতে চাও না। কিন্তু দরিয়া বলল, 'যাক, বাজে কথাই যখন, তাহলে চলো এই দিকটার ওই বিল্ডিংটা দেখিয়ে আনি। ওই যে তুমি বলেছিলে, ওখানে স্টার হোটেলের সুযোগ-সুবিধাগুলো দেখবে।'

'চলো। ওখানে লোকজন আসেনি?'

'আরে না। আজ বুধবার।'

'কে বলেছে, তোমার মাসুদ সাহেব?'

'আবার?'

'জারা আর আয়াতকে দেখলাম সুইমিংপুলে। ওর মা সঙ্গে গেলেন না?'

'ওরা পারবে। কালও নিজেরাই সাঁতরেছে। লায়লার মনটা খারাপ। মনমরা। কারণটা তো বুঝতেই পারছ।' বলতে বলতে দরিয়া গলা নামিয়ে নিল। রুম থেকে বেরোনোর আগে চলার যে ফুর্তি তাতে যেন খানিকটা খামতি ঘটল। দুজনেই এই একটি মুহূর্তে খানিক যেন নিশ্চলও। আমার টাকরার কাছে ঝুলছে প্রশ্ন অথচ তা করতে পারছি না। দরিয়ার চোখের ছায়ায়, বাইরে রোদ ওঠা দিনে, ওদিকে পরদা খানিকটা সরে থাকার পরেও, রুমটা এখন ছায়াময় হয়ে উঠল। রুমের দরজার লক হাত দিয়ে দরিয়ার দিকে তাকালাম। জানতে চাইতে পারতাম, 'কেন?' কিন্তু প্রশ্নটা হতো বোকার মতো। অপ্রয়োজনীয়ও। যেহেতু বিষয়টা কিছুটা হলেও আমার জানা। কানের কাছে জাঈদ নামের সেই অদেখা লোকটি! সেই প্রশ্ন। প্রশ্ন নাকি সিদ্ধান্ত। তিনি আর আসবেন না। এই কথাটাই ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। কিন্তু এখন ও দরিয়ার দিকে তাকিয়ে ওই কথার ভার বাড়ানো অবান্তর। বাইরে গেলে আলোয় এই গুমোট আর অব্যক্ততার ভাবটা কেটে যাবে। এখানে দুজনার এই দৃষ্টি বিনিময় খানিকটা অস্বস্তিকরও।

'হুঁ। পারছি–। খুব স্বাভাবিক। কিন্তু জানো, দরিয়া?' দরজার লকে হাত দিয়ে আমি বললাম, 'আমার কিন্তু লায়লার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে ওসব শোনার পর থেকেই।'

দরিয়ার ভুরুতে গিঁট পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলেছি আমি। দরিয়া আমাকে হাতের ইশারায় আবার ভেতরে ডাকল। আমি দরজা ভেজিয়ে ঘুরতেই ভুরুর ওই গিঁট না-খুলে ও জানতে চাইল, 'কী শুনতে ইচ্ছে করছে?'

'ওই যে পাষাণভার বয়ে বেড়ানো। যতক্ষণ জারা তার সামনে ততক্ষণই তো জাঈদও তার সামনে। তাকে তো ভুলতে পারছে না। অথবা জাঈদ ও তো তো। এইসব–'

'হুঁ, হইচে। পরে শুনো। আগে তো পুরোটা জানো। ভার তো আছেই। তাছাড়া তুমি তাকে কিছু বললেই তো ও বুঝে যাবে আমি তোমায় ওসব বলেছি।'

'সেকথা বলবে ওকে। বলবে, আমি নয়শ তিনে ভোররাতে বলা ওদের কথাগুলো শুনে ফেলেছি। ওকে ক্যাফেতে দেখে যে কিছু-একটা বুঝেছি তা নিশ্চয়ই বলতে যাচ্ছ না।'

দরিয়া আমার দিকে চেয়ে, 'আচ্ছা-আচ্ছা' করল। তারপর বলল, 'তোমার মাথায় যে কত বুদ্ধি! তাতে কি ও কিছু মনে করবে না? ওই ভোর রাতে তুমিই-বা জেগেছিলে কেন!'

'আরে মনে করার কী? কী আছে মনে করার? আমি শুনেছি তাই তোমাকে বলছি। তুমি মোটামুটি মাসুদ সাহেব বলে পাস কাটাতে চেয়েছিলে। পারোনি। আমি সবই বুঝে গেছি। এইভাবে–'

'এর ভেতরে আবার মাসুদকে টেনে আনছ কেন? ঘটনা কী? আমায় আবার কিছুতে সন্দেহ করো নাকি? তোমার মতিগতি কিন্তু ভালো ঠেকছে না। গলা পর্যন্ত গিললেই কীসব শোনো আর কীসব বলো তার কোনো ঠিক থাকে? বলতেই থাকো, বলতেই থাকো, হ্যাংওভার কাটেনি না?'

'কী যে বলো না। স্নানান্তে আমি এখন পবিত্র মানব। মনেই হয় না কোনো দিনও পান করেছি।'

'হইচে। চলো।' গলা নামিয়ে বলতে বলতে দরিয়া দরজার বাইরে এলো। এখন গলায় একেবারে অন্যস্বর, 'আপনাকে নিয়ে আগে ওটা দেখিয়ে এসে আমরা লায়লাকে ডাকব। তখন না হয় একবার চা খাব।'

আমরা নয়শ তিন ছাড়িয়ে নয়শ দুইয়ের সামনে থেকে ওভারব্রিজের দিকে। আমি একবার নয়শ দুইয়ের দিকে তাকিয়েছি। ঘাড় ঘোরাতেই ডান দিকে বারান্দার বাইরে মাধবীলতার ঝাড়ে একটি ছোট্ট টুনটুনি চোখে পড়েছে। আহা, গাছের পাতায় আলো আর পাখির গান একইসঙ্গে! কতদিন পরে। মুহূর্তে মনটা ভরে গেল!

২

এই দিকে এসে দরিয়া সোজাসুজি একটি বড়সড় বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল মাঝখানের বারান্দা ধরে। ওই দিকের টিলা ও ক্যাফেটেরিয়ার থেকে গোটা ভবন আর আশপাশের পথ যত সংকীর্ণ ভেবেছিলাম, ঢুকতে ঢুকতে মনে হলো মোটেও তা নয়। বরং উলটোই। একেবারে প্রমাণ সাইজের একটি হোটেলের কোনো দুটো রুমের মাঝখানের প্যাসেজে যেমন থাকে, তাই। এমনকি সামনে খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপরে দুই সারিতে সোফা পাতা। দরিয়া সেগুলোর সামনে না দাঁড়িয়ে উত্তর-পুব কোনায় একটি রুমের দিকে এগোল। এই প্যাসেজটার পরে শাটারটানা লম্বা দরজা। টেনে সরাতেই দুদিকে দুটো রুম। ও ডানের রুমটায় ঢুকল। আমিও ঢুকতেই যেন ভ্যাবাচেকা খেলাম। একি! এমন ব্যবস্থা বলতে গেলে আগে দেখা হয়নি। রুমের ভেতরেই বাথটাবটা গোল এবং আশপাশ জুড়ে অসংখ্য কায়দা। এসব আমার কাছে নতুন। কখনোই দেখা হয়নি আমার চক্ষু মেলিয়া। বিস্ময়ে দরিয়ার কাছে জানতে চাইলাম, 'এই অবস্থা! এটা বাথটাব?'

'হুঁ! মাসাজ হয়। গরম পানি ঠাণ্ডা পানি ঘাড় এলিয়ে দেওয়া।'

'তা বলে আকৃতিতে এমন গোল আর রুমের একপাশে?'

'হুঁ। যদি একসঙ্গে দুজন নামে তাহলে এতটা জায়গাই তো লাগবে। বুদ্ধু কোথাকার যেন কিছুই বোঝে না।'

'আসে এমন ধারা মানুষ?'

'কেন না। বয়স্ক পুরুষ সঙ্গী তরুণী। এই কোনায় নিভৃতে এমন রুম তো তারা চাইতেই পারেন। নাকি পারেন না?'

'হুঁ। তা পারেন। আলবৎ পারেন। একশোবার পারেন। ভাবছি–'

'ভেবে লাভ নেই। বরং দেখো তোমার সাথে কেউ আসে কি না?'

'এই যে সবকিছু আমার দিকে আনা। আমি অমন বয়স্ক আর ক্ষমতাবান মানুষে পরিণত হইনি, সখি।'

'হতে কতদিন। তাই আগেই দেখিয়ে রাখলাম যদি লাগে।'

বিছানার মাথার দিকে একটা সোফা। হেলান দেওয়ার জায়গাটা এতই উঁচু যেন সিংহাসন। বিছানার লম্বালম্বি দুই দিকে দেয়াল জুড়ে আয়না। অভিসার কক্ষ বলে কথা। এই দেখানো? আশপাশে সব রুমই এমন। কিন্তু এখানে ঢোকার আগে ডান দিকের প্যাসেজে যে শিশুর গলা শুনলাম। দরিয়ার কাছে জানতে চাইলাম, 'এদিকের রুমগুলোও একই রকম?'

'না-না। তবে কাছাকাছি। এখানে হানিমুন কাপলরা আসে তো। তাদের কথাও এদের মাথায় রাখতে হয়। বড় রুম, পরদা ও শাটার টানা বাথরুম, রুমে ওই টেবিলে খাওয়া-দাওয়া, এখানেই তারা কাটিয়ে যায়, ওই বারান্দায় বসে, সেটাও বড়।' বলতে বলতে দরিয়া বেলকনির দিকটাতে গেল। সেদিকের পরদা সরিয়ে ঈষৎ নীলাভ শাটার সরিয়ে দিতেই এই রুমের অর্ধেকটা রোদে ভরে গেল। সূর্য এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। রোদটা আসছে। দরিয়া বেলকনিতে গিয়ে ইশারায় ডাকল।

এই রুমের বেলকনি তুলনায় বড়। বারান্দাটা কোনোভাবেই ক্যাফেটেরিয়ার দিকে থেকে দেখা যাচ্ছিল না, যদিও দুটো কোনাকুনি। এই বিল্ডিংয়ের একটা কোনায় তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাটি থেকে থেকে বেলকনিটা বেশ উঁচুতে। নিচে ফাঁক। কাছে ও সীমানায় কাঁঠালগাছ। সেগুলোও মনে হয় আগেই পরিকল্পিতভাবে লাগানো। বেলকনির বাইরে গাছের ছায়া। পাশের কাঁঠালগাছটার পরেই থোকা থোকা আনারসগাছ। কলাগাছও আছে ঢালে। এখানে সামনে উত্তর, কিন্তু ডানে পুব পাশটা খোলা রাখায় আলো গায়ে

লাগছে, সূর্য ঢাকা পড়ে আছে গাছের ছায়ায়। চারদিকের গাছের আবরণে ঘিরে ধরা নির্জনতায় শুধু আসছে পাখির ডাক। কাঁঠাল পাকতে শুরু করেছে। একটু দূরে একটা গাছের নিচে পড়ে আছে একটা। গায়ে পাখির ঠোকরের দাগ। ওই গাছটা সীমানার বাইরে। পাশে কংক্রিটের ছোট খুঁটিতে তারকাঁটার বেড়া!

দরিয়া বলল, 'এই জায়গাটা এখানকার সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। কী সুন্দর না?'

এই প্রথম দরিয়া আমার কাছে কোনো বিষয়ে মতামত চাইল। হতে পারে একটু আগে আমার চোখের নাগরিক হোটেলসজ্জার বিস্ময় দেখে, সেটাকে উলটে দিতে তার এই প্রস্তাবনা। কিন্তু ওর জানতে চাওয়া আর না চাওয়া কোনো ব্যাপার নয়, আমি এমনিতে স্বীকার করতাম, এতক্ষণ যেভাবে দেখেছি যা দেখেছি, সেদিক থেকে এই ভিউ একেবারেই বিপরীত! কিন্তু আমার কাছে ওই তাঁবু কটেজের থেকে দেখা সামনের প্রান্তর ও দুই টিলা বা পাহাড়ের মাঝখানের অধিতক্যাসহ সেখানকার লেবু-কলা-আনারস ও বাঁশানি বাঁশের ঝাড়ের শোভার মাত্রা একেবারেই ভিন্ন। এ দিকটা অন্য কারণে ভিন্ন। এখানকার নির্জনতা ও রোদ্দুরের ভেতরে যে ছোঁয়া এ আলাদা! একেবারেই আলাদা!

দরিয়াকে বললাম, 'তুমি না জানতে চাইলেও বলতাম এই জায়গাটা সত্যি ভিন্ন আর এর সৌন্দর্যও আলাদা।'

'এই পাশে শেয়াল আসে রাতে। এখানে বসলে দেখা যায়।'

'খুব স্বাভাবিক। এত কাঁঠাল গাছে গাছে, শিয়াল তো আসবেই।'

'শেয়াল-শেয়াল' বিড়বিড়ও করলাম। দরিয়া হয়তো খেয়াল করেনি। ও চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'বসো, চাইলে এখানে তোমার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তবে তো খুবই ভালো হয়।'

'ভালো না ছাই, চা খেয়েই তো সিগারেট জ্বালানো। সেটা হবে না। যদি তা মানতে পারো তাহলে চা দিতে বলি এখানে, আর লায়লাকেও।' দরিয়া ফোনটা চোখের সামনে নিল। ওর লায়লা বলাতেই আমারও মনে হলো, এখানেই ওই প্রসঙ্গের বাকিটা শোনা যেতে পারে। সন্ধ্যার দিকে যদি লায়লার বর আসেন তাহলে দেখা যাবে হয়তো এসব শোনার আর কোনো সুযোগই হবে না। তখন ওই অজানা কথাগুলো ভেতরে গুমরে বেড়াবে এ অবস্থাটা হবে না-গেলা না-ওগড়ানো দশা! ও ভালোই জানা আমার। তখন চারপাশের কোনো কথাতেই আর প্রায় কোনো আকর্ষণ থাকে না। সব স্বাদ লাগে বিস্বাদ। লায়লা সামনে থাকলে তা আরও তীব্র হবে।

এখান থেকে যতটুকু পশ্চিম আকাশ দেখা যায়, তাই দেখলাম। সেখানে একখানা ভারী মেঘ ধীরে ধীরে শ্রীমঙ্গলের আকাশের দিকে আসছে। এখনো আছে কমলগঞ্জের আকাশে। নিশ্চয়ই শুভাশিসদের এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। ওখানকার আদমপুর আর ঘোড়ামারা এই দুই গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা ছোট খোয়াই নদীটা এখন জলে ভরা। স্রোত তীব্র। উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী। শীতে দেখতে পাওয়া বালি কাঁকর সবটাই উধাও। এখন ভরা বর্ষায় সে নদী যৌবনবতী। এবার তো অকাল বর্ষা। জ্যৈষ্ঠেই বৃষ্টি যা হওয়ার হয়েছে। এই শেষ আষাঢ়ে বৃষ্টি বরং অপেক্ষাকৃত কম। কল্পনায় ও নদীটাকে ভরা দেখতে পেলাম। একবার শীতকালে জলহীন শীর্ণ ওই নদীতে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো পার হতে গিয়ে পারানি নিচ্ছিলেন বৃদ্ধ মাঝি, যিনি বর্ষায় এখানে খেয়ায় পারাপার করেন। সেই শীতে পার হওয়ার পরে জনপ্রতি এক টাকা দেওয়ার সময় শুভাশিসের কাছে একটু বিস্মিত গলায় জানতে চেয়েছিলাম, 'এটা নদী?' শুভাশিস আমার মুখের দিকে তাকাতেই সেই মাঝি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় শুভাশিসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমার বাড়ি কোথায়? ও তা জানাতেই, মাঝি আমার দিকে তাকিয়ে শুভাশিসকে আবার কী যেন বললেন। আমার চোখে চেয়ে বাকি পয়সা ফেরত দিতে দিতে হাসলেন। বিষয়টা কী শুভাশিসের কাছে জানতে চাইলে ও জানিয়েছিল, মাঝি বলেছেন আমি ঠিকই বলেছি, আমার এলাকায় এটা ছড়া [খাল]। একটু অবাকই হয়েছিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে আর-একবার পেছন ফিরে দেখে নিলাম সেই প্রবীণকে, যার দক্ষিণবঙ্গের নদী সম্পর্কে ধারণা আছে। কিন্তু পাহাড়ি নদী সে আকারে যত ছোটই হোক, বর্ষায় এর বিপুলবিক্রম কিংবা অমিত তেজ সম্পর্কে দিনে দিনে আমার জানা হয়েছে। সেটা মনু কিংবা কুশিয়ারা, সুরমা অথবা পিয়াইন কিংবা দাড়াইন। কিংবা জাদুকাটা! যার তট শীতে প্রায় মরুভূমি কিন্তু বর্ষায় উৎসের ওই চার-ছয় বর্গ কিলোমিটার এলাকা থাকে তার জলস্রোতের দখলে থাকে!

ক্যাফেটেরিয়ায় চা চেয়ে আর একই সঙ্গে পারভিন নামের কেউ একজন এসেছেন কি না, তিনি এলে কোন জায়গা থেকে দরিয়াকে ফোন করবেন– বলার ফাঁকে দিগন্তে তাকিয়ে এইসব ভেবে নিলাম। যদিও দরিয়ার চোখ তখন আমার মুখেচোখেই। কথা শেষ হতেই ফোনটা কোলের ওপরে রেখে আমার কাছে জানতে চাইল, 'কোথায় হারাবে গো। আমি তো তোমার সামনে নেই। চোখ দিগন্তে ঠিকই কিন্তু দেখছে অন্যকিছু।'

'আরে না। দেখলাম না ঠিক, ভাবলাম।'

'ওই হলো, তা শুনি কী ভাবছিলে?'

'একটি নদী, কাছেই, কমলগঞ্জে।'

'খালি নদী। না নারী? দরিয়া মানেও তো নদী। যদি কেউ বলত একটা নদী– এই যে দরিয়া–'

'আরে দরিয়া নদীর চেয়ে বড়। সমুদ্র। আমার ভাবনায় তা কূল পায় না।'

'নদী পায়? তাহলে আমি আমার ডাকনামটাও জানাতে পারি। মা ডাকত ওই নামে ছোটবেলায়।'

'কী?'

'থাক।'

'আহা বলো না।'

'থাক্, ভেবে নাও। নিশ্চয়ই জাহ্নবী কিংবা শৈবালিনী নয়।'

'তা নয়। তবে তটিনী হতে পারে।'

'থাক। ওর আর জেনে কাজ নেই। ও নাম হারিয়ে গেছে, কেউ আর ডাকে না।'

'তবে গোলাপ গোলাপই, তা তুমি যে নামেই ডাকো।'

'মিলল না। গেল এখানে। গোলাপকে যদি মামাকলা কিংবা মাকাল বলে ডাকা হয়, তাহলে যায়?'

'আরে এটা তো কবির উপমা। তারার ফুল হয় কিংবা জোছনার সাথে চন্দন দেওয়া যায়? কাজী নজরুল তো দিয়েটিয়ে একেবারে রানী করে ছেড়েছেন, কী অসাধারণভাবে।'

দরিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খানিক চমকে আমার দিকে চাইল। সামান্য বাতাসে কাছের গাছটার কাঁঠাল পাতাগুলো দুলছে। রোদ পড়েছে ওর পাটল রঙের কামিজের ওপরে। সেই আলোর ঝলকও একই সময়ে মুখখানির ওই চকমকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। নাকি অমনই দেখতে লাগল। এই নারী কাল রাতে যে ছিল আমার বাহুলগ্না এখন খানিক দূরে হলেও– আপন ও নিজস্ব আর অবাক করা কোমল। সাধারণত যে কঠোরতা ওর চিবুকের নিচে থাকা তা উধাও। না হাসলেও মানুষ এত হাস্যোজ্জ্বল আর কোথায় যেন দ্বিধাহীন। এ সময়ে মিঠুন রুমের বারান্দার শাটার সরিয়ে ট্রে হাতে, 'ম্যাম, চা। কোনোটায় চিনি দিইনি।' বলে মাঝখানে ছোট্ট প্লাস্টিকের টুলটায় রাখল। দরিয়া ওর চা রাখা দেখতে দেখতে বলল, 'আচ্ছা, লাগলে দিয়ে নেবেন স্যার, রুমে তো চিনির পাউচ আছে। আর শোনো, পারভিন এলে আমাকে ফোন করতে বলো।'

মিঠুন শাটার ও পেছনে পরদা টেনে দিয়ে চলে যেতেই দরিয়া আমাকে বলল, 'নাও চা পান করো। তারপর বলো, লায়লা সম্পর্কে আর কী জানতে চাও? তোমার তো তাড়া আছে, কখন না কখন কুলাউড়া যেতে হয়।'

চায়ের কাপ ঠোঁটে ছুঁইয়ে হাসলাম, 'ঠ্যাস দিয়ো না আর। তুমি না

বললে যাচ্ছি না। দেখো না ফোন রুমে রেখে এসেছি।'

'আহা আহা। আমি না বললে বাবু যাচ্ছেন না। আমার বুঝি ঘরসংসার কিছু নেই। তোমাকে নিয়ে এখানেই থেকে যাই আরকি?'

'সে তুমি পারবে না, আমিও পারব না। আমার সঙ্গে কারও বেশি দিন থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি তুলনা দিই তাহলে কাশবনের মতন। দূর থেকেই ও জিনিস ভালো দেখায়।'

'সে তোমার চুল। প্রায় কাশবন।'

'দারুণ বলেছ।' শব্দে করে হাসলাম। এই সুযোগে সিগারেট জ্বালিয়ে প্রবল ইচ্ছের বিপরীতে দরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'লায়লার বিয়ষটা।'

'আমি জানতাম, ও তুমি ভুলবে না। তোমার সারিন্দায় ওই একগান। তুমি যে এমন নাছোড়বান্দা এটা সত্যি জানা ছিল না। কোনো-একটা বিষয় পেলে তার একেবারে তল উলটে দেখা লাগে না। তাই না?'

মুখে আমার চাপা হাসি চোখে কৌতূহল। স্বাভাবিক কি না জানি না কিন্তু দরিয়াই আমাকে কৌতূহলী করেছে, সেই কৌতূহলের উদগ্র ধরনটাও বুঝে যাওয়ায় তাকে আবারও বুদ্ধিমতী মানতেই হলো। বললাম, 'তা কিছুটা তো লাগে। নইলে চলে! একেবারে গর্তজীবী হয়েছি বলে কি এই জীবনে আর কোনো কিছুই জানার আগ্রহ নেই?'

'তাইলে বলো কী জানতে চাও। সরাসরি বলো।'

'আরে কথা তো তোমার কাছে। আবার ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কী?'

'ওই তো তোমার যেটুকু দরকার সেটুকু ডাইরেক্ট। বাদ বাকি সব ইনডাইরেক্ট। বলো কী জানতে চাও?'

'এই যে, বলো কী জানতে চাও বললে আমি কী করে বলি বলো যে এইটুকু জানতে চাই আর এইটুকু জানতে চাই না। তাছাড়া ওই জাঈদকে তো আমি চিনিই না। লায়লাকে দেখলাম বলতে গেলে একপলক, এক-আধবার মাত্র তার সঙ্গে কথা হলো।'

'ও আচ্ছা। তাহলে তোমার বিশেষ কিছু জানার নেই, মানে স্পেসিফিক, তাই তো?'

দরিয়া চায়ের মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়েছিল আমার দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো তখন সামান্য বড় আর কৌতূহল যেন আমাকে জাঈদ-লায়লা নিয়ে এক গোলকধাঁধায় ফেলতে পেরে ওর যত আনন্দ।

বললাম, 'না, সে অর্থে আমার কাছে স্পেসিফিক তো কিছু নেই। যদি সেভাবে বলি, তাহলে ওদের ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টা ঘটল কীভাবে? আর পুরো বিষয়টার ভার তারা কেন এইভাবে বয়ে বেড়াচ্ছে? দেখো, এইভাবে জানতে চাইলে তো পুরোটাই বইয়ের ভাষার মতন হয়ে যাবে। তখন একটু পরেই মনে হবে আমি তোমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছি।'

শুনে, হাতের মগটা নিচে নামাতে নামাতে দরিয়া শব্দ করে হাসল, 'ধরো তাই। এক্ষেত্রে তুমি সাংবাদিক সংবাদের কোনো একটা ক্লু পেলে যেভাবে সেই সূত্র ধরে এগোয় সেভাবে এগিয়ে যাও। দেখো তাতে তোমার যা প্রয়োজন তা পেয়েও যেতে পারো।'

'এখানে আমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন বলে কিছু নেই। আবারও বলছি, কাল রাতে সেই না দেখা জাঈদের গলায় অমন করুণ আর কাতর স্বরে আমি আর আসব না শোনার পরে, লায়লা যখন বললেন, আমি তা বলিনি। এই কথা দুটোর ভার। দুজন মানুষ। মাঝখানে তাদের ভিন্ন পরিচয়ের সন্তান। অন্তত একজনের কাছে তো তাই। এই কষ্ট তারা সারাটা জীবন বয়ে বেড়াবে। হয়তো ওই ছোট্ট জারাও। যদি কোনোদিন সে জানতে পারে। সব মিলে তো, বুঝতে পারছ আমার খচখচানিটা কেন যাচ্ছে না কোনোভাবে।'

'খচখচানি ভাবলেই খচখচানি, না ভাবলে কিছুই নয়। জগতে কত উলটোপালটা বিষয় ঘটে। সে তোমার জীবনেও আছে আমার জীবনেও আছে। হয় সরাসরি অথবা পরোক্ষ। কোনোটা সামনে আসে কোনোটা আসে না। এই তো। যার খচখচায় আসলে সে ওটার ভেতরেই থাকে তাই এই অবস্থা।'

দরিয়া যখন এই কথাগুলো বলছে, ওর দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভঙ্গিতে নয়, শুধু এই কথাগুলোর কারণে একটুক্ষণ ওকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়েছে। মনে হচ্ছিল, এমন সহজ করে বলে ফেলা গেল, এইভাবে, এবারও সে জারা (যদি ও বেচারা ইতিমধ্যে বিষয়টা জেনে

থাকে) আর লায়লার বিষয়টা ভেবে দেখল না। আবার জাঈদকেও তো দরিয়া চেনে। ভাবল না জাঈদের দিকটা? এর ভেতরে আমার তোমার তোমার আমার ভাবে দেখার কী থাকাতে পারে? এই ভাবনা শেষ হয়নি, বরং সেখানে সে প্রসঙ্গটা প্রত্যেকের জীবনেই কমবেশি আছে, এখানে নিয়ে এসেছে, সেই জায়গাটাও কি কোনো ইঙ্গিত?
আমার ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই দরিয়াই বলল, 'এইভাবে বলছি বলে আমাকে আবার নিষ্ঠুর ভেব না। ভেব না যে পরিচিত মানুষের জীবনে এমন ঘটনা থাকলে আমার ভেতরে দুঃখ হয় না। না-হওয়ার তো কোনো কারণও নেই। আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটা বলেছি। বোঝাতে চেয়েছি, যার যার দুঃখ তার। প্রতিটি মানুষের জীবনে এসব থাকে, আছে। লায়লারও আছে, আছে জাঈদেরও। কত ভালো ছেলে ও। আমি তো চিনি। এমনকি যদিস ভেতরের কথা বলি, তাহলে লায়লার চেয়ে জাঈদের কষ্টটাই বেশি। ও কষ্ট পাচ্ছেও বেশি। লায়লা তো না-চাইতেই, সে যেভাবেই বলো, একপ্রকার সুখেই আছে। সে তার অতীতটাকে বর্তমান করে নিয়েছে আর সেই বর্তমানে সে দারুণ সুখী। বরং জাঈদ সামনে এলে তার দুঃখ। এছাড়া জাঈদ যে জারার বায়োলজিক্যাল বাপ, একথা সে মনে না আনতে পারলেই ভালো থাকে, এটুকু তোমার মনে হয়নি?'
আমাকে প্রশ্ন করেছে দরিয়া। নাকি এটা ওর মন্তব্য? ওর দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলাম। এই সময়ে ফলভারে নত কাঁঠালগাছের পাতায় একটু ভারী খসখসে শব্দ তুলে বাতাস বয়ে গেল। একটু দমকা মতন। অপ্রত্যাশিত। পাহাড়ের গা বেয়ে আসা ভিজে বাতাস। সে বাতাসের এক মুহূর্তের দরিয়ার খোলা চুল পেছন থেকে সামনে এসে ওর মুখ জড়াল। দৃশ্যটা দারুণ! দরিয়া মগটা পাশে রেখে হাত দুটো পেছনে নিয়ে ওড়না না সামলে চুল বাঁধল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ওড়না ঠিক করতে করতে বলল, 'কী?'
এর অর্থ, 'কী দেখো?' নাকি লায়লাকে কেমন দেখেছ– সেই মন্তব্যময় প্রশ্নটা আবার সামনে আনা। কোনটা?
আমিও একটু যেন না বোঝার মতন করে বললাম, 'কী?'
'প্রশ্ন করো কেন? লায়লাকে দেখে মনে হয়নি তোমার অত সব ভাবাভাবির মানুষ ও নয়।'
'তবু মানুষ তো। বয়ে নিয়ে তো বেড়ায়। এইটুকু দেখে কীভাবে কী বুঝি বলো?'
'যা বোঝো।'
'আগে বলো কীভাবে ঘটল, কোত্থেকে কী?'
'আবে তা কি জরুরি। এক শহরের মানুষ ওরা। একসঙ্গে বড় হয়েছে। যদিও দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, তাতে কী প্রেমের সম্পর্ক তো থাকতেই পারে, যদিও সবাই বন্ধু হিসেবেই জেনেছে। এসব অবশ্য পরে লায়লার কাছে শোনা। সেখান থেকে শারীরিক সম্পর্ক আর লায়লার বিয়ে হয়ে যাওয়া। ধরো ঘটে না এমন? আমারও তো ঘটতে পারত, যে কারোই ঘটতে পারে।
'হ্যাঁ, তা ঘটে।' দরিয়া এইখানে আবার আমার জীবনে আর যে কারও জীবনে,' বলে ও হয়তো গোটা বিষয়টা একটু নৈর্ব্যক্তিক করে তুলতে চাইল। আমিও ওর কথায় কোনো ইঙ্গিত না খুঁজে মূল বিষয়টাতেই থেকেছি। সেখানেই থাকা দরকার। আবারও জানতে চাইলাম, 'তখন বিয়ে করেনি কেন ওরা?'
'কী সব বোকা বোকা প্রশ্ন করো, হে। চলে যাই।'
'আরে এইটুকু বলে যাও।'
'সেই সুযোগ হয়নি আবার সেই সম্পর্কই ওদের ডেভেলপও করেনি। লায়লা যে কনসিভ করল আগেই, সেটা বিয়ের পর পর বুঝেছে। হয় না এমন। ওটা ধরো ঘটে গেছে। যদিও ওদের ফিজিক্যাল রিলেশনটা আগে থেকেই ছিল। তুমি জারাকে দেখছ। জাঈদকে দেখলে বুঝতে দুজনার চোখ আর কপালের এই জায়গাটা (দরিয়া হাত দেখাল) একেবারে একই।'
'আচ্ছা। আমার তো ভদ্রলোককে দেখাই হলো না।'
'দেখেছ। খেয়াল করোনি। একবার বারান্দায় তোমার সঙ্গে ক্রসিং হয়েছে। ওই একবারই। আমি তখন ক্যাফেতে তুমি ওভার ব্রিজে উঠছিলে। ওটা অবশ্য খেয়াল করার বিষয় না।'
'আরে আমি ভেবেছি উনি নয়শ পাঁচের কেউ! বিস্ময় কাটিয়ে জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, লায়লার বর কিছু জানেন না?'
'কীভাবে? একমাত্র নারীই জানে তার সন্তানের পিতাকে। যদি না লন্ডন না প্যারিসের সেই নারীর ঘটনাটা কারও জীবনে না ঘটে।'
'সেটা কী?'
'জানো না তুমি? যাহ্, কী বলো? ফেসবুকে দেখোনি?'
'আরে জানি না তো।'
'ওই যে যমজ বাচ্চা। ডিএনএ টেস্টে দেখা গেছে, প্রেমিকের সন্তান একটা, অন্যটা ভিন্ন একজনের। পরে ও বলেছে যে, সেদিন সে আরও একজনের সঙ্গে শুয়েছিল ওদিন। মানে ওর ওভারি ফার্টাইল ছিল, একদিনে দুজনার দুটো স্পার্ম সেখানে কার্যকর হয়েছে।'
'এমন হয়? কী জানি হতে পারে। দুনিয়ায় কত কী ঘটে!'
'আমাদের এখানে হলে তো কেউ কিছুই জানত না, তাই না? ওখানেও হয়তো জানত না, জেনে গেছে। তবে এটা এক্সপেশনাল। বাদ বাকি সবই নারীরাই জানে। এই একটা জায়গায় তোমারা ধরা। কী বলো?' বলে দরিয়া ছড়িয়ে হাসল।
'তবে যাই বলো, লায়লা ভীষণ শক্ত মানুষ। এই বিষয়টা তো নিজেরই ট্যাকল দিতে হয়েছে।'
'তা হয়েছে। কিন্তু এটা একজন নারীর জন্য খুব জটিল-কঠিন কিছু?'
'না তা হয়। তবু–'
'কঠিন হলো একটাই, জাঈদকে এখনো ছাড়তে না-পারা। সেটা লায়লা পারেনি হয়তো পারবেও না। ও সে জাঈদ যতই বলুক আর আসবে না, লায়লাই ডেকে আনবে।'
'তুমি জানলে কীভাবে বিষয়টা?'
'জাঈদ বলেছে। পরে লায়লাও। এই তো। চলো যাই।'
শাটার টেনে ঢোকার আগেই টের পেলাম, রুমবয়রা রুমটা গোছাচ্ছেন। আমাদের ও বিষয়ে কথা থামানোই উচিত। তবু যেন একবারে অপরিচিত কোনো মানুষ নিয়ে কথা বলছি এমনভাবে কথা বলতে বলতে আমরা এই বিল্ডিংয়ের বাইরের ছোট্ট চত্বরে এলাম। এখান থেকে অফিসের কোনা হয়ে সুইমিংপুলটা দেখা যাচ্ছে। একটু এগোতে দেখা গেল পুলচেয়ারে হেলান দিয়ে মোবাইলে চোখ রেখে আছে লায়লা। পুলের পানিতে আরও কয়েকটা বাচ্চা ও দুজন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে জারা ও আয়াত।
দরিয়াকে বললাম, 'জানো, এখন আমি আর লায়লার মুখে কিছুই খুঁজব না।'
'বেশ। তা বলে ওর সামনে আমার কাছে নয়শ তিন নম্বর রুমের কাউকে নিয়ে কিছু জানতে চেয়ো না। তাহলে লায়লা তোমার সামনে সহজ হতে পারবে না।'
'কী যে বলো?
'তবে আজ যদি রাতে পানপত্র লইয়া উনি তোমার সামনে বসেন, তাহলে দেখো কথায় কথায় জীবন, প্রেম এসব নিয়ে কথা বলবে। ওর বর যদি থাকে তাহলে ও আবার একেবারেই ভিন্ন মানুষ। তখন গুলশান-বনানী টাইপ। বাচ্চাদের সামনেও তাই। আর নয় একেবারে রাজবাড়ির মেয়ে। মানুষের কত রূপ বলো।'
'হুঁ। এই যে আমার সঙ্গে যে নারী তারই কত রূপ!'
'কোথায়? আমি সব সময়ই একই।'
'হয়েছে। শুধু কাল গভীর রাত্রে দেখেছিলুম ভিন্ন দরিয়া, সে নদী এমনই নদী।'
'হইচে। থাক। ও তোমার কারণে–' বলে, আমার দিকে চোখে একটু সলজ্জ কটাক্ষ হেনে দরিয়া ওভারব্রিজ ধরে সামনে এগিয়ে গেল। আমিও উঠলাম। কিন্তু ওর হাঁটার গতিতে মনে হলো একাই সে যাবে ওদের কাছে সুইমিংপুলের ওখানটায়। আমাকে যেতে হবে নিজের রুমে। এইটুকু যা অবসর জুটল আমার।
দরিয়া ফিরে জানতে চাইল, 'এখন কি রুমের দিকে যাওয়া হবে না, আমার সঙ্গে?'
আমি এই প্রস্তাবটায় কোনো গুরুত্ব দিলাম না। তাকিয়ে থাকলাম। তাতেই কি দরিয়ার পা আটকাল। সে সত্যি দাঁড়াল। এমনকি একটুক্ষণ সুইমিংপুল সোজা দেখে আবার ফিরেও এলো। আমি ওর মুখচোখ দেখলাম, সেখানে হঠাৎ কোনো ভার নাকি খানিকক্ষণের থমথমানি। ওভারব্রিজের ওপরে চারপাশটা দেখে আমার কাছে এসে বলল, 'কথাগুলো সব শুধু আমাদের দুজনার। মনে রাখবেন, জনাব।'

'হুঁ। মনে থাকবে।'

'আচ্ছা, অত ভাবছ কী বলো তো? ওদের কথা, ওদের জীবন? ওটা ওদের। আমাকে দেখো, জানো তো আমার সবই, নাকি আবার বলব?'

সত্যি এইখানে দাঁড়িয়ে পুলসাইড চেয়ারে বসা লায়লাকে দেখে বারবার সেই না দেখা জাঈদের কথাটা কানে বাজল। ও কথা আরও কিছুক্ষণ কানের চারপাশে লতিয়ে পেঁচিয়ে থাকবে। ও থেকে মুক্তি নেই জানি। কিন্তু দরিয়ার অবাক করা অনুমানের শক্তি! ও দেখি বুঝে ফেলে। তা যাচ্ছিলে ওদিকে সেই তো ভালো ছিল। আমিও রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে ধাতস্থ হতে পারতাম। আমাকে আবার ডাকলে কেন। ডাকলে তাও ভালো এর ভেতরে তোমার জীবনের ইতিবৃত্তান্ত ঢুকিয়ে আমায় থামালে কেন? জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে। তা বুঝে গেছি। তাই বলে সেকথা বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে। এইভাবে? বরং নিজেতে থেকে, কিছু ভেবে, কিছু না ভেবে, কিছু ভাবনার পাশ কাটিয়ে দিয়ে আমি যা বোঝার বুঝে যেতাম। তার পরে হুট করে চলে যেতাম। যেমন ডেকেছ তোমার এই ছুটির নিমন্ত্রণে, সেখান থেকে তোমার ফিরে যাওয়ার আগেই আমি চলে যেতাম। হয়তো টের পেতে লোকটার ভেতরে কিছু ঘটেছে, হয়তো পেতে না। এই শ্রাবণে আমার শ্রাবণ থাকত আমারই!

কিন্তু, দরিয়া আবার টের পেত না? সবই বুঝে গেছে। ওই যে আমার মনে কী আছে গানটা যেভাবে ভেবেছি, সেভাবে তার যা বোঝার বুঝে যেত। কিন্তু একথাও তো ও ঠিকই বলেছে, এসব কি আমার ভাববার বিষয়?

'কী? বলব?' বেশ কাছে এসে রেলিংয়ের ওপরে হাত রেখে পুরো বিষয়টা থেকে আমায় সরিয়ে নিতে দরিয়া বলল, 'দেখো, তোমার রুম সোজা সীমানার কাছে ওই জামরুল গাছটায় কত শালিক। ছোটবেলায় এক শালিক দেখলে মনে হতো খুব খারাপ, দুটো দেখলে দুটো আঙুলে চুমু। মনে আছে? কিন্তু এতগুলো একসঙ্গে দেখলে, শুভ আর শুভ। সব ভালো!'

'তোমার বিষয়টা আমার জানা, দরিয়া।'

ও চোখ বড় করল, 'আমি কই কী আর আমার সারিন্দা কয় কী? নাকি একতারা বলব?'

'যাই বলো। হলো একই কথা। ভাষার কাজ যোগাযোগ তা ঘটলেই হলো।'

'তাইলে আমি পারলে ওরা কেন পারবে না?' শোনো, ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে এক ফকির গান শেষ হওয়ার পরে প্রতিবেশী এক বিধবাকে একটা কথা বলেছিলেন, সেকথা এখনো মনে আছে : 'মাটির হাঁড়ি ভাঙলে জোড়া লাগে না। জীবনটা মাটির হাঁড়ি করো না।'– কী গভীর কথা। জীবন তো হাঁড়িই। কিন্তু মাটির হাঁড়ি করা যাবে না।'

আমি একটু অবাক হয়ে দরিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

দরিয়া একটু আদেশের সুরে বলল, 'যাও রুমে। ফোন ধরো। সময় থাকলে পুলের পরের ওই টিলাটায় যাব। ও না না, এখন হবে না। তুমি তো গোসল করে নিয়েছ। ওখানে গেলে গায়ে বাঁশপাতার আঁচ আর পায়ে কাদা লাগবে। কাল যাব। ওরা পুল থেকে ফিরলে লাঞ্চ। ওকে–!' বলতে বলতে দরিয়া সামনে হেঁটে গেল। আমি ওর যাওয়াটা দেখতে দেখতে নিজের রুমের দিকে। শালিকগুলোর কিচিরমিচির কানের পাশ থেকে বয়ে চলেছে।

৩

শিয়রের দিকে 'যে পথে হেঁটে এসেছি' রাখা। হাতে নিলাম। খাটের কোনাতে বসলে, পরদা এপাশে কিছুটা গোটানো থাকায় চাইলে সামনে সুইমিংপুলের একটা পাশ এবং একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দরিয়া আর লায়লাকে দেখে নেওয়া যায়। তাকালাম সেদিকে। একবারই। তার পরে হাতের বইটায় চোখ। সামনের দিকে কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়েছি মোটে। পড়েছি তা বলা ঠিক হচ্ছে না, স্রেফ চোখ বুলালাম। কিন্তু এখন বাইরে রোদে আকাশে দূরে খানিক মেঘের ভেতরে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ছাওয়া আমার মন। বিষণ্ন নাকি বিহ্বল সে ব্যাখ্যার দরকার নেই। বুঝতে পারছি বইটা হাতে নড়ছে, কিন্তু খুলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সামনের শুরুর গদ্যটার নাম মনে পড়ল না। অথচ দু-তিন পাতা তো পড়েছি। উলটে সূচি দেখে নিতে পারি। সেভাবে উলটালাম। লেখাটার শিরোনাম : 'লিখতে না পারার দিনগুলো'। লিখতে না-পারার বেদনাদায়ক দিনগুলোর কথা বলতে চেয়েছেন আহমাদ মোস্তফা কামাল। ধারণায় মিল থাকলেই, মানুষ মিল খোঁজে। এই লেখায় তিনি যে অপ্রকাশের ভারের কথা জানাচ্ছেন, সেখানে যেতে মন চাইল। কিন্তু আবার সামনে দিকে বাইরে তাকিয়ে বইটা বন্ধ করে প্রচ্ছদটার দিকে তাকালাম। এর পর আবার কিছুক্ষণ একেবারে সামনে। নভেমে ঢোকার জনশূন্য রাস্তাটায় তাকিয়ে থেকে থেকে আবার নিজের হাতের দিকে। বইটার শেষাংশের আগের একটি পৃষ্ঠা। সেখানে একটি উদ্ধৃতি। ছোট টাইপ। তাই হয়তো চোখ আটকাল। ওপরে লেখা, 'দৃশ্যটি এ রকম : এর পরে ওই উদ্ধৃতির অনুচ্ছেদ : 'ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়-দুর্গাপুরের। বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাঁদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।...'

এই পর্যন্তই পড়লাম। পথের পাঁচালীর শেষ দিক। এই উদ্ধৃতির পরের অংশে আর চোখ গেল না। দুর্গাহীন অপু। পড়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বুঝতে পারছি এও টানছে না। এমন অসাধারণ উপন্যাসিকগদ্যও কখনো কখনো মনের অবস্থার কারণে পড়া যায় না। হয়তো সেই দশা। কিচ্ছু করার নেই আমার এখন। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শালিকগুলোকে দেখব, তাও হবে না। তখন নয়শ তিনে চোখ পড়লেই জাঈদের সেই গলাটা কানে বাজবে হয়তো। কিন্তু দরিয়া তো বলেছে, বইটা বাঁহাতে নিয়ে খাটের ওপরে রাখতে রাখতে ভাবলাম, ওসব না ভাবতে। ও যেমন নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছে, জীবনটা মাটির হাঁড়ি না করতে। আমি তো কিছুই করিনি। আমার কিছু ভাঙেনি। তাই জোড়া লাগানোর প্রশ্নও নেই। আমার জীবন তো মাটির কেন কোনো উপাদানের কোনো ভাণ্ডই নয়। তাই ভাঙা জ্যান্ত মরা কোনো বিষয়ই আমার নেই।

ঘর হতে দুই পা ফেলে এই মানুষ দেখা আর জানায় যে কাতরতা তৈরি হয়, তা ক্ষণিকের। দরিয়া আমার এখনই বিদায় করলে ঘটত অন্য বিষয়। হয়তো কুলাউড়া গিয়ে ওই মনসামঙ্গল সন্ধানে, অপরিচিত বিধান দেবের খোঁজে ভুলে যেতাম এসব। স্মৃতি থেকে ভেসে চলে যেত জাঈদ ও লায়লা আর জারা। হয়তো কখনো জারাকে মনে পড়ত। বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠা একটি মেয়ে। ওই মুখ ভোলা যাবে না। যদিও সেখানে কোনো ঘটনায় তারা মুখময় বিরক্তিটুকুও চোখে ভাসত। হয়তো ভাসত অথবা না। কিন্তু এখন পর্যন্ত তো আমি অন্তত আধখানা ঘটনার ভেতরে। সন্ধ্যায় আসবেন লায়লার স্বামী। তখন এই আধখানায় যোগ হবে আরও সিকি; তখন জাঈদ থাকলে হয়তো 'এক' বা সম্পূর্ণ হয়ে যেত। তা আর হচ্ছে না। আমি তো মানুষগুলোর ভেতরে থেকে পাশেই থেকে যাচ্ছি। এর ভেতরে দরিয়াও একজন। সব তার জাহির সব তার বাতুন। ফলে বিভূতিভূষণও পাড়িয়ে নিতে পারছেন না আহমাদ মোস্তফা কামাল। ওঁর দোষ কী? সংকট আমার মনের গহনে। এ বইয়ের নামের মতনই প্রায়, 'যে পথে হেঁটে এসেছি', এসে এখানে ঢুকে পড়েছি।

বইটার প্রচ্ছদে তাকালাম। হুঁ, ঠিকই ভেবেছি নামটা। আমার এই এখানে আসা, যে পথ ধরে এসেছি– এর সঙ্গে দূরাগত হলেও কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেলাম। যদিও শুধুই নামে। তবে না পড়েই তো মনে হয়েছে লেখক এই হেঁটে আসা বলতে, ফেলে আসা পথ বেয়ে তার জার্নিকেই বুঝিয়েছেন। মানুষ তো জীবনের পেছনের পথটাকেই ফেলে আসে। হয়তো এই নামকরণে সেই ইঙ্গিতটাও আছে। বইটার দিকে তাকিয়ে কেন যেন এর নামকরণের জন্যই বেশ মনে হলো, সেই চলমানতার কথাই লেখা আছে এখানে। হাতে নিয়েছিলাম আবার। প্রচ্ছদে দেখলাম। কিন্তু এখন খানিকক্ষণের অবসর থাকলেও তো এটা পড়তে পারব না, মনের সেই সংগতি নেই। মন বিক্ষিপ্ত। ফরফর করে বইটার পাতাগুলোর পাশ দিয়ে আঙুল টানলাম। একটা পৃষ্ঠায় থামল আঙুল, সেখানে তাকালাম

না। আবার একইভাবে। আঙুল থামল। সেখানে শিরোনামের একটি লেখা, 'ভার্চুয়াল সম্পর্ক : সেই সময়, এই সময়'। শিরোনামটা আকর্ষণীয় মনে হলো। কিন্তু লেখাটা ঠাসা গদ্যে, জানালা-দরজা নেই। পড়তে আগ্রহ হলো না। আর এগোনো যাবে না, ভানাটা কেটে যাচ্ছে। ধুস্ আবার ফরফরিয়ে আঙুল চালালাম। বেরুল : 'বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুচ্ছ'। এ তো আমার অবস্থা। কিন্তু ভাবনাটা বিক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হলে এমন একটি লেখা একটানে পড়া যায়? অখণ্ড সংযোগ দরকার। লেখাটার শুরুতে খানিকটা ভূমিকা মতন। পড়িনি। এরপরে উপশিরোনাম । বিষয় : সম্পর্ক। একটা উপশিরোনাম যখন আছে, পরের পৃষ্ঠায় আছে। সেখানে গেলাম। বিষয় : নারী-পুরুষ; এর পরে, বিষয় : রাজনীতি। স্বাভাবিকভাবেই, কাল রাত ও আজকের সকাল মিলে বিষয় : নারী-পুরুষেই চোখ আটাল। ৭ থেকে ১১। এবার আর দ্রুত অস্থির চোখে নয়, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম :

'৭. নারী ও পুরুষ হয়তো একই প্রজাতির প্রাণী নয়; প্রজাতি বিভাজনে জীববিজ্ঞানীরা কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছেন!'

মুখে ঈষৎ হাসি খেলল আমার। অজান্তেই।

'৮. পুরুষ বোঝে না নারীকে, যেমন নারী বোঝে না পুরুষকে, তারা বাস করে ভিন্ন ভিন্ন জগতে।'

সবাই-ই তাই? হয়তো, অথবা হয়তো না। কিন্তু আমি যে বুঝি না, তা সত্যি। হাসলাম, সামান্য ছড়িয়ে।

'৯. মানব-সভ্যতার সবচেয়ে ভুল আবিষ্কার– বিয়ে, যা ভিন্ন দুই জগতের বাসিন্দাকে একসঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য করে।'

হুঁ, এখানে যদি জগৎ বলতে একটু ছড়িয়ে, একটু কি বেশ খানিকটা ছড়িয়ে ভাবা যায় তবে। আর জগৎ শুধু গার্হস্থ্য হলে? হয়তো অনেকেরই দুজনের একই জগৎ। তারা 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গায়; অন্যরা 'আজ দুজনার দুটি পথ দুটি দিকে গেছে বেঁকে' মনে মনে, মুখে-চোখে সংসার।

'১০. পুরুষ তিন ধরনের : যুক্তিতাড়িত, আবেগতাড়িত ও লিঙ্গতাড়িত।'

হয়তো আরও আছে দু-এক পদের। তবে এই তিনটি মুখ্য। এখানে আমার মনে হলো, জাঈদ কোনটি? নিজেকে না, নিজের কোনো বন্ধুকে নয়, এমনকি দরিয়া তার নিজের জীবনের যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে মনে করে দিয়েছে, সেই অচেনা মানুষটিকেও না, শুধু জাঈদ! কেন জাঈদের নাম মনে এলো? সে ওপরের কোনটি তাড়িত? লায়লার যে মুখ চোখ দেখেছি, ওঁর কথা আর ভাবলাম না। সে এখানে গৌণ!

'১১. নারীরা দুই ধরনের : ক) ভালোবাসতে জানে না কিন্তু মুখে বলে ভালোবাসি। কারণ, তারা যে ভালোবাসতে অক্ষম সেটিও জানে না। খ) ভালোবাসতে জানে, কিন্তু কখনোই সেটি বলে না।'

এবারও, শুধু দরিয়া আর লায়লার কথাই ভাবলাম। কে কোনটা? দরিয়া? দ্বিতীয়টা। লায়লা? খুব তো জানি না তাকে, কিন্তু ওই 'ক' আর 'খ' পড়ে তাকে দ্বিতীয়টা ভাবতে চাইলাম। নাকি প্রথমটা? সেটা জানা দরকার? কী হবে জেনে। জানব, গভীর গেলেই তো ওই সব বোঝাবুঝি। কাছে গেলেও বাড়ে; বাড়লেই সে ক্ষেত্রে দূরত্ব ভালো। এখানে অজানাটাই। তাতেই চাইলে যে কোনোটায় বসিয়ে দেওয়া যায়। দোষ তো করছি না। আমাতেই থাকছে।

বইটা আস্তে বন্ধ করলাম। ঘাড় একটু উঁচু করে তাকালাম সামনে। নভেমে ঢোকার রাস্তাটা নির্জন। সেখান থেকে গেটের দিকে যতটা দেখা যায়, চোখে পড়ল। বইটা ততক্ষণে বাঁ হাত থেকে অবার বিছানায়। তা দেখলাম একবার, আনমনে ঘাড় ঘুরিয়ে, যেন বইটার কাছে এসব কোনোকিছুই আশা করিনি। হঠাৎ সামনে চোখ আটকে গেছে ওই জায়গাটা। আর তাতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই কথাগুলো যেন উপরি হিসেবে জানা। হলো নাকি? তাতে নিজের এই নিয়ে চলার ভার আরও কিছুটা বাড়ল। সে কথা ভাবিনি, ভাবতে চেয়েছি, অথবা চাইনি।

বইটা পাশে সরিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে এসব ভাবছি, কিন্তু এই সমস্ত ভাবনাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার কেন যেন মনে হলো, হয়তো জাঈদ আর লায়লার সম্পর্কের ভেতরে ভিন্ন কোনো গল্প আছে, সেজন্য দরিয়া বিষয়টা ওইখানেই শেষ করে দিতে চাইছে। নাকি অন্য কিছু। আরও কিছু। সেটা কী? সেজন্য ও নিজের কথাটা সামনে নিয়ে এসেছে। না, এই সবই আমার কষ্টকল্পনা। পুরোটাই নিজেই বানিয়ে এগিয়ে নিতে চেয়েছি। ওদের ভেতরে কোনো সংকট নেই। মাটির হাঁড়ি যদি ভেঙেই থাকে, সেটা জাঈদের। লায়লা সুখে আছে। নাকি সুখের অভিনয়। দরিয়া তা জানে। নাকি নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দরিয়া সবটাই সমান করে দেখতে চেয়েছে, নাকি আমাকে তাই বুঝিয়েছে।

ফোনে মেসেজ আসার শব্দে সম্বিত পেলাম। উঠে দেখাও দরকার। ফোনটা সেখানেই। রুমে ঢুকে দেখাও হয়নি। কোনো কল এলো কি না? না, কোনো কল আসেনি। কিন্তু বুলবুলের কয়েকটি মেসেজ। প্রথমটা, সে ওই বিধান দেবের সঙ্গে কথা বলেছে, আমি গেলেই একটা ব্যবস্থা হবে। দ্বিতীয়টা, আমি যেন একবার যাওয়ার চেষ্টা করি। তৃতীয়টা, আমার কি দু-একদিনের ভেতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ঘটবে? চতুর্থ, যদি তা ঘটে, তাহলে এখন মৌলভীবাজারে বুলবুলের এক বন্ধু আছে, সে নিয়ে যেতে পারবে। পঞ্চমটা, আমি এই নিয়ে কী ভাবছি ওকে যেন টেক্সট দিয়ে জানাই।

ফোনটা আবার আগের জায়গায় রাখতে রাখতে ভাবলাম, বয়েই গেছে। জানালার পরদা সরিয়ে, পানিতে আরও কয়েকটি বাচ্চার সঙ্গে আয়াতকে হাত দিয়ে পানি নাড়তে দেখে মনে হলো, বয়ে টয়ে যায়নি। আগে ওই বিধান দেবের সঙ্গে কথা বলি। হয়তো বুলবুল দূরে আছে বলেই তাকে এভাবে প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছে লোকটা। আমি ফোন করে দেখি কী বলেন। আগেই বুলবুলকে কোনো সিদ্ধান্ত জানানোর কী দরকার।

দরিয়া পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে। কোমরে হাত। আয়াতকে কিছু একটা বলছিল। শোনা যাচ্ছে না। এদিকের শাটার কিছুটা খোলা তবুও। লায়লার একইভাবে মোবাইলে চোখ। হয়তো জাঈদের সঙ্গে মেসেজ বিনিময় চলছে। হতে পারে এও আমার কল্পনা। জারা একদম শেষ মাথায়। গলা তলানো পানিতে দাঁড়িয়ে। সেই দিকটায় জারার কাছে ধীরে ধীরে সরে গেল দরিয়া, সে হয়তো আয়াতকে কিছু-একটা শোনার জন্য বলছে, কিন্তু আয়াত শুনছে না। হতে পারে অথবা এর কিছুই না-ও হতে পারে।

জানালার কাছ থেকে সরে এলাম আমি। চোখ ওই দিকটায়। লায়লা একইভাবে মোবাইলেই তাকিয়ে। বাকি দুনিয়া তার কাছে স্থির। এখন ওখানেই তার জগৎ। সোজা কথায় আজ ভোর সকালে তার একচুয়াল সম্পর্কটা এখন ভার্চুয়াল, অথবা উলটো, ভার্চুয়ালে একচুয়াল, সেখানেই তাদের যা সম্পর্ক। দূরে তবু কাছে। আবার কাছে কিন্তু সদাই তা দূরে। এই দূর সব সময়েই তা দূর, কখনো তা কাছে হবে না, অথচ ভেবে নেওয়া যে কাছে। আসলে সেদিন তাদের সম্পর্ক কাছেই ছিল, সেদিনও তা সম্পর্কের অনিশ্চয়তায় তা ছিল দূরেই। যাকে এখানে কাছে বলতে বুঝছি, সেপথ কোনোদিনও কাটেনি ওই সম্পর্ক। ফলে সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় তা দূরে। শুধু ক্ষণিকের জন্য তা কাছে এসেছিল। এখন সেই ক্ষণিক অর্থে তা কাছেই আছে, কিন্তু দূরে। দূরে তাই টান আছে। হয়তো ভালোবাসাও সেখানে আছে কিছু অথবা ওই ভালোবাসা নামক 'অপ্রয়োজনীয়' বস্তুটাই সেখানে কোনোদিনও ছিল না। তবে? ক্ষণিকের ভালোলাগা ভুল। না, তাও হয়তো না। হয়তো একসঙ্গে বড় হয়ে উঠতে উঠতে একধরনের টান, যা দুজনের ভেতরেই সমানে বাহিত হয়েছে কোনো-এক সময়ে। সেই টান ভুল নয়। সেখান থেকে জারার আগমনও তো ভুল নয়, তবে ঘটে গেছে। তাই ওই জারা, কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকা জারা, সেই এখন টান হয়ে আছে দুজনের মাঝখানে।

আচ্ছা, লায়লা কোনোদিনও যদি জাঈদকে বিষয়টা না জানাত।

তাহলে জাঈদ কি জানতে পারত? হয়তো শারীরিক সম্পর্ক তাদের ওই দিনের আগেও ঘটেছে, পরেও ঘটতে পারে কিংবা ঘটেছে এবং গতকালই। কিন্তু ওই নির্দিষ্ট দিন। তার পরেই লায়লার বিয়ে। ঘটনাটা হয়তো বিয়ের একদম আগে আগেই, হয়তো সেটি তখন তাদের কাছে এক ধরনের শেষ সাক্ষাৎ। আখেরি মোলাকাত! হিন্দি ছবিতে যেভাবে নায়ক নায়িকাকে বলে থাকে আর আমরা শুনে থাকি তেমন! লায়লাকে তার অন্তর্গত ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন, তিনি যে ভালোবাসতে জানেন তা আর তাকে বলতে হয়নি। ধারণ করেছেন। হয়তো জাঈদ তখনো ভালোবাসেননি। ওই ঘটনাটা জেনে তার উপলব্ধি। এনিয়ে দরিয়া হাসান আজিজুল হকের 'মন তার শঙ্খিনী' নামের গল্পের কথা বলেছে। গল্পটা পড়েছিলাম সবে কলেজে উঠে, সতেরোও হয়নি তখন। শেষ বাক্যটা সেই থেকে মনে গেঁথে আছে, কিন্তু তখন অথবা এখনো এর কিছুই যেন বুঝিনি। চলে যেতে যেতে হামিদা সাদুকে বলে, 'আমি চললেম, তোর ছেলে রইল মোর পেটে। খানিকটা শোধ দেলোম।'– এমন একটি বাক্য। কেন কী শোধ, কীভাবে এই শোধ দেওয়াটা ঘটেছিল, তা সেদিন বুঝিনি, আজও যে বুঝেছি তাও নয়। এখন খানিকটা উপলব্ধি করতে পারেছি বটে! হয়তো লায়লা তার ভেতরে ভালোবাসার খানিকটা ওই জারাকে ধারণ করে শোধ দিয়েছেন, দিলেন ভাবতে গিয়েও পারিনি। কত কিছুই যে ভাবনায় ক্রিয়ার অতীত কাল হয় না, তা সব সময়েই বর্তমান, আরও বাড়িয়ে বললে চলমান বর্তমান। অথচ সংসারের হিসেবে জীবনের প্রতি পাতায় তা আসলে অতীত। একদিন ছিল, আজ আর তা সত্য হিসেবে নেই। অথচ বর্তমান। সেই যে বৈজ্ঞানিকের বিড়াল! কিংবা, জাহির বাতুন! কিংবা আসলে সে বলে দক্ষিণে চলে বামে। জানাই হয় না, এর কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

এসময়ে মনে পড়ল, আচ্ছা দরিয়ার কাছ থেকে তো এটা জানা হয়নি যে জাঈদ কী করেন? কোথায় থাকেন? আর তিনি বিয়েথা করেছেন কি না? কিন্তু আর হয়তো জানতে চাওয়াটা ঠিক হবে না অন্তত ঘণ্টাখানেকের ভেতরে। তাহলে শ্রীমতি সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কর্কশ গলায় ছবক দেবেন, 'এখনো ওই লায়লা-জাঈদেই আছ? এর বাইরে বেরোতে পারোনি? কী কোনও কাজ নেই, নাকি ফেসবুকের ভার্চুয়াল বান্ধবীকুল অনুপস্থিত। তাদের গ্রিন লাইন জ্বলে না? নাকি মেসেজ অপশনে তোমায় ডিসকানেক্ট করে রেখেছে! কোনটা?'

এর কোনো জবাব তো দিতেই পারব না। চুপ করে থাকতে বাধ্য হব। তাতে আরও দু-কথা দরিয়া শোনাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। ফলে জাঈদের নিয়ে প্রশ্ন করা কিংবা না-করার বিষয়টা মাথাতেই রাখতে হবে আপাতত। সুযোগ বুঝে পড়তে হবে কথাটা। সেটা জানাও তো একটু দরকারি। তাহলে আমার ভেতরে তালগোল পাকানো হিসাবটা কিছুটা হলেও মিলিয়ে নিতে পারতাম। ও বিষয়ে আপাতত সংকটও তো জানি। দরিয়া সত্যি কখনো কখনো মুখটাকে প্রায় সেলাই দিয়ে রাখতে বাধ্য করে।

এ সময়ে ফোন বাজল। জানালা থেকে ততক্ষণে রুমের ভেতরের দিকে সরে এসেছি। হাতের সিগারেটটা আধাআধি পুড়েছে। ফোনের দিকে তাকালাম বাথরুমে দিক থেকে। সোজা পুলের পাশে দরিয়া দাঁড়ানো, চোখের সামনে ফোন। কিন্তু তখনো জানি না ও-ই ফোন করেছে। হাতে নিয়ে দেখলাম। ও বলল, 'জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখো? এতই যদি দেখার শখ, তো এখানে আসো।' আমি এর জবাব কিছু বলার আগেই ও আরও বলল, 'আচ্ছা শোনো, এখন আর ওই সামনের দিকের টিলাটায় যাওয়া তো হচ্ছে না। আমরা এখনই রুমে ফিরব, তারপর আর পনেরো মিনিট। লাঞ্চে যাব। ক্যাফে থেকে ফোন করছে। ঠিক আছে?'

ফোনটা রাখতে রাখতে ভাবলাম, এখন বিধান দেবকে একটা ফোন করে তার পরে না-হয় বুলবুলকে যা জানানোর জানাই। ওর তো

কোনোভাবেই আর তর সইছে না।
বিধান দেব ফোন ধরার পরে আমার গতকালের পরিচিতি দিয়ে জানতে চাইলাম, আজ বুলবুল নামে একজন তো তাকে ফোন করছেন, তা আমি যদি আজ অথবা কাল আসি তাহলে তিনি আমাকে বইটা দিতে পারবেন তো?
বিধান বললেন, একদিনো বই অয়নি [হয় নাকি], স্যার? কীতা মাতইন [বলেন]?'
আগেই এটা অনুমান করেছিলাম, আসলে তিনি বুলবুলকে যা বলেছেন কথার কথা। যেহেতু বুলবুল দূরে আছে, তাকে বোঝানো তার জন্য সোজা। সেই কাজটি তিনি করেছেন। ঢাকা দক্ষিণে যে লোকটা তো তাহলে ঠিকই বলেছেন, ওর কথার ঠিক থাকে না। ব্যবসা যে করে, কীভাবে করে তা ওই জানে। সঙ্গে এও খেয়াল করলাম, বিধানের সম্বোধনে আমিও স্যার। এটা বুলবুলের কারণে। বুলবুল তার পরিচয় দিয়েছেন, তাই আমি যেহেতু তার বন্ধু, বিধান আমাকেও স্যার সম্বোধন করছেন।
আমি তাকে বললাম, 'একদিনে হয় না জানি, ভাই। কিন্তু আপনি ওই স্যাররে তো কইছোইন, আইজ কাইল কুলাউড়া গেলেই বই দিয়া দেবেন?'
'আপনে কাইল আইতায়নি [আসবেন]?'
'আইলে বই দিতে পারতায়নি [পারবেন]?'
বিধান দেবের গলা এবার কাতর, 'আবার কীতা মাতোইন, স্যার? পারতাম নায়। চারদিন কি হপ্তা তো লাগতোয়। ফটোকপি-বাঁধাই কত কাম। আপনে বোঝাই তো। আপনার বন্ধু ওই স্যার বোঝোন নায়।'
আমি নাকি বুঝি আর বুলবুল বোঝে না, বিধানের যা অনুমান। আসলে বুলবুলের আগ্রহ আর তাড়াহুড়োয় ওর এমন মনে হয়েছে। আসলে বুলবুলের দূর থেকে মনে হয়েছে বিধান চাহিবামাত্র মাল ডেলিভারি দেবে। আর আমি বুঝতে পেরেছি, ওসব ওর কথার কথা, হয়তো একেবারে সামনে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বইটার ফটোকপি হয়তো দিতে পারবেন।

তারপর বলবেন আপনি বাঁধাই করে নেবেন। যেহেতু জিনিসটা আমাদের হাতে আসা দরকার, তাই গলায় যথাসম্ভব বিনয় রেখে বললাম, 'আর কীতাই মাতরাম [বলব], আপনে যা ভালো বোঝেন। তয় কইলে কাইল আইতে পারি। আর নয় পরশু। পারতায় [পারতেন] না?'
'না স্যার, হাতে নানান কাম। আর দুইদিন বাদে আউক্কা [আসেন] হইয়া যাইত।'
'আচ্ছা। তাইলে চারদিন বাদে না পাঁচদিন বাদে?'
কাইল জানাই। যদি পারি এর মইদ্যে, ও স্যার, আপনার বন্ধু ওই প্রফেসার তো মুসলমান, উনি ইত্যাদি কীতা করতোইন? পড়তোন?'
একটু হাসি পেল। এখানে বিধানের গলায় এমন এক বিস্ময় মাখানো সারল্য যে তাকে আর কিছু বলতে পারলাম না যে তার কেন এমন মনে হলো। বরং বললাম, 'উনি গবেষণা করেন তো ওই ধরনের বই নিয়া। অনেকগুলো মনসামঙ্গল তার আছে।'
'আইচ্ছা। উনি ইতা নিয়া লেখতোইন, নানি [নাকি]?'
'অয়-অয় [হ্যাঁ-হ্যাঁ]।
'আচ্ছা, দিরাম। কাইল একবার ফোন করোইন যেন।'
'আইচ্ছা।'
বিধান আদাব দিয়ে ফোনটা কাটলেন।

৪

শ্রাবণের দীর্ঘ দিবস। দুপুরে খাওয়ার পরে ক্যাফেতেই কিছু সময় আড্ডা দিয়ে আয়াত আর জারার ঘুম আসায় দরিয়া ও লায়লা তাদের নিয়ে নিজেদের রুমে চলে গেল। তখনই গত পরশু ও কাল, আজ সারাটা দিন মিলিয়ে, এই কিছুটা সময়ে আমার জুটেছে যেন শুধু নিজেরই সময়। এছাড়া আর যেসব সময় একলা ছিলাম, সেই সময় ঠিক নিজেতে নিজের কাছে থাকা বলে না।
এখন রুমে এসে, চারদিকের ঘুসঘুসে বৃষ্টির ভেতরে চারদিকের নির্জনতায়, এই আমার মনে হলো, মাথাটা কিছুটা শূন্য, কানে কোনো শব্দ ঢুকছে না, ফলে প্রকৃতির চাপে আমি খানিকটা বোধহীন। যদিও শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু যেন অনুভব করতে পারছি, বাইরের রেনট্রির পাতা থেকে, দীর্ঘ সেগুনের বড় বড় পানের আকৃতির পাতা থেকে আর ইউক্যালিপটাস সব চিরল চিরল পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে। কোথাও ঘাসে, কোথাও কংক্রিটে। সেই শব্দ হচ্ছে। পাখিদের নেই সেই পূর্বাহ্নের প্রাণশক্তি। দিনটি ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। ফলে আর যেটুকু বেলা আছে এর ভেতরে যা হোক বেঁচে থাকার জন্য পেটটা ভরে নিতে হবে। আর আমি খাওয়া বেশি হয়েছে এমন বোধ হওয়ায় একটু হাঁসফাঁসও করছি। অথচ পাখিদের সরীসৃপদের কিংবা শিয়াল-সাপদের এমন বৃষ্টিতে কষ্ট হয়। সাপরা তো রাত্রে বেরিয়েই পড়ে, সারা দিন খাওয়া জোটেনি বলে। বৃষ্টির এমন শব্দ পেট ভরা থাকলে কানে কিছুটা রোমান্টিকই লাগে। যদিও ইকো-রিসোর্টের আশপাশে প্রাণীদের অবস্থা বেশ কাহিলই হয়।
দুপুরে খাওয়ার সময়ে লায়লাকে দেখে একটা কথা ভেবেছিলাম। বালিশে পিঠ রেখে পরদা টানা জানালায় তাকিয়ে আমার আবার আজ ভোর রাতের কথা মনে পড়ল আবার। জাঈদের সেই কাতর গলা। সেখান থেকে দুপুরের আগপর্যন্ত মোবাইলে দেখা লায়লার তুলনায়, এ বড় ব্যতিক্রমী অনেকটাই অচেনা এক লায়লা। এখানে অচেনা বলতে কাল রাত ও সকাল থেকে যাকে দেখেছি, তার থেকে ভিন্ন। একটা মানুষ তো পুরোপুরি বদলে যায় কিংবা পালটে যায় না। কিন্তু তার আচরণগত বদল যদি চোখে পড়ে, যদি মনে হয়, সেই সকালে দেখা মানুষটাও এতক্ষণে অনেকটাই পালটে গেছে, তাহলে তার পরিবর্তনটা চোখে লাগে। দরিয়ার কাছে তা লাগেনি নিশ্চিত। দরিয়া তাকে চেনে। কেন অমন বিষণ্ন আর মনমরা হয়েছিল তাও জানে। কিন্তু পুলের পাশে সারাটা সময় মোবাইলে চোখ রাখা লায়লা, সেখানে মোবাইলে তাকিয়ে থাকা ওই চোখে তো কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না। মাথাটা নামানোই ছিল। ফলে দূর থেকে হোক বা কাছ থেকে অনুমানে, সেই মানুষটির চোখমুখ চকচক করছে। এর কারণ কি এই যে সন্ধ্যার পরে তার স্বামী আসবেন? হতে পারে অথবা যে কারণে তার মন ও সেই কারণে চোখমুখ মেঘলা ছিল– সেই জাঈদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, পরস্পরকে বোঝাতে পেরেছে, হয়তো আপাতত মান-অভিমান কিংবা বিচ্ছেদ অথবা দেখা হওয়ায় সৃষ্ট সংকট– সবই কাটাতে পেরেছে সে। হয়তো লায়লা যে বলেছিল, 'আমি কি তাই বলেছি?' সেই 'তাই'টা যে কী তাও বোঝাতে পেরেছেন। আবার জাঈদ যে বলেছেন, তিনি আর আসবেন না– সেই কথাটা হয়তো তুলে নিয়েছেন। এসব কল্পনায় যা ভাবছি তার কিছুই ঠিক নয়। কারণ একেবারেই ভিন্ন, লায়লা নিজেকে বদলে ফেললেন। আজকের ভোররাত তিনি আর স্মরণে রাখতে চান না। চানওনি। দুপুরের আগপর্যন্ত তাই হয়তো তার ভেতরে প্রবাহিত ছিল। এতক্ষণে ধুয়ে-মুছে সবই সাফ সুতোর করে নিয়েছেন। আবার এও তো হতে পারে, দরিয়া তাকে বলেছে যে আমি তাদের বিষয়টা বুঝে ফেলেছি। দরিয়াকে যে জিজ্ঞেস করেছি, লায়লার সঙ্গে যার কণ্ঠস্বর শুনেছি, তিনি কে? ফলে লায়লা আমার সামনে দুপুরে খাওয়ার সময় একেবারে ভিন্ন মানুষ।
খেতে খেতে আমি সত্যি একটু অবাক হয়েছি, সেটা এখনো পর্যন্ত কাটেনি। কিন্তু যা ভেবেছি, তার কিছু যদি ঘটেই থাকে, লায়লা নিজেতেই বদলে ফেলে থাকেন নিজেকে, অন্তত আমার জন্য, তাহলে খারাপ কী? জীবনের সব বেদনার ভার কিংবা ভেতরের অপ্রাপ্তিকে এভাবে বয়ে বেড়াতে হবে? হয়তো কখনো মনে পড়বে, তখন ওই বিষণ্নতা কিংবা ভেতরের বিপন্নতা স্বাভাবিক। তাই

বলে সব সময়ে? সবাই অবশ্য তা পারে না। তাও তো ঠিক। কিন্তু লায়লা হয়তো পেরেছেন অথবা ওপরে ওপরে পেরেছেন, ভেতরে তার সবই ভেঙেচুরে একাকার হয়েছে। হয়তো সেখানে জাঈদের আকুতিময় মুখ, সেই মুখে অভিমানজনিত প্রত্যাখ্যান হয়তো ভেসে উঠেছে তাদের অকৈশোর জীবনের স্মৃতি– তাও তো দাম্পত্যের সম্পর্কের দায়ে রজ্জুবদ্ধ নয়, খোলা। কিন্তু সেই বন্ধন পরস্পরের ভেতরে সৃষ্টি করেছে এক গরাদ। দুজনে ভিন্ন ভারে ভিন্ন জগতে সেখানে দুজনার কাছে বন্দি। সেই বন্দিত্বের কারাগারের মঞ্চে ঋানু অভিনেত্রীর মতো পাকা অভিনয় লায়লা করেছেন আমার সামনে। কিন্তু সামনে যতই অভিনয় করুন, ভেতরে দাগ তো আর লেপা যাচ্ছে না। যদিও আমি তাদের এক অসতর্ক মুহূর্তে সে দাগের সামান্য দেখেছি, ফলে অভিনয়ের চিত্রনাট্যের পেছনে যে কথা চাপা পড়ে আছে, তারও কিছুটা হলেও জানি। জানি বলেই আমার কাছে তা অভিনয় বলে মনে হচ্ছে। যে অর্থে আমরা অভিনয় কথাটা বলি, এটি তো সেই অর্থে নয়। আবার গূঢ় অর্থে অভিনয়ই তো, নিজেকে নিজের থেকে সরিয়ে ভিন্নভাবে উপস্থাপনা!

তো সেই লায়লা উচ্ছ্বাসময়। তিনি আমার খাওয়ার তদারকই করেছেন বলা যায়। দরিয়া তা খেয়ালও করেছে। বুঝছিল লায়লা স্বাভাবিক হতে চাইছে। যেমন আমাকে আরও এক টুকরো মাছ নিতে বলেছেন, আমি যে খেতে পারব না আর তাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু লায়লার পীড়াপীড়িতে তাও নিতে হয়েছে। দরিয়াও বলেছে, 'নিন না, মাছ তো আপনি পছন্দই করেন। মাংস নেবেন না? মাটন নেবেন এক টুকরো?' উত্তর যাই দিই, দরিয়া লায়লার আগ্রহটা বুঝতে পেরে বলেছে ও কথা। লায়লা জারার খাওয়া খেয়াল করেছে। খাওয়ার আগে তাকে বলেছে হাত থেকে ট্যাবটা রাখতে, আয়াতকে চিকেন ও ডাল মাখিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে ছেলের চামচে মুখে তুলে দিচ্ছিল আর নিজে খেয়েছেন। স্বাভাবিক লায়লা। যদিও গত দুবার এই ক্যাফেতে দেখা লায়লার সঙ্গে তুলনা করলে আমার চোখে অস্বাভাবিকই! যদিও এই অস্বাভাবিকটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা মানুষের জীবনে। অথচ সেটাই ঠেকছে অভিনয়।

জানালার বাইরে তাকালাম। যেটুকু ফাঁকা আছে পরদায় মাঝখান দিয়ে, আকাশ কেমন যেন ঝিম ধরা। মেঘ ছাওয়া। টিপটিপ বৃষ্টি আছে। বিকেলে হয়তো আর আলো ফুটবে না। দিনটা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসবে, একটা শ্রাবণ দিন শেষ হয়ে যাবে, যদিও দিনটি বর্ষণক্লান্ত নয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভার, যা এই ঋতুতে খুবই স্বাভাবিক! কিন্তু আমি যা ভাবছি দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই বলে এমন অলস মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছি আর চারপাশের সবকিছু আমার ওপরে কেমন যেন জেঁকে বসছে। অথবা উলটোটা। ঘটনা পরম্পরায় সবকিছু মিলিয়ে আমি জড়িয়ে পড়ছি। কী হতে পারে? লায়লার বদল থেকে আর গোটা ঘটনায়? যদিও একবারের জন্যও আমার কিন্তু মনে হয়নি কেন এর ভেতর পড়তে হলো। দরিয়া কি ইচ্ছে করে এখানে ডেকে এনেছে, যাতে এমন একটি বিষয় আমি জানতে পারি? তাতে আমার কী হবে? জেনে কী করব। নিজে যে গুহায় বাস করি, সেখানেই ফিরে যাওয়া আর স্মৃতির জাবর কাটা। স্মৃতির সেই সাঁকো আমার শুধু অতীতেই দোলে, সে কখনো বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের পানে আমায় নিয়ে যায় না। ফলে যেখানে ছিলাম একদা আমি, সেখানেই তো থেকে যাই। এভাবেই আমার অতীত– ওই অতীতের ভার টানতে টানতে একদিন সে কোনো ভবিষ্যৎ– নিকট বা দূর, সেখানে লীন হয়ে যাব। যেমন যায় সবাই লীন হয়ে, বাকিরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানকেও সহগামী করে, আমি বর্তমানকে করি অতীতমুখী। এখানে কেন যেন জাঈদের সঙ্গে নিজের এক ধরনের মিল খুঁজে পেয়েছি। জাঈদের বাঁচাটা ভিন্ন, কিন্তু সেটাও অতীতকে নিয়েই। হায়রে জাঈদ! অদেখা এক মানুষ আপনি। শুধু গলা শুনেছি আর আপনার অতীতে বসবাসের সঙ্গে নিজেরটা মিলিয়ে নিচ্ছি। যাক, অজ্ঞাত এক মিল মিলে গেল অজ্ঞাত এক কারণে!

কী জানি, মিলেছে কি? লায়লার কথা ভাবতে ভাবতে এভাবে মিলিয়ে নিলাম, যদিও এখন জাঈদের বৈবাহিক অবস্থাটা এখনো দরিয়ার কাছে থেকে জেনে নেওয়া হয়নি। সুযোগ জোটেনি। কিন্তু যদি ধরে নিই, জাঈদ এখন অবিবাহিত তাহলে তিনি কি গোটা জীবন ধরে তার এক টুকরো অতীতকেই বয়ে নিয়ে চলবেন। আচ্ছা, যদি উলটোটা হয়, তাহলে? হলেও, না-হলেও, জাঈদের জীবনটা দরিয়ার বলা সেই মাটির হাঁড়ি। যা ভেঙেছে আর যেন কোনোভাবে জোড়া লাগছে না। হয়তো লাগবেও না। যে মাটির হাঁড়ি ভাঙে তা কি আর কোনোভাবে জোড়া লাগে। লায়লা ওই তরিকায় গমনই করেননি অথবা করেছেন, কিন্তু জীবনকে আবার জোড়া লাগিয়ে ফেলেন, অথবা ভাঙেইনি তার, তা আবার জোড়া লাগাবেন কি? কিন্তু দরিয়া? ওকে তো জোড়া লাগাতে হয়েছে, তাই ওর কাছে উপলব্ধিটা অনেক বেশি বাস্তব!

আমার ভাবনার জগৎ ঘুরতে ঘুরতে সেই দরিয়াতে এসেই একটু থমকে গেল। তাও ভালো, তাতে এতক্ষণে এখানে ওপানে ঘুরপাক খাওয়াটা তো একটা জায়গায় থিতু হবে। এখান আসার কেন্দ্রে তো ওই টেনে এনেছে আমাকে। ডেকে এনেছে। হয়তো এ ছিল ওর অনেক দিনের ইচ্ছা। শেষবার ঢাকায় দেখা হলে ও বলেওছিল, কখনো ডাকবে ওর কোনো ছুটির নিমন্ত্রণ। আমার তো কর্ম আর ছুটি কোনোটাই নেই। ওর আছে সন্তান। সেখান থেকে কদিনের জন্য ছুটি জুটেছে আর আমায় ডেকেছে। আমি এসেছি। আর সেই আগমনে বাদ বাকি।

দরিয়াই তো বলেছে, এত কিছু না-ভাবতে। নিজের উদাহরণ দিয়েছে। সেটা আমি জানি বলেই তো বলেছে। নিজের বলে মনে করে বলেও বলেছে। হয়তো এই জীবনে পথ চলতে আবার কখনো কোনো বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে তাও বলবে। কিন্তু যে জন্য ওই সময়ে ওর কথা, ওর জীবন দিয়ে উদাহরণটা দিয়েছিল, তেমন তো আর ওর এই জীবনে ঘটবে না। জীবনের সে পর্ব আমরা পার হয়ে এসেছি। অথচ সেই কথাটা আজ কতটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে দরিয়া। বেঁচে থাকাই মানুষকে নিজের মতন করে স্বাবলম্বী করে তোলে। এটিই সত্য।

যে ছেলেটিকে, তিনি তো আর ছেলেমানুষ নেই, তবু কোনো একদিন যে ছেলেটিকে ও ভালোবাসত, পারিবারিকভাবে জানাশোনা ছিল, তিনি ক্যারিয়ারের প্রশ্নে বসের মেয়েকে বিয়ে করেন। অথচ তখনো দরিয়া জানে, ছেলেটি তাকে ভালোবাসে। এই দুঃসংবাদটা শোনার কদিন আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর হলের ঠিকানায় তার চিঠি এসেছে। অথচ ওই কদিনের ভেতরেই দরিয়া পরিত্যক্ত। দরিয়া তার কাছে কেউ না! অথচ ওই সংবাদটা শোনার আগে দরিয়ার চোখ পৃথিবীতে পুরুষ বলতে ওই একজনই। যে অর্থে ওই সময়ে দরিয়ার জন্য একজন পুরুষ ভাবা যায়। সেই যে নিজেকে ও পাখা গোটাল আর যেন কোনোদিন আকাশে উড়ল না। ক্লাসরুম আর নিজের হল। হল থেকে বেরোতে চাইত না। শুধু রুমমেটেরা ওকে রুমে রেখে যেত না বলেই, ও ক্লাসে যেত। কিন্তু ক্যাফেটেরিয়া, মুক্তমঞ্চ, ডিপার্টমেন্টের সামনে আড্ডা, প্রান্তিক চৌরঙ্গী– সবখানে সে অনুপস্থিত! বাড়িতেও জেনে গেছে দরিয়ার এমন অবস্থা। এর ভেতরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর ছোটবোনকে দেখে এক পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে। এদিকে ওর বাপ বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে পরেরটার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু সে পক্ষের ছেলের স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশগামী। এই মেয়েকেই বিয়ে করে যেতে চান, তাহলে ওখানে গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ হবে, ততদিনে তার অনার্সও শেষ হবে ইত্যাদি। এদিকে দরিয়াও বিয়ে করতে রাজি ছিল না। জীবনের প্রতি সে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। আর বিয়ে! কিন্তু ছোট বোনের জীবনের দিকে তাকিয়ে, বাবার ধনুর্ভঙ্গপণের কারণে দরিয়া নিরুপায়। দরিয়া যেহেতু বাড়ির পছন্দের কাউকে বিয়ে করবেই না, তাই সে সহপাঠী বন্ধুদের বলে ওরা কেউ তাকে বিয়ে করবে? (এটা দরিয়া কেন করছে তা বলেনি কখনো, যদিও অনুমান করা যায় যে, অপরিচিত কারও সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে এদের কাউকে বিয়ে করা তার জন্য নিরাপদ। অন্তত ও মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার আগপর্যন্ত কখনো দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য পীড়াপীড়ি তো করবে না। হতে পারে মাস্টার্স শেষ হতে হতে আরও কিছুদিন সময় পাওয়া যাবে। ততদিনে ওর ভাষায়, ওই ভাঙা হাঁড়ি যদি জোড়া লাগে! অথবা যদি ভেতর থেকে এই উপলব্ধি হয় যে হাঁড়িটি ভাঙেনি। সেটা যথাস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে শুধু, কিন্তু ভাঙেনি। কারণ, ও ছেলেবেলায় জেনেছে মাটির হাঁড়ি ভাঙলে জোড়া লাগে না, জীবনটা কোনোভাবে মাটির হাঁড়ি করা

যাবে না)। তখন জুয়েল বলেছে, ও করবে বিয়ে। যদিও তাতে জুয়েল যে একটা ভুল করছে এই প্রায় আধপাগলা একটা মেয়েকে বিয়ে করে, একথাও তো অন্য বন্ধুরা শোনাতে ছাড়েনি। জুয়েলকে দেখলে মনে হয় না, ও মানসিকভাবে অমন দৃঢ় মানুষ। সেই থেকে জুয়েল দরিয়ার চিকিৎসক, বন্ধু-গাইড-ফিলোসফার যাই বলা যাক তাই। স্বামী নয় বন্ধু! ফলে দরিয়া কিছুদিনের ভেতরে ঘুরে দাঁড়ায়। ওর গড়িয়ে পড়া জীবনে ফুলে আর ফলে ভরে। বছর বাদে সন্তান–তন্ময়। সেও সামনে ও-লেভেল দেবে। ফলে দরিয়া আপন পথ চলার অভিজ্ঞতায় আমায় ওই কথা বলতেই পারে যে, 'আমাকে দেখো। সেখানে লায়লা তো অন্য ক্লাসের মানুষ এখন। ওকে কেন কাতর হতেই হবে? ঠিক হয়তো আমি দুজন মানুষকে সেই রাজবাড়ির পটভূমিকায় আবাল্য রেখে নিজের মতন করে এগোচ্ছি বলেই এইভাবে ভাবছি। কিন্তু এই পর্যন্ত এসেও আমার মনে হয়েছে, হয়তো তাই। অথবা তাও না। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো বোধ কাজ করেছে। সেটি অজ্ঞাত। আমার মতন লোকের জানার বাইরে! সারা জীবন তা ধারণার বাইরেই রয়ে যাবে। শত চেষ্টায়ও সবটা বাগে আনতে পারব না। ও আমায় দিয়ে হবে না। মা বলত, শোন, তোর বোধ হবে কবে? হবে না। যার হয় তার নয়েতে হয়, যার হয় না নব্বইয়েও হয় না। তোর হবে না।– মাতৃবাক্য শিরোধার্য!

দরজায় নক। নিশ্চয়ই দরিয়া। না, দরজা খুলতেই জারা। হেসে খুব যেন দায়িত্ব পালন করতে এসেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আংকেল, আপনি কফি খাবেন? দরিয়া আন্টি জানতে চাইল। আমরা রুমে কফি বানাচ্ছি।'

আমি দরজা থেকে একটু ভেতরে পিছিয়ে আসায় জারা একেবারে দরজায়। আমিও মেয়ের এমন দায়িত্বপূর্ণ আচরণে হেসে বললাম, 'সেটা তো আমিও আমার রুমে বানাতে পারতাম, কিন্তু সে কফি মুখে দেওয়া যাবে না। তা তোমাদের রুমে কে বানাচ্ছে কফি? আপনি না, আপনার আন্টি!'

'আন্টি আর আমি। বোথ!' জারার লাজুক হাসির জবাব। এই বয়েসি মেয়েদের এই হাসিটার তুলনা হয় না, কদিন বাদেই আর এটা থাকে না। ভেতরে বেড়ে ওঠা নারীত্ব হাসিটা হাপিস করে ফেলে।

'আচ্ছা, তা আপনারা ঘুমাননি? আপনি যে পরিমাণে সাঁতার কাটলেন তাতে একটুও টায়ার্ড হননি? আমি তো ভেবেছি সব ঘুম।'

'না।' জারাকে আপনি বলা শুনে একই হাসি, 'আম্মু আর আয়াত ঘুম। আমি আর আন্টি চেজ খেলছি।'

'আচ্ছা। জারা তাহলে ছোটখাটো একজন রানী হামিদ!' বলে বুঝেছি ও হয়তো কথাটা ধরতে পারবে না, কিন্তু পেরেছিল, 'না-না, আমি অত ভালো পারি না। জাঈদ আংকেল খুব ভালো খেলেন। দরিয়া আন্টিও।'

'জাঈদ আংকেল!' আমি যেন নামটা এই শুনলাম।

'আম্মু আর আন্টির এক ফ্রেন্ড। এসেছিল। আজ চলে গেছে।'

'আচ্ছা। আমি কিন্তু একদমই পারি না চেজ। জানো তো এটা আমাদের এদিককার, মানে ইন্ডিয়ান একটা খেলা?'

'জি, আংকেল। আপনার রুমে পেপারের কাপ আছে না? আন্টি একটা দিতে বলেছে, আপনার কফির জন্য।'

'আচ্ছা–' রুমের ভেতরে ঢুকে টিভির নিচে রাখা কয়েকটা কাগজের কাপের দুটো জারাকে দিতে দিতে বললাম, 'থ্যাংক ইউ ডিয়ার ইয়াং লেডি, ওয়েটিং ফর ইওর কফি!'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

জারাও তাহলে জাঈদকে ভালোই চেনে। জানেও খানিকটা। জানে জাঈদ ভালো দাবা খেলেন এবং জাঈদ যে এলেন এটা আর অপ্রকাশ্য কোনো বিষয় নয় অন্তত জারার দিক থেকে। সেখান থেকে লায়লার বরও নিশ্চয়ই জানেন। তবে জারা জানে যে তার মা আর দরিয়া আন্টির ফ্রেন্ড জাঈদ বলে একজন এসেছিল। এটা লায়লার বরের জানার ভেতরে কিছুটা হলে ফারাক আছে। হয়তো আমিও তেমনই একজন। জাঈদ ছিলেন নয়শ তিনে, আমি নয়শ চারে। জাঈদের সঙ্গে দেখা হয়নি লায়লার স্বামীর (হয়তো আগে কখনো দেখা হয়েছে, পরেও আবারও হবে)। আমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা হয়েও যেতে পারে। তবে ফারাক আমাদের দুজনার ভেতরে একটা আছে। আমি দরিয়ার বন্ধু আর লায়লার কাছে অপরিচিত, আজই পরিচয়; আর জাঈদ, দরিয়া আর লায়লা দুজনের পরিচিত, একই শহরের এবং বন্ধুও বটে। এত যে ভাবছি, এমন তো হতে পারে লায়লার বন্ধু হিসেবে জাঈদকে ওর স্বামী বিয়ের সময় থেকেই চেনেন। হতে পারে না, তাই। শুধু জারার বিষয়টা জানে না। হতে পারে জানেন অথবা জানেন না। হয়তো আমার এই ভাবনার সবটাই অমূলক আর অপ্রয়োজনীয়। তাদের ভেতরের সবই যথাপূর্বং। আমার অনুমান।

আমি দরজা বরাবর বারান্দায় দাঁড়ালাম। পুবের ভেজা আকাশ আর জামরুল ও আমগাছের পাতা থেকে নিচে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরা দেখছি। ওদের রুমের দরজা খুলতে দেখে, নিজের রুমে ঢুকে বোতল উঁচু করে পানি গলায় ঢালতে ঢালতে জারা আর দরিয়া দুজনে কফি নিয়ে হাজির। দরিয়ার নিজের কাপে চুমুক দিচ্ছে, জারার হাতে একটাই কাপ। ও আমার দিকে কাপটা বাড়িয়ে দিতেই, আমি ওর কাপ কোথায় জিজ্ঞেস করার আগেই দরিয়া বলল, 'যাও, তুমি কফিটা শেষ করো আর বোর্ডটা সাজাও। এবার সিওর তুমি উইন করবে। তোমার খেলায় ডেভেলপ হচ্ছে র‍্যাপিডলি।'

আমি জারাকে বললাম, 'এগেইন থ্যাংক ইউ, জারা।'

ও দরজা টেনে দিতে দিতে, 'উই আর মোস্ট ওয়েলকাম, আংকেল।'

আমি দরিয়ার কাছে জানতে চেয়েছি, 'কফি কে বানিয়েছে?'

'দুজনেই। দাবা খেলতে খেলতে ভাবলাম কফি খাওয়া যাক, তাই।'

'আরে অতটুকু মেয়ে দুধ চিনি সব পরিমাণমতো মেশাতে পারে?'

'ওই হলো। ও তো দুইবার হেরেছে। এখন কফি বানানোর ক্রেডিটটা বাচ্চাটাকে তো দিতেই হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। ট্যাবের জায়গায় দাবার বোর্ড নিয়ে বসছে এই তো অনেক।'

দরিয়া চেয়ারে বসতে বসতে একটু ইয়ার্কির স্বরে বলল, 'জি জি।'

'দাবা জারার ভালো খেলারই কথা। ও-ই বলল, জাঈদ নাকি ভালো দাবা খেলে।'

'হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন ছিল স্কুলে থাকতে।'

'ও বাবা। জারাও তো তাই বলল। জাঈদকে ভালোই চেনে তাহলে।'

'তো। চিনবেই ওর মায়ের আবাল্য বন্ধু। ওরা একই শহরের না চেনার কী আছে!'

'আরে তাই বলছি। কাল সন্ধ্যায় মেয়েটার মুখে যে বিরক্তি দেখেছি, তাই ভাবলাম, ভেতরে ভিন্ন কোনো বিষয় আছে কি না?'

'আরে না। মা-মেয়ের কোনো বিষয়। আচ্ছা শোনো, যাই এখন। বৃষ্টি না কমলে তো বের হওয়া হচ্ছে না। দাবা খেলি।'

'শোনো, তোমাকে বলা হয়নি। বুলবুল ফোন করেছে ওই বইঅলাকে। বইঅলাকে বলেছে এক কথা, আমাকে বলে আরেক কথা। পরে কোনটা আসল বুঝতে চাইলে তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে যেটা বুঝলাম, গিয়ে কিছু অ্যাডভান্স করলে কাজে হাত দেবে। এখন ভাবছে ফোনে ফোনে তো। পরে যদি আর ফোন না ধরি।'

'হ্যাঁ, অমন মনেই হতে পারে। স্টেশনের ছোট্টখাটো এক দোকানদার পুঁজিই-বা তার আর কত।'

'হুঁ। তাই ভাবছি–'

আমি শেষ করতে পারিনি এর আগেই ফের দরিয়ার স্বভাবসুলভ ঠেস, 'আজই যাবে। এই বৃষ্টিতে?'

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয়

UNION BANK LTD
SHARIAH BASED BANK

16716
Call Center

'আরে না। বলছি তো এখান থেকে যাওয়া তোমার অনুমতি সাপেক্ষে।'
'তো?'
তবু একটু মিউমিউ করে কোনোমতে বললাম, 'ওই লোকটি বললেন কাল পারলে একবার যেন কুলাউড়া ওর ওখানে যাই।'
'আচ্ছা। এখন কাল। দেখি—' একেবারে নির্লিপ্ত স্বর।
'কী দেখবা?'
'কী করা যায়। বলা তো যায় না, আমিও যেতে পারি তোমার সঙ্গে। কী পারি না?'
'তা পারো।'
'আচ্ছা, যাই। মেয়েটা বোর্ড সাজিয়ে বসে আছে। তুমি ফেসবুক করো। এই বোর্ড শেষ হলে আবার আসব।'
'শোনো?' দরিয়াকে ডাকলাম। গলায় জিজ্ঞাসা।
দরিয়া তা বুঝে তাকাল, 'কী-ই?' গলায় বিরক্তি মেশানো আহ্লাদ।
'জাঈদ বিয়ে করেছেন?'
দরিয়া শব্দ করে হাসল। চোখ সে হাসিতে আরও একটু বড়! আমার দিকে তাকাল যেন আমি প্রায় বালক একটা, 'তুমি সেখানেই আছো না?' বলতে বলতে এগিয়ে এসে মাথায় একটা চাপড়। 'কিছু মাথায় ঢুকলে তা আর বের হয় না, না?' আমি একইভাবে তার দিকে চেয়েছিলাম। হাসির কারণ কিছুতেই অনুমান করতে পারলাম না। দরিয়ার উলটো প্রশ্ন, 'করলে কী?'
'আরে বলো না?'
'না। যাই। কেন, কী, আর না। তবে লায়লাকে আমি বলেছি, তুমি কাল জাঈদের গলা শুনেছ।' একটু নিচু স্বরে একথা বলে তার পরে দরজা খোলার সময়ে আমার দিকে তাকিয়ে, 'পাগল লোক একটা!' বলে চলে গেল।

৫

শেষ বিকেলে বৃষ্টির টিপটিপ ধারা ঝিরঝিরিতে পরিণত হলো। ক্যাফেটেরিয়া থেকে দরিয়ার ফোন পেয়ে সেদিকে যেতে যেতে খেয়াল করলাম একটু ঠাণ্ডা লাগছে, পাঞ্জাবির ওপরে একটা কিছু জড়ানো থাকলে হতো। শ্রীমঙ্গল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা। বৃষ্টি যেমন বেশি শীতকালে শীতও প্রায় উত্তরবঙ্গের মতন, কখনো তার চেয়েও তীব্র! ক্যাফেতে ঢুকে সামনের গ্লাসে তাকিয়ে দেখলাম আমার চুলে কুয়াশা জমে থাকার মতন বৃষ্টির আস্তরণ! মাথা মুছতে পারলে হতো, একটা টিস্যু নেওয়া যেতে পারে। এর আগেই দরিয়া বেশ হেসে বলল, 'মাথায় একেবারে মাকড়সার বাসা হয়েছে বৃষ্টিতে। তাই না জারা?' বলে, টেবিল থেকে দরিয়া দুটো টিস্যু এগিয়ে দিল, 'মাথায় চেপে ধরো। মুছো না, চুল আউলে যাবে। চুল আউলালে পচা লাগবে। এত কষ্ট করে করা ব্যাকব্রাশ-করা বাবু, আউলালে হয়!'
দরিয়ার এমন ধারা কথায় জারার হাসি আরও ছড়াল। ও মাকড়সার জাল কথাটায় মজা পেয়েছে।
দরিয়াকে বললাম, 'তোমাদের মাথায় এমন হয়নি? লম্বা চুলে তো আরও বেশি হওয়ার কথা।'
'এই যে—' দরিয়া ওড়না দেখাল, 'এটায় আমরা দুজন মাথা ঢেকে এসেছি, মনে হচ্ছিল সেই ছেলেবেলায় নানাবাড়িতে আমি আর আমার এক মামাতো ভাই কচুপাতা মাথায় দিয়ে একটা মাঠের মাঝখান থেকে এসেছি।' কথাটা বলতে বলতে দরিয়ার মুখটা একটু কালো হলো। সাধারণত এমনভাবে অতীতের কথা বললে মুখে হাসিটা অটুট থাকারই কথা, কিন্তু তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কেন। কারণটা সামান্য হলে অনুমান করতে পেরেছি, হয়তো ওই ছেলেটি, দরিয়ার ওই মামাতো ভাই, ওর সঙ্গেই ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল; হয়তো ওই বৃষ্টিতে কচুপাতার নিচে সেই আসার স্মৃতি—দুজনের কৈশোরক প্রেমের সেই থেকে সূত্রপাত। সেই দিনের স্মৃতি এখন অজানিতেই এভাবে সামনে আসায় দরিয়ার জ্বলজ্বলে চোখমুখ নিভে গেছে! সেটা কাটাতে আমি প্রসঙ্গ ঘোরালাম, 'তোমাদের না দাবা খেলা শেষ হলে আমাকে ডাকার কথা ছিল?'
'আরে ডাকব কী? শেষ গেমে আমি হেরেছি, তাতেই জারা বলল, এখনই চলো, আম্মু দেখার আগে। মানে ওকে আইসক্রিম খাওয়াতে হবে। তাই চটপট চলে এসেছি।'
'আচ্ছা। জারাবাবু তাহলে জিতেছেন। কনগ্রাচুলেশন জারা।'
'ওয়েলকাম। কিন্তু আংকেল, জাঈদ আংকেলের সঙ্গে কিছুতেই পারতাম না উইন করতে। উনি খুব ভালো খেলে।'
'কবে খেলেছো তোমার জাঈদ আংকেলের সঙ্গে?'
'এই তো পরশুদিন। একেবারে কয়েক চালেই কিস্তিমাত। তবে উনি আমাকে একটা সিক্রেট ট্যাকটিস শিখিয়ে দিয়েছে কুইন [মন্ত্রী] আর নাইটের [ঘোড়া]। ওইভাবেই আন্টিকে ডিফিট দিয়েছি।'
দরিয়া কপট বিস্ময়ের সঙ্গে জারাকে বলল, 'আচ্ছা, তাই নাকি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। শেখাবে আমাকে?'
'না-না। শেখালে আমি আর তোমার সঙ্গে পারব না।'
আমি জারাকে বললাম, 'না, কিছুতেই তুমি ওই সিক্রেট দরিয়া আন্টিকে বলবে না। সিক্রেট কখনো বলতে হয় না।'
'আপনি ঠিকই বলেছেন। একবার আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ম্যাথসের একটা সিক্রেট শিখলাম। পরে আমি একদিন ভুলে গিয়ে ওর কাছে সেটা জানতে চাইলে বলল, সিক্রেট ইজ অলওয়েজ সিক্রেট। ও আমাকে আর বলেনি ওটা।'
জারা বেশ গুছিয়ে কথা বলে। যদিও ইংরেজির ভালোই মিশেল থাকে, কিন্তু কথাটা সে বলতে পারে ভালোই। যুক্তি দিয়ে।
দরিয়া হয়তো আমাকে মেয়েটার এমন কলবলানো আরও কথা শোনানোর জন্য ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কী-কী সিক্রেট শিখেছ জাঈদ আংকেলের কাছ থেকে?'

'আছে ম্যাথসের একটা।'
দরিয়া জানতে চাইল, 'কী সেটা? ও সিক্রেট তো, সিক্রেট বলা ঠিক না।'
'আরে বলোই না। বললে কী হয়, আমরা তো আর তোমার ক্লাসের কোনো ফ্রেন্ড না। আমরা জানলে কিছু হবে না।' আমার একথায় জারা খানিকটা টলছে তবে পুরোপুরি নয়।
দরিয়া বলল, 'বলো, ঠিকই তো আমাদের বললে তো আর কিছু হচ্ছে না।'
জারা আমাদের দুজনকেই দেখল, 'ওই সিক্রেটটা হলো, যা হাফ দ্যাট ইজ ফিফটি পারসেন্ট। যা টুয়েন্টি ফাইফ দ্যাট ইজ ওয়ানফোর্থ। যা ওয়ান ফিফথ দ্যাট ইজ টুয়েন্টি পারসেন্ট!'
'ও আচ্ছা।' দরিয়ার চোখ বড় করে মন্তব্য!
জারার মন্তব্য, 'তোমরা এটা জানো।'
আমি শব্দ করে হাসলাম।
জারার আইসক্রিম শেষ। দরিয়া আমার কাছে জানতে চাইল, 'চা না কফি?'
'আইসক্রিম।'
'যা, কী বলে? এখন আইসক্রিম! জারার মতন কথা।'
জারা শব্দ করে হাসল। পরিবেশ অনেকটাই হালকা। তাহলে কাল সন্ধ্যায় জারা অমন মুখ গোমড়া করে রেখেছিল কেন। জাঈদই কারণ? নাকি জাঈদের সঙ্গে তার মায়ের বন্ধুত্বের কোনো বিষয়? নাকি এখানে তার আগেই কোনো বিষয়ে? নাকি উলটোটা? জাঈদের সঙ্গে জারার আন্তরিকতা? জারার ভাষায় সিক্রেট শেখার কারণে লায়লা বকেছে জারাকে? নাকি এর কিছুই নয়? কাল জাঈদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল জারা আর লায়লা তাকে ক্যাফেটেরিয়ায় পাঠিয়েছেন সেই জন্য? এই বয়েসে মেয়েদের অল্পে অভিমান হয়। আমার পক্ষে তো এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা সম্ভবও নয়। কেন কালকে জারা অমন প্যাঁচার মতো মুখখানা করেছিল।
তবু দরিয়াকেই যেন বললাম, 'আজ জারাকে খুব সুন্দর লাগছে, কাল আমাকে দেখেই কেমন গোমড়া ছিল, তাই না দরিয়া? আমি তো

ভেবেছি ও আমাকে একদম পছন্দই করেনি।'

'তাই নাকি, জারা?' দরিয়া জারাকে বলল কফিতে চুমুক দিতে দিতে।

'না-না। রাতে জাঈদ আংকেল চলে গেল, তাই। আম্মু একটু বকল আমি জাঈদ আংকেলের সঙ্গে কথা না-বলে ট্যাব দেখেছিলাম।'

জারা কোনো প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিছুটা অস্বস্তিতেও পড়েছে যেন মেয়েটা যেন যা বলতে চাইছে বলতে পারছে না।

দরিয়ার কানের কাছে ফোন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজার দিকে ফোনে রিং হওয়ার শব্দ। লায়লা ফোনটা কাটলেন না। আয়াতের হাত ধরে আমাদের টেবিলের কাছে এসে এক গাল হেসে তিনি বললেন, 'আরও আগেই আসতাম, কিন্তু এনার টয়লেট। কই পাকোড়া ভাজেনি?'

'হায়রে, আমি একদম ভুলে গেছি!' দরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

লায়লার তাতে কিছুটা হতাশাও, 'হায়রে, আমি আরও আয়াতকে বলেছি।'

দরিয়া আয়াতকে বলল, 'ডোন্ট ওরি, আয়াতবাবু, হবে।' বলেই উঠে গেল কাউন্টারের দিকে। সেখানে মিঠুন আর একটি মেয়ে। সম্ভবত নাম স্মৃতি, ভুলও হতে পারে। সকালে দুজন ছিল, একজনের নেমপ্লেটে লেখা ছিল স্মৃতি অন্যজনের তিথি। পরেছিল নভেম্বের ইউনিফর্ম। ওই পোশাকে সবাইকে প্রথম দেখায় প্রায় একই রকম লাগে আকৃতিতে বিশেষ কোনো ফারাক না-থাকলে। (সম্ভবত) স্মৃতির গলায় শোনা গেল।

দরিয়া তাতে আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলো, 'হুঁ, হবে। আয়াত চেয়েছে আর হবে না? তিথি আন্টি তাড়াতাড়ি পাকোড়া তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা গরম-গরম খাব।' এর পরে আমার উদ্দেশ্যে জানাল, 'হয়েছে কী, লায়লা আমাকে সেই কখন বলেছে। তারপর আমি দাবায় হেরে জারাকে নিয়ে এসেছি আইসক্রিম খেতে, ফলে আর মনে নেই। আপনাকে যখন ফোন করেছি, তখন অর্ডার দিলেও হয়ে যেত এতক্ষণে।' দরিয়া আমাকে আপনি সম্বোধন করছে লায়লার সামনে। স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে এটা করায় আমার কানে লাগল।

লায়লা বললেন, 'আইসক্রিম? এই ঠাণ্ডায় আইসক্রিম পাগল! আসুক তোমার বাবা।' লায়লার রাগটা কপট, কিন্তু গলার স্বরে মেয়ের প্রতি বিরক্তি নেই। যাক লায়লা স্বাভাবিক। দুপুর থেকেই খেয়াল করেছি।

কিন্তু দরিয়া যে বলেছে, জাঈদের বিষয়টা ও লায়লাকে বলেছে, তাতে হয়তো আমার সামনে আড়ষ্টতার বিপরীতে লায়লা নিজেকে বদলে নিয়েছে। সেজন্য আমাকে প্রশ্ন, 'আচ্ছা আপনি বলেন, দরিয়া আপা কাজটা ঠিক করেছে?'

লায়লা 'হ্যাঁ' নাকি 'না' কী শুনতে চাইল কে জানে? নাকি তার মেয়ের ওই অপেক্ষাকৃত শীতল দিনে আইসক্রিম খাওয়ায় যে একটা বকা পাওনা হয়েছে, সেটা আমাকে দিয়ে ঠিক করে নিতে চাইল। সেখান থেকে নিজের কথা বলে জারাকে উদ্ধার করল আয়াত, 'আম্মু, বাবা কখন আসবে?'

লায়লা একটু হকচকিয়ে যাওয়া জারার দিক থেকে আয়াতের দিকে ফিরে বললেন, 'আসবে, আজ রাতেই। এই তো আর বেশিক্ষণ না।'

'রাত কখন বেশিক্ষণ না হবে?'

আমরা হাসলাম। দরিয়া বলল, 'ধরো, ডিনার খাওয়ার আগে আগে।' এর পরে লায়লার কাছে জানতে চাইল, 'লিটন ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার? কখন রওনা দেবেন?'

'বলল তো বিমানের লাস্ট ফ্লাইটে। ঢাকা থেকে ছাড়ে ছটায় না সাতটায়।'

'তাহলে প্রায় দশটা বাজবে। সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গল অনেক পথ।'

'সিলেটেও নাকি কোনো এক বন্ধুর সঙ্গে একটু দেখাও করবে।'

'তাহলে আরও দেরি।'

শুনে জারা বলল, 'আয়াত, তোর বেশিক্ষণ না হবে অনেকক্ষণ পরে।'

আয়াত এবার জানতে চাইল, 'সেই অনেকক্ষণ কখন হবে, আম্মু?'

দরিয়া বলল, 'বললাম তো আয়াত, আগে পাকোড়া আর পেঁয়াজু

খাই আমরা, খেতে খেতে চিন্তা করব।'

এসময় আমার টেবিলের ঠিক সামনে বসা লায়লা একটু লাজুক হেসে আমায় বলল, 'আমার কেমন কাটল এই একটা দিন। একদিনই তো হলো এই সন্ধ্যায়। ভালো?'

প্রশ্ন আবার প্রশ্নের সঙ্গে মন্তব্য আবার জবাব– সবটাই যেন একই সঙ্গে পোরা। কিন্তু লায়লা হাসল খুব সুন্দর করে। যেখানে একই সঙ্গে অভ্যর্থনা আর তার কোনো গোপন কথা, যা আর রয়নি গোপনে, তা আমি জেনে যাওয়াতে ভেতরের যে প্রতিক্রিয়া এর সবটাই ফুটে উঠল। হয়তো এটাই বিগত দিনে একজন মানুষের জীবনে যাই ঘটে থাকুক, এর ফলে যাই হোক, সেই জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া, সেখানে যত বেদনাই অথবা দুঃখই থাকুক, এরও যে আনন্দ, সেই আনন্দের একমুহূর্তের জন্য হলেও সাক্ষী হতে পারা ভাগ্যেরই বটে। লায়লাকে এমনভাবে দেখে, গতকাল এমনকি সারাটি সকালের বিপরীতে এখন এক লায়লাকে দেখে, আমারও ভালো লেগেছে। দরিয়াও তা বুঝতে পারছে? পারলে আমাকে করা প্রশ্নের জবাব নিশ্চয় ও-ই দিত। তাতে ওর প্রগলভতা ফুটেও উঠত। যদিও আমি লায়লার এমন কথার আগেই নিজেতে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। বলব, আমি যথাপূর্বং তথা পরং। থাকবও পূর্ববর। একমাত্র দরিয়া ছাড়া অন্যের সামনে দ্বিতীয় কোনো মানুষের সামনে আমার মনে ছায়া যেন প্রকাশিত না হয়।

আমিও একটু হেসে বললাম, 'একই। বলতে পারেন বিন্দাস। দরিয়া আহ্বানে আসা আপনার কল্যাণে অমৃতসুধা যোগ। এর চেয়ে আনন্দের কী আছে!'

'আচ্ছা, এমন আনন্দ!' লায়লার বিস্ময়!

দরিয়া ঠিকই তার ধরনে বলল, 'আহা, আমার আহ্বান, আবার অমৃতসুধা নাকি কারণবারি? কী সব বলবেন আপনি। যেন এসব এখানে এসেই জুটল। আপনাকে আহ্বান জানানোর লোকের অভাব?'

'আরে কী যে বলো না। আমি থাকি সাহারায়। তোমাদের এই ফুলের মেলায়!'

'হইচে। আর কাব্য করতে হবে না। তাও আমার কাজী নজরুল থেকে, নিজে করলে না হয় বুঝতাম।'

'সামনে এই যে জিনিস, অমন ধরনের কবিকেই তো স্মরণে আনতে হয়। তার এর চেয়ে লাগসই গানের কথা আছে এখন বুঝতেই পারছ কেন বললাম না।' এরপরে লায়লাকে বললাম 'সত্যি, বেশ কাটছে। রাতে আপনার বর এলে নিশ্চয় আরও ভালো লাগবে।'

দরিয়া বলল, 'জানি না, ভাই। মুডি মানুষ। দেখা গেল আসতে আসতে মাথায় কোনো প্রবলেম ঢোকায় নিয়ে আসে। তখন সেই চিন্তায়ই থাকল।'

লায়লা বলল, 'আগেই এতকিছু ভাবছেন কেন?'

এমন সময়ে স্মৃতি পাকোড়ার প্লেট নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। পেছনে মিঠুন। হাতে আরও-একটি প্লেট। আমি আমার বাঁয়ে হেলে নিচু স্বরে দরিয়াকে বললাম, 'জলযোগ যদি এই জিনিসের আমদানি থাকত?'

'হবে। দেবে। অন্য কিছুও হতে পারে। ভাববেন না।'

জানতাম দরিয়া এই-ই বলবে। ডানে কাচের দেয়াল থেকে দূরে তাকালাম। সেখানে একটা টিলা, ওপরে আলো। এত দূর থেকে মনে হচ্ছে বাল্বটা প্রায় জ্বলছেই না। কোন জায়গায়? সেখানের ঘরখানা কতটুকু অনুমানে আনতে পারছি।

লায়লা যেন আমার কথাটা শুনতে পেয়েছে এমনভাবে দরিয়াকে বলল, 'কী বলেন, আপা?'

'আরও আছে। যার যা ধান্ধা আরকি।'

তা এক অর্থে ধান্দা বইকি! কখনো কখনো যার প্রাণ প্রায় আইঢাই করে ওই এক ফোঁটা জলের জন্য। নিজেকে সেই বুড়ো নাবিকের মতন মনে হয়, চারদিকে বহিছে ধারা কিন্তু তার এক ফোঁটাও গলায় দেওয়ার মতন নেই। না, উদাহরণটা লাগসই হয়নি। হতে পারে, কোনো ধারাই নেই কাছেপিঠে। আর এখন হাতের কাছে ভরা কলস থাকতে, এমন বর্ষণক্লান্ত দিনের পরে, যখন সন্ধ্যে আসে খুব ধীরে, অলস পায়ে, যদিও মেঘে মেঘে ছাওয়া আকাশে সূর্যের ছটাহীন দুপুরের পর থেকে, সন্ধ্যে তো অতি মন্থর, তার পরে যখন সে আসে, তখন তাকে, বৃষ্টিদিনের আলস্য কাটাতে অমন ধান্দা কি আর ধান্দা বরং তা কাঙ্ক্ষিত!

আমাকে নিয়ে দরিয়ার হাসতে হাসতে লায়লাকে বলা কথাটা নিজের কাছে যথার্থ করে তুলেছি। নিজের রুমে ঢুকে তা ভাবতে ভাবতে আমার মুখে হাসি। লায়লার স্বামী আসবেন, জানি না ভদ্রলোক কতক্ষণে এসে পৌঁছবেন। দরিয়াও কিছু বলেনি। যখনই আসুন দরিয়া আদেশ করার আগেই সঙ্গে থাকা পাঞ্জাবিটা পরেছি। এর আগে মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছি। পাঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়ানোর আগে আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে মনে হলো, দুপুরেও আমার চোখে যে সামান্য ব্যথা ছিল তা আর নেই। বরং ফুরফুরে। লায়লা-জারা মিলে তা কাটিয়ে দিল। নাকি কেটে গেল। গেলেই ভালো। যে ভার বহন করতে জানি না। শুধু শোনা থেকে জানা। সেই থেকে তা কিছুক্ষণের জন্য বহনের চেষ্টা। তা যত দ্রুত কেটে যায় ততই নিজের জন্য ভালো। পাখির জাতের ওড়ার ধাত তো অর্জন করতে পারিনি বাউলের মতন, তবু সে চেষ্টা করতে দোষ কী। কিন্তু সংসারের কবি তো বলেন উলটো কথা, ওই যে পাখি উড়ে যায়, যাওয়ার পরেও ওই গাছের ডালে আর পাতায় তার ছায়াটা নাকি লেগে থাকে। তার মানে চাইলেই এই জীবনে একবার ডালে বসা ছায়াটুকু মুছে দেওয়া যায় না। তার কোনো না কোনো রেশ কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু থাকেই।

সেই ছায়াটুকুর মতন রেশ কীভাবে কাটানো যায়? এর কোনো উপায় তো কারও জানা নেই। এর নাম কি মায়া। হয়তো। কিন্তু বাউলকে সেই মায়ার ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। নইলে ওই পাখির মতন উড়ে বেড়ানো যায় না। ফলে ঘরে থেকেও বাউল-বৈরাগী-ফকির না হয়েও কেউ কেউ ওই মন তৈরি করে নিতে পারেন। তার হাঁড়ি ভাঙে না। লায়লা কিংবা দরিয়া তা পেরেছে। পেরেছেন তাও অনেকেই। হয়তো জাঈদ পারেননি। আর আমি শুনেই বিবশ। শোনাটাই ছেড়ে যাচ্ছিল না। কানের পাশে পাশে ঘুরঘুর করছে। কিছুক্ষণের জন্য কেটে গেছে। এখান থেকে চলে গেলে সব লেপেপুছে যাবে। আবার কোনো দমকে মনে পড়বে অথবা পড়বে না।

মনে যে পড়বে, এই স্বাভাবিক সত্যটুকু বুঝতে পারছি। সেখান থেকে আমার মতন ক্ষণিকের অতিথির ক্ষণিকের এই মুক্তির জন্য পোশাক বদলালাম নাকি পোশাক বদলের সঙ্গে নিজের রূপান্তর! ভেবেছি। দরিয়া ডাকতে আসার মাঝখানের সময়টুকু এভাবে উড়ে গেল!

আর বারবার মনে হচ্ছিল, কেন যে আসি মানুষের মাঝে! না আসাই বরং বৈরাগ্য!

দরিয়া দরজায় নক। আমি কিছু বলার আগে দরজা ঠেলে গলা বাড়িয়ে দিয়ে দরিয়া বলল, 'যাক, রেডি। এই একটা বিষয়ে একেবারে অবিডিয়েন্ট।' বলতে বলতে ও রুমে ঢুকল, 'একটু পরে লায়লার রুমে চলে এসো।'

'লায়লার রুমে?'

'হুঁ, নয়শ দুইয়ে। কেন কোনো সমস্যা?'

'না।'

'আর শোনো, তোমার কাছে যেটা আছে ওটা তোমারই।'

'আচ্ছা। তা কেন?'

'হইচে। মনে করে নিয়ে যেও। আবার নভেমের লোকজনের জন্য রেখে যেও না।'

'আরে তা যাব না। ভেবো না কিছু, ও জিনিস মনে থাকবে জগতে আর যাই ভুল হোক। শ্রীরাধিকা কলসে যমুনার জল নিতে ভোলে

না।'

'সে আমি জানি।' দরিয়া একটু ঘুরে দরজাটা আটকে দিয়ে রুমের ভেতরের দিকটায় আয়নার সামনে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মোবাইলে চোখ। কিছু ডান হাতের বুড়ো আঙুলে টেনে দেখছে। বলল, 'আচ্ছা,' মাথা তুলল সে, 'এই গল্পটা জানো নাকি, পড়েছ আগে? সাদাত হাসান মান্টোর। কী বানান সদত হাসন মান্টো– এমন বানান কেন? আমাদের বোঝার মতন করে লিখলেই হয়, শাহাদাত হাসান মান্টো। এই যে এই গল্পটা–'

'কোন গল্প? মান্টো উর্দু ভাষার খুব বড় গল্পকার।'

'সে জানি। কিন্তু এই গল্পটা–। দাঁড়াও, বলছি। এই যে এক লোক জানতে চেয়েছেন দেশের অবস্থা কী? তখন অন্যজন বলছে দেশের অবস্থা জেলখানার মতন। কারণ এখানে খুনি আজান দেয়, ডাকাত ইমামতি করে আর চোর-বাটপার সব নামাজ পড়ে।– এটা? পড়েছ আগে।'

ঘরের আলোয় দরিয়ার মোবাইলে চোখ। আমি ওর দিকে তাকিয়েই ছিলাম। ও মাথা তুলল। আমি কথাটা শোনার পরে চলে গেছি অতীতে।

দরিয়া জানলে চাইল, 'কী?'

'জানি মনে পড়েছে। কিন্তু এই গল্পটা পড়ার আগেই গল্পটা জানি আমি। তখন বলতে গেলে যুবক হয়ইনি। অন্তত সেই জানার দশ বারো বছর পরে তার এই গল্পটা প্রথম পড়েছিলাম।'

'মানে? হেঁয়ালি করো না। ডালপালা ছড়িয়ো না। জানা থাকলে বলো।'

'আরে হেঁয়ালি নয়, বাস্তব, সত্যি কথা।'

'বললেই হলো, মান্টোর গল্প পড়ার আগে থেকেই তুমি গল্পটা জানো। আজকাল বিবাগী হতে চাও। তা একসময়ে তান্ত্রিক-গুণিন– এই সমস্তও ছিলে নাকি?'

'আরে, শোনোই না।'

'বলোই না, বানানো কাহিনি। আজব!'

'বানানো না। তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। কদিনের জন্য মামাবাড়ি গেছি। ফেরার পরই শুনি মা বলছেন, শোন সংগ্রামকে জেলে নিয়ে গেছে। সাবধানে চলিস। দেখা করতে যাবি না কিন্তুক, তা'লি তোগেরও যদি আটকায়।'

দরিয়া আর গালগল্প ভাবছে না। কারণ অল্প-একটু শুনেই সে চোখ খানিকটা বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আমার বলাটা সত্য, তা বুঝে নিল। আমি বললাম, 'ও আসলে রাস্তার মোড়ের দোকানে বসে পানের বোঁটায় চুমু ঝাকা দিয়েছিল। তাই গি লাগল কলেজ ফেরত এক বড়বোনের গায়ে। সে থানায় গেল। ফলে ওকে ধরে নিয়ে হাজত। সংগ্রামের বাপ ভীষণ নীতিবান মানুষ, ওকে ছাড়াতেও যাননি। তাই আঠারো দিনের হাজত। সেখান থেকে বেরিয়ে ও বলেছিল ওই গল্প।'

'এই গল্প? মানে কী? তোমার ওই বন্ধু তখনই মান্টোর গল্পটা পড়েছেন? কোথায় পড়েছেন জেলখানায়?'

'আরে না। ও কদিন বাদে লঞ্চঘাটের আড্ডায় স্টারফিল্টারে টান দিতে দিতে আমাদের বলছিল, জেলখানার দিনকাল কেমন ছিল, কে কেমন আচরণ করত এইসব। যখন ওর কাছে জানতে চেয়েছি।'

'কী বলল?'

'আরে ওটাই প্রায়। বলে, শোন শুক্কুরবারে দেখি কি অবাক কাণ্ড। জেলখানায় কোর্ট মসজিদ থেকে আজান শোনা যাওয়ার পর পরই দেখি কি– অতিউর– ওই যে সুন্দরঘোনায় খুন করিছে সে আজান দিতিচে। এর পর আর একজন যে মোল্লারহাটে ডাকাতি করতি যাইয়ে গণধোলাই খাইছে সে ইমাম, আর চোরধাউর টাউট-বাটপার আমার মতন এইযে যারা, এসব দাঁড়াইছে নামাজে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সেইয়ে দেখি। আর ভাবি জেলখানা কী-এক আজব জায়গারে ভাই। যে খুনি সে কিছু সময়ের জন্য মুয়াজ্জিন, যে গণধোলাই খাওয়া ডাকাইত, যার এক চোখ গালাইয়ে দিছে পাবলিকে সে কিছু সময়ের ইমাম।'

'গল্প তো এক। বলছ তখনো তোমরা মান্টোর এই গল্প পড়োইনি।

'আরে, অসম্ভব। গঞ্জে ফেরেশতে বইটা দেখেছি হয়তো। পড়িনি। আর এই গল্প কোথায় পাব। কী শুনে তোমার মনে হচ্ছে না, জেলখানায় এটা হতে পারে?

'হু, তা পারে।'

'আমি প্রথম যেদিন এই গল্পটা পড়েছি, সেদিনই সংগ্রামের কথা মনে পড়েছে। ও তখন কুয়েতে ছিল। বলারও তো কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু পাঁচ-ছ বছর আগে ওকে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বললাম, 'ও বলল তাই নাকি, মনে নেই। তোর তো দেখি সবই মনে থাকে। আঠারো দিন, চুন মারা, সুন্দরখোনার আতিউর খুনি। তয় ঘটনা কিন্তু সত্যি। এই নিয়ে ওই মান্টো না কি নাম ক'লি [বলিলি] তারও গল্প আছে নাকি?' বললাম আছে। সাতচল্লিশের পরের পাকিস্তান সম্পর্কে তার দুই চরিত্রের সংলাপ। তখন সংগ্রামের কথার যা ধরন, হেসে বলেছে, "দেইছিস, ওয়াইজ ম্যান অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট আর অলওয়েজ ক্রিয়েটর সাচ সেইম টাইপ অব হিউম্যান স্টোরি। দেখিছিস!" বলে, হেসেছিল। এমন ইংরেজি বাক্য ও এত সুন্দর বলত, নির্ভুল, কিন্তু ইন্টারের পরে বান্দা আর পড়ল না।'

'এখন কোথায় আছেন উনি?

'এলাকায়ই। তা হঠাৎ মান্টোর এই গল্পের খোঁজের কারণ কী?'

দরিয়া আবার মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখল। কী যেন একটুক্ষণ দেখল সেখানে। এর পরে মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে স্মিত হেসে প্রায় স্বগতোক্তি করল, 'আরে পিয়াল পোস্ট দিয়েছে। পিয়ালকে তুমি চেনো। মানে আমার কাছে শুনেছ। শ্রীমঙ্গলেই থাকে। একটা ছোট রিসোর্ট আছে ওর কমলগঞ্জের দিকে। মনে পড়েছে? ওর মান্টোর গল্পের এই পোস্ট দেখে জানতে চাইলাম। আগে পড়িনি তো গল্পটা। তাই তুমি জানো কি না?'

'আমি প্রথম পড়েছি তাও অন্তত বছর কুড়ি আগে। বললামই তো।'

'ও অবশ্য মুনতাসীর মামুনের কলাম থেকে পোস্টটা দিয়েছে। মানে গল্পটা তার ওই কলাম থেকে নিয়েছে।'

'আচ্ছা। দেশভাগের পটভূমিতে মান্টোর গল্পগুলো অসাধারণ। তুলনা হয় না।'

'সে আমিও কিছু পড়েছি। নন্দিতা দাশের ছবিটাও দেখেছি। তুমি?'

'আমার দেখা হয়নি।'

'তুমি অবশ্য হিন্দি ছবি দেখোই না। কিন্তু এটা দেখো, নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিক যা অভিনয় করেছেন।'

'আচ্ছা, দেখব। কিন্তু দেশভাগের বলি এই মান্টো কিংবা ঋত্বিক অথবা ধরো একটু দূরের মানিক বা জীবনানন্দের মতন জটিল চরিত্রের অভিনয় যত ভালোই হোক, শেষ পর্যন্ত ওখানে পৌঁছানো যায়?'

'এই যে তত্ত্ব। হইচে। থাক, আমারে আর কীর্তন শুনিও না। ও গান আমার বোধের বাইরে। আসো লায়লার রুমে। আবার যেন ডাকতে আসতে হয় না।'

৬

লায়লার রুমে যাওয়ার আগে দরিয়ার দরজায় নক করলাম। এর কারণ, যদি ওই রুমে দরিয়া না-থাকে, তাহলে আমি ওখানে সহজ হতে পারব না। আমার অবশ্য মনে হয়েছে লায়লার রুমেও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ও নিজের রুমে না-থাকলে আমি লায়লার রুমেই যেতাম। কিন্তু নক করা মাত্রই দরিয়া বলল, 'কাম ইন।' আমি গলা বাড়িয়ে দেওয়া মাত্রই বলল, 'আমি জানতাম তুমি আমার খোঁজ নিয়ে তারপর যাবে। বাবুর তো সব সময়েই সঙ্গীসাথি লাগে। তাই না?'

'আরে তা না। তবে ওখানে তুমি না থাকলে, তুমি ছাড়া আমি একা–'

MTB CARDS
towards a cashless society

This Ramadan

Enjoy amazing offers with your MTB Credit Card

Avail **10% cashback** at

Apex™ Bata Ecstasy® INFINITY™ Mega Mall
LUBNAN Richman YELLOW

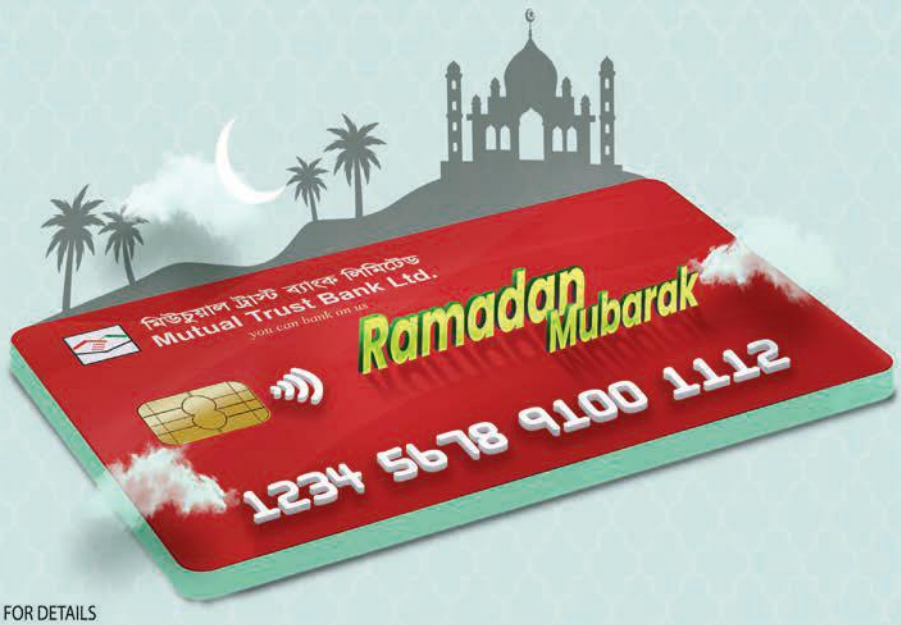

SCAN FOR DETAILS

- Complimentary Companion Sehri & Iftar
- 10x reward points at grocery shopping
- Discount at top online and offline merchants

*Conditions Apply

Offer valid till Eid day 2023

MTB

16219 | Mutual.Trust.Bank | mutualtrustbank.com

'সব সময়ে খালি বাংলা সিনেমা। জীবনে কত বই দেখেছ বলো তো?'
'ধুর।'
'ধুর, কি বদনাম অবিচার পিচঢালা পথ সবগুলো না আট দশবার করে দেখেছ!'
'কম বললে। বদনাম দেখেছি সতেরবার। শুধু রাজ্জাকের পকেটে ববিতার ওই বকুল ফুলের মালাটা দেখার জন্য। সর্বশেষ জোনাকিতে। ষোলতম বারের অন্তত দশ বছর পরে। তাও কুড়ি বছর হবে।'
'তাহলে কথায় কথায় বাংলা সিনেমার ডায়ালগ তুমি দেবা নাকি দেবে অন্য মানুষ?'
'আর তুমি এই ডায়ালগ শোনার জন্য রুমে?'
'না। একটু পিয়ালের পোস্টের নিচের কমেন্ট দেখছিলাম। ছেলেটার আবার কোনো সমস্যা হয় কে জানে! গভর্নমেন্টকে এসব বিষয়ে উসকে দেওয়া লোকের তো অভাব নেই! তাই না? দেখা গেল সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটকে দিল।'
'আমার মনে হয়, তুমি অতিরিক্ত ভাবছ।
'না গো, গর্তবাসী। একটু দ্বার খোলো, খোলো দ্বার। দেশ দুনিয়া কোথায় যাচ্ছে সে খবর তো রাখো না। আজকাল কতকিছুই তো তিল থেকে তাল হয়ে যায়।'
'তা যায়। কিন্তু মান্টোর এই পরিচিত গল্পের জন্য? এ তো পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশে– সর্বত্রই এই অঞ্চলের সবগুলো ভাষায় পঠিত অতি পরিচিত গল্প এই নিয়ে আবার কী? তাহলে হ্যান্স ক্রিশ্চান এন্ডারসনের সেই রাজা ন্যাংটা গল্পটা কেউ পোস্ট করলে, এই অঞ্চলের কেন দুনিয়ার সব রাজা ক্ষেপে যাবেন, নাকি?
'ঘটনা প্রায় সেদিকেই।'
'এমন কেন মনে হচ্ছে তোমার। কেউ কোনো ইঙ্গিত দিয়েছেন নাকি অনুমান?'
'ইঙ্গিত খানিকটা দিয়েছেন একজন।'
'কে?'
'বলব। দেখি আরেকটু। চলো ওই রুমে যাই। লিটন ভাইয়ের আসার সময় হয়ে গেছে।'
'এত তাড়াতাড়ি?'
'আরে বড়লোকের ব্যাপার। কাজ শেষ তো টিকিট ক্যানসেল করে বিকালের ফ্লাইটেই রওনা দিয়েছেন। সিলেট এসে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে রওনা দিয়েছেন অনেকক্ষণ। লায়লাকে জানিয়েছেন জারা আর আয়াতকে না বলার জন্য। সারপ্রাইজ দেবেন।'
'আচ্ছা। তা জারা কোথায়? ও না তোমার রুমেই ছিল।'
'এখন বাপের জন্য বুকড্ রুমে। নয়শ তিনে। চলে আসবে এখানে অথবা এখন লায়লার রুমেও থাকতে পারে। চলো।'
দরিয়া রুমের দরজা টানা শেষ করে ঠোঁটে তর্জনি ছুঁলো। অর্থাৎ, চুপ থাকতে হবে। সেটাও বলল, 'পিয়ালের ব্যাপারে কোনো কথা না। ধরো, অনেক কিছুই আমার আগে মনে হওয়া। কেননা, আগেও ছেলেটা এমন জটিলতায় পড়ল। এবার আর তার জের টানতে হয় কি না।' বলে, আবার ঠোঁটে আঙুল দরিয়ার।
লক ঘুরিয়ে দরিয়া আগে লায়লার রুমে ঢুকে গেল। আমি দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরিয়া না ডাকলে ঢোকা ঠিক হবে না। কিন্তু তার আগেই লায়লা জানালেন, 'আসেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন?'
'আরে, এসব ওনার ব্রিটিশ অ্যাটিকেট। মেয়েদের রুমে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।' দরিয়া বলতে বলতে হাসল।
রুমের এক পাশে টি-টেবিলের ওপরে কয়েকটি গেলাস, পানির বোতল ও আইস বক্স। দেখতে দেখতে ভাবছি, আইচ বক্সটা কি লায়লা নিয়ে এসেছেন না এখানকার। পাশে বরফ তোলার ফর্ক ইত্যাদি সবই আছে। আসল বস্তুই তো নেই। দরিয়া বলল, 'লিটন ভাই টেক্সট করেছেন, এসে যাবেন, চাইলে আমরা শুরু করতে পারি।' দরিয়া আমার কাছে জানতে চাইল। লায়লার নির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য নেই। তিনিই লিটনকে সবচেয়ে ভালো জানেন। অতএব আমাদের কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে, আমার যা ইচ্ছা, তাই তার সিদ্ধান্ত। দরিয়া আমার দিকে চাইল। আমিও দরিয়ার দিকে। দরিয়া চোখে হাসি নিয়ে জানতে চাইল যেন, 'কী?'
'আগে তার আগমন ঘটুক, তারপর না-হয়।'
লায়লা জানালেন, 'না-না। সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা বরং খুব স্লো মুডে শুরু করি।'
'আমি একটু হেসে দুহাত ছুড়ে বললাম, 'তথাস্তু।'
দরিয়ার মন্তব্য, 'ইস্ কী খুশি। এই জিনিসের কথা শুনলে চোখেমুখে হাসি যেন আর ধরে না! একেবারে ছলকে পড়ে।'
'বোঝই যখন, বলে আর লজ্জা দেবে না মাননীয়া!' হেসে উত্তর দিয়ে লায়লার কাছে জানতে চাইলাম, 'কী বলেন, লায়লা?'
আয়াত বিছানার ওপরে একটা ছবির বইয়ের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে লায়লার কাছে জানতে চাইল, 'আম্মু, তাহলে বাবা কখন আসবে?'
'আসবে, আয়াত।'
'তুমি বললে, তোমার গেলাস সাজানোর সময়ে বাবা চলে আসবে।' ওর বর্ণনা শুনে আমরা হাসলাম।
'ইয়েস, বাবা। তাই হি উইল কাম ইমিডিয়েটলি।'
'ওকে। বাবাকে বলো, অ্যাম অলওয়েজ উইথ বুকস্ নট উইথ মোবাইল লাইক আপু।'
'ওকে, গুড বয়।'
শুনেছি, ছোটরা বড়দের খেয়াল করে। তাদের কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে নিজের প্রয়োজনটা খুঁজে নিতে চায়। জানতাম, এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আগে খুব দেখিনি অথবা দেখার সুযোগও হয়নি। আয়াতের থেকে লায়লার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বুদ্ধিমান ছেলে।'
'বুদ্ধিমান না, বেশি চালাক।'
দরিয়া বলল, 'এভাবে বোলো না, আয়াত খুব ভালো ছেলে।'
আমাদের এই কথোপকথনও আয়াত শুনে ফেলেছে। বলল, 'আই এম নট বেশি চালাক।'
আমরা আয়াতের বলার ধরনে হাসলাম। লায়লা বললেন, 'কী পাকা ছেলে তুই! বাপ আসছে তাতেই তোর কথায় পোয়া বারো।'
আয়াত তার মায়ের এ কথার কিছুই বোঝেনি। এদিকে আমি হাত নেড়ে দরিয়াকে ইঙ্গিত করলাম শুরু করার জন্য। কিন্তু ইঙ্গিত যে করলাম, দ্রব্য কোথায়। বুঝতে পারছি, তা আছে, কিন্তু দরিয়াকে না বলবে বেরটা করবে কে। যদি লায়লার স্বামী লিটনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যখন তা করার প্রয়োজন নেই। তাহলে শুরু করাই উত্তম। দরিয়া লায়লাকে বলল, 'এই এদিকে আর একজন একেবারে উতলা নয়, লায়লা।'
লায়লা হাসলেন। এই রুমের আলমারিটা বড়, দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে সামনে। দেয়ালের গা ঘেঁষে। লায়লা আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে সেদিকে গেলেন। আলমারি খুলে, দুই পাল্লার ভেতরে নিজেকে সেঁধিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন, এরপর পলিথিন-জাতীয় ব্যাগ পত্তরের শব্দ। দরিয়া আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। সুযোগ থাকলে বলেই বসত, 'এই-যে এখন আর মুখের হাসি সরছেই না।' বললও, 'একি হাসি।' আমি তাকালাম দরিয়ার দিকে। লায়লা ততক্ষণে টেবিলের কাছে নিয়ে এসেছেন একটা কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ। সেখান থেকে বের করলেন একটি খুব ছোট সিভার্স রিগালের বোতল। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা পকেটে পুরুন।' তারপর একই গড়নের বড় বোতলটা। সত্যি, এবার আমার চোখে হাসি ছলকে উঠতেই পারত তাই স্বাভাবিক। কত দিন বাদে এই জিনিস। শুনেছি এ বস্তু অতি দুর্লভ, চাইলে তো মেলেই না, ট্যাঁকে কড়ি নিয়ে খুঁজলেও সব সময়ে পাওয়াও যায় না। লায়লা ফরসা বাহুতে ঝুলতে ঝুলতে সামনের সেন্টার টেবিলটার মাঝখানে একেবারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। বড় বোতলটার দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণের ছোট বোতল আমার পকেটে। লায়লা বোতলটা টেবিলে রাখতে রাখতে জানতে চাইলেন, 'হবে না, চারজনের? সঙ্গে সঙ্গে দরিয়ার মন্তব্য, 'বয়ে যাবে। কী যাবে না।?' এটা আমার উদ্দেশ্যে তার ট্যাস। ওদিকে লায়লার জবাব, 'নিশ্চয়ই লিটনের কাছে আছে। যার গাড়িতে আসছে, তিনি দিয়ে দেবেন।'
দরিয়া বলল, 'আর বোলো না। তাহলে মানুষজন কেউ কেউ এখনই দেখবা সুইমিং কস্টিউম পরে রেডি।'
'কেন, কাল লাগবে না? কাল আছেন তো?' আমার কাছে জানতে

চাইলেন লায়লা।
'আছি আবার নাই। বলতে পারছি না কিছুই। কুলাউড়া থেকে ডাক এলে চলেও যেতে পারি।'
'দেখছি লায়লা, একবারে বাংলা সিনেমার গানের ভাষায় কথা বলে। খেয়াল করিসনি?'
'বলুক। আচ্ছা তুমি ওনার সাথে এত লাগো কেন?'
'কেন যে লাগি তা যদি জানতাম।' আমার দিকে চোখ তুলে বলল, 'কী আপনি জানেন কেন এত লাগি!'
আমি লায়লার হাত খেয়াল করছি। বোতলাটা খুলে প্রতিটি গেলাসে তিনি ঢাললেন একেবারে অনায়াস দক্ষতায়, ঘাড়টা নুইয়ে তাকিয়েও দেখলেন না। কিন্তু দুজনার প্রায় মাঝখানে বসে, জানালার দিকে চেয়ারে বসে আমার পক্ষে দেখা সহজ, প্রতিটিতেই একেবারে সমান ঢেলেছেন লায়লা। তার মানে এ কাজে তিনি অভ্যস্ত। আগ্রহও আছে। অভিজ্ঞতা তো বটেই। চোখ সরিয়ে লায়লাকে বললাম, 'এখানেই তো বিষয়টা ভিন্ন, লায়লা! সেটা যখন কেউ জানে তখন আর ওই বোধটা থাকে না। আসলে দরিয়া আমাকে খুব ভালোও বাসে।'
'কইছে। ওনাকে খুব ভালোও বাসে, না ছাই। আমার বয়ে গেছে এমন মানুষকে ভালোবাসতে।'
'তাহলে এত লাগই-বা কেন,' লায়লা আমার পক্ষ থেকে দরিয়ার কাছে জানতে চাইলেন। আগে আমাকে এর পরে দরিয়াকে গেলাস এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আর এত ডাকই-বা কেন?'
'ডাকব না? লোকটা একলা থাকে নিজেকে নিয়ে। ভাবি ডেকে দেখি কেমন আছে কী করছে।'
আমি গলা ছড়িয়ে হাসলাম। মাঝখানে লায়লাও হাসতে হাসতে হাতের গেলাস এগিয়ে বললেন, 'চিয়ার্স।'
দরিয়া বলল, 'তা এমন অট্টহাসির কী হলো তাই তো বুঝলাম না!' বলে, ঠোঁট ছুঁয়েছে গেলাসে।

৭

লিটন আসার পরেই আমাদের আসরের পরিবেশ একেবারে বদলে গিয়েছে। সেটা যে যাবে আমি জানতাম, আর তাই স্বাভাবিক।
প্রায় দিন চারেক পরে জারা আর আয়াত বাবাকে পেয়েছে। ওদিকে তার অপেক্ষায় লায়লা আর দরিয়াও অপেক্ষমাণ ছিল। লিটন মানুষ হিসেবেও ব্যস্ত। সেই মতিঝিলে অফিস। সেখান থেকে এয়ারপোর্ট। সিলেট বিমানবন্দর থেকে আবার উলটো পথে শ্রীমঙ্গলের দিকে এতটা পথ এসেছেন। তিনি আসায় আমাদের আসরে সাময়িক বিরতি দিতে হয়েছে। যদিও লিটন এ রুমে ঢুকে, আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের রুমে যেতে যেতে বললেন, 'আপনারা চালু রাখুন। আমি জাস্ট একটা শাওয়ার নিয়ে এসেই জয়েন করছি।'
জারা আগে থেকেই লিটনের জন্য বরাদ্দ রুমে ছিল। আয়াত বাপের সঙ্গে সেখানে গেছে। একটু পরে গেছেন লায়লা।
আমি দরিয়াকে বললাম, 'উনি আমাদের বয়েসি হবেন?'
'না, তোমার চেয়ে ছোট হবেন। আমার দুই ইয়ার সিনিয়র।' দরিয়া প্লেট থেকে কাজু বাদাম তুলে নিতে নিতে বলল।
'আমি ভেবেছি আর একটু বয়েসি। যেভাবে বলছিলে তুমি! ভেবেছিলাম একটু ভারিক্কি চালের মানুষ।'
'আরে না। লিটনভাই খুবই জলি মাইন্ডের মানুষ। ভাবটাব তেমন নেই। আর বেশ মিশুক। বনেদি তো তাই ভাবটা কম।'
'বাড়ি কোথায়?'
'এত কী দরকার?'
'না। কিন্তু দেখো এত পথ এসেছেন, ক্লান্তি নেই।'
'অমন টয়োটায় এলে তোমারও ক্লান্তি থাকত না। ঢাকায় তো বিএমডব্লিউ চালায় উনি।'
'ওহ। তাহলে এখানে কেন গ্র্যান্ড সুলতানে উঠলেই তো পারতেন।'
'সেই কেন দিয়ে, কী কাজ তোমার বলো। খাও। কেন নভেম খারাপ? গ্র্যান্ড সুলতান তো হোটেল, নভেম ইজ ইকো-রিসোর্ট।'
'আলবত ইকো-রিসোর্ট। আর গ্র্যান্ড সুলতান কেমন কী কিছুই তো আমি জানি না। সবই আমার শোনা। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া।'
'দেখতে হবে না তোমার, কম কিছু দেখো নাই।'
দরজার দিকে দেখে বললাম, 'আচ্ছা জাঈদ যে এসেছিলেন এটা লিটন জানেন।'
'লায়লার কাছে জানতে চাইনি। জানেন নিশ্চয়ই, না হলে জারার সঙ্গে গল্প করতে করতে জাঈদের সঙ্গে দাবা খেলার বিষয়টা তো জেনে যাবেন। ফলে জাঈদের কথা লিটন ভাইয়ের না জানার কিছু নেই। তবে তুমি যেভাবে, যা জানার কথা বলছ, তা জানেন না নিশ্চয়ই। লায়লার এলাকার বাল্যবন্ধু, ওখানকার অনেকের সঙ্গে লায়লা আর লিটন ভাইয়ের যোগাযোগ আছে।' কথাগুলো একটু নিচু গলায় দরজার দিকে তাকিয়ে দরিয়া বলল যেন লায়লা বা অন্য কেউ এলেই গলার স্বর এই মাত্রায় রেখে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলবে।
লায়লা ঢুকেই বলল, 'জারা-আয়াত একটু উত্তেজিত লিটনকে পেয়ে। ও আসছে।'
'তুমি থাকলা না, যদি কিছু লাগে?'
'যা লাগবে, তা এখানে। লিটন এখনই আসবে। আমরা চালাই।'
'আচ্ছা,' দরিয়াকে বললাম, 'এখন পাকোড়াগুলো দিতে বলো।'
'হু, দেখছ ভুলে গেছি।' দরিয়া বলতে বলতে ফোনের কাছে গেল, সেখান থেকে তাকাল লায়লার দিকে, 'বুঝলে, যার যাতে জমে, তার তা মনে থাকে। আমার মতন এমেচারের ওসব কি মনে থাকে?'
'আমি অবশ্য তোমায় মনে করিয়ে দিতাম।' লায়লা আশ্বস্ত করলেন।
'দেখেছেন তো লায়লা, ভালো-মন্দ সবটাতেই আমার দোষ।' আমি লায়লাকে বললাম। তিনি মুখ টিপে হাসলেন শুধু। একবার চাইলেন আমার দিকে। তারপর নিজের গেলাসটা হাতে নিতে নিতে দরিয়ার দিকে। সেখানে হাসিটা শেষ হতে হতে খানিকটা কৌতূহলেও মিলিয়ে গেল যেন। বার্তাটা এই– ও যে কেন এমন করে ওই জানে। আর-একটা হতে পারে– আপনাদের এই কথার খুনসুটিটা বেশ, এর ভেতরে আর আমায় কেন টানছেন! অথচ নিজের গেলাসটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে লায়লা ব্যাখ্যা দিলেন একেবারেই ভিন্ন, 'তবু এই করে, যা করে তা তো আপনার সঙ্গেই। দরিয়া আপার মতন অমন গম্ভীর মানুষ। এমন যে করতে পারে কারও সঙ্গে দেখলেও বেশ লাগে। আই এনজয় ইট।'
'হয়েছে লায়লা, তোমার দেখি লিটন ভাই আসাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ঢালো আমাদের গেলাসে।'
'না না, তা বাড়েনি।' লায়লা তার গেলাসটা টেবিলে রেখে বোতলটা হাতে নিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে একবার চেয়ে বললেন, 'কেন, তোমায় দেখি না আমি ওনাকে দেখলে তোমার যেমন হয়। কথা ফোটে। অন্য কারও সামনে তো তুমি অন্য মানুষ।' তার দরিয়ার গেলাসে ঢালা শেষ। আমার গেলাসের ওপরে বোতলের মুখ। কথা বলতে বলতে অনায়াসে ঢাললেন লায়লা। এবারও দুজনের পরিমাণে কোনো তারতম্য নেই।
দরিয়া বলল, 'আহা কী সার্টিফিকেট। লেখা থাকলে তো বাঁধিয়ে রাখা যেত, তাই না? কী বলেন?'
দরিয়া আপনি সম্বোধনে আমাকে কথাটা বলা শেষ হওয়ামাত্র আমার দিকে চেয়ে, 'নিন।' বলে লায়লা আবার হাসি ছড়িয়ে দিলেন, 'আচ্ছা, ফিরে লিখে দেব। তখন বাঁধিয়ে রেখো।'
'বুঝলেন?' এর পরে আমার উদ্দেশ্যে লায়লা, 'সত্যি বলেছি, দরিয়াপু যাই বলুক। আপনি তার কাছে একেবারে ভিন্ন একজন মানুষ। যাকে পেলে যেন ও জীবনের সব দুঃখ ভুলে যায়।'
'ওই লায়লা, কী সব বলছিস? দুঃখ ভোলার আবার কী হলো? আমার জীবনে আবার দুঃখটুঃখ কী? বল, ওকে পেলে বাড়তি আনন্দ হয়,' দরিয়ার গলার স্বর এ সময়ে একেবারেই ভিন্ন খাঁজে। মনে হচ্ছে অন্য কেউ বলছে কথাগুলো, 'অথবা আনন্দটা চাপা রাখতে পারি না, তাই তোর অমন মনে হয়। নাকি?' এরপর স্বগতোক্তির মতো, গেলাসটা মুখের কাছে টেনে নিতে নিতে সে বলল, 'আমার কোনো দুঃখ নেই তো, বিন্দাস আছি–' গেলাস নামিয়ে তাকাল আমার দিকে, 'কী, এই চোখে আছে কোনো দুঃখ?'
লায়লা দরিয়ার এমন গলায় আমাকে আহ্বান জাগানোয় একটু হাসল। হাসিটা মিলিয়েও গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যেন এটা জানানো, এইটুকু গলায় ঢালি। দরিয়াকে ধরেছে। আমি অবশ্য এর উত্তরে সেভাবে হাসতে পারলাম না। কিছুটা হলেও তো জানি ওকে, হয়তো লায়লার হাসি মিলিয়ে যাওয়াতেও ছিল সেকথা। আমার

মনে হলো প্রসঙ্গটা সরে গেলে হয়। লিটন কেন আসছেন না? এলে গোটা আলোচনাই বদলে যেত। চাইলে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনায় কথা ঘুরিয়েও দেওয়া যেত। ব্যক্তিগত বিষয়ে ঢুকলে সেখান থেকে বের হওয়া মুশকিল। ওই ঘোরে আতিপাতি ঘুরে মরতে হয়। দেয়ালে মাথা কুটতে হয়। নিজেকে ছবকও দিতে হয়। যাকে নিয়ে বিষয়টা তার জন্য কষ্ট হয়। হয়তো কখনো কখনো হয় করুণাও। কিন্তু কাউকে করুণা করা তো কোনো কাজের কথা নয়। বিষয়টা ভালোও নয়। যার বিষয়ে তখন কথায়, সে তো আমার কাছে করুণা চায়নি। কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে তাই জমিয়ে নিয়ে বেশ বসে আছি। আর তাকে সেই চোখ দেখছি। হয়তো দেখতে চাইছি না, কিন্তু অবচেতনে তাই ঘটে চলেছে আমার ভেতরে আমার অজানিতে।

'না-না, কোনো দুঃখ নেই,' দরিয়াকে বললাম, 'আপনাকে পাওয়ার পরে সব উবে গেছে যেটুকু যা ছিল। এখন শুধু হাসি আর আনন্দ। একেবারে আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!'

লায়লা শব্দ করে হাসল, 'ভালোই বলেছেন। আনন্দ আর আনন্দ–' বলতে বলতে লায়লার হাসিমাখা চোখ নিভে গেল। আবার মুহূর্তে নিজেকে ফিরেও আনলেন। হয়তো আমার কাছে মুহূর্তের দুর্বলতায় ধরা পড়ার ভয়ে, কিংবা এখনই দরিয়া যদি তাকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়, কিংবা যদি আমিই তাকে জিজ্ঞেস করে বসি। লায়লার কথার শেষাংশ হাসি মিলিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, 'একটু আনন্দই জীবনের সব।'

কিন্তু আমার ভালো বলা আবার লায়লার প্রশংসাকে উলটে দিতে যেন দরিয়া বলল, 'কী আর নিজে বলেছে? বলেছে তো রবীন্দ্রনাথের গান। ওর তো বাংলা সিনেমার থেকে বলার কথা। সব সময়ে তাই বলে। ওটাই ওর সঙ্গে ভালো যায়। দেখিস না মাঝে মাঝে একটা সৌমিত্র-সৌমিত্র ভাব নেয়। না-না, ফারুক-ফারুক।'

লায়লা গলা ছড়িয়ে হাসল। সমস্ত পরিবেশটা হালকা হয়ে গেল। আমার দুপাশের দুজন তাতে যেন নিজেদের আড়ালে নিতে পারল এবং একই সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকলেন লিটন। তার বাঁ হাতে আয়াতের হাত ধরা পেছনে জারা। ধীরে পায়ে আমার ডান দিকের ফাঁকা সোফাটায় বসলেন। আয়াত পাশে দাঁড়ানো। জারা এসে কী একটা ওর কানে কানে বলে ওকে নিয়ে চলে গেল। লিটন বললেন, 'ডোন্ট লক ইউর ডোরলক। জারা বলল, 'ওকে।' এর পরে আমাদের রুমের দরজা আটকানোর শব্দ। তারপর কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা।

লিটন আসতে গোটা পরিবেশটাই খুব স্বাভাবিকভাবে একটু পালটে গেছে। খানিক ঝলমলেও। ওর গায়ে দামি পারফিউমের গন্ধ। পাতলা জিনসের ওপরে লালচে টি-শার্ট। সম্ভবত এক্সারসাইজ করেন লিটন। শরীরের গঠন তাই প্রকাশ করছে। একটু হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। শরীরের মধ্য প্রদেশ একেবারে নির্মেদ, বাহুগুলো বেশ শক্ত। এ সময়ে দরজায় নক। লিটন উঠতে চাইলে লায়লা এগোলেন, 'পাকোড়া এসেছে।'

লিটন আমার উদ্দেশে বললেন, 'এখন এইসব এতকিছু। ডিনারের তো বারোটা বাজবে, নাকি কী বলেন?'

দরিয়া জানাল, 'ওই একটু। ডিনার কটায় দিতে বলব। আপনি তো আর্লি খান।'

'আজ কোনো আর্লিটার্লি নেই। ওনার অনারে যখন খাবেন আপনারা।' বলে, বোতল থেকে একটা বেশ বড় পেগ ঢেলে নিয়ে বললেন, 'আজ একদিন নিয়মকানুন না-হয় না-ই মানলাম। আমাদের স্কুলের সময়ে সেবার ওয়েস্টার্ন সিরিজে একটা শব্দ থাকত না, আউট ল'। সেই আউট ল'।'

লায়লা লিটনের ভুল ভাঙালেন, 'সেই আউট ল' অন্য জিনিস। আর তোমার আউট ল' অন্য। তবে যতই আউট ল' হও, ওষুধটা মনে করে খেয়ো।'

'আরে আউট ল' অডিট ল'-র ফারাক আমি জানি।'

'জানো, সেটা আমিও জানি। ওষুধের কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। গেলাস হাতে থাকলে তুমি ধীরে ধীরে এমনিতেই আউট ল' হয়ে যাও।'

লিটন শব্দ করে হাসলেন। দরিয়া (সম্ভবত) লায়লার দায়িত্বপনা খেয়াল করল চোখ সামান্য বড় করে। চোখ জোড়া ওর এমনিতেই বড় তা কোনো কারণে আর-একটু বড় হলে দেখতে বেশ লাগে। এ কথাটা ওকে বলব বলে ভাবলাম। এমন অনেক কিছুই তো বলার জন্য অনেক সময়েই ভাবি, পরে আর তা হয়তো মনেও থাকে না। কিন্তু দরিয়াকে দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম একেবারেই অন্য কথা। দরিয়ার চোখ থেকে চোখও সরিয়ে নিলাম। তাকালাম নিজের গেলাসে। সোনালি তরল তখন নিচের দিকে। হাতের মুঠিরও নিচে। সেখানে তাকিয়ে যেন এই কথাবার্তার থেকে আমি অনেকটা সরেও গেছি। লায়লা এখন আবার ভিন্ন মানুষ। একজন মানুষ আসরে ঢুকতেই আমার কিংবা দরিয়ার সামান্য হলেও তো পরিবর্তন হয়েছে। আমি একটু আড়ষ্টও হয়েছি। জানি এ কেটে যাবে। তবু অপরিচিত লিটন, লায়লাও তো তাই। এই ছব্বিশ-সাতাশ ঘণ্টায় লায়লার সঙ্গে যদিও-বা কিছু আলাপ-আড্ডা হয়েছে, এখন আর নেহায়েত অপরিচিত বলা যাচ্ছে না। লিটন তো এখনো অপরিচিতই। দরিয়ার মুখে তার সম্পর্কে যা শুনেছি, তার সঙ্গে সামনের মানুষটাকে মিলিয়ে নিতে তো কিছু সময়ও লাগবে। কিন্তু যে লায়লাকে চিনেছি, এমনকি খানিকটা জেনেওছি, সেই লায়লা লিটনের সামনে খানিকটা হলেও ভিন্ন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। না, আড়ষ্ট নয়, এমনকি আমাদের গেলাসে বোতল থেকে ঢেলেও দিয়েছেন একই দক্ষতা ও আন্তরিকতায়, ঢেলে দিয়েছেন লিটনের গেলাসেও, কিন্তু কোথাও যেন নিজেকে এক অদৃশ্য অর্গলে তিনি বেঁধে নিয়েছেন। লিটনের সামনেই তার এটা হয়, নাকি কারণবারি গলায় পড়লে ধীরে ধীরে তার এটা বাড়ে, তা বুঝতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু তাতেও যে খুব বুঝতে পারব তাও হয়তো নয়।

দরিয়াও আমাকে খেয়াল করছে। ওর বসার জায়গা থেকে আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখা সম্ভব। একইভাবে লিটনের জন্যও তাই। আমি আর লায়লা মুখোমুখি। আমি দরিয়ার দিকে ঘাড় ঘোরালে লায়লা অর্ধেক থাকেন, আবার লিটনের দিকে তাকালে একইভাবে লায়লা অর্ধেক থাকেন কিন্তু দরিয়া থাকে না চোখে। দরিয়া যে আমার এই পর্যবেক্ষণ খেয়াল করছে, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি সচেতনে নয়, এমনিতেই লায়লার পরিবর্তনটা বুঝতে পেরে ভাবলাম, লিটন খুব ডমিনেটিং নাকি লায়লা নির্দিষ্ট কোনো কারণে মিইয়ে আছেন, তাতে কোনো আনুগত্য আছে কি? হতে পারে অন্যের সামনে লিটনের কাছে এটিই তার প্রকাশ্য ধরন।

লায়লা আমাকে বলল, 'আপনার গেলাসটা এভাবে কোলে নিয়ে বসেই থাকবেন? এতে কিন্তু যে দরিয়া আপুর বদনামের আর শেষ থাকবে না।'

লায়লা রসিক। লিটন এ কথায় প্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি। লায়লা দরিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ডোন্ট অরি লায়লা, রজনী এখন বাকি। ওস্তাদরা শেষ রাতে মার দেন।'

ছদ্মবিস্ময়ে জানতে চাইলাম, 'কী এমন করলাম আবার ওস্তাদি?'

'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।' লিটনও মুখটা একটুখানি হাঁ করে যেন ভিন্ন দেশি কোনো ভাষা শুনছেন এমনভাবে জানতে চাইলেন।

'তোমাকে বুঝতে হবে না, দেখলেই চলবে।' আমার দিকে আঙুল তুলে জানালেন, 'ওনার গেলাস তো হাতেই ধরা, সে কথা বললে দরিয়া আপু বলছে যে উনি অনেকক্ষণ চালাতে পারবেন।'

'সে আমি দেখেই বুঝেছি, আকেলমামাকে লিয়ে ইশারাই কাফি।'

'কী করে বুঝলেন, লিটন ভাই, দেখি আমার সঙ্গে মেলে কি না?

'আছে আছে। রসিক জানে রসের খোঁজ। ওই যে অনেক পানি মিশিয়ে যখন ধীরে ধীরে খান– তখনই বুঝতে হবে উনি লম্বা রেসের ঘোড়া।'

লিটনকে একটু ধরেছে নাকি। এই দুই পেগেই? যে লোক শুরুতে মোটামুটি প্রতিটি বাক্যেই অল্প বিস্তর ইংরেজি শব্দ বললেন, তিনি রসিক রস, লম্বা রেসের ঘোড়া– এসব বলছেন। এমনকি বাংলা বাক্যেই বলছেন সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে। সে বাক্যে কোথাও অনভ্যাসও নেই তার। ইংরেজি শব্দ কমে আসছে আর উর্দু প্রবাদ– সব মিলে দরিয়ার দিকে একবার দেখে নিয়ে, আমি কিছুক্ষণ লিটনের দিকে তাকালাম। লায়লা তা খেয়াল করলেন।

'সবাই যার যার গেলাস রাখো,' লায়লার নির্দেশ, 'এটা শেষ হলে বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে দেব। বুঝতে পারছি, আমাদের যখন শেষ হবে

ততক্ষণে ওরা খিদেয় কাতর হয়ে যাবে।'
লায়লা এ কথা বলছে– শুনেই একটু যেন কানে লাগল আমার। দরিয়া মোবাইলটা হাতে নিল, সেখান থেকে কানে, তাই ওর চোখ আর দেখা হয়নি। লিটনের মুখে বেশ এক প্রসন্ন হাসি, হয়তো লায়লার এই তৎপরতায়। কিন্তু লায়লার কথাটা আমার কানে লাগার কারণ তো একেবারেই আলাদা। গতকাল সন্ধ্যায় যে লায়লাকে দেখেছি, এমনকি আজ সকালেও, আরও একটু বাড়িয়ে বললে দুপুরেও– সেই লায়লা সন্তানদের ঠিকঠাক সময়ে খাইয়ে (এমনকি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার কথাটা) দেওয়ার কথাটা এমন তৎপরতার সঙ্গে বলছেন! এটা কি লিটন আসার কারণে নাকি তার মাথায় জাঈদ আর একেবারে নেই। এই রুমটা তো লায়লার, কিন্তু এখানে একবারও সে মোবাইলে হাত দেয়নি। অন্তত এই পর্যন্ত। তাহলে সারাটা সকাল ও দুপুর সে চোখের সামনে মোবাইল ফোনটা ধরে রেখে কি লিটনের সঙ্গেই মেসেজ চালাচালি করেছে। না, তা নয়। বরং লিটনের অবস্থাজনিত বিষয়ে বার দুয়েক খোঁজ নিয়েছে দরিয়া। জারাও হয়তো। হয়তো এই জন্য একবার মনে হয়েছে ও মায়ের ফোন থেকে ফোন করেছে। কিন্তু লায়লা! কী জানি, স্বামী-স্ত্রীর বিষয়, আমায় দেখিয়ে তো তারা কথা বলবে না। কিন্তু একটু বদলে যাওয়া লায়লার একই সঙ্গে তৎপরও। হতে পারে, স্বামীর সামনে, স্বামীর বিত্ত-বৈভব অভ্যাসের অংশ করে নিতে এই তৎপরতার প্রয়োজন হয়। এমনকি স্বামীর সামনে তৎপরতার মাঝখানে ম্রিয়মাণতাও। নাকি ম্রিয়মাণতায় একপ্রকার তৎপর থাকতে হয়। তাই স্বাভাবিক। যা তার কাছে স্বাভাবিক তা খুঁচিয়ে অস্বাভাবিক লাগাতে যাব কেন?
দরিয়া ফোনটা কানের কাছে নিতে নিতে লায়লাকে বলল, 'ওদের খাবার নয়শ একে দিতে বলেছি, আমাদেরটা আরও ঘণ্টাখানেক পরে এখানেই দেবে।'
'কখন বললে?'
'ওই রুম থেকে অর্ডার দেওয়ার সময় বলেই এসেছি। ওরা এই রুমের ইন্টারকমে নক করবে।'
'এখন তবে কাকে ফোন করছ?'
'আছে। ধরছে না।' এই 'আছে'টা দরিয়া এমনভাবে বলল যে এরপরে আর জানতে চাওয়া যায় না, আছেটা কে?
দরিয়া একটু বিরক্ত হয়ে ফোনটা টেবিলের ওপরে রাখল। এরপরে বাঁ হাতের গেলাসটা সেই বিরক্তিমাখানো কিছুটা চিন্তিত হয়ে এমনভাবে তুলে মুখে ধরে রাখল একটু বেশি সময়ে। গেলাস নামাতে নামাতে কিছু একটা বিড়বিড়ানি।
এর ভেতরে আমাকে লিটনের প্রশ্ন, 'আপনার কেমন লাগছে?'
দরিয়ার বিরক্তি কেটে গেল, 'ওনার এই জিনিস থাকলেই ভালো লাগে। বাকি সময়ে সব বোরিং। কিশোর কুমারের গান হলে ঠিক, বাকি সময়ে বোরিং। কাছে পিঠে ফকিরানি-বাউলানি থাকলে ভালো থাকে, বাকি সময়ে বোরিং আর কথায় কথায় বাংলা সিনেমার ডায়ালগ, বাকি সব বোরিং।'
দরিয়ার কথায় লায়লা ও লিটন হাসলেন। আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু-একটা তো বলা উচিত। একটু নিচু গলায় বললাম, 'এই যে পাশে তুমি, তুমি তবে কী? বোরিং তো লাগেনি একটুও। বাউলানি না ফকিরানি?'
'ও হতে পারলে তো কাজই হতো এই জীবনে। আপনাকে তো বলেইছি– বাউলানির সাদা শাড়ি আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর পোশাক, ও পরার শখ আমার ছোটবেলা থেকে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে ছোটবেলায় আসত একজন। তার আঁচল জড়িয়ে ধরতাম। সেই গন্ধ এখনো আমার নাকে। এক মুঠ চালে জীবন। এর চেয়ে ভালো কিছু আছে?' না-থামালে দরিয়া বলেই চলত, হয়তো একটু আগে আসা ফোনটার বিরক্তি কাটাতে এইভাবে বলে গেল, 'দারুণ স্মৃতি।' এই যে আমারে বাউলানি ভেবে তোমার বোরিং না লেগে থাকে। এই ভেবেই তো আমার জীবন ধন্য।'
পরিবেশটা সামান্য গম্ভীর নাকি সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওকে থামাতে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সুযোগের আগে লায়লা বলল, 'আমাদের এলাকায় দেখেছি দুই-একজন, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন– দেখলেই মনে হয়।'
লিটনকে মনে হলো, তিনি এই আলাপ থেকে খানিকটা দূরে। অথবা একটু যেন বিস্ময়ে দরিয়াকে দেখছেন। এই দরিয়াকে তিনি দেখেননি। কিন্তু এদের যা পারিবারিক সম্পর্ক তাতে না-চেনারও কথা তো নয়। হতে পারে, এই দরিয়াকে তিনি আগে দেখেননি। জানেন না তার এই সাধের কথা। আমিও তো জানতাম না। এমনকি ওর মুখে ওদের এলাকার বাউল-ফকিরদের কথা শুনেছি, কিন্তু সামান্য মদিরায় আক্রান্ত দরিয়া যে নিজের অন্তর্গত কোনো-একটা বয়সে লুকানো সাধ এমন অর্গলহীনভাবে হড়হড় করে বলে দেবে, তা কি আমার জানা ছিল? ওই কথা কটি বলার সময়ে ওকে এমন লাগল যেন আগে দেখিনি! ওই কথায় ও আমাকে তুমি সম্বোধন করেছে, সংশোধন করেনি তা, আমার কানেও আটকায়নি, জানি না বাকি দুজনের কানে আটকেছে কি না।
লিটন হঠাৎ গেলাসটা গলায় উলটে দিলেন। আমি সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত। বললেন, 'আর একটা করে দিয়ে তারপর যাও, লায়লা।'
'একটু ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে না, তুমি!'
'এখন সবাই ফাস্ট হব। তুমি এসে হইয়ো ফাস্ট।'
স্বামীর আদেশ। আমাদের গেলাসের দিকে তাকালেন। লিটন উঠে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের সিগারেট বের করলাম পাঞ্জাবির বাঁ পকেট থেকে। কিন্তু লিটনের বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে নিজের প্যাকেটটা বাঁ হাতে আলতো রাখলাম সামনের টেবিলের ওপরে। লিটন লাইটার জ্বালানোর ফাঁকে দরিয়া টেবিলের ওপরের একটা সিগারেট নিয়ে নিজের ঠোঁটে গুঁজল। দৃশ্যটা নিঃসন্দেহে দারুণ। দরিয়া সিগারেট টানবে সেটা নয়, যেভাবে সে সিগারেটটা ঠোঁটে গুঁজে তাকাল আমাদের দিকে যেন অভ্যস্ত। লিটন জ্বালানো লাইটার জ্বালিয়ে 'লেডিজ ফাস্ট' বলে দরিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। লায়লা একটু হেসে লিটনের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছার প্রকাশ করলেন, 'আমি বাচ্চাদের ডিনার দিয়ে এসে ধরাব। এই দুটো সিগারেটের কোনটা কম কড়া?' লিটন সম্মতি জানানোর আগেই বললাম, 'অবশ্যই ধরাবেন। দেখব আপনি ধরাতে পারেন না দরিয়ার মতন ধরিয়ে দিতে হয়?'
দরিয়া সিগারেটে একটান দিয়ে সেটা তর্জনি ও বৃদ্ধায় খাড়া করে চোখে সামনে এনে দেখে ধোঁয়া ছাড়ল এই বলতে বলতে, 'ইহ, আমি যেন সিগারেট জ্বালাতে পারি না? না খাই, জ্বালাতে পারি– ওই যারা বিয়ে করেনি কিন্তু বরযাত্রী গেছে, তাদের মতন আরকি।' এরপর লায়লাকে জানাল, 'এটা কম কড়া। এই সাদাটা। ওই লালটা এর চেয়ে বেশি কড়া।'
দরিয়ার কথায় আমার মুখে হাসি ফুটল। সঙ্গে মনে পড়ল এক ডাক্তারের উক্তি। সিগারেট একটু কমিয়ে ওই রেগুলার বেনসনের বদলে যখন লাইট অর্থাৎ লালটার বদলে সাদাটা খাওয়ার সংবাদ দিয়ে বললাম, 'এখন কম টানি আর লাইটটা খাই।' তিনি একটা প্রায় অবুঝ বালককে বোঝাচ্ছেন এমন হাসি হেসে একটু ধমক মেশানো স্বরে বলেছিলেন, 'বিষের আবার ভালো মন্দ কী? বলেন তো?'
এই কথাটা হুবহু বলতেই দরিয়া বলল, 'ঠিকই তো লায়লা, বলো বিষের আবার ভালো মন্দ কী!' এরপরে সরাসরি আমার উদ্দেশ্যে, 'এটা তা, কিশোর কুমারের গানের একটা লাইনও বলা হয়নি ডাক্তারকে? এর পরের লাইন, 'যখন আমি মরতে বসেছি' তোমার বেসুরো গলায় শুনিয়ে দিতে পারতে। তাহলে ডাক্তার মেনে নিতেন যে করতে চায় তার আর মানা করে কী লাভ!'
লিটন ছড়িয়ে হাসলেন, 'ভালো বলেছেন। কিন্তু মাই ডিয়ার আপু, সিগারেট খেলে কেউ মরে না। এসব অ্যান্টি টোব্যাকো ক্যাম্পেইন।'
'হইচে, থাক। সুরির সাক্ষী মাতাল। এই নিউজ লিটনভাই আপনাকে দিয়েছে, গুগল সবজান্তা?'
'না-না। এটা সত্যি। সিগারেট খুব ক্ষতিকারক, তার মানে এই নয় যে সিগারেট খেলে মানুষ মরে।– মরাটা একেবারে ভিন্ন বিষয়। অনেক মানুষ আছে প্রচুর সিগারেট খেয়েও তারা দীর্ঘজীবী, আর না খেয়েও অনেকে অকালে মরেছে।'
দরজায় নক! লায়লা উঠে গেলেন, খুলতেই রুম সার্ভিসের লোক, হাতে ট্রে। লায়লা কিছু জানানোর আগে দরিয়া বসা থেকে বলল, 'নয়শ একে দিয়ে দিন। লক খোলাই আছে।' লোকটির সঙ্গে লায়লা গেলেন।

দরিয়া আবার আগের প্রসঙ্গে, 'সে ভালো মন্দ জানি না। আমার পাশে কেউ সিগারেট টানলে ভীষণ গন্ধ পাই। তখন তার সঙ্গে কথা বলাই খুব কষ্টকর হয়।'

'এই যে এখন নিজেই টানলেন?' দরিয়া অ্যাশট্রেতে সিগারেটের শেষ অংশটুকু রাখছে। লিটনের চোখে দরিয়ার আচরণ কিছু বিস্ময়ের, 'এতে তো আরও অসুবিধা হওয়ার কথা!'

'না-না, তা হয় না। তখনো নিজেকেও মনে হয়, ওই গন্ধের ভেতরেই আছি। তাতে আর অসহ্য লাগে না।'

'ইন্টারেস্টিং!'

লায়লা এসে চেয়ারে বসতে বসতে নিজের গেলাসটা নিয়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'এটা শেষ হলে ওদের ডিনার খাওয়াব। আমাদেরটা এখানেই দিতে বলেছি এক ঘণ্টা পরে।'

'হুঁ।' কিন্তু আয়াত তো এখানে ঘুমাবে।

'না, সে বাপের সঙ্গে। জারা আপনার ওখানে।'

টেবিলের ওপরে দরিয়ার ফোনটার আলো জ্বলছে। জায়গাটা একটু কাঁপছে। ফোনটা সরে সরে যাচ্ছে। দরিয়া দেখেও দেখছে না। একটু বিড়বিড় করল সেদিকে তাকিয়ে, 'আননোন নাম্বার,' এরপরে ওই বিরক্তির সঙ্গেই সে ফোনটা তুলল। রুমের নিস্তব্ধতায় শুনলাম :

–হ্যালো।

–দরিয়া আপা, আমি টুটুল। আপনি ফোন করলেন। আমার নাম্বারে কথা বলতে চাচ্ছি না। তাই আমার এক ছোটভাইয়ের নাম্বার দিয়া ফোন করছি। আপনি ভালো আছেন?

–আমি ভালো। আপনাদের খবর কী? পিয়ালের অ্যাকাউন্ট তো ডিঅ্যাক্টিভেটেড মনে হয়। কোনো সমস্যা নাকি? ওকে ফোনেও পাচ্ছি না। এদিকে আপনিও ফোন ধরেন না। টেনশনে শেষ।

–আছে কিছু সমস্যা। এই জন্যই অন্য নাম্বার দিয়ে ফোন করছি। বোঝলেন না।

–বুঝছি। আমি কি এর পরে আপনাকে এই নাম্বারে ফোন করব?

–না আপা। কোনো ইনফরমেশন থাকলে মেসেজ দিয়ে দেবেন।

–পিয়ালের খবর জানাবেন। ও এখন কোথায় আছে। কী অবস্থায় আছে? আমার কিন্তু খুব টেনশন হচ্ছে, টুটুলভাই।

–না টেনশন কইরেন না। ও আমারও তো ছোটভাই। দেখি কী করা যায়। আপাতত ওর বাড়িতেই আছে। এর বেশি ফোনে বলা যাবে না।

–আচ্ছা। সাবধানে থাকবেন।

–জি। রাখলাম।

ওপাশ থেকে টুটুল নামের লোকটি ফোনের কলটা কাটার পরেও দরিয়া তার ফোন সেটের স্ক্রিনের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিরক্তি নেই। দুশ্চিন্তা সেখানে। ফোনটা রেখেই সে দ্রুত নিজের গেলাসটা হাতে নিল।

লিটন জানতে চাইলেন, 'এনি ব্যাড নিউজ, আপা?'

'না। ব্যাড-গুড কিছু না। আসলে লায়লা জানে। আমাদের খুবই পরিচিত একটা ছেলে। এই এলাকায় অনেকগুলো রিসোর্ট মোটেল এসব করার সঙ্গেও সে ছিল। ওর একটা ফেসবুক পোস্ট নিয়ে, এলাকার লোকজন ঝামেলা করছে।'

আমার এত বিস্তারিত সবটা প্রায় জানাও নয় যেন সেভাবে শুনলাম। কিন্তু লিটন তো সবমিলে ক্ষমতাবান মানুষ। তিনি জানতে চাইলেন, 'কী এমন পোস্ট? কী লিখলেন তিনি?'

'আরে তেমন কিছু না। পাকিস্তানের উর্দু লেখক মান্টোর একটা গল্প। তাও প্রফেসর মুনতাসীর মামুনের একটা কলামের লিংক থেকে, তার বরাত দিয়ে।'

লিটন সেটাও জানতে চাইলে দরিয়া মান্টোর ছোট্ট গল্পটা বলল। আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার বাল্যবন্ধুর জেলখানার অভিজ্ঞতাটা। কিন্তু লিটনের মূল ঘটনা জানা প্রয়োজন, তাই ও বিষয়টা উহ্য রাখলাম।

লিটন একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাতে এমন কী হয়েছে?'

'কী আর। ধর্মাবমাননা।'

'তাই নাকি। স্থানীয় কয়েকজন মাওলানা অবশ্য বলেছেন, এখানে ধর্ম অবমাননার কিছু নেই। তাতে কার কী? পিয়ালকে হুমকি দিয়েই যাচ্ছে।'

'পাওয়ার পার্টির স্থানীয় লোকজনের ইন্ধন ছাড়া এটা অসম্ভব।'

'সে তো আমরা সবাই বুঝছি।'

'যাক। দেখি কাল। ও কাল তো শুক্রবার। দেখা যাক।'

লিটনের কথা শেষ হতেই লায়লা বললেন, 'আমি একটুক্ষণ পরে আসছি। আপনারা চালান। এখন ওরা না-বললে হয় যে বাপের সঙ্গে খাব, তাহলেই হয়েছে।'

৮

লায়লা বাচ্চাদের খেতে নিয়ে যাওয়ার পরে অল্প কিছুক্ষণের জন্য রুমটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একে নীরব বলা যায় না। গেলাসে চুমুক দেওয়ার শব্দ। কারও পাকোড়া খাওয়ার কিংবা কাজু বাদাম চিবানোর শব্দ অবশ্য আছে। টুটুল নামের লোকটির ফোনটা আসার পর থেকে দরিয়া সামান্য হলে অনমনস্ক। এটা অবশ্য লায়লা থাকতে বোঝা যায়নি। অথবা লায়লার নিজস্ব তৎপরতায় তা আলাদা করে ভাবা যায়নি। এর পরে কিছুক্ষণের ভেতরে দরিয়া সেখান থেকে নিজেকে এখানে ফিরিয়ে আনতে খানিকটা তৎপরও হয়েছে।

দরিয়া যতই কাছে বসে থাকুক, একজন মানুষের মন এখন কোথায় তা বোঝে সাধ্য কার। যাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলে, তা সামনে খোলা থাকলে তো সে এখানে থেকে অন্য যে কোনো জায়গায় সে অনায়াসে চলে যেতে পারে। যদিও তিন জনের কারও চোখের সামনে সে জগৎ নেই। কোথায় যেন একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, দুজন মানুষের সামনে একটা মোবাইল ফোন থাকলেও সেখানে তৃতীয় আর-একজন উপস্থিত। তাতে নর-নারী নিবিড়তম মুহূর্তে ফ্রয়েডের সেই আনুমানিক উক্তির এক উপরি স্বরও যেন প্রতিধ্বনিত হয়, ওই সময়ে শুধু দুজন সাধারণ সেখানে থাকে না, থাকে নাকি চারজন। কী জটিল কথা! আমি প্রথম যেদিন পড়েছিলাম অথবা শুনেছিলাম একথা, তখন জটিলতর মনে হয়েছিল। অনুমানেরও বাড়া, উপলব্ধি আর দূরে!

কথা চালিয়ে নিতে দরিয়াই উদ্যোগী হলো, কেননা লিটন তো আমার ততটা পরিচিত নন। একজন সদ্যপরিচিত মানুষের সঙ্গে সহজ হতে আমার খানিকটা সময়ও লাগে। এমন আড্ডায় প্রগলভ হলে তখন আপসেই মুখ থেকে নানান প্রসঙ্গে কথা বেরোবে। তা জানি। কিন্তু সেটারও তো সূচনা প্রয়োজন।

ওই ফোনের প্রসঙ্গ থেকে ফিরতে আর রুমের নিস্তব্ধতাকে কাটাতেই বুঝি দরিয়া বলল, 'লিটনভাই, আপনাদের সেক্টরের অবস্থা কী?'

লিটন নিজেকে একটু ছড়িয়ে, সোফা থেকে পা দুটো টেবিলটার নিচে টানটান করে অনেকখানিক ঠেলে দিয়ে বসেছিলেন। পেটের ওপরে রাখা গেলাসটা তার দুই হাতে মুঠ করে ধরো। দরিয়ার জিজ্ঞাসায় যেন সম্বিতও এলো তার। সোজা হয়ে বসতে বসতে একটু বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'সবই তো বুঝতে পারছেন। একদমই ভালো না। বাইরের সঙ্গে লেনদেন প্রায় নেই।'

'সেটুকু তো জানি। সবাই যেমন জানে। এ নিয়ে আমরা নিজেদের ভেতরে কত ধরনের কথাও বলি। কালই ওনাকে বললাম। এখানেই তো গেস্ট আসা একটু কমে গেছে।'

'সেইটুকুই। বাইরে ওপরে ওপরে গভর্নমেন্ট যতই ইউক্রেন-রাশিয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন করুক না-কেন, ভেতরে রিজার্ভ নেই। সব উন্নয়নে প্রায় ভেসে গেছে। আর উন্নয়ন মানেই তো কিছু লোকের পকেট ফোলে। আর ফোলা পকেট তো আর এদেশে দেখানো যায় না। তাই সব বিদেশে পাচার হয়।'

'আমাদের উন্নয়ন মানেই কনস্ট্রাকশন।' দরিয়া বলল।

'এর এফেক্টটা আপনারা টের পাচ্ছেন যখন, সরাসরি জনগণ টের পেতে আর কত দিন।' জানতে চাইলাম।

লিটন আমার দিকে বেশ গাঢ় চোখে তাকালেন, 'ম্যাক্সিমাম ছয় মাস। আমাদের অর্থনীতি তো আমদানিনির্ভর। আর ওই যে শোনেন রেমিট্যান্স রেমিট্যান্স, সেখানেও টান পড়ছে।'

লিটনের তাকানোর কারণটা বুঝেছি, এভাবে অর্থব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক বিষয়– এসব সরাসরি আমাকে বলবে কি না কিংবা আমার আগ্রহটা কোন ধরনের, বিষয়টার ভেতরে এই চলমান ব্যবস্থায় বিরোধিতার কিছু আভাস আছে কি না অথবা সেটুকুই শুনতে আগ্রহী কি না, তাই

NRB Bank

সহজ কিস্তিতে আপনার
স্বপ্নের ওমরাহ পালন

কোন প্রকার অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই এনআরবি ব্যাংক ইসলামিক কার্ড ব্যবহার করে
ওমরাহ প্যাকেজে উপভোগ করুন ৩-১২ মাস পর্যন্ত 0% ইএমআই সুবিধা

* শর্ত প্রযোজ্য

24 HOURS CALL CENTER | 16568
www.nrbbankbd.com
www.facebook.com/nrbbankbd

হয়তো ওই চোখে তাকিয়েছেন।
'সে তো এলাকায় গেলেই টের পাই।' দরিয়া বলল, 'এদিকে ডলার নিয়ে যা শুরু হয়েছে।'
'হওয়ারই কথা। এত অবৈধ এলসি কাটা হলে। আমাদেরও তো হাত পা বাঁধা। ব্যবসা করব আর এইসব পাত্তা দেব না, তা কি হয়?' লিটনের গলায় হতাশা। একটু আগের সেই বড় করে তাকানো চোখ পানীয়ের প্রভাবে কুঁচকে গেছে। সেখানের অসহায়ত্ব তবু লিটন চাইলেও আটকাতে পারছেন না। তিনি হয়তো সেই চেষ্টা করছেনও না। নাকি বস্তুর প্রভাবে আমি অমন দেখছি!
দরিয়া বলল, 'আচ্ছা, এই সাবজেক্টটা বাদ থাক। এ নিয়ে কথা বলে এমন আসর মাটি করার দরকার কী? আমরা অন্য কথা বলি।'
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথায়, দেশের চলমান অবস্থা রাজনীতি এসব আসেই, খুব বেশিক্ষণ এর বাইরে থাকাও যায় না। গত চব্বিশটা ঘণ্টা কি তারও বেশি এসবের একেবারে বাইরেই ছিলাম, হয়তো ছিলাম, মাঝেমধ্যে দরিয়ার কারণে যা একটু বাইরের পৃথিবী সামনে এসে পড়েছে। তার পর আবার নভেম্বের গহ্বরে। যেখানে গোটা পৃথিবী এর বাইরে এসে যেন দাঁড়িয়ে আছে। না, একেবারে বিচ্ছিন্ন যে তা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু পুরোপুরি সেই চলমান জগতেও যেন নয়। কিন্তু লিটনের আগমন এমন রুমের ভেতরের আয়োজনেও বাইরের দুনিয়াকে টেনে নিয়ে এসেছে। সেটি যেন বাস্তব। সেটি এখান থেকে বেরোলেই সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে, এড়ানো যাবে না। বরং এখানে তাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে নিজেদের আলাদা একটি জগৎ যেন রচনা করে নিয়েছি, তাও যেন ভেঙে যাচ্ছিল। হয়তো তাই লিটন তা বুঝতে পেরে সেখানে আবারও একটা পরদা টেনে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
দরিয়া সে সুযোগটা কাজে লাগাল, 'আপনি তো ফিল্ম সোসাইটি এই সবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফিল্ম নিয়ে বলুন।'
'এসব আপনাকে লায়লা বলেছে, তাই না?'
'সে যেই বলুক। করতেন এটা তো সত্যি!'
'সে কোন আমলের বিষয়। এখন ফিল্ম দেখার সময়ই হয় না। তবে কি জানেন, সাউথ ইন্ডিয়ান ছবিতে একটা নতুন ওয়েব এসেছে। সেটা এই যে ভার্চুয়াল জগৎ, সোশ্যাল মিডিয়া, সব মিলে এর ল্যাঙ্গুয়েজটা ধরতে পারছে, বোম্বে ফিল্ম সেটা পারছে না।' বলতে বলতে লিটন সবার গেলাসে আবার ঢাললেন।
দরিয়া গেলাসে বরফ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের অবস্থা কী?'
'বাদ দেন। ও আলোচনা পরে করা যাবে। যাই হোক তার ধারাবাহিকতা না-থাকলে কিছুই আসলে দাঁড়াবে না।' লিটন লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনার গান শোনার কী খবর?'
'এই যে আর তো কোনো কাজ নেই আমার। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে সারা দিন গান শুনি। এটাও কি লায়লা বলেছে?'
দরজা ঠেলে লায়লা ঢুকলেন। লিটন বললেন, 'হুঁ, লায়লাই তো। কিন্তু, সত্যি তো আপনি গান শোনেন। খুব।'
'খুব মানে। সারা দিন। এখানে এসে ওনাকে পেয়ে বিরতি দিয়েছে। লালন-রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। লালন আর রবীন্দ্রনাথও বেশি। মাঝে একদিন রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন বলেছেন যেন লালনের।
'বুলিদির কাছে আপনি গান শিখতেন দরিয়া আপু।' লায়লা বলল।
'ওই পর্যন্তই। তোমাদের শহরও ছেড়ে গেলাম, গানও আর শেখা হলো না।'
'শোনাটা তো আছে।' লায়লার গেলাসের দিকে তার হাতের বোতল, সেখানে ঢালতে ঢালতে লিটন মাথা একটু ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে লায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলা হয়নি। আজ এয়ারপোর্টে ফিরোজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'
মুহূর্তে ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। হঠাৎ কেন কে জানে। লায়লা কিছু বললেন না। লিটনের হাতের বোতল থেকে সোনালি জল লায়লার গেলাসে পড়ার শব্দটাই শুধু। তার ভেতরে সবাই যেন কেমন চুপ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, যদিও বুঝতে একটুক্ষণ লেগেওছিল, তবু বুঝতে পারলাম। পাঁচটি ইন্দ্রিয় যেন সংকেত দিল যে লিটন এমন একটা নাম বলেছেন, তা এই নিস্তব্ধতার কারণ। না, সেটি লায়লার কোনো বিষয় নয়, তাহলে লিটন অন্তত আমাদের সামনে বলতেন না। আর লোকটি বিশেষ কেউ যে জন্য এমন চরাচর ছাপানো নীরবতা ভর করেছে।
আমি দরিয়ার দিকে তাকালাম। লিটন নিঃশব্দে বোতলটা রেখে লায়লার দিকে এগিয়ে দিলেন গেলাস। তাতে নীরবতা কাটার কোনো কারণ নেই। দরিয়া মাথাটা মেঝের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। এই নীরবতার নিজস্ব কোনো ভাষা খুঁজে নিতে থাকি আমি। এখন যে বাঁ দিকে সামান্য হেলে দরিয়ার ডান হাতটা আলতো করে ধরব, তাও পারছি না। তবে বুঝলাম কথাটা লায়লার দিকে লিটন বললেও সংবাদটা দরিয়াকেই দেওয়া! তাতে দরিয়ার এই প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ নিভে যাওয়া। এই-যে এখান থেকে প্রায় হারিয়েই যাওয়া যেন, নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, তাই এই নীরবতা, এই নিস্তব্ধতা।
অসহনীয় কাটল এই কয়েকটি মুহূর্ত। যখন সেটা বুঝে অথবা না-বুঝেই সংবাদের বাকিটুকু জানার জন্য লায়লা লিটনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি এখানে কেন?'
'নতুন যে ক্যান্টনমেন্ট হয়েছে, সেখানে কী কাজ। বেশি কথা তো হয়নি। আমি বেরোচ্ছি, উনি ঢুকবেন। ওনার গাড়িটা একজিটের ওই দিকটার কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিল তাই দেখা হয়েছে।'
দরিয়া মাথা তুলে লিটনকে দেখল। এখানে ওই সংবাদটা তার না দিলে চলত না। তাকে যে লিটন চেনেন তাও জানে দরিয়া। লিটনের কাছে কিছু না জানতে চাওয়ায় তাও বুঝতে পারলাম।
শুধু যেটা বুঝতে পারছি না, কোনো-একটি নাম এখানে উচ্চারিত হওয়ায় দরিয়ার এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?
লিটন বললেন, 'আচ্ছা। তা যা নিয়ে কথা হচ্ছিল, দরিয়া আপু, চর্চা না থাকুক গান শোনান একটু।'
সঙ্গে সঙ্গে দরিয়া ফাঁকা গেলাস লিটনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একটু যেন ভেংচি কেটে আর জিহ্বা উলটে, 'দরিয়া আপু গান শোনান না একটু। হবে না। গানের গ-ও জানি না।'
লায়লা বলল, 'জানো।'
'বললাম না, জানি না। মুড নেই।'
'আচ্ছা।'
'ইউটিউবে শোন্– চালা– নাকি আমি চালিয়ে দেব।' বলে, গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে চকচক করে পানি খাওয়ার মতন পুরো গ্লাস খালি করে বলল, 'আমাকে আর দেবেন না লিটনভাই, যথেষ্ট হয়েছে। আর না। আপনারা খান। আমি বসে থাকি।' কথাগুলো দরিয়া বলল যেন এই আসার থেকে নিজেকে তুলে নেওয়া বা নিজেকে নাকি সরিয়ে নেওয়া। এখানে থেকেও যেন সে এখানে নেই। অথবা আছে। যাকে বলে, থেকেও না থাকা।
লায়লা লিটনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদেরও তো আর বেশি চলবে না, নাকি?' আমার দিকে ফিরে, 'আপনার কী মতামত, ভাই?'
লিটন কিছু বলার সুযোগ দিলেন না, 'ওনার মতামত নিচ্ছ কেন? গেস্টের মতামত হয়। এই বোতলে তেমন নেই। তোমরা না চাইলে আর খাব না। কী বলেন?'
লিটন এই কথায় কিন্তু আমার মতামতটাই চাইলেন। অথবা কথাটা এমনভাবে বললেন, এটা তার সিদ্ধান্ত আর মতামতটা আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে। আমি খেয়াল করছিলাম, দরিয়ার হঠাৎ রূপান্তরটা। এই বদলে যাওয়া। একটি মাত্র শব্দে। মানুষটা মাথাটা নুইয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে টেবিলে তার শূন্য গেলাসের দিকে। সেখানে পাশেই তার ফোনটাও। টুকটুকে লালচে একটি আবরণ ওটার। সেখানে এই তাকিয়ে থাকায় এমন আসরে আমাদের তিনজনের ভেতর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। ওখানের ওই তাকিয়ে থাকায় নিজেকে হারিয়ে খুঁজে নিচ্ছে। কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছি না। যদি খেপে ওঠে। যদি এই ঝিমধরা অবস্থায় হঠাৎ উঠে নিজের রুমে চলে যায়। যদি ভিন্ন কিছু বলে বসে। যদি তাতে নিজেকে আর ধরে রাখতে না-পারে!
'তাই। বোতল শূন্য, আসরও তবে শেষ। রাতও তো হয়েছে। বাইরে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে!' নিজের কথাগুলোকে একটু অসংলগ্নও মনে হলো। আমার জিভ সামান্য আড়ষ্ট।
'না-না, বোতল শূন্য নয়।' লিটন বললেন, 'আমার রুমে ইনট্যাগ আরও-একটি আছে, বড়ভাই!'

এমন ভাবে বললেন লিটন, আমার হাসি পেল।
লায়লার মন্তব্য, 'আমি তো তাই ভাবছি, তোমার ব্যাগে আর না থেকে পারে না।'
'আরে কাহির ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই। কী নতুন একটা হোটেল হয়েছে এয়ারপোর্টের কাছে ওখান থেকে নিয়ে এসেছে। ও নামার সময়ে প্যাকেটটা আমার ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে দিল।'
'সে তুমি উনি না দিলেও একটা আনতে কি আনতে না?' স্বামীর স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লায়লা হাসতে হাসতে বলল।
দরিয়া ফোনটা চোখের সামনে এনে দেখল। তার পরে ওটা কোলের ওপরে রেখে লিটনের দিকে গাঢ় চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তা আপনাকে দেখে কী বললেন উনি?'
দরিয়ার প্রশ্নের শুরুতে ভেবেছি, হয়তো বোতল দেওয়া লিটনের বন্ধু কাহির সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে দরিয়া। চোখে তার কৌতূহল, কিন্তু সেই চোখের খুব ভেতরে যেন অবজ্ঞাও, গলার স্বরে ঈষৎ তাচ্ছিল্যও!– এসব বুঝতে আমাকে লিটনের উত্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো, 'না, তেমন কিছু না। শুধু দেখাই। জাস্ট আ বিট। মানে ক্রসিং।'
'ওহ। কিছুই বললেন না?'
'একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন মনে হলো। মানে, আমি এখানে হঠাৎ।'
'হুঁ-হুঁ। তাই তো। স্বাভাবিক।'
আমি দরিয়াকে দেখলাম। কিছু জানতে চাওয়ার নেই। অনুমানে কত কীই-বা জানতে চাওয়া যায়। কোন কথা বলে, কীভাবে?– কে হায় হৃদয়ে খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!– সে বস্তু, যত অন্তর্গত থাকে তত বাঁচোয়া। ততটাই।
'আর ওপেন প্লেসে অফিসার মানুষ। তাদের কত ধরনের ব্যাপার থাকে।'
দরিয়া তার ফোনটা কানে দিল। রিঙের শব্দ হচ্ছে। এরপর দরিয়া তার জড়ানো গলাটাকে একটু সতেজ করে বলল, 'রেহান, ডিনার রেডি? দিয়ে দাও। ওপাশ থেকে জানতে চাওয়া। (অস্পষ্ট)। হুঁ, নাইন জিরো টু– ওকে। ওকে ম্যাম (অনুমান, অস্পষ্ট)– ওকে।' ফোনটা রেখেই লিটনকে দরিয়ার মন্তব্য, 'এর ভেতরে হকচকালেন?'
বুঝতে একটু অস্পষ্টই লাগল আমার। কাকে কী নিয়ে? দরিয়া এখানে আছে তো?
লায়লা ডান হাত বাড়িয়ে সেদিকে একটু ঝুঁকে দরিয়ার ঘাড়ে ছোট্ট চাপড় দিয়ে বলল, 'কোয়ায়েট, আপা।'
দরিয়ার স্বগতোক্তি, 'ওকে। অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট! হলো? পশ্চিম রণাঙ্গন সম্পূর্ণ শান্ত।' বলে বুকের একটু ওপরের দিকে টোকা দিল। এরপর গলায় সামান্য খাঁকারি দিয়ে একটু নিচু গলায় গান ধরল :
'সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে?
ডাক্-না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নধারে॥
– এইটুকু গেয়েই থেমে গেল, 'হচ্ছে না। হয় না। সেই কবে বিনুদির কাছে শেখা।'
লায়লা বললেন, 'হচ্ছে তো।'
'না।'
দরিয়ার গলায় সুর তাল ঠিকই আছে। গায়কিটাও একটু যেন অপরিচিত ঠেকল। নাকি দরিয়াও সেই দলে যাদের স্বর গান গাইলেই বদলে যায়। ওর কণ্ঠস্বরটা এমনিতেই একটু চোখা। সেটি আর একটু তীক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে কিন্তু সরু নয়, 'নারে লায়লা– হয় না।' বলেই ধরল আর একটি :
'অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে
অনেক দিনের মনের মানুষ–
কোন ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥
– গাইতে গাইতে দরিয়া আমার দিকে চেয়ে হাসল। খুবই শুকনো হাসি! কষ্টে কি? দূর থেকে টেনে আনা। নিজেকে হারিয়ে খোঁজা? আবারও আগের অংশ গেল ও :
'কোন ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে– ' গেয়ে ছেড়ে দিল। বলল, 'হবে না। হচ্ছে না। হওয়ার কী? আমি কি গাইতে পারি নাকি। কতজন টিভিতেও গায়, নাকি লায়লা।'

লায়লা বললেন, 'না, হচ্ছে।'
লিটনের দিকে দেখলাম, তিনি একটু যেন বিস্ময়ে দরিয়াকে দেখছেন। তার কথায় প্রতিক্রিয়া যে দরিয়া তাকে তিনি যেন চেনেন না, আবার এই যে গান গাইতে গাইতে ছেড়ে দেওয়া দরিয়া, সেও অপরিচিত। লায়লা ব্যতিক্রম তার কাছে পরিচিত এই দরিয়া। তিনি আবার ঝুঁকে ধরলেন দরিয়ার কাঁধ। দরিয়া সেখানে লায়লার হাতের ওপর নিজের বাঁ হাত রেখে চাপ দিয়ে বলল, 'তার চেয়ে গানটা শুনি।' বলেই ফোনটা হাতে নিয়ে চালাল।
'সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে?
ডাক্-না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নধারে॥
ফোনটা রাখল টেবিলের ওপরে। গানটা শুনতেই বোঝা যায়, এটা সুচিত্রা মিত্রের গলা।
দরিয়া ফোনটা রাখতে রাখতে বলল, 'লায়লা কোথায় পাব তারের সঙ্গে শব্দ মিল। কিন্তু বিষয়টা একেবারে আলাদা না?'
টেবিলের ওপরে গান বাজছে। ছড়িয়ে গিয়েছে সারা ঘরে। সুচিত্রা মিত্র সেই একটু ভারী অথচ তীক্ষ্ম গলা। দরজার কাছের ও খাটের দিকের সিলিংয়ের আলোয়, আধো অন্ধকারে, আলোর সঙ্গে স্বর মিশে যায়।
যখন নিভবে আলো, আসবে রাতি, হৃদয় দিস আসন পাতি–
আসবে যে যে সঙ্গোপনে বিচ্ছেদেরই অন্ধকারে॥
জানি না এই সময়ে দরিয়ার এমন প্রতিক্রিয়ার কী কারণ। জানতে চাইব। সে উঠে খাটের দিকের সিলিংয়ের লাইট অফ করে দিয়ে এলো। গান বেজে চলেছে :
তার আসা-যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
দরজায় শব্দ। জারা অথবা আয়াত। না হলে ডিনার। হ্যাঁ, ডিনার হাতে দুজন।
লায়লা বলল, 'ও দুটোকে একটু দেখে আসি।'
ওরা টেবিলের ওপর থেকে গেলাস সরিয়ে ট্রে দুটো রাখল। এর পরে দরিয়ার কাছে খুব নিচু গলায় জানতে চাইল, 'ম্যাম, আর কিছু লাগলে এখনই বলবেন। ক্যাফে বন্ধ হয়ে যাবে।'
'আচ্ছা।' দরিয়া দেখে বলল, 'সব রুমে পানি দেবেন। আর কিছু মনে হয় লাগবে না।'
রোহান জানালেন, 'পানি দিয়েছি, ম্যাম। নয়শ তিনে বেবিরা আছে, তাই ওটা ভেতরে রেখেছি। বাকি দুটো টু লিটারি দরজার সামনে আছে।
'ওকে।' ওয়েটাররা যেতে দরজা আটকাতেই দরিয়া একটু হেসে বলল, 'বেরসিক। আসার আর সময় পেল না। গান শেষ হওয়ার আগেই এলো।'
টেবিলের ওপরে সুচিত্রা মিত্র গাইছেন :
তারে বাঁধবে বলে যেই করো পণ সে থাকে, থাকে বাঁধন–
সেই বাঁধনে মনে মনে বাঁধিস কেবল আপনারে॥
গানটা শেষ হতেই দরিয়া গুনগুনাল :
সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে?
ডাক্-না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নধারে॥
এর পরে চারদিক আবার নিস্তব্ধ। লায়লা এসে তার চেয়ারটার পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। আলো জ্বালানোর অনুমতি চাই দরিয়ার কাছে। এই অন্ধকারে তো ডিনার খাওয়া যাবে না।

৯

ঘুম আসছে না, এদিকে চোখও খুলে রাখতে পারছি না।
শুয়ে পড়ার আগে জানালার পরদা সরিয়ে কিছুক্ষণ দেখেছি, শ্রাবণের বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে প্রকৃতি শ্রাবণ হয়ে গেছে। রুমের এসি কমিয়ে দিয়েও এমন ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছিল গায়ে জাড়কাঁটা উঠে যাবে। হাফহাতা টি-শার্ট ও লুঙ্গি পরে তা আরও বাড়তে দিয়েছি। কিন্তু আমি তো নিরুপায়। যদি কাল চলে যাই তো আজ সন্ধ্যায় গায়ে দেওয়া পাঞ্জাবি-পাজামাটাই সম্বল। বাকি জোড়া নিশ্চিত শুকোয়নি। কে ভেবেছে এখানে দুই-তিন দিন কাটাতে হবে। এমনিতে বেরোনোর সময়ে তো এই কদিনের কোনো হিসাব আমার কাছে ছিল না। তবু সবসময়ে কোথায় না কোথায়, কীভাবে না কীভাবে থাকি ভেবে একজোড়া কাপড় বেশিই নিই। লুঙ্গি পরে তো আর রওনা দিতে পারব না, ভদ্দরলোকের পোশাকের জ্ঞান হয়েছে। আমার ছোটবেলায় একবার বাসার কাছে নতুন বাজারে গিয়েছিলেন বাবা, খুবই জরুরি কোনো দরকার, পথে নাকি এক বিশিষ্টজনের দেখা হলো। বাবা লজ্জা পেয়েছিলেন। বাজার থেকে এসে বলেছিলেন, আজই তাড়াহুড়োয় লুঙ্গি পরে বাজারে গেছি আর দেখ্ ওমুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' সেটা নাকি ভারি লজ্জার। একটু বড় হয়ে আমাদের শহরে বড় বড় ব্যবসায়ী, বনেদি বাড়ির একটু বয়েসি মানুষ কিংবা রাজনীতিবিদদের কাউকে কাউকে দেখতাম বেশ একটা কায়দা করে রিকশায় বসে যাচ্ছেন, পরনে লুঙ্গি। ওই কায়দার বসায় তার যে লাটসাহেবি ভাবটা এসেছে, তা ওই লুঙ্গিরই জন্য! লুঙ্গিই তার বাবুয়ানার স্বরূপ। আজকাল সেই কেতা চাইলেও আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। সেদিন পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। হয়তো আমরাই লুঙ্গি পরা সেসব মহাজনদের দেখা শেষ প্রজন্ম।
কিন্তু, একটা ফুলহাতার টি-শার্ট না এনে ভুল করেছি। বাহুতে খুব ঠাণ্ডা লাগছে। দ্রাক্ষারসে টইটম্বুর পাকস্থলী নিজেই শরীরের তাপ শুষে নিয়ে কাহিল করে ফেলেছে, ফলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি কান্না কিংবা শ্রাবণের নিজস্ব স্বর কোনোটাই দেখার সক্ষমতা শরীরে নেই। কম্বলই ভরসা। এসির ঠাণ্ডা সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে কম্বলের নিচে গেলাম।
পরদা সরিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে, এক মুহূর্তে মনে পড়েছিল দরিয়ার মুখ। কী এমন ঘটেছে যে ওই জনৈক ফিরোজের কথা বলায় ওর অমন প্রতিক্রিয়া! নিজেকে সামলাতেই পারছিল না! তাহলে তিনিই কি সে-ই, যার সঙ্গে ছিল ওর সম্পর্ক, পারিবারিকভাবে বিয়েও স্থির হয়েছিল। সেই লোকটি দরিয়াকে কিছু না জানিয়ে, ওর পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে, বিয়ে করল বসের মেয়েকে। তখন তার পোস্টিং কোথায়? রংপুরে না চট্টগ্রামে। জানি না। জানতে চাইনি। দরিয়াও বলেনি। অপ্রয়োজনীয়। দরিয়া তো আমাকে বলেনি কিছুই। তবু জানা হলো। তারপর বিদেশ। জাতিসংঘের কাজে হয়তো। উন্নতি। চৌকস সেনা কর্মকর্তা! হতে পারে, তড়তড়িয়ে ওপরে উঠবার সিঁড়ি খুঁজতে মানুষ কতকিছু তো করে, করেছে, করতে পারে, করে থাকে। সেখানে ফিরোজ আর ব্যতিক্রম কী? বরং সম্পর্কটাকে যে দাম্পত্যে যায়নি সেই ভালো।– এই করেছ ভালো। তাতে দরিয়ার মনে তীব্র কোনো দহন হয়েছে! একেবারে বালখিল্য চিন্তা। হবে না? আজও হয়। ভালোবাসাহীনতায় নয় যতটা, তার চেয়েও বেশি অমন সুচারু প্রতারণায়! তাই দুঃখের জলের ভেতরে চোখে জ্বলছিল সেই আগুন। দপ্ করে, ফুৎকারে, কোনো ফুঁ দিয়ে নেভেওনি তা। বুদ্ধিমতী মেয়ে। সামলে নিয়েছে। ও সময়ে গানে আশ্রয় নিয়েছে। লালন ও রবীন্দ্রনাথের গানে স্বাভাবিক তার জ্ঞান। আগে প্রায় না শোনা গানটা মনে এলো না ঠিকঠাক। সে যে মনের মানুষ কেন তারে বাইরে দাঁড়িয়ে রাখিস।– এটা? নাকি উলটো কিছু। নাকি লায়লার অনুরোধ রক্ষা! নাকি, হারিয়ে খোঁজা নিজেকে, সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা? কী যে! লায়লাকে বুঝে নিতে নিতে অথবা নাই বুঝতে, বুঝতে না পেরে (মানুষকে কি বোঝা যায়!) এই দরিয়া, একটু আগে আমার সামনে, এইভাবে! কখনো ভাবিনি। যে মানুষ প্রাত্যহিক নিজেকে প্রায় সামনে আনেই না, সে-ই ওইভাবে, লিটনও ছিলেন, তার সামনেও। হয়তো ভুল ভাবছি, লিটন লায়লা এখন ওর অনেক কাছের আমি বরং দূরের। হয়তো আমার সামনে, একটু সহজ হতে, লায়লার অনুরোধে গানে আশ্রয়! তা মন্দ তো গায়নি ও। ওইটুকু– তারপরই সে বল ইউটিউব মারফত সুচিত্রা মিত্রর কোর্টে ঠেলে দিল। নিজে গাইলে অমন মদিরাময় গলায় হয়তো গানটা ওর আড়ষ্ট ঠোঁটেই থাকত, মাথায় নিতে পারত না, কিন্তু ওই আবহে, সুচিত্রা মিত্রের গায়কিতে ও নিজের করে নিচ্ছিল, নিয়েছে! বুঝিনি। বোঝা যায়নি। সেখানেই মনের মানুষের বিপরীত কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ। তাও বলেছে লায়লাকে! এই জায়গাটা বুঝিনি। ভাবেছি, কেন অমন বলল। কিন্তু কোনোদিনও তা দরিয়ার কাছে আর জানতে চাওয়া হবে না। নাকি হবে? এই প্রসঙ্গটাই তো তোলা যাবে না। তাহলে?
চোখ জড়িয়ে আসছে। জড়িয়ে গিয়েওছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। বাইরের আলোয় একটু ঢুকেছে পায়ের দিকটায়। পরদা সেখানে সামান্য গোটানো। বৃষ্টিতে বাইরের আলো চকচকে, নাকি এখন আমার চোখ অমনই দেখল!
দরজায় নক করছে কেউ! না, তবে লকে? খট শব্দ। তন্দ্রায় নাকি বাস্তবে? দরজাটা খুলে গেল? কেউ আবার দরজা আটকাল? রুমে

দরিয়া?
'জেগে আছে?' শুনলাম?
খাটের পায়ের দিকটায় দাঁড়ানো দরিয়া। অন্ধকারে যতটুকু বোঝা যায়, পায়ের দিকের আলোতে, মোটা লাগছে ওকে, নাকি ঢোলা জামা পরা? হাতে চাবি?
জানতে চাইলাম, 'চাবি?'
'আমি তবে ঢুকলাম কীভাবে।'
'??'
'হুঁশ থাকে তোমার। পানিটা হাতে নিয়ে যখন ঢুকছে দরজা তো আমি খুলে দিয়েছিলাম নাকি? চাবিটা হাতেই ছিল।'
'বসো।'
'হইছে। এখনো নেশার ঘোরে, না?'
'না।' উঠে বসতে বসতে বললাম, 'আছে একটু।'
'আমার কেটে গেছে।' দরিয়া আমার পায়ের কাছে বসতে বসতে বলল, 'ও থাকে? আমার এমনিতে কিছু হয় না। সিগারেট ধরাও একটা।'
'আচ্ছা।' পাশের সাইড টেবিলের ওপরের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ও বাঁহাতে চাবিটা এগিয়ে দিয়ে ডান হাতে সিগারেট নিতে খাটের প্রায় মাঝখানে উঠে এলো। কম্বলটা আমার বুকের কাছ থেকে নেমে গেছে।
জানতে চাইলাম, 'তুমি ঘুমাওনি কেন?'
'আসছে না। আসবে না।' সিগারেটে টান দিতেই অন্ধকারে দরিয়ার মুখ দেখলাম। চিবুকে কেমন যেন থমথমানি, কিন্তু তা পড়তে দিতে চাইছে না।
'অ্যাশট্রে–!' বলে একেবারে আমার কাছে এসে পাশে বসে আধশোয়া হলো।
আমি ডান হাতে অ্যাশট্রেটা ধরে আবার রেখে দিলাম। কম্বলটা টেনে দুজনার বুক বরাবর দিয়ে এ অ্যাশট্রেটা কম্বলের ওপরে রেখে বললাম, 'আমারও ঘুম আসছে না। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'
'আমার কথা আবার ভাবে নাকি কেউ!'
'শুধু বাজে কথা। শুধুই।'
'একেবারে বাজে কথার ছড়াছড়িতে ভরা আমার জীবন। তাই না?'
'এটা আরও বাজে কথা।'
'কোনটা তোমার কাছে ভালো কথা তাহলে, বলো?'
'আমি কিছুই বলিনি।'
'তুমিই সব বলেছ।'
'আমি? আমি তো শুনছি দেখছি। কিছু তো বলিনি। বলছিও না। ওই আমার কাজ।'
'তাই বললে তোমায় ভেবেছি, না?'
'না। তাও না। লিটন বললেন।'
'আবার ওই কথা। চলে যাব কিন্তু। দরিয়ার ঘাড়ে রাখা আমার হাতটা ওর বাঁহাতে সরিয়ে দিতে চাইল। এতে অ্যাশট্রেটা নড়ে গেলে সেটাকে ধরে রাখতে আবার হাতটা একই জায়গায় আনল।
দরিয়া অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে সেটা আমার হাতে দিয়ে কম্বলটা একটু টেনে নিল। আমাকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওই বিষয়টা আর কখনো বোলো না, সখা। আমার ভালো লাগে না।'
জড়ানো চোখ থেকে সবে কথায় ফিরলাম। ঘুমের ভাব কাটেনি। সেজন্য দরিয়া সিগারেট টানলেও আমি টানিনি। কিন্তু আমার বাহুলগ্ন দরিয়া! কেন? অন্তর্গত শোকে? আমার সঙ্গে এই জড়িয়ে থাকা– এটা উপশম? আমি বাঁ হাত ঘুরিয়ে ওর মাথায় রেখে, ওই হাতেই ওকে আরও খানিকটা টেনে নিলাম। দরিয়া সরে এলো আরও। দুজনার দুটো শরীর প্রায় জড়াজড়ি। কী বলব এখন? কী বলা যায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কখনো নীরবতাই ভাষা! তাতেই সব যোগাযোগ রক্ষিত হয়। দরিয়া ওর বাঁহাত রাখল আমার বুকে। টের পাচ্ছি সে হাত বুকে উঠছে নামছে। ঘষছেও। এতে নিজস্ব শোক কাটে হয়তো। শুধু ওর কথার সূত্র ধরে স্বগতোক্তির মতন করে বললাম, 'বলব না।'
'বোলো না কখনো। এই তো গুড বয়।' বলেই, ওই বুকে ঘষা হাতখানায় আমার মুখে টেনে নিয়ে বাম গালে চুমু দিল। এমন নীরবতায় চুমুর শব্দটা স্পষ্ট কানে লাগল। একটু পরে ডান হাতে টেনে নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরও টানলাম কাছে। দরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজল ওর একমাথা চুলগুলো আমার মুখে ও চোখে। আমি ওকে সেখান থেকে একটু টেনে নিয়ে, নিজেও সামান্য নেমে ওর ঠোঁটে ছোট্ট চুমু দিলাম। দরিয়ার হাত আমার চিবুকে। আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজলাম। ও কিছুই বলছে না। সাড়াও দিচ্ছে না। ওর নিচের ঠোঁট আমার মুখের ভেতরে। বুঝতে পারছি দরিয়ার দম বন্ধ করে আছে। আমি ডান হাতে ওকে পেঁচিয়ে ধরলাম। ওর লম্বা জামাটা কোমর ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। আমার হাত ওর নিতম্বে। সেখানে কিছু পরে নেই। আমার হাতটা সেখানে পড়ায়, ও একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ ওর। ঠোঁটে ঠোঁট। আমার ডান হাত ওর জামার ভেতর দিয়ে গলিয়ে স্তন ধরলাম। দরিয়া ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিল ফিসফিসিয়ে বলল, 'কিচ্ছু পরিনি।' বলেই ওর বাঁ স্তনে আমার হাতের ওপরে নিজের হাতটা রাখল। আমি দরিয়ার গলায় চুমু খেলাম। চুমুর শব্দও শুনলাম। স্তন থেকে হাত নামিয়ে ওর নাভিতে, সেখান থেকে আরও নিচে। দুই উরুর মাঝখানে। ছোট ছোট লোম। এর পরে আরও নিচে হাত নেওয়ার আগেই ও আমার হাতটা টেনে আবার ওর বুকে রাখল। আমি আবারও ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতেই, ওর বাঁ হাতটা আমার লুঙ্গি গেঁড়ো সোজা ঢুকিয়ে দিল। সেখানের লোমগুলোয় ওর হাত। তারপর আরও নিচে। দরিয়া আমার নুনু ধরে বলল, 'দাঁড়াবে না?' আমার অস্ফুট বলা, 'হুঁ।' ওর জানতে চাওয়া, 'কই?' ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, ওর জামাটা বুকের কাছে উঠিয়ে স্তনে মুখ দিলাম। খুব নরম আর ছোট্ট স্তন দরিয়ার। যেন পুরোটাই মুখের ভেতরে চলে যাবে। ওর হাত তখনো আমার নুনুতে নাড়ছে। আমার মনে হচ্ছে, এমন এই বিস্ময়কর অনুভূতি কোনোদিন পাইনি আমি। কখনোই না। 'দরিয়া!' ডাকলাম। সাড়া দিল না, নাকি দিচ্ছিল না। 'কথা বোলো নাতো।' ওকে উলটে দিতে চাইলাম। পারলাম না। ওর গলায় ঠোঁট আমার। বলল, 'দাগ কোরো না।' মুখ নামাতে থাকলাম। গলা থেকে বুকে। বুক থেকে পেটে। দরিয়া কম্বলটা টানল। তার পর আমার মাথা ধরেই থাকল। ওর নাভিতে মুখ নামিয়ে ওর দুই পায়ের মাঝখানে নেওয়ার আগেই আমার চুল ধরে টেনে নিল, 'উঁহু'। এরপর আমার নুনুটা মুঠ করে ধরে ঝাঁকাল, 'কই? দাঁড়াবে না? কী হয়েছে?' 'কিছু না। হু-হু-দাঁড়াবে। অমন করো। এই তো।' বলে ওর ঠোঁটে মুখ গুজতেই বলল, 'চুষে দিই!' বলেই, আমাকে সরিয়ে চিৎ করে ফেলে ও মুখ দিয়ে দিল আমার দুপায়ের মাঝখানে। বাঁ হাতে নুনুটা ধরে মুখে পুরে চুষতে শুরু করল। সঙ্গে মৃদু কামড়। মুখ থেকে যে অবিস্মরণীয় ধ্বনি বেরোচ্ছে আমার। সে ধ্বনি নিজের কানেই অবিশ্বাস্য ঠেকছে। একেবারে উপায় আর অবলম্বনহীন আমি। অবলম্বন একমাত্র দরিয়ার চুলময় মাথা। সেটিই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম। ওর মুখের গতিও বাড়ছে যেন, নাকি ওই চরম পুলকে অমন মনে হচ্ছে আমার। মনে হলো, যেন ওই জায়গা থেকে ও কখনোই মুখ সরাবে না, কোনো দিনও না, আর আমি অনাদি অনন্তকাল কষ্ট করে শ্বাস নেওয়ার মতন গোঙাতেই থাকব।
একটু বাদেই উঠে এলো দরিয়া। আমার বুকের ওপরে ওর মাথা। সেখান থেকে বাঁ দিকে হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে, অন্ধকারে দেখলাম, ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি অন্তর্গত উত্তেজনায় ঘুরে ওকে টেনে বুকের মাঝখানে এনে ওর দুপায়ে মাঝখানে উঠে, বাঁ হাতে ওর ভিজে ওঠা যোনিকেশে হাত বুলিয়ে, ডান হাতে উত্থিত নুনু ধরে, ঠিক যোনিকেশের ওখানে স্পর্শ করা মাত্র দরিয়া আমার তল পেটে আস্তে চাপ দিয়ে অস্ফুট বলল, 'থাক না। কী দরকার?' গলা কোমল অথচ আদেশ, 'আসো।' বলে, আমাকে টেনে নিজের বুকের ওপর জড়িয়ে ধরল। ওর দুই উরু তখন আবার জোর লেগে গেছে প্রায় আর আমি তার ওপরে। অস্ফুট জানতে চাইলাম, 'কেন?'
দরিয়ার জড়ানো গলা, 'থাক, শুয়ে থাকো আমার বুকে। নাইবা করলাম। হলো তো। এই তো বেশ।'
ইচ্ছে হচ্ছে বলি, ফাজলামি করো? অথবা জোর খাটাই, কিন্তু ওই 'নাইবা করলামে'র আকুতির কাছে হারলাম আমি!
শুয়ে রইলাম যেন প্রায় পৌষের রাতে সম্পূর্ণ নগ্ন দুজন নারী-পুরুষ পরস্পর জড়িয়ে আছে। নগ্ন দরিয়ার গায়ের নগ্ন আমি। শুয়ে আছি আমৃত্যু শুয়ে থাকব এমন বোধে। ভেতরে ঠাণ্ডা হলাম দুজনেই। তাই বুঝে ও আমার কপালে ঠোঁট চেপে রাখল, যেন এই চুমু কোনো দিনও শেষ হওয়ার নয়।

বাইরে চরাচর ডুবানো বৃষ্টি! আমি উঠে কম্বলটা টেনে দুজনকে পুরোটা ঢেকে ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম। অস্ফুট বললাম, 'জানো, হোটেল রিসোর্টের এই সাদা কভারের কম্বলগুলো গায়ে জড়ালে আমার নিজেকে কী মনে হয়?'

'কী?' গলায় আহ্লাদ।

'যেন লাশ।'

'আমরা এখন তাই। দুজনই। লাশ। আমাদের ওখানের ফকিররা যেমন বলে জ্যান্ত মরা।'

১০

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাইরে মেঘলা দিনের অস্ফুট আলো। পায়ের দিকের ডান পাশে পরদা ফাঁকা হয়ে থাকায় এসেছে সেই আলো। চোখ খুলতে খুলতে ওই আলোতে বাইরের প্রকৃতিও খানিক সলজ্জ লাগল।

দরিয়া পাশে নেই। থাকার কথাও না। আমার গায়ের ভেতরে গুটিসুটি দিয়ে ঢুকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বলেছিল, 'ভয় পাইও না গো সখা। আলো ফোটার আগেই চলে যাব।'

আমি ডান হাতে অনেকটা ছোট্ট শিশুকে ঘুম পাড়ানির ঢঙে দরিয়ার পিঠে চাপড় দিয়েছিলাম। তারপর আর মনে নেই। দুজনের সঙ্গমহীন সঙ্গমের পরে আমরা জিন্দা লাশ! যাকে দরিয়া বলেছে একেবারে উলটো, জ্যান্ত মরা। যেমন উলটে দিয়ে নিজে খানিকটা আর সুচিত্রা মিত্রর গলায় রবীন্দ্রনাথের একটি গান। যেটি গগন হরকরার বিখ্যাত গানটির একেবারেই বিপরীত। এতটা কাল, সেই স্কুলে শাহাব স্যারের ক্লাসে শোনা থেকে এটুকুই জানা ছিল, গগন হরকরা অথবা গগনচন্দ্র মজুমদারের 'কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে-রে'– এই গানটির সুর থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সংগীতটির সুরারোপ করেছেন। স্যার তাঁর জলদগম্ভীর গলায় গগন হরকরার গানটি একটু গেয়েও শুনিয়েছিলেন। তখনো জানি না ওই মেঘগম্ভীর গলার স্বরকে ইংরেজিতে বলে ব্যারিটোন! স্যারকে মনে পড়ল। কোনো কোনো প্রসঙ্গে অতীত যে কত ভাবে বর্তমানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু দরিয়ার গলা সত্যি অবাক করা। এ জানা ছিল না। গান শিখত, গাইতেও যে পারে তা বলেনি কোনোদিন। গুনগুনিয়ে গায়ওনি। স্কুলে-কলেজে কবিতা আবৃত্তি করত। তা অবশ্য লায়লার সঙ্গে পরিচয়ে সূত্রে বলেছে, জাঈদ ভালো আবৃত্তি করত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংস্কৃতি সপ্তাহে প্রথম হয়েছে, ক্যাসেট বের করার ইচ্ছে ছিল, তখন দরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল। তার পরে হঠাৎ জাঈদ এই সব থেকে নিজেকে কেন যেন সরিয়েও নিয়েছিল। সে 'কেন'টা হয় লায়লার সঙ্গে সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা ছিল অথবা তা ছিঁড়ে গিয়েছিল। এর পরে দরিয়া পরেও জাঈদকে বলেছে, ইউটিউবে ওর আবৃত্তি পোস্ট করতে। কিন্তু ওকে যে আবৃত্তির জন্য জাঈদ-লায়লা আজও মান্য করে তা জানার সুযোগ আকস্মিকই হলো। ও মুখ ফুটে না বললেও, ওর আবৃত্তি ও কবিতাপ্রীতি সম্পর্কে এভাবে সেভাবে, এমনকি ওর বর জুয়েলের মুখেও শুনেছি। কিন্তু গান? জনৈক আভাদির কাছে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গান শেখা কিংবা বাউল গান শেখা, ফকিরি গান গাওয়া কিংবা ওই গানগুলোর আন্তঃসম্পর্ক– এসবও যে দরিয়ার কোনো এক কালে ভালো লাগার ক্ষেত্র ছিল, তা জানার সুযোগ হয়নি। কেউ জানায়নি। ও-ও হয়তো তা ভুলে যেতে চেয়েছে। ভুলে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে। নিজেকে নিয়ে পালিয়েছে সব ছেড়ে একাকী। সেখানে আর যেন কারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। কিংবা পালাতে গিয়ে সবটাই হারিয়ে ফেলেছে একদিন। অথবা ইচ্ছে করে পথে ফেলে দিয়ে ছটকে পড়েছে নিজেকে নিয়ে। শুধু নিজেকে উদ্ধার কিংবা হারিয়ে পাওয়া। আর কখনো ফিরেও তাকায়নি সেদিকে। তার কারণ কি ফিরোজ? লিটন প্রায় অসতর্কভাবে যার নাম বলে ফেলেছেন। সেই জন্যই কি লিটনের বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে, দরিয়া আমায় থামিয়ে দিয়েছে। কী জানি? এমন সব আকস্মিক মুহূর্তের কোনো খবরে নিজের অজানা নিয়ে আর কতক্ষণ পাক খাওয়া যায়? তখন 'কী জানি?'-ই নিজেকে বোঝানোর জন্য সবচেয়ে ভালো উত্তর!

তাই সেই ফিরোজকে মনে রেখেও ভুলে যেতে, কোথায় পাব তারে-কে এভাবে, সেই 'মনের মানুষকে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে' বলে উলটে দেওয়া! রবীন্দ্রনাথে খুব পরিচিত গান এটি নয়। আবার দুটো গানের বাণীর ধ্বনি কাছাকাছি হলেও বিষয় একেবারে উলটো। একটা বাউল সুরের অন্যটি ধ্রুপদ। এসবও দরিয়ার জানা। কিন্তু এখানে বাইরে থেকে শোনো, কিন্তু বুকের ভেতর নিলে, বুকটাকে নয়ন জ্বলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়– তাই তো সেই চেয়েছে। আর সেটা যদি নিজের কাছে সে ধরাই পড়ে যায়, নিজের কাছে নিজেই বাঁধা পড়ে যাওয়া হয় বলেই, তা এইভাবে, একেবারে আমাদের আসরে ভাষাতে যেন ধরা দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের কথায়, অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে অনেকদিনের মনের মানুষ! সত্যি বিস্ময়কর। অবাক হওয়ার কিন্তু নিজেকে এর ভেতর দিয়ে সামলানোর কী চেষ্টা! তাই গলায় সেই গানের রেশ রেখে চালিয়ে দিল সুচিত্রা মিত্রের গান!– এত কিছু, এভাবে, অমন একটি মুহূর্তে মিলিয়ে নেওয়া!

আর সেই টান, ওই গানের টানের সেই মনের মানুষকে ভুলতেই তবে দরিয়া এলো আমার কাছে! এই পর্যন্ত ভেবে, দৃষ্টি আবার পরদার কাছে নিয়ে মনে হলো সকালটা আলোময় হয়ে উঠবে হয়তো। খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভেতরে অদ্ভুত বিপন্নবোধ কিংবা একেবারেই কূল না-পাওয়ার মতন বিষয় ঘটলেই এমন হয়। তখন সকাল কি সন্ধ্যা কি গনগনে দুপুর মনে হয়, এসব কথা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ভাবা যেতে পারে। খোঁয়ারির নেই। অতি উত্তম স্কচ হুইস্কির এই বড় গুণ। ঘুম যেটুকু হয়েছে খুব গভীর হয়েছে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সিগারেটে প্যাকেট নিতে হলে তো উঠতে হবে। হুঁ, উঠি, তলপেটে চাপও ভীষণ!

সিগারেট জ্বালিয়ে, এসি বন্ধ করে দিয়ে দক্ষিণের একটা শাটার খুলে দিয়ে বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিলাম। কম্বলটা টেনে দিয়ে নিলাম কোলের ওপরে। ডানে সাইড টেবিলে অ্যাসট্রে। সকালটা হঠাৎ মধুর হয়ে উঠেছে দরিয়াকে ভেবে। এমনি দেখলে কিন্তু মনে হয় না, শরীরে অত ঢল। মনে হয় কী কোমল ও নরম! কিন্তু যেভাবে আমার ওপরে চড়াও হয়েছে, সেই মুহূর্তের আগপর্যন্ত তো আমি যেন নিশ্চিতই হতে পারিনি যে দরিয়া ওটা চাইছে। বরং এক ধরনের সংকোচই দানা বেঁধেছিল আমার শরীরে। সেই জড়তা বা সংকোচ সেটিও কাটিয়ে দিল দরিয়া নিজেই। তারপর যখন নিজেকে সম্পূর্ণই জড়তা কাটিয়ে, ভাসিয়ে দিতে চেয়েছি, তার আগে নিজের গোঙানি সাগর পাড়ের ঢেউয়ের মতনই আছড়ে পড়েছে নিজের কাছে, যাতে নিজের জড়তা কেটে গিয়েছে ওই চূড়ান্ত মুহূর্তে; যখন ওই ঢেউ গর্জন করে উঠেছিল রক্তে আর প্রবল উচ্ছ্বাসে তাতে নিজেকে ভাসিয়ে নেওয়ার জন্য আমি অনড় আর অটল, তখনই দরিয়া নিজেকে জমিনের তটরেখার বালুকাবেলা থেকে সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়েছে। আমাকেও সরিয়ে নিতে বলেছে এই বলে, আর আছড়ে পড়ো না, সরে যাও। তা যেন মিনতিরও অধিক কিন্তু মোটেও মিনতি নয়। তটরেখায় না পৌঁছানোর জন্য প্রায় আদেশ। তাই আমার আর সেখানে যাওয়া হয়নি। মেনে নিয়েছি ওর কথা। গুটিয়ে গিয়েছিলাম? তা হয়তো নয় বরং একে গোটানো না বলে বলা উচিত সংবরণ। এর পরেই আবেগে, আবেশে, আলিঙ্গনে দরিয়া আমায় ভরিয়ে তুলেছে। ভরে গিয়েছি। ওর বাহুডোরে বাঁধা আমি এই স্মৃতিটুকু আর জীবনেও যেন ভুলে যেতে পারব না।

কিন্তু ওকি এমনই? এমন কেন করল? ভাবলাম আমি। একি ওই গুপ্ত প্রকাশ্য অথবা জাহির বাতুনি কায়দার চূড়ান্ত প্রকাশ? ধরা দিয়েও ধরা না-দেওয়া। নাকি এটিই ধরা দেওয়া। দরিয়া ধরা দিক, তাও তো আমি চাইনি। দরিয়াও তো তা চায় না। আমাদের ব্যাপারটা সেই যে ছেড়ে দিয়ে ধরে রাখার মতন বিষয়। বন্ধনহীন গ্রন্থি। বাঁধনহীন বাঁধন। আবার কবে দেখা হবে জানি না। হয়তো হবে না অথবা হবে। কিন্তু দেখা হওয়া আর না-হওয়ায় আমরা তো একই থাকব। আমাদের পথ রেললাইনের মতন নাকি সমান্তরাল? পাশাপাশি কিন্তু দুজনের দূরত্বটুকু স্থিরীকৃত। সেই অমোচনীয় দূরত্ব সবসময়ই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের ঘোরতর সংকেত নিয়ে চলমান। তা থেকে কাছে এলেই ঘটবে রেলগাড়িটার লাইনচ্যুতি। তাই বুঝি তা বুঝে দরিয়া আমাকে সেই গড়ন ভাঙতে দেয়নি। হতে পারে অথবা তাও নয়। হতে পারে এটাও পরস্পরের সমান্তরালতা ঠিক রাখার এক পরীক্ষা! তাহলে অতটা এগোনোর কী দরকার ছিল? নাকি গত রাতের দুঃখ ভোলার চেষ্টা? এভাবে ভোলা যায় দুঃখ! নাকি একেবারেই ভিন্ন কিছু। ওই মুহূর্তে দরিয়া আমাকে ভাসিয়ে দিতে দিতে সবই ভুলে ছিল। আমার গর্জনময় গোঙানিতে ওর পাড় ভেঙে পড়ল ওর কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু যেইমাত্র আমি নিজেকে প্রস্তুত

www.fsiblbd.com

ঈদ মোবারক

ঢাকা ওয়াসার
বিল কালেকশনে টানা ৪র্থ বারের মতো
১ম স্থান অর্জন করলো
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

সেবাই আমাদের শক্তি
গ্রাহকদের আস্থা ও ভালোবাসা আমাদের অর্জন।

ISO 27001:2013 CERTIFIED COMPANY

সবার জন্যে সুবসময়

FSIB ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

করে গর্জনকে ছাপিয়ে দরিয়ায় সবেগে হাল সঞ্চালন করে ঢেউ ভেঙে পাড়ে পৌঁছতে চাইলাম, সেই পরমতম মাহেন্দ্রক্ষণে দরিয়ার ফিরোজের সঙ্গে শরীর বিনিময়ের স্মৃতি চোখে ভেসে উঠেছিল। আর কোনো সাড়া ওর কাছে পৌঁছাচ্ছিল না। ওই পাড় উপচানো জলস্রোত থেকে ফেনারা শোলা, শোলা থেকে ফানুস হয়ে উঠে গেল! নয়তো অমন বিনয়ী স্বরে প্রত্যাখ্যান! এও সেই মুহূর্তে দরিয়ার পক্ষেই সম্ভব। এর পরের স্নেহ ও মমতা যা দরিয়া আমায় উপহার দিয়েছে, যাতে আমি নিজেকে বঞ্চিত আর প্রত্যাখ্যাত না মনে করি। তাই কি?

শেষবার ছাই ঝেড়ে তারপরও দুটো টান দিলাম সিগারেটটায়, কিন্তু এই একেবারে শেষাংশে আর ছাই ঝাড়ার মতন কিছু ছিল না। আর একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করলেও উঠিনি। আলোর রেখাটুকুর দিকে চেয়ে থাকলাম। সে নিশ্চয়ই বেলক্ষণ। হাতের তর্জনী আর মধ্যমায় গোঁজা সিগারেটটা ওই অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে তাই মনে হলো, তাহলে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা চিন্তা করেছি, ফিল্টারটা অ্যাসট্রেতে রাখতে রাখতে ভাবলাম।

বাইরে এখন আলোর মিয়ানো ছটা। মেঘলা দিনে পুব দিগন্ত ফুঁড়ে এইটুকুই আসতে পারে। ওই যে সুইমিংপুলের পরের টিলার গায়ে একদল মেঘ ছুটে গেলে তাও আর থাকবে না। ঘুম যখন আর হবেই না। সম্ভাবনা নেই। সম্ভবও না। গত রাতের ঝড় অনেক কিছু সরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ভাবলাম, বরং উঠে মুখহাত ধুয়ে, ওঠো শিশু মুখ ধোও পরো নিজ বেশ থেকে আপন পাঠেতে মনে করো হে নিবেশ বলে, একমাত্র পড়ার উপকরণ, যে পথে হেঁটে এসেছি'টা নিয়ে বসে পড়ি। কাল দুপুরের পর থেকে আর বইটা ধরাই হয়নি। কাল ওই নারী-পুরুষ অংশটা পড়ার সময়ে, পাতা উলটাতে উলটাতে, পেছনের দিকে একটা জায়গায় চোখ পড়েছিল। সে জায়গাটা পড়তে চাই।

মুখহাত ধোয়ার জন্য গিজারের সুইচ অন করে একটা সিগারেট জ্বালানোর পরে মনে হলো, একবারে স্নানটা সেরে নেওয়া যেতে পারে। ক্লান্তি ও আড়ষ্টতা খানিকটা কমবে। ততক্ষণে পেটে যদি খিদে চ্যাগাড় দিয়ে ওঠে, তাহলে সকালের নাস্তাটাও বেশ আয়েশ করে খাওয়া যাবে। নইলে খাওয়াটাও কখনো কখনো প্রায় নিয়ম রক্ষার মতোই হয়।

পাঞ্জাবি-পাজামা পরতে পরতে, চুল আঁচড়ানোর সময় মনে পড়ল, এখানকার লন্ড্রি থেকে অন্য পাঞ্জাবি-পাজামাটা নেওয়া হয়নি। ইস্তিরি করা হয়ে গেলে অবশ্য ওরাই দিয়ে যেত। হয়তো গতকালের বৃষ্টিতে তা শুকাইয়নি। সে কথা ভেবে রাতের কাপড়গুলো টি-শার্ট ও লুঙ্গি ধুইনি। কিন্তু না ধোয়া বাসি কাপড় পড়াও অস্বস্তিকর। কে জানত এমন ঘটবে। কে জানত দরিয়ার অমন নির্দেশমাখানো আমন্ত্রণ! ভবিষ্যৎ তো কোনোভাবেই জানা থাকে না, জানা যায় না।

কাল সন্ধ্যায়ও কি জানা ছিল মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দরিয়াকে আজ আমার সামনে এক নতুন দরিয়া! পর-পর দুই রাতে সে দুজন। দুই ধরনের দুই নারী। পৃথক কিন্তু একক। আবার একই কিন্তু একের ভেতরে দুই!

বালিশে হেলান দিয়ে যে পথে হেঁটে এসেছির সেই লেখাটা খুললাম, এই বইয়ের শেষ গদ্য, পৃষ্ঠা ১৪৭। ওপরে শিরোনামা : 'গৃহবন্দি সময়ের ইঙ্গিত-ইশারা'।

আহমাদ মোস্তফা কামাল লিখেছেন, 'সারা বছর একটা দীর্ঘ ছুটির জন্য অধীর অপেক্ষা করি। ভাবি, যদি পাই অমন ছুটি, তাহলে বিরতিহীনভাবে লিখে যাব, বই পড়ব, সিনেমা দেখব, কিংবা ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াব। এখন আকস্মিকভাবে পেয়ে গেছি ছুটি, না চাইতেই, কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না।'

এই পর্যন্ত পড়ে, লেখকের ইচ্ছা ও সুযোগের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য জানালায় চোখ রাখলাম। এদিকের পরদা সরিয়ে দেওয়ার পরে বইরের পৃষ্ঠায় ঝকঝকে আলো। সে আলোয় বাইরে তাকাতেই মনে হলো, যার ছুটিই জীবন অথবা আজ পর্যন্ত কোনো কাজের দেখা পেল না যে, তার দীর্ঘ কেন কোনো ছুটির জন্য অপেক্ষার আর কী আছে। তবু এখানে আগমন, দরিয়া ও লায়লার বাচ্চাদের স্কুলে ছুটির কারণে আর দরিয়ার এক ছুটির নিমন্ত্রণে! হায়, সেখানে নিজেকে নিজের গর্তজীবীতার থেকে টেনে বের করাই যেন এক ছুটি। লেখকের উপলব্ধির সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাইলেই কি তেলেজলে মিশ খায়? জোর করে খাওয়ানো! এসব ভাবতে ভাবতে বাইরে থেকে চোখ আবার বইয়ে আনতে, দৃষ্টি ছলকে গেল পাশের পৃষ্ঠায়, ১৪৬-এ প্রায় আশি ভাগ ফাঁকা। ওই পৃষ্ঠার ওপরে চারটি লাইন :

'কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে সে মরে গেছে।'

এটা উদ্ধৃতি। অনুচ্ছেদও আলাদা। এর নিচে লেখকের মন্তব্য :

'হায়, ভুল মানুষকে ভালোবেসেছিল কুসুম, ভালোবেসে তাই মরে যেতে হয়েছে তাকে!'

এর নিচে লেখা রচনার তারিখ : 'মে, ২০১৭'

মন্তব্যটা মনে হলো যেন দরিয়াকে নিয়েই। মনে হতে দোষ কী। দরিয়াও তো তাই বলল, ও জ্যান্ত মরা। ফিরোজকে ভালোবেসে! এমন তো খুব ঘটে না, কিন্তু ঘটল, দরজায় টোকা। আমি নিশ্চিত দরিয়া। দরজা খুলতেই একগাল হেসে (একটু লাজুক কি!) দরিয়া ঢুকল রুমে। হাসিটা আরও ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'বাহ, একেবারে ফুলবাবু। বেশ লাগছে তোমায়!'

'সে তো তোমাকেও।'

'আমি শুধু চুল আঁচড়েছি, তোমার মতন গোসল তো করিনি।'

'টিপ পরেছ জামার রং মিলিয়ে।'

'তোমার হাতে ওই বই। কয়দিন ধরে পড়ো?'

'আরে পড়ার সময় পেলাম কোথায়?'

'চলো নাস্তা করে নিই।'

'ওরা?'

'ওরা নটা-দশটার আগে উঠবে? লায়লার রুমে নিশ্চয়ই লিটন।'

'আয়াত একলা?'

'একলা তো কি। তোমার যা হিসাব– বোঝে না কিছু।'

'জারা ওঠেনি?'

'না, ওরা বাপের সঙ্গে নাস্তা খাবে। চলো, আমরা নাস্তা খাই তারপর না হয়, ওই টিলাটায় যাওয়া যাবে, ওটা তো দেখা হলো।'

'কাল রাতে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে তাতে ওঠা যাবে ওখানে! প্রচুর চিনা জোঁক নাকি বৃষ্টি হলেই বের হয়।'

দরিয়া যেন আমার কথা শুনল না। বারান্দার ডান দিকে শিউলি গাছটার পাতায় তাকিয়ে আছে। আমি দরজা টেনে দেখতে দেখতে কথাগুলো বলছিলাম ওকে। কিন্তু ওই শিউলি গাছ এবং এর পেছনের কলাগাছের ঝাড়, বাঁশানি বাঁশের ঝাড়– এভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে? তবে দাঁড়িয়ে দেখেনি, হেঁটেছে খুব ধীর পায়ে। আমি কাছে যেতেই বলল, 'কাল রাতের বৃষ্টিতে একেবারে সবুজ গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে আর এর ওপরে যেই পড়েছে সকালের রোদ, দেখোনি তো, একেবারে যেন সোনারং!'

'তোমার সাহিত্যে কিংবা সংগীত ও নাট্যকলায় পড়া উচিত ছিল গো।'

'তাহলেই হলো, একেবারে ডাব্বা মারতাম।'

ওভারব্রিজের ওপরে দরিয়া আগে উঠে পুবে ঘুরে দাঁড়ালে, সেদিকের গাছের পাতার ফাঁক থেকে কিছুটা সরাসরি আলো এসে ওর মুখে লেগেছে। কমলা রঙের জামা ও সবুজ সালোয়ার, কপালে সবুজ টিপের ওপরে পড়েছে সকালের রোদ! দরিয়া মুখখানাও আভাময়। আমার চোখ জোড়া সেখানে ঠিকরে পড়েছে। ওর উজ্জ্বল শ্যামলা রঙে সূর্যের আলো। ছোট্ট নাকফুলেও রোদের ঝিলিক। দরিয়া আমার তাকানোটা দেখে হাসল একটু। চোখ জোড়া বড় করে বলল, 'আসো একটা ছবি তুলি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটার একটু নমুনা রাখব না, তা কি হয়?'

'আচ্ছা, নমুনা। তুমি ছবিতে রাখো, আমি মনে রেখে দেব।'

'খালি সিনেমার ডায়ালগ! না? নমুনাই। কিন্তু আমি যে মনে রাখব না, সেটা তোমাকে কে বলেছে?'

'মনের চেয়ে বড় রাখার জায়গা আছে নাকি?'

'ওই আমি শর্মিলা ঠাকুর আর তুমি উত্তম কুমার নাকি? ছবিটা দারুণ। শোনো ফেসবুকে যখন আপলোড করব না এটা, তখন মনেই রাখা। মনে পড়লে দেখব।' বলতে বলতে আমাকে বাঁ হাতে টেনে ডান হাতে সেলফি তুলল দরিয়া। আমরা ক্যাফেটেরিয়ার দিকে সামান্য ফেরা। অফিস দালান ও গাছগুলো পেছনে।

ছবি তোলা হতেই দরিয়ার দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমারে বোঝে সাধ্য কার? মনে পড়লে দেখবে– এটা তবু স্বীকার করলে কিন্তু কোনোদিনও বলো না তো। আবার বলো। লাগছে মন্দ নয়।'

'হইচে কী এই সকালে, খালি বাংলা সিনেমার ডায়ালগ।'

'কিন্তু তোমাকে বোঝা যে যায় না, সেটা তো মানলে। এটা তো আর সিনেমার ডায়ালগ দিইনি।'

'কেউ তো বুঝতে চায়নি কখনো। তাই বুঝতেও দিইনি।'

'চাইলে দিতে?'

'ভেবে দেখতাম।' বলে, হেসে উঁচু গলায়, 'হইচে, চলেন চলেন। এখানে আর ওইসব লাগামছাড়া কথা নয়। এখানকার এই শিফটের সব কটা ছেলে-মেয়ে আমাকে খুব ভালো চেনে। আমার মুখে এসব কথা শুনলে ওদের এমন দশা হবে যে মুখ থেকে আর কথাই বের হবে না, বুঝলেন!'

ক্যাফেতে ঢুকে বাঁ দিকে কোনার ছোট টেবিলটাতে মুখোমুখি বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিঠুন আর সাথি এসে হাজির। সাথি কপালে বেশ বড় করে টিপ পরেছে আর সিঁথিতে সিঁদুরও দিয়েছে বেশ গাঢ় করে। ফলে এর সঙ্গে ওর সাদা শার্ট, কালো কোটি ও প্যান্টে আবৃত ছোট্টখাটো শরীরটাকে বেশ বিচিত্র লাগছে। অলংকরণে দেশি, পোশাকে বিদেশির মিশ্রণ। কাল সকালে ও আসেনি। নাকি এলেও খেয়াল করিনি।

দরিয়াকে 'গুডমর্নিং ম্যাম' বলে মিঠুন খাবারের অর্ডার নিয়ে যেতেই সাথি বললেন, 'ম্যাম, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।' দরিয়া কপাল কুঁচকে একটু বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাতে যোগ করলেন, 'স্যারকেও।'

'তাই বলো। স্যারকে সুন্দর লাগছে সেটা বলার জন্যই আমাকেও বলা, না?' দরিয়া বেশ ছড়িয়ে হাসল, 'থ্যাংক ইউ, সাথি। স্যারকে সত্যি সুন্দর লাগছে, না?'

'জি, ম্যাম।'

'স্যার এমনিতেও খুব সুন্দর মানুষ। খাওয়ার পরে তুমিই আমাদের কফি বানিয়ে দেবে ঠিক আছে?'

সাথি সরে যেতেই দরিয়া একটু নিচু গলায় আমাকে বলল, 'দেখেছ, শুধু আমি তোমায় ফুলবাবু বলি, এইটুকু মেয়েটাও তোমাকে দেখে মুগ্ধ!'

'আমিও আজ সকালের তোমাকে দেখে মুগ্ধ!'

'হইছে। কাল রাতে খুব–' দরিয়া গলা আরও নিচে নামাল, 'খারাপ লেগেছে তোমার? দুঃখ পেয়েছ?'

দরিয়ার চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, কেন এমন বলছে ও, কী নিয়ে বলছে। ওকথা যাই হোক আবার তা তুলে কী লাভ। হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতন করে বললাম, 'দুঃখেরও

সাধ্যি নাই, আমারে দুঃখ দেবে।'
'জানতাম, আবার সিনেমার ডায়ালগই দেবে নয়তো গান কলি বলবে।'
'এটা যে বাংলা সিনেমার গান, তাও তুমি জানো নাকি?'
'কেন জানব না, একজন তো ওসব বাংলা সিনেমায় গাইতেন। আর দেখতে আচরণ প্রায় তোমার মতোই ছিল, ছিল কি আছে। শুধু ভেতরের মানুষটা এক নয়।'
আবারও নীরবতা। ক্যাফেটেরিয়ার অন্য টেবিলগুলোতেও আরও আট-দশজন আছে। কথাবার্তা তারাও বলছেন। চামচ প্লেট ও তাদের খাওয়ার শব্দের ভেতরে এই নীরবতা। এমন সকালটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ফিরে আসতে চেষ্টা করে বললাম, 'এদের ওমলেটটা এমন পাতলা হয়, যেন পাটিসাপটা।'
'দেবে আর একটা? বলব?'
'আরে না। ভালো বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা। এটা আমাদের দেশের মায়েদের স্বভাব। সেটা আমাদের জেনারেশনেও বাহিত।'
দরিয়া এ কথার কোনো উত্তর দিল না। আমার কথার মাঝখানেই টেবিলের ওপরে রাখা ওর ফোনে একটা মেসেজ ঢোকার শব্দ হলো। ও আমাকে আর-একটা ওমলেট দেওয়ার কথাটা শেষ করেছে, মুখে পরোটা ও ডিম, এর ভেতরেও এক হাতে ফোনটা চোখের সামনে নিল। ওদিকে আমার কথাটাও খেতে খেতে শেষ করেছি। দরিয়ার মুখের দিকে তাকাইনি। কিন্তু ও কোনো উত্তর না দেওয়ায়, মুখে তাকাতে লক্ষ করলাম, সেখানে ছায়া, মুখ ঈষৎ গম্ভীর। জানতে চাইলাম, 'কী হলো?'
দরিয়া বিড়বিড় করে ওই ছায়াফেলা মুখে জানাল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। টুটুলভাই মেসেজ লিখেছেন, 'সিচুয়েশন ইজ নট গুড, আপা।' বলে, দরিয়া ফোনে টাইপ করল কিছু-একটা। ফোনটা রাখতে রাখতে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। লিখেছি, জানান কেমন কী? একটা আননোন নাম্বার থেকে মেসেজটা এসেছে।'
সাথি আমাদের টেবিলের পাশে এসে খাওয়া কোন পর্যায়ে দেখে চলে গেলেন। দরিয়া বলল, 'কী জানি কী অবস্থা। তেমন কিছু হলে টুটুলভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব। পিয়ালের সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে না।'
'চলো, আমিও যাব।'
'আগে তো দেখি। আচ্ছা তুমি আজ কুলাউড়া যাবে বলছিলে।'
'চেয়ে তো ছিলাম। যদি তবু অনুমতি পাই, দেবী।'
'আমি অনুমতি দেওয়ার কে?'
'ওমা, তোমার ডাকে সাড়া দিয়েই তো এসেছি।'
'তাই আমি বিদায় করলেই যেতে হবে?'
'তাই তো।'
'আচ্ছা। তাহলে চলো তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাই, যাবে?'
'না বাবা, ডর লাগ রাহা হ্যায়।'
'তাইলে? কফিটা কী ভালো বানিয়েছে মেয়েটা।'
সাথি শুনে ফেলছে। ফিরে দেখলেন আমাদের। দরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এইমাত্র যা বললে এটাও নিশ্চয়ই হিন্দি সিনেমার ডায়ালগ?'
'না, গান।'
'সারা দিন মাথায় এইসব তোমার?' হাসতে হাসতে বলল দরিয়া।
হাসলাম। দরিয়ার ফোনে মেসেজের শব্দ। ও ফোনটা হাতে নিল। সেখান থেকে চোখের সামনে। মুহূর্তে মুখ-চোখের ওই হাসি বদলে গিয়ে মুখটা একটু শক্ত হলো। দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল ফোনে। চোখে বিস্ময় ও রাগ, 'ইম্পসবিল বলে কী?'
'কী হয়েছে?' গলা নামিয়ে জানতে চাইলাম। গুরুতর কিছু-একটা যে ঘটেছে, তা দরিয়ার ফোনের দিকে চাহনিতেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু ও কোনো উত্তর দিল না। ফোনের দিকেই থাকল। একবার শুধু মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে দেখল। সে মুখে থমথমানি। এর পরে ফোনটা দুই হাতে ধরে টাইপ করল। আমি কফিতে চুমুক দিয়ে আবারও নিচু গলায় জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে? খারাপ কিছু?'
'হুঁ।' টাইপ করতে করতে অস্ফুট জবাব, 'খারাপ—। অবস্থা মোটেই ভালো নয়।'
'কী হয়েছে, বলবা তো।'
'পিয়ালকে থানা থেকে জানিয়েছে, বাড়িতেই থাকতে। ওর বাড়িতে তারা আসবে।'
'মানে?'
'এর বেশি আর কিছুই টুটুলভাই লেখেনি। হয়তো লেখা সম্ভব নয়। এটা অন্য নাম্বার থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ।'
'তার মনে পুলিশ পিয়ালকে সিকিউরিটি কাস্টডিতে নিতে চায়। নইলে ওর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এ রকম কিছু?'
'কী করে বলব? আমি লিখেছি দরকার লাগলে জানাতে, যাব থানায় বা পিয়ালের বাড়ি।'
'তুমি যাবা? তুমি তো স্থানীয় নও। যদিও এ জায়গার সবই তোমার চেনা জানা। তাতে তোমার কারণে পুলিশ বা এই টুটুল— এদের কোনো সমস্যা না হয়।'
'সেটা হলে টুটুলভাই জানাবে, আপা আসার দরকার নেই। দেখি না কী লেখে।'
দরিয়া হাতের ইশারায় মিঠুনকে ডাকল। মিঠুন কাউন্টার ছেড়ে একটু গম্ভীর মুখে দরিয়ার কাছে আসতে ও বলল, 'মিঠুন, এই স্যারের পাজামা-পাঞ্জাবি আছে লন্ড্রিতে, ওটা এখন পাওয়া যাবে।'
মিঠুনের মুখ দেখে মনে হলো, দরিয়ার চোয়ালের গম্ভীরতা পড়ে নিতে পেরেছেন। খুব শুকনো মুখে জানালেন, 'ম্যাম, লন্ড্রি তো এখনো খোলেনি। আচ্ছা দেখি কী করা যায়। স্যারের রুম তো নাইন জিরো ফোর।'
'হুঁ।' মিঠুন সরে যেতেই দরিয়া আমাকে বলল, 'চলো, তোমার তো এখন আবার তামাকে টানার সময়, চা কফি খেয়ে ওটা না জ্বালালে তোমার সঙ্গে প্রাণ থাকে না। তুমি সিগারেট খাবা আর আমি তোমার ছবি তুলব।'
'মানে?'
'মানে খুব সোজা। আমার ছবি তোলার ইচ্ছে হতে পারে না, সখা? নাকি সে ইচ্ছেরও কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই।'
'কী কথা!' পাঞ্জাবির সাইড পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার বের করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে সাথিকে কিছু-একটা বলে আমার দিকে আসা দরিয়াকে দেখলাম কাচের বাইরে থেকে। এই নারী, নাম দরিয়া, অর্থাৎ নদী, নদীর চেয়েও রহস্যময়। কিছু বোঝা যায় না তার। কখন শাওনের ভরা সোতা গাঙ আর কখন পৌষের থির গাঙ! কে বুঝবে? শুধু মুগ্ধতা ছড়ায়। উন্মোচনহীন রহস্যেও অপার মুগ্ধতা। দেখলেই তা বাড়ে। বাড়তেই থাকে। কিন্তু কখনো যেন তা উন্মোচনের সুযোগ দেবে না।
'কী! বলামাত্রই জ্বালানো সারা, তাই না?' এরপর কাচের দরজার কেউ নেই দেখে নিয়ে বলল, 'এখন আর কাছে আসবা না। সিগারেটের গন্ধ অশ্লীল!'
ওভারব্রিজের নিচ থেকে সুইমিংপুলের পাশের রাস্তায়, পেছনের টিলা ডান থেকে ওপরে তাঁবু কটেজ, এখানে আসতেই দরিয়া বলল 'এখানে দাঁড়াও। দুই দিকের টিলা এখানে বোঝা যায়।'
আমি দাঁড়ালাম। দরিয়া পেছনে সরে গিয়ে ফোন তাক করে আবার সামনে এসে আমাকে আরও একটু ডানে সরতে বলল। এই সোজা টিলাটা উঠে গেছে। পাশেই ন্যাড়া মাথার একটা চা-গাছ। ইশারায় সেদিকে আর একটু সরতে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'সিগারেটা ঠোঁটে রাখবা। ডান হাতে।'
দরিয়ার নির্দেশ মানলাম। কিন্তু দুই হাতে ওর চোখের সোজা উঁচু করে ধরা মোবাইল নামিয়ে নিয়েছে ও। তোলেনি ছবি। সেখান থেকে ডান হাতে। নিশ্চয়ই আবার মেসেজ এসেছে। দরিয়ার মুখ আবার শক্ত হয়ে উঠল। মোবাইলটা চোখ বরাবর একটু নিচে ধরল। ওর স্বরে আর্তনাদ, 'শিট। থানায় নিয়ে গেছে।' বলে, দরিয়া তাকাল আমার দিকে। 'একটা পোস্ট শেয়ার করার জন্য থানায়। অনুভূতিতে আঘাত লাগার আশঙ্কা। বোঝো কিছু?'
এরপরে দরিয়াকে কিছু-একটা টাইপ করতে দেখলাম। ও আমার একেবারে সামনে এসে বলল, 'আর ছবি তোলা হলো না। যাও, ব্যাগ গোছাও। আমি এখন থানায় যাব?'
'আমিও যাব তোমার সাথে?'
'না, তোমাকে স্টেশনে দিয়ে আমি থানায় যাব। অথবা টুটুলভাই

আপনি কেন
বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এ
পারিবারিক ও গোষ্ঠী তাকাফুল করবেন?

- ইসলামি শরি'আহ ভিত্তিক সুদ মুক্ত পারিবারিক ও গোষ্ঠী মুদারাবায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হালাল সঞ্চয় পদ্ধতি অনুসরণ
- ঝুঁকি নিরসনে তাবাররু ফান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ চর্চা করা
- অ্যাপস ও ওয়েব সাইট ভিত্তিক সার্বক্ষণিক ডিজিটাল সেবা পাওয়ার সুবিধা
- তাবাররু তহবিল নীতি অনুসারে দ্রুততম সময়ে তাকাফুল সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান হতে ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম প্রদান এবং পলিসি তথ্য পাওয়ার সুবিধা
- পারিবারিক ও গোষ্ঠী তাকাফুলের আওতায় সকল প্রকার জীবন ও স্বাস্থ্য তাকাফুল সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ

আপনার ও আপনার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তায় গ্রহণ করুন ঃ

- বেঙ্গল সঞ্চয়ী তাকাফুল
- বেঙ্গল গোষ্ঠী তাকাফুল
- বেঙ্গল শিশু নিরাপত্তা তাকাফুল
- বেঙ্গল স্বাস্থ্য তাকাফুল
- বেঙ্গল পেনশন তাকাফুল

ইসলামি শরি'আহ মোতাবেক পরিচালিত

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
BENGAL ISLAMI LIFE INSURANCE LIMITED
জীবনের সাথে

প্রধান কার্যালয় ঃ আজিজ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৯৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ + ৮৮ ০২ ২২৩৩৫৭৭৩৬, + ৮৮ ০৯৬৭৮১৭১৭১৭
ইমেইল ঃ info@bengalislamilife.com.bd

09678171717 | www.bengalislamilife.com.bd

যেখানে যেতে বলেন। ওদের হাতে টাকা-পয়সা কী আছে না আছে কে জানে। আমার যাওয়া দরকার। পিয়ালের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। এখানে প্রথম যখন আসি ছেলেটা আমার জন্য যা করেছে, সে ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না।'

দরিয়া আমাকে চলে যেতে বলছে। কিন্তু ওকে এই অবস্থায় রেখে চলে যাব? অবশ্য লায়লা-লিটন আছেন। আমাকে বাড়তি চিন্তা না করলেও চলবে। আমি ওভারব্রিজে উঠে রুমের দিকে যেতে যেতে দরিয়া বলল, 'অফিসে বলি একটা সিএনজি আনতে। বলে আমি রুমের দিকে আসছি।'

'কেন তোমার গাড়ি আননি?'

'থানায় গাড়ি নিয়ে যাব না। সমস্যা আছে। মনে হবে পিয়াল লোকজন খবর দিয়েছে। আগে গিয়ে সিচুয়েশন দেখি।'

রুমে ঢুকে দেখলাম, টিভির নিচের টেবিলে লন্ড্রি থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি রেখে গেছে। মিঠুনের কাজ। অফিস থেকে অন্য চাবিটা নিয়ে খুলেছে। আমাদের বিরক্ত করেনি। হয়তো ও দরিয়ার মুখের থমথমানিটা বুঝতে পেরেছে। অথবা এটাই ছিল কাউন্টার দরিয়ার নির্দেশ।

ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে বারান্দায় বেরোতে দরিয়াকে দেখলাম ওভারব্রিজের ওপরে। ঘাড়ে একটা সাইডব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়েছে। মুখে একদমই হাসি নেই। চোয়াল আরও শক্ত যেন দাঁতে দাঁতে চেপে আছে। মুখে আলো পড়ায় চোয়ালটা আরও শক্ত লাগছে। থমথমানি ভাবটা পুরোটাই পড়ে নেওয়া যাচ্ছে।

আমার দিকে চেয়ে শুকনো হাসি হাসল দরিয়া। বলল, 'বোঝো অবস্থা! সাদা কাপড় জড়িয়ে জ্যান্তমরা না এমনিতেই আমরা জ্যান্তমরা! কোনটা? একে বাঁচা বলে? বেঁচে থাকা বলে? বলো, আমরা এমনিতেই সব লাশ।'

'কী বলব, বলো?'

'আমরা জেলখানায় না, আছি কাফন পেঁচিয়ে কবরে। বলো ঠিক কি না? ছেলেটার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে। কত আনন্দ করব ভেবেছি। বলেছে, আপু আপনে আইতায় নায় বিয়ায় [আসবেন না বিয়েয়]?

'তাই নাকি?'

'তো কী? আর কী করেছে ও? কার পাকা ধানে মই দিয়েছে বলো?' দরিয়া উত্তেজিত হচ্ছে। থামানোও তো ঠিক না। তাহলে একেবারে ফেটে পড়তে পারে। আবার এমন উত্তেজিত হওয়াও কাজের কথা হয়। বললাম, 'ঠান্ডা থাকো। এ সময়ে ধৈর্যই সব। দেখে কী হয়। আমি যাব তোমার সাথে?'

'না তো বললাম। ঠান্ডা থাকা অত সোজা? চাইলেই থাকা যায়। পারলে বাংলা সিনেমার গান ধরো।'

ওভারব্রিজের থেকে নেমে অফিসের সামনে সিএনজির অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। অফিস থেকে একজন তরুণী বেরিয়ে দাঁড়ালে দরিয়া তাকে কাছে ডেকে নিচু গলায় বলল, 'মনিয়া, মনে আছে তো। ওদের সাড়ে নটায় ডেকে দেবেন। রুম নাইন টু জিরো। বলবেন আমি সদরে গেছি। যেন ফোন না করে। টেক্সট দেয়। দরকারে তোমার ফোন থেকে যেন কল করে।'

'ম্যাম, এখন সদরে কোথায় যাচ্ছেন?'

'থানায়। ওদের তোমার কিছু বলার দরকার নেই।'

'ওকে।'

দরিয়ার গলার স্বর ফুটছিল। কিন্তু ও হয়তো বুঝছিল না। আপাত স্থির ও ঠান্ডা দরিয়ার গলায় ক্রোধ। সিএনজি ঢুকতে মুনিরা একটু এগিয়ে সেটাকে ঘুরতে বলে দরিয়া কাছে জানতে চাইল, 'ম্যাম, আপনার ওখানে কোনো দরকার লাগলে আমাকে জানাবেন।' ফরসা মেয়েটার গাল এই কথায় আরও ফরসা হয়ে উঠল। সেটাও কি রাগে নাকি সে বুঝতে পারছিল দরিয়ার কোনো সংকট। সৌজন্যের খাতিরে সে বিষয়টা জানতে চায়নি।

সিএনজি নভেমের বাইরে আসতেই দরিয়া ওর বাঁ হাতটা আমার ডান হাতের ওপর রাখল, 'মাইন্ড করলা? এইভাবে তোমায় ভাগিয়ে দিচ্ছি?'

গাছের পাতায় আলো আটকায় তাই সিএনজিতে ভেতরেও আলো-আঁধার খেলছে। গ্র্যান্ড সুলতান ছাড়িয়ে সদরের দিকে গেলে এটা আর থাকবে না। সেখানে রাস্তা মসৃণ আর বড়। সরু আর কোথাও কোথাও খোয়া ওঠা এই রাস্তায় খানিক ঝাঁকুনিতে দরিয়ার দিকে চাইলাম, কেন এটা বলছে। আমি উত্তর দেওয়ার আগেও বাঁহাতে আমার ডান হাত জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আমার কাছে সরে এলো, ছোট্ট ব্যাগটা ওর কোলের ওপরে। আরও বলল, 'কিছু মনে কোরো না, কিন্তু।'

'কী যা-তা বলো না। কাজ নেই আর।'

'কী যা-তা। ওমা– দেখো না।' বলে ঘাড়ে মাথা, 'এই পরিস্থিতি হঠাৎ। তোমার সেই মনসামঙ্গল লোকটার ফোন নাম্বার-টাম্বার আছে তো?'

'আছে।'

'তবে আর কী। এখান থেকে এক স্টেশন। ঘণ্টাখানেকের ভেতরে ট্রেন আসবে।'

'জানি।'

'আর কী জানো? বলো।'

'জানি না।'

'আমার কথা মনে থাকবে?'

'জানি না। থাকবে। তুমি এখন মাথা ঠিক রাখো। দেখো গিয়ে।'

'হুঁ। মনে পড়লে ফোন কোরো।

বড় রাস্তায় পড়তেই দরিয়া একটু সরে বসেছে। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, 'জানতাম, এটাই হবে। কতবার বলেছি চা শ্রমিকদের ভেতরে কাজ করিস, নিজেকে সাবধান রাখিস। শুনল ছোঁড়া!' এরপর ড্রাইভারকে নির্দেশ, 'ভাই আগে রেলস্টেশন যাবেন।' এর পরে আবার বিড়বিড়ানি, হাতটা নামিয়ে আমার হাতের ভেতরে হাত দিয়ে উচ্চারণ করল যেন কেউ শুনছে না আবার শুনছেও :

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।
এখনো রাত শেষ হয়নি,
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবার উঁচিয়ে আছে।
তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকর শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাওনি।

এর পরে আমার হাতটা শক্ত করে চেপে দরিয়া বাইরে তাকাল। এতক্ষণ কিলোমিটারব্যাপী চা বাগানের মাঝখান থেকে এসেও তার কিছু যেন চোখে পড়েনি। আমি শুধু সামনেটাই দেখেছি, দরিয়ার মুখের দিকেও তাকাইনি। রাস্তার একপাশে আরসিসির ঢালাই হচ্ছে, সেখানে অটোরিকশাটা ঝাঁকুনি খেলে সামনে থেকে চোখ সরিয়ে আনলাম ওর মুখে। কী শক্ত! এখনই চোখে বিস্ফোরণ ঘটবে। অথচ সেখানে জল। কোনো গাড়ির আওয়াজই আর কানে আসছে না। আবার দরিয়ার মুখটায়ও তাকাতে পারছি না। ও তাকাল আমার দিকে, একটু যেন হাসলও। আবার বাইরে ওর মুখ। চোখে অসহায়ত্ব।

লেভেলক্রসিং ছাড়িয়ে দুই পাশের দোকানের পরে, বাঁয়ে স্টেশন রোডের দিকে সিএনজি ঘুরতেই দরিয়া আমার দিকে তাকাল। মুখে হাসি। হাতে চাপ দিল। আবার হাসি। এর পরে মূল চত্বরে ঢুকতেই হাতটা ছেড়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে আমার ডান গালে চুমু খেয়ে বলল, 'সাবধানে যাও, সখা। দেখা হবে আবার।'

আচ্ছা। আমি ওর মাথাটা ডান হাতে চেপে ধরে বললাম, 'থানায় পৌঁছে একটা টেক্সট দিয়ো।'

সিএনজি থেকে নামতেই ওর নির্দেশ, 'যাও, স্টেশনে ঢোকো, পেছনে তাকাবে না। তারপর আমি যাব।'

কে শোনে? প্লাটফর্মে উঠে পেছনে তাকালাম। দরিয়ার সিএনজি ঘুরছে। ও হাত নাড়ল। হাতটাই আবার দেখলাম। আমি ঘুরে ডান দিকে একটা পিলারের নিচে গোল বেঞ্চিতে বসে রইলাম ঝিম মেরে!

কাজল শাহনেওয়াজ

অপরূপগঞ্জ ও সুজাতা স্বাধীন

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

১

অপরূপগঞ্জ জেলা শিল্পকলা মিলনায়তনে হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক ছড়া উৎসব'। দেশের নানান অঞ্চল থেকে তো বটেই, পার্শ্ববর্তী দেশের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা/মহকুমা থেকেও অনেকে এসেছেন উৎসবে। এ ছাড়া দেশে থাকা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ করে একজন রুশ কবি, ঢাকায় এই মুহূর্তে বেড়াতে আসা একজন সোমালি কবি, ইথিওপিয়ার নাগরিক/দূতাবাসে কর্মরত একজন সমালোচক, ভুটানে বেড়াতে আসা এক ইউরোপীয় পর্যটক, যে এখন বাংলাদেশে– এমন একজন কবি ও এই উৎসবে এসেছেন। তাই অনায়াসেই একে আন্তর্জাতিক বলা যায়।

উৎসবের প্রধান আয়োজক স্থানীয় এক দৈনিকের সম্পাদক ইসরাফিল সাহেব। উনি নিজে নিয়মিত স্থানীয় সমস্যা নিয়ে সম্পাদকীয় লিখতে সিদ্ধহস্ত, তা ছাড়া তেমন সাহিত্যকর্মের কোনো পরিচয় নেই। তবে নিয়মিত বিরতিতে উনার দপ্তরে সাহিত্য সভা করে থাকেন। সাহিত্যের প্রতি তার যত টান, সাহিত্যের সামাজিক শক্তির প্রতি টান আরও বেশি। এই শহরে তার পৈতৃক একটি বাড়ি আছে, সেখানে ছাদে বাগান করেছেন। বেশ বড় সেই ছাদটা। ঢাকা থেকে বা দূরের কেউ এখানে এলে উনি নিয়মিত সেই ছাদটা দেখান, ছাদের নানান রকম গাছপালা সম্পর্কে শাইখ সিরাজের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক বক্তৃতাও দেন। তবে প্রতিবেশী অন্যান্য বাসা থেকে যারা তাকে ছাদের টবে পানি দিতে দেখেছেন, তারা বলেন, ওনাকে নাকি তখন দেখতে লাগে গরিব ঘরে কেউ যখন নিতান্ত অবহেলায় কুকুরকে ফেন খেতে দেয় সেই রকম 'উব্যুৎ করা বালতি'!

ইসরাফিল সাহেব এই উৎসবটা অনেকটা ক্যু করে নিজের আয়ত্তে এনেছেন। অনেক বছর আগে অন্য একদল তরুণ এটা শুরু করেছিল, তাদের থেকে এটা নিয়ে নিজের আয়ত্তে আনেন। আসলে এখন আর তা ছড়া উৎসব নেই, এখন এটা রীতিমতো সাহিত্য উৎসব। কবিতা পড়া, নাটক নিয়ে আলোচনা, আঞ্চলিক গান, ছড়া পাঠ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্কুলের ছাত্রীদের নৃত্য, নৃত্যনাট্য শো, নাটক– সব কিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী টানা অনুষ্ঠান হয়। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ শব্দ!

২

অপরূপগঞ্জে একটা কাজে এসেছিলাম। এই শহরে আমার বাড়ি, কিন্তু বহুদিন আসা হয় না। এবার এসে ঠিক করলাম কয়েক দিন কাটায়ে যাব। সময়টা শীতকাল শেষ হয়ে বসন্ত আসি আসি করছে। সামনেই দোলপূর্ণিমা।

শহরটা বেশ অচেনা হয়ে গেছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি জনসংখ্যা সারাদিন মানুষে মানুষে একাকার। ঘন ঘন ব্যাটারিচালিত থ্রিহুইলার চলাফেরা করছে। হাটার পথ রুদ্ধ, কিন্তু সামান্য ভাড়াতেই শহরের এ মাথা-ও মাথা চলাফেরা করা যায়। আগের চাইতে বেশি দূরে চলাফেরা করা যায়।

প্রথম দিন এসেই ভাবতে লাগলাম, কী করি কী করি, কোথায় যাই! পরের দিন ভোরবেলা মনে হলো পুরনো দিনের হর্টিকালচার ফার্মটা দেখে আসি না! তিন চাক্কায় চড়ে গেলাম সেখানে। প্রথমেই ধাক্কা খেলাম, নতুন প্রবেশ পথে। আগে ছিল উত্তর দিকে, একটা গলির মুখে, এখন পশ্চিমে, সদর রাস্তায়। ভেতরের ল্যান্ডস্কেপ বদলে গেছে। আগেকার সেসব আম পেয়ারা নেই, এখন নতুন নতুন জাতের নানান বর্ণের চক্ষুহরা গাছ। এগিয়ে যেতে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পুরনো দীঘিটাকে পেলাম, তার পাশে সেই যুগে নারকেল গাছগুলো অনেক বড় হয়ে প্রৌঢ় হয়ে গেছে। তাকালে মাথা উঁচু করে ঘাড় বাঁকাতে হয়। নিজের ভেতর একটা মন-চাপা বাতাস গুমরে উঠল! আমার সেই যুগের বান্ধবীরা এখানে এখন থাকলে তাদের নিশ্চয়ই এমন প্রৌঢ়রূপে দেখতাম। হায়রে সময়!

শহরে অনেক কাঠের ফার্নিচার বানানোর দোকান হয়েছে। আজকাল মানুষের কি খুব খাটের প্রয়োজন? সেমিডাবল বক্সখাট বানাচ্ছে দলে দলে কাঠের মিস্ত্রিরা। নতুন নতুন যন্ত্র উঠেছে হাতে, আগেকার সেই ছুতার নাই আর দেশে– হাত করাত নাই, রান্দা নাই, বাইসা নাই, কাঠ ফুটা করার ধনুকের মতো যন্ত্রটা নাই। স'মিল থেকে কাঠ চেড়াই করে এনে যন্ত্র দিয়ে কাঠ টুকরা করতেছে, যন্ত্র দিয়ে চাছতেছে, যন্ত্র দিয়ে গোল করে কাটতেছে, ফুটা করতেছে, জোড়া দিতেছে। সব যান্ত্রিক, মোটরচালিত, ইলেকট্রিক। চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়!

একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো, উনি আগে স'মিলের মালিক ছিলেন। গাছ কাটতে কাটতে একদিন তার এক শ্রমিক করাতে জড়ায়া দুই টুকরা হয়ে যায়। তারপর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেলে কয়েক মাস জেল হওয়ার পর জেল থেকে ছাড়ায়ে আনার জন্য তার মিলটি বেচে দিতে হয়। জেল থেকে সে বের হয়ে গাছের চারার নার্সারি দিয়েছে। এখন সেখানে সে আতর গাছের চারা গজানোর চেষ্টা করতেছে। গোপনে নাকি একদিন গাছের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে। গাছেরা তাকে মিলে কাঠ চেড়ার সময়কার ব্যথার কথা বলেছে। খুব নাকি ব্যথা হয়, মরণ যন্ত্রণা হয়। গাছেরা তো সবাই মিলে একটা প্রাণ, একজন ব্যথা পেলে অন্যজনেও তা টের পায়।
আমাদের বাসার সামনে একদিন এক ফার্নিচারের রং মিস্ত্রির সঙ্গে কথা। এই তরুণ দেখতে টিভি নাটকের নায়কের মতো, কিন্তু এইট পাস, পড়াশোনা কম। এখন মেহগনি কাঠের খাটের কাজ করে। খাটের মাথার দিকটায় অন্য মিস্ত্রিরা নানা রকম ফুলদানির নকশা এঁকে দেয়, সে আর তার এক সঙ্গী মিলে ৭ দিনে রং করার কাজ শেষ করে। ৩ দিন লাগে ঘষাঘষির কাজে, ৪ দিন লাগে রং করতে। মজুরি দুজনে ৩ হাজার টাকা। কাজ করার সময় মোবাইলে গজল শোনে।

২২ ফাল্গুন এবার ৭ মার্চ পূর্ণিমা তিথি, দোলযাত্রা। বাতাসে নব বসন্তের হাওয়া, থেকে থেকে ভেসে আসছে অজানা ফুলের ঘ্রাণ। কোকিলের কুউউ-কুউ ডাক এখনো এই মফস্বল শহরের আকাশ ভেদ করে নভোমণ্ডলে বিলীন হওয়ার আগেই আবার ফিরে আসে এই মাটির পৃথিবীতে। মানুষের মন উতলা করে।

দোলপূর্ণিমায় ৫৬ প্রহর বা ৭ দিন নামকীর্তন দলের সঙ্গে মিশে যাবে সুভাষ। দলের সঙ্গে তখন সে ঘুরে ঘুরে গাবে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'। সারা দিন ধরে অবিরাম কীর্তন হবে, একেক দলে তিন ঘণ্টার শিফট। বাঁশি, চটি, খমক, করতাল, হারমোনিয়াম সহযোগে সমবেত কণ্ঠে গাইবে আর নাচবে পুরো সম্প্রদায়।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে

গৌর গোপাল সম্প্রদায়, মা চণ্ডী সম্প্রদায়, নবসখী সম্প্রদায় ইত্যাদি নামের দল আসবে। আসন্ন দিনগুলোর কথা ভেবে সুভাষের মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সারা বছরের জরাজীর্ণ সময়ের ভেতর থেকে নির্জীব হয়ে যাওয়া মনটা লাফিয়ে ওঠে। আহা, নামগান শুনে ভাবের উদয় হলে তাকে এসে বুকে জড়িয়ে ধরবে কত না জন, কেউ বা সাক্ষাৎ ভগবান ভেবে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে!

৩

ব্যানার দেখে আমি একদিন ছড়া উৎসবে ঢুকে পড়ি।
পরিচিত বাবুল রেজা তার শিশুকন্যাকে তখন মঞ্চে পাঠাচ্ছে আল মাহমুদের ছড়া পড়তে।
ছড়া উৎসব জমে উঠেছে পুরো দমে।

শিল্পকলার প্রাঙ্গণ জুড়ে কয়েকটা স্টল বসেছে। সেখানে একটা জিলাপী আর শুকনা মিষ্টির দোকান, একটা বইয়ের, একটা কাঠের হস্তশিল্পের, একটা মাটির কারুশিল্পের, একটা জামা কাপড়ের, একটা

চা ও পিঠার দোকান। সব কিছু একটা একটা করে আমন্ত্রণ করেছেন সম্পাদক সাহেব। চা ও পিঠার দোকানি অবশ্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেলা করেন, এবার কাশ্মীরেও স্থানীয় পিঠা নিয়ে যাবেন বলে জানালেন।

ঢাকা ও ইন্ডিয়ার ছড়াকাররা স্থানীয় ছড়াকারদের সামনে ভাব দেখিয়ে চলাফেরা করছে। তারা নানারকম রংদার পোশাক পরে এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নামকীর্তনের কীর্তনিয়াদের মতো বছরের এ কটা দিন যেন ওদের সামনে রাজকীয় বিহারের সম্মান নিয়ে আসছে। ইন্ডিয়ার ছড়াকারদের সঙ্গে স্থানীয় দু'চারজন ছড়াকার গদগদ চিত্তে চোখে মুখে আতিথেয়তা প্রকাশ করে ঘুরছে। এতে দাদাদের শরীরের ভাষায় বেশ দাদাগিরি ফুটে উঠছে। ঢাকা থেকে আগত ছড়াকার আসলাম সানী শিল্পকলা থেকে একটু দূরে চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাচ্ছে। প.বঙ্গ থেকে আগতদের কয়েকজনকে ভিআইপি সুযোগ দিয়ে সার্কিট হাউজে রাতের থাকার জায়গা হয়েছে, বাকিরা হোটেলে এসি রুমে থাকবেন। ঢাকা থেকে আগত ছড়াকার ইন্ডিয়ান ছড়াকারের কাছে টিকতে না পেরে আগামীকাল খুব ভোরের বাসে করে পাবনা চলে যাবেন আরেকটা উৎসবে যোগ দিতে।

এসব উৎসবে সাহিত্যপ্রেমীদের আসার উৎসাহের অভাব নেই। কিছু আসেন আমন্ত্রণে, কিছু আসেন নিজের আগ্রহে। আমন্ত্রিতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আয়োজকরাই করেন, বাকিরা নিজের খরচে আসেন। আয়োজকরা অবশ্য তাদের জন্য হোটেল বুকিং করে দেন, খরচ যার যার তার তার। কেউ বা আসেন খুলনা থেকে, কেউ মুক্তাগাছা থেকে, কেউ বা নেত্রকোনা থেকে।
আমার কাছে মনে হলো এসব উৎসব আসলে একরকমের ট্যুরিজম। ছড়া বা কবিতার নামে সাহিত্য ট্যুরিজম, মাজারে মাজারে যারা যান তাদের জন্য যেমন মাজার ট্যুরিজম, তীর্থে যারা যান তাদের জন্য তীর্থ ট্যুরিজম। এ রকম সমুদ্র ভ্রমণ, রাঙ্গামাটি ভ্রমণ, হাওর ভ্রমণ বা সিলেট মাজার ভ্রমণও আসলে এক প্রকার ট্যুরিজমই। মফস্বল শহরের এই এক প্রকার বিলাস!

হঠাৎ আমার কানের কাছে গুনগুন করে উঠল কে যেন–
'বাপুই চেংড়ারে, গাছত উঠিয়া একখান জলপই পাড়িয়া দে'

কে গাইল এ গান? ছড়া উৎসবে আসছি। গান কেন?

কুড়িগ্রাম থেকে এসেছে কবি সুজাতা স্বাধীন সপরিবারে। তার জামাই স্বাধীন গ্রামীণ পশু ডাক্তার, সে কবিতা লেখে মূলত মাকে নিয়া। তবে দেশ নিয়াও তার কবিতা আছে। নিজের কবিতার বই নিয়ে আসছে এই ছড়া উৎসবে পড়ার জন্য।

আগ্রহ নিয়ে বইটা উল্টেপাল্টে দেখি। মাকে নিয়া কবিতাগুলোর কাব্যমান কাঁচা, তবে তা সমাজতাত্ত্বিক উপাদানে ঠাসা। গরিব মানুষের রাজনীতির মোটাদাগের উচ্চারণ।

মায়ের গুণগান করে অনেকগুলো কবিতা লিখেছে কবি। তা ছাড়া শাশুড়িকে নিয়াও তার একটা কবিতা আছে। তবে মনে হয় চিরন্তন শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক তাকে খুব ভাবিয়েছে। কবিতাটা এ রকম :

'শাশুড়ি আমার যুবতি নারী
নিজের রূপের বাহার করি
কর্ম ছোঁয় না হাতে'

কবিতার নাম 'বাল্যবিয়ে রোধ করি'। কবিতা থেকে বুঝতে পারি অল্পবয়সে সুজাতার বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ি তখনো যুবতি, সেজেগুজে থাকেন সারাদিন, নিজে কাজ করতে চান না। খুব চমৎকৃত হই এই কবির প্রতি। যদিও তার সাহিত্যমানে আমার মন ভরছে না, কিন্তু তার কবিতা থেকে বুঝতে পারি তার রয়েছে দীর্ঘ এক জার্নির গল্প!

সুজাতার সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে এসেছে, দুজনেই ছোট ছোট। সে কবিতা পাঠ করতে সুন্দর করে সেজে এসেছে, যদিও তা হলদেটে কমদামি হার, কানে ঝুমকা রুপার অলংকার। স্পষ্ট করে মাথায় তেল দিয়েছে, তবে বেশ গোছগাছ করে শাড়ি পরেছে তার

ছোটখাটো দেহে। শ্যামলা রূপ তাতে খুব ফুটেছে। জামাইকে ঝাড়ি দিচ্ছে মাঝে মাঝেই। সবার সামনেই সারাদিন পচাচ্ছে– তোমারে নিয়া আর পারি না, কুড়িগ্রামের ক্ষ্যাত, তোমরার এংকা তেংকা ভাষা, আমরার গাইবান্ধার ভাষা অনেক উন্নত।

আজকে মঞ্চে কবিতা পাঠ করে সুজাতার মন ভরেনি। জামাই বলে, তাইলে মঞ্চে গিয়া ভাওয়াইয়া গা।

কোন গানটা গাবে তা নিয়া ক্যাচালে পড়ছে। 'বাপুই চেংড়ারে' ইন্ডিয়ার এক শিল্পী অলরেডি গাইতেছে, তাই এইটা চলবে না, আরেকটা গাইবে বলে ভাবে। জামাইরে বলে মোবাইল থেকে লিখে দিতে। এদিকে জামাইর ফোনে ডাটা নেই। খুবই বিপদে পড়ছে সে, মুখচোখে শঙ্কা। বৌটা গান পারবে কিনা। তখন আমি আগাইয়া যাই। বলি ঠিক আছে, আমার ফোনে ডাটা আছে। ইউটিউবে গানটা বাজাই। আপনারা লিখে নেন।

আমি গান বাজাই, স্বাধীন লেখে, সুজাতা গান শুনে শব্দটা ঠিকমতো উচ্চারণ করে দেয়। জামাইরে আবার বলে তোমরা কুড়িগ্রামের ক্ষ্যাত ক্যাংকা ক্যাংকা কর, আমরার গাইবান্ধার কত সুন্দর উচ্চারণ।

ইউটিউবে গান বাজে–
'ও মুই নাইওর আর না যাইম গাড়িয়াল তোমার গাড়িত চড়ি,
তোমার গাড়ির হাংড়াত বাজি ছিড়ি গেইল মোর বিয়ার শাড়ি।'

'হাংড়াত' শব্দটা বুঝতে না পারলে আমি আবার গানটা বাজাই। সে সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা গেয়ে ফেলে শব্দটা কনফার্ম করে। তার গাওয়া শুনে বলে দেওয়া যায় গানগুলো সে গুলে খেয়েছে, প্রতিটা গানই পাগলিটার সুরসহ মুখস্থ।

মেয়েটাকে আমার পছন্দ হৈছে। সারাক্ষণ লাফাচ্ছে, গান গাইছে, নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতেছে। সরলতা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে কাউকে দেখতে খুব অশ্লীল লাগে। কিন্তু সুজাতাকে দেখে তা মনে হলো না।

তখনই পরিবারটার সঙ্গে আমার ভাব হয়। আমি একটা টান অনুভব করি ওদের প্রতি। ওদের গল্পে ঢুকতে থাকি।

কুড়িগ্রামের জামাই 'স্বাধীন' গাইবান্ধার মেয়ে সুজাতাকে বিয়ের আগে প্রাইভেট পড়াত। শুধু পড়ানো না জীবনের সব শিক্ষা দিত। এভাবে মনটাও দেয়।

একদিন ধরলা ব্রিজ দেখাতে নিয়ে গেছিল সুজাতাকে। সুজাতা তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। চোখে মুখে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। আকাশে উড়ে যাচ্ছিল বকের সারি। থেকে থেকে বউ কথা কও ডাকছে। ওরা এক সময় ধরলা পার্কের টি-বাঁধের ওপর থেকে ব্রিজটা দেখে। সুজাতার চোখে অপার বিস্ময়। স্বাধীন বলে এই ধরলা থেকা পানি গিয়া যমুনায় পড়ে বুঝছিস? ধরলা নদীর বৈরলা মাছ জগৎ বিখ্যাত। সেদিন থেকে সুজাতার চোখে স্বাধীন দেবতার আসন পেয়ে যায়।

ক্লাস এইটে স্বাধীন সুজাতাকে প্রথম চুমা খায়। শিক্ষকের প্রথম চুমুতে শে অচিরেই বড় হয়ে ওঠে। তখন থেকেই শে ছন্দ মিল ছাড়া গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করে।

মায়ের আঁচলের নিচ থেকে গরিব শিক্ষকের হাতের বাঁধনে ধরা দিবারকালে সুজাতা হয়ে ওঠে সোহাগিনী। গাইবান্ধা থেকে ওর বাপ কুড়িগ্রাম এসে মুদি দোকান দিয়েছে, বাসা রিভারভিউ স্কুলের কাছে। সেই বাসার গৃহশিক্ষক স্বাধীন।

স্বাধীন এসএসসি পাস করে পশুডাক্তারির ট্রেনিং নেয়। এখন পেশায় গ্রামের পশুডাক্তার। চরে চরে ঘুরে বেড়ায়, পশুর ডাক্তারি করে। যাত্রাপুর হাট থেকে শ্যালো নৌকায় করে কোনো কোনো দিন চলে যায় দৈ খাওয়া চর অবধি।

তরুণ পশুডাক্তার বৌয়ের সব কিছু গুছিয়ে দেয়। বৌকে তার মনের ইচ্ছামতো চলতে দেয়, কিন্তু এ জন্য স্বাধীনকে তার মা-বাপকে ছাড়তে হয়েছে। তারা এসেছে আঞ্চলিক ছড়া উৎসবে। সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটার গায়ে মুজিব কোট, মেয়েটা ছোট কিন্তু চোখ মুখ বুদ্ধির প্রখর ছাপ। ছেলেটা বাপকে বলছে, বাপ, বল কিনে দাও। বাপ বলছে, পরে নিস। মেয়েটা মায়ের বইটা হাতে ধরে রেখেছে।

ছড়া উৎসবের প্রথম রাতে শহরের কোনো হোটেলেই জায়গা পায় নাই। দেশের প্রেসিডেন্ট এসেছে মিটামইনে তার বাড়িতে, তাই শহরের সব হোটেল সিকিউরিটির জন্য বন্ধ। বাধ্য হয়ে ট্রেনে চড়ে বাজিতপুর গিয়ে রাতটা কাটাতে হবে।

রাতে যখন স্টেশনে যাচ্ছিল, ফাল্গুন মাসের রাত– হঠাৎ কুয়াশা মশারিতে মোড়ানো। পূর্ণিমার আগে, মধ্যরাতে চাঁদ কেবল দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে! সেদিকে তাকিয়ে সুজাতার মনটা দুঃখে ভরে গেল। সব ব্যাটাদের জন্য শহরেই জায়গা হলো, আর শে কিনা দূরের কুড়িগ্রাম থেকে আসা এক মেয়ে, জামাই তার পশুডাক্তার, হোক না কবি, তার কোনো থাকার জায়গা হলো না এখানে। এই গভীর রাতে দুটা ঘুমিয়ে পড়া ছাগলছানা কোলে নিয়া তাকে যেতে হচ্ছে আরও দূরের এক হাফ শহরে। হায়রে কপাল!

গল্প শুনে আমার মনে হলো কবিতার জন্য যে কষ্ট করেছে, ওদের একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত। বললাম : 'নীলগঞ্জ যাবেন নাকি চন্দ্রাবতীর বাড়ি দেখতে? চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের মহিলা কবি। গেলে সব খরচ আমি দেব।'

ওরা রাজি হলে এক হোটেলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শহীদি মসজিদের চিপা গলি থেকে ব্যাটারিচালিত তিনচাক্কা নেই। জালালপুর বাজার হয়ে সেই তিনচাক্কা নিয়েই হাজির হই চন্দ্রাবতীর বাড়ি ফুলেশ্বরী তীরের কাচারিপাড়া বা পাতুয়ারী গ্রামে। পথে আসতে আসতে চন্দ্রাবতীকে নিয়ে অনেক কথা হলো তার সঙ্গে আর তাতেই সুজাতা ভীষণ আগ্রহী হয়ে পড়েছে চন্দ্রাকে নিয়ে।

চন্দ্রাবতীর গল্পটা শুনে সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্যাটা ধরে ফেলেছিল, বলল : 'ওর বাবার জন্যই তো এত ঘটনা। জয়ানন্দ মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়তেই পারে, তারপরও সে তো ফিরে আসছিল। তখন তাকে বাধা না দিয়ে গ্রহণ করলেই পারত।'

গ্রামে ঢুকে সুজাতা বলে এখানে দেখার কী আছে! এইখানের বাতাসে একটু শ্বাস নিলেই আমার জীবন ধন্য হবে। কিছুক্ষণ সেই পথের ধারেই পাথরের মতো বসে রইল। তাকায়ে থাকলো চন্দাবতীর সেই কথিত মন্দিরের দিকে, যেখানে চন্দ্রা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে আটকে রেখেছিল তার কাব্য রচনার কাজে। প্রেমিক জয়ানন্দের জন্য দরজা খুলে বের হয়ে আসে নাই।

ওর ছেলে বলে : ও মা, বাড়ি যাবা না? নাকি বসি বসি কবিতা গাইবা কেবল? খিদা লাগছে তো।

আমরা কিছুটা ভয় পেয়ে যাই কবি সুজাতাকে নিয়ে। সে কি আজ এখান থেকে উঠবে না?

চন্দ্রাবতীর বাড়ি থেকে আসার তিন দিন পর শুনি কবি ইন্তিখাব আহমদ নামক একজন আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল ২৬ বছরের তরতাজা যুবক। অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল সে, তবে কোনো বই নাই তার। সেও এই ছড়া উৎসবে কবিতা পড়তে এসেছিল। কবিরা খুব সেন্টিমেন্টাল হয় শুনেছি। যুগে যুগে তারা একই রকম আচরণ করে বোধ হয়। তারা বদলায় না।

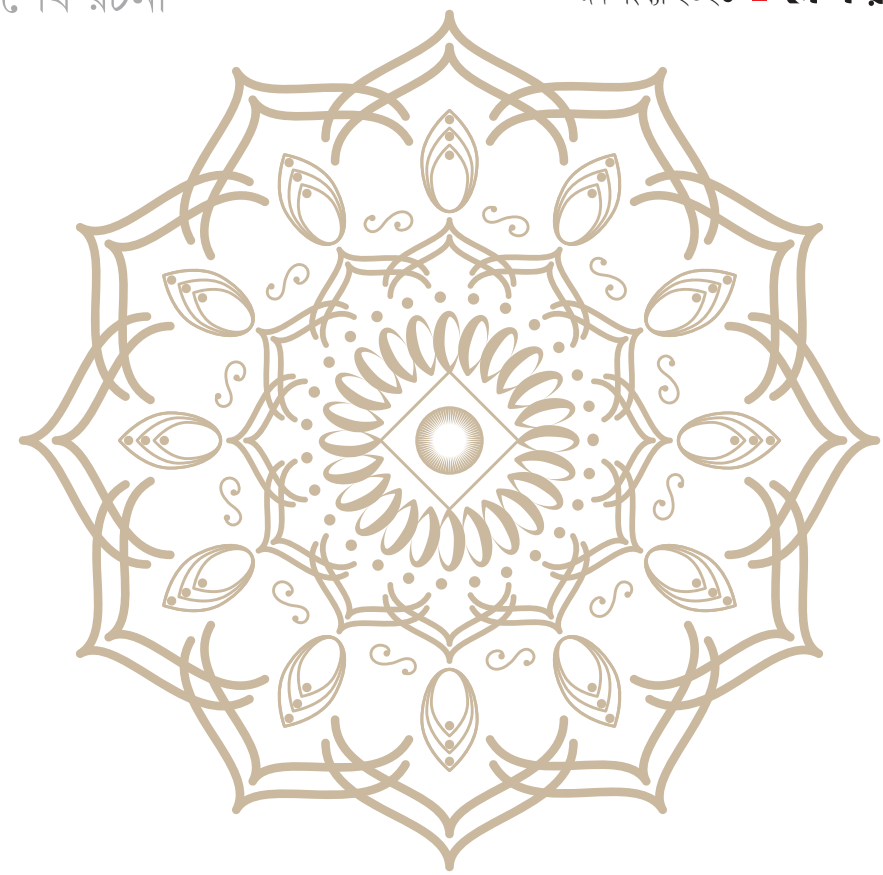

সৈয়দ তারিক

সমাধি যখন ভাবের দেশ

আমার একটি প্রিয় দর্শনীয় স্থান হলো সমাধিস্থল। গোরস্তান, শ্মশান, সেমিটরি, বধ্যভূমি। জীবনের অনিবার্য পরিণতি ধারণ করে নিস্তব্ধ এসব চত্বর। খ্যাতিমান, নামজানা কিংবা চেনা-অচেনা কত-কত মানুষের অন্তিম নিবাস। সমাধিলিপিতেও কত বিচিত্র তথ্য ও ভাবসমাবেশ। আর সমাধির আকৃতি-সজ্জার সৌন্দর্যও বৈচিত্র্যময়। সুযোগ পেলেই কোনো সমাধিস্থলে কিছু সময় কাটাই। জন্মলগ্নের অপর পৃষ্ঠায় মৃত্যুর এপিটাফখচিত। জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির এ স্থানে মাঝেমধ্যে এলে হয়তো দুনিয়ালিপ্ত মন একটু নিজেকে সামলে নিতে পারে।

আর আমি যাই বিভিন্ন মাজার শরিফে। সেসব সমাধি মাজার নামে অভিহিত হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক পুরুষগণ সমাহিত থাকেন। সেগুলোর আলাদা একটা মাত্রা আছে। এগুলো অন্য সমাধির মতো মৃত্যুপুরী নয়, বরং খুবই প্রাণবন্ত স্থান। আমি যাই এখানে ভক্তি নিবেদন করতে, আগত ভক্তদের ভাবপ্রবাহ অনুভব করতে এবং ওলি, মজ্জুব, সাধক, আশেকদের সঙ্গযাপন করতে। এখানে বিপুল মানুষ সমবেত হতে থাকেন। বিশেষ করে মাজারকেন্দ্রিক ওরস মাহফিলে তো বেশ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানাদি হয়। ওরস মানে মূলত ভক্তদের মিলনমেলা। পীর-ফকির-সাধুর প্রয়াণ দিবস কিংবা আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে, কিংবা অন্য কোনো উপলক্ষেও, এখানে ভক্ত-প্রেমিক-সাধুজনরা, বিপদাপন্ন-সাহায্যপ্রার্থী-শান্তিকামী মানুষেরা সমবেত হন। এসব মাজারের সাথে সাধারণ কবরের পার্থক্য আছে। একটি ফকিরি গানে আছে :

পাগল মরলে বাত্তি জ্বলে
মুনশি মরলে জ্বলে না,
এই মানুষে মানুষ আছে
কানার দলে দেখে না।

এই মাজারগুলো বিশ্বাসীর কাছে জীবন্ত। ধর্মগ্রন্থে বলা আছে, 'আল্লাহর পথে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তোমরা তাদের মৃত বলো না। আল্লাহ তাদের গোপনে রিজিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।' এসব মাজারে যেসব ওলি আছেন তারা আল্লাহর বিশেষ নিকটজন। সুতরাং তাদের কাছে তথা তাদের অসিলায় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে সেই প্রার্থনা আল্লাহ মঞ্জুর করতে পারেন, এরকম একটা বিশ্বাস নিয়ে কোনো না কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষে দোয়া

চাইতে বহু মানুষ হাজির হন এখানে।

শুধু কি কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানাবার জন্য লোকে এখানে আসে? না। আরও অনেক মানুষ আসে ভক্তি ও প্রেমের টানে। ওলির প্রতি ভক্তি নিবেদন করে তারা তাদের আধ্যাত্মিক চর্চার উৎকর্ষ সাধন করে। মাজারকে কেন্দ্র করে যে ওরস তথা ভক্তদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সমবেত হন ওলি, আশেক, পাগল, মজ্জুব, ভক্ত ইত্যাদি নানা পর্যায়ের মানুষ। তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ও সাহচর্যে ভক্তি, ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, সাধনমার্গ ইত্যাদি বিষয়ে চর্চার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে।

কিন্তু এই যে মাজারে সমবেত হওয়া, ভক্তি অর্পণ, ভাবচর্চা, আনুষ্ঠানিকতা এসব নিয়ে একদিকে আধুনিক যুক্তিবাদী লোকজন ও অন্যদিকে ধর্মীয় কট্টরপন্থি লোকেরা সংশয়, জিজ্ঞাসা ও আপত্তি তোলেন। কট্টরপন্থি লোকজন একদিকে যেমন ওয়াজে, সমাবেশে ও রচনায় এসব মাজার-সংস্কৃতির বিরোধিতা করেন, তেমনি ততোধিক কট্টররা এই ধারার অনুসারীদের নিগ্রহ করা, ওলিদের হত্যা করা কিংবা মাজারে বোমা নিক্ষেপ করার মতো চরম অমানবিক কর্মকাণ্ডও ঘটায়।

কট্টরপন্থিদের বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। তারা নিজেরা যেটা জানে, বোঝে বা মনে করে সেটাকেই একমাত্র সত্য বলে মানে। তারা চরমপন্থাকেই তাদের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যারা চিন্তাশীল ও যুক্তিমনস্ক তাদের কাছে একটা আলাপ রাখা যায়।

আচ্ছা, বলুন তো, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের কী তাৎপর্য আছে? যাদের স্মরণে এ শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে তারা তো কবেই মরে গেছে। তাদের আনুষ্ঠানিক সম্মান দেখানোর অর্থ কী? এ সম্মান দেখানো আমাদের নিজেদের জন্যই দরকার। যেন আমরা প্রেরণা পাই, যেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকি তাদের অবদানের জন্য। একটা গান বা গানের সুর যদি বেজে ওঠে কিংবা একটুকরো বর্ণিল কাপড় যদি প্রদর্শিত হয়, আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হয়, নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়। এর অর্থ কী? একটা গান বা একটা কাপড়ের টুকরাকে সম্মান দেখানোর কী আছে? এ হচ্ছে প্রতীকের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান। জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত স্বদেশেরই রূপকল্প। প্রতীকপূজারই সেক্যুলার রকমফের এটা।

শুধু আনুষ্ঠানিক সম্মানই নয়। এর সাথে আবেগ-প্রেম-দেশাত্মবোধ-আদর্শবাদ কত অনুভূতিই না যুক্ত হয়। 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। মাটিতে মাথা ঠেকানোর কী আছে? পঁচাত্তরের পর স্বেচ্ছানির্বাসনে যাওয়া কাদের সিদ্দিকী অনেক বছর পরে যখন ফিরে এলেন দেশে, বিমান থেকে নেমেই মাটিতে শুয়ে পড়লেন তিনি কপাল ঠেকিয়ে।

এসব প্রতীকী বিষয় যদি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি এসব আবেগ ও অনুভূতি, তবে ফকিরের মাজারকেন্দ্রিক ভক্তি-প্রেম বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

২

প্রসিদ্ধি আছে যে, বাংলাদেশ ওলি-আউলিয়াদের দেশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এ দেশে ইসলাম প্রচারিত ও বিকশিত হতে শুরু করে সুফি সাধকদের মাধ্যমেই। সেসব সুফি প্রয়াত হওয়ার পর তাদের সমাধি মাজারের রূপ নেয়। সময়ের সাথে অনেক মাজার হারিয়ে গেছে। আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে আছে অনেক মাজার শরিফ। নিয়মিত ভক্তজনাদের আগমন ঘটে সেখানে।

এ দেশের সবচেয়ে পুরনো ও বিখ্যাত মাজার শরিফগুলোর মধ্যে আছে নেত্রকোনায় শাহ সুলতান রুমি (১১ শতাব্দী), রাজশাহীর শাহ মখদুম (১৩ শতাব্দী) বগুড়ায় শাহ সুলতান বলখি (১৪ শতাব্দী), চট্টগ্রামের বাবা বদর শাহ (১৪ শতাব্দী), সিরাজগঞ্জে বাবা মখদুম শাহদৌলা (১৪ শতাব্দী), সিলেটে হজরত শাহজালাল (১৪ শতাব্দী), আখাউড়ায় বাবা কল্লা শহীদ (১৪ শতাব্দী) প্রমুখের সমাধিস্থল। নিত্যনিয়ত প্রচুর জনসমাগম ঘটে এসব মাজার শরিফে।

এ লেখায় আমরা কয়েকটি মাজার শরিফ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব, যে মাজার শরিফগুলোর খানিকটা বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে। এটি কোনো গবেষণামূলক রচনা বা লক্ষ্যনির্ভর প্রতিবেদন নয়। আমার সাবলীল ভ্রমণ প্রক্রিয়ার ভেতরে যেসব

মাজার শরিফে হাজির হতে পেরেছি তার থেকে গোটা কয় মাজারের কথাই এখানে বলছি।

বঙ্গভবন প্রাঙ্গণের মাজারসমূহ

বঙ্গভবন প্রাঙ্গণে সুলতানি আমলের তিনটি মাজার শরিফ রয়েছে। এগুলো দেখাশোনার জন্য কোনো খাদেম নেই। বঙ্গভবনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের একটি অফিস রয়েছে। বঙ্গভবন এলাকার সব স্থাপনা দেখভাল করার দায়িত্ব এ অফিসেরই। অফিসের বর্তমান প্রধান হলেন উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মেহেদী রায়হান নাদিম। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে তিনি বেশ অনেক দিন আগে জানতে চান যে মাজারে দেওয়ার গিলাপের কাপড় কোথায় পাওয়া যায়। সেই সময় তিনি জানান যে বঙ্গভবনে যে তিনটি সুলতানি আমলের মাজার শরিফ আছে সেগুলোর গিলাপ পুরনো হয়ে গেছে, পাল্টে নতুন গিলাপ দেওয়া দরকার। তিনি একই সাথে আমাকে আমন্ত্রণ জানান, যখন গিলাপ চড়ানো হবে তখন আমি থাকলে তার কাছে ভালো লাগবে। এ তো আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর মধ্যে কভিডের আগ্রাসনে বিষয়টা স্থগিত থাকে। এরপর তিনি যোগাযোগ করে জানতে চান, আমি একটু অবসর পাব কি না। আমি যাব বলে সম্মতি দিই। সেই অনুসারে এই ছয়শো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক মাজারগুলো দর্শন করে ও গিলাপ আচ্ছাদনের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ভক্তি নিবেদন করার সুযোগ পেয়েছি।

বঙ্গভবনে হজরত শাহজালাল দখিনি বাবার মাজার শরিফের সামনের পরিচিতি ফলক থেকে জানা যায়, সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৮-৮১ খ্রিস্টাব্দ)-এর রাজত্বকালে শাহ জালাল দখিনি (রহ.) নামে একজন সুফি সাধক গুজরাট থেকে পূর্ব বাংলায় আগমন করেন এবং বর্তমান মতিঝিল এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। সুলতানের আদেশে সঙ্গীসাথীসহ তিনি নিহত হলে তার সঙ্গীসাথীসহ তাকে সমাধি করা হয় বলে জানা যায় (৮৮১ হিজরি/১৪৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ)।

এখানে অদ্ভুত ব্যাপার, সুলতানের রাজত্বকাল বলা হচ্ছে ১৪৭৮-৮১ খ্রিস্টাব্দ, আর সুফিদের শাহাদতের সময় ১৪৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ, তাহলে তো সুলতানের রাজত্বকালের আগেই ঘটনাটা ঘটে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপক কাজী আশরাফ জানিয়েছেন, ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিমের মতে সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর রাজত্বকাল ১৪৭৪-৮১ (তথ্যসূত্র : সুলতানি আমল, পৃ. ২৭৬)। এ তারিখটাই তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।
হজরত শাহজালাল দখিনির নামের সাথে সম্পর্কিত শাহজালাল দখিনি মসজিদ রাজউক চত্বরে রয়েছে।

বঙ্গভবন এলাকায় তিনটি মাজারের একটিতে আছেন হজরত নয়গজী শাহ। আর একটিতে আছেন হজরত চন্দন শহিদ শাহ। এক গম্বুজবিশিষ্ট হজরত শাহজালাল দখিনি বাবার মাজার শরিফে দুটো সমাধি দৃশ্যমান। একটি দখিনি বাবার ও অন্যটি তার সহযোগী কোনো ওলির বলে অনুমান করা হয়। তিনটি মাজারে কেবল চারজনই নন, একটিতে আরও অনেক ওলিকে একত্রে সমাহিত করা হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

নীলক্ষেত বাবুপুরার মাজার শরিফ

ঢাকার নীলক্ষেতের বাবুপুরায় পুরনো একটি খানকা শরিফ, মাজার শরিফ ও মসজিদ (মরিয়ম সালেহার মসজিদ) রয়েছে।

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 'ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী' নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ লিখেছেন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১)। তার ভাষ্যে, 'খুব সম্ভব এটাই ঢাকা শহরের প্রাচীনতম খানকাহ।'

ঢাকার মগবাজারে যে দায়েরা ও মাজার শরিফ আছে শাহ নূরী বাবার, তারই পিতামহ মাওলানা শায়খ গুলাম মুহাম্মদ মুজাদ্দেদী। তার পুত্র ও খলিফা, শাহ নূরীর পিতা, আবদুল্লাহ আলীম। এই দুজন, পর্যায়ক্রমে বাবুপুরা খানকায় লোকেদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে দীক্ষা ও তালিম দিতেন। এটি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কথা। তাদের দুজনের মাজার শরিফ এখানে অবস্থিত। সন্নিহিত কবরস্থানে আরও অনেকের রওজা অবশ্য আছে। ছবিতে ডান দিকের বড় রওজাটি শায়খ গুলাম মুহাম্মদের ও পাশেরটি বাবা আবদুল্লাহ আলীমের।

একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। এখানে হজরত বাঘু দেওয়ানের ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘু দেওয়ান ছিলেন শাহ নূরী বাবার দীক্ষাগুরু। পীর। তার কাছ থেকেই শাহ নূরী খেলাফত লাভ করেন। 'ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী' বইটিতে হাকীম হাবীবুর রহমানের বিখ্যাত কিতাব 'আসুদগানে ঢাকা'র বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, খালিকুর রহমান বাঘু দেওয়ানের নিবাস ছিল রাজশাহীর ভেন্নাবাড়িয়ায়। তার ওফাতের পর সেখানেই তার মাজার হয়। কিন্তু

এখন বাবুপুরা খানকায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে : হযরত শায়খ গোলাম মোহাম্মদ মোজাদ্দেদী ওরফে বাঘু দেওয়ান (রহ.)-এর মাজার শরীফ। 'ওরফে'র অংশটুকু জিজ্ঞাসা জাগায়।

সাধক ও সুফিতাত্ত্বিক কবি শাহ আলী রজা ওরফে কানু ফকিরের মাজার শরিফ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুফি ভাবধারায় বিপুল গ্রন্থাবলি রচিত হয়। বাংলাপিডিয়ার বিবরণ হতে জানা যায় : 'বাংলার কবিরা প্রধানত ফারসি ও হিন্দি ভাষায় রচিত সুফিসাহিত্যের গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন। সেসব গ্রন্থের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ-জুলেখা, দৌলত উজির বাহরাম খানের লাইলি-মজনু, কাজী দৌলতের সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, আলাওলের পদ্মাবতী, নওয়াজিস খানের গুলে বকাওলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।'

বাংলাপিডিয়া আরও জানাচ্ছে : 'মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় সুফিতত্ত্ব বিষয়ে দুই ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে শাস্ত্রকাব্য ও পদাবলি। শাস্ত্রকাব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয় (১৪৯৮), সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ ও জ্ঞানচৌতিশা (১৬ শতক), যোগকলন্দর (১৬ শতক), শেখ চাঁদের হরগৌরী-সম্বাদ ও তালিবনামা (১৭ শতক), আবদুল হাকিমের চারি-মাকাম-ভেদ (১৭ শতক), হাজী মহম্মদের সুরতনামা (১৭ শতক), মীর মহম্মদ শফির নূরনামা (১৭ শতক), শেখ মনসুরের সির্নামা (১৮ শতক) এবং আলী রজার আগম ও জ্ঞানসাগর (১৮ শতক)। এ গ্রন্থগুলোতে প্রধানত সুফি সাধনপ্রক্রিয়াই বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশেরও বর্ণনা আছে।'

সাধক ও সুফিতাত্ত্বিক কবি শাহ আলী রজা ওরফে কানু ফকিরের মাজার শরিফ চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায়। ভক্তসাধারণের কাছে তিনি অন্যান্য মাজারের ওলিদের মতোই একজন হিসেবে বিবেচিত হলেও শাহ আলী রজাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় একজন সুফিতাত্ত্বিক কবি হিসেবেই জানেন।

তার সম্পর্কে উইকিপিডিয়া লিখছে : "তাসাউফের ওপর অসংখ্য দেবনগরী বাংলা, ফারসি, উর্দু, আরবি ভাষায় কিতাব রচনা করেন। সাতশো মারফতি গান রচনা করে রেখে গেছেন চিরস্মরণীয় অবদান। 'সিরাজকুলুব', 'জ্ঞানসাগর', 'আগম', 'ধ্যানমালা', 'যোগকালন্দর' এবং 'ষট্‌চক্রভেদ' তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। আলী রজা অনেক পদও রচনা করেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থে তার বত্রিশটি পদ সংকলিত হয়েছে।"

উইকিপিডিয়া আরও বলছে : 'ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮০০ শতকের অন্যতম ইসলাম প্রচারক শাহ সুফি আলী রজা (প্রকাশ : কানু ফকির) (রহ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক সুফি কবি। তিনি ছত্রিশ বছর অরণ্য সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার কারণে হযরত শাহ সুফি আলী রজা (রহ.) সাধারণের নিকট কানু ফকির হিসেবে পরিচিত ছিলেন।'

তিনি সাধনা করেছিলেন চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁওর কুড়াইল্যা মুড়া নামক পাহাড়ের চূড়ায়। একবার গিয়েছিলাম তার সাধনস্থল দর্শন করতে। এ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে চড়াই-উতরাই-সমন্বিত দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পেরোতে হয়। যখন হাঁপাতে-হাঁপাতে এ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম তখন অনুধাবন করলাম দুর্বল ও পীড়িত ফুসফুস নিয়ে আমার সাধ্য নেই যে এখন এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সাধনপীঠটি দর্শন করি। সুতরাং পাহাড়ে ওঠার পথটির মুখেই একটু বসে থাকলাম।

নাটোরের ঔষধি গ্রামের জনক ও আধ্যাত্মিক ধারার মানুষ আফাজ উদ্দিন পাগলার মাজার

নাটোরের লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়ি ইউনিয়ন ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদের জন্য বিখ্যাত। এই এলাকার অধিকাংশ বাড়ির সন্নিহিত জমিতেই ঔষধি উদ্ভিদের ফলন দেখা যায়। এই অঞ্চলে এসব উদ্ভিদ চাষের অগ্রপুরুষ আফাজ উদ্দিন, যিনি আফাজ পাগলা নামে পরিচিত। একই সাথে তিনি আধ্যাত্মিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ভাবের গান গাইতেন বিভোর হয়ে। ২০১৭ সালে তিনি প্রয়াত হন। তার ভক্তবৃন্দ ও উত্তরাধিকারীরা তার সমাধিতে মাজার স্থাপন করেছেন ও এখানে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

তার প্রয়াণের পর বাংলানিউজ২৪ তার সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে দিচ্ছি।

'রোববার (০৫ নভেম্বর, ২০১৭) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঘুমের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে ও পালিত এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

স্থানীয়রা জানান, প্রায় ৪৫ বছর আগে নাটোরের লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া গ্রামে ঔষধি গাছের চাষ শুরু করেন আফাজ উদ্দিন। পাশাপাশি কবিরাজি চিকিৎসাও শুরু করেন তিনি।

এলাকার সবাই তাকে আফাজ পাগলা নামে চেনে। তিনি নিজে ঔষধি গাছ চাষ করেই থেমে থাকেননি, অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে। প্রথমে কেউ গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, এটি লাভজনক। পরে অন্যরাও চাষে যুক্ত হন। এভাবে ঔষধি গাছের চাষ বাড়তে থাকে খোলাবাড়িয়া গ্রামে। মিছরি দানা, ভূঁইকুমড়া, আলকুচি, তুলসী, হরতকী, আমলকী, বহেরা, বাসক, ঘৃতকাঞ্চন, শতমূলী, শিমুল, অশ্বগন্ধাসহ প্রায় ১৪০ প্রকারের ঔষধি গাছের চাষাবাদ করা হয় এখানে। আজ এ গ্রাম সারা দেশে ঔষধি গ্রাম হিসেবে পরিচিত।

এ গ্রামে উৎপাদিত এসব গাছ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাইকারি ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যান। ঔষধি গাছকে ঘিরে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে ঔষধি বাজার। গ্রামবাসীর উৎপাদিত ভেষজ বাজারজাত করতে গড়ে উঠেছে সমবায় সমিতি।

নাটোর শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ গ্রামের পথের দুই ধার ও জমিতে গাছ আর গাছ। কোনোটিই যেনতেন গাছ নয়, অনেক জটিল রোগ সারে এসব ভেষজ উদ্ভিদে। গাছের পরিচয়েই

স্বাস্থ্য বীমা

থাকুন নির্ভাবনায়
প্রগতি লাইফের স্বাস্থ্য বীমায়...

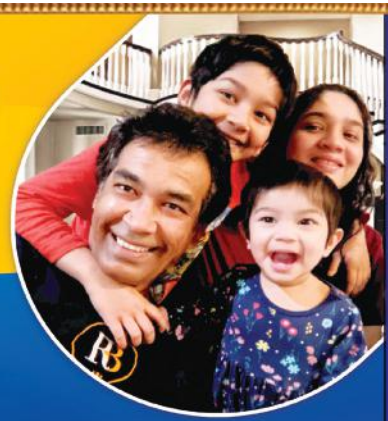

সুবিধাসমূহ

- দেশি-বিদেশি যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ
- হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায়
  - রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্রকার পরীক্ষা
  - ডাক্তারের পরামর্শ ফি
  - অপারেশন খরচ
- হাসপাতাল ভর্তির পূর্বের ১৫ দিনের চিকিৎসা খরচ
- হাসপাতাল ছাড়ার পরের ৩০ দিনের চিকিৎসা খরচ
- অ্যাম্বুলেন্স খরচ
- বীমা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণে সম্পূর্ণ বীমা অংক নমিনীকে প্রদান
- প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর রেয়াত সুবিধা
- দেশব্যাপী ২৫০+ নেটওয়ার্ক হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে সর্বোচ্চ ৪৫% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা

সুবিধা	প্যাকেজ-১	প্যাকেজ-২
মৃত্যু ঝুঁকি	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা
হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসা	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা

বার্ষিক প্রিমিয়াম শুরু ১০,৭৮৫/- টাকা থেকে (বয়স এবং প্যাকেজের ভিত্তিতে)

০৯৬৭৮৭৭১২০৮
(সকাল ৯টা - বিকাল ৬টা) (শনি - বৃহঃ)

আরো জানতে স্ক্যান করুন

প্রগতি লাইফ
ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়ঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

Pragati Insurance
Limited
Achieved
AAA
CREDIT RATING

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং "AAA" অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড।

Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard "AAA" Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.

Symbol of Security

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Pragati Insurance Limited

Tel : +880 2 58150727 & 9133680-2
Web : www.pragatiinsurance.com

খোলাবাড়িয়াকে ডাকা হয় 'ঔষধি গ্রাম'। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের বদৌলতে বদলেছে গ্রামটির নাম। বদলে গেছে পুরো গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা। বদলে গেছে তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম।

এখন ঔষধি গাছেই ঘুরছে গ্রামের ১৬০০ পরিবারের অর্থনীতির চাকা। 'ঔষধি গ্রাম' এ নামে গ্রামটিকে পরিচিত করে তোলার নেপথ্যে রয়েছেন আফাজ উদ্দিন।

লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আবদুল বাতেন ভূঁইয়া বাংলানিউজকে জানান, কৃষিক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে 'চ্যানেল আই কৃষি পদক' পেয়েছেন আফাজ পাগলা। এছাড়া স্থানীয়ভাবে পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার। অবসরে তিনি একাকি থাকতে পছন্দ করতেন। আধ্যাত্মিক গান গাইতেন তিনি। এছাড়া নিজের কবিরাজি চিকিৎসালয় থেকে নানা রোগের চিকিৎসা সেবা দিতেন তিনি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসতেন চিকিৎসা নিতে।

যৌনপল্লীর মাজার শরিফ

শরণ দেবীর কথা শুনেছিলাম লোকপরম্পরায়। অনেক কাল আগে টাঙ্গাইলের যৌনপল্লীতে এক নারীকে বলপূর্বক আনা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী এক সাধিকা। তিনি তার কত্রীকে বললেন, 'আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি এখানেই থাকব, কিন্তু আমাকে দিয়ে ওইসব কাজ করাবেন না, ওগুলো আমাকে দিয়ে হবে না।'

শোনা যায়, তবু তার ঘরে খদ্দের পাঠানো হয়, কিন্তু কেউ উপগত হতে পারেনি, বরং নানারকম ঘটনা ঘটে : কারও যৌনক্ষমতাই লুপ্ত হয়ে যায়, কেউ মনোদৈহিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউবা অন্য কোনোভাবে আক্রান্ত বা পীড়িত অনুভব করে। কাহিনিগুলো লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে ফলে তার ঘরে আর কেউ লিপ্সা নিয়ে আসত না। তিনি তার সাধন-ভজন নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন।

একসময় তিনি দেহান্তর প্রাপ্ত হন। তারপর ওখানে সমাধিমন্দির বা মাজার শরিফ গড়ে ওঠে। পল্লীর নারীরা তাকে অত্যন্ত ভক্তি-মান্য করেন। ওখানে ওরস মাহফিল হয়। একসময় শরণ দেবীর সাথে মা ফাতেমার একীভবন ঘটে। পল্লীর সামনের চা-দোকানের দোকানি জানালেন, তিনি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন এটি মা ফাতেমার মাজার। মহররমের সময় সিন্নির বড় অনুষ্ঠান হয়। বহিরাগত অনেক ভক্ত-আশেক মানুষ এতে সমবেত হন। তবারক গ্রহণ করেন সবাই।

একুশ শতকের শুরুর দিকে ভূমিলোভীদের অপচেষ্টায় পুরো পল্লীটাকে ভেঙেচুরে নারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আগের মাজারটিও তখন ধূলিসাৎ হয়েছিল। পরে যখন পল্লীটির পুনর্নির্মাণ হয়, নতুনভাবে মাজারটিও গড়ে ওঠে।

শহীদ ওলির মাজার

এমন কিছু ওলি-আল্লাহ আছেন যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাহ্যত শহীদ হয়েছেন। যেমন, ভেড়ামারার গোলাপনগরের সোলায়মান শাহ। রাঙামাটির শুভলং-এও পেয়েছি একজন শহীদ ওলি ধনা মিয়া বাবাকে। বরিশালের অলিউল্লাহ শাহ তেমন একজন।

পাঁচ পীরের মাজার

পাঁচ পীরের মাজার নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার শরিফ আছে। এই পাঁচ পীর বা বারো আউলিয়া বলতে সবসময় যে পাঁচ কিংবা বারো সংখ্যা বোঝায় তা নয়। এর দ্বারা কিছু সংখ্যকও বোঝায়। গাজীপুরে একটি পাঁচ পীরের মাজার শরিফ আছে। শালবনের ভেতরে নিভৃত ও সুন্দর এ মাজারটির কথা উল্লেখ করলাম কারণ, ঢাকার কাছাকাছি এই মাজার শরিফে কোনো পূর্ণিমা রাতে যদি মাজারে ভাবমণ্ডিত সময় কাটাতে আগ্রহী কেউ আসেন তবে একটু অন্যরকম ভালো লাগবে মনে হয়।

বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর মাজার

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর গ্রামে রয়েছে বিশিষ্ট ওলি বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী ও তার উত্তরাধিকারীদের মাজার শরিফ। বছরে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান হয় এখানে।

জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (১৮৫৬-১৯০৯) নকশেবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার শাহ সুফি ফতেহ আলী শাহ ওয়ায়সীর অন্যতম খলিফা ছিলেন। তার পোশাকি নাম মাওলানা আহমদ আলী। তার গুরু-ভাইদের মধ্যে আছেন শাহ সুফি আবু বকর সিদ্দিকী (ফুরফুরা) ও শাহ সুফি ওয়াজেদ আলী শাহ (যার থেকে এনায়েতপুর, শম্ভুগঞ্জ, চন্দ্রপাড়া প্রভৃতি দরবারের উদ্ভব)।

বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী সুফিবাদের গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন বাংলা, উর্দু ও ফারসি ভাষায়। বাংলায় তার লেখা গ্রন্থ তিনটি : 'নূরেহক গঞ্জেনূর', 'সফিনায়ে সফর' ও 'মদিনা'। এ গ্রন্থগুলো তিনি পয়ারবন্ধে অর্থাৎ কবিতার ভাষা ও ছন্দে রচনা করেন। তার অন্যান্য বইয়ের অনুবাদের মধ্যে আছে 'সিররে হক জামে নূর', 'মাতলাউল উলুম', 'আইনাইন' প্রভৃতি।

এ দেশের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যদিও 'বাংলাদেশের সুফি সাধক' বা 'আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম' জাতীয় বইগুলোয় এই ওলির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বাবা জাহাঙ্গীরের মাজার শরিফ

কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরীর মাজার শরিফ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ায় চৌধুরীপাড়ায় অবস্থিত। ২০২১ সালে তিনি অন্তরালবর্তী হন। তিনি এ নিবন্ধের রচয়িতার মুরশিদ তথা দীক্ষাগুরু। কিন্তু শুধু সে কারণেই এ বৃত্তান্তে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সমকালে আত্মজ্ঞানের চর্চায় তার ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

বাবা জাহাঙ্গীরের শিক্ষার মূল কথা হলো, ধর্মীয় দর্শন অনুসারে কেবল একটি উপদেশই মানুষকে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো : প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেল। তাহলেই তুমি মুক্ত। এ কথায় তিনি বুঝিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ অহমকেন্দ্রিক বা বমড় পবহঃৎরপ. এই অহম বা ইগো বা আমিত্বকে যে প্রশমিত তথা নিউট্রালাইজ করতে পারে সে নিজের সত্তার গভীরে যে বিশুদ্ধ সত্তা আছে তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। এটি করার জন্য কোনো উপযুক্ত গুরু তথা পীরের নির্দেশনায় মোরাকাবা তথা ধ্যানসাধনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়।
এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সাধনালয় প্রতিষ্ঠা করেন নরসিংদীর শিবপুরে নৌকাঘাটা গ্রামে। তার মুরিদগণকে তিনি সেখানে গিয়ে ধ্যানসাধনা করতে নিরন্তর উৎসাহ দেন এই কথা বলে যে, শুধু শুধু এসে বাবা বাবা ডাকবা, কয়টা কথা শিখবা, আর অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকবা, তাতে কোনো লাভ নাই। ধ্যানসাধনা করে আত্মমুক্তির পথে এগিয়ে যাও।

তিনি তার ওয়াজে-আলোচনায় ওজস্বী ভাষায় এইসব দেশনা যেমন দেন, তেমনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'মারেফতের গোপন কথা' আশির দশকে কট্টরপন্থি মোল্লাদের উসকানিতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে তৎকালীন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। পরে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। একই সময়ের দিকে আরেক সুফি ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থ রচয়িতা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতীর বইও একইভাবে মামলায় পড়ে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, এখনো পর্যন্ত ধর্ম অবমাননার মামলায় বাংলাদেশের আদালতে ওই দুই লেখকের মামলা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বাবা জাহাঙ্গীর নানা অর্থে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন।

রাজু আলাউদ্দিন

বাংলা, স্প্যানিশ ও বোর্হেসের অনুবাদ

বাংলা ভাষার উদ্ভব কত সালে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটি কম করে হলেও ১ হাজার ২০০ বছর তো হবেই। কেউ কেউ মনে করেন সপ্তম শতক, কেউ কেউ দশম শতকে এর উৎপত্তি বলে মনে করেন। মোটামুটিভাবে দশম শতককে যদি গ্রহণযোগ্য ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এই ভাষার বয়স এখন ১ হাজার ২০০ বছর। যদিও আমরা জানি কোনো ভাষাই হঠাৎ রাতারাতি গড়ে ওঠে না। অত্যন্ত মন্থর গতিতে সে গড়ে ওঠে, বিবর্তিতও হয় একইভাবে। এই যে এত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পৃথিবীতে ছড়ানো, যার কোনো কোনোটির সাথে রয়েছে অন্য কোনো এক ভাষার দূরাত্মীয়তা। আর ঠিক এ কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভাষার সাথে অতি ক্ষীণ হলেও আত্মীয়তা আছে এই অতিদূরের স্প্যানিশ ভাষার। শুনতে হয়তো বেখাপ্পা লাগছে কিন্তু ভাষাবিদদের কাছে তা খুবই স্বাভাবিক এক তথ্য। বেখাপ্পা হলেও স্বাভাবিক এ কারণে যে উভয় ভাষাই নিঃসৃত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার থেকে। অনেকটা এমন যেন পারিবারিক বিরোধের ফলে দুই ভাই দুই দিকে চলে গেছে: একজন বহু পথ পেরিয়ে ভারতবর্ষে আর অন্যজন ইউরোপের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু তাদের ভাষিক DNA একই। ঠিক এ রকম ডিএনএ সম্পর্কের কারণেই স্প্যানিশে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাংলায়ও একই উচ্চারণ ও অর্থ নিয়ে হাজির। শব্দগুলো হচ্ছে, যেমন Paila, Pus ও Lodo. নিশ্চয়ই আরও অনেক শব্দ আছে, যেহেতু ভাষাতত্ত্ব আমার মূল ক্ষেত্র নয়, তাই সম্ভাব্য অন্য শব্দগুলো সম্পর্কে আমার জানা নেই। কিন্তু কৌতূহলবশত এই শব্দগুলোর উৎস খুঁজতে গিয়ে লক্ষ করলাম, এগুলো স্প্যানিশ ভাষায় ঢুকেছে লাতিন থেকে। কিন্তু বাংলা ভাষার সাথে লাতিনের সম্পর্ক খুব একটা উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। তাহলে কীভাবে এলো বাংলা ভাষায় এ শব্দগুলো? তবে লাতিন যেহেতু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর বাংলা ও স্প্যানিশ যেহেতু ওই একই ভাষাগোষ্ঠীর সন্তান, ফলে বাংলায়ও ওই শব্দগুলো লাতিন থেকেই এসেছে, তবে অনেক ঘুরপথে অবশ্যই। আমার ভালো লাগছে এটা

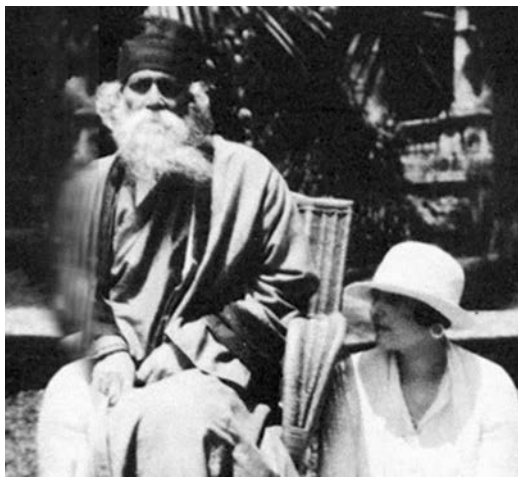

দেখে যে এই শব্দগুলো আমাদের জানান দিচ্ছে আজকে আমরা যত দূরেই থাকি না কেন স্প্যানিশভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের আত্মীয়তার একটা সম্পর্ক হাজার বছর আগে থেকেই ছিল। আর ঠিক এ কারণেই আমাদের মধ্যে আবেগ, ভালোবাসা আর সাংস্কৃতিক এক সাযুজ্য চোখে পড়বে।

বাংলা ভাষার মতো বাংলা সাহিত্যও সমবয়সী। আর অদ্ভুত শোনালেও দেখা যাবে এখানেও আছে উভয় ভাষা ও সাহিত্যের সাথে কিছু বিষয়ে মিল। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কবিতা চর্যাপদের মতোই স্প্যানিশ হার্চার আবির্ভাব সেই দশম একাদশ শতকে। কালের এই সাযুজ্য ছাড়াও আরও একটি মিল হচ্ছে, এই দুই প্রাচীন কবিতাই আবিষ্কৃত হয়েছে বিদেশের মাটিতে: চর্যাপদ নেপালে আর

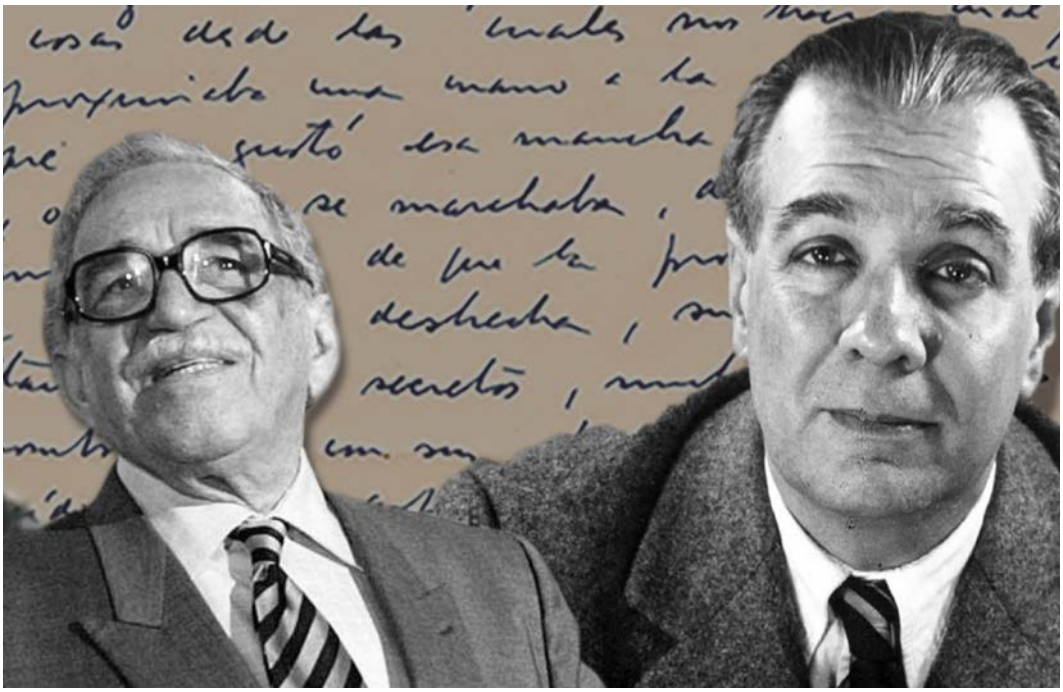

হার্চা মিসরের কায়রোতে, অর্থাৎ দুটোই এশিয়ায়। আরও একটি সাযুজ্য এই যে উভয় কবিতাই আবিষ্কৃত হয় বিশ শতকের প্রথমার্ধে।

চর্যাপদকে একদিকে অসমীয়া, অন্যদিকে ওড়িয়ারা নিজেদের বলে যে দাবি করে, তার কারণ বাংলার পাশাপাশি প্রায় কাছাকাছি সময়ে এই দুটি ভাষার উদ্ভব এবং উভয়ের মধ্যেই আছে অভিন্নার্থক বহু শব্দ। একইভাবে এই হার্চার ভাষাতেও আছে আরবি, স্প্যানিশ ও রোমান্স ভাষার মিশ্রণ। এই কারণে স্প্যানিশ ভাষার এই প্রাচীন নমুনা হার্চায় রয়েছে প্রচুর আরবি ও রোমান্স শব্দের উপস্থিতি। তবে এসব সত্ত্বেও গবেষকদের বিচারে হার্চা স্প্যানিশ কবিতার আদিতম নমুনা। এক অর্থে গোটা ইউরোপেই হার্চা হচ্ছে প্রাচীনতম লিরিক, যেমনটা গোটা এশিয়ায় চর্যাপদ প্রাচীনতম গীতিকবিতা।

স্প্যানিশ ও বাংলা ভাষায় আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে উভয় ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণ খানিকটা ভিন্ন হলেও, অর্থের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা নেই। যেমন Sorbete, Azafran ও Naranja, এই শব্দগুলো আমাদের ভাষায় আরবি থেকে প্রবেশ করে উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে শরবত, জাফরান ও নারঙ্গি। এ রকম আরও বহু শব্দ আছে যা উভয় ভাষায় একটু ভিন্নভাবে উচ্চারিত হলেও অর্থ অভিন্ন। ভাষিক এই আত্মীয়তার মূল কারণ স্পানএগ্রা প্রায় আট শো বছর আরবদের অধীনে ছিল, এর ফলে প্রায় ৪ হাজারের বেশি শব্দ আত্তীকৃত হয়েছে স্পানঞ্জল ভাষায়। বাংলা ভূখণ্ড সাড়ে পাঁচ শো বছরেরও বেশি সময় মুসলিম শাসকদের অধীনে থাকার কারণে বাংলা ভাষায় কম করে হলেও ১ হাজার ৮০০ শব্দ সরাসরি আরবি ভাষা থেকে প্রবেশ করেছে। সন্দেহ নেই যে স্পানএগ্রার মতো যদি আমাদের ভূখণ্ডেও মুসলমানদের শাসনামল ৮০০ বছরের দৈর্ঘ্য পেত তাহলে আত্তীকৃত শব্দের সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি হতে পারত। সাদৃশ্য আছে ব্যাকরণের কিছু নিয়মকানুনের ক্ষেত্রেও, বাংলা ভাষায়ও ব্যক্তিভেদে স্প্যানিশের মতোই ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কিন্তু এই সব সাযুজ্য সত্ত্বেও দুই ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে তফাত আছে নিশ্চয়ই। আর ওই তফাতই আমাদের পরস্পরের প্রতি কৌতূহলী ও আকৃষ্ট করে তোলে। আমরা একই ভাষাগোষ্ঠী থেকে এলেও আমাদের ভাষা ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে গেছে। আর ভাষা আলাদা হওয়া মানে জগৎও আলাদা হওয়া। এই প্রসঙ্গে বোর্হেসের একটা চমৎকার উক্তি আমার মনে পড়ছে : cada idioma es un modo de sentir el universo o de percibir el universo. –(Borges en Sur:1931-1980, Jorge Luis Borges,Emece, 1999,P 325) অক্তাবিও পাসও প্রায় বোর্হেসের প্রতিধ্বনি করেই ভাষা ও বিশ্বের অভিন্ন সম্পর্কটিকে আরও নিশ্চিত ও স্পষ্ট করে তোলেন এভাবে : Each language constitutes a way of looking at the world, and each civilization is world in itself. –(On Translation,Octavio Paz, Unesco Courier, February 1975, p 38)

বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমরা এমন এক জগৎকে দেখতে পাই, যা অন্য ভাষীদের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্ন জগৎগুলোর মধ্যে একটা সেতু গড়ে তোলেন অনুবাদকরা। হাজার বছরের ব্যবধানে আমরা আলাদা হয়ে এমন এক ভিন্ন চেহারা নিয়েছি যা ভাষার ব্যবধানের কারণে আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত। কিন্তু অনুবাদকরা এই অপরিচয়ের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিতে পারেন তাদের কাজের মাধ্যমে। অনুবাদের গুরুত্ব ও লক্ষ্য বোঝাতে গিয়ে অক্তাবিও পাস আমাদের মনে করিয়ে দেন যে Translation does away with the differences between one language and another; and, on the other hand, it brings them into greater prominence, because through translation we become more fully aware of the fact that other people speak and think in ways that differ from ours. –(On Translation,Octavio Paz, Unesco Courier, February 1975, p 38)

বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য লম্বা সময় পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। এই ভাষায় জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ভাবুক ও সৃজনশীল প্রতিভা। তাদেরই একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে তিনি যখন এই বুয়েনস এইরেসে পা রেখেছিলেন, তখন তিনি হয়তো ভাবেননি যে ওই সফরটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে তার মাধ্যমে, অন্যদিকে, বিক্তোরিয়া ওকাম্পোর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল আর্হেন্তিনা ও বাংলার মধ্যে সংস্কৃতিক বন্ধুত্বের ও বন্ধনের।

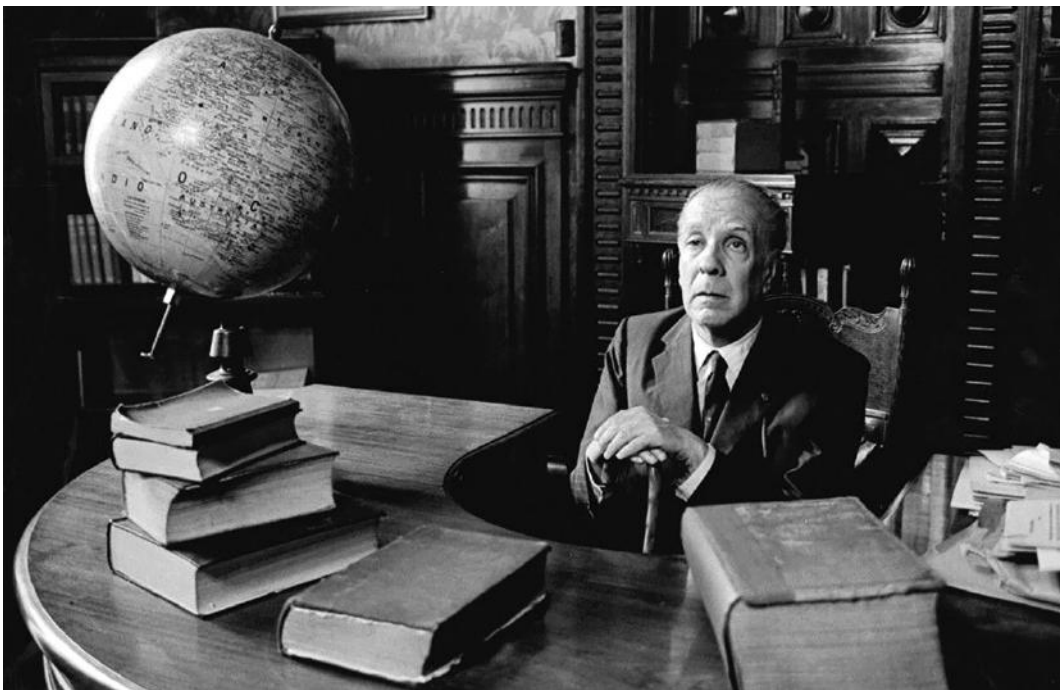

এই মুহূর্তে আমার স্মরণ করা উচিত যে তাদের এই মুখোমুখি সাক্ষাতের আগেই বিক্তোরিয়া ওকাম্পো ছাড়াও আর্হেন্তিনার আরও কয়েকজন গুণী মননশীল ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ ও চর্চার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাদের আবেগ ও আকর্ষণকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। তাদের একজন কার্লোস মুস্সিও সায়েন্স পেনঞা এবং অন্যজন হোয়াকিন বে গনছালেস। ভারতমুগ্ধ এই দুই আর্হেন্তিনো ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত, কিন্তু তারা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের আর্হেন্তিনা সফরের আগেই রবীন্দ্র-রচনা অনুবাদ ও সে-সম্পর্কে লেখার মাধ্যমে মূর্ত করে তুলেছিলেন আর্হেন্তিনার বিশ্বমুখী মনের উদারতা ও বিপুলতাকে। খুব বিচ্ছিন্নভাবে হোর্হে লুইস বোর্হেসও তার কোনো কোনো লেখায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার পাঠ ও কৌতূহলের চিহ্ন ছড়িয়ে রেখেছিলেন পরস্পরের সাক্ষাতের আগেই। আর অনেকটা ওকাম্পোর আতিথেয়তার বদৌলতেই কার্লোস ও বোর্হেসের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল। সাক্ষাতের পরে বোর্হেস তাকে নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন। আর বিক্তোরিয়া ওকাম্পো তো তাকে নিয়ে লিখেছেন একাধিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা এবং বই। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোর আতিথেয়তা ও বন্ধুত্বের প্রতি প্রীতির নিদর্শন হিসেবে তার একটি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন ওকাম্পোকে। এসব ঘটনা উল্লেখের মূল কারণ এটা দেখানো যে গত শতাব্দীর গোড়ায় যে-সম্পর্কের সূচনা তা আমাদের সাহিত্যে, আমার ধারণা স্প্যানিশ সাহিত্যেও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। আর্হেন্তিনাসহ গোটা লাতিন আমেরিকায় যেমন রবীন্দ্র-তর্জমা ও চর্চার জোয়ার এসেছিল, তেমনিভাবে আমরা বাঙালিরাও লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। মোটামুটি তিরিশের দশক থেকেই বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের বিপুল পরিমাণ পাঠক তৈরি হয়েছে। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের প্রধান সব লেখকের রচনা যেমন অনূদিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে এই অঞ্চলের লেখকদের নিয়ে বহু গ্রন্থ।

আর্হেন্তিনার হোর্হে লুইস বোর্হেস বাংলা ভাষায় ষাটের দশক থেকেই অনূদিত হতে শুরু করেন, অবশ্য তা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত আগ্রহের ফল হিসেবে। নব্বইয়ের দশকে খানিকটা আমার উদ্যোগে ও আগ্রহে বোর্হেসচর্চা ও তার রচনার অনুবাদ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন কেন আমি বোর্হেসকে বেছে নিয়েছিলাম? এর উত্তরে বলব, লাতিন আমেরিকার বিরাট পাঠকগোষ্ঠী ও লেখক-অনুবাদকরা যে কারণে বাংলা ভাষার প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ঠিকই একই কারণে আমিও আকৃষ্ট হয়েছিলাম বোর্হেসে। কিন্তু আবারও প্রশ্ন আসবে কী কারণে বোর্হেস?

বোর্হেস, কেবল লাতিন আমেরিকাতেই নয়, গোটা স্পানঞল সাহিত্যেই তিনি সেই লেখক যিনি ইউরোপ, প্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতসহ গোটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে। কেবল তাকাননি, যেন গোটা পৃথিবীটাকেই তিনি একাধিক ভাষায় দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের বদৌলতে নিজের ঘর করে নিয়েছিলেন। তার সাহিত্যে আমরা কেবল আর্হেন্তিনার বা লাতিন আমেরিকারই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না, শুনতে পাই এই পৃথিবীর কণ্ঠস্বর, গোটা মানবজাতির কণ্ঠস্বর। এই কারণে তিনি যেমন আর্হেন্তিনার, তেমনি তিনি আমাদেরও। বোর্হেসের এই বৈশ্বিক চরিত্রই আমাকে আকৃষ্ট করেছে তার লেখা অনুবাদে এবং তাকে নিয়ে লিখতে। বোর্হেসের সঙ্গী হওয়া মানেই বিশ্বের বহুত্ব ও সঞ্চিত জ্ঞান, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, আর সর্বোপরি সময়ের সব কটা শাখায় ভ্রমণের বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন। তিনি আমাদের সেই আলেফ, আর 'আলেফ হচ্ছে স্থানের সেই সব বিন্দুর একটি, যেখানে অন্য সব বিন্দুর অবস্থান।'

ইংরেজি এবং খানিকটা স্পানঞ ভাষার সূত্রে আমি এই আলেফ নামক বোর্হেসকে ছুঁতে চেয়েছি। সব সময়ই যে সফলভাবে পেরেছি, সেই দাবি করব না। কারণ যেমনটা আগেই বলেছি প্রতিটি ভাষা স্বভাবে ও চলনে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। ফলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে কিছু না কিছু হারায়। কিন্তু যখন একটি লেখা উৎস ভাষা থেকে লাখো ভাষায় জায়গা করে নেয়, তখন সে আবার কিছু অর্জনও করে। কারণ ভিন্ন একটি সংস্কৃতির স্পর্শে উৎস ভাষার লেখাটি নতুন পরিবেশে ভাষিক আতিথেয়তায় সে নতুন অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন আমরা এ কথা বলতে পারি না যে অনুবাদ মানেই কিছু না কিছু হারায়। অনুবাদ হচ্ছে হারানোর মাধ্যমে অর্জনের এক শিল্প।

শাহাব আহমেদ

কালো সে যতই কালো হোক

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

ফুলের গন্ধ নিয়ে বসন্তের প্রথম হাওয়াটি এসে চুম্বন করলেই, ওর গর্ভ সঞ্চার হয়। পর পর পাঁচটি বসন্ত ধরে এই একই ঘটনা দেখে আসছি।

দেখতে সে পাইনের মতো লম্বা ও কৃশকায়, তুকেও পাইন বাকলের কোকো কালার। কালো মানুষ, তবে ঘুটঘুট্টি কালো নয়। চুলে ব্রেডিং করে বলে সাপের মতো অনেকগুলো সরু বেণী মাথা থেকে ঝুলে থাকে এবং দেখতে ভালোই লাগে।

টিশিয়া, আমার অফিসের নার্স। দাঁতগুলো গায়ের গাঢ় রংয়ের সঙ্গে ম্যাচ করে আলো-ঝিলিক-দেওয়া পার্লি সাদা। তবে ওপরের মাড়ির দাঁতগুলো একটু সামনে এগুনো বলে আদুরে ঘোড়ার দাঁতের মতো মনে হয়। ঠোঁট তাদের ঢেকে রাখে ঠিকই কিন্তু ওই যে ওর একটা বাই, মুখ খুললেই মুখের দুইটি কোনা দুই কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং যে হাসিটির জন্ম হয় তার সংক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা কারও থাকে না।

'জীবন তো তোমার কষ্টের, এত হাসি আসে কোথ্থেকে?'

'কষ্টের তলা থেকে ডক'

সে আমাকে ঠিক এমনই একটা উত্তর দিয়েছিল, না আমার তা মনে হয়েছে, তা আর স্মরণ করতে পারি না।

দেখতে সে সুন্দর এ কথা বলা যাবে না কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও হাসিটির কারণে সে যে কোনো সুন্দরী নারীর বলয় থেকে তার পুরুষটিকে কেড়ে নিতে পারে। অবশ্য ধরে রাখতে পারে না। পুরুষ শুধু হাসি বা যৌনতায় সন্তুষ্ট নয়। তার অন্য বহু কিছু চাই কিন্তু সেই বহু কিছুর মধ্যে অন্যের একগাদা ছেলে-পুলে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুতরাং ওরা ভালোবাসার কুহু-কূজন শুনিয়ে গর্ভসঞ্চার করে কেটে পড়ে। টিশিয়া নারী, তার সংসার চাই, বাচ্চা-কাচ্চা চাই, ভালোবাসাও চাই। একটি অন্যটির প্রতিপক্ষ নয়, তবে বাচ্চা-কাচ্চা আর না চাইলেও ভালোবাসা চাওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বয়েস তার হয়নি। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, প্রতি রবিবার চার্চে যায়, মনোযোগ দিয়ে উপাসনা করে, ঈশ্বর মাতার আইকনের পাদদেশ চুম্বন করে। বাচ্চাগুলো বাইবেল স্কুলে সময় কাটায় ঈশ্বরের কণিকার ছিটেফোটা স্পর্শ পেয়ে মানুষ হবার মাতৃ আকাঙ্ক্ষায়।

যৌনমিলন নয়, জন্ম নিয়ন্ত্রন যেহেতু ঈশ্বরের নীতির বিরুদ্ধে, সে বারবারই ফাঁদে পড়ে। তবে এ নিয়ে সে কোনোভাবে চিন্তিত বা বিষণ্ন বা হতাশ নয়। আগামীকালের চিন্তা বা গতকালের আফসোস নিয়ে সে আজকের দিনের পূর্ণতা অপূর্ণ করে না।

এদিক থেকে সে আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং নিশ্চিত আমেরিকান এবং সাদায় কালোয় ব্যবধানহীন। দীর্ঘদিন এই দেশে থাকলেও আমরা গায়ে লেপটে থাকা অতীত ও ভবিষ্যতের মরকত শ্যাওলা ধুয়ে ফেলতে পারিনি। সঠিকভাবে বললে, চাইও নি।

এই দেশে আমাদের আসা, শুধুই সন্তানের জন্য, তা নইলে স্বদেশের হাইকোর্টের সমান বাড়ি, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল ভরা ষাড়, উঠান-ভরা পাকা ধান ছেড়ে কে বিদেশে আসে? এখানে না আছে আপনজন, না আছে শত্রু। এই না-আপন, না-শত্রু, আমাদের ছেলেমেয়েরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে, ভালো চাকরি করবে, সুখী হবে এই তো স্বপ্ন। সুখ হল অর্থ, ওরা প্রচুর অর্থ কামাই করবে, তাও তো আমাদের স্বপ্নেই মজ্জাগত।

টিশিয়া গরীব কিন্তু বড় পাখার রাজহাঁসের মতো। সে হাঁটে তো পিছু পিছু ওর বিচ্ছুগুলোও লাইন ধরে হাঁটে। কে পাশ করল, কে করল না, কে স্কুলে সাসপেন্ড হলো তা নিয়ে ওর কোনো মাথা ব্যথা নেই, সে তার পাখনার নীচে ওদের আগলে রাখে, মুখে মাথায় চুমু খায়, এক সঙ্গে হাসে, খেলে, স্নেহে উজার করে দেয়। বলি, 'টিশিয়া, এভাবে ছেলে-পুলের মাথা খেতে নেই। ওদের শাসন করতে হয়, তা নইলে মানুষ হবে না।'

'ডক, নিজেই মানুষ হই নাই.... ওদের আমি কী মানুষ করব?'

হাসে। তবে নিজে মানুষ না হওয়ার আক্ষেপে তার মাথার কোনো অংশ ফুলে উঠতে দেখি নাই।

নার্স সে ভালো, হাত নরম। সে যখন টিকার ইনজেকশন দেয়, শিশুরোগীরা ভ্যা...এ...এ... করে চিৎকার শুরু করে। কিন্তু চিৎকার শেষ হবার আগেই ওর সুঁই সুরুৎ করে বের হয়ে আসে এবং তাদের দিকে সুগার-ফ্রি ক্যান্ডি বাড়িয়ে দিয়ে সম্মোহনী হাসিটি ছড়িয়ে দেয় সারা কক্ষে। সূর্যকিরণের সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোর মতো তার হাসিতেও নাকি কেউ কেউ অমন রশ্মি দেখতে পায়। আমি ডাক্তার, গুরু জিনিস দেখে দেখে চোখ ভোতা, তাই অত সূক্ষ্ম জিনিস আমার চোখে পড়ে না। অথবা কে জানে হয়তো আমার চোখ নয়, পুরনো চশমা-জোড়াই অসংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। একই চশমা চিরদিন সমান দেখে না।

রোদ কী বৃষ্টি, শীত কী দহন, সে কখনই কাজ মিস করে না। পুচকে রোগীরা ওকে ভালোবাসে, মাঝে মধ্যে ওর জন্য গিফটও নিয়ে আসে। ও ধন্যবাদ দেয় আর হাসে। আলিঙ্গনও করে ওদের। বলেছি না ওর হাঁসের পাখা, ওই পাখার নীচে সবাই আটে।

ইদানীং ওর হাসিতে কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, মাঝে মাঝে ধূপছায়ার মত কিছু একটা ওর মুখ মাড়িয়ে উড়ে যেতে দেখেছি। প্রশ্ন করেছি, 'টিসিয়া, কোনো সমস্যা?'

সে বিষণ্ন হেসেছে।

'না ডক, কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কী ঠিক হবে, সে আমাকে বলেনি, আমিও প্রশ্ন করিনি।

আগের সিজোনাল প্রেমিকগুলো স্ব স্ব প্রজনন সম্পন্ন করে চলে গেলও কিছুদিন আগে ওর নতুন একটি বয়ফ্রেন্ড হয়েছে। মধুপান তার শেষ হয় নাই, তাই উড়াল না দিয়ে, সে ওর ঘরেই ঘর বেঁধেছে। কাজ সে করে না কিন্তু প্রেমের কূজন করে ডানা-কাটা অ্যাঞ্জেলের মতো। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিয়ে করবে এবং ঈশ্বরের ময়দান পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকবে। খুশীর কথা, যে অকাতরে স্নেহ বিলায়, তারও তো স্নেহের ব্যাটারিতে রিচার্জ লাগে। কিন্তু জীবন দ্বিমুখী নদী, তাই একজন বয়স্ক মানুষের সংসার এক রকম, দুইজন বয়স্ক মানুষের-দুই। কত কত জটিলতার টানাপোড়েন থাকে সেখানে। টিশিয়ার মুখে বর্ণাভার খেলাগুলো ছিল সেই দুইয়ের সংসারেরই প্রতিফলন। চশমা পুরনো হলে, সব দেখা যায় না। আমি দেখতে পাইনি। একদিন রোগী দেখার মাঝখানে ফোন বাজে।

সে এসে কেঁদে ফেলে ঝর ঝর করে, 'ডক, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'কেন, কী হয়েছে, সিরিয়াস কিছু?'

'আমি বলতে পারব না, সরি ডক!' বলে সে চাবি হাতে রওনা দেয়।

ওটা আমার স্যাটেলাইট অফিস। বেশ কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করছে, সে একমাত্র নার্স। অফিস চলবে কী করে, সে প্রশ্ন করার সময়ও সে দেয় না।

কী ঝামেলা!

খুব বিরক্ত হই, এই মানুষগুলো সত্যিই দায়িত্বহীন! এত যত্ন করি, পয়সা বেশি দেই, ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু অর্থহীন। শুধুই নিজেরটুকু বোঝে, চাকরি থাকল কি গেল, পরোয়া করে না।

আমাদের সন্তানগুলো ঠিক এ রকম। কোনো বিবেক নাই, কোনো দায়িত্ববোধ নাই। নিজেরা এত পরিশ্রম করি, ভাবি দেখে শিখবে। আপনজনকে টানি, যে আপন নয়, তাদের ও টুকটাক দান খয়রাত করে ভালো বোধ করি। অথচ এরা কেমন যেন! কী করে নিজে বাঁচবে তা নিয়েই চিন্তা নেই, অন্যের চিন্তা তো দূরের কথা। শুধু একটাই ধ্যান-জ্ঞান, 'আজ', শুধু 'আজ' বাঁচলেই হলো, কাল হবে কালকের কথা।

আমরা জানি সেটা ভুল, আজ হলো কাজ করার দিন, ঝড়-বৃষ্টি-কালো দিনের জন্য সঞ্চয় করার দিন। ভোগ, বিশ্রাম ভ্রমণ আগামী দিনের বিষয়, তাও যদি সেই আগামী দিন কোনো কালো দিন না নিয়ে আসে।

পরের দিন টিসিয়া কাজে আসে না। তার পরের দিনও নয়।

কয়েকদিন পরে খবর নিয়ে আসে আমার সবচেয়ে পুরনো নার্স, 'ডক, টিসিয়ার খবর শুনেছো?'

'না তো! কী খবর?'

'জেলে।'

বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়ি। কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না।

'ওর বয়ফ্রেন্ড জেলে। কয়েকদিন আগে সে তাকে দেখতে গিয়েছিল। তার চলে আসার পরেই নাকি বয়ফ্রেন্ডের কাছে কিছু ড্রাগস পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে টিসিয়াই তাকে সরবরাহ করেছে। সে এখন ড্রাগ ট্রাফিকিংয়ের মামলায় জেলে, বিচার চলছে, কী হয় বলা মুশকিল।'

বজ্রাহত হলে মানুষ কেমন বোধ করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হল আমি বজ্রাহত। বিশ্বাস হয় না, ওর মতো এত চমৎকার একটা মানুষ, বিশেষ করে এতগুলো সন্তান যার কাঁধে, এমন অর্বাচীনের মত কিছু করতে পারে। সে যে ড্রাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় আমি তা জানি, আমার শুধু চশমাই পুরনো নয়, আমার মাথাও ন্যাড়া, মাদকাসক্ত বা মাদকব্যবসায়ীদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। মেয়েটা নিশ্চয়ই কোনো ফাঁদে পড়েছে।

'কোনো প্রমাণ আছে যে, সে-ই ড্রাগ সরবরাহ করেছে?'

'জানি না।'

'ওখানে ভিডিও টেপ হয় না?

'হয় হয়তো, কে জানে?'

'তোমার কী মনে হয়, সত্যি সে এ কাজ করেছে?'

'মনে হয় না, তবে প্রেমে পড়লে মানুষ কী না করে?'

'কিন্তু সে কচি খুকি তো নয় যে, প্রেমে পড়ে মাথা খোয়াবে?'

'হ্যাঁ ডক, সত্যিই তুমি বুড়া হয়ে গেছ, প্রেমের কি ছোট বড় বয়েস হয়?' বুড়ো নার্স হাসে।

কিন্তু তার হাসিটি মলিন। বুঝি, আমার মত সেও হতবিহ্বল এবং বিশ্বাসে অবিশ্বাসী।

ছটফট লাগে।

বলি, 'সে তো দীর্ঘদিন আমাদের এখানে কাজ করেছে, আমরা কি ওর ব্যবহার, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতার কথা উল্লেখ করে চিঠি দিতে পারি না? কোর্ট কি তা বিবেচনায় নেবে না?'

কিছুদিন পরে খবর আসে টিসিয়ার ১০ বছরের জেল হয়েছে, বয়ফ্রেন্ড ১ মাস হাজত খেটে মুক্তি পেয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে বাস করছে এবং টিসিয়ার প্রাণের প্রাণ বিচ্ছুগুলোকে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে ফস্টার কেয়ারে পাঠিয়েছে।

জামাল রেজা

ফুডপান্ডার ছেলেটা

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

সাইকেলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে পকেট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ছেলেটা। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ভেজা মাথা মুছলো হাতের তালু দিয়ে। মুছলো মুখও। ঠোঁট জোড়া কাঁপতে শুরু করেছে তার। শীতে পেয়ে বসেছে। হাঠাৎই নেমেছে এই বসন্তে বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঘূর্ণি বাতাসও। শোঁ শোঁ শব্দও হচ্ছে এখন কালবৈশাখীর মতো করে। এখনো হাতে দুটি রাইড আছে। এই দুটি পৌঁছে দিয়েই ঘরে ফিরবে সে। বোনের মুখটা ভাসছে তার মনে। ঘর থেকে বেরোবার সময় বলেছিল, ভাইয়া আমার জন্য একটা বার্গার নিয়ে আইসো।

ব্যাগ থেকে বার্গারের প্যাকেটটি হাতে নিল ছেলেটা। গরম কমে এলেও ওম লেগে আছে প্যাকেটের শরীরে। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধটা নিল। ঠিক আছে। এরই মধ্যে মোবাইল ফোন বাজল তার, হ্যালো... ছেলেটা বলল–

কি হলো আমার অর্ডার কখন আসবে? অন্যপ্রান্ত থেকে কাস্টমার বলল।

বৃষ্টি কমলেই চইলা আসুম স্যার।

তখন তো ক্ষিদা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চইলা আসুম স্যার।

জলদি এসো। নিচে এসে মিসকল দিও, আমি নেমে আসব।

আইচ্ছা স্যার।

মোবাইল ফোন সেটটি পকেটে ভরতে ভরতে পকেট গেটে গিয়ে গলা বের করল ছেলেটি। আকাশ দেখল সে। না, বৃষ্টি কমে এলেও একদম থামেনি। এখন নামলে ভিজে যাবে। শরীর ভেজার চেয়ে মাল না ভেজার প্রতি বেশি নজর তার। ভিজে গেলে মাল ফেরত দেবে। তখন আবার গুনতে হবে জরিমানা।

ফুডপান্ডার এই ছেলেটির নাম অপু। তবে তার নাম মায়ের মুখেই বেশি শুনেছে সে জীবনে। এই ছেলে, এই ফুডপান্ডা ছেলে বলেই লোকজন এখন সম্বোধন করে তাকে। বয়স চৌদ্দ বছর। ছিপছিপে গড়ন। মা প্রায়ই বলে, 'তর যদি একটা চাকরিবাকরি মিলে তাইলে এই কাম ছাড়বি রে অপু। রাইতে তুই যখন বাইরে থাকস তখন আমার মন খালি ট্যাও ট্যাও করে।'

ট্যাও ট্যাও কি মা? জানতে চেয়েছিল অপু। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলেছিল, 'মুরগির বাচ্চা বাইরে রাইখা খোঁপে মায়েরে আটকাইলে যেমন ট্যাও ট্যাও করে মুরগি ডাকতে থাহে, হেমুন অইছে আমার অবস্থা। তুই মাল ডেলিভারি দিতে গিয়া যহন বাইরে থাহছ তহন আমার ভিত্রে ঐ মুরগির মতোই খালি অপু অপু ডাক পারে পরানে।'

আদর করতে থাকা অপুর গালে তখন মায়ের তপ্তাশ্রুর ফোঁটা পড়েছিল। ছেলে বুঝতে পেরে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুই কান্দিছ না মা। তুই কানলে আমার বেজায় কষ্ট হয়।'

তাদের এই মা-ছেলের কষ্টের চেয়েও বড় কষ্ট বুকে নিয়ে ফোঁফায় ঘরের কোণে মনসুর মিয়া। অপুর বাবা। রিকশা চালাত মানুষটা। রোড এক্সিডেন্টে ডান পা কাটা পড়েছে। বুকেও পেয়েছিল প্রচন্ড চোট। তখন নিঃশ্বাস নিতে বড়ই কষ্ট হতো তার। দুধের শিশুটিকে ফুডপান্ডার কাজে লাগিয়ে দিলেও ভেতরে স্বস্তি নেই বাপের। মনে মনে আল্লাহকে ডাকে আর বলে, 'তুই আমারে কেন এমুন শাস্তি দিলি, খোদা? তর দুনিয়াতে আর মানুষ পাইলি না?'

হালকা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অপু পথে নামে। কাস্টমার আবার ফোন করে জানিয়েছে, 'এখনই না পৌঁছালে অর্ডার ক্যানসেল করতে বলেছে।' সে ছাড়া আর তেমন কেউ নেই রোডে। দু-একটি প্রাইভেট কার মাঝে মধ্যেই ভেজা পথে ছেরৎ ছেরৎ শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে অপু। তার শরীর সম্পূর্ণ ভিজে চুপচুপা হয়ে গেছে ততক্ষণে। শাহজাদপুর খ-৫৬ নম্বর বাড়ির সামনে অপু যখন সাইকেল থেকে নামল, তখন রাত আড়াইটা। মিসকল দিতেই কাস্টমার এসে অর্ডারি খাবার নিয়ে চলে গেল ভেতরে। বৃষ্টি আবারও বেড়েছে। কিন্তু অপু থামতে পারল না। বাকি অর্ডারটি পৌঁছাতে হবে গুলশান এক নম্বরে। তারপর মিলবে নিষ্কৃতি।

মহাখালী সাততালা বস্তির মোড়ে এসে অপু যখন নামল সাইকেল থেকে তখন দেখে মা দাঁড়িয়ে আছে টং দোকানের বারান্দায়। তাকে দেখেই মা ছুটে এলো। বুকে টেনে নিল ছেলেকে। শুরু করল কান্না। অপু মাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, 'তুই খামাখা কান্দোস ক্যান মা? আমি কি একলাই বাইরে আছিলাম? আমগোর লগের বেবাক পোলাপাইন দেখি রোডে রোডে এহনতরি।'

মা আঁচলে চোখের জল মুছে, ছেলের ভেজা মাথা মুছতে শুরু করে। কথা বের হয় না তার মুখে। ভেতরে যেন অথৈ ঢেউ মায়ের।

ঘরে অপুকে ঢুকিয়ে পুরো শরীর শুকনো কাপড়ে মুছে দিল মা। ছেলে তার কাঁপছিল তখন। সরিষার তেল ডলে দিল, কিন্তু কাঁপুনি যেন থামছিলই না। ঘরের কোণের দিক থেকে ডাক ভেসে এলো মনসুর মিয়ার, অপুর মা ... অপুর মা ...

কি অইছে আপনের?

অরে খাইতে দাও আগে।

দিতাছি আফনে চুপ থাহেন।

মনসুর মিয়া কথা বাড়াল না। কষ্ট চাপা দিল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে। নিরুপায় এই মানুষটি। প্রায়ই ভাবে সংসারের কথা। ছেলেটার কষ্টের কথা।

অপু বোন মনিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বার্গার খেতে দিল। বোনটি তার চপ চপ শব্দ করে খাচ্ছে সেই বার্গার। রাজুও মোচড় দিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসল। ততক্ষণে মনির বার্গার খাওয়া প্রায় শেষ।

আমারটা কই? জানতে চাইল অপুর ছোট ভাই রাজু। অপু তৎক্ষণাৎ বলল, 'কাইল আইন্না দিমু তরে। আইজ একটাই আছিল দুকানে।'

মিছা কথা। বলল মন খারাপ করে রাজু।

মা বলল, 'ঐ ছেমরি এক কামুড় থাকলে দে, নাইলে পেট নামবো তর। দেহছ না কেমনে চাইয়া রইছে?'

মনি বার্গারের শেষ কামড় দিতে গিয়েও দিল না। রাজুর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। রাজু সেটি বাঘের মতোই থাবা দিয়ে নিয়ে মুখে পুড়ে গপাগপ শব্দে খেয়ে ফেলল। পানির মগ হাতে নিতে নিতে সে বলল, আর দুইডা বছর যাউক। ভাইয়ার রহম আমিও ফুডপান্ডা হমু। তহন দেখবি পরতেক দিন মজার খাওন নিয়া আসুম।

ভাই বোন দুজনের মুখের দিকেই তাকাল অপু। মনে মনে স্থির করল কাইল দুই ভাই বোনের জন্য দুইটি বার্গারই সে নিয়ে আসবে।

অভাব বাড়লে মানুষের স্বপ্নও বুঝি বাড়ে। ভাইবোন আর মা বাবাকে নিয়ে সচ্ছল একটা সংসারের স্বপ্ন কিশোর অপুর ভেতরে চাটাই বোনার মতোই এগিয়ে চলে।

মা অপুকে ডিম আর আলুর ছালন দিয়া ভাত দিলেও খেতে পারল না অপু। মুখে লুকমা তুলতেই অক অক শব্দে বমি করে দিল সে। মা অপুকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে মিশিয়ে নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করে বিলাপ জুড়ে দিল। ও আল্লাহ তুমি সহায় হও। আমার পোলার কি অইছে? ঐ অপুর বাফ আফনে হুতি মাইরা রইছেন ক্যান? পোলা তো বমি কইরা ভাসাইছে। হের শইল্লে দেহি জ্বর।

পঙ্গু মানুষটা গড়াগড়ি দিয়ে চৌকির কোণে এসে ছেলের মাথায় হাত দিল। মানুষটা ঢুকরে কেঁদে উঠল তখন।

অপু বলল, জ্বর না বাবা। বৃষ্টিতে ভিজেছি তো। সহালেই দেইখো ঠিক হইয়া যাইবো। মা আমারে এক গেলাস পানি দে।

রসুন তেল মিশিয়ে গরম করে অপুর শরীরে দিল তার মা। তাতে একটু স্বস্তিই বুঝি পেল অপু। সে ইচ্ছে করে সুস্থতার ভাব দেখালেও জ্বর তখনো ছাড়েনি।

ছেলের মাথায় হাত বুলাতে থাকল মা। বসে থাকল ছেলের সিথানে। চোখ গেল চৌকির দিকে। রাজুটা ভাইয়ার ব্যাগ জড়িয়ে ধরে বসে

আছে।

ঐ কিরে অপুর ব্যাগ ধইরা বইসা আছস যে? জানতে চাইল মা।

মা ভাইয়ার ব্যাগের মইধ্যে খালি খাওনের বাসনা। আক্ষেপে বলল রাজু। তাতে মায়ের ভেতর কাপড় চেপার মতোই মুচড়িয়ে উঠল একটা কিছু। গলার কাছে উঠে এলো কষ্ট। না পাওয়ার আহাজারি কষ্ট।

জামা কাপড়ে আর ব্যাগে খাবারের গন্ধ অপুও পায়। ব্যাগটা প্রায়ই শুঁকে দেখে সে। দামি সব খাবার এই ব্যাগে ভরে নানাজনকে বিলালেও নিজে কোনোদিন খেতে পারে না। সামর্থে কুলোয় না তার। অসমর্থ মানুষদের এই আকুতি চিরকালের। চিরকালই তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। কষ্ট পায়। ভেতরে গুমরে মরে কষ্টের নীল বিষ।

অপুর সমবয়সীরা সেভেন-এইটে পড়ে। তারও পড়ালেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। বাবার এক্সিডেন্টের পর সেই স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফুডপান্ডার কাজে মা-ই লাগিয়ে দিয়েছে শাহীনকে বলে কয়ে। ক্ষুধার্তের নিদারুণ কষ্ট অল্প বয়সেই অপুকে সাইকেল নিয়ে ছুটতে সাহস জুগিয়েছে। ফুডপান্ডার মাল ডেলিভারি করে যারা, তাদের কাজ রাতেই বেশি থাকে। রাতেই অ্যাপে এটা-সেটা অর্ডার করে মানুষ। প্রথম প্রথম অপু প্রতি রাইডে ত্রিশ টাকা পেত। এখন পায় চল্লিশ করে। ইতিমধ্যে তার কিছু বান্ধা কাস্টমারও মিলে গেছে। ফলে রাইডের পরিমাণও বেড়েছে। সপ্তাহে এখন তিন-চার হাজার টাকা আয় হয়। তবে খাটুনি যায় প্রচুর। অপুর কষ্ট মা-বাবা অনুভব করে মর্মে মর্মে। নিরুপায় তারা দুজন মানুষও। অপুর মা দুটি বাসায় ছোটা বুয়ার কাজ নিয়েছে। তাতে করে মাসে আড়াই হাজার টাকা আসে। মা ও ছেলের ইনকামের টাকা থেকেই চলে সংসার। অসুস্থ মানুষটার জন্য কিনতে হয় ওষুধ পথ্যও।

আকাশে মেঘ ছিল তখন। সাইকেল নিয়ে ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল অপু। মা তার দাঁড়িয়ে থাকল নিথর বরফ খণ্ডের মতো। মুখে বুঝি রা নেই। একটু আগেই অবশ্য ছেলের গায়ে হাত দিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। জ্বর নেই এক ফোঁটাও।

বিস্তর মুখে মিনারার বাপের টং দোকানের সামনে প্রতিদিনকার মতো আজও বসে আছে শ্যাওলা রঙের সেই কুকুরটি। কুকুরের এত সুন্দর রঙ হয় না। এটার হয়েছে। অপুর মা ঘাড় ফেরাতেই কুকুরটি আকাশমুখো হয়ে মেঘের ঘ্রাণ নিল যেন। ফের তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। অপুর মা আকাশ দেখল। মেঘ ক্রমেই ঘন কালো হচ্ছে। আজ বৃষ্টিতে ভিজলে অপুটার আবারও জ্বর আসবে। আজ তাকে বেরুতে না দিলে কী ক্ষতি হতো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপুর মা ঘরমুখো পা বাড়াল। ঘণ্টাখানেক বাদেই তাকেও যেতে হবে মনীষাদের বাসায়। কাজ করে এসেছে সকালেই। মনীষার বাবা নাকি তাকে কী বিষয়ে কথা বলবেন, যেতে হবে সে জন্য। মোটেও যেতে ইচ্ছা করে না অপুর মায়ের। লোকটা জানি কেমন করে তাকায়। সেদিন পেছন থেকে ডেকে আর কথা বলেননি। চেয়েছিলেন একদৃষ্টিতে। এসব অপুর মায়ের ভালো লাগে না। জীবন সংসার নিয়ে সংকটে কাটছে তার প্রতিটা মুহূর্ত। সংকটে আর জুট-ঝামেলায় জড়ালে জীবনের রসবোধও ম্লান হয়। তবু যাবে। যেতে হবে। অপুকে একটা কাজে লাগিয়ে দিতে বলেছিল। যদি তেমন কোনো খবর হয়?

অপুর মায়ের চোখে কঠিন জিজ্ঞাসা, 'জীবন এমন কেন? সন্তানের মুখের খাবার জোগাতে এত কিছু করতে হবে?'

২

রাজুটার খাই খাইটা বেড়ে গেছে ইদানীং। একটু আগেই দোকান থেকে পুরি এনে খেল, এখন আবার ঘ্যান ঘ্যান করছে ঝালমুড়ির জন্য। এসব খেতে হলে টাকা লাগে না? হিসাবের টাকায় সংসার সচ্ছল চলে?

মা ঝালমুড়ি ...

আবারও এসে রাজু বলল মাকে।

ইচ্ছে হচ্ছিল হাতের বেলন দিয়েই বারি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে। কিন্তু রাগ সংবরণ করে আঁচলের গিঁট খুলে পাঁচটি টাকা দিল রাজুকে। রাগত বলল, এরপরে আবার টেকা চাইতে আইলে তরে মাইরা ভাগুম আমি।

ছেলে চলে যাওয়ার পর নিজের বলা কথাই রিপিট হতে থাকে অপুর মায়ের ভেতর। ব্যথায় বুকটা বুঝি টনটন করে ওঠে। একটু আগেই বড় ছেলে অপুর সঙ্গে কথা হয়েছে। ছেলেটার কণ্ঠ তখন ভারি ঠেকছিল। ঘরে ফিরতে বললেও ফেরেনি। আজ নাকি রাইড বেশি। ফিরতে দেরি হবে। এদিকে ঘরে পড়া অচল মানুষটির দিকেও আর তাকানো যায় না। কেমন যেন সাপ চোখে তাকিয়ে থাকে। পলক পড়ে না চোখের। মানুষটির প্রতি যে খুব যত্নশীল তাও বলা যাচ্ছে না। সংসার আর তিন সন্তান সামলাতে গিয়ে দিশেহারা প্রায় অপুর মা। একটু রং চা করে নিয়ে গেল স্বামীর কাছ। ওঠেন চা খান। বলল অপুর মা।

লাইজু... ডাকলেন অপুর বাবা।

কন-

মায়েরে খালি খোয়াপে দেখি ক্যান কইতে পারো?

না, মরা মানুষ খোয়াপে দেখাটা ভালো না। বাদ দেন, খোয়াপ তো খোয়াপই, চা নিন।

একটু দুধ চা খাইতে মুন চাইছিল।

দোকান থেইকা আইনা দেই?

না।

তয়?

তোমার হাতের চা-ই খাইতে চাই।

মানুষটার চোখে চোখ রেখে মুচকি হেসে দিল অপুর মা। তাদের সংসারে হাসির অনুপস্থিত দীর্ঘদিন ধরে।

স্ত্রী চা বানাতে চলে যাওয়ার পর স্বামী সেদিকেই তাকিয়ে থাকল। মনে ভাসল অতীত। সেই অতীতে সুখ বসন্তে কালো মেঘ ছিল না। ছিল সুখ। ছিল শান্তি।

বাবা... ডাকলো রাজু।

কী?... বলল মনসুর মিয়া।

এত বুখ লাগে ক্যান বাবা?

পেট থাকলে তো বুখ লাগবোই

আইচ্ছা বাবা, আমরা গরিব হইলাম ক্যান?

গরিব?... কথা থেমে যায় মনসুর মিয়ার। এরপর মনে হয় মুখে আর জবাব ওঠে না। কিন্তু আবারও নাছোড়বান্দা ছেলে বাপের গর্দান ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করে, কওনা বাবা, আমরা গরিব হইলাম ক্যান?

আল্লায় করছে রে বাপ, আল্লায় করছে।

এতে আল্লার কী লাভ হইছে?

মনসুর মিয়া এবার ছেলের দিকে করুণ চোখে তাকায়। তবে বলে না কিছুই। কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয়, বলে তর মাকে বলতো অপুকে ফোন দিতে।

মুখে একটা চট শব্দ তুলে রাজু চলে যায়। বাপের সামনে তখন দাঁড়ায় আরও কিছু প্রশ্ন। সেসবের উত্তর হয় না। এক্সিডেন্ট হলো ক্যান? মৃত্যু হইলো না ক্যান? এত ক্যান এর জবাব এই জগৎ-সংসারে মেলে না বলেই কিছু মানুষ হাজারো ক্যানোর ভেতর দিয়েই জীবন কাটায়।

নেইন আফনের দুধ-চা। অপুর মা স্বামীর সামনে কাপ এগিয়ে ধরে বলল। মানুষটা হাত থেকে কাপ নেওয়ার সময় আঙুলের ছোঁয়ায় বেজে উঠল হাতের চুড়ি। টুংটাং এই চুড়ির শব্দ মনসুর মিয়ার খুউব পছন্দ। আর্ট কলেজের সামনে থেকে প্রায়ই রিকশা থামিয়ে কাঁচের চুড়ি কিনে এনে দিত স্ত্রীকে। এখন সেসবই তার কাছে স্মৃতি।

স্ত্রী কাপ রেখে চলে যেতে চাইলে স্বামী হাত ধরলেন।

কী?

কিছু না

তাইলে

এমনি

চা খাইন

তুমি পাশে বহো, আমি চা খাই

না, আমি যাই আমার হাতে কাম আছে।

স্ত্রী চলে গেলে মনসুর মিয়া সেদিকে চেয়ে থাকে। ভেতরে তার নানা প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি চলে তখন।

৩

আজ আকাশে মেঘ নেই। ঠা ঠা রোদ। হাসপাতালের বেঞ্চিতে বসে আছে অপুর মা। মনে তার ঘনকালো মেঘ জমেছে। সাত দিন ধরে অপু মহাখালী অ্যাজমা সেন্টারে ভর্তি আছে। তার নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। ডাক্তার জিয়াউল করিম পকেটের টাকা দিয়ে অপুর ওষুধ-পথ্য কিনে দিয়েছেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। আজ সকাল থেকে শ্বাসকষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। অক্সিজেনেও যেন কুলোচ্ছে না।

অপুর মা ছেলের পাশে বসে চোখের জল ফেলছে। অপুর জ্ঞানবোধ নেই। চোখ মেলেও তাকাচ্ছে না, এমন অবস্থায় মায়ের মন ঠিক থাকে কী করে?

রাতে অপুর বেগতিক অবস্থা দেখে ভেন্টিলেটর দিয়েছেন ডাক্তার জিয়াউল করিম। তার মুখও মলিন। রোগীর সাড়া না পেলে ডাক্তার সতেজ থাকেন কবে?

রাত বারোটা পেরিয়েছে আঠারো মিনিট আগে। আকাশে জোছনা ভরা চাঁদ। হাসপাতালের করিডরে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে অপুর মা। মনটা ভীষণ খারাপ। তার বিপদে কাউকে পেল না পাশে। ঘরে অসুস্থ মানুষটা দুটি ছেলেমেয়েকে সামলাচ্ছে, আর সে পড়ে আছে অপুকে নিয়ে হাসপাতালে। ছেলের জবান বন্ধ। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মায়ের কোলে মাথা রেখে সে বলেছিল, 'জ্বর বালা হইলে আর বৃষ্টিতে ভিজুম না মা। আমার বুকে ঠাণ্ডা বইসা গেছে।'

নিজেও মনে মনে পণ করেছে। ছেলেকে আর ফুডপান্ডার কামেই দেবে না। প্রয়োজন হলে ছেলেকে নিয়ে ফুটপাতে পিঠার দোকান দেবে।

তখন রাত নিশুতির দিকে। হাসপাতালের দেয়ালে হেলান দিয়ে অপুর মাও ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কোলের কাছে একটি বস্তার ব্যাগ। আশপাশে অন্যান্য রোগীর সঙ্গের লোকজনও চাটাই বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছে। সকলের ভেতরেই অস্বস্তি, অলস প্রতীক্ষা কখন ছাড়া পাবে হাসপাতাল থেকে।

এই যে শুনছেন? একজন আয়া এসে ডাকল অপুর মাকে।

অপুর মা চোখ খুলে তাকাল। বলল, 'আমারে ডাকতেছেন?'

হু, আপনের পোলা ভেন্টিলেটরে না?

হু, অয়।

হেয় মনে অয় বাঁচব না। ডাক্তার স্যারে আপনারে যাইবার কইছে।

কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে অপুর মা। এই কান্না তার থামেনি। অপুর নিঃশ্বাস থেমে গেছে। তার কাঁধে আর কোনো দিন ফুডপান্ডার ব্যাগ ঝুলবে না। কাস্টমারদের পছন্দের সব খাবার বিলিয়ে ব্যাগভর্তি মজাদার খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে আর কোনো দিন সাততলা বস্তিতে গভীর রাতে ফিরে আসবে না অপু।

পেছন থেকে তাকে আর কেউ ডাকবে না ফুডপান্ডার ছেলে বলে।

অপুর মা হাসপাতালের করিডর চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল। শেষ রাতের ম্রিয়মাণ চাঁদটা তখন নারকেল গাছের ফাঁকা দিয়ে বিলোচ্ছিল আধমরা আলো। যে আলোতে মেলে চাঁদের পরাজয়। জীবনেও বুঝি তেমন করেই আলো ঝিমোয়।

কবিতার সময়
সময়ের কবিতা

মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফেরদৌস নাহার, সাইফুল্লাহ্ মাহমুদ দুলাল, মারুফুল ইসলাম, মারুফ রায়হান, ইরাজ আহমেদ, জুয়েল মাজহার, ফকির ইলিয়াস, হেনরী স্বপন, হাদিউল ইসলাম, চঞ্চল আশরাফ, মোস্তাক আহমাদ দীন, খলিল মজিদ, শাহীন মোমতাজ, মিলটন রহমান, ইকতিজা আহসান, সুভাশিস সিনহা, সোহেল হাসান গালিব, পরাগ রিছিল, কাজী নাসির মামুন, সাঈদ জুবেরী, সরোজ মোস্তফা, তানভীর মাহমুদ, তারিক ঈমাম, আলতাফ শাহনেওয়াজ, আফরোজা সোমা, উম্মে রায়হানা, রাজীব দত্ত, বিধান সাহা, আসমা অধরা, ইফতেখার ইনান, খান রুহুল রুবেল, অমিত রেজা চৌধুরী, দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম, নওশাদ জামিল, স্নিগ্ধা বাউল, বিজয় আহমেদ, তৌহিদুল ইসলাম, রাজীব আশরাফ, রওশন আরা মুক্তা, তানিম কবির, সিফাত বিনতে ওয়াহিদ, রিমঝিম আহমেদ, হাসনাত শোয়েব, সালেহীন শিপ্রা, অনুভব আহমেদ, নাদিয়া জান্নাত, ফরহাদ নাইয়া, নাজমুস সাকিব রহমান, ফারজানা হায়দার চৌধুরী, মাসুম মুনাওয়ার, সাজ্জাদ হোসেন, রুবেল সাইদুল ইসলাম

অলংকরণ : তৌহিন হাসান

মুহম্মদ নূরুল হুদা

শিঙকইনের বিষ

যে নড়াচড়া করে
তাকে ধরা যায় না,
তার কাটায় শিঙকইনের বিষ,
একবার ফুটিয়ে দিলে জনম
ফুরায় তো জ্বালা ফুরায় না।

পোকখালির পর
মইশখালি দরিয়ার বাঘমোহনায়
যেখানে সাতখুনের নৌকাসমাধি
নোনাজলের আড়াল থেকে
জোছনায় বুক দেখায়,
সেখানে ডুব দিয়ে বাবা কি
সহজেই না কাতুকুতু দিয়ে
ধরতেন সেই বিষধর শিঙকইন!

মা
লালমরিচের জিহ্বাজ্বালানো
ঝাল দিয়ে রান্না করে সেই মাছ
তুলে দিতেন বাবার পাতে।
তখন নৌকাসমাধি থেকে মুক্তি
পেয়ে সেই মৎস্যশক্তি মকরধ্বজ
বড়ির বীর্য জোগাতো পিতার
পৌরুষে। আমরা কি আসিনি
সেই পিতারই অমৃতস্য ঔরসে?

অতএব সাবধান,
আমরা ভূমিসন্তান,
আমরা পালাবো না,
আমরা হারাবো না,
আমরা ভূমিসন্তানরা
প্রতি অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায়
নৌকাসমাধি ছেড়ে ফিরে
আসবো শিঙ বাগিয়ে,
প্রতিশোধে
প্রতিরোধে
শুদ্ধ হবো
নৈয়ায়িক প্রতিহিংসায়,

আমরা দাঁড়িয়ে আছি,
আমরা দাঁড়িয়েই থাকবো
অঙ্গে অঙ্গে লীলায় লীলায়।
তুমি কে হে,
কোন বিশ্বত্রাস
চিঙ্গিস-হালাকু যে
উৎখাত করতে
চাও জাতিসন্তানকে?
ব্যক্তি থেকে জাতি,
জাতি থেকে মহাজাতি,
মহাজাতি থেকে মহাপ্রাণ,
মহাপ্রাণ থেকে মহাত্রাণ...

অনন্তর
ব্যক্তিভিটা থেকে বিশ্বভিটায়,
মুক্তি শুধু মুক্তি পায় সীমানা
থেকে মূর্তবিমূর্তের
সীমানাহীনতায়,

আয় জাদু আয়
আয় জাদু আয়
আয় জাদু আয়

আয় মহামুক্তির
মহামোহনায়

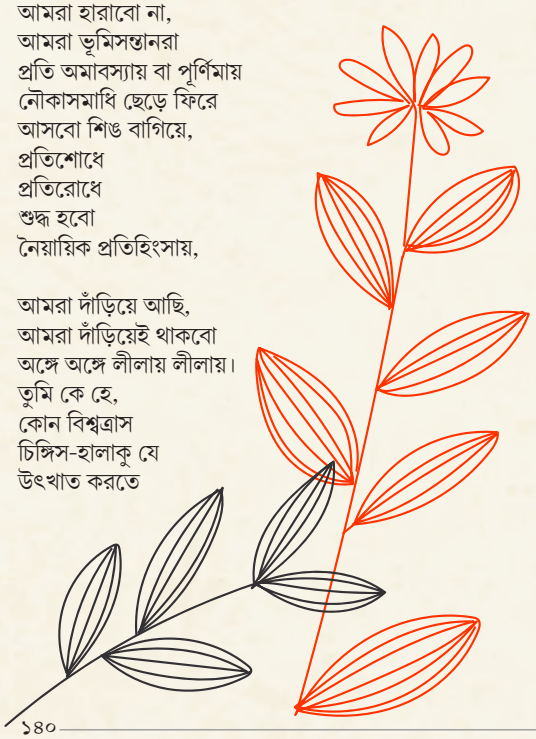

ফেরদৌস নাহার

হাওয়ার উৎসব

জানি, ভ্রমণ আয়োজন সাজিয়ে তুলছে তার মুখ
একটানা গেয়ে যাচ্ছে মগ্ন যাত্রার গান
পৃথিবীর ঘড়িতে এখন কটা বেজে কত
যদি ঠিক ঠিক বলতে পারো, তাহলে একদিন
সত্যি সত্যি চলে যাব তোমাদের দেশ ছেড়ে

না হেসো না। এটা হতে পারে
জেদি মানুষের কিছু অবুঝ ইশারা থাকে খুব
পাখা ঝাপটানো প্রার্থনায় ঝরে পড়ে সেসব
যেদিন রাতগুলো দুহাত খুলে এগিয়ে গিয়েছিল
কিছু শ্লীল-অশ্লীল শব্দের দিকে
শব্দেরা বাঁকবদল করে ঘুমোতে চেয়েছে
অতসব বুঝতে চায় না তারা
শুনতে পাই কণ্ঠস্রোত, হাওয়ার উৎসব

তুষারের বুকে এঁকে যাওয়া পদচিহ্নের ওপর পা ফেলি
বলি, পৌঁছে দাও অভ্রান্ত দিনের কাছে
ভালো থেকো শীত দেশে একান্ত চাওয়া উষ্ণতা
সহিষ্ণু দিন শেষে অন্ধকারে শুয়ে থাকা আলোর চিবুক।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

কবর এবং কোকিল

বাঁশ বাগানের মাথার ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়া জোছনা
অমাবস্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকারের সুগন্ধি
জোনাকীর বাতিঘর, ঝিঁঝি আবহ সংগীত
গ্রীষ্মে আম্র মুকুলের মিষ্টি মিষ্টি ঘ্রাণ
বর্ষায় তুমুল বৃষ্টির সৌরভ একটি কবরকে অতি যত্ন করে রাখে।

শরৎফুলের ঝরা পাপড়ি, ঝরা পাতার নক্সিঘাসের আদর
হেমন্তে দূর ধানক্ষেতের শুভেচ্ছা
শীতের ঘন কুয়াশার শিশিরের চুয়ে পড়া ভালোবাসায়
ভিজিয়ে রাখে একটি কবর।

বসন্তের বাতাসে মেশানো চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবে
তসবি গোটার মতো বারো মাসের বন্ধনে
গাছের ছায়া জড়ানো ঝলমল রোদের অভিনন্দনে
পাশের স্কুল থেকে ভেসে বালক-বালিকদের মুখরিত আনন্দে
শীতল শান্তিতে শুয়ে থাকে–
একটি কবর; স্যারের কবর।

স্যারের কবর! বলে শ্রদ্ধায় বিনীত শেয়ালেরা ফিরে যায়
টেবির চর, রৌহা, বেতমারীর দিকে।
কবরটি জিয়ারত করার পর শিহাব ভেজা চোখে, ভেজা কণ্ঠে
ফোন করলো।
বেজে উঠলো ৬৪৭ ৫৬৮ ১৯৭১.
ফোনের ভেতর থেকে ভেসে আসলো কোকিলের ডাক।
কোকিলের ভাষার অনুবাদ :
মুক্তিযোদ্ধা শহীদ স্যারকে আমরা প্রতিদিন বেসামরিক কায়দায়
গ্রামীণ শ্রদ্ধায় গার্ড অব অনার দেই।

মারুফুল ইসলাম

ফিরে আসা

খোলা লনে প্রাতরাশের টেবিলটা
আকাঙ্ক্ষিত আহ্লাদ হয়ে আমাকে ডাকল আজ সকালে
অদূরবর্তী রাস্তার মৃদুমন্দ যানবাহনের সচল শব্দে
সচকিত রাতজাগা বাতাসে
শিশুদের দুলে দুলে নামতা শেখার ভঙ্গিতে
দুলছে দুধারের কাশবন
ওপরের আলসে মেঘগুলোকে মনে হলো
উঠোনের রোদে শুকোতে দেওয়া আতপ চালের পাঁপড়

মাঝেমধ্যে চিরচেনা পরিবেশ অজান্তেই
অভিনতুন অবয়বে দেখা দেয়
পাশে এসে বসে বাইশ বছরের স্মৃতির শরীর
কথামালা পাক খায় খাবারের স্বাদে আর
পানীয়ের উষ্ণতায়
আশপাশের গল্পগুচ্ছ হয়ে ওঠে ধ্বনির ধূপছায়া

আমরা হারিয়ে গিয়ে
এরকম এক সকালে আবার ফিরে আসি

মারুফ রায়হান

আমরা বাঙ্গাল কিছুটা কাঙ্গাল

অতীতে করি বাস আমরা কতিপয় পুরনো ক্ষত্রিয়
যা কিছু প্রথাগত সাবেকি হামবড়া সাদরে বরণীয়

নতুন যাত্রায় ভাব ও চিন্তায় সতত সংশয়
হাঁটিও একপথে সবাই দল বেঁধে বিশ্ব করি জয়

প্রচল ঘূর্ণিতে নিত্য ঘেরাটোপে বিবিধ উৎসব
টেলিস্কোপে দেখা নেবুলা-নীহারিকা নিরেট ঝুট সব

বিজ্ঞজন বলি নিজেকে বরাবর, অরুচি বিজ্ঞানে
পক্ষপাতহীন যুক্তি-বিতর্ক এড়াই সজ্ঞানে

সমঝদার বটে বাঁশির ঢোলকের, শুনি না ক্ল্যাসিকাল
শহর ভরে ফেলি অট্টালিকা গড়ে ভরাট করে খাল

হিংসা অভিমান নিন্দা অপমান এসব ঢের প্রিয়
গুজবে মাতি খুব, পরের চর্চায় মুখর ইন্দ্রিয়

তুচ্ছজ্ঞান করি যা কিছু অভিনব জটিল সুন্দর
আমরা বাঙ্গাল কিছুটা কাঙ্গাল আবেগী অন্তর

ইরাজ আহমেদ

পাঠ করো আমার নামে

রৌদ্রে গিয়ে পাঠ করো
আগুনে গিয়ে পাঠ করো।
বহুদিন হাওয়া থেকে বাঁচাইনি নিজেকে
বহুদিন পাখি থেকে;
কুয়াশা থেকেও।
আজ দুঃখ সাক্ষ্য দিতে এসেছে দেখে ভালো লাগছে
পুলিশের মতো অবহেলা করেনি বলে
ভালো লাগছে।
রৌদ্রে গিয়ে পাঠ করো
আগুনে গিয়ে পাঠ করো আমার দিনলিপি;
আমার ভালো লাগবে।

বসন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যর্থ কুয়াশায়
আমার গন্তব্য অস্পষ্ট হয়ে যায় উদ্বেগভর্তি
একটা বাসের ভিতরে।
মৃত মাছেদের শহরে ভয় সারা রাত জেগে বসে থাকে
নাম ধরে ডাকে–
নীল
নীল...
বাতাসে ঘষা খেয়ে ম্যাচের কাঠির মাথায়
ধরে যাচ্ছে নীল আগুন
নীল ডাকঘর থেকে ভোরবেলা অসংখ্য চিঠি আসছে
মাছ ধরার নীল জাল
পুকুরে ভাসছে সহায়-সম্বলহীন
জেগে থাকছে ভয় কাউকে চিনতে না পেরে।

কেউ ডাকছে আমাকে?
যেরকম জঙ্গল থেকে মানুষকে ডাকে
মৃত পাতাদের পরিত্যক্ত বোধ!
পাঠ করো আমার নামে,
রৌদ্রে গিয়ে
আগুনে গিয়ে।

জুয়েল মাজহার

ঘোড়া

পোতাশ্রয়ে হল্লা চলে ঝগড়ুটে পাখি আর ঝোড়ো বাতাসের

পাথরের ঘোড়া এক অ্যান্টেনার মতন সেখানে
পেতে রাখে কান। অপলক চোখজোড়া সমুদ্রের দিকে

চেনা পথে ভারী বুটে কাঁকর মাড়িয়ে প্রিয় নাবিক আসে না
মদালস গলা আর ভাঁটিঘরে করে না গমগম

রাত্রে জেটির পাশে গম্বুজের মতো গোল তাঁবুর ভেতরে
বেশ্যাদের ব্যবহৃত স্তন আর আনে না স্পন্দন;
-----আকাশের খিড়কিপথে দ্যায় না উঁকি ভয়োরিস্ট চাঁদ

নাচা-গানা-হল্লা শেষে ভাঁটিঘরে বন্ধ হয় ঝাঁপি;
নিজের ডেরার দিকে টলোমলো পা-দুটো থামিয়ে
ঘোড়াটির গলা ধরে নাবিক কাঁদে না

মাঝরাতে সমুদ্রকেবিনে তার গাঢ় সলিলোকি
ক্রমে, ধীরে মিশে গেছে ঢেউ-জলে, নুনে ও নিস্বনে
যেন-বা চুম্বক কোনও, অয়স্কান্ত মণি এক তাকে
টেনেছে অতল গর্ভে---- গূঢ় এষণায়!

হয়তো-বা তাকে নিয়ে খেলছে কোনো তলহীন নিকষ বিবর
হয়তো সে তাকে অতলের গর্ভে ফের জন্ম দিতে চায়;

ঘোড়াটি জানে না কিছু; অপেক্ষায় দু-চোখ পাথর

ঊর্ধ্ব-হৃদে ফ্লুরোসেন্ট একটি কাছিম তার থামাল সাঁতার!

এর হিম চোখে এক ছায়ার পিকাসো
পাইপ-ঠোঁটে চুপচাপ আঁকছেন ছবি। সে-ছবিতে

কাকতাড়ুয়ার খড়ঠাসা শিরে সেই নাবিকের টুপি
ফরফর ধ্বনি তুলে উড়ছে বাতাসে

ফকির ইলিয়াস

মধ্যরাতের মিথমিশ্রণ

তুমি কখনো ভাবোনি; এই বৃক্ষের
ছায়ায় তোমাকে দাঁড়াতে হবে-
ভাবোনি-
এই নদীর ঢেউয়ে ভেজাতে হবে
পা, এরপর জল ছিটিয়ে যাপন
করতে হবে মাদুলি-উৎসব!

অথচ এমনটি তুমি ভাবতে পারতে-
এমন মধ্যরাতের শরীরে
মিশিয়ে দিতে পারতে
সবুজ মিশ্রণ, চাঁদের কণা।

মানুষ সব সময় সবকিছু ভাবতে পারে না।

যখন ভেবে অন্য আকাশের মুখোমুখি
দাঁড়ায়; তখন দেখে-
বৃক্ষের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
কয়েকটি কাঁটা, নদীর বুকে-
তার দিকে তাকিয়ে আছে,
কয়েকটি আদিম পাথর।

হেনরী স্বপন

শেয়ারবাজার

কাচের দরজা এঁটে সাদা ধবধবে বসে থাকে
শংকরমঠের শিব,
ভিখিরির ঘরে এভাবে কেউ
দুধ-কলা দিয়ে ক্ষুধার্ত বেড়াল পোষে না,
যদিও মেয়েলি সবকিছুতেই বাতাসার গুঁড়ো,
তন্দুরি রুটির গন্ধ,
চিকেন ফিশের গায়ে কামড়ের দাগ
লেগে থাকে গালে ও গলায়।
দেবতা হলেই পুজো!
কর্ণফুলি কাগজে ছাপালে সেজানের রমণীরা,
তীর্থমেলা লোক সমাগমে;
উদোম পুকুরে হেলে পড়া বাঁশঝাড়,
কোঁকড়ানো ঝুরি বটের তলায় মনসার ঘট,
লতাচ্ছাদিত জাপটে ধরা বুকে পৈতৃক দেয়াল;

ভিটেমাটি ফেলে রাখা লোকসানে গমগম করছে তুমুল
শেয়ারবাজার...!

হাদিউল ইসলাম

নখদর্পণে

নখদর্পণে আমার প্রেমিকারা খেলছে এখনও
তাদের বিনুনি উড়ছে চিলঘুড়ির ল্যাজের মতো
অথবা খোঁপার 'পরে ফণা তোলা ফুল, হুঁশিয়ার;
বলে যাচ্ছে এখনও

নখদর্পণে এতো যে বোমা পড়ে, গিলে ফেলি
পাগলাঘণ্টির সমস্ত সাইরেন হৃদয়ে লুকাই
আমি একটা নেইলকাটার খুঁজি রোজ

ক্ষীণকায়ী যে অভিমানটা নতমুখে হেঁটে গেলো
জীবনানন্দের কবিতার গলির ভেতর
নখদর্পণে দেখে একটা নেইলপলিশও খুঁজি খুব

চঞ্চল আশরাফ

নৈকট্যের পর

তোমাকে সন্ধ্যার কাছে রেখে আমি মধ্যরাতে
বুকের ভিতরে চাঁদ নিয়ে শুয়ে পড়ি, যাতে
নিদ্রা নেমে আসে, জোছনায় পড়ে থাকা শব
ফের উঠে বসে, তাকে ঘিরে যা কিছু সম্ভব,

বৃত্তাকার নাচ, ছাইয়ের আগুনে ফেরা, রণপায়ে
চকিতে পাহাড়ে ওঠা, দুই হাতে কুয়াশা সরায়ে
তুমি দেখো, সব ঝরাপাতা ফিরে গেল গাছে;
তোমার নীরব ঠোঁটে চুম্বনের দাগ লেগে আছে

স্খলনের চিহ্ন মুছে, শবের রক্ষক এই চাঁদ আর
আমি; ঘুমের উপর নড়ে ছায়া, দূরত্বে তোমার...

মোস্তাক আহমাদ দীন

ঘুঘুকাল

অঘ্রানে, খলার পাশে এসে ভাবি :
'এ মাটি উড়ছে কেন, আর, তার গায়ে
কেন লেগে আছে রাজ-চঙ্গলের দাগ?'

এই খোলা প্রান্তরেও নারীরত্ন চুপে মরে যায়

ভাবতেই অবাক আমি– যার নাম সাধুকান্ত,
সুষ্ঠু পৃথিবীর কাছে সেও বলে-কয়ে ঘুঘু

কেউ দিয়ে যায় বীজ, উয়ানির আগেই এসে,
অন্যজন, বারবার, খেয়ে যায় ধান

খলিল মজিদ

হাছন রাজা

আমি কিছু নয়... এই কথা ভেবে
দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী ছাড়েন গৌড়
পার হয়ে যান গৌড়ারং অবলীলায়;
যেদিকে তাকান দেখেন বন্ধু দয়াময়।

আঙুলে আংটি চমকিয়া গান প্রজন্মান্তরে
ছামিরন দেওয়ান।
মিউজিয়মের ছবি ও আসবাবে পুরোনো খানদান।

অন্তরে অভেদমন্ত্র ধরে যে হাছন–
কোনো ঘৃণা নেই, বিষণ্নতা নেই,
হাওরের ঢেউ আর বিশাল বাতাস–
সে-ছবি উধাও।
বায়ুর বিষয়-আশয় ধরে না ছবিতে, গান হয়ে যায়।

বাতাসে গুঞ্জরিত হয়–
'তুমি-আমি, আমি-তুমি ছাড়িয়া ভয়...'

শাহীন মোমতাজ

রাত্রিকালীন বৃষ্টি দেখতে দেখতে লেখা কবিতা

দূরবর্তী আলোক-চিহ্নকে ঘিরে সমস্যাবহুল রুগ্‌ণ
পৃথিবীর আবর্তনের মতো স্বাভাবিক
এই ফিরে আসা, ফলে
ক্ষণস্থায়ী আত্মাভিমান থেকে প্রকটিত হচ্ছে ব্যবধান
দেখ ফলে ও পাতায়।
তখন তো মনে হয়, একটা সমস্যা মানে
সমাধান দূর-পরাহত। অনিত্য সংসারে ফিরে বোঝাপড়া
তেলাপোকাদের সাথে কীটনাশকের।
এরই ফাঁকে ঘুম, যাকে উপশম বলে মান্য করি,
এসে তাড়া দিতে থাকে, বলে–
'তোমার চোখের পাতা ঝরে যাবে এরকম চৈত্র-রজনীতে।'
তথাপি যাচনা করি, হতাশার কথা তাকে
পুনঃপুন ব্যক্ত করে বলি–

আমার আরাধ্য মেঘ, বৃষ্টি নিয়ে
চলেছে কোথায়!

ইকতিজা আহসান

মাধবপুর

আমরা এরপর একটি নদীর তীরে
একটি ধানক্ষেতের কল্পনা করতে থাকি
বেশ একঝাঁক পাখির মালা দিগন্তে উড়িয়ে দেই
তাদের ডানাবর্তী হাওয়ায় সংলাপ বাজে
হাওয়াকে আমরা একটি নির্দিষ্ট গতিতে
প্রবাহিত হতে বলি!
পাশেই একটি মাধবীতলা বুনে দেই
রচিত সকালে ঝরা ফুলের গন্ধ দিয়ে
আমি চুম্বন আঁকি তোমার অধরে
আমার রক্তে তখন একটি গনগনে সূর্য ওঠে!
আমরা হাত ধরে একটি নদীর ঘ্রাণে
ধানক্ষেতের ঘ্রাণ যোগ করে নামতা শিখি অনুভূতির!
পৃথিবীর সকল ফুল ঠিক অই মুহূর্তেই ফোঁটে
অনেকগুলো মাধবী জমা হয়
সুই-সুতো দিয়ে মালা বুনে আমরা একটি
মাধবপুরের স্বপ্ন দেখি
তুমি আর আমি তখন একটি কল্পিত
মাধবপুরের রচনা লিখতে বসি!
সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে
আমরা লিখেই চলছি
তবু আমাদের এই রচনার কোনো উপসংহার নেই!

সোহেল হাসান গালিব

দেখা

পিছন-ফিরে তাকালেই অতীতকে দেখতে পাবে
এমনটা আশা করো না। ক্রসফায়ার-যোজিত
নিশিভোরে,
শিশির ভাদুড়ীর নাট্যশালা থেকে বহুদূরে
হাত-কড়া খুলে দেয়া বন্দিটি যখন ফিরে তাকায়
ছুটতে ছুটতে, পালাবার পথ নেই বলে
কাদাজীর্ণ এক সোঁতায় ডুবতে ডুবতে,
তখন সে অতীতকে নয়, আতঙ্কিত এক
ভবিষ্যৎকেই
দ্যাখে।

কেবল কার্নিশের কাছ থেকে, ১২ তলা ভবনের
স্বপনচূড়ায়–
ওই একটি মানুষ অন্তত যদি একবার পিছন-ফিরে
তাকাতো
জীবনের অতল রসাতলে নামবার আগে,
নিশ্চিতই সে
দেখতে পেত তার ধসে যাওয়া ভুবনের
আসমুদ্রহিমাচল। দেখতে পেত হাঁসের ডানার
নিচে
পদ্ম ও পল্বল।

কিন্তু সে ফিরেও তাকালো না।

মিলটন রহমান

রায়

ঘুম নাকি জ্বর
নামছে অঝর
মগজে ঘাই মেরে
মজ্জার বাঁধ ছিঁড়ে
কে নেয় বসত তৃণে!
আমিও কঠিন ঘুণ
ছেড়েছি সব নুন
বিবশা রাতের ডাকে
মেঘের হাঁকডাকে
বসে আছি তাই
বিধাতার রায়!

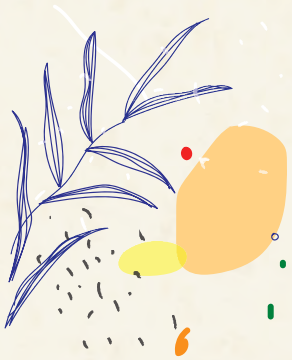

শুভাশিস সিনহা

অন্তরঙ্গ

যেতে যেতে তবু থমকে দাঁড়ানো বেলা
মেঘের অশ্রু মাটির হৃদয়ে ঝরে,
প্রহেলিকা এক আঁচলে ওড়ার খেলা
হাওয়া কানে কয়– মন যে কেমন করে!

মন কি এখনো আছে আমাদের মনে
উন্মুল শাখা কোথায় ফোটাবে ফুল,
ভাগ হয়ে আছি কত শত জনে জনে
আকাশে আকাশ তারকাখচিত ভুল।

যেতে যেতে তবু ভুল পদরেখা বেয়ে
ত্রস্ত কামিনী দেহব্যঞ্জনা আঁকে,
বুক চাপড়ায় কূলভাঙা আনমেয়ে
ঝাঁপ দিয়ে মরে দরিয়ার বাঁকে বাঁকে।

মরি আর বাঁচি কাছাকাছি কিবা দূর
একের অঙ্গে অন্যের অঙ্গার,
কণ্ঠে জ্বলছে কথাহারা কোন সুর
সঙ্গী চাইছে সঙ্গের সংহার।

তৌহিদুল ইসলাম

নবধারা জলে

মুখ ভারী করে উইড়া যাচ্ছে
সিরিয়াস এক মেঘের টুকরা
ক্লাসরুমে বসে বাচ্চা কাচ্চা
কবিতা পড়ছে বিষটি বিষটি

নীল নবঘনে রবীন্দ্রনাথ
সাদা দাড়ি মেলে দেখিয়া হাসচে
হাহাহা হিহিহি হাহাহিহিহি
হিহাহি হাহিহা হিহাহিহাহিহি

মহাখালী রেল পার হয়ে দূরে
তেজগাঁও আর কারান বাজার
বস্তির থেকে মাল কিনে নিয়ে
অপ্রমিত কবি চা-বিড়ি খাচ্ছে

লেভেল ক্রসিংয়ে সাইরেন বাজে
পুলিশের বাঁশি, ট্রেন আসে দূরে
কুকুকু ঝিকিকি কুকুঝিকিঝিকি
কুঝিকি কুঝিকি ঝিকুঝিকুকিকি

তখনো আসেনি ব্রেকিং নিউজে
উপকূলে কোন ঝড়ের খবর
ঢেউ উথলানো সমুদ্র এক
বেহুদা কেবলি মেঘ পাঠাচ্ছে

নতুন একটা দ্বীপ জেগে ওঠা
পাথরঘাটার কিনারে টিনারে
কেওরা গাছেরা ঘিরেছে বনের
হরিণেরা তার পাতা চিবাচ্ছে

মাথার ওপরে রোদ মেলে দিয়ে
বিষখালী নদী ট্রলারে কাঁপছে
ট্রাট্রাট্রালালালা ট্রাট্রা ট্রালালালা
ট্রালালা লালাট্রা ট্রাট্রা লালালাট্রা

মুখ ভারী করে উইড়া গেল গা
সিরিয়াস এক মেঘের টুকরা
ক্লাসরুমে তবু বাচ্চারা পড়ে
রঠাঠা ঠাঠাঠা ঠাঠা ঠাকুরণ!

পরাগ রিছিল

বালিঝুড়ি

সব সম্পর্কই কি বালিঝুড়ি নদী–
হারিয়ে যায় ঝুরঝুর জলের বানে?
ধসে পড়ে মাটি, পায়ে দাঁড়ানোর!
তবু কোথাও ঝোরা ছিল, উজানে
বইতো নির্জন একান্ত গোপনে...

দূরে কোথাও উল্কাপাত,
দেহটা জ্বালিয়ে পুড়ে যায় নক্ষত্র জ্যোতি।

সব সম্পর্কই কি বালিঝুড়ি নদী...।

কাজী নাসির মামুন

একটি সনেট

প্রতিটি সকাল যেন প্রসাধন। আমি মুঠো ভরে
দিয়েছি তোমায়। তবু সারারাত জেগে-থাকা পাখি
ডানায় লুকিয়ে রেখে পৃথিবীর সব মাখামাখি
উদভ্রান্ত অপচয় রুখে দিতে চাই। থরে থরে
সাজানো পাতায় প্লুত বেদনারা একা একা ঝরে।
পত্রল রাষ্ট্রের নীতিহীনতাই আমি লিখে রাখি।
সাজঘরে বসে বসে তুমি দেখো তুমুল বৈশাখী
ঝড়ের বাতাস। আমি মুক্তিকামী। দূরে গেছি সরে।

সিঁথির সঙ্গীত শুনে দূরগামী চুলের আশায়
চিরুনি থাকে না বসে। তার কাজ শোভন শৃঙ্খলা।
যতটা আঁচড় দিলে সমাজের প্রত্ন ছলাকলা
মনের আয়ত্তে আসে, চিরুনির মৌন ভূমিকায়
আমিও বিপ্লবী নাম– ততটাই লাঙলের ফলা।
তোমার পুঁজির প্রেম! অহেতুক এতো কথা বলা।

সাঈদ জুবেরী

সম্পর্ক

ওহ লুথার কিং, আমেরিকা ইজ এ লস্ট ড্রিম
অব হোয়াইট ওয়ার্ল্ড। খোঁড়াকে খোঁড়া
বলিও না, কানাকে কানা, কালোকে
কালো বলিও না, খাটোকে খাটো...

বলিয়া বলিয়া, শিখাইয়া শিখাইয়া
খোঁড়াকে খোঁড়া, কানাকে কানা,
কালোকে কালো, খাটোকে খাটো করিয়া
খবর করিতে করিতে... এই দুনিয়ার
মিডিয়ার পাদপ্রদীপেরই আলোর নিচেই
কালো মাইকেল জ্যাকসন অতঃপর সাদা
হইয়া মরিলো... প্রকাশ্যে!

আর, দাস ব্যবসা বিলুপ্তির পর বৈধ-অবৈধ
আদমপাচার ব্যবসায়ের সাথে সাথে শিশু ও
নারীচালান নিয়ে ভাবিত হতে হতে...
দেশে দেশে শরণার্থী শিবির গড়ে উঠছে...

তবে, আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের সঙ্গে
রিফিউজিদের সম্পর্ক ঠিক করতে রাজি হয়
নাই স্বর্গ হইতে বিতাড়িত মানবকুল, এখনো।
এদিকে, আমরা... বন্ধুত্বের নামেই
বাধ্যতামূলক, অগত্যা... হা হা...
কলোনিয়াল হ্যাঙওভার... ধারণার
আকাশ... তুলো মেঘের ফাঁকে নীল...
সৌজন্যতাবশত বা ভয় ও দ্বিধায়... আমরা
বরাবর আনএক্সপোরড রইয়া যামু... উপরন্তু,
যা শিখাইসে সিলেবাস, মুদ্রার দুই পিঠেই
কলম্বাস...।
অবিকশিত সম্পর্কের ভেতর হারাইয়া
এইখানে, এইভাবে... আমরাও
বিকাশরোহিত...। আর সোনাপাখি, ভগ্ন
রিদয়ে পড়শির খোঁজে গান
গাহিয়া, তোমায় মরমি অজুহাতে হাসিল
করিবার সান্ত্বনা লভিব... বা, চতুর কিংবা
আংশিক জীবনী লইয়া মরিয়া যাইব।

তানভীর মাহমুদ

কুহু ছাপ

শালের হৃদয়ে কথাগুলো অবারিত হোক।
না বলার গহীন থেকে থির জলে ছায়া ফেলছে
পত্রালীর আকাশ।
বনানীর বিপুলতায় শূন্যের গা ছুঁয়ে
নামে রোদের আলাপ– আর
লুকিয়ে যায় পাতার ঘ্রাণে।

কুহু ছাপে পেরুলে বহু বিজন–
অরণ্যের কথামালা থেকে
ফোটে তোমার আঙুল।
তরুর ত্বকে মিশে যেয়ে অধরা অলোক
থেকে থেকে হচ্ছে ভাস্বর, ভিজছে স্বনন
অধরার বুকে তোমাকে তাই
ডাকছে এই বন।

সরোজ মোস্তফা

আম্মা

আম্মা, পুকুর ঘাটের পাশে বড় ছায়াগাছ।
গ্রীষ্ম-বর্ষা, নিন্দা-রোদনের দিনগুলোতেও
আমলকী, হরীতকী হয়ে ছায়া মাখতে থাকেন।
রাষ্ট্র, বস, পরিহাস, পুলিশি চোখ কিংবা
শিমুল গাছের মাধুর্য– মায়ায় ঘুরে আসার পরও
রৌদ্র ও দহনে এই গাছ ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাবে না।

সবাই ভাববে তুমি ছাতা, চেকবই ও রুমাল চাইতে এসেছো।
অঘ্রাণের ধান কিংবা খইনের মাছের ভাগ চাইছো।

আম্মা, পুকুর পাড়ের বড় বেলগাছ।
পার্বণের আলপনা শেষ করে মুগডাল তিনিই রাঁধেন।

আলতাফ শাহনেওয়াজ

আমরা ভালো আছি

আজ রাতে আমি তুফান মেলের গতিতে কী আর বলব?
চলন্ত গাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে
রাস্তায় রাস্তায় যত লোক ছুটে যাচ্ছে
সব মুখে একটাই কথা, 'ভালো আছি, আপনি ভালো তো?'

কেউ কি আসলে উত্তরের অপেক্ষায় আছে?
উত্তরটা সবার জানাই–
ওই যে 'ভালো আছি'– মানুষের বলা ওইটুকু শব্দের মধ্যেই
দিনশেষে রক্তাক্ত কণিকাসুদ্ধ টলমল করে
দুচোখের দুফোঁটা অস্ফুট জল,
আর মুখ বুজে সয়ে যাওয়া সে জলের আয়নায়
গাছের পাতার আলো পড়েছিল, কিন্তু সেখানেই আমি দেখছিলাম
অন্ধকারের দীর্ঘ সারি 'হুকুম করুন মালিক'
নামে শাখায় শাখায় দুলে উঠছে;

কেউ কোনো কথা বলছে না
ফোনের পেছনে আঁড়ি পেতে আছে কেউ,
গাছগাছালির নিচে চাপা পড়া হোয়াটসঅ্যাপে সবাই
এটুকু বলতে পেরেই খুশি যে 'আমরা ভালো আছি...'

তারিক ঈমাম

হাসি ও করাত

দূরদূরান্তের আলোকবর্ষ থেকে তোমার হাল্কা হাল্কা আলো,
সাথে ঘ্রাণ– বুঝতে পারি আসে, বুঝতে পারি মর্তের
নয়। তবু মাতানো। তবু হাহাকার। যেমন বেহেস্তের ঘ্রাণ
পাওয়া যায় চল্লিশ বছর দূর থেকে সেই অপেক্ষায় আমি
থাকি এই নরকে, এই জাহান্নামে গড়াতে গড়াতে শুধু আশা
সেই ঘ্রাণ!

এই নরক যন্ত্রণার সাথে গড়িয়ে আসে তোমার হাসি, আহা,
কীভাবে ভুলে যাবো সেই হাসি, সেই নরক। আমি ভাবি,
এত কিছু মাথায় নিয়ে কীভাবে আমি থাকি, কীভাবে
তোমাকে ভুলি বা না ভুলি।

আফরোজা সোমা

হেমলক

এই মায়াবী রাতে
যখন হাওয়ারা আরো একটু এলিয়ে দেবে গা
যখন লতা, গুল্ম ও বৃক্ষের পাতাগুলো
আরো খানিক মন্থরে দুলবে
তখন সমস্ত সৌন্দর্য, ক্লেদ ও জখমকে সাথে নিয়ে
বসবো মুখোমুখি
সবাইকে দেবো ধন্যবাদ
সবাইকে দেবো মাফ করে
আর খুব পেলবতায়
নিজের মাথায় বুলিয়ে দেবো হাত।

তারপর 'মুখোমুখি বসিবার' থাকে শুধু হেমলক :
থাকে শুধু একটা জীবন
'আসি' বলে বিদায় নেবার।

রাজীব দত্ত

পোড়ামাটির গজল

১
মনোহরকে পাখি কামড়ালো
এত কামড়ালো
মনে হলো
দূরে গিয়ে নিভে যাচ্ছে বাতি

২
অন্য কেউ হলে ফিরে আসতো এতক্ষণে

৩
একটা ভাঙা হাঁসের দিকে তাকিয়ে আছে
আরেকটা হাঁস;
মাটিদের বিস্ময় নিয়ে

৪
চালতা ফুলের ফোটা দেখতে দেখতে
তুমি সাঁতার শিখলে

৫
ফুল বনের হাওয়া
কাঁচা কবরের দিকেও তো বইতে পারো

উম্মে রায়হানা

আজকে রাতে

একলা থাকার এই তো সময় আজকে রাতে
স্নান করে নে, তোর আর আমার শরীর মিলে
গান করে নে, আজকে রাতে

তোরেই শুধু দেখবো আমি আজকে রাতে
ভিডিও কলে কী আর করি! ঋতুমতী
শরীর জ্বলে

হাওয়ায় উড়ে তোর ছবি আজ
আমার চোখে আজকে রাতে
তোর নামে আজ খুব ঘুমোবো
আরাম করে

একলা থাকার একলা সময়
আজকে রাতে
তোর ছবিতে চোখ ভিজে যায়
একলা ঘরে

খুব অভিমান
ব্লক করেছি ইন্সটাগ্রামে
অন্ধ হয়ে কল্পনাতে
শরীর ঘামে

আজকে আমি একাই তোকে
দেখবো শুধু
বার্তা নেই আর
জানলা খালি
শুকনো ধু ধু

কতোই ছবি জমতে ছিলো
ফোনের ভাঁজে
দেখবো কখন! দিন পোহালো
কাজের মাঝে

এখন আমি একলা রাতে
দেখছি তোকে
তোর ছবিকে দেখবো আমি
প্রবল শোকে

তুই নেই তো কী হয়েছে
ডিভাইস জুড়ে
তোরই ছবি দেখছি আমি
একলা ঘরে

বিধান সাহা

উপেক্ষা

তোমারই উপেক্ষা তুমি তুলে নিলে কোলে!

এখানে দুপুর গড়িয়ে রাত নামছে
কুকুর ডাকছে
একটা পাতা উড়ে গেল তুমুল উদাসীনতায়
সন্ধ্যায় তোমাকে দেখেও এড়িয়ে গেছে একজন

এসব প্রসঙ্গ নয়;
রাত নামলে একটা হুহু বাতাস এফোঁড়-ওফোঁড়
করে দেয় আজও!

আমার ঘুম আসে না!

ইফতেখার ইনান

টোটেম

প্যানিক

করাতে বাজাও ভায়োলিন– কাটো
ফালি ফালি করে রাত,
সুরের শ্বাপদ ভর করা তার-ই
তোমার পুলসেরাত।

ডিপ্রেশন

নীরবের দেহে শব্দ খুঁজতে
ভিসেরা দেখছো খুলে,
লিখিয়াম ঢালো, লিখিয়াম জ্বালো–
আত্মামর্মমূলে।
খরাচৌচির ভূমির মতোন
সহস্র ভাগ হয়ে,
হাসির বিমাতা যে বিষাদ– রাখো
অশ্রুর আশ্রয়ে।

প্যারানোইয়া

তোমার শরীরে কুয়াশাশরীর
জেগে ওঠে ক্রমশ,
ডাকে শীত, জপ করে আধোস্বরে–
তমস তমস তমস

আসমা অধরা

নিদারুণ প্রেমে

অথবা, মুগ্ধতার মৃত্যু হয়নি বলে
ঘুমের ঘোরে তার নাম শোনেনি কেউ
যে অন্ধকার বাগানে দৈবাৎ কোন আওতা নেই
নেই কাগজের ভাঁজ, কালির ঔদার্য;
যথেষ্ট পুরুষ আয়না যেন এক!

এইসব দারুণ উদ্বেগে, প্রাক্তন হয়েছে বিকেল
এ তমসায়, বৈষ্ণব হলে বুঝি খঞ্জনও শৃঙ্গার,
ঊর্ণনাভ স্বেদ, যেন ধমনি ভেঙে গড়িয়ে যায়
প্রগাঢ় কোন শ্রম, তবু সে গুলজার।

গৌড় নাকি দ্রাবিড়ের এক অর্ধস্ফুট বুলি
ওগো ময়ূখ, তোমার কণ্ঠ গলে যাক আলোয়
পর্যাপ্ত পারদ মাখিয়ে দর্পণ গড়ে গেলেই
পাখনা জুড়ে নিয়ে উড়ে যাবে এক মেঘমগ্ন অঙ্গিরা।

সাহসের সহিস, নদীটির কী তবে মন খারাপ?

খান রুহুল রুবেল

ছাদখোলা বাড়ি

খোলা ছাদে বসে বন্ধুরা বলেছিল,
জীবনকে দেখে নেব।
কে যে বলেছিল কাকে, তখন উনিশশ অনেকে...

আজকাল খুব অ্যারোপ্লেন শুনি
রেডিয়োর মতো করে বাজে দূরের পাহাড়।
কারা যেন মাঝরাতে অন্ধকার
ফুঁড়ে এসে বলে, এত ভয় পেলে চলে? সিংহ
এসেছিল জানি।

পাশ ফিরে শুই। দূরে ফিসফাস। দূরে মহামারী।
ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে ছাদখোলা বাড়ি।

অমিত রেজা চৌধুরী

আয়নাবাজি

সোনার মাছি খুন হলো, সেই থেকে
এ অঞ্চলে সমুদ্রচোখ লোনা
প্রতিটি মুখ আজ ফণার অবশেষ
আয়না তুমি কার অবচেতনা?

আয়না তোমার জলের শ্রুতি বলো,
মাধ্বীরেখায় পাগল জেগে আছে?
অন্যজীবন ধন্যজীবন ক'রে
হৃদয় ফেলে হৃদয়হীনার কাছে

আয়না বাইরে জিভ দিয়ে কী চাটো?
প্রশ্নচিহ্নে শিল্পের অন্ধকার
গর্ভাশয়ের কী উগলে দাও আলোয়?
প্রশ্নচিহ্নে গলিত কারাগার
.
আয়না তোমার অন্ধত্ব কিসে?
প্রেম ফুরালে ইচ্ছে শুধু ছোঁয়ার
আয়না তোমার প্রজ্ঞাপারমিতায়
মুখোশজীবী রাষ্ট্রে বেহাত দুয়ার

আয়না তোমায় ন্যাংটো করল কারা?
খায় যারা লাল আংরা ভাত না পেয়ে
আয়না তোমার জ্যান্ত ভালুক ডাকো,
শূন্য শ্মশান যেমন ঘুমায় দেহে
.
আয়নাবদ্ধ সময় ফুলের অতীত,
কুড়াচ্ছে ব্লেড অপহৃতা রুমি
আয়না তোমার অভিসারিকা কে?
– সাথীহারা রাত্রিমরুভূমি

আয়না তোমার কে মুছবে রৌরব?
– বন্যহাতির জোছনাসঙ্গম
মনে রেখো, লুসিড ড্রিমের সীমায়
পাক খাওয়া চিল বারুদের সংযম

বিজয় আহমেদ

বসন্ত

শিকারি ষাঁড়ের কুঁজে সূর্য বেঁধে রেখে খুঁজি–
কে গো?
তুমি বিহঙ্গের স্তনে কুহু কুহু ডাক;
উড়াও বাতাস ধুলা-ঝড় শিঙ্গা ফুঁকে
যেনবা বসন্ত-গেরিলার কাঁধ রে হারমোনিয়াম
প্রেম খুঁজে পায়

দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম

নিত্য যে সন্ধ্যা

সমস্ত সন্ধ্যাটা অঞ্জন দত্তের গান হয়ে আছে। হিম ছুরির নিচে বিক্ষত গোলাপ পাপড়ি, তার শরীরে ফুঁ দিতেই ব্যথা হয়ে বাজছে অতীত। আমাদের মিথ্যে নাগরিক জীবনের থেকে স্পষ্ট দূরত্বে কুচকাওয়াজ তুলছে নিজ নিজ শৈশব। এটুকুই। তার বাইরে একলাবোধ সত্যি, মৃদু হাওয়ায় টলে ওঠা পড়শি নারিকেলপাতা যে কোরাস মেলাতে চাইছে, তারও আছে ভিন্ন শিল্পকলা। তারও আছে ভিন্নতর যোগাযোগ, ঈশ্বরের উঠোনবাড়ির গর্ত খুঁড়ে বেরোয় যে চাঁদ তারই আলোর নিচে উড়ে আসে ঝাঁকেঝাঁক চিঠি। আমাদের কিছুই নেই। ব্যালকনিতে অনিবার্য অন্ধকার, সাঁজোয়া মিছিল হয়ে ঢুকে যাপিত জীবনের ব্যর্থতাগুলো। আর বিরহ, মধ্যরাতের দিকে দৌড়ে যায় প্রতিচ্ছবির কঙ্কাল।

নওশাদ জামিল

নীল শাড়ি

যেখান থেকে যাত্রা শুরু করি
আবার আমি সেখানে আসি ফিরে
অনেক পথ পেরিয়ে এসে দেখি
ফেরার পথে কুহক আছে ঘিরে।

পাহাড় নদী পেরিয়ে মেঠোপথ
এসেছি ফিরে হৃদয় আহ্লাদে
অন্ধ ফুলে পরাগ ঢেলে দিয়ে
আবেগ ছাড়া কে আর পড়ে ফাঁদে?

পথের বাঁকে বাতাস ছেঁড়া মেঘ
উড়ল বুঝি আগুন হাতছানি
ধোঁয়ার রেখা মাড়িয়ে বহুদূর
পেলাম দেখা পরম ঝলকানি।

হৃদয় টানে আবার আসি ফিরে
ফেরার পথে কুহক ছড়াছড়ি
কুয়াশাজাল ছিন্ন করে দেখি
পথের বাঁকে উড়ছে নীল শাড়ি।

স্নিগ্ধা বাউল

কালবৈশাখী

জীবন এক বেদনার অসম্ভব নাম
সহস্র বনবীথিকা আমায় ছুঁয়ে যায়
কালবৈশাখীর নামে
অনবরত ঝড় বৃষ্টি মেপে
জীবন বজ্রপাতের মুখে দাঁড়িয়ে
গুনছে পরমায়ু,
অনবরত বাতাসে দুলছে মানিপ্ল্যান্ট
আসছে সঙ্গমে খুঁজে নেবে পরমায়ু
জীবন এক অসম্ভব বেদনা
অসম্ভব বেদনার পরিপুষ্ট বীজ
ভ্রূণ লালন করে দেওয়া জীবন
আমারে ফিরায়ে দেও আমারে।

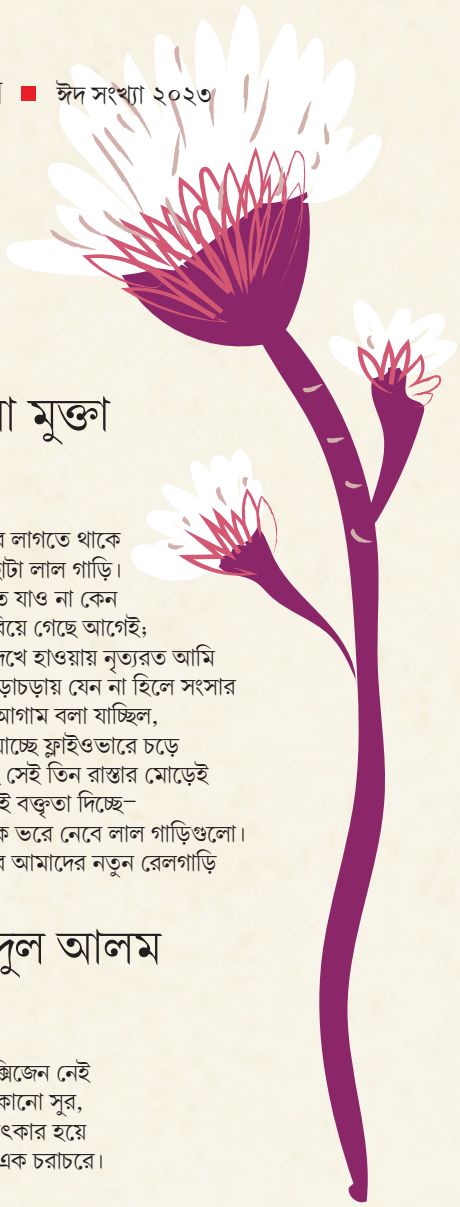

রওশন আরা মুক্তা

মহিষপনা

রাত যত গভীর হয় ভার লাগতে থাকে
ফ্লাইওভারে শাঁইশাঁই ছোটা লাল গাড়ি।
যদিও মধ্যরাতে যত দ্রুত যাও না কেন
বাড়ি ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে আগেই;
ভরদুপুরে মহিষটিকে দেখে হাওয়ায় নৃত্যরত আমি
প্রণাম করি, প্রাণীটির নড়াচড়ায় যেন না হিলে সংসার
যদিও আগের মেয়াদে আগাম বলা যাচ্ছিল,
এসব লাল গাড়িরা যে যাচ্ছে ফ্লাইওভারে চড়ে
রাস্তাগুলো তো মিশেছে সেই তিন রাস্তার মোড়েই
গুরু-গম্ভীর মহিষ পাশেই বক্তৃতা দিচ্ছে–
এসব শব্দেই আজ ট্যাংক ভরে নেবে লাল গাড়িগুলো।
বাড়তি বাক্যে চলে যাবে আমাদের নতুন রেলগাড়ি

রুবেল সাইদুল আলম

শূন্য শহর

আজ শহরে কোনো অক্সিজেন নেই
সুরের যন্ত্রে উঠছে না কোনো সুর,
সমস্ত কোলাহল যেন চিৎকার হয়ে
আছড়ে পড়ছে কোনো এক চরাচরে।

নগরের চাঁদটাও কেমন ফ্যাকাশে লাগছে
চা বিক্রি করা ছেলেটা আনমনে বসে আছে,
তার চায়ের কাপ থেকে উঠছে না কোনো অস্বচ্ছ ধোঁয়া
ঝালমুড়ির দোকানে নেই কোনো খরিদ্দার।

আমি শূন্য হৃদয় খড় নিয়ে বসে আছি
কার ভাবনায়, কোন অপেক্ষায় জানি না।
শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে
কার যেন বিবাগী ডাক শুনছি।

আজ শহরটা খুব অপরিচিত লাগছে জানো।
তুমিহীনা কেমন যেন অচেনা, মায়াহীন।
কেমন যেন এক বিবর্ণতা, পাতাঝরা শুকনো উদ্যানের মতো।

আমি বসে বসে করছি হৃদয়ের ব্যবচ্ছেদ।
আমি চাঁদ চাই না, জ্যোৎস্না চাই না
আমি চাই কেউ থাকুক এই শহরে।
একই শহরের বাতাস নিচ্ছি বুক ভরা শ্বাস নিয়ে,
এইতো স্বস্তি।
বিনোদিনী, তুমি ভালো থেকো।

তানিম কবির

সারাদিনজুড়ে

এখন এমন হবে ঝরাপাতা ঘুরতে থাকবে পায়ে
দাঁড়িয়ে লিখবে চিঠি মরা বাঁশঝাড়
বিরতি নেবেন কবি মাত্রাবৃত্তে কাব্য রচনা থেকে
আলস্যে মৌসুমি স্নায়ু টেনে নেবে দীর্ঘসূত্রতাকে
বলবে দুয়েক কথা বলে-কয়ে নিজেই নিজেকে
হারিয়ে হারানো সব স্মরণে আনিয়ে নেবে লোকে
চারদিক ঝিমমারা ঔৎসুকতার
কেন্দ্রের হবে অভিমুখী
সারাদিন মনে হবে, সব কি হারাতে পেরেছি কি?

রাজীব আশরাফ

বিষবাক্য

আজ বাতাসে মিলায় শুধুই হাহাকার
আজ আকাশে মিলায় সমগ্র ইচ্ছারা
আজ জীবন এখানে বুক পোড়া ছারখার
আজ হাতেও কিছু নেই শুধু বিষ ছাড়া

আজ সন্ধ্যা নামে কিন্তু তখন মেলার শেষ
আজ মগজ বিভোর বিস্মরণের নেশায় চুর
আজ চোখ বন্ধ এবং আমার খেলার শেষ
আজ কানে বাজে আঁতুড়ঘরের বিষণ্ন সুর

আজ স্বীয় হাতে বিস্মিত বোধ বিষ ধরে
আজ আঁতুড় দিকেই যাচ্ছে কেনো সময়
আজ জীবন শুষ্ক কাঠ ও খড়ে অনাদরে
আজ এক জীবনের পুড়ে যাওয়ার ভয়

আজ আমি কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক
আজ আমি নিছক তোমার ঘরে শূন্যস্বর
আজ নেমে গেছে খাদের দিকে সব তর্ক
আজ ঘর মানেই সংবেদসহ শ্বেত মর্মর

আজ বিষ হাতে এই জীবন ভীষণ হতচ্ছাড়া
আজ কি বিশ্বাসে নিচ্ছি শুধুই বিষ শ্বাসে
আজ বিষবৃক্ষের পাতাও সকল ছন্নছাড়া
আজ ঘটবে পতন যবনিকার অনভ্যাসে

আজ নাইবা ঘটুক অন্যকিছু এইটা ছাড়া
আজ বেরিয়ে আসুক অন্তঃপুরের আত্মপীড়ন
আজ শূন্যতাকে ভালোবেসে দিবোই সাড়া
আজ আমি একটা অগ্নিসম উদ্‌গিরণ

সিফাত বিনতে ওয়াহিদ

সেই ছেলেটা

“এমন বৃষ্টির দিনে দু পাশে ডুবে যাচ্ছে ভাঙা সিঁড়ি। আপনি কি আসবেন না? ব্যস্ত নাকি ভারি?”– কিছুটা সংকোচেই ছেলেটা সুর তুলে গান গাইছিল। গত রাতের জ্বরবেগ কিছুতেই নামছিল না মাথা থেকে। কণ্ঠে তার তুমুল সন্দেহ– “আছেন? কই বলছেন না যে কিছুই? এমন কেন লাগে? মনে হয় শোকসভার আয়োজন চলছে শহরজুড়ে। আপনি তো প্রেমিকা। শুধু আনন্দই খোঁজেন সবখানে।”
বাতাস ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। বৃষ্টির বাঁকানো ছুরিকা কপাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেমে যায় নিচে। মনে হয় সমস্ত শিডিউল বিপর্যয় ঘটুক মাঝপথে। বিনা বজ্রপাতে কাদাভরা রাস্তা মাড়িয়ে এমন আমন্ত্রণের গন্তব্যে ছুটে চলি লোভাতুর চোখে। এমন সময়, বুকের ভেতর বোকাপতঙ্গ নড়েচড়ে ওঠে। পাহাড়ভাঙা ধস কানে শীৎকার তোলে প্রবল আর্তনাদে। পৃথিবীর সমস্ত প্রবাহিত জলে ডুবে যায় একেকটা আশ্চর্য বিকেল।
আরো একবার ডাক আসে– “এই যে! শুনছেন? আপনার নগ্ন পায়ে ধৈর্যরা দেবদারু পাতা হয়ে পড়ে আছে। দুয়ার এঁটে বসে থাকি, এমন উজবুক কেউ হয়েছে নাকি আগে?”
মগবাজার চৌরাস্তা পেরোতেই দৃষ্টি চলে যায় পিয়াসীতে। মধ্যমার চূড়া থেকে এক ঝটকায় ফিরে এসে গুটি গুটি হাতে উত্তর লিখতে থাকি– আমার বাঁকে বাঁকে আসে নদী, আসে মরুভূমি! অ্যাঁই ছেলে! আসো, তোমাকে নিয়ে আরো কিছু কবিতা লিখি!

হাসনাত শোয়েব

পাশ ফিরে শুয়ে...

পাশ ফিরে শুয়ে আছ। তোমার পিঠজুড়ে কেউ করছে আঁকিবুঁকি। একটি হলুদ দুপুর, গাঢ় আফিমের রঙ, আর সূর্যাস্তগামী মাছ। একদিন কেউ তুলে নিয়ে গেল দুপুর। নিঃসঙ্গ পিঠ দুপুরের অপেক্ষাতেই পার দিল একের পর এক মাংসল সূর্যাস্ত। খালি পিঠ ভরে গেল সস্তা কোলার ক্যান আর পরিত্যক্ত আফিমে। ছোট ছোট করে কেটে রাখা নখও কেউ ফেলে রেখে গেছ। কেউ রেখে গেছ বিটলসের নরওয়েজিয়ান উড। তবু পাশ ফিরলে না তুমি। দুপুরের অপেক্ষাতেই কেটে গেল জোড়া শীতকাল। রাত গেল, সকাল এলো, ফিরল না শুধু আফিমের রঙে দুলতে থাকা মাতাল দুপুর।

রিমঝিম আহমেদ

অভয়মিত্র ঘাট

বৃষ্টি এলো। কাগজের নৌকা পানিতে ভাসাই
বেশিদূর যায় না, ভিজে সপসপ করে
মোল্লার দুয়ার মসজিদ পর্যন্তই
বড়জোর অভয়মিত্র ঘাট
এর বেশি হলে এপার-ওপার, ঘাটের পরে বাজার

পানি দেখি, দাগা খাওয়া মানুষের মুখ–
বিদেশি জাহাজ, গানভোলা মাঝি আর অন্ধকার
প্রগাঢ় সন্ধ্যার
নদীর পানিতে বাঁকাচোরা আলোর আকার...

দেখি, নিজের ভেতর ঘাই মারা কই
যেমন ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসে ট্রলার
তুমি তার মাথানত ছই

সালেহীন শিপ্রা

আমার শহরে এসে ফিরে যায় মেঘ

বইয়ের দোকানে কাচ, ধুলো পড়ে তায়
কী প্রেমে লিখেছি নাম আঙুল ডগায়।
সস্তা চায়ের টং দোকানের ভিড়
পাশ ঘেঁষে ছায়া পড়ে মোটর গাড়ির।
আমার শহরে এসে ফিরে যায় মেঘ
আমি নেই মিশে আছে ধূসর আবেগ।

কাঁঠালচাঁপার ডাল, মাধবীর ঝোপ
নীরব ফুলার রোডে স্মৃতি ছোপ ছোপ
একলা ফিঙের পাশে ফিঙেই উড়ুক
হুডতোলা রিকশায় যুগল ঘুরুক।
রোদ ও ছায়ায় ভাসে বাতাসের বেগ
আমার শহরে এসে ফিরে গেলো মেঘ।
আমার শহরে এসে ফিরে যায় মেঘ
আমি নেই পড়ে আছে আমার আবেগ।

কাঁটাবন সিগন্যালে কবিতার মন
সমুদ্র ডেকে আনে যখন তখন।
কফিশপে অপেক্ষা, জ্যামে আর ঘামে
রাত্রি ঘনিয়ে আসে কারো ডাকনামে!
চেয়েছি একলা তারা, পেয়েছি আরেক
আমার শহরে এসে ফিরে গেলো মেঘ।
আমার শহরে এসে ফিরে যায় মেঘ

আমি নেই পড়ে আছে আমার আবেগ।

নাজমুস সাকিব রহমান

আতর

আমাদের ভাড়া বাসার বারান্দা থেকে
তোমার রুম দেখা যায়। দোতলা একটা
বাড়ির পেছনের রুম। তোমার জানালায়
পর্দা ফিরোজা– গ্রিলের দুপাশে আমগাছ
বিষণ্ন; ভেতর থেকে তাকালে আমাকে
দেখা যায়।
আমার জন্যই তুমি নির্লজ্জ হও। জানালার
পর্দা টেনে দাও। জামা বদলাবার আগে
বাতি নেভাও। নিজেকে গোপন করে
তোলো। দূর থেকে আমি তোমার বড়
হওয়া দেখি। কিন্তু তোমার বড় বোনকে
দেখি না। তাকে কি বাড়ির সামনে দেখা
যায়?
তোমাদের বাড়ির সামনেই তো মহল্লার
পুকুর। আমাদের ছাদে উঠলে দেখা
যায়। তোমার বড় বোনকে জিজ্ঞেস
করো, সে কি কারো কাছে সাঁতার
শিখতে চায়?

নাদিয়া জান্নাত

চিরকালীন

যত অভিমান ভরা কলতান
গাবে তারা আজ সারা দিনমান
জয় জয়গান কাকে পায়ে ঠেলে
হেঁটে আসা পথ আর নিচু জলে
তাকে বুঝি মনে পড়ে, জ্বর এলে?

আলুথালু শরবনে, হলো দেখা
বধূদের নোলকের রূপরেখা
যথাতথা শোলকের দিন কই
হাত দিয়ে টেনে ধরা সরু মই
উজানের দিকে তাই চলি একা

দেখাহীন দিনগুলো বড় ফাঁকা
শ্মশানের ঢালু দিকে পোড়া চিতা
একা থাকা বটগাছে ছায়া কার
থোকা থোকা ফুলতোলা জামা যার!
বেঁচে থাকা অকারণে শেষ হলো

চৈত্রের দাবদাহে এলোমেলো
ধানক্ষেতে দেখা গেল কালো ছাই
মনে আছে, তবু চোখে দেখা নাই
দেহতরী হোক তার সুশীতল
পাখিদের ঠোঁটে রাঙা বটফল

ফরহাদ নাইয়া

হৃদমাতা

প্রেমে আমার আঙুলে কেটে গেছে
এখন
ঠোঁট দিয়ে ধরি সব।
তোমার কলরব
পানি পানি
কিছুটা সাঁতার আমি জানি
তবু ভয় পাই
যদি ডুবে যাই
তোমার কথার ভিতর
রাখা ঈদুল ফিতর
সেখানে
লোকেরা সেমাই খায়
যায় নানাবাড়ি।
কেন তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যা হও।
আমি তো বারবার রোজা ভাঙি
তোমাকে দেখি
ওগো কুসুম–
এইসব রোজার ভিতর
তোমাকে দেখাই
আমার ঈদুল ফিতর।

ফারজানা হায়দার চৌধুরী

অন্তর শূন্যতার হাহাকারে

ভীরু অভিপ্রায় মননের সঞ্চয়
আবেগে ঢেলে দেব নতুন শ্লোকের মতন
ধ্রুপদি সুর প্রজাপতির পাখনার রঙে মিলে
ভেসে যাবে বহুদূর চুম্বক আকর্ষণে
কেন্দ্রের লোহার দিকে ধাবিত ম্যাজিক যেন!

সময় গড়ায় এন্তার প্রজন্মের শাখা বেয়ে বেয়ে
তবু সব রয়ে যায় গহিনে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরে–
জলের নিঝুম অন্তরে

এই অন্তর শূন্যতার হাহাকারে আজও খুঁজে জুঝে মরে
বিপর্যস্ত হৃদয়ের বালুচরে জমে থাকা
সামান্য পলির আবরণ ভেদ করে
অঙ্কুরোদগম দেখবার প্রতীক্ষায়...

প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিপর্যস্ত বিভ্রান্তির চরাচরে
প্রেম কি রঙের বাহারে চোখে ধরা পড়ে?
প্রজাপতির মোহ শুধু দুর্ভাবনায়
বারংবার পথ হারায়!

অনুভব আহমেদ

বিষাদাগার

যে বেদনা তোমারে মানুষ দিতে পারে তার কাছে নত হয়ে
তুমি গাছ হবার কথা ভাবো। যে আঘাত তোমারে মানুষ দিতে
পারে তার কাছে নত হয়ে তুমি নদী হবার কথা ভাবো। যে ক্ষত
তোমারে মানুষ দিতে পারে তার কাছে বিদুর হয়ে তুমি পাখি
হবার কথা ভাবো। যে কপর্দকশূন্যতা মানুষ তোমারে দিতে
পারে তার কাছে নিচু হয়ে তুমি অন্য জীবনের কথা ভাবো।

আর এক জীবন পরে তুমি দেখো উদ্যানে ঝুঁকে আছে নিরাভরণ
পাতাদের শুষ্ক, মর্মর দেহ। নদীর বুকে কাঁপছে অজস্র দস্যু
নৌকা। তীরে জনপদের বারোয়ারি যাপন।

মাসুম মুনাওয়ার

আয়শা

বাসা থেকে বেরুতেই দেখি আয়শা
গলির নিয়ন আলোয় চিপচিপে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে মেয়ে
তারে দেইখ্যা চুপিসারে নিজেরে লুইকবার লাইগ্যা ব্যস্ত হইয়্যা পড়ি
আয়শা আমার পুরাতন প্রেমিকা
নিজেরে পকেটে নিয়া ধীরে আয়শার দিকেই হাঁটতে থাকি
আয়শা আমারে দেখতে পায় না
আমি আরো নিকটে পৌঁছে যাই
আয়শা পিছন ফিরে তাকায়
আমারে দেখতে পায় না
দুইজনে হাঁটছি পাশাপাশি
আয়শা আমার পুরাতন প্রেমিকা
তারে কথা দিয়েছিলাম জীবনের
রাখতে পারিনি সেই আলাপ।

আয়শা শেষ হতে না হতেই আমাকে ডুবাতে বসে খাদিজা
খাদিজা আমার বউ
আমি আয়শাকে ভালোবাসি
খাদিজারেও
খাদিজা জানে না আয়শা নামে কেউ ছিলো আমার জীবনে
আমি চিরকুমারের মতো খাদিজার নিকট হাজির হই
আমার মনে থেকে যায় আয়শার ছায়া
শাপলা তুলতে তুলতে আয়শা ঢুকেছিলো মাথায়
নামাতে পারিনি আর
আয়শা আমার পুরাতন প্রেমিকা
খাদিজারে শরীরের কোনায় চুপায়ে রাইখ্যা আমি হাঁটি আয়শার দিকে
আয়শা জানে না আমিও আছি তার পাশে
হাঁটছি তাকেই অনুসরণ করে
কদমে কদম রেখে।

শালুক তোলা আয়শা আমার
পুরাতন প্রেমিকা আমার
ইলিশের নরম কাটার মতোই বিঁধে আছে আয়শা
আয়শা পুরাতন প্রেমিকা আমার।

সাজ্জাদ হোসেন

কবিতার ওমলেট, ঘাম, গোসল

বেশি করে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, টমেটো
কুচি আর পরিমিত লবণ দিয়ে গতরাতে একটা কবিতার
ওমলেট বানাতে চেয়েছিলাম।
এর আগেও বেশ অনেকবার কবিতার ওমলেট খেয়েছি।
প্রতিবারই অভূতপূর্ব, অবর্ণনীয় লাগে তার স্বাদ।
নিয়মমাফিক গতরাতেও একটা বাটিতে কবিতার খোসা ভেঙে
তার কুসুম আর সাদা অংশ দিয়ে
সেটাকে অনেকক্ষণ চামচ দিয়ে বিট করেছি।
একে একে তাতে ঢেলে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি,
কাঁচা মরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি
আর লবণের নির্যাস। এরপর আবারও
মিনিট দুয়েক বিট করেছি।
কড়াইয়ে পর্যাপ্ত তেল গরম করে তাতে ছেড়ে দিলাম
কবিতার মিশ্রণ।
এখানেই বিপত্তির শুরু। না, কবিতার ওমলেট হচ্ছে না।
আমিও নাছোড়।
আগুনের আঁচ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে
ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম কড়াই।
না, ফায়দা হলো না কিছুই।
ওমলেট হওয়ার নামগন্ধও নেই।
ঢাকনা সরিয়ে খুন্তি দিয়ে যেই না মিশ্রণ
নাড়তে গেলাম, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মতো
কড়াইয়ের তেলেই প্রকটিত হলো
কবিতার অবয়ব।
চোখের সামনেই আলাদা হয়ে গেল
পেঁয়াজ, মরিচ, ধনেপাতা, টমেটো আর লবণের নির্যাস।
পাশে ভেঙে রাখা খোসাটা যুক্ত হলো কবিতার মুখমণ্ডল,
হাত, পা, ধড়, মস্তকে।
আপনাআপনি নিভে গেল চুলার আগুন।
আমি তো দরদর ঘর্মাক্ত, শিরদাঁড়া ঠকঠক।
রক্তনালি হিমহিম, চোখের পাতা হিমশিম।

মুহূর্তে কর্ণ কুহরে গগনবিদারী নাদ.....
“শোনো হে বৎস কবিয়াল, বহু যুগ, বহুকাল,
খেয়েছ আমাকে তুমি, খেয়েছ আমার কঙ্কাল।
আমাকে করেছো ইচ্ছার দাস, পদানত পদলেহি,
বোঝোনি তুমি সময়ে আমিই হবো যে এমন দেহি।
এবার তুমি শুধবে মাশুল গুনে গুনে ততদিন,
আমার খায়েশ, আমার ক্ষুধা মিটবে না যতদিন।
অনুগত তুমি থাকবে আমার শব্দ বাক্য পদে,
দেখব তোমার ‘জো হুকুম রূপ’ মত্ত হয়ে মদে।
আমিই তোমায় দেব নব জ্ঞান, যদি না আমায় বোঝো,
তুমিই হবে ওমলেট আমার, কড়াইটা তবে খোঁজো।”

নাদ থেমে গেলে সংবিৎ ফিরে পেলাম।
যাহ্ শালা, বেঁচে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া।
এতোক্ষণ তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম!
শরীর ঘেমে গেছে, অন্তত গোসলটা করে আসি।

জাতীয় বীমা দিবসে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডকে বীমা দাবী পরিশোধে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা স্মারক প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন। অনুষ্ঠানে বীমা দাবী পরিশোধে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বি এম ইউসুফ আলী কে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ঈদ সংখ্যা ২০২৩ ■ দেশ রূপান্তর

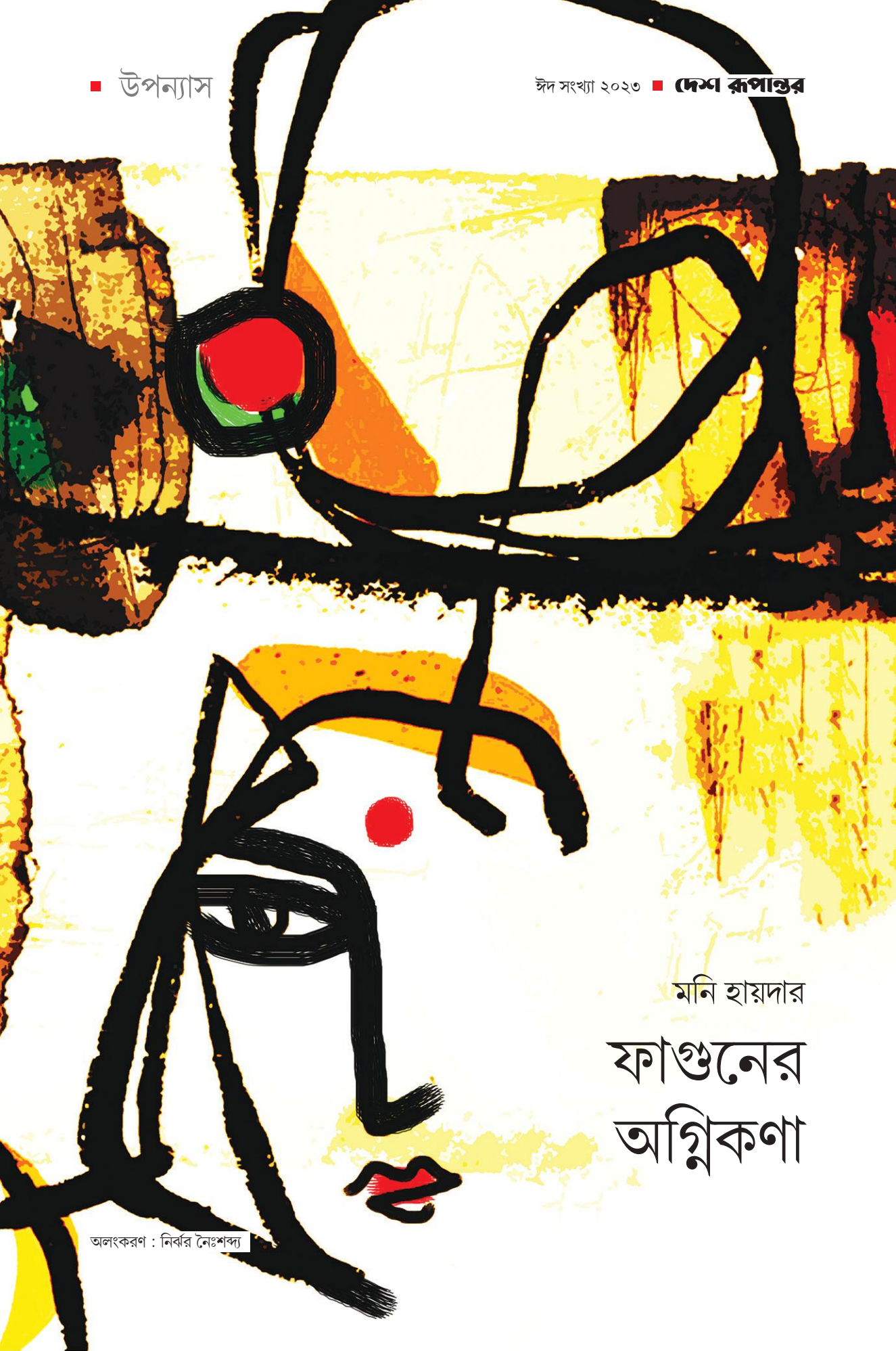

মনি হায়দার

ফাগুনের অগ্নিকণা

অলংকরণ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

তুমি কি সংসারটা রক্ষা করতে চাও? দেখো কী ফুটফুটে বাচ্চা আমাদের। খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তুমি আন্দোলন থেকে সরে আসো! অনুনয় করেন আবদুল মান্নাফ স্ত্রী মমতাজ বেগমকে, জেলের গেটে দাঁড়িয়ে।

মমতাজ বেগম মিনু দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সামনে সামান্য স্পেসের পর নিরেট দেয়াল দাঁড়িয়ে। দেয়ালের ওপারে কী আছে, দেখা যায় না। দেখা যাবারও সুযোগ নেই। জেলে বন্দি অনেকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে প্রিয়জন। মোটা লোহার জ্যাকেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ভেদ করে চক্ষুর সকল আলো একত্র করে একে অপরকে দেখছে, আলাপ করছে। জেল গেটের পরিসর খুব বড় নয়। ছোট খুকু বাবার হাত ধরে জেলের গেটে এসেছে মাকে দেখতে। চার বছরের খুকু বুঝতে পারছে না মা জেলের বন্দি। মা ও বাবার আলাপের মধ্যে ছোট খুকু হাঁটছে, আর বিচিত্র লোকজনের আসা যাওয়া দেখছে। খুকু মুখে আঙুল দিয়ে অবাক চোখে দেখছে পুলিশদের। দেয়াল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মমতাজ বেগম মিনু চোখ রাখেন সামনে স্বামী মান্নাফের দিকে। তিনি চোখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের অন্ধকার, থেঁতলানো নিকষ অন্ধকার।

তুমি উত্তর দিচ্ছো না কেন মিনু? আবদুল মান্নাফের কণ্ঠে এক ধরনের বিতৃষ্ণা।

কী উত্তর দেব? অনেক দূরের কণ্ঠ মিনুর।

তুমি সংসারটা বাঁচাও। মেয়েটির ভবিষ্যৎ, তোমার আমার সংসারের চেয়ে তোমার আন্দোলন কি বড় হয়ে গেল? কী হবে এই আন্দোলন করে?

মান্নাফ! আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। মনে হয় তুমি অনেক দূরের কেউ– কেন এমন হচ্ছে?

মিনু, ধোঁয়াশা কথাবার্তা বাদ দাও। জীবন অনেক কঠিন, তুমি সেটা ভালোভাবেই বোঝো। সরকার আমাকে অনেক চাপ দিচ্ছে। এমনকিআমার চাকরি চলে যেতে পারে, শেষের দিকে আবদুল মান্নাফের গলা অনেকটা লোহার মতো কঠিন হয়ে যায়।

শোনো, মানুষ সারা জীবন পাশাপাশি থাকার পরও যে অচেনা হয়ে যায়, তার প্রমাণ তুমি আর আমি। তুমিও আমাকে চিনতে পারোনি, আমিও পারিনি তোমাকে। এটা স্বাভাবিক।

কী বলছ এসব? অসহিষ্ণু আবদুল মান্নাফ। কেন চিনতে পারব না আমরা একে অপরকে? ওইসব ধোঁয়াশা চিন্তা বাদ দিয়ে চলো, আগের জীবনে ফিরে যাই। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাও। জেলজীবন কি ভালো জীবন? লোকে কত কী বলে, তুমি শুনতে পাও না। সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে জানিয়েছে, তুমি যদি আন্দোলন বাদ দাও, চাকরি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। চাইলে তোমাকে আমাকে বড় চাকরি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবে। গরাদের ওপর রাখা মমতাজের হাতের ওপর হাত রাখেন আবদুল মান্নাফ, তুমি আন্দোলন থেকে ফিরে আসো। সংসারটা বাঁচাও। শেষের দিকে মিনতি আবদুল মান্নাফের গলায়।

তুমি দেখো একটা সংসার, আমি দেখি হাজার হাজার, লাখো লাখো সংসার– তোমার আমার মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই মান্নাফ, মমতাজ বেগম মিনু নির্মল গলায় বলেন।

মানে তুমি আন্দোলন থেকে সরবে না?

খুকু খেলতে খেলতে মায়ের সামনে, লোহার গরাদের এপারে দাঁড়ায়। মমতাজ বেগম মিনু হাত রাখেন কন্যার মাথায়, চোখ রাখেন সামনে দাঁড়ানো প্রেমিক স্বামী, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা আবদুল মান্নাফের চোখের ওপর, না, সরব না। ভাষার জন্য আন্দোলন আমি চালিয়ে যাব। আমার সঙ্গে জেলে আমার মর্গান স্কুলের সাতজন ছাত্রী আছে, একই গাড়িতে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে, আমি ওদের কাছে ভাষার মা, আমি ওদের পথে রেখে সরে যেতে পারি না।

পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের আবদুল মান্নাফ সামনে দাঁড়ানো নিজের স্ত্রী, কিন্তু এই মুহূর্তের নারী মমতাজ বেগমকে একেবারেই চিনতে পারছেন না। তিনি জানেন, মমতাজ বেগম মিনু এই অঞ্চলের নারী বা মেয়েদের মনোবৈকল্যের বাইরে, নিজস্ব চৈতন্যর তুখোড় সাহসী মানুষ। কিন্তু মেয়ে মানুষ তো, সরকারের প্রলোভন দেখালে, হয়তো আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসতে পারেন। কৌশল হিসেবে বাসা থেকে মেয়ে খুকুকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। মায়ের চিরকালীন নরম মন সন্তানের প্রতি। আর খুকুকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে মমতাজ। নিশ্চয়ই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দোলনের রাস্তা থেকে মরে আসতে পারেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো।

মমতা! কৌশল পাল্টালেন আবদুল মান্নাফ, খুব নরম গলায় আবেদন রাখেন স্ত্রীর কাছে, আমাদের প্রেম, সংসার, খুকুর বেড়ে ওঠা সবই তোমার হাতে– একটু বিবেচনায় নাও। কোথায় যাবে নিরপরাধ মেয়েটি? তুমি যদি সংসারে না থাকো কে লালনপালন পড়াশোনার দায় নেবে?

কেন তুমি নেবে? জগতে কত মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে আঁতুরঘরেই মারা যায়। আমাদের খুকুতো বড়, চার বছর চলছে ওর। নিজেই মেয়ে অনেক কাজ করতে পারে।

তা পারে, জানো বাসার মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার জিজ্ঞেস করে, বাবা মা কই? আমি বলি তুমি বেড়াতে গেছো। এভাবে মেয়েটাকে কত বুঝাব? ওর শৈশব, জীবন তোমার হাতে মিনু...। আবেগে গলা ধরে আসে আবদুল মান্নাফের, আমাদের ভালোবাসার প্রথম সন্তান অনাদরে বেড়ে উঠবে?

বিচলিত হন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান কল্যাণী রায় চৌধুরী বা মমতাজ বেগম মিনু ঢাকার লালবাগের জেলের গেটে দাঁড়িয়ে নিজের আত্মজার ভবিষ্যৎ ভেবে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তিনি দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার লাখ লাখ সংসারের একজন। ফিরে আসেন নিজস্ব দরজায়। মুখে মৃদু হাসি ফোটে, আজ আমার কন্যা কষ্ট পেলেও পেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে মা কাছে না থাকলে সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আমার অবর্তমানে খুকুর খুব সমস্যা হবে, আমি নিশ্চিত। কিন্তু খুকু, আমার গর্ভের ও গর্বের কন্যা যখন বড় হবে, জানবে মা দেশের লাখো কোটি মানুষের মুখের ভাষার জন্য লড়াই করেছে, জেল খেটেছে, তখন নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবে। বলবে, আমার মা আর পাঁচজন মায়ের মতো ভাষার জন্য আন্দোলনে নেমে ঘরে বসে অশ্রুপাত করেই দায়িত্ব শেষ করেনি। পথে পথে অজস্র মানুষের সঙ্গে পায়ে পা রেখে মিছিল করেছে, স্লোগান দিয়েছে– রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কল্লা চাই, তখন নিশ্চয়ই আমার কন্যা, আজকের ছোট্ট খুকু গৌরবে উদ্ভাসিত হবে।

আবদুল মান্নাফ অনুভব করছেন, পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। তিনি হেরে যাচ্ছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রতি একজন বাঙালি হিসেবে তারও সমর্থন স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আন্দোলনে জড়িয়ে জেলে আসা, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা, তাও মেয়ে না নারী হয়ে? পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র। ঢাকা শহরে বা নারায়ণগঞ্জে নারীরা বাসার বাইরে যায় না। গেলেও রিকশা বা ঘোড়ার গাড়ির চারপাশে কালো কাপড়ের ঘের দিয়ে, ঢেকেঢুকে ইজ্জত রক্ষা করে। কোনো নারী একা বাইরে বের হলে পঞ্চায়েত জরিমানা করে। মিছিল মিটিংয়ে যোগ দেওয়া অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে কল্যাণী রায় চৌধুরী বা মমতাজ বেগম মিনু। পত্রপত্রিকায় এই ঘটনার ছবি প্রকাশ করেছে। গোটা পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়েছেন নারীরা। পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম নারীর মিছিল ও স্লোগান। দেশবাসী মারাত্মক উত্তেজিত। পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চয়ে যাচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অশংগ্রহণে বিচলিত পূর্ব বাংলার নূরুল আমিনের পেটোয়া সরকার।

মমতাজ বেগম মিনু বা কল্যাণী রায় চৌধুরীকে থামানোর জন্য সরকার ব্যবহার করছে স্বামী আবদুল মান্নাফকে। গতকাল

গেণ্ডারিয়ার অফিসে কাজ করছিলেন আবদুল মান্নাফ। খাকি পোশাকে চারজন পুলিশ আসে। পুলিশ দেখে অবাক হলেও আবদুল মান্নাফ বিচলিত হলেন না।

পুলিশের কনস্টেবল শফিক আলী বললেন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় নেবেন আমাকে?

সচিবালয়ে।

কার কাছে যেতে হবে?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্যারে কাছে।

চলুন।

কলিগের কাছে অফিসের চাবি রেখে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন তিনি। গেণ্ডারিয়া থেকে সচিবালয় খুব বেশি দূরে নয়। দ্রুতই চলে এসেছে গাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে গাড়ি একটা দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচে থামে। পুলিশের সঙ্গে নেমে এলেন গাড়ি থেকে আবদুল মান্নাফ। পুলিশের ইশারায় সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ডান পাশের ডানের একটা রুমের দরজার সামনে দাঁড়ায় পুলিশের সঙ্গে আবদুল মান্নাফ। পুলিশের একজন ভিতরে ঢোকার কয়েক মুহূর্ত পরই বের হয়ে আসে বাইরে, আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন স্যার।

আবদুল মান্নাফ সাদা কাপড়ের ঝোলানো পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। রুমটা বড়সড়। বামদিকের একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে মাঝবয়সী একজন বসে আছে। হাতে সিগারেট জ্বলছে, মাথায় চুল নেই, টেকো। কিন্তু নাকের নিচে গোফ। টেবিলের ওপর কাঠের ওপর নাম লেখা, আবদুল মোমিন চৌধুরী, ইনবেস্টিগেশন অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আবদুল মোমিন চৌধুরী সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইশারায় বসতে বলে আবদুল মান্নাফকে। ইশারা পেয়ে বসেন সামনের চেয়ারে।

আপনার স্ত্রী মমতাজ বেগম মিনু ওরফে কল্যাণী রায় চৌধুরী?

জি, মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করেন আবদুল মান্নাফ।

উনি হিন্দু?

এখন মুসলমান।

হাসেন টেবিলের ওপরে বসা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইনভেস্টিগেশন অফিসার আবদুল মোমিন চৌধুরী, মুসলমানদের এক গ্লাস গোল খাইয়ে হিন্দুরা সব কিনে নিতে পারে।

ইনভেস্টস্টিগেশন অফিসারের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকেন আবদুল মান্নাফ। মনে মনে বলেন, হারামজাদা কী বলতে চায়? কিন্তু মুখের সামনে মৃদু হাস্য ঝুলিয়ে তাকিয়ে থাকেন, ঠিক বুঝলাম না আপনার বক্তব্য।

আমরা জেনে গেছি আপনি কলকাতার মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন পূর্ব পাকিস্তানে। মুসলমানও বানিয়েন। নামও রেখেছেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীর নামে মমতাজ! পুরো ব্যাপারটাই সাজানো, বুঝলেন, সাজানো।

সাজানো? কী সাজানো?

সিগারেটের গোয়ায় কষে টান দিয়ে মোমিন চৌধুরী বলছেন, আপনারা সহজ বিষয়টাও বুঝতে পারেন না। ওই যে হিন্দু মেয়েটা মুসলমান হয়ে এই দেশে এসেছে, কেন এসেছে জানেন?

এসেছে আমার সঙ্গে ঘরসংসার করতে।

আবার হা হা হা হাসিতে রুমটা ফাটিয়ে তোলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইনভেস্টিগেশন অফিসার, তা তো বটেই, তা তো বটেই। হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন আরো পরের দিকে, যখন আম আর ছালা দুটোই চলে যাবে।

আবদুল মান্নাফ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইনভেস্টিগেশন অফিসারের দিকে, লোকটা আমাকে কী বুঝাতে চাইছে?

আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি, তাই তো?

জি, মাথা নাড়ান আবদুল মান্নাফ।

ব্যাপারটা শুধু আপনার একার কেইস না, এই ধরনের কেইস আমাদের কাছে এসেছে প্রায় লাখখানেক। বুঝলেন মান্নাফ সাহেব লাখখানেক। সরকারের মাথা গরম। একসঙ্গে এক লাখ নারী যদি মিছিল করে সরকার সামলাবে কীভাবে? আবদুল মোমিন চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে চেয়ারে হেলান দিয়ে।

অস্বস্তি বোধ করে আবদুল মান্নাফ। লোকটা অফিস থেকে তুলে এনে কী সব আবোলতাবোল বকছে! এক লাখ নারী যদি মিছিল করে, কোথাকার এক লাখ নারী? পূর্ব বাংলার মেয়ে বা নারীরা তো ঘর থেকেই বের হয় না। তাহলে?

ইন্ডিয়ার সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার হিসেবে বেছে নিয়েছে আপনাকে, ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে নির্দেশ করেন আবদুল মান্নাফকে, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইনভেস্টিগেশন অফিসার।

আমাকে? অবাক আবদুল মান্নাফ।

অবাক হওয়ার কিছু নাই। আমি না মানে আমরা, আমরা মানে সরকার সব জানে।

কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।

জানি তো, আপনি কিছুই জানেন না। যদি জানতেন তাহলে কি হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করতেন?

নড়েচড়ে বসে আবদুল মান্নাফ, দেখুন আমি আপনার স্ত্রী চিনি। মিনু খুব স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজের জন্ম পরিবারের সবাইকে অস্বীকার করে আমার সঙ্গে পূর্ব বাংলায় চলে এসেছে। আমার সন্তানের জননী।

শুনুন মান্নাফ সাহেব, ইন্ডিয়ার সরকার অনেক কৌশল করেছে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আপনার স্ত্রীর মতো আরও এক লাখ হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে ধর্মান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকেছে। সেই সব হিন্দু নারী মেলে মেয়ের মা হয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে মিশে বুদ্ধি পরামর্শ করে সবাইকে বুঝিয়েছে, পাকিস্তান টিকবে না। বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তান অত্যাচার করছে। এই কুবুদ্ধির মহিলাদের কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষার নামে আন্দোলন শুরু করেছে। প্রমাণ আপনার সংসার, আপনার হিন্দু স্ত্রী কল্যাণী রায় চৌধুরী বা মমতাজ বেগম মিনু।

আবদুল মান্নাফের মাথা ঝিমঝিম করছে। বুঝতে পারছেন চেয়ার দখল করা এসকল মাকাল ফলের কারণে পাকিস্তান একদিন ফাঁকিস্তানে পরিণত হবে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। বললেই জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু মিনু কারাগারে। চার বছরের মেয়েটা খুকুর কী হবে? আবদুল মান্নাফ চুপ থাকেন। অপেক্ষা করছেন। আইন পড়েছেন তিনি। জানেন এইসব বড় হুজুরদের দৌড় সম্পর্কে। একটা কিছু মতলব করেই ডেকে আনা হয়েছে অফিস থেকে। ঝেড়ে কাশার আগে নানা ধরনের ফুটফাট ফাটাচ্ছে।

আপনি তো সরকারের কর্মকর্তা। খাদ্য বিভাগে আছেন, আপনার স্ত্রীর এইসব আন্দোলন ফান্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আবদুল মান্নাফ বুঝতে পারছেন এতক্ষণে চান্দু আসছে গাছের গোড়ায়। কেবল কাপড় তুলতে শুরু করেছে, মুততে একটু সময় লাগবে।

স্যার, মিনু বরাবরই স্বাধীন সত্তার মানুষ। যদিও আমরা স্বামী-স্ত্রী কিন্তু ওর মতামতে আমি হস্তক্ষেপ করি না– যতটা সম্ভব কৌশলী হওয়ার চেষ্টা করছেন আবদুল মান্নাফ।

দেখেন মান্নাফ সাহেব, আপনাকে বলি– পাকিস্তান দুনিয়ার মুসলিম

জাহানের একটা সাহস আর বীরত্বের প্রতীক। ইন্ডিয়ার বুক চিরে দুনিয়ায় একটা ইসলামি রাষ্ট্র আমরা কায়েম করেছি। সেই প্রতিবেশী হিন্দু ইন্ডিয়া চাইবে না, প্রতিবেশী ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হোক। সেই কারণেই আপনার স্ত্রী কল্যাণী রায় চৌধুরী ওরফে মমতাজ বেগম মিনু জেনেশুনেই আপনার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, আপনার ঔরসের সন্তান নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। এতদিন চুপচাপ থেকে আন্দোলনের ঘুঁটি চালিয়ে পাকিয়ে মাঠে নেমেছে। দেখুন, এই পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত কোথাও নারীরা মিছিল-মিটিং করার সাহস দেখায় নাই। এখানে সব নারী পর্দার মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। আর মমতাজ বেগম মিনু ওরফে কল্যাণী রায় চৌধুরী নিজে তো মিছিলে গেছেই, সঙ্গে স্কুলের মেয়েদের নিয়ে গেছে। গোটা নারায়ণগঞ্জ তোলপাড় হয়ে গেছে। ওখানকার সুধীজন সরকারের কাছে নালিশ জানিয়েছে, এই মহিলা মুসলমান মেয়েদের উসকানি দিয়ে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মিছিল করতে বাধ্য করেছে। বুঝতে পারছেন পাকিস্তান সরকারের জন্য কত বড় ষড়যন্ত্র? সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম চরিত্র আপনার স্ত্রী– আপনি করছেন সরকারের চাকরি। এখন বলুন, কী করা যায়?

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন আবদুল মান্নাফ। মান্নাফের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইনভেস্টিগেশন অফিসার আবদুল মোমিন চৌধুরী। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকার কারণে অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি।

আপনি কিছু বলবেন না?

স্যার, কী বলব বুঝতে পারছি না।

শুনুন মান্নাফ সাহেব, আপনার সামনে বিপদ, মহাবিপদ। দুটি প্রস্তাব আপনাকে দিচ্ছি। এতক্ষণের হাসিখুশি সহজ সরল ভাবটা মুখের পর্দা থেকে মুছে পেশাদারির কঠিন মুখ তৈরি করে নেন আবদুল মোমিন চৌধুরী, প্রথম হচ্ছে স্বামী হিসেবে আপনার দায়িত্ব আপনার স্ত্রীকে এইসব আন্দোলন থেকে বিরত রাখা। বিরত রাখলে দুটি লাভ– এক আপনি আর আপনার স্ত্রীকে আরও ভালো পোস্টিং দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি বা লাহোরে পাঠাবে সরকার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে না গেলেও পূর্ব পাকিস্তানে আরও ভালো পোস্টিং দেবে সরকার। যদি কোনোটাই না করেন, সরকারের স্বার্থে আপনাকে চাকরিচ্যুত করা ছাড়া সামনে কোনো পথ নেই। বুঝতে পারছেন আপনি, আমি কী কী প্রস্তাব দিলাম আপনাকে?

জি স্যার বুঝেছি।

আগামী সপ্তাহের মধ্যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে জেল গেটে দেখা করে কী সিদ্ধান্ত নিলেন, জানাবেন। আবদুল মোমিন চৌধুরী কলিংবেল টেপেন। ঢোকে সেই পুলিশ। ইশারায় আবদুল মান্নাফকে দেখিয়ে বলেন, ওনাকে পৌঁছে দিয়ে আসো।

আসুন স্যার, দরজার দিকে আমন্ত্রণ জানায় পুলিশ।

ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে সালাম জানিয়ে পুলিশের সঙ্গে বের হয়ে আসেন আবদুল মান্নাফ। বুঝতে পারেন তিনি না চাইলেও একটা রাজনীতির অদৃশ্য জালে আটকা পড়ে গেছেন বা যাচ্ছেন। সচিবালয়ের দোতলায় দাঁড়িয়ে তিনি চারদিকে তাকালেন। ঢাকা শহর প্রতিদিন একটু একটু পরে পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন ইমারত হচ্ছে। দোতলা যে বিল্ডিংটার বারান্দায় আছেন সেই বিল্ডিংটাও ওপরে আরও তালা হবে। নিচের দিকে ইট-সিমেন্ট-বালু ছড়িয়ে আছে। মিস্ত্রিরা কাজ করছে।

স্যার, চলেন– অপেক্ষায় থাকা পুলিশেরা তাড়া দেয়।

আবদুল মান্নাফ সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেন। মনের মধ্যে ভাবনার ঝড়, কী করব আমি? যতটুকু চিনি জানি মিনুকে, মিনু কোনোদিন এই পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না। যদি না দাঁড়ায় আন্দোলনের পথ থেকে... পরিণতি সম্পর্কে এখনই ভাবনার দরকার নেই। আগে ওর সঙ্গে দেখা করি, পরিস্থিতি বোঝাই। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে তিনি পুলিশদের বলেন, আপনাদের আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।

পুলিশেরা খুশি হয়ে যায়। ওদের পালের গোদা হ্যান্ডশেক করে, ঠিক আছে স্যার।

মমতাজ বেগম মিনুর সামনে জেল গেটে দাঁড়িয়ে দুদিন আগের সচিবালয়ের ঘটনা আর এই মুহূর্তের ঘটনা মিলাতে পারছেন না সরকারের খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর আবদুল মান্নাফ। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। মেয়েটা আপন মনে খেলছে, দৌড়াচ্ছে। দৌড়ে দৌড়ে মাকে স্পর্শ করছে, ডাকছে– মা! মমতাজ বেগম মেয়ের মাথায় হাত রাখছেন। পাহারায় থাকা পুলিশেরা মেয়েটিকে দেখছে। আসামিদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে খুকুকে দেখছে আর হাসছে। একজন পুলিশ খুকুর হাতে কয়েকটি চকলেট দেয়। প্রথমে নিতে গড়িমসি করলে মমতাজ বেগম বলেন, নাও মা, নাও। মায়ের কথায় খুকু চকলেট হাতে নেয়। মমতাজ বেগম মিনুর সঙ্গে দেখা করার জন্য আধঘণ্টা সময় পেয়েছেন আবদুল মান্নাফ। একটু দূরে অপেক্ষারত পুলিশ জানিয়েছে, সময় শেষ। দুই মিনিট হাতে আছে।

ভাবনার সমুদ্র থেকে ফিরে আসেন আবদুল মান্নাফ, তোমার শেষ কথা শুনতে চাই মিনু।

আমি তো শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছি তোমাকে। আমার ব্যক্তিগত লাভ বা সংসারের জন্য আমি ভাষা আন্দোলনের মতো মহৎ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে পারব না। কন্যা খুকুর দিকে তাকিয়ে নির্বিকার বলেন মমতাজ বেগম মিনু।

খুকু তখন চকলেট মুখে দিয়ে চুষছে।

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মিনু, গাঢ় গলা আবদুল মান্নাফের। আমি অনেক চেষ্টা করছি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে। কিন্তু...

আমি জানি, তোমার প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। প্রত্যেক মানুষ শেষ পর্যন্ত একা। আমি আমার পথে আছি। শুধু আবেদন থাকবে, খুকুর দিকে খেয়াল রেখো।

স্যার! পুলিশ সামনে এসে দাঁড়ায়, সময় শেষ আপনাদের। জেলের ভেতরের দিকে মহিলা পুলিশও এসে দাঁড়ায় মমতাজ বেগমের সামনে, আপা সময় শেষ।

এসো মা, খুকুকে নুয়ে কোলে নেন আবদুল মান্নাফ। চলো বাসায় যাই।

চকলেট চুষতে চুষতে খুকু প্রশ্ন করে, মা? মা যাবে না?

তোমার মা পরে যাবে মা।

না, আমি মায়ের সঙ্গে থাকব, আমি মায়ের সঙ্গে থাকব... ছোট খুকু পিতার কোলে কাঁদতে শুরু করে। মমতাজ বেগম তাকিয়ে দেখছেন প্রিয় আত্মজার চিৎকার। মহিলা পুলিশ হাত ধরে টানছে। আবদুল মান্নাফের পাশে দাঁড়ানো পুলিশও টানছে। কিন্তু নিজের মতো চিৎকার করে যাচ্ছে সাহানা বেগম খুকু, আমি মায়ের সঙ্গে থাকব। মমতাজ বেগম গরাদের শিক ছেড়ে পিছনে ফেরেন, চোখের জল দেখাতে চান না মেয়েকে। তিনি মহিলা পুলিশের সঙ্গে জেলের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পাচ্ছেন মেয়ের আর্তচিৎকার, আমি মায়ের সঙ্গে থাকব, আমি বাসায় যাব না, আমি মায়ের সঙ্গে থাকব...

দুই

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়ের বাড়িতে উৎসব।

তিনি বিচারপতি হওয়ার আগেই আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লম্বা দোহারা গড়নের মহিমচন্দ্র রায়ে শরীরের রঙ ফরসা। নাকের নিচে কালো গোঁফ চকচক করে। দেখেই অনুমান করা যায় রাশভারী রায় সাহেব গোঁফজোড়ার বিশেষ যত্ন নেন। সব সময়ে সাদা ধুতি আর হাওয়াই শার্ট পরেন। কালেভদ্রে কোর্ট প্যান্ট টাই পরেন। চোখের তারায় সব সময়ে খেলা করে কৌতুক। রাজশাহীর রঘুনাতপুরের কয়েক পুরুষ জমিদার বংশের সন্তান মহিমচন্দ্র রায়। সবই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু সমস্যা তৈরি

করেছে স্বদেশি আন্দোলন। স্বদেশি বা ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীরা একের পর এক যন্ত্রণার তৈরি করে চলেছে। তিনি স্বাধীনতার বিরোধী নন, তিনিও স্বাধীনতা চান। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য জ্বালাও পোড়াও কেন? আস্তেধীরে চেয়েচিন্তে যে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে, সেই স্বাধীনতার জন্য এত লড়াই কেন? পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়।

এখন তিনি বিচারপতি। যদি ইংরেজ সরকার বিচারপতি পদে নিয়োগ না দিতেন, আমি কি বিচারপতি হতে পারতাম? যে প্রেম দেয় সেই প্রেমের কিছু যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়। রেলগাড়ি, বাস, টেলিগ্রাম ভারতবাসীর জীবনে কম দিয়েছে ইংরেজ?

দোতলার স্টাডিরুমের মধ্যে সাজতে সাজতে নিজের সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন থাকেন বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়। নিজের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেওয়া প্রিয় অনুষঙ্গ। নিচের হলঘরে লোকজনের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কেউ কেউ জোর গলায় ডাকছে। দেয়ালে টানানো ঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল নটা বাজে। ঠিক সাড়ে নটায় আসবে ব্রিটিশ সরকারের সেই বার্তা বাহক আর ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট নিজের হাতে হাতে দেবেন রায় বাহাদুর উপাধির সনদ।

কলকাতার পত্রিকায় খবরটা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। কিছু কিছু মানুষ বিরোধিতাও করছে। আপনমনে সংলাপে বসেন বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়, যিনি আধা ঘণ্টা পর রায়বাহাদুরে অভিষিক্ত হবেন। অনেকটা প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাদের সিংহাসেন আরোহণের ঘটনা মতো। তখন হয়তো আয়োজনে আরও চাকচিক্য বা বাগাড়ম্বর থাকত, থাকাটাই স্বাভাবিক। সময় পাল্টেছে। চলছে দুনিয়া জুড়ে ব্রিটিশ রাজত্ব। ওরা যেভাবে চাইবে, সেভাবেই তো চলতে হবে। নইলে জীবন উপভোগ হবে কীভাবে? কিন্তু সাধারণ মানুষ বা স্বদেশি আন্দোলনকারীরা বুঝতে পারে না বিষয়টা।

পোশাক পরিধান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন নিজেকে বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়। আয়নায় প্রতিপলিত দেখতে পেলেন গিন্নি মাখনমতি দেবীকে। সাধারণত গিন্নির সঙ্গে সংসারিক আলোচনা ছাড়া আজকাল তেমন কোনো আলাপ হয় না। দিনরাত আদালত, সভা-সমিতি নিয়ে থাকেন। কিন্তু আকজের দিনটা অন্যরকম। বাড়িতেই থাকবেন। নিজেকে দেখতে দেখতে স্ত্রী মাখনমতি দেবীর দিকে ফিরে তাকালেন বিচারপতি। মুখে মধুর বিজয়ী হাসি, কিছু বলবে গিন্নি?

পাশে এসে দাঁড়ান মাখনমতি দেবী। দুজনের প্রতিফলিত অবয়ব আয়নার মধ্যে। স্বামীর জামার বুকের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেন, নিচের ঘরে অনেক লোক এসেছে। সবাই হৈচৈ করছে। যাবে না?

যাব তো। তোমার কন্যা কই?

মিনু আছে ওর রুমে।

আবার আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের শিক্ষক মাখনমতি দেবীকে শুনিয়ে বলেন মহিমচন্দ্র রায়, দেখো ব্রিটিশ রাজের দেওয়া রায়বাহাদুর উপাধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত মানুষের অভিনন্দন পেলাম। অফিসে বাড়িতে কত বন্ধু পরিচিতজন ফুল মিষ্টি নিয়ে এসে অভিনন্দন জানিয়েছে অথচ আমার একমাত্র কন্যা...

তুমি তো জানো, মিনু একটু অন্যরকম। আর সমাজ সংসারের সবাই কি একরকম হয়? স্বামীর দুঃখ তিনি বোঝেন। মেয়েটা পিতার ব্রিটিশ তোষণ পছন্দ করে না। দিনেরাতে নিজের রুমে বসে পড়াশোনা করে। ওর কাছে বাইরের নানা ধরনের বন্ধুরা আসে। সমাজের নীচু জাতের মানুষ যেমন আসে, আসে মুসলমান বন্ধুরাও। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে পার পাওয়া যায় না।

আয়না থেকে ফেরেন স্ত্রী মাখনমতি দেবীর দিকে বিচারপতি, তুমি আমাকে তোমার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের ছাত্র পেয়েছ? যা বোঝাবে, তাই বুঝব। দেখে নিও, এই মেয়ে একদিন আমাদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। আবার কলেজে পড়ার গো ধরেছে? কেন কলেজে পড়তে হবে? আমার যা কিছু আছে, ওর একলার সারাজীবন চলবে না? কীসের এত পড়াশোনা? সারাদিন বাড়িতে নানা ধরনের লোক আসে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ভুলে যায়, এটা বিচারপতির বাড়ি। বিয়ের প্রস্তাব আসছে, বিয়ে করবে না। কতবড় সাহস!

ও পড়াশোনা পছন্দ করে, করতে দাও না। মেয়ে তো বাড়ির বাইরে তেমন যায় না।

তুমিই ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছ। বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায় রেগেমেগে দরজার দিকে যান, দরজা অতিক্রম করে আবার ফিরে আসেন, দাঁড়ান স্ত্রী মাখনমতি দেবীর মুখোমুখি, তোমাকে বলে রাখলাম এই মেয়ে বিপদ ডেকে আনবে একদিন। তিনি ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেলেন।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মাখনমতি দেবী স্বামীর ঘর গোছানো শুরু করেন। সারা দিন বাড়িতে কত ধরনের যে অতিথি আসে, যায়, তাদের চা-নাশতা দেওয়া, বাড়িতে কাজের মানুষ চার-পাঁচজন– তাদের দেখাশোনা করা, আবার স্কুলে আসা-যাওয়া নিঃশব্দে করেন তিনি। কিন্তু স্বামী বিশিষ্ট বিচারপতি সংসারের এইসব বিষয়ে একেবারে নীরব। কেবল আদেশ করেই দায়িত্ব শেষ।

নিজের রুম পার হয়ে বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায় সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। কানে আসছে নিচতলা থেকে অতিথিদের হাস্য কলরব। বন্ধু বিশিষ্ট আইনজীবী দেবেশ কুমার চৌধুরীর গলা সবাইকে ছাপিয়ে উচ্চগ্রামে হল্লা করছে সারাটা বাড়িতে। মহিমচন্দ্র রায়ের মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কারণ, আইনজীবী হিসেবে কলকাতা কেন, সারা ভারতবর্ষে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও আছে চৌধুরীর। ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে রায়বাহাদুর উপাধি পাওয়ার পিছনে বন্ধু দেবেশ কুমার চৌধুরীর ইন্ধন ছিল সবচেয়ে বেশি, বাইরের লোকেরা তো সবটা জানে না।

তিনি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করেছেন, বাড়ির গেটে গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছেন। লোকজন তাড়াহুড়ো করে বাইরের রুম থেকে গেটের দিকে যাচ্ছে। বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায় বুঝতে পারেন, ব্রিটিশ রাজের বিশেষ গাড়ি চলে এসেছে। ম্যাজিস্ট্রেটসহ উপাধির বার্তাবাহক গাড়িতে। সবাই ওদের বরণ করতে যাচ্ছে। দেবেশ কুমার চৌধুরীও যেতে যেতে হাঁক দিচ্ছেন, মহিম? তুমি কোথায়? ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের গাড়ি আসছে তোমার বাড়ির গেটে।

আসছি আমি, তিনিও যতটা সম্ভব উচ্চৈঃস্বরে চিৎকারে সাড়া দিতে দিতে সিঁড়ির শেষ ধাপের দুই ধাপ ওপরে এসেছেন, সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে কল্যাণী রায় চৌধুরী। মেয়েকে দেখে মহিমচন্দ্র রায়ের মনের মধ্যে একটা মমতার ঢেউ খেলে যায়। একমাত্র মেয়ে, সুন্দর আয়াত দৃষ্টি। ভাবছেন, হয়তো মেয়ে ব্রিটিশ রাজের দেওয়া উপাধি বিষয়ে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। তিনি আগ্রহ ভরে মেয়ের দিকে তাকান। বাইরে গেট খোলার শব্দ, মানুষের হৈ-হুল্লোড় বাড়ছে।

কিছু বলবে তুমি?

বাবা, সারা ভারতজুড়ে দখলদার ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর ওপর চালাচ্ছে অত্যাচারের স্টিমরোলার। স্বদেশি সন্দেহ করে যাকে তাকে করছে গ্রেপ্তার। বিচারের প্রহসনের নামে দিচ্ছে একের পর এক ফাঁসি। মহাত্মা গান্ধী, জওহেরলাল নেহরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জেলে। শত শত হাজার হাজার মায়ের বুক খালি করছে যে জালিম শাসকরা, কেড়ে নিচ্ছে ভূমিপুত্রদের অধিকার, তুমি বাঙালি, ভারতবাসী হয়ে কেমন করে হার্মাদদের পুরস্কার এই নৃশংস উপাধি গ্রহণ করো?

মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়ের। রুমের মধ্যে ক্রোধের যে অগ্নিকুণ্ড জন্মেছিল, মেয়ের ভাষ্যে সেই কুণ্ডু পুনর্বার জেগে ওঠে। চিৎকার করে বাড়ির ইট কাঠ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সময়টা এখন প্রতিকূলে।

বাড়ি ভরা সম্মানিত মেহমান। চলে আসছে বাড়ির মধ্যে ব্রিটিশ রাজের বিশেষ অতিথিবর্গ। এই সময়ে মূর্খ মেয়ের সঙ্গে এখন বাহাস করার সময় নেই। পরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে, নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছেন বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়।

মিনু, তিনি সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে মেয়ের মুখোমুখি, তোমার সঙ্গে পরে এই বিষয়ে আলাপ করব। এখন আমার কাজ আছে, মিনুকে অতিক্রম করে মহিমচন্দ্র রায় সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাবা! তুমি এই নিকৃষ্ট দালালি গ্রহণ করো না!

মেয়ের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে না পিতার কানে। কারণ, তিনি বাড়ির লম্বা টানা বারান্দায় দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগত মেহমানরা ফুল ও ফুলের মালা হাতে এগিয়ে আসতে থাকেন। তিনি ফুল ও ফুলের মালা মাথা নুইয়ে গ্রহণ করতে করতে নিচের দিকে নামেন। ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ির দরজা খুলে বের হয়েছে দাঁড়িয়েছে। টকটকে লাল রঙের ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে মহিমচন্দ্র রায়ের জন্য, সঙ্গে দেবেশ কুমার চৌধুরী। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে, কিন্তু মনের মধ্যে প্রিয় কন্যার শব্দগুলো বিষের বাশির সুরে বাজছে। যে সুর মহিমচন্দ্র রায়কে বিবশ করে দিচ্ছে।

তিন

জানেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু পূর্ব বাংলার।

তাই নাকি?

আবদুল মান্নাফ আর কল্যাণী রায় চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। দুজনেই আইন বিভাগের ছাত্র। কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণে কল্যাণী রায় চৌধুরীর উচ্চারিত শব্দে এক ধরনের কৌলিন্য ঝরে। নিখুঁত উচ্চারণে কল্যাণী যখন কথা বলেন তখন অবাক না পারেন না আবদুল মান্নাফ, কেমন করে কলকাতার মানুষ এমন সুন্দর বাচনিক পর্বে বলেন কথা? বাংলা ভাষাই– গোটা বাংলার মানুষের ভাষা। কলকাতার মানুষের কেন পার্থক্য উচ্চারণে?

আপনি কি পূর্ববঙ্গের?

পাশাপাশি বেঞ্চে বসার কারণে কল্যাণী প্রথম প্রশ্ন করেন আবদুল মান্নাফকে। পাশাপাশি বসলেও আবদুল মান্নাফের মধ্য এক ধরনের করুণা কাজ করছে। কলকাতার কেবল মেয়ে না, ছেলেদের মধ্যেও লুকানো অহংকার দেখেছেন তিনি। পূর্ব বাংলার মানুষদের প্রতি কলকাতা বা ওই অঞ্চলের মানুষের এক ধরনের অনুজ্ঞা বা প্রচ্ছন্ন অবহেলা আছে। যদিও একটি অঞ্চল ও একটি ভাষার মানুষ সকলেই। আবদুল মান্নাফ ভাবেন, এক গোষ্ঠী বা অঞ্চলের মানুষ হলেও যারা একটু বনেদি কিংবা সামনের কাতারের মানুষ, তারা পিছিয়ে থাকাদের অবজ্ঞা করেন। এটা করে আভিজাত্যর অভিঘাত প্রতিষ্ঠা করে মজা বা সুখ চাখেন।

পূর্ব বাংলার কোথায় আপনার পূর্বপুরুষদের বাড়ি?

রাজশাহী।

রাজশাহী? রাজশাহীর কোথায়?

আপনার বাড়ি কি রাজশাহী? প্রশ্ন করেন কল্যাণী রায় চৌধুরী।

না, আমার বাড়ি রাজশাহী থেকে অনেক দূরে, বলা যায় একেবারে বিপরীতে। কিন্তু আমার দু-একজন বন্ধু আছেন রাজশাহীর।

ও আচ্ছা... কিছুটা দমে যান মিনু।

কিন্তু রাজশাহীর কোথায়? এলাকাটা তো অনেক বড়। ইতিহাসে যার নাম বরেন্দ্র এলাকা।

হাসেন কল্যাণী রায় চৌধুরী, আমি অতটা জানি না। বাবা, দাদা-আত্মীয়স্বজনদের মুখে শুনেছি, রাজশাহীর রঘুনাথপুরে জমিদার ছিলাম আমরা।

ও মা! জমিদার নন্দিনী আপনি? একটু নাটকীয় ঢংয়ে বলেন আবদুল মান্নাফ।

হাসিতে ভেঙে পড়েন কল্যাণী, আপনি কি নাটক করেন?

করতাম গ্রামের স্কুলে...। স্বীকার করেন আবদুল মান্নাফ। এখন জীবন নাটকের মধ্যে সব ভুলে গেছি।

জীবন নাটক মানে?

আমরা হলাম পূর্ব বাংলার সাধারণ বাঙালি। আপনারা যাদের বলেন বাঙাল। বাবা কৃষক– আমরা ইচ্ছে আধুনিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা। তাই চাকরি আর পড়াশোনা নিয়ে একেবারে দিশেহারা।

আপনি চাকরিও করেন নাকি? খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করেন কল্যাণী।

হ্যাঁ, আমি সিভিল সাপ্লাই অফিসের বড় কেরানি।

আবদুল মান্নাফের কথায় হাসেন কল্যাণী রায় চৌধুরী।

আপনি হাসলেন কেন?

আপনার মতো আমিও চাকরিজীবী।

তাই নাকি? কোথায় চাকরি করেন?

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায়।

বাহ, খুব ভালো লাগলো জেনে, আপনিও চাকরি করেন, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন আবদুল মান্নাফ।

কেন ভালো লাগল?

আবদুল মান্নাফ একটু ভড়কে যায়। কলকাতার ডাকসাইটের মেয়েরা একটুতেই মাইন্ড করে। সামনে দাঁড়ানো এই ভীষণ সপ্রতিভ মেয়েটি কী মনে করল কে জানে। এমনিতে দারুণ সুন্দরী। চাকরি করে ব্যাংকে, নিশ্চয়ই বিয়েও হয়েছে। না, এদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলা দরকার।

আমার ধারণা ছিল আইন বিভাগে আমি একাই চাকরিজীবী ছাত্র...

হাসেন কল্যাণী রায় চৌধুরী, কেবল আপনি আর আমি না, আইন বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই চাকরিজীবী। চাকরির ফাঁকে আইন পড়ে ভবিষ্যতে কোনো গতি না হলে বা সামনে রাজনীতির সুযোগ থাকলে আইনের ডিগ্রি থাকলে সুবিধা হবে।

আমি এতসব জানি না, আর ক্লাস করছি গতকাল থেকে। কারো সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ঘটেনি, আপনার সঙ্গে ছাড়া।

আমারও।

মানে?

আপনার মতো আমারও কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় ঘটেনি, আপনার সঙ্গে ছাড়া...।

দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ে। করিডোর ধরে হাঁটতে থাকা ছাত্রছাত্রীরা তাকায়, হাসির হুল্লোড়ের উৎসে। আবদুল মান্নাফের জগৎটা হঠাৎ আনন্দে উৎসবে ভরে ওঠে। কলকাতায় এসেছেন বছরখানেক কিন্তু এমন হাসি-উচ্ছ্বাসের দিন বা সময় কারো সঙ্গে কাটানোর সুযোগ হয়নি। আজই প্রথম, তাও কলকাতার মেয়ের সঙ্গে...।

ক্লাসের ঘণ্টা পরে, দুজনে ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাসে প্রবেশ করেন। এবং আগের মতোই পাশাপাশি বসেন। অধ্যাপক অহীন্দ্র বসু পড়াতে শুরু করেন। আবদুল মান্নাফ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকান ভালো করে, আড় চোখে। সাড়া ক্লাসে ত্রিশ থেকে চল্লিশজন ছাত্র হবে, বোঝা যায় অধিকাংশই চাকরিজীবী। বয়সের চিহ্ন চোখেমুখে। হঠাৎ সামনে একটা খাতা ঠেলে দেয় কল্যাণী রায় চৌধুরী।

আপনার নাম কী? ঠেলে দেওয়া খাতার ওপর লেখা দেখতে পান আবদুল মান্নাফ।

অদ্ভুত এক ভালো লাগায় প্রাণ মন জুড়িয়ে যায় মান্নাফের। নিচে লেখেন, আমার নাম আবদুল মান্নাফ। পাল্টা প্রশ্ন লেখেন তিনি, আপনার নাম? খাতাটা ঠেলে দেন কল্যাণী রায় চৌধুরীর দিকে।

আমি কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু। আবদুল মান্নাফের ঠেলে দেওয়া খাতায় নিজের নাম লিখে কল্যাণী পাল্টা প্রশ্ন রাখে, বাড়ি কোন এলাকায় আপনার?

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর মানুষ আমি, বাঙাল। আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?

ঠেলে দেওয়া খাতায় কল্যাণী রায় চৌধুরী নাম দেখে আবদুল মান্নাফের মধ্যে আনন্দ হিল্লোলের যে সুর বেজে উঠেছিল মুহূর্তে মুছে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ পরিচয়ে মান্নাফের মনের মধ্যে এক ধরনের অনুরাগের সুর বেজে উঠেছিল সেই সুর স্থির হয়ে যায়, নামটা দেখে।

আমরা সবাই বাঙাল, বাঙালি। থাকি হাওড়ায়। আপনি থাকেন কোথায়?

আমি থাকি কলেজ স্ট্রিটে। আপনার বাসায় কে কে থাকেন? ঠেলে দেন খাতা কল্যাণীর দিকে আবদুল মান্নাফ। কয়েক মুহূর্তের আগের উচ্ছ্বাস মিইয়ে আসে।

আমি থাকি বাবা-মায়ের সঙ্গে। আপনার সঙ্গে কে কে থাকেন?

আমি থাকি মেসে। আমরা একসঙ্গে থাকি চারজন, একটা বাসা মেস বানিয়ে। বুয়া এসে রান্না করে দিয়ে যায়, আমরা খাই। আপনার বাবা কী করেন?

আমার বাবা বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়। আমার মা একজন শিক্ষক। আপনার বাবা-মা কী করেন?

আমার বাবা কৃষক। মা কৃষাণী।

আপনি হালচাষ করেন?

অবশ্যই। বাড়িতে থাকার সময়ে বাবার সঙ্গে হালচাষ করতাম স্কুলে-কলেজে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

জানেন, আমার হালচাষ করতে খুব ইচ্ছে করে। কেমন করে কৃষকেরা লাঙল ধরে গরুর পিছনে হাঁটে, কেমন করে চাষবাস করে...। আমি চাই কৃষক স্বামী। হিহিহি....

আমি তো একজন কৃষক, যদিও কলকাতা মহানগরে অজস্র নাগরিকের স্রোতে মিশে নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনের মধ্যে কৃষির গন্ধ এখনো টের পাই।

ঘণ্টা বেজে ওঠে, অধ্যাপক অহীন্দ্র রায় রুম থেকে বের হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা হুড়মুড় করে ক্লাস থেকে বের হওয়ার লড়াই করে। বিকেল হয়েছে। খিদে পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময়ে আবদুল মান্নাফের হাত থেকে খাতাটা নিজের কাছে নিয়ে বের হয়ে আসেন মিনু। পিছনে পিছনে আবদুল মান্নাফ। নিচে নেমে দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে। একটা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলেন মিনু, আমার জন্য অপেক্ষা করছে মা। না যাওয়া পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন আর বাবা কোর্ট থেকে বারে বারে ফোন করে জানতে চাইবেন, আমি ফিরেছি কি না। যখন শুনবেন আমি বাসায় ফিরেছি, নিশ্চিত হবেন। আসি?

আসুন, ঘাড় কাত করে বিদায় জানান আবদুল মান্নাফ। চোখের সামনে দিয়ে কল্যাণী রায় চৌধুরীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলে যায়। চলে যাওয়া গাড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর আবদুল মান্নাফ। বুকের মধ্যে অনন্ত তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু অপ্রকাশের ভারে যন্ত্রণায় কাঁপছেন। জীবনের প্রথম অনুরাগে তিনি বিহ্বল কিন্তু কীভাবে সম্ভব? যোজন দূরের সীমানা প্রাচীর পার হয়ে কতদূর যেতে পারবেন তিনি? ভাবনায় নিমজ্জিত হতে হতে একটা সিগারেট ধরালেন আবদুল মান্নাফ।

চার

ঢাকা শহরে আজ বিকেলে পাকিস্তানের পুলিশ গুলি চালিয়েছে, অজস্র মানুষ হত্যা করেছে। কী অন্যায় করেছে এই দেশের মানুষ? মাতৃভাষায়, নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চেয়েছে, এটাই অপরাধ? দুনিয়ার যে কোনো দেশের মানুষ বা জনগণ সেই দেশের ভাষায় কথা বলবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জালিম পাকিস্তানি সরকার কোনো যুক্ত বা ইতিহাস মানছে না। হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে উর্দু ভাষা। প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছে। আজ চলছে সারা দিনব্যাপী মিছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিল রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে। কিছুক্ষণ আগে শুনতে পেয়েছি সেই মিছিলে বর্বর পাকিস্তানি সরকারের পেটোয়া নুরুল আমিনের পুলিশ চালিয়েছে গুলি– শহীদ হয়েছে অনেকে। এখনো শহীদদের নাম সঠিকভাবে জানতে পারিনি। আমরা এই প্রতিবাদ সভা থেকে বাংলার নিরপরাধ ছেলেদের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানাই...

বর্ষীয়ান নেতা আবুল হাশিম তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করছিলেন ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ শহরের রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের সামনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিবাদ সভায়। গোটা প্রাঙ্গণ লোকে-লোকারণ্য।

আবুল হাশিমের বক্তৃতায় জনগণ যখন প্রতিবাদে ফুঁসছে, ঠিক সেই সময়ে প্রতিবাদ সভার উপস্থিতজনদের কানে আসে স্লোগানের আগুনের শব্দ– রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। সভার সকলেই বিস্মিত, ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকায়, চোখের সামনে দেখতে পান অবিশ্বাস্য এক মোহময় সাহসী রজনীগন্ধা ফোটার দৃশ্য। মহিলা বা মেয়েরা মিছিল করে আসছে। মিছিলের পিছনে মর্গান গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা, সামনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। তিনি সামনে থেকে হাত উঁচিয়ে স্লোগানে লিড দিচ্ছেন, রাষ্ট্র ভাষা-রাষ্ট্র ভাষা, পিছনের শ'তিনেক ছাত্রী গলার রগ ফুলিয়ে প্রতিধ্বনি করছে, বাংলা চাই, বাংলা চাই। নুরুল আমিনের কল্লা, কেটে ফেলব আমরা...। রাষ্ট্র ভাষা রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা চাই, বাংলা চাই...।

মিছিল এসে যুক্ত হয় ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ সভায়। মিছিলের নেতা, মর্গান গালর্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম এগিয়ে যান সভার প্রধান অতিথি আবুল হাশিমের দিকে। আবুল হাশিম দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক মিছিল-মিটিং দেখেছেন। কলকাতা, ঢাকা দুই শহরেই দেখেছেন। নিজেও অংশ নিয়েছেন। পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। হাজার লাখো মানুষের মিছিল দেখেছেন, জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু আজকের এই মিছিল ও জনসভা অন্যরকম, বিস্ময় সৃষ্টি করেছে নারায়ণগঞ্জে। নারীরা মিছিল করেছেন, ভাষার জন্য প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য।

মিছিলের নেত্রী এগিয়ে আসছেন সভামঞ্চের দিকে। আবুল হাশিমের পাশে বসা নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের নেতা সামসুজ্জোহা কানে কানে বলেন, উনি মমতাজ বেগম। মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে মিছিল করে সভায় এসেছেন।

আবুল হাশিম চমকে উঠেছেন মিছিল দেখেই কিন্তু স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক এতটা অগ্রসর হয়ে আসবেন তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। মমতাজ বেগম মিনু এগিয়ে যেতেই বয়োবৃদ্ধ আবুল হাশিম দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এগিয়ে আসেন মমতাজ বেগম। আবুল হাশিমের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়ালে অজস্র মানুষের মধ্যে তিনি জড়িয়ে ধরেন, বিজয়ী হও মা। কিন্তু সামনে তোমার বিপদ, ভয়ানক বিপদ। পাকিস্তানের সরকার তোমাকে ছাড়বে না। এই সমাবেশের মধ্যে সরকারের চর লুকিয়ে আছে। সামনে তোমার বিপদ।

মুখে সাহসের হাসি মমতাজ বেগমের, আমি ভয় পাই না চাচা। ভয় পেলে কি তুমি এমন কাজ করতে? করার সাহস পেতে? আমার মনে হয় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে, না– আবুল হাশিম তিনি মাথা নাড়াতে নাড়তে বলেন, সমগ্র পাকিস্তানে আজ প্রথম নারী মিছিল হলো। তুমি সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছ– তোমাকে অনেক অপমান সইতে হবে।

আমি তৈরি আছি চাচা। আমি তো আপনার সম্পর্কে জানি, সেই কবে থেকে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করেছেন পূর্ব পাকিস্তান আর অভিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন...

দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে আবুল হাশিমের, কিন্তু পারলাম কই মা। গুজরাটি, দিল্লি রাজনীতির মুৎসুদ্দি, করাচির মোজাহের আর ধর্মের ত্যানার কাছে হেরে গেলাম। সোনার বাংলা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, খণ্ডিত বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে কোনো সুখ পাই না।

বুঝি আমি, আপনাদের মতো বৃহৎ চিন্তার মানুষ এখন নেই–

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মাইক্রোফোনে বলছেন উপস্থাপক, এইমাত্র আমাদের সামনে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। নারায়ণগঞ্জের মর্গান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ভাষা আন্দোলনের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এখন আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন মর্গান গালর্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম।

মমতাজ বেগম তাকান আবুল হাশিমের দিকে। আবুল হাশিম অভয় মুখে তাকান, যাও।

মমতাজ বেগম এগিয়ে এলেন মাইক্রোফোনের সামনে। তিনি যখন স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, মনের মধ্যে শঙ্কা ছিল, মনের মধ্যে জড়তা ছিল, মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। কিন্তু মেয়েরাই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় এগিয়ে আসে, চলুন আপা।

ভয় পাবে না তো? সামনে এগিয়ে আসা নবম শ্রেণির ছাত্রী মহুয়া আখতারকে প্রশ্ন করেন তিনি।

মহুয়া আখতারের পাশে দাঁড়ানো সপ্তবর্ণা বন্যা বলে, ভয় পাব কেন আপা? আমাদের দেশ, আমাদের ভাষা– আমরা মিছিল করব আমাদের মাটিতে। ভয় পাব কেন? আপনি চলুন... আপনার পিছনে আমরা আসছি।

বুকটা অদম্য সাহসে ভরে যায় মমতাজ বেগমের, আমি একা নই। আমার সঙ্গে আরও অনেকে আছে... আগামীর নাগরিকরা আছে। স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক ফয়জুর কবির তো পায়ে পা দিয়ে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। লোকটা সামনে আসলে মাথা নিচু করে থাকে কিন্তু পিছনে গেলেই সাপের খোলস ভেঙে গড়াই নদীর স্রোতের গতিতে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। সব কানে আসে কিন্তু চোখকান বুঝে সহ্য করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সামনের এই কন্যারাই সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে নেবে।

নারায়ণগঞ্জ শহরের রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের সামনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত বিশাল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব প্রেরণায় মমতাজ বেগমের বুক ভরে যায়। তিনি চারদিকে তাকিয়ে জনসভার লোকজনের মধ্যে অজস্র চোখের সামনে নিজের দৃষ্টি রেখে বলতে শুরু করলেন, আজকের সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম, উপস্থিত সুধীজন, শ্রমিক ভাইগণ, মর্গান স্কুলের ছাত্রীসহ উপস্থিত ছাত্রবন্ধুরা, জাতি হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে করতে হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ও প্রধান অস্ত্র ভাষা। বাঙালিদের, অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস থাকার পরও প্রায় ১২০০ মাইল দূরের করাচির শাসকরা আমাদের ভাষা, আমাদের আশা কেড়ে নিতে চাইছে। কেবল কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, আমাদের ভাইয়ের হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না। আমরা তো এই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করি নাই। আমরা চেয়েছিলাম, সবাই মিলে পাকিস্তানে

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান মিলে একসঙ্গে থাকতে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে। কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী শুরুতেই মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দু জবানে কথা বলতে ও লিখতে বাধ্য করতে চায়। যা এই পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষার জনঘন হয়ে আমরা মানতে পারি না। যদি আমরা ওদের এই কুচক্র মেনে নেই পরের দিন ওরা আমাদের হাত-পা কেড়ে নেবে, আমাদের জিহ্বা কেড়ে নেবে। আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব? নিশ্চয়ই না, আমরা প্রতিবাদে প্রতিরোধে ওদের ঘায়েল করব। যার শুরু হলো নারায়ণগঞ্জ থেকে।

এখানে উপস্থিত বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম চাচা আছেন, আছেন নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্টজনরা, আপনাদের সাক্ষী রেখে বলছি, ভাষার জন্য, বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় জীবন দিয়েছে আমার ভাইয়েরা, যদি আবার রক্ত দিতে হয়, দেব আমরা– আমার স্কুলের মেয়েরা আর মেয়েদের সঙ্গে আমি থাকব সকলের সামনে, প্রথম বুলেটে আসবে আমার বুকে....

প্রতিবাদ সভার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। মমতাজ বেগমের বক্তব্যের মধ্যেই স্লোগান ওঠে– রাষ্ট্র ভাষা, রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা চাই, বাংলা চাই...। অজস্র স্লোগান আর মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন মমতাজ বেগম মিনু। তিনি অনুভব করছেন জনতার বুকের ভেতরের ভাষা সেতারের সুর। স্লোগান স্তিমিত হলে তিনি আবার শুরু করেন, আমরা নারী, আমরা অবলা। আমরা ঘরের মধ্যে কেবল রান্না আর সূচিকর্মে পটু– পুরুষরা এই ধরনের ধারণা তৈরি করেছে। আজ নারায়ণগঞ্জের নারীরা প্রমাণ করেছে, নারীরা– আমরাও মিছিল করতে জানি, আমরাও স্লোগান দিতে পারি।

একটা বিষয়, পাকিস্তানের সরকার আমাদের আন্দোলন দমাতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করবে, আপনারা সচেতন থাকবেন এবং যে কোনো পরিস্থিতির সামনে আসলে সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করবেন। পিছিয়ে যাবার সুযোগ নেই। আজ আমরা পিছিয়ে গেলে কাল আমাদের গলা টিপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে আমাদের পিষে মেরে ফেলবে। সুতরাং লড়াইয়ের মাঠ থেকে যদি সরে যাই, শহীদ ভায়েরা আমাদের ক্ষমা করবে না।

পাঁচ

১৯৪৩ সাল।

কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের নাখোদা মসজিদের ইমাম দুহাত তুলে মোনাজাত করছেন আর কাঁদছেন অঝোরধারায়, হে পরোয়ারদেগার, আজ আমাদের জন্য মহান দিন। কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যা কল্যাণী রায় চৌধুরী সজ্ঞানে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। উপস্থিত মুসল্লিরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলেন, আমিন আমিন...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয়ের পর থেকে আবদুল মান্নাফ আর কল্যাণী রায় চৌধুরীর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন দেখা হলে দুজনই কাছে আসে। দুজনই বুঝতে পারছিল ধর্ম এবং রাজনীতির বাইরে এসেও জীবন সাজানো যায় নতুন আরতিতে। প্রায় প্রতিদিন দেখা হওয়ায় আলাপে দুজনে খুব কাজে আসে কিন্তু মুখ ফুটে নিগূঢ় নিবিড় সত্য প্রকাশ করতে পারছিল না। বিকেলে ক্লাস শেষ হওয়ার পর আবদুল মান্নাফ উদাস হয়ে বলে, একা একা ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলে বিয়ে করলেই হয়, কটাক্ষে উত্তর দেয় কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু। করতে তো চাই কিন্তু বাঙালকে কলকাতার কোনো কন্যা কি বিয়ে করবে? তার ওপর ধর্মে মুসলমান। ভালোবাসায় কি ধর্ম মানে? ভালোবাসাই তো ধর্ম–

আবদুল মান্নাফ অবাক তাকায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর মুখের কল্যাণী রায় চৌধুরীর দিকে। আয়াত দুটি চোখে মায়ার দ্যুতি ভেসে বেড়ায়। বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে কলকাতা শহরের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোতলায় দাঁড়িয়ে কল্যাণী প্রস্তাব দেয়, মান্নাফ চলুন গঙ্গার ধারে যাই?

আবদুল মান্নাফও এই ধরনের একটা সুযোগ অপেক্ষায় ছিল। গঙ্গার জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে ক্রমাগত বুনতে থাকা অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে। নদীর জলের সঙ্গে জলের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তখন মিনু না করতে পারবে না। কিন্তু সম্ভব? হিন্দু মুসলমানের রাজনীতির অবস্থা তো ছ্যাড়াবেড়া। কোনো ঝামেলা হবে না তো? আরে এত চিন্তা করছি কেন, মিনুর সঙ্গে তো কোনো কথাই হয়নি। আগে কথা হোক– পরে ভাবা যাবে।

আমিও ভাবছিলাম, কোথাও যাওয়া যায় নাকি! প্রতিদিন ক্যাম্পাসে বসে কথা বলি, নতুন কোথাও গেলে ভালো লাগবে, চলুন! একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে উঠে বসে দুজনে। গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে শুরু করে। কলকাতার বিকেলের রাস্তায় আরও ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম আর প্রাইভেট গাড়ি চলছে। হালকা হাওয়ায় উড়ছে মিনুর কালো চুল। উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পরছে মান্নাফের মুখের ওপর। মিনুর চুলের অবশ করা গন্ধ। চোখ বুঝে কল্যাণী রায় চৌধুরীর চুলের গন্ধ নেয় মান্নাফ আর ভাবে, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর কৃষকের পোলার কপালে আজ বিকেলের দিকেই কলকাতার রাস্তায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।

মিনু তাকায় পাশে বসা পূর্ব বাংলার দোহারা গড়নের বলিষ্ঠ পুরুষের দিকে। মানুষটা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, পাশে বসা ফুলকুমারীর দিকে তাকচ্ছে না। লজ্জা বা কুণ্ঠার কারণে সরাসরি তাকাচ্ছে না আবদুল মান্নাফ, বুঝতে পারে মিনু।

জানেন মান্নাফ? অস্ফুট বলে মিনু।

উদাস দৃষ্টি রাস্তা থেকে ফিরিয়ে এনে প্রতিস্থাপন করেন আবদুল মান্নাফ, কী বলুন।

কলকাতার রাস্তায় আমি বাড়ির বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে এই প্রথম ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছি কলকাতার রাস্তায়।

মানে?

তোমরা তো কলকাতার মেয়ে, বনেদি পরিবারের মেয়ে। তোমাদের আত্মীয়স্বজন তো আছে। তাদের সঙ্গে বের হও না? আবদুল মান্নাফ আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত সুখে, বুঝতে পারছে কল্যাণী রায় চৌধুরী। মজা পাচ্ছে খুব। ছেলেটো ডুবে গেছে আমার মধ্যে...।

সবই ঠিক কিন্তু আমার বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায় অনেকটা গোড়াপন্থি।

মানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলে আবদুল মান্নাফ।

আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া চাকরি করতে দিতে চাননি। আমি জোর করে করছি।

সত্যি তো, রায়বাহাদুর বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়ের একামাত্র মেয়ের চাকরি করতে হবে কেন? তিনি সে কারণেই হয়তো...

আবদুল মান্নাফের মুখের কথা কেড়ে নেন কল্যাণী, সেটা হলে এক ধরনের সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু বাবা প্রচণ্ডভাবে আচারনিষ্ঠ আর ধার্মিক মানুষ। তিনি যদিও লেখাপড়া করেছেন, ব্রিটিশরাজের বিচারক হয়েছেন, আমাদের বাড়িতে কলকাতার খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীরা আসেন বাবার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে, বাবা সেই আড্ডা উপভোগও করেন কিন্তু পরিবারের বেলায় তিনি গোড়া।

চট করে আবদুল মান্নাফ হাত ধরে কল্যাণীর, তাহলে কী হবে?

চমকে গেলেও কলকাতার সন্ধ্যার লালিমা প্রহরে আবদুল মান্নাফের এই প্রগাঢ় স্পর্শ ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত করে মহিমচন্দ্র রায়ের একামাত্র কন্যা, কল্যাণীকে। নিজেকে অনুভূতির স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে পাল্টা হাত রাখে আবদুল মান্নাফের হাতের ওপর, কিসের কী হবে?

তোমাকে যে আমি ভালোবাসি মিনু। জানো, সারাটা রাত আমার মেসের রুমে কেটে যায় তোমাকে ভেবে ভেবে। জানি আমি একটা দুঃসাধ্য পথে পা রেখেছি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কলকাতার গাড়ি ঘোড়ার শব্দের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আবদুল

মান্নাফ একটু জোরে প্রকাশ করছিল আবেগে কেঁপে কেঁপে।

জানো, একই পরিস্থিতি আমারও। আমি আগে কখনো এমন করে কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে আসিনি– আমি বাড়িতে একা থাকতে পারি না। মনে হয় তুমি আমার সঙ্গে আছো।

অ্যাই অ্যাই... গাড়োয়ান ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে দেয়। বাবু, গঙ্গার ধারে এসেছি।

ঠিক আছে, আবদুল মান্নাফ দ্রুত নিচে নেমে হাত বাড়িয়ে দেয় কল্যাণীর দিকে। কল্যাণী বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নিচে নেমে আসে। আবদুল মান্নাফ ঘোড়ার গাড়িওলাকে ভাড়া দিয়ে দাঁড়ায় কল্যাণীর পাশে। সন্ধ্যার একটু আগে আগে গঙ্গার পাড়ে চলে এসেছে। চারদিকে নানা ধরনের মানুষ। এরাও এসেছে বৈকালিক ভ্রমণে।

চলো, গঙ্গার পাড়ে যাই, তাড়া দেয় আবদুল মান্নাফ।

চলো, আবদুল মান্নাফের সঙ্গে পা মিলিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু। দুজনে এসে দাঁড়ায় গঙ্গার পাড়ে। খাড়া তীরের নিচে গঙ্গা কত বিচিত্র গল্প আর ঘটনার সাক্ষী হয়ে বয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। গঙ্গার তীরে ছোট ছোট বেঞ্চের ওপর বিচিত্র ধরনের নাগরিক বসে বসে গল্প করছে, বাদাম খুঁটছে। থেকে থেকে বাদামওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, অ্যাই বাদাম, অ্যাই বাদাম।

বাদাম খাবে, মিনুকে জিজ্ঞেস করে মান্নাফ।

ঘাড় কাত করে মিনু, খাবো।

এই বাদামওলা? বাদাম দিয়ে যাও–

বাদামওলা বাদাম মাপতে থাকে। পাশেই নরম সবুজ ঘাস দেখে বসে পরে কল্যাণী, বাদামোর ঠোঙ্গা নিয়ে পাশে বসে আবদুল মান্নাফ। সূর্য ডিমের কুসুম রঙ ধরে নেমে যাচ্ছে গঙ্গার অথৈ জলের মধ্যে। জলের ওপর পড়ছে লাল আবিরের ঘন মিষ্টি ছায়া। সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে লঞ্চ স্টিমার ভেঁপু বাজিয়ে। মৃদু হাওয়ায় হাওয়ায় গোটা গঙ্গার তীর অবাক আনন্দে হাসছে।

আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে, বাদাম খুঁটতে খুঁটতে বলেন কল্যাণী রায় চৌধুরী। আমারও, মুখের বাদাম রেখে চিবুতে চিবুতে বলে আবদুল মান্নাফ। আমি কিছুক্ষণ আগেও ভাবিনি তোমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে এসে এভাবে গল্প করব, সময় কাটাব।

বাড়িতে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে গেছে, আপন মনে বলেন মিনু।

তোমার বাড়িতে?

হ্যাঁ। আজকে তো ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান আমাকে নিয়ে যেতে পারেনি। খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে শূন্য গাড়ি গেছে। মা জানিয়েছে বাবাকে, বাবা তো হুলুস্থুল বাড়িময় বাধিয়ে বসে থাকবে, নির্বিকার বলে কল্যাণী রায় চৌধুরী।

তোমার সমস্যা হবে না মিনু? নিমিষে গোটা পরিস্থিতি অনুধাবন করে ভেতরে ভেতরে খানিকটা ভয় পায় আবদুল মান্নাফ। ভারত জুড়ে চলছে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির রক্তাক্ত পালাবদল। কখন কোথায় কী ঘটে বলা মুশকিল। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়ের ক্ষমতার একটা প্রভাব আছে। ভদ্রলোক বড় বেশি সরকার ঘেঁষা, বদনাম আছে ইংরেজদের পক্ষের বলে। তিনি তো একটা কিছু করতেই পারেন। শেষে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কলকাতা এনে প্রেমের বলি হয়ে যাব?

না, সমস্যা কী হবে! আগেও দুবার বাড়ি যাইনি।

কেন? বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে চোখ বের হয়ে আসতে চায় আবদুল মান্নাফের। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

হাসেন কল্যাণী রায় চৌধুরী, ভয় পেও না। বাড়ির ইংরেজ তোষণ পরিস্থিতি ভালো লাগে না আমার। ভারতবর্ষের মাটিতে এখন ত্রিশ কোটি মানুষ অথচ সাত সাগর আর তেরো নদীর ওপার থেকে কয়েক লাখ সাদা চামড়ার ইংরেজ আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে পারছে? পারছে এই দেশের একদল পরজীবী মানুষের জন্যই তো। সেই পরজীবীদের একজন বিচারপতি রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়। সুতরাং তার সঙ্গে আমার একটা যুদ্ধ চলছেই। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায় বাড়িতে পার্টি দিলেন। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি, কেউ জানে না।

না জানিয়ে গেলে কেন?

আমার প্রতিশোধ।

বুঝলাম না, আবদুল মান্নাফ সত্যি সত্যি সামনে বসা এই লাস্যময়ী ললনাকে বুঝতে পারছে না। কী বলতে চায় মেয়ে? বাবা সমাজে রাষ্ট্রে সম্মানিত হয়েছে, পার্টি তো হতেই পারে। কিন্তু মেয়ে কেবল ইংরেজ দখলদারিত্বের কারণে পিতার এই গৌরব গ্রহণ করতে পারছে না!

আমার পবিত্র ভূমি ও মানুষ যাদের পায়ের নিচে খাবি খায় প্রতিমুহূর্তে সেই হায়েনাদের দেওয়া সামান্য উপঢৌকন কেন গ্রহণ করতে হবে? সারা বাড়িতে উৎসব, বাবাকে মালা পরায় শত শত মানুষ। তিনি হাসিমুখে মালা নিচ্ছেন অথচ বুকের মধ্যে খচখচ করছে একমাত্র এই আয়োজন অস্বীকার করে বাড়ি ছেড়েছে। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দেয় কল্যাণী রায় চৌধুরী।

পরে কী হলো?

কী আর হবে? সারা কলকাতায় খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ, অবশ্য গোপনে। কেননা, সমাজের সবাই জেনে গেলে রায়বাহাদুরের মানসম্মান থাকবে? কিন্তু আমাকে পাবে কোথায়? আমি দুদিন পরে বান্ধবীর বাড়ি থেকে চলে আসি। রায়বাহাদুর প্রায় মাসখানেক আমার সঙ্গে কথা বলেননি। কিন্তু আমি ঠিক করে নিয়েছি।

তো আজকে কী করবে? বাড়ির সবাই তোমাকে নিয়ে ভাববে তো!

ভাবুক মান্নাফ, আমি বাড়িতে হাঁফিয়ে উঠেছি। বাঁধাধরা নিয়ম আমার ভালো লাগে না। এই যে সন্ধ্যার প্রগাঢ় আলো ছায়ায় বসে আছি তোমার সঙ্গে, আমার শ্রেষ্ঠ সময়। তুমি আমাকে নিয়ে কী ভাবছ? প্রশ্ন করে তাকিয়ে থাকে কল্যাণী রায় চৌধুরী।

আমি তোমাকে নিয়েই জীবন সাজাতে চাই মিনু, নির্বিকার নিজেকে প্রকাশ করে আবদুল মান্নাফ। সত্যি বলছ তো?

একেবারে সত্যি। কিন্তু সমস্যা অনেক আমাদের সামনে–

কী কী সমস্যা?

তুমি বুঝতে পারছ না? প্রশ্ন করে মান্নাফ। আমার ধারণা সম্যাগুলো তুমি ভালোভাবেই জানো।

প্রথম সমস্যা আমাদের দুজনের ধর্ম।

রাইট। ধর্ম আমাদের সামনে বড় বাধা।

বুঝতে পারছি। দ্বিতীয় সমস্যা?

রাজনীতি। উপমহাদেশের মুসলমানের রাজনীতি বেয়াড়াভাবে গতি পরিবর্তন করছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই সম্পর্ক রাজনীতির ওপর কোনো প্রভাব তৈরি না করে।

তৃতীয় সমস্যা?

আমার বাপ-মা কীভাবে নেবে, সেটা জানা।

জানার চেষ্টা করো। আমি তোমার হাত ধরে চলে আসব বাড়ি ছেড়ে...। কলকাতার গঙ্গার পাড়ে সন্ধ্যা অতিক্রম করে রাত নেমে এসেছে অনেক আগেই। আশপাশের মানুষজন অনেকবার জায়গা পরিবর্তন করেছে, নতুন মানুষ এসেছে। কিন্তু গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর আবদুল মান্নাফ আর কলকাতার নৈহাটির রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণী রায় চৌধুরী সামনে দিন ও রাত একাকার। দুজনে একটা অসম্ভব স্বপ্ন ট্যানেলের মধ্যে হাঁটছে, হাঁটছে আর হাঁটছে। সামনে দেখতে পাচ্ছে ঘন কুয়াশার মধ্যে দুটি সাদা অশ্ব। অশ্ব দুটো দৌড়াচ্ছে না মাটিতে পা রেখে, অশ্ব দুটো উড়ে চলেছে হাওয়ায় হাওয়ায়। সেই অশ্বদ্বয়ের আরোহী কল্যাণী রায়

চৌধুরী আর আবদুল মান্নাফ। মাটির পথে অশ্ব দুটো উড়ছে না, উড়ছে কলকাতার পাড়ের গঙ্গা নদীর প্রবহমান পানির ওপর দিয়ে, ধুলো উড়িয়ে নয়, জলের শিশির ছিটিয়ে।

রাত আটটা বাজে মিনু, চলো তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই!

চলো! হাত বাড়ায় মিনু।

হাত ধরে আবদুল মান্নাফ, তোমার হাত দুটো ভীষণ নরম।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ায়, তোমার হাতটা ততোধিক শক্ত। আমি এমন শক্ত একজোড়া হাত চাই।

গ্রামে থাকার সময়ে আমার কৃষক পিতার সঙ্গে আমি হালচাষ করেছি, তখন হাত দুটো লাঙলের হাতল ধরার কারণে। সেই লাঙলের হাতল ধরা হাতে জীবনে প্রথম কোনো মেয়ের হাত ধরেছি মিনু।

ছাড়বে না তো কখনো?

কখনো না।

সত্যি বলছ তো মান্নাফ?

সত্যি বলছি মিনু। তোমাকে ছাড়া আমার একটি দিনও চলবে না, প্রবল আবেগে কাঁপছে আবদুল মান্নাফের গলা।

আমিও, কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু শক্ত করে হাতটা ধরে আবদুল মান্নাফের। তোমার সঙ্গে সারাটা জীবন থাকতে চাই।

কিন্তু!

কিন্তু কেন?

আমার বাবা-মা তো মানবে না মিনু। ওনাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, শতসহস্র বছরের সংস্কার আর মানসিক বন্দিত্বের কারণেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে মন। আমি জানি, তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছ কিন্তু...

কী বলছ তুমি? কেন মানবে না?

অন্য ধর্মের মেয়েকে বউ হিসেবে আমার বাবা-মা গ্রহণ করবে না। কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নেই মিনু। তুমি হিন্দু না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান– আমার কিছু যায় আসে না। আমি কল্যাণীকে চাই। এখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও।

আমারও কোনো সমস্যা নেই মান্নাফ। ধর্ম, যে কোনো ধর্মই হোক আমার কাছে আচার মাত্র, মনের মধ্যে যে ধর্ম বাস করে সেটাই প্রকৃত ধর্ম। আমি সেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমার সঙ্গে থাকব।

কিন্তু আমার একটা সমস্যা আছে–

কী সমস্যা?

আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। জানো তো বাঙালির ঘরের প্রথম সন্তানের ওপর অনেক দায়িত্ব থাকে। অনেক আশা ভরসা করে থাকেন। ভাবেন, ছেলের বউ হবে...

মান্নাফ, আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে তো বলেছি, ধর্ম আমার কাছে আচার। ভেতরের মনুষ্যত্বই আসল বা প্রকৃত। আমি সেই ধর্মের সঙ্গে, আমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই। আমি প্রয়োজন হলে ধর্ম ত্যাগ করে তোমার ধর্ম গ্রহণ করব।

রাতের গঙ্গার তীর, কলকাতার আকাশ হঠাৎ রঙে রঙে রঙিন রঙ ধারণ করে উছলে উঠতে শুরু করেছে, অনুভব করে আবদুল মান্নাফ। হিন্দু ধর্মের একজন নারী কেবল ভালোবাসার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে চাইছে, কত বড় ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে! আবদুল মান্নাফের গোটা শরীর মন আকুলতায় ডুবন্ত আকুলতা অবাক শিহরনে দ্রিম দ্রিম নাচছে।

তুমি এত বড় ঝুঁকি নেবে?

নিয়েছি তো মনে মনে, আমি জানতাম এই ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পরপরই অনেক ভেবেছি। সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি– যা হওয়ার হবে, আমি বাঙালের সঙ্গেই থাকব। এখন যা করার তুমি করো।

বুকের ওপর থেকে বিরাট পাথর নেমে যায় আবদুল মান্নাফের। হাত ধরে কল্যাণীর, তুমি খুব সুন্দর!

লজ্জায় ডুবে যায় কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু,পাগল একটা!

চলো, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি, অদূরে অপেক্ষারত ঘোড়ার গাড়ির একটা গাড়োয়ানকে হাত ইশারায় ডাকে।

এগিয়ে আসে ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির দিকে যেতে যেতে মান্নাফের দিকে তাকায়, তোমাকে যেতে হবে না। আমি কলকাতার অলিগলি চিনি।

চেনো, কিন্তু এখন থেকে আমার দায়িত্ব তোমাকে পৌঁছে দেওয়া। তোমার সঙ্গে আমি আমার সঙ্গে তুমি– দুজনে মিলে একটি সূত্র, বুঝেছ? বলতে বলতে আবদুল মান্নাফ গাড়িতে উঠে বসে হাত বাড়ায় কল্যাণীর দিকে। কল্যাণীও হাত বাড়িয়ে দেয়। ধরে মান্নাফ। উঠে মান্নাফের পাশে বসে কল্যাণী। গাড়ি চলতে শুরু করে নৈহাটির দিকে। রাতের কলকাতায় ছুটে চলছে ঘোড়ার গাড়ি। কতবার, কতভাবে মহিমচন্দ্র রায়ের মেয়ে কল্যাণী রায় চৌধুরী কলকাতা শহরের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়িতে মোটরগাড়িতে ঘুরেছে, এখানে ওখানে হোটেলে খেয়েছে, বাড়ি ফিরেছে, আজকেও ফিরছে কিন্তু কত ব্যবধান, কত পার্থক্য– দুই ফেরায় বা যাত্রায়! সে এখন একক নয়, দ্বিসত্তার মিলিত প্রবাহে অনন্য সূত্র নির্মাণ হয়েছে মনের ও যৌবনের জাদুঘরে। তিনি পাশে বসা আবদুল মান্নাফের হাতটা ধরেন, আজকের সময়টা একেবারেই অন্যরকম!

সত্যি, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিনু, তুমি আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। যাচ্ছি ঘোড়ার গাড়িতে করে তোমার বাবার বাড়ির দিকে, কী অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে। এতদিন শুনেছি অন্যদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা, কিন্তু আজকে ঘটল আমাদের জীবনে। তোমার মতো আমার মনের মধ্যেও ঝড় বইছে আবেগের, সুরের, ভালোবাসার সাত রঙের।

আমি কিন্তু বিয়ের পর তোমার গ্রামের বাড়ি যাব।

গ্রামের বাড়ি যাবে?

হ্যাঁ।

কেন?

পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন ও জীবনাচার দেখার আগ্রহ খুব আগ্রহ আমার। হাজার হাজার বছর ধরে পালাক্রমে যে জীবনের মানচিত্র বহন করছে পূর্ব বাংলার মানুষ, সেই জীবনের সংবেদন আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। আর আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করব না?

নিশ্চয়ই নিয়ে যাব, তার আগে বিয়েটা আমাদের কলকাতাতেই সারতে হবে।

কলকাতাতে কেন?

গ্রামে বিয়ে করতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে। মানুষের মুখে নানা ধরনের প্রথা আর কুসংস্কারের কুৎসা রটনা করে নৃত্য করবে, ওদের সেই সুযোগ দেওয়া যাবে না।

যা ভালো মনে করো, করবে।

স্যার, নৈহাটির রাস্তায় এসেছি, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান হাঁক দেয়, কোথায় থামব?

আবদুল মান্নাফ আর কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু দুজনার মধ্যে এতটাই মগ্ন ছিল, কখন কলকাতার প্রধান সড়ক পার হয়ে নৈহাটিতে প্রবেশ করেছে গাড়ি। রাস্তার দিকে তাকায় কল্যাণী, বাড়ির কাছেই এসেছে। আমি নেমে যাই। তুমি এ গাড়ি নিয়ে কলকাতা ফিরে যাও। আগামীকাল বাকি কথা হবে। ঠিক আছে, আবেগে আক্রান্ত আবদুল মান্নান চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে একটা চুমু খায় কল্যাণী কপালে। কল্যাণী বিস্ময়ে বিপন্ন। শরীর কাঁপছে থরথর। কী করবে, কীভাবে নিজেকে সামলামে বুঝে উঠতে পারে না। পূর্ব বাংলার বাঙাল যে এমন ডাকাত, বুঝেছিল আগেই। কিন্তু এই সময়ে এইভাবে...। নিজেকে সামলে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে যায়

কল্যাণী মিনু। গাড়োয়ান ঘোড়ার গাড়ি ঘুরিয়ে আবার চলতে থাকে, কলকাতার দিকে।

ঘটনার দুটি রূপ, ভাঙন ও গড়ন। একদিকে ভাঙে নদীর, বিপরীতে গড়ে। কলকাতার বনেদি পরিবারের কন্যা কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনুর ঘটনাও ছড়িয়ে পড়ে, প্রথমে নিজের ঘরে, পরে বাইরে এবং ঘরে ঘরে। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায় ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়, বিস্মিত। তিনি স্ত্রী মাখনমতিকে ডাকেন। মাখনমতি প্রচলিত সনাতন ধর্মের এক নিষ্ঠাবান পূজারি। তিনি ভেবে পান না, আমার পেটের কন্যা কেমন করে এমন দুঃসাহসী কাজ করার সাহস পায়?

তোমাকে বলেছিলাম, এই মেয়ে সংসারে না, আমার তিলে তিলে গড়া জীবনে সর্বনাশের বজ্র হয়ে আসবে। আমার কথা ঠিক হলো তো? বলেছিলাম, ম্যাট্রিক পাস করেছে, করুক। আর প্রয়োজন নেই। না, মেয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বাইরের মানুষের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মেয়েকে বাড়ির বাইরে কলেজে পাঠালে, চাকরিতে পাঠোলে, এখন এই অপমানের দায় কে নেবে?

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের শিক্ষক মাখনমতি দেবী কী জবাব দেবেন? শরীরের মধ্যে প্রাণমন জীবনের সকল বোধ নিয়ে পাথরের মমতায় দাঁড়িয়ে আছেন। গতকাল থেকে বাড়িতে কোনো রান্না নেই। খাওয়া নেই। বিচারপতি ছুটি নিয়ে বাসায় নিজের রুমের মধ্যে চুপচাপ বসে আছেন আর থেকে হা-হুতাশ করছেন।

বুঝলে আমার মূল সর্বনাশ করেছে বাইরের তিনজন আর ঘরের তুমি।

আমি কী করলাম?

ডা. বিধানচন্দ্র রায়, ড. সুনীতিকুমার মুখার্জি আর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে দিয়ে আমার কাছে মেয়ের লেখাপড়ার বিষয়ে সুপারিশ করাওনি? করিয়েছি, কারণ আমিও চেয়েছি মিনু বড় মেধাবী ছাত্র। আমি স্কুলের শিক্ষক, মেয়ে লেখাপড়া করতে চায়, আমি না করি কীভাবে? তুমিই তো চাওনি, ম্যাট্রিকের পর বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। সেটা যদি জোর করে করতাম, হয়তো আমার বিরুদ্ধে কুৎসা হতো কিছুদিন, কিন্তু আজকের ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। আমার কী ইচ্ছে করছে জানো? হয় আমি আত্মহত্যা করি নয়তো তোমার আদরের কন্যাকে পিটিয়ে মেরে ফেলি। তিনি রুমের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলেন, আমার বৈঠকখানায় ওরা আসত, গল্প করত, সেই ফাঁকে জানিয়ে দিলে, আমি রক্ষণশীল, আমি আমার মেয়ের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে। ইস! কী ধরনের তাস তুমি আর তোমার মেয়ে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে? পায়চারি করতে করতে বিচারপতি দাঁড়ান স্ত্রী মাখনমতি দেবীর সামনে, মেয়েকে রক্ষা করার জন্য কলেজে যেতে দিলাম কিন্তু বাধ্য করলাম ঘোড়ার গাড়ি কালো কাপড়ে ঢেকে যাবে। মেয়েও গেল, হাসি পাচ্ছে আমার, কিন্তু আমার মেয়েকে কি আমার সনাতনে রাখতে পারলাম? হায় ঈশ্বর আমি এখন কী করব?

দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ান বৃদ্ধ রায়হাবাদুর বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়। পিছন থেকে স্বামীকে আঁকড়ে ধরেন মাখনমতি দেবী, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তো চেয়েছিলাম আমার মেয়ের মেধা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। ওর দ্বারা মানুষের কল্যাণ হোক। নামও তো রেখেছিলাম– কল্যাণী। কিন্তু ও যে এমন রাক্ষসী হয়ে আমাদের জন্য অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে আসবে, তুমিও যেমন জানতে না, আমিও জানতাম না।

কত বড় বড় পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, কী বলেছে, লেখাপড়া শেষ করে বিয়ে করব। এখন সে বিয়েটাই করছে কিন্তু লেখাপড়াটা তো শেষ করল না, হাহাকারে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়। মতি, আমি ওইসব পরিবারের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? ওরা আমাকে দেখলে ব্যঙ্গ করবে, বলবে, কী খবর রায়বাহাদুর সাহেব, মেয়েকে তো যবনের হাতে তুলে দিলেন। নিশ্চয়ই অনেক দামি দামি উপহার পেয়েছেন? বলো মতি, আমি কী করে বাঁচব? হু হু কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। স্বামী মহিমচন্দ্র রায়কে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদছেন কল্যাণীর মা মাখনমতি দেবী।

তিন দিন আগে রাত করে বাড়ি ফেরায় মেয়েকে অনেক বকেছেন বিচারপতি মহিমচন্দ্র রায়। বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, এত রাতে একা একা বাড়ি ফিরছ, কোথায় ছিলে?

কল্যাণী খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেয়, গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম বাবা।

হতভম্ব বিচারপতি মহিমচন্দ্র, এত রাতে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে?

কেন?

গঙ্গার ধারে কলকাতার মানুষ কেন যায়?

রাগে ফুঁসছেন তিনি। নিজেকে সংযত করে পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন যায়?

হাওয়া খেতে।

তুমিও হাওয়া খেতে গিয়েছিলে?

মাথা নাড়ান কল্যাণী, জি।

মাখনমতি দেবী এবং বাড়ির সকলে দরজার আড়ালে বা সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। কল্যাণী সব সময়েই একরোখা, আবেগী সঙ্গে সঙ্গে প্রবল সাহসীও। কোনো কিছু পরোয়া করে না ও। কিন্তু পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একের পর সওয়াল জবাব করা দেখে ও শুনে ভেতরে ভেতরে সবাই ভয়ে সেঁটিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সামনাসামনি নিষেধ করাও যাচ্ছিল না।

তুমি আমার মেয়ে, তুমি কলেজ থেকে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে এত রাতে একা বাড়ি ফিরলে–

একা না, আমার সঙ্গে কলেজের একজন সহপাঠী ছিল।

আমূল চমকে ওঠেন বিচারপতি রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়, আমার মেয়ে কলেজের একজন সহপাঠীর সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে রাত নটার সময়ে বাড়ি ফিরেছে! আমি কী জানতে পারি, তোমার সহপাঠীর নাম কী?

আবদুল মান্নাফ!

আবদুল মা...

মান্নাফ, পিতার উচ্চারণ ঠিক করে দেন কন্যা।

একজন মুসলমান ছেলের সঙ্গে তুমি গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম। কেন কী হয়েছে?

লোকে জানলে আমার মানসম্মান থাকবে?

কী আশ্চর্য বাবা, রাত-দিন তোমার কোর্টে, বাড়ির বৈঠকখানায় কত মুসলমান আসে। তাদের সঙ্গে তুমি গল্প করো, চা খাও, তাতে কিছু হয় না! আর আমি একজন মুসলমান ছেলের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে গিয়েছি, তাতে তোমার মানসম্মান যাবে?

নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রাখেন বিচারপতি, ছেলেটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

সময় হলে জানতে পারবে, আমি টায়ার্ড বাবা, পরে এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। পিতা মহিমচন্দ্র রায়কে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের রুমের দিকে চলে যায় কল্যাণী রায় চৌধুরী। মেয়ের পিছু পিছু আসেন মাখনমতি দেবী। মাকে দেখেই দরজা জুড়ে দাঁড়ান কন্যা, বলো মা।

এসব কী বলছিস তুই?

কী বলছি আমি?

সারা দিন বাসায় না এসে গঙ্গার ধারে একটা মুসলমান ছেলের সঙ্গে...

তুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যা শুনেছ, সবই সত্যি। কিন্তু মা এখন আমি ভয়ানক ক্লান্ত। রেস্ট নিই, পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

মাকে এক প্রকার জোর করে রুমের বাইরে ঠেলে বের করে দিয়ে

দরজা বন্ধ করেন কল্যাণী। বসে রুমের খাটে। সত্যি সত্যি শরীরটা সুখ অবসাদে ভেঙে আসতে চাইছে। বিছানার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিন কল্যাণী মিনু। কপালের ওপর ডান হাতটা চলে যায়। স্পর্শের জাদুতে শরীর শিউরে ওঠে কল্যাণীর, লোকটা দিনদুপুরের একটা মস্ত ডাকাত!

পরের দিন মেয়েকে তিনি অনেক বুঝিয়েছেন, মা তুই সর্বনাশ করিস না। ধর্ম বিসর্জন দিয়ে অন্য ধর্মের মানুষ বিয়ে করলে তোর বাবা আত্মহত্যা করবে, আমাকে জানিয়েছে।

সেটা বাবার ব্যাপার, জীবন আমার সিদ্ধান্ত আমার।

মারে, তুই কি সারাটা জীবন তোর মতো চলবি? আমার কথা, তোর বাবার কথা ভালো লাগে না?

কথা তো ভালো লাগার নয় মা, কথা হলো অনুভবের, নিজেকে প্রকাশের। আমি আমাকে আমার মতো প্রকাশ করতে চাই।

তুই কি ওই ছেলেটাকে বিয়ে করবি?

ইচ্ছে আছে!

মেয়ের কথায় মাখনমতি দেবী নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে। জন্ম দিয়ে, আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে এই কালসাপ পুষেছিলাম? বাবা-মায়ের সম্মান বিসর্জন দিয়ে মেয়ে বিয়ে করতে চায় মুসলমান ছেলে? তিনি ভেবে পান না, কী আছে ছেলেটার মধ্যে? পূর্ব বাংলার মানুষ তো এমনিতেই অসংস্কৃতবান, অসামাজিক, চাষা। যাদের বলা হয় বাঙাল। সেই বাঙাল সমাজে জাত মান ধর্ম বাদ দিয়ে চলে যাবে একমাত্র সন্তান? কীভাবে মেনে নেবেন তিনি? কল্যাণী ছাড়া এই বাড়ি তো পাষাণপুরী। মেয়েটা যতক্ষণ বাসায় থাকে বাড়িটা জমজম করে নাচে। কত পরিকল্পনা করেছেন স্বামীর সঙ্গে, ভালো একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এই বাড়িতেই রেখে দেবেন মেয়ে জামাতাকে। অথচ মেয়ে উল্টো স্রোতে...

বুঝতে পারছেন, নিজের পেটের মেয়ে, আদরের মেয়ে– যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নড়ানো যাবে না। কোনোদিন নড়ানো যায়নি। কলকাতায় এই ধরনের দু-একটি ঘটনা মাখনমনি দেবী শুনেছেন– হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিয়ে। শুনেছেন, অবাক হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন কিন্তু অবাক ঘটনা, সেই গল্প এখন নিজের সংসারে, বেহুলার বাসরঘরের সাপ হয়ে ঢুকেছে কন্যা।

স্বামী-স্ত্রীর বেদনাবিধুর দৃশ্য যাপনের কালে কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের নাখোদা মসজিদের ইমাম, ইমামের সঙ্গে মুয়াজ্জিন, মুসল্লিরা আনন্দে হাসছেন। একজন হিন্দু নারী মুসলমান হয়েছে। কলেমা পড়ার পর ইমাম সাহেব কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনুর নাম রাখেন মমতাজ বেগম। বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার পক্ষে কন্যা ছাড়া কেউ না থাকলেও ছেলের পক্ষের সবাই কন্যার জন্য উৎফুল্ল। বিয়ে ও মোনাজাতের পর নবদম্পতি আগে থেকেই ভাড়া করে রাখা একটি বাড়িতে ওঠে।

ছয়

বিশিষ্ট নৃত্য ও অভিনয়শিল্পী রওশন জামিল বাসায় ঢুকেই সামনে পেয়ে যান পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে খুকুকে। খুকু নতুন জামাকাপড় ও জুতো পরে বাড়িময় ঘুরছে। খুকুকে দেখেই তিনি দুহাত বাড়িয়ে কোলে নেন, আদর করে জানতে চান, তোমার মা-বাবা কোথায়?

রওশন জামিল এসেছেন শুনেই বাসার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন আবদুল মান্নাফ, আপা কেমন আছেন?

হাসিমুখ রওশন জামিলের, আমি তো ভালো। সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী কই?

হাসেন আবদুল মান্নাফ। রওশন জামিল আর গওহর জামিল বাসায় এলেই মমতাজ বেগমকে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী বলে ডাকেন। দুই দম্পতির একই ঘটনা কিন্তু পাত্রপাত্রী উল্টো। পুরানো ঢাকার তরুণী রওশনকে নৃত্য শেখাতেন গনেশ নাথ। নৃত্য শেখাতে শেখাতে এবং শিখতে শিখতে জড়িয়ে পড়েন গভীর প্রেমে, দুজনে। প্রেম তো আর দুজনকে ছাড়ে না, লেগে যায় কাঁঠালের আঠার আনন্দে। শেষে পারিবারিকভাবে দুজনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের আগে গনেশ বাবু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলেন। নতুন নাম ধারণ করলেন গওহর জামিল। আর পুরনো ঢাকার বিশিষ্ট ওষুধের ব্যবসায়ী আবদুল করিমের কন্যা রওশন আরা করিম বনে গেলেন রওশন জামিল।

ওর তো আসার কথা, এসে পড়বে। আপনারা বসুন।

মমতাজ আজকে ছুটি নেয়নি? এ কেমন কথা, একমাত্র মেয়ের জন্মদিন!

পাশে দাঁড়িয়ে বলেন গওহর জামিল– তুমি বোধহয় জানো না নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলন নিয়ে খুব মিছিল হচ্ছে, হয়তো সেই কারণে মমতাজ আসতে পারেনি।

সেটা হতে পারে, কী একটা বদমাইশ সরকার, মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়, ফুঁসে ওঠেন রওশন জামিল। হারামজাদাদের ধরে লটকে দেওয়া দরকার।

বুঝলেন আপা, যারা সরকারে থাকে ওরা জনসাধারণ থেকে দূরে থাকে। জনগণের ভাষা বুঝতে পারে না। সেই কারণেই নিরপরাধ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ওদের যত আক্রমণ– বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী আরও বলেন, কিন্তু আমার শঙ্কা অন্যখানে!

কী আশঙ্কা আপনার? প্রশ্ন করেন রাজনীতিবিদ আজিজুল হক নান্না মিয়া।

খুকুর জন্মদিনকে ঘিরে আবদুল মান্নাফ ও মমতাজ বেগম মিনুর বাসায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। পাঁচ বছরের মিনুকে ঘিরে দুজনের সংসার। আবদুল মান্নাফ দয়াগঞ্জের ভাড়া বাসায় থাকেন সঙ্গে স্ত্রী মমতাজ বেগমও থাকেন। মাঝে মাঝে মমতাজ বেগম থাকেন মর্গান স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে তৈরি করা প্রধান শিক্ষকের বাসায়। স্কুলে কাজ করতে করতে অনেক সময় রাত হয়ে গেলে থেকে যেতে হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার বাইরে তিনি নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেন। শ্রমিক নেতা ইদ্রিস হোসেনের সঙ্গে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার সচেতন করে বক্তৃতা করেন। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা করেন, বোঝান। ফলে, তিনি নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের মধ্যেও পরিচিত, জনপ্রিয়। কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন সারাক্ষণ। মমতাজ বেগম মিনুর অভিমত, যেখানে মানুষ সেখানেই অধিকার বঞ্চিত মানুষ। সুতরাং লড়াই অনিবার্য।

দয়াগঞ্জের বাসায় অতিথিরা আসছেন, বসছেন। একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। রওশন জামিলের কোল থেকে নেমে খুকু ঘুর ঘুর করছে, মাকে খুঁজছে। মা বলেছিলেন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময়ে, বিকেলে না হলেও সন্ধ্যার পরপর চলে আসবেন।

আমার আশঙ্কা পাকিস্তান সরকার যদি পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর এই ধরনের অত্যাচার অব্যাহত রাখে, পূর্ব বাংলা ধরে রাখতে পারবে না।

চুপ চুপ! আঁতকে ওঠেন বিশিষ্ট আইনজীবী আবদুল সালাম খান। শোনেন, পাকিস্তানের চর কোথায় না কোথায় আছে, কেউ জানে না। সুতরাং চুপ থাকাই ভালো। আমরা এসেছি মমতাজের মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। কিন্তু মমতাজ না আসলে তো জমবে না। মান্নাফ, তোমার বউ না আসলে খাওয়াদাওয়া দাও। আমি থাকি আজিমপুরে। যেতে সময় লাগবে।

বসেন, গল্প করেন, রান্না প্রায় শেষের দিকে– যেখানে রান্না হয়, সেখান থেকে চিৎকার দিয়ে জানান দেন আবদুল মান্নাফ।

গওহর জামিল মিটিমিটি হাসতে বলেন, রান্নার ঘ্রাণটা তো দারুণ! কী রান্না হচ্ছে?

তোমার নাক তো খাবার ঘ্রাণের জন্য মুখিয়ে থাকে... তোমার আর খাবারের দরকার নাই, ঘ্রাণেই ভোজন।

রওশন জামিলের কৌতুকে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে।

রান্নার জায়গা থেকে ফিরে আসেন আবদুল মান্নাফ, বাবুর্চি ইরানি। ওর হাতে রান্না খুব সুস্বাদু হয়। আর ঘ্রাণে ভরে যায় এলাকা।

সবই বুঝলাম, কিন্তু খুকুর মা কোথায়? পুরনো ঢাকার সর্দার নাসিরউদ্দিন প্রশ্ন করেন, এই মেয়েটা সংসারের বাইরে অনেক সময় দেয় স্কুলে, সভা সমিতিতে। মমতাজ বেগমের মতো যদি আর দশজন নারী থাকত ঢাকা শহরটা পরিবর্তন করে ফেলতাম।

ঠিক বলেছেন, পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলেন আবদুল মান্নাফ। ও ভীষণভাবে মানুষমুখী একজন মানুষ। দিনরাত সাধারণ মানুষের কল্যাণ কীভাবে করা যায়, ভাবে। স্কুলের মেয়েদের কত ধরনের সমস্যার সমাধান যে করে, শুনলে অবাক হবেন।

শুধু সেটাই না, রওশন জামিল বলেন, গানের গলাটাও ভালো। আমি তো ওর গান শুনেছি, মিষ্টি গলা।

খুকুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের অতিথিরা খুকুকে উপহারসামগ্রী উপহার দিয়ে, খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব করে চলে যান রাত আটটার দিকে। খুকু বাপের সঙ্গে উপহারগুলো মায়ের পড়ার টেবিলের সাজিয়ে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ে। মনটা খুব খারাপ, মা এলো না কেন? মাকে তো পাই না। বাসায় থাকেন না বেশিরভাগ সময়। সময় কাটে বাপের সঙ্গে। আসুক মা, কথাই বলব না। চোখ ফেটে পানি আসে ওর, ছোট্ট খুকুর।

একুশে ফেব্রুয়ারি মমতাজ বেগম বা কল্যাণী রায় চৌধুরী মিনু ও আবদুল মান্নাফের একমাত্র কন্যার জন্মদিন। কিন্তু মমতাজ বেগম মিনু কোথায়? তিনি নারায়ণগঞ্জে রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করার পর অন্যদের বক্তৃতা শুনছেন। বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন, মেয়েদের ঠিকঠাক বাসায় পৌঁছানো দরকার। সভার বাইরে এসে ছাত্রীদের ডেকে একে একে বাসায় পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। বললেন, বাসায় কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন উঠলে, আমার নাম বলবে। কেমন? কোনো ভয় পাবে না। আমি তো আছিই।

মেয়েরা ঘাড় নাড়ায়, ঠিক আছে আপা।

মর্গান স্কুলের মেয়েদের বাসায় পাঠিয়ে আবার ফিরে এসে বসলেন আবুল হাশিমের পাশে। বক্তারা একের পর এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন। ঢাকায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমতলায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। মারা গেছে বেশ কয়েকজন। নাম জানা গেছে দুজনের, একজন আবদুল জব্বার, অন্যজন আবুল বরকত। ভাষার মিছিলে গুলি? রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের সামনে জড়ো হওয়া মানুষের ঢেউ ক্রমাগত বাড়ছে, আর বাড়ছে। মমতাজ বেগম জনতার মুখের ওপর ক্রোধ ও প্রতিশোধের অগ্নিকুণ্ড দেখতে পান। বুঝতে পারেন, কোনোভাবেই এই জাতি পরাভব মানবে না।

রাত প্রায় আটটার দিকে জনসভা শেষ হয়। ঢাকা থেকে খবর আসছে– পুলিশ ধরপাকড় চালিয়ে যাচ্ছে। আরও একজনের নাম মাইকে ঘোষণা করা হলো, এই মাত্র জানতে পারলাম ঢাকায় মেডিকেল কলেজের সামনে ভাষার জন্য আর একজন শহীদ হয়েছে। আমাদের সেই শহীদ ভাইয়ের নাম আবদুস সালাম।

সঙ্গে সঙ্গে জনসভার মধ্যে উন্মত্ততার স্লোগান ওঠে, রাষ্ট্র ভাষা রাষ্ট্র ভাষা– বাংলা চাই, বাংলা চাই। নূরুল আমিনের-নূরুল আমিনের– কল্লা চাই, কল্লা চাই। তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা। রক্ত চাই, রক্ত চাই– রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই...। তুমুল স্লোগানের পর স্লোগান, নারায়ণগঞ্জের মাটি স্লোগানে স্লোগানে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

নারায়ণগঞ্জ অগ্নিকুণ্ডময় এক টুকরো পূর্ব বাংলা। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নেতারা– খান সাহেব ওসমান আলী, আজগর আলী, জালালউদ্দিন, এ কে শামসুদ্দোহা, মুস্তাফা সারওয়ার, নুরুল ইসলাম মল্লিক, শফি হোসেন খান, লুৎফর রহমান, জানে আলম, এম এইচ জামিল, বাদশা মিয়া, নাজির হোসেন, সুলতার মোহাম্মাদ, মুস্তাফা মনোয়ার, মশিয়ার রহমান, নিখিল সাহা, জালাল আহমেদ দুলু, সুবিমল গুহ, আবু বকর, আবদুল মোতালিব, রুহুল আমিন, আফেন্দি হাদীস মোল্লা, আট বছরের বালক মোসলেহউদ্দিন– বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, রাত হয়ে যাচ্ছে গভীর। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত প্রত্যেকে। বিশ্রাম নেওয়া দরকার পরের দিনের আরও আন্দোলনের জন্য। সুতরাং সভা এখানেই আজকের মতো শেষ।

ঢাকা থেকে আসা বর্ষীয়ান নেতা আবুল হাশিম তো জায়গা ছেড়ে যেতেই যান না। কিন্তু শরীরে কুলাচ্ছে না। পাশে বসে আছেন মমতাজ বেগম মিনু। একসময়ে মিনু হাত ধরে তোলেন আবুল হাশিমকে, চলুন চাচা আপনাকে গাড়িতে তুলে দিই।

শিশুর মতো হাসেন তিনি, তুমি যখন বলছ তখন তো যেতেই হয়। মমতাজ বেগমের হাত ধরে দাঁড়ালেন আবুল হাশিম। ধরে ধরে হাঁটিয়ে অদূরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেলেন মমতাজ। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলে ধীরেসুস্থে তিনি গাড়িতে বসলেন, তাকালেন ঘিরে থাকা নেতাদের দিকে, তোমরা এই মেয়েটার দিকে খেয়াল রেখো। পাকিস্তানের সরকার এই মেয়েটাকে ছাড়বে না।

ঝুঁকে আসেন খান সাহেব ওসমান আলী, আপনি চিন্তা করবেন না। মমতাজ আমাদের অহংকার। ওর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে আজ প্রথম নারী মিছিল হলো। ঘরের মেয়েদের বাইরে টেনে আনল, দুর্জয় সাহসের কাজ।

আমার ভয়টা সেখানেই, সরকারের চর সব জায়গায়ই আছে। আমার ধারণা, সেই চরদের খবরের ভিত্তিতে তোমাদের ওপর নির্যাতন চালাবেই, এ মেয়েটাকেও ছাড়বে না, বলেন আবুল হাশিম। তাকান সামনের দিকে, ড্রাইভার চলো।

আবুল হাশিম চলে যাওয়ার পর উপস্থিত নেতারাও একে একে বাসার দিকে চলে যান। মুস্তাফা সারওয়ার, মুস্তাফা মনোয়ার, খান সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন মমতাজ বেগমকে ঘিরে। মমতাজ বেগমের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন খান সাহেব, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা আছি আপনার সঙ্গে।

হাসেন মমতাজ বেগম মিনু, জানি আমি। আপনারা আছেন বলেই সাহস পাই।

আপনে ভয় পাবেন না আপা, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আবুল হাশেম মোল্লা পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বাস দেন, আপনার কিছু হলে নারায়ণগঞ্জে আগুন জ্বালিয়ে দেব। আপনে বাসায় যান– আমরা আপনার লাখো ভাই।

মমতাজ বেগম হাসেন। শান্তি ও সাহসের সৌরভ বুকে নিয়ে রিকশায় ওঠেন তিনি। নারায়ণগঞ্জের রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট থেকে মর্গান গার্লস স্কুলের দূরত্ব বেশি নয়। রাস্তার এক পাশে লাইটপোস্ট থেকে মৃদু আলো আসছে। পাশে দাঁড়ানো বিচিত্র ধরনের লম্বা গাছপালা। মৃদু আলো ও ছায়ার মধ্যে রিকশা চলতে চলতে মমতাজ বেগমের মনে পড়ে খুকুকে। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মেয়েটা পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকেই যে ভাষা আন্দোলনের এমন পরিস্থিতি ঘটবে, জানতেন না। ঘটনা যখন ঘটে তখন কিছু করার থাকে না। মান্নাফের ওপর ভরসা আছে। মেয়ের জন্মদিনটাকে বড় করে পালন করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে এটাও চেয়েছিলেন পরিচিতজনদের নিয়ে একটা গেট টুগেদার। খুকুর জন্মদিনটাকে সামনে রেখে সবাই মিলে আড্ডা গল্প করে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে মমতাজ বেগমের।

রিকশা থামে স্কুলের সামনে। নেমে ভাড়া দিতে গেলে রিকশাঅলা বলে, মা ভাড়া লাগবে না।

হতভম্ব মমতাজ বেগম, কেন?

মা, আমরা মুখ্য মানুষ। রাজনীতি তেমন বুঝি না। তয় বুঝি, ভাষার লাইগা আপনেরা লড়াই করেতেছেন। আমিতো মিছিলে যোগ দিতে পারি না, রিকশা ছাইড়া। রিকশার ভাড়াটা আপনারে উপহার দিলাম। আপনের বক্তৃতা হুনচি, খুব ভালা কইছেন।

নিজের আবেগ আটকে রাখতে পারছেন না মমতাজ বেগম। চোখ ফেটে পানি আসছে কিন্তু তিনি চাইছেন না, রিকশাঅলার সামনে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করাই উত্তম, মানেন তিনি। কিন্তু রিকশাঅলার ভাড়াটাও দিতে চান। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, আপনি ভাড়া না নিলে আমি কষ্ট পাব।

আধো আলো আঁধারির মধ্যে হাসেন রিকশাঅলা, একটু কষ্ট পান মা জননী। জোরে প্যাডেল চালিয়ে রিকশাঅলা দ্রুত চলে যায়। বিশাল বৃক্ষের শক্তি নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ মমতাজ বেগম। গেটের দারোয়ান বৃদ্ধ গণেশ দাশ গেট খুলে দেখছিলেন। মমতাজ বেগমের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে কাশি দিলেন। গণেশের কাশিতে নিজের মধ্যে ফিরে আসেন, আপনি রিকশাঅলাকে চেনেন?

না, শহরে কত রিকশাঅলা, কেমনে চিনুম? আপনে ভেতরে আসেন। অনেক রাইত হইচে।

হ্যাঁ, অনেক রাত, নিজের মুখে শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে করতে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকেন মমতাজ বেগম মিনু। গণেশ গেট বন্ধ করে হাঁটতে থাকে মমতাজ বেগমের পিছু পিছু।

মা!

ঘুরে দাঁড়ান মমতাজ বেগম। কিছু বলবেন কাকা?

স্কুলের ফয়জুল কবির স্যার আর দপ্তরি মেসবাহ আইছিলেন। বাইরেও দুই তিন লোক ছিল। সবাই মিলে বারান্দায় বইসা আলাপ করছে।

মমতাজ বেগম বুঝতে পারেন, গৃহের মধ্যে সাপ লেজ পাকাচ্ছে। প্রশ্ন করেন, কিছু শুনেছেন আপনি?

না মা জননী, আমি দুই একবার কাছে গেলেই ওরা কথা থামাইয়া দিয়েছে। একবার পানি দিতে বলেছিল। পানি দিতে গেলে ওরা অন্য গল্প করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, সব আপনার বিরুদ্ধে বলছে।

ঠিক আছে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

আচ্ছা। গণেশ চলে যায়।

ব্যাগের ভেতর থেকে চাবি বের করে তালা খুলে রুমে ঢুকে আলো জ্বালান। ক্লান্ত লাগছে খুব। বাথরুমে ঢুকে হাত পা ধুয়ে বিছনায় বসেন মমতাজ বেগম। টেবিলের ওপর খুকুর একটা ছবি। ছবিটা হাতে নিয়ে তিনি হাত বুলাতে থাকেন, মনে হচ্ছে, ছবিটা এখনই কথা কয়ে উঠবে।

মা, তুমি আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও এলে না, আধো আদুরে কণ্ঠ ভেসে আসে ছবির ভেতর থেকে, বাসায় কত্তো মেহমান এসেছিল, সবাই তোমার নাম বলেছে। তুমি এলে না কেন? যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। একটাও না। আড়ি...।

সাত

সন্ধ্যার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সচিবালয় থেকে বাসায় পৌঁছে কেবল পাঞ্জাবি খুলে মাথায় অবস্থিত জিন্নায় টুপিতে হাত দিয়েছেন, চিৎকার করে ওঠে লাল টেলিফোন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রী মরিয়ম বেগমের হাতে পাঞ্জাবি দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে লাল টেলিফোনের রিসিভার হাতে নেন, হ্যালো?

স্যার, আমি নারায়ণগঞ্জের মহকুমা পুলিশ সুপার আমিনউদ্দিন। আমিনউদ্দিনের গলা কেঁপে যাচ্ছে, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগে কখনো কথা বলেননি। আর জয়েনও করেছেন মাত্র দেড় মাস আগে।

হ্যাঁ বলো।

স্যার নারায়ণগঞ্জে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

বিরক্তির সঙ্গে বলেন, জানি সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ভাঙচুর হয়েছে। এমনকি আমার কল্লাও চেয়েছে। তোমার কাছে নতুন কিছু থাকলে বলো। সারা দিনের ধকলে আমি ক্লান্ত।

দুঃখিত স্যার, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য, কিন্তু উপায় ছিল না। আমিনউদ্দিন অফিসে বসে জিহ্বা চাটে। গলা শুকিয়ে আসছে।

আসল কথা বলো, আগে বলো তোমার নাম কী?

নাম জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে আমিনউদ্দিনের পালপিটিশন বেড়ে যায়। কোনো অন্যায় করলাম নাকি? নাকি মহকুমা প্রশাসককে দিয়ে ফোন করালে ভালো হতো? কিন্তু খবরটা আমি দিয়ে কাছে আসার চেষ্টা করাটা বা সরকারের প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করাটা কি মুখ্যমন্ত্রী স্যার মেনে নিতে পারেন নাই?

কী হলো, তোমার নাম বলো।

আমিনউদ্দিন স্যার।

ওকে, তুমিও আমিন, আমিও আমিন। বলো নারায়ণগঞ্জের ঘটনা কী?

মমতাজ বেগম–

মমতাজ বেগম? কোন মমতাজ বেগম?

স্যার মহিলা আসলে হিন্দু!

স্ত্রীকে ইশারায় চলে যেতে বলে চেয়ারে বসেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, কী আবোলতাবোল বলছ? নাম বলছ মমতাজ বেগম, আবার বলছ হিন্দু।

জি স্যার, হিন্দু ছিলেন কিন্তু একজন মুসলমানকে বিয়ে করে মুসলমান হয়েছে। উনি নারায়ণগঞ্জের মর্গান গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার।

তো কী হয়েছে তাতে?

স্যার ওই মহিলা আজ বিকেলে নারায়ণগঞ্জে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে বিরাট মিছিল করেছে।

কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। ইসলামি পাকিস্তানে মহিলারাও মিছিল করেছে? এই খবর যদি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, করাচির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানতে পারে, ক্ষমতার তখত মুহূর্তে উড়ে যাবে নরকের পাদদেশে। বিপদটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে প্রশ্ন করেন, মিছিলে কতজন নারী ছিল?

স্যার, প্রায় দুইশত ছিল।

দুইশত নারী?

জি স্যার।

ওদের মাথায় ঘোমটা ছিল?

না স্যার।

ওদের নেতৃত্ব কে দিয়েছে?

ওই যে স্যার মমতাজ বেগম, হিন্দু মহিলা।

মিছিল শেষ হয়েছে কখন?

স্যার মিছিল তো জনসভায় যোগ দিয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই– এ দাবিকে বিরাট মিছিল আর জনসভা হয়েছে। আমি স্যার রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছি। রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

গুড, মিছিলে আমার কল্লা চায় নাই?

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা পুলিশের প্রধান আমিনউদ্দিন টেলিফোনের ওপাশে নির্বাক। বেচারার অবস্থা ছেড়ে দে মা কাইন্দা বাঁচি। মনে মনে নিজের গালে নিজের হাতে নিজের পায়ের জুতো মারছে, ক্যান ফুটানি কইরা আমি ফোন করতে গেলাম? এসডিওকে দিয়ে করালেই হতো!

আমিনউদ্দিন?

জি স্যার, খুক খুক কাশি আসে আমিনউদ্দিনের।

ভয় পাচ্ছো কেন? পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই যত মিছিল মিটিং হয়েছে, সব মিছিল মিটিং থেকেই জনগণ আমার কল্লা চেয়েছে? হাসেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন– ভেবে দেখেছ আমার কল্লার কত দাম? মূলত আমি জানতে চাইছি নারায়ণগঞ্জে আমার কল্লার দাম উঠেছে কি না!

১৯৪৮ সালে আমিনউদ্দিন ছিলেন পুলিশের এসআই। কিন্তু ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে কপাল খুলে যায়। হিন্দু পুলিশরা ওই পারে হিজরত করার পর পুলিশের অনেক পদ খালি হয়ে যায়। শূন্য পদ পূরণ আর নতুন সরকার চালাবার জন্য নিচের দিকে পদগুলো দ্রুত উন্নত হতে থাকে। সেই উন্নত হওয়ার সুযোগে এসআই আমিনউদ্দিন প্রমোশন পেয়ে পেয়ে, বড় বড় স্যারদের পিছনে হাত কচলে কচলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এসডিপিও হয়ে গেছেন। বড় বড় স্যার, মন্ত্রীদের কীভাবে সামলাতে হয়, জানেন না। আবার মুখ্যমন্ত্রীকে সামলানো? কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সরস আলাপে আমিনউদ্দিন ভীষণ মজা পান।

জি স্যার, আপনার কল্লাও চাইছিল মিছিল থেকে।

শুনে ভালো লাগল। এখন আমাকে বলো, জনসভায় লোকজন কেমন হয়েছিল? হাজার পাঁচেক?

না স্যার, হাজারখানেক।

চোপ, ধমক দেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, মিথ্যা বলবা না। তোমরা পুলিশরা নিজেদের লুঙ্গির কাচা আটকবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে জনসভার উপস্থিতি কমিয়ে বলো। আবার সরকারের পতন হলে একটু আগের মন্ত্রীকে ধরে জেলে পুরে বীরত্ব দেখাও। সত্যি করে বলো, কত হাজার লোক হয়েছিল মিটিংয়ে?

স্যার, আপনার অনুমানই সত্যি। হাজার পাঁচেক তো হবেই।

সভায় কে কী বলেছে, বিশেষ করে মমতাজ বেগম কী বলেছেন, সব রিপোর্ট পাঠাও।

জি স্যার।

মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনের রিসিভার রাখেন। সামনের টেবিলের ওপর মরিয়ম বেগম কয়েকটা মিষ্টি, বিস্কুট আর এক কাপ ঘন দুধের চা রাখেন। আয়েশ করে হাই তোলেন নূরুল আমিন। চায়ের কাপ হাতে নেন, চায়ের কাপে চুমুক দেন, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জন্মে ময়মনসিংহ হয়ে কত পথ ও পদ পার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী! বিষয়টা কেউ ভেবেছে? সবটাই হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য। পাকিস্তান! সত্যি এক অসাধারণ দেশ...।

আবার ফোন বাজে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রিসিভার কানে নেন নূরুল আমিন, হ্যালো?

স্যার আমি দোহা! আপনি কোথায়? এ এইচ এম এস দোহা আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক।

আমি এইমাত্র বাসায় এলাম, সারা দিনের হাঙ্গামার পর। কেন?

নারায়ণগঞ্জের খবর শুনেছেন?

হ্যাঁ, একটু আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে পুলিশের এসডিপিও ফোন করেছিল। শুনলাম, ওখানে নাকি বিরাট মিছিল আর জনসভা করেছে আন্দোলনকারীরা। আরও অবাক ঘটনা, মহিলারা এই মিছিলে অংশ নিয়েছে।

আপনি ঠিকই শুনেছেন স্যার, কিন্তু এই ঘটনা পাকিস্তানের জন্য খুবই বিপজ্জনক। বিশেষ করে মমতাজ বেগম– ওই মহিলা কিন্তু হিন্দু। ভারত থেকে এসেছে। পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য এই মহিলাকে এখনই গ্রেপ্তার করা দরকার। আশকারা দেয়ার টাইম নেই।

একটু ভাবা দরকার...

আমরা ভাবতে থাকব অন্যদিকে হিন্দুরা সব শেষ করে ফেলবে। মিছিলে স্লোগান উঠেছে যুক্তবাংলা চাই, জয় হিন্দ। আপনে বুঝতে পারছেন পরিস্থিতি?

বলেন কী?

জি স্যার। ওখানকার আনসাররা আমাকে রিপোর্ট দিয়েছে।

একটু সময় নিয়ে পূব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বলেন, আগামীকাল একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। আপনি, আমি, চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ, হোম সেক্রেটারি আফছার, পুলিশের প্রধানকে রাখেন। গোয়েন্দাদেরও রাখেন।

স্যার, নারায়ণগঞ্জ পুলিশ ও গোয়েন্দা প্রধানকেও রাখা দরকার।

রাইট। নারায়ণগঞ্জের পুলিশ রিপোর্ট তৈরি করছে। রাতেই ঢাকায় চলে আসবে।

স্যার, একটা কথা–

বলুন।

পাকিস্তান আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের আশা ভরসা। ভারতের সরকার ও হিন্দুরা কোনোদিন চাইবে না পাকিস্তান মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। ভাষা আন্দোলনের নামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচুর হিন্দু ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা অনেক পরিকল্পনা করে, যাতে এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিশে মায়ের ভাষার আবেগ তৈরি করে একটা মহাসর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারে। স্যার, আপনি কঠোর মানুষ, আপনাকে আরও কঠোর হতে হবে। ইসলামের স্বার্থে, আমাদের স্বার্থে শুরুতেই শত্রুদের বিনাশ করতে না পারলে আমরাই অস্তিত্ব সংকটে পড়ব। আমাদের প্রথম শিকার হবে মমতাজ বেগম, ওই হিন্দু নারী। ওকে গ্রেপ্তার করলেই ভারত থেকে কত হিন্দু আসছে, জানা যাবে।

ঠিক আছে, সায় দেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। কালকেই তৈরি হবে আমাদের ব্লুপ্রিন্ট।

আট

তোমাকে নিয়ে আমার খুব ভয় হয় মিনু, সকালে অফিসে যাবার আগে টেবিলে নাস্তা করতে করতে বলেন আবদুল মান্নাফ।

খুকুর মুখের রুটি আর ডিমের অংশ দিতে দিতে তাকান, কেন? আমি কী করলাম?

কী করোনি, সেইটে বলো। নারায়ণগঞ্জের সমাবেশের তোমার বক্তৃতা দেশের সকল পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম নারী মিছিল করে বলছ, কী করলাম আমি?

আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি মাত্র, গম্ভীর গলা মমতাজ বেগম মিনুর।

তুমি তোমার পয়েন্ট থেকে তোমাকে দেখছ কিন্তু সরকার দেখছে কোন পয়েন্ট থেকে? সরকার দেখবে সরকারের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। সবই তো জানো, মুসলিম লীগ সরকার সবকিছু সন্দেহ আর হিন্দু বিরোধিতার গান পয়েন্ট থেকে। পত্রিকার তোমার বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কিছু খবরও ছাপা হয়েছে। সবকিছু নিয়ে আমি চিন্তিত।

কিন্তু আমি চিন্তিত না, দৃঢ় কণ্ঠ মমতাজের। আমি যা করেছি আমার বিশ্বাস ও নীতিবোধ থেকে করেছি। প্রয়োজন হলে আরও করব।

পানির গ্লাস মুখে নিয়ে একটু থামেন আবদুল মান্নাফ, আমি তো জানি তুমি কোনো অন্যায় করোনি, কিন্তু...

সকাল বেলা অত কিন্তু কিন্তু করো না। শোনো বাজার লাগবে, অফিসে যাবার আগে মাছ আর সবজি দিয়ে যেও। আগামী রোববার, সন্ধ্যায় কোনো কাজ রেখো না।

কী করবে? গ্লাসের পানি শেষ করে প্রশ্ন করেন মান্নাফ।

খুকুর জন্মদিনে রওশন আপা এসেছিলেন না, আমি তো থাকতে পারলাম না, ভাবছি ওইদিন আপার বাসায় যাব। খুশি হবেন তিনি।

ভালো প্রস্তাব, আবদুল মান্নাফ নাস্তা সেরে ওঠেন। তুমি কখন যাবে?

এইতো খুকুর খাওয়া শেষ। আমি নাস্তা করে রেডি হয়ে বের হয়ে যাব। আর খালা বলেছিল, মাসের বেতনটা অ্যাডভান্স দিতে, দিয়ে দেব?

দাও। জামা প্যান্ট পরে বলেন মান্নাফ, তুমি থাকতে থাকতে আমি বাজারটা করে আনি। রান্নাঘর থেকে ব্যাগটা এনে দাও।

এক মিনিট অপেক্ষা করো, খুকুর খাওয়া শেষ করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে মমতাজ বেগম দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে ঢোকেন। মান্নাফ এগিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে ওঠে। খুকু হাসে। রান্নাঘর থেকে ব্যাগ হাতে আসেন মমতাজ, মেয়ের সঙ্গে দুষ্টুমির সময় অনেক পাবে, আগে বাজারে যাও। আমিও রেডি হচ্ছি–

মান্নাফ ব্যাগ হাতে দূত বের হয়ে যান। মমতাজ বেগম বেডরুমে ঢোকেন। রান্নাঘরে খালা থালাবাসন পরিষ্কার করছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মমতাজ বেগমও ভাবেন, একটা কিছু ঘটবে, আমিও টের পাচ্ছি। কিন্তু কী ঘটতে পারে? মাথার চুল আঁচড়ানো শেষ করে নিজের মনেই সিদ্ধান্ত নেন, যা হওয়ার হবে। পরোয়া করি না কিছু।

বেডরুমে ঢোকে খুকু, মা?

মেয়েকে কোলে তুলে নেন, আদর করেন, কী মা?

খালার সঙ্গে থাকতে আমার ভালো লাগে না! অভিমানী ঠোঁটে ফোটে অভিমানী ফুল।

বুকের সঙ্গে মেয়েকে ঝাপটে ধরেন মমতাজ বেগম, শুনতে পান মেয়ের বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে বেজে ওঠা অভিমানের সাইরেন। কী করতে পারেন তিনি? স্কুলের কোয়ার্টারে নিয়ে রাখতে পারেন কিন্তু তিনি স্কুলের কাজ সামলাবেন কী করে? আয়া রেখে চেষ্টা করেছেন, মেয়ে স্কুল কম্পাউন্ডে থাকলে বারবার ছুটে আসে মায়ের দপ্তরে। মেয়েকে সামলাবেন না মর্গান স্কুলের তিন শতাধিক ছাত্রী সামলাবেন? খুকুকে নিয়ে স্কুলে কয়েক দিন থেকেছেনও। সমস্যা তৈরি করেছে ফয়জুল কবির। লোকটা মিচকে শয়তানের বাপ। সামনে এলে ভিজে বিড়ালের পীর বনে যায় কিন্তু পিছনে বসে নাড়ে শয়তানি কলকাঠি। মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস, হতে চায় মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মমতাজ বেগমের এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসার আট বছর আগে শিক্ষক হিসেবে ঢুকেছে এলাকার প্রভাব খাটিয়ে। পড়ানোরও ভালো যোগ্যতা নাই। ক্লাস ফোরের বাংলা পড়ানোর সময়ে মমতাজ বেগম বারান্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছেন, খুবই ক্লিশে পড়ানো। পড়ানোর মধ্যে কোনো আবেগ নেই, নেই শিশু মনস্তত্ত্বও। সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, ক্লাসে বাচ্চাদের তুই বলেন। শুনে মমতাজের মাথায় আগুন লাগে, করছে কী লোকটা?

পরের সপ্তাহে শিক্ষকদের মিটিং ডাকেন মমতাজ বেগম। মিটিংয়ে তেমন কোনো এজেন্ডা ছিল না। টুকটাক গল্প করার পর মমতাজ বেগম বলেন, আমার কাছে কয়েকজন অভিভাবক এসেছেন। আগেও এসেছেন। কিন্তু গত কয়েক দিনে এসেছেন বেশ কয়েকজন। তারা ঠিক অভিযোগ নয়, আমাকে জানিয়েছেন মাত্র, একটা বিষয় সম্পর্কে। আমার মনে হয়েছে, বিষয়টা আপনাদের জানানো দরকার। আবার যে খুব জটিল কোনো বিষয় তাও নয়। বিষয়টা খুব হালকা।

সব শিক্ষক তাকিয়ে আছেন মমতাজ বেগমের মুখের দিকে। বুঝতে পারছেন না, মমতাজ বেগম কী বিষয়ে বলবেন? জটিল না হলে মিটিং ডাকার দরকার কী?

কোনো কোনো শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর সময়ে আমাদের কোমলমতি ফুলেল ছাত্রীদের তুই-তোকারি করেন, যা শুনতে খুবই খারাপ লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে সব শিক্ষক তাকান ফয়জুল কবিরের দিকে। মুখের নিচে ছাগলের দাড়ি নিয়ে ফয়জুল কবির সবার সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকেন। মনে মনে বলেন, হারামি মাগী– এ কথার জন্য মিটিং ডাকার দরকার ছিল? আমাকে বললেই হতো। ফাজলামি পেয়েছ মাগী? সময় আসুক, দেখামু মজা কারে কয়।

মমতাজ বেগম বলেন, শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ, আপনারা জানেন। নতুন করে বলবার কিছু নেই। ওদের মন চিন্তা ও কল্পনার জগৎ ভীষণ কোমল। কর্কষ কিছু শিশুরা নিতে পারে না। আমাদের তুই-তোকারির ব্যাপারটা বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করেছে, সেই কারণে অভিভাবকরা আমার কাছে এসেছে এবং জানিয়েছে। আমি বিষয়টি আপনাদের জানালাম। আশা করি আর এ ছোট বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে না।

মিটিং শেষ হলেও মনের মধ্যে গজর গজর করতে থাকে ফয়জুল কবির, মিটিং ডেকে শিক্ষকদের সামনে আমাকে অপমান? ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খান সাহেব ওমসান আলী না থাকলে কবে উল্টে দিতাম তখত। খান সাহেব কী যে পেয়েছে মমতাজ বেগমের মধ্যে, মমতাজ বেগম যা বলেন, মেনে নেন। বিষয়টা নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির প্রিয় সদস্য দোকানদার আবুল খায়েরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ফয়জুল কবিরের। মূলত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য যত আলাপ, পরামর্শ সবই হয় আবুল খায়েরের সঙ্গে। আবুল খায়ের কোনোভাবে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিল, সেই বিদ্যার দৌড়ে এগিয়ে চলছে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে, ঘোড়ার আগে আগে।

আবুল খায়ের পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলেন, বুঝলা না তুমি মাস্টার? এই সামান্য ভূগোলডা বুঝলা না? কেমনে তুমি প্রধান শিক্ষক হইবা মর্গান গার্লস ইস্কুলের? যদি হইয়া যাও, চালাইতে পারবা? তুমি তো চাউল আর ডাইল মিশাইয়া তরকারি খাইবা।

তুমি বুঝাইয়া কও, দাঁত খিলাল করতে করতে বলে ফয়জুল কবির।

হাসেন আবুল খায়ের, বুঝলা না তো? হোনো নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওমসান আলী কি পাকিস্তানের রাজনীতি করেন? তিনি পাকিস্তানে থাইকা রাজনীতি করেন ভারতের। কী জানি কয়, ধর্মনিরেপক্ষ রাজনীতি– হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খিরিস্টান– সব ধর্মের মানুষ লইয়া নাকি শান্তিতে বসবাস নাকি শান্তি। এই জিনিস পেয়ারে পাকিস্তানে সাপ্লাই দিতাছে কারা?

কারা? দাঁত খিলাল করতে করতে মুখ হা হয়ে আছে ফয়জুল কবিরের।

ভারতের হিন্দুরা। আমাগো এই নারায়ণগঞ্জের ওসমান আলী খান সাহেবের পুত্র এ কে এম শাসসুজ্জোহা, মোস্তফা সারওয়ার ওই রাজনীতির গাছ। এই গাছের লগে যোগ দিছে মজিবর। আর একখান মোস্তফাও আছে এই দলে।

কার কথা বলছ ভাই?

মুস্তফা মনোয়ার। লোকটা ছবি আঁকে। ভাষা আন্দোলনের ছবি। মারাত্মক। এইসবের লগের ঢাকার নেতা মজিবর যোগ হইচে।

মজিবরটা কে?

খালি খাইলে আর ঘুমাইলে তো অইবে না ফয়জুল কবির, চারইরদিকের খবরও রাখা দরকার। এই মজিবরও আইচে কলিকাতা দিয়া। মজিবর ঢাকা দিয়া নারায়ণগঞ্জ আইলে দেখচো মানুষ কেমনে ভেড়ে? মজিবররে লইয়া আমার বড় ভয়। কতা কয় পরিষ্কার কইরা– লোকে পছন্দ করে।

আবুল খায়েরের বাপ ছাবেদ খায়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বরিশাল থেকে নারায়ণগঞ্জ এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। চটকলের শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করে ধীরে ধীরে নারায়ণগঞ্জের মানুষেরই পরিণত হয়েছে। জায়গা জমি রেখে বিয়ে করে এখানেই স্থায়ী হয়ে যায় ছাবেদ খায়ের। ছাবেদ খায়েরের তিন মেয়ে তিন ছেলে। সবার বিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কয়েক বছর আগে মারা গেছে। বাপের উত্তরাধিকারে আবুল খায়ের চাষাড়ার রোডে তিনটা দোকানের মালিক। রাজনীতিতে মুসলিম লীগার। ধর্মে অন্ধ। নারায়ণগঞ্জে জন্ম হলেই পরিবারের বরিশালের কথার অভ্যাসটা রয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে গেলে চেষ্টা করে চলতি ভষায় বলতে কিন্তু হয়ে যায় হিজড়া ভাষা, কিছুটা চলতি, কিছুটা নারায়ণগঞ্জের, কিছুটা বরিশালের– শুনতে বেজায় লাগে।

আর তোমাগো স্কুলের হেডমাস্টারও আইচে কলিকাতা দিয়া। তাইলে কী অইলো?

কী অইলো? ফয়জুল কবির হাতের দাঁত খিলাল ফেলে দিয়ে মুখের নিচে ছাগলের দাড়িতে হাত বুলায় আপন মনে।

দুই দুই গুনে আট হইলো।

দাঁত বরে করে হাসেন দোকানে সামনের চেয়ারে বসে ফয়জুল কবির, তুমি আমাকে ভোদাই মনে করেছ খায়ের ভাই। আমি জানি, দুই দুগুনে চার।

পাল্টা হাসেন আবুল খায়ের, জানি তো, তুমি ভোদাই না। তুমি বোয়াল মাছ। সমেস্যা একটাই, তোমার দাঁত নাই। দাঁত ছাড়া বোয়াল মাছ। আরে ফয়জুর এই গুন হেই গুন না। এই গুন রাজনীতির। রাজনীতির গুনে দুই দু গুনে আট হয়, বারো হয়, আটত্রিশ হয়। সুতরাং মমতাজ বেগমরে হ্যারা সাপোর্ট দেবে এটাই স্বাভাবিক। এই সাপোর্টের মইধ্যে স্যাবোটাজ কইরা তোমার আমার দাবি-আশা আদায় করতে হইবে, বুঝলা?

বাজার থেকে মাছ তরিতরকারি নিয়ে আসেন আবদুল মান্নাফ। ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে তাকান মমতাজ বেগম আর কন্যার দিকে। মমতাজ বেগম বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরে আছেন চেয়ারে বসে। মেয়েও মাকে জড়িয়ে রাখে মা। মা ও মেয়ের এই দৃশ্যর দিকে তাকিয়ে থমকে যান আবদুল মান্নাফ, কী হয়েছে তোমাদের?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মমতাজ বেগম, খুকু বলেছে খালার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না। শুনে আমার মনটা খারাপ হয়েছে মান্নাফ। আমিও নিজে জানি, এতটুকু মেয়ে কাজের মানুষের থাকলে ভেতরের সুকুমার সুন্দর বিকাশ হতে পারে না। কী করি বলো তো?

দেখি, কাশিয়ানী থেকে মাকে আনাতে পারি কি না। চিঠি লিখব আজই। তাছাড়া আমি তো অফিস শেষ করেই বাসায় চলে আসি। ওর সঙ্গেই থাকি, যতক্ষণ তুমি না আসো। আর যেদিন আসো না, সেদিন তো ওকে নিয়েই থাকি।

কাজের খালা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে খাবার ঘরে ঢোকে। মমতাজ বেগম এতক্ষণ চেয়ারে বসে খুকুকে আদর করে বুঝিয়েছে, দুজনে চাকরি করলে এরকম হয়। তাছাড়া রবিবার তো সারা দিন আমরা দুজনে তোমার সঙ্গেই থাকি। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাই, বাইরে গিয়ে ফুচকা আইসক্রিম খাই, খাই না?

মাথা নাড়ে ছোট খুকু, খাই তো।

আসছে রবিবার তোমাকে নিয়ে নৌকায় চড়ব?

নৌকায় চড়ব? ভীষণ খুশি খুকু।

হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে আমি আর তোমার বাবা বুড়িগঙ্গায় যাব। বুড়িগঙ্গায় অনেক নৌকা আছে না, পালতোলা ছোট ছোট নৌকা। সেই নৌকায় আমরা চড়ব, কেমন?

আচ্ছা, ঘাড় দুলিয়ে সায় জানায় খুকু।

আরও আছে মা–

কী আছে মা? মায়ের মুখের ওপর রেখে জানতে চায় খুকু।

তোমাকে নিয়ে আমরা কলকাতায় যাব।

কলকাতা কোথায়?

কলকাতা! কলকাতা বড় একটা শহর। সেই শহরে ট্রাম গাড়ি আছে, ট্রেন আছে, তোমার নানা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে নানা-নানি আছে, বিরাট পুকুর আছে, সেই নানা বাড়ির সামনে। তুমি সাঁতার কাটবে।

কলিকাতা কি ঢাকার চেয়েও বড় মা?

হাসেন মমতাজ বেগম, হ্যাঁ ইকটু বড়। সেই বড় শহরে তোমাকে নিয়ে ঘুরব।

কন্যাকে গল্পে গল্পে অনেকটা সহজ করে খালার কাছে রেখে বের হয়ে পড়েন একসঙ্গে আবদুল মান্নাফ আর মমতাজ বেগম মিনু।

নয়

নারায়ণগঞ্জের কোর্টের পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক ইমতিয়াজ কোর্টের বাইরে এসে হাজার হাজার জনতার সামনে উর্দু ভাষায় বলে, সরকার মর্গান গালর্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগমকে ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার করেনি। গ্রেপ্তার করেছে স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করবার জন্য। মমতাজ বেগম মর্গান স্কুল থেকে অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ কোর্টের সামনে হাজির হাজার হাজার জনতা চিৎকার করে, মানি না। মানি না। সব মিথ্যা, ভুয়া।

ইমতিয়াজ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত ভেতরে চলে যায়।

মমতাজ বেগম আদালতের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছেন। বিমর্ষ হলেও মনের জোর হারাননি। জানালা দিয়ে চারপাশে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি মমতাজ বেগমকে উৎফুল্ল রেখেছে। ভাবনা কেবল খুকুর জন্য। বুঝতে পারছেন, পাকিস্তানের সরকার সহজে ছাড়বে না। কী হবে খুকুটার?

সকালে স্কুলে ঢোকার মুখে ফয়জুল কবিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন মমতাজ বেগম। মুখে গোপন কিন্তু বিকৃত হাসির একটা আভা দেখতে পেয়েছেন মমতাজ বেগম। অতিক্রম করে যেতে যেতে আবার তাকায়, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ক্লাস নাই?

মাটির দিকে তাকিয়ে বলেন, না আপা ক্লাস নাই। আমার এক আত্মীয় আসবে, একটু অপেক্ষা করতেছি।

ঠিক আছে, দ্রুত নিজের রুমে ঢোকে।

রুমে ঢোকার পরপরই গেটে এসে দাঁড়ায় পুলিশের গাড়ি। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে নামে আটজন পুলিশ। দলটার নেতৃত্বে আছেন নারায়ণগঞ্জ থানার ওসি বদরুল করিম। খাকি পোশাকের পুলিশ মর্গান গার্লস স্কুলের বিরাট মাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের জানালা দিয়ে মেয়েরা, স্কুলের শিক্ষকেরা দেখতে পেয়ে বিমূঢ়। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। পুলিশেরা দ্রুত রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মমতাজ বেগম বুঝতে পারে, ঘটনা যা ঘটার ঘটছে। বুঝতে পারলেন, দাবার ঘুঁটির চাল দিয়েছে সরকার।

আপা, আমি নারায়ণগঞ্জ থানার ওসি বদরুল করিম। আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। থানায় চলুন।

কী অপরাধ আমার?

আপনার অপরাধ আপনি স্কুলের পঁচিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

আমি?

আপা! বদরুল করিমের চোখে মুখে কাঠিন্য। আমরা একমুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছি না। আপনি মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আপনার মানমর্যাদা আছে, আপনার সঙ্গে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করতে চাই না। আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে এবং এখনই।

ওয়ারেন্ট দেখান আমাকে।

পাশে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এসআইকে ইশারা করে ওসি বদরুল করিম, ওয়ারেন্ট দেখাও আপাকে।

রাইফেল অন্য কাঁধে চালান করে দিয়ে পকেট থেকে ওয়ারেন্টের কাগজ ধরে মমতাজ বেগমের সামনে, কোর্ট থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক ইস্যু করা ওযারেন্ট দেখতে পান তিনি, মমতাজ বেগম। টেবিলের ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্র ফাইল গোছাতে গেলে বাধা দেন ওসি বদরুল করিম, এসব গোছানোর টাইম নাই আমাদের। আপনি চলুন, স্কুলের শিক্ষকরা গুছিয়ে রাখবে।

ইতিমধ্যে ক্লাসের ছাত্রীরা ক্লাস বাদ দিয়ে হেডমাস্টারের রুমের চারদিকে আসছে। শিক্ষকরা কী করবে বুঝতে পারছে না। স্কুলের শিক্ষক ফয়জুল কবির রুমের মধ্যে ঢুকেছে শুরুতেই। বদরুল করিম জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে?

হাত কচলায় ফয়জুল কবির, স্যার আমি এই স্কুলের একজন শিক্ষক।

গুড, আপনি আপার টেবিলের সকল কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন। আপা, চলুন।

ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন বলেছেন, আমি সব গুছিয়ে রাখব।

টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যেতে যেতে মমতাজ বেগম তাকান ফয়জুল কবিরের দিকে। মুখের নিচে ছাগলের দাড়ি নিয়ে ফয়জুল কবির দাঁত বের করে পাল্টা তাকিয়ে দেখছে স্কুল থেকে, নিজের রুম থেকে রেব হয়ে যাবার সময়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগমের দিকে। এই প্রথম ফয়জুল কবির চোখ নামায়নি।

মমতাজ বেগম রুমে থেকে বের হয়ে স্কুলের সামনে আসলে, এক দল মেয়ে এগিয়ে আসে, আপা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

মমতাজ বেগম দাঁড়ান, পুলিশেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, আবার দাঁড়ালেন কেন আপা? বললাম না আপনাকে আমাদের হাতে সময় নেই।

আমার ছাত্রী, আমি বিদায় নিচ্ছি ওদের কাছ থেকে।

পুলিশের কিছু করার থাকে না। অসহায় ভঙ্গিতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশরা।

মতাজ বেগম এগিয়ে পাশে দাঁড়ান ছাত্রীদের, মেয়েরা তোমরা স্বাভাবিক থেকো। আইন হাতে তুলে নেবে না। আমি থাকি আর না থাকি, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেশ। ভালো থেকো।

তিনি সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পিছনে পুলিশ। ওরা দ্রুত চাচ্ছে মমতাজ বেগমকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করতে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই। মমতাজ বেগম স্কুলের গেট পার হয়ে সামনে রাখা গাড়িতে উঠে বসলেন। পুলিশেরাও গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দেয়। স্কুলের মেয়েরা সব বাধা উপেক্ষা করে ক্লাসে বইখাতা রেখে দৌড়ে গেটের দিকে আসতে থাকে বাঁধভাঙা জোয়ারের গতিতে কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে।

দশ

স্যার, আপনাকে সালাম দিয়েছেন, পিয়ন গোবিন্দ লাল দাস দরজায় দাঁড়িয়ে।

ফাইল থেকে মুখ তোলেন আবদুল মান্নাফ। যদিও ফাইল দেখছেন কিন্তু মনের মধ্যে অজানা একটা দুচিন্তা ঘোড়ার গতিতে দৌড়াচ্ছে। অফিসে এসে কয়েকটা সিগারেট টেনেছেন। মান্নাফ সিগারেট একটু বেশিই টানেন কিন্তু আজকে সব বেশি ছাড়িয়ে গেছে।

ঠিক আছে, আসছি।

পিয়ন গোবিন্দ লাল দাস চলে যায়। ফাইল বন্ধ করে দাঁড়ান আবদুল মান্নাফ। খাদ্য পরিদর্শনের অফিস। অনেক জরুরি ব্যাপার থাকে। অফিস প্রধানের নাম জেলা খাদ্য কর্মকর্তা, মোহাম্মদ ইউনুস। লোকটার মুখ ভরা দাড়ি। পরনে সব সময়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি কিন্তু পেট ভরে খায় ঘুষ। ঘুষ ছাড়া একটা ফাইল ছাড়ে না। আবদুল মান্নাফ ধীরে ধীরে বস মোহাম্মাদ ইউনুসের সংস্পর্শ থেকে দূরে এসে এসেছে। কেন জানি মোহাম্মদ ইউনুসকে দেখলে ঘৃণা জাগে। লোকটা মনে হয়, আবদুল মান্নাফের মনের এই ঘৃণার সন্ধান জানে। ফলে, অফিসের বাইরের সকল ফাইলের কাজ থেকে আবদুল মান্নাফকে সরিয়ে দিয়েছে। যেসব ফাইল কেবলমাত্র অফিস সংক্রান্ত, সেইসব ফাইল পাঠায়।

স্যার, আমাকে ডেকেছেন? রুমে ঢুকে প্রশ্ন করেন আবদুল মান্নাফ।

হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী নারায়ণগঞ্জে একটা স্কুলের হেডমাস্টার না?

জি স্যার, মর্গান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করেন।

কী নাম আপনার স্ত্রীর? মমতাজ বেগম? না?

জি স্যার! আবদুল মান্নাফের মধ্যে পালপিটিশন শুরু হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোনো ভালো সংবাদ নয়। নইলে বিশিষ্ট ঘুষখোর মোহাম্মদ ইউনুস ডেকে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু কী ঘটেছে? ওকে কি মেরে ফেলেছে পাকিস্তানের সরকারের বিশেষ কোনো বাহিনী? নাকি গুণ্ডা দিয়ে আক্রমণ করেছে পথে? মমতা কি আহত? হাসপাতালে?

মান্নাফ, আপনার স্ত্রী মমতাজ বেগমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ওনাকে নারায়ণগঞ্জ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে স্কুলের ছাত্রীসহ হাজার হাজার মানুষ, শ্রমিক কোর্ট ঘিরে রেখেছে। নারায়ণগঞ্জ খাদ্য অফিসের কর্মকর্তা নিজাম হোসেন এইমাত্র টেলিফোনে আমাকে জানালেন।

আবদুল মান্নাফ এক অনিশ্চিত হাওয়ায় দুলতে শুরু করলেন। মমতাজ বেগম মিনুকে ঘিরে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলেন কিন্তু সত্যি সত্যি ঘটে যাবে এবং এমন ঘটনা ঘটবে, শুনে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে খুকুর মুখটা মনের আয়নায় দেখা চেষ্টা করলেন। মেয়েটা তাকিয়ে আছে পথের দিকে, মা আসবে? আসবে তো কিন্তু কবে? কী সান্ত্বনা দিয়ে খুকুকে আগলে রাখবেন?

মান্নাফ সাহেব?

স্যার?

আমার মনে হয় আপনার নারায়ণগঞ্জ যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ স্যার।

বিশিষ্ট ঘুষখোর ইউনুসের রুম থেকে বের হয়ে আসেন আবদুল মান্নাফ। নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে ভাবেন, লোকটা মানে ইউনুস বাজে মানুষ সন্দেহ নেই কিন্তু বাজে মানুষের মধ্যে কিছুটা ভালো লবণও থাকে। থাক ওই শালার ইউনুসের লবণ থাক, কিন্তু আমার সংসার, স্ত্রী, সন্তানের কী হবে? মমতাজ মিনু খুব তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবে, এমনটা মনে হয় না। খুকুকে আমি কীভাবে সামলাব? মেয়েটা যা অভিমানী? ওর অভিমান ভাঙতে ভাঙতে আমার দিন-রাত চলে যাবে, অফিস করব কখন?

রুমে ঢুকে চেয়ারে বসে পিয়ন শামসুল হককে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলেন আবদুল মান্নাফ। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, মুখ ভরে ধোঁয়া নিয়ে লম্বা করে ছাড়লেন, আমি এখন নারায়ণগঞ্জ গেলে কখন ফিরব ঠিক নেই। মেয়েটা দুপুরের পর পাগল হয়ে যাবে আমাকে না দেখলে। খালার হাত থেকে ছুটে রাস্তায় চলে আসবে। বাড়িওয়ালার বাসায় টেলিফোন আছে। নারায়ণগঞ্জে খাদ্য অফিসে ফোন দিয়ে আরও জানা যাবে, আমি বরং বাসায় যাই আগে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালেন আবদুল মান্নাফ। চা নিয়ে ঢোকে পিয়ন। আবার বসলেন চেয়ারে, চা খেয়ে বের হই। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

স্যার? শামসু টেবিলের একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে তাকালেন আবদুল মান্নাফ, বলো।

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা শুনছেন?

কী ঘটনা?

খাদ্য অফিসের উল্টোদিকে, রাস্তার ওপারে পৌরসভার একটা অফিস। ওই অফিসের লোকদের সঙ্গে খাদ্য অফিসের লোকদের চেনাজানা আছে। অফিসের নিচের দিকে কর্মচারীদের আনাগোনা আড্ডা হয় অনেক বেশি। চায়ের দোকানটাও পৌর অফিসের সামনে। ঢাকা শহরের রাজনীতির অনেক খবর পৌর অফিসের সূত্রে আগেভাগে ওরা জেনে যায়।

এক হিন্দু মহিলাকে নাকি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?

তোমাকে কে বলল? চায়ের মিষ্টি স্বাদটা বিষাদ তিতকুটে লাগে

মুখে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে পৌর অফিসে ফোন আসছিল। সেই মহিলা নাকি পূর্ব পাকিস্তানের এক মুসলমানকে বিয়ে করেছে। আসলে স্যার, এটা হলো ইন্ডিয়ার কৌশল। মারাত্মক বুদ্ধি। আমাদের দেশের মুসলমান ছেলেদের ধরে ধরে হিন্দু মেয়েরা বিয়া করে এই দেশে এসে এখন, ভাষার নামে গণ্ডগোল পাকাইতেছে।

আবদুল মান্নাফ চা খাওয়া ভুলে সামনে দাঁড়ানো শামসুর দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ধরনের গল্প যদি পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা বিশ্বাস করে, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে, দেশটা তো রসাতলে যাবে। সমস্যা, ওদের মগজে একবার এই বটিকা ঢুকে গেলে আর পরিত্রাণের উপায় থাকবে না।

জানেন স্যার, মহিলা কত বড় ধুরন্ধর? পূর্ব পাকিস্তানে এসে নারায়ণগঞ্জের একটা বড় গার্লস স্কুলের হেডমাস্টারের পদ ভাগিয়েছে? আর আমার দেশের মুসলমান মেয়েরা চাকরি পায় না। মহিলারে ধরছে স্যার পুলিশে, ঢাকা জেলখানায় এনে শুনেছি কপিকলে ঝুলাবে।

গলার স্বর নেই আবদুল মান্নাফের, কপিকলে কেন ঝুলাবে?

হাসে শামসু, দলে কে কে আছে বের করবে না পাকিস্তানের পুলিশ? আপনি কী মনে করেন, পাকিস্তানের পুলিশ কাঁচা?

পিয়ন শামসু কি আমাকে কোনো টার্গেটে পরিণত করেছে? নইলে হারামজাদা এই দুঃসময়ে আমার সঙ্গে রাজনীতির আলাপ শুরু করল কেন? নাকি হারামজাদা ঘুষখোর মোহাম্মদ ইউনুসের কোনো ষড়যন্ত্র? পাকিস্তানটাই একটা ষড়যন্ত্রের ডিব্বা। দেশটা স্বাধীন হলো সাড়ে চার বছর, একের পর নামছে রাজনৈতিক ধস আর চারদিকে চলছে বিশ্বাসহীনতার অবাক আক্রমণ। একমাত্র রজ্জু, ধর্ম।

তোমার কী মনে হয়?

আমার তো মনে হয় স্যার, পাকিস্তানের পুলিশ সাচ্চা ইমানদার, সৎ আর সাহসী। নইলে এই ষড়যন্ত্রকারী মহিলাকে ধরে ফেলল কেমন করে? এখন বুঝবে মজা, পাকিস্তানের সঙ্গে মশকরা করলে কী হয়। স্যার, আপনাকে আর এক কাপ চা দেব?

না, তোমার এই চায়েই যে মিষ্টি দিয়েছ, মুখ মরে যাচ্ছে মিষ্টিতে।

স্যার আমার কাছে যদি কোনো ক্ষমতা থাকত, আমি কী করতাম জানেন?

কী করতে?

মহিলারে আমি একেবারে গুলি করে মেলে ফেলতাম। কত বড় সাহস আর ষড়যন্ত্র স্যার দুনিয়ার একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে?

পাকিস্তান যে দুনিয়ার একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র, তোমাকে কে বলল?

দুনিয়ায় আরও মুসলিম রাষ্ট্র আছে স্যার?

সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ইয়েমেন, ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া...

স্যার, আমিও ওইসব দেশের নাম জানি, কিন্তু আমাদের পাকিস্তানের মতো ইসলামি দেশ না। পাকিস্তানের জন্য কত মানুষ জীবন দিয়েছে, ভারতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আপনি জানেন?

শামসু?

বলুন স্যার।

দাঁড়ান আবদুল মান্নাফ। এসব পতঙ্গদের সঙ্গে আলাপ করে কোনো লাভ নেই, কেবল মূল্যবান সময়ের অপচয়। দ্রুত বাসায় ফেরা দরকার। খুকু হয়তো এতক্ষণে কান্না জুড়ে দিয়েছে, তুমি তো ইসলাম আর পাকিস্তান নিয়ে অনেক বললে, এখন বলো, তুমি আজকে সকাল কটায় উঠেছ?

হতভম্ব শামসু, পাকিস্তান ইসলামের সঙ্গে সকালে কটায় ঘুম থেকে ওঠার কী সম্পর্ক? মাঝে মাঝে স্যারদের অনেক ব্যাপারই বুঝতে পারে না। যেমন ইউনুস স্যার। লোকটা নিয়মিত নামাজ পরে, রোজা রাখে, বাড়িতে মসজিদ দিয়েছে, কিন্তু ঘুষ ছাড়া ফাইল ছাড়ে না। আর এই স্যার নামাজ রোজার ধার ধারেন না কিন্তু ঘুষ খান না, কারো নামে বদনামও করেন না। খুব বিভ্রান্তির চার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে শামসু।

উত্তর দাও শামসু।

স্যার সাতটায়।

তুমি নিয়মিত সাতটায় ওঠো ঘুম থেকে?

জি স্যার। নিয়মিত সাতটায় উঠি। উঠে হাতমুখ ধুয়ে গোসল করি, গোসল সেরে নাস্তা খেয়ে অফিসে আসি।

মানে তুমি ফজরের নামাজ পড়ো না।

গলায় কুমির আটকে যায় শামসুর। বুঝে গেছে, স্যারেরা এমনি এমনি স্যার হয়নি। ওর ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে দৌড়ে পালায় স্যারের সামনে থেকে। নয়তো ধুলো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেলে অনেক উপকার হতো। নিজের গালে নিজে মনে মনে চটকাতে থাকে, কেন শালা এসব বলতে গেলাম?

ঠিক আছে, শামসু। কাল থেকে চেষ্টা করিও ফজরের নামাজ পড়তে। কারণ, সৃষ্টিকর্তা ফজরের নামাজের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শোনো নাই, ফজরের নামাজের জন্য আজানের সেই আহ্বান, ঘুম হইতে নামাজ উত্তম। ইসলাম কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রেখেছে, দুনিয়ার মানুষের জন্য, যেমন শোনা কথা বিশ্বাস না করা, গিবত বা বদনাম না করা। জানো তো, গিবতকারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন তিনি।

জি স্যার! গলার স্বর মাটিতে নেমে এসেছে শামসু মিয়ার।

টেবিল চেয়ারগুলো মুছে রেখো, কেমন? রুম থেকে বের হয়ে যান আবদুল মান্নাফ।

ঘাড় কাত করে মৃত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে শামসু মিয়া।

এগার

সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের রুমে বসেছেন চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ, হোম সেক্রেটারি আফছার, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের প্রধান আবদুল বশির, আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক এএসএম দোহা। সচিবালয়ের অন্য বিল্ডিংয়ে নিজের দপ্তরে আছেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। মুহুর্মুহু ফোন আসছে স্বরাষ্ট্র সচিবের রুমে নারায়ণগঞ্জ থেকে।

ফোন তোলেন আজিজ আহমদ, হ্যালো আমি চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ বলছি। কে বলছেন?

স্যার আমি ইমতিয়াজ, মহকুমা প্রশাসক। আদাপ স্যার।

আদাপ, আসল ঘটনা বলুন। একজন মেয়ে মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারছেন না আপনারা? ফুঁসে উঠছেন আজিজ আহমদ।

আজিজ আহমদ সরাসরি ফোন ধরবেন চিন্তা করতে পারেনি মহকুমা প্রশাসক। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন নুরুল আমিন নামে কিন্তু দেশ চালাচ্ছেন আজিজ আহমদ। ভারতের সিএসপি। ভয়ানক একরোখা আর জাঁদরেল অফিসার। শোনা যায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ আছে ভদ্রলোকের।

স্যার! সামলে নেয় ইমতিয়াজ নিজেকে, স্যার পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার মানুষ এনে নারায়ণগঞ্জের আদালতপাড়া ঘেরাও করেছে। আর মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছে। আপনিও শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় স্লোগানের পর স্লোগান।

পুলিশ? পুলিশ কী করছে? আজিজ আহমদের গলায় ব্রজশব্দ। তিনি বাঙালিদের অধিকার বিষয়ে ভয়ানক স্পর্শকাতর। একটা ভেতো জাতি সম্প্রদায়, না আছে সভ্যতা-ভব্যতা, ভদ্রতা– কেবল আছে

মিছিল আর অধিকার। শালাদের পাছা দিয়ে অধিকার ঢুকিয়ে দিতে পারলে, মজা পাওয়া যেত। ঠিকভাবে প্যান্ট শার্ট পরতে জানে না, পরে লুঙ্গি গামছা, খায় ভাত মাছ, শালাদের অধিকারের অত্যাচারে সরকার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। মহকুমা শহর নারায়ণগঞ্জের একটা মহিলাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না!

স্যার! পুলিশ তো আছেই, তিনশো পুলিশ কিন্তু পুলিশের চেয়ে মানুষ হচ্ছে কয়েক শতগুণ বেশি। সবচেয়ে অবাক ঘটনা, পুরুষের সঙ্গে প্রচুর নারীও এসেছে।

নারীরাও মিছিল করছে?

জি স্যার। অনেক নারী। স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকরাও এসেছে। স্যার, বাসার বৌ-ঝিরাও এসেছে। ওদের একটাই স্লোগান– থেমে যায় মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ।

কী স্লোগান?

মমতাজ আপার মুক্ত চাই, নুরুল আমিনের কল্লা চাই–

হোয়াট ইজ দিস কল্লা? কল্লা মানে?

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ ইমতিয়াজ ও কল্লা শব্দের মানে বোঝে নাই। অফিসের বাঙালি আর্দালি কিয়ামত আলী বুঝিয়ে দেয় কল্লা মানে মাথা। ঘাড়ের ওপর দিয়ে ধারালো দায়ের এক কোপে নামিয়ে দেয়া যায়।

স্যার, কল্লা মানে হেড।

মাথা?

জি স্যার। কল্লা ইজ মাথা।

মুখ্যমন্ত্রীর মাথা দিয়ে ওরা করবে?

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আনসার বাহিনীর প্রধান এএইচএমএস দোহা। লোকটা যদিও পূর্ব বাংলার কিন্তু মনে মননে মগজে পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের গোলাম। অনেক সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্মগত নাগরিকের চেয়েও অনেক বেশি পশ্চিম পাকিস্তানি।

স্যার, আমি বলছি, ইংরেজিতে বলতে শুরু করেন দোহা, ওরা মানে বাঙালিরা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, খুশি নয়। হাভাতে তো। চির ক্ষুধার্ত এই বাঙালি সম্প্রদায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন স্যারের কাটা মাথা দিয়ে খেলবে।

হোয়াট?

জি স্যার খেলবে।

কী খেলবে? আজিজ আহমদ ক্রোধে কাঁপতে থাকে।

স্যার, ফুটবল।

বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় আজিজ আহমদ। সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় হোম সেক্রেটারি আফসার, পুলিশ প্রধান আবদুল বশির।

বাঙালি শালারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন স্যারের মাথা নিয়ে ফুটবল খেলতে চায়? এত দুঃসাহস বাঙালিরা কোথায় পায়?

আফসার খানের টেবিলের ওপর রাখা আপেলের টুকরো মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলে দোহা, স্যার টোটাল ব্যাপারটাই ইন্ডিয়ার চাল। ওদের তৈরি ব্লুপ্রিন্ট। ওরা কোনোভাবেই পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্থির থাকতে দেবে না। দলে দলে মুজাহিরের নামে হিন্দুদের পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা পূর্ব বাংলায় পাঠিয়েছে ধুতি পরে কিন্তু এখন পড়ছে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। নারায়ণগঞ্জের এই মহিলা মমতাজ বেগম প্রকৃতপক্ষে হিন্দু।

হিন্দু?

অনেকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সুযোগ খুঁজছিলেন হোম সেক্রেটারি আফসার খান, জি স্যার হিন্দু। ভদ্রমহিলার আগের নাম কল্যাণী রায় চৌধুরী। ওর পিতার নাম মহিমচন্দ্র রায়। বাড়ি কলকাতার নৈহাটি।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকল কীভাবে?

পাশে দাঁড়িয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে দোহা। আফসার খান একটা ইতর। পাকিস্তান সরকার যখন দোহাকে আনসারের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিচ্ছে, এই লোকটা বাধা দিয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের একটা কর্নেলকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের জোর সুপারিশের কারণে পারেনি। হারামজাদা এখন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আজিজ আহমদের প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের সব শালারা এক, এত সেবা দেয়ার পরও হারামিরা বিশ্বাস করে না বাঙালিদের। দোহার মনের মধ্যে উল্টো দিকের একটা চাকা ঘুরতে শুরু করে, বাঙালি হওয়া অপরাধ কেন? বাঙালিরা পাকিস্তান আন্দোলনে জীবন দিয়েছে অনেক বেশি। কায়েদ-ই-আজমের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডেতে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হিন্দুদের হাতে জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশু। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন...

পানির গ্লাসের পানি করে মুখ খোলে আফসার খান, স্যার কয়েক বছর আগে এই নারী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর আবদুল মান্নাফকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেছে কলকাতায়। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান হলে চলে আসে এই দেশে।

আজিজ আহমদ আবার বসে পড়েন, এতো বিস্ময়কর জালিয়াতি।

জি স্যার, আমি এ দেশের মোমিন মুসলমানদের এই বিষয়টাই বোঝানোর চেষ্টা করছি।

কানে রিসিভার নিয়ে অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ, মানুষ বাড়ছে, স্লোগান বাড়ছে। কিন্তু ঢাকার বড় স্যারদের খেজুরে আলাপ আর শেষ হচ্ছে না। মিছিলকারীরা রিকশার ওপর দাঁড়িয়ে ভেতরে কী হচ্ছে দেখাও চেষ্টা করছে। যদিও কলাপসিবল গেট আটকানো, তালা মারা হয়েছে বেশ কয়েকটা। পুলিশ ও আনসার পাহারায় কিন্তু মিছিলকারীরা গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে কলাপসিল গেট ঝাঁকাচ্ছে, এমন শক্তিতে ঝাঁকাচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে। যদি কলাপসিবল গেট ভেঙে ফেলে আর এই হাজার হাজার মানুষ ঢুকে যায় আদালতের মধ্যে, মহকুমা প্রশাসক আর ভাবতে পারে না। হালকা শীতের মধ্যে ঘামতে শুরু করে ভদ্রলোক। শরীরের কালো কোর্ট খুলে চেয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে।

হ্যালো? এবার হোম সেক্রেটারির গলা। কী অবস্থা এখন ইমতিয়াজ?

গলা রীতিমতো কাঁপছে ইমতিয়াজের, স্যার পরিস্থিতি না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। আগে বুঝতে পারিনি, এই মহিলা এত জনপ্রিয়।

ওরা কী চায়?

স্যার জনগণ চায় মমতাজ বেগমের মুক্তি।

স্কুলের পঁচিশ হাজার টাকা আত্মসাতের মামলার আসামি, সেই আসামির বিচার না হয়ে মুক্তি কীভাবে সম্ভব?

কিন্তু স্যার নারায়ণগঞ্জের জনগণ বিশ্বাস করে না মমতাজ বেগম স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। জনগণ মনে করছে, মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিধায় সরকার ষড়যন্ত্র করে এই মামলা সাজিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে স্যার, মমতাজ বেগমের মুক্তির জন্য মর্গান স্কুলের ছাত্রীরাও এসেছে। বিষয়টা বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে।

তুমি এক কাজ করো, তোমার এই অফিসটা কয় তলার?

তিনতলা স্যার।

তুমি দোতলায় যাও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনগণকে বুঝিয়ে বলো, সরকার মমতাজ বেগমকে ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার করেনি, গ্রেপ্তার করেছে স্কুলের টাকা আত্মসাতের জন্য।

স্যার সমস্যা আরও আছে– ইমতিয়াজ গলায় কাশি জমেছে। খুক খুক কাশছে।

কী সমস্যা?

আদালতের আইনজীবীরা একট্টা হয়ে মমতাজ বেগমের জন্য জামিন প্রেয়ার করছে, নগদ দশ হাজার টাকায়। স্যার কঠিন পরিস্থিতি, কী করব এখন? জামিন না দিলে এখানকার লোকজন...

আরে রাখো তুমি! ধমকে ওঠে আফসার খান। সরকার একটা প্ল্যান করেছে অনেক ভেবেচিন্তে, জামিন দিলে সরকার থাকে? তোমাকে

যা বলেছি তাই করো। আমি আজিজ স্যারদের সঙ্গে আলাপ করে তোমাকে জানাচ্ছি। ঠিক আছে?

জি স্যার, ঠিক আছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক ঠাস শব্দে টেলিফোনের রিসিভার রাখার শব্দ পায়। বেচারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিন মাস আগে পূর্ব বাংলায় আসার সময়ে ভীষণ আনন্দিত ছিল। শুনেছে এই অঞ্চলের মানুষ খুব ভালো। নম্র, ভদ্র, আর দরিদ্র। দরিদ্রের কারণে লেখাপড়া করতে পারে না। ঘরে নারীরা পরে থাকে লম্বা শাড়ি। যাতে শরীরের অর্ধেকের বেশি দেখা যায়। বাইরে পুরুষরা পরে লুঙ্গি...। অনেকটা লেংটির মতো লাগে। মুখে চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। অথচ ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নামার পর গাড়ি পাওয়া যায়নি। কারণ, ঢাকায় হরতাল।

কিসের হরতাল? ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করে ইমতিয়াজ।

ভাষা আন্দোলন চলছে– পশ্চিম পাকিস্তানের একজন অফিসার জানায়। যে অফিসার রিসিভ করতে এসেছে।

ভাষা আন্দোলনটা কী?

বুঝিয়ে বলে অফিসার, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের একটাই ভাষা, মানে উর্দু প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মানতে চায় না।

কেন? সরকারের সিদ্ধান্ত মানবে না কেন? একটা দেশ, একটা ভাষা থাকলে ঐক্য গড়ে উঠবে। শাসনকাজ চালাতে সুবিধা হবে, আমলার আমলাতান্ত্রিক ভাষ্য ইমতিয়াজের গলায়।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা উর্দু ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে চায় না। বাঙালিরা মনে করে, পশ্চিম পাকিস্তান মানে করাচির সরকার বাঙালিদের ওপর জুলুম করছে। হাজার বছর ধরে যে ভাষায় বাঙালিরা কথা বলছে, সেই মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দু চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। আজকের হরতাল তারই প্রতিবাদে। আর দেখেন, কোথাও একটা গাড়ি নেই। গোটা রাস্তা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মতো ফাঁকা। আপনার জন্য গাড়ি আসতে পারেনি এ কারণে। অবশ্য বিকেলের দিকে হরতাল শেষ হলে গাড়ি পাওয়া যাবে।

সেই বিকেল পর্যন্ত আমি এয়ারপোর্টে বসে বসে মাছি মারব?

না স্যার, আপনার জন্য ভিতরে বসার ব্যবস্থা করেছি বিমানবন্দরের স্টেশন ম্যানেজারকে বলে।

রাস্তায় গাড়ি না থাকার কারণে ভিতরে ভিতরে রাগ হচ্ছিল ইমতিয়াজের কিন্তু অফিসার আসিফ আলীর ত্বরিত সিদ্ধান্ত জেনে খুশি হলো। ভেবেছিল বিকেল পর্যন্ত এয়ারপোর্টের বারান্দায় বসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আসিফ আলী ব্যাগ নিয়ে এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের দিকে নিয়ে যায় ইমতিয়াজকে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা সুখের নয়। শুনেছে ভেতো বাঙালি সাত চড়েও রা করে না, অথচ গোটা ভূগোলটাই উল্টো। কথায় কথায় প্রতিবাদ করা বাঙালিদের স্বাভাবিক স্বভাব। মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগমকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের মানুষ যা করছে, ভাবা যায়?

হোম সেক্রেটারির আদেশ মাথায় নিয়ে দুজন বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনজন পুলিশ, কয়েকজন কর্মকর্তা সঙ্গে ইমতিয়াজ আদালত ভবনের দোতলায় গেলেন। জনগণের চিৎকার, স্লোগান একমুহূর্তের জন্যও থামছে না। সঙ্গের লোকজন নিয়ে বারান্দায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন উৎসুক্যে নিয়ে তাকায়। পাশে দাঁড়ানো বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট ফিরোজ আখতার চিৎকার করে বলেন, আপনারা শুনুন, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ স্যার আপনাদের উদ্দেশে কথা বলবেন।

ইমতিয়াজ সামনে লোকজনের ভিড় সরাসরি দেখে একটু ভিরমিই খায় কিন্তু দ্রুত নিজেকে আত্মস্থ করে গলাখাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করে, ভাইসব! সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি যে, মমতাজ বেগম মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আমরা সবাই তাকে সম্মান করি কিন্তু স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করলে তো সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কারণ, জনগণের টাকার হেফাজতকারী সরকার। মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনের জড়িত বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এটা ঠিক নয়।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের মানুষ ভীষণ ক্ষেপে যায়। আগের চেয়ে স্লোগান দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এতক্ষণ জনগণ কেবল স্লোগান আর কলাপসিবল গেট ঝাঁকানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন ইটের টুকরো মারা শুরু করেছে আদালতের দিকে। বেশ কয়েকটি জানালার কাচ ভেঙে ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে এর টুকরো টুকরো ভগ্নাংশ। দ্রুত বারান্দা থেকে সরে আসে মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ দলবলসহ। না হলে ইটের টুকরো আঘাত করত। আবারও ঘামছে ভদ্রলোক। মনে মনে একটাই প্রশ্ন লোকটার, হাড়-ঝিরঝিরে হাভাতে মানুষগুলো প্রতিবাদের এত শক্তি কীভাবে পায়? কে জোগায়? এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষ বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ।

দোতলা থেকে নিচের তলায় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যাবার সময়ে হাতজখানার সামনে দিয়ে যান ইমতিয়াজ। হাজতখানা অতিক্রম করার সময়ে দেখতে পান, ভেতরে একটা চেয়ারে বসে আছেন মমতাজ বেগম। বিস্ময়ে বিমূঢ় জেলা প্রশাসক। হাজতখানায় চেয়ার? সেই চেয়ারে বসে আছেন মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম, যার বিরুদ্ধে পঁচিশ হাজার টাকা তহবিল তছরুপের অভিযোগে বিচার হচ্ছে। আসামিকে ঘিরে হাজতের দশ-বারোজন গল্প করছে।

আসামি চেয়ার পেল কোথায়? কড়া গলা জেলা প্রশাসকের।

পিছন থেকে সামনে আসে বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট ফিরোজ আখতার, আমি দিয়েছি স্যার।

আপনি দিয়েছেন আসামিকে চেয়ার? অবিশ্বাস্য দৃষ্টি ইমতিয়াজের। আপনি ম্যাজিস্ট্রেট, বিচার করেন, আইন জানেন না?

নিশ্চয়ই জানি স্যার।

তাহলে আসামিকে চেয়ার দিলেন কেন?

ফিরোজ আখতার চোখ রাখে মহাকুমা প্রশাসকের চোখে, স্যার! আইন তো আইন। মানুষের মনের মধ্যে এক ধরনের আইন আছে, সে আইন মনুষ্যত্বর। আপনি বলুন, হাজতখানায় মমতাজ বেগমকে আমরা আসামি বানিয়ে স্কুল থেকে তুলে এনেছি, সত্যি কি তিনি স্কুলের টাকা চুরি করেছেন? আপনিও জানেন, আমিও জানি, আমরা জানি, তিনি নির্দোষ। সৎমানুষ। সাহসী মানুষ। নিজের মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তো কিছু বলেননি। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক। সম্মানিত শিক্ষক। আমরা এখানে এসেছি এসব শিক্ষকের কাছ থেকে হাতে-কলমে শিখে। একজন ছাত্র হিসেবে আমি একজন শিক্ষককে সম্মান দিয়েছি মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, আমি কোনো অপরাধ করিনি।

হতভম্ব জেলা প্রশাসক তাকায় সঙ্গের অফিসারদের দিকে। সবার চোখের ভাষায় ফিরোজ আখতারের বক্তব্য মেনে নিয়েছে। এমন হতে পারে, ফিরোজ এদের সঙ্গে আলাপ করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন ঘরে বাইরে শত্রু বাড়িয়ে বিপদের পরিধি বাড়ানোর দরকার নেই। কৌশলী হওয়া দরকার। মুখের এক ধরনের পরাজিত হাসি ফুটিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই করেছেন। আর আইন? আইন তো মানুষই তৈরি করে, মানুষের জন্য।

জি স্যার, মাথা নাড়ায় ফিরোজ আখতার।

চলুন, কোর্টের দিকে যাওয়া যাক। দেখি, ওরা জামিনের কী করল?

বারো

পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের অফিসে অপেক্ষা করছেন আজিজ আহমদ, এএসএম দোহা, আশরাফ খান, পুলিশের আইজি আহমদ বশির। অফিসে আসতে দেরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাসায় বারবার ফোন করলে এনগেজ পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকার সরকারি বাসায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ফোন করেছিলেন, করাচি থেকে। ঢাকার রাজনীতির সঙ্গে ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আলাপ হয়েছে দুজনের

মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বলিষ্ঠভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনোভাবেই ভাষা আন্দোলন বাড়তে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু স্যার, বাঙালিরা তো মানছে না, সারা দেশে প্রতিদিন মিছিল-মিটিং-জনসভা করে চলেছে। ঢাকা তো নরককুণ্ড বানিয়ে ফেলছে। প্রায় প্রতিদিন হরতালও ডাকছে। আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট জানাচ্ছে, সবটাই ভারতের কারসাজি।

সেটা তো জানি, কিন্তু বাড়তে দেওয়া যাবে না কোনোভাবেই।

স্যার নারায়ণগঞ্জে একটা ঝামেলা হচ্ছে, বলতে চাইছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে।

কী ঝামেলা?

ঢাকায় ছাত্রদের ওপর যে গুলি হয়েছে, কয়েকজন মারাও গেছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে একটা জনসভা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। সেই জনসভায় একজন নারী, ওইখানকার একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নাম মমতাজ বেগম, স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে জনসভায় যোগ দিয়েছে।

বলেন কি? বাঙালি নারীরাও মিছিলে যোগ দিয়েছে?

জি স্যার। শোনা যায়, মহিলা ভারত থেকে এসেছে।

প্রমাণ আছে?

আছে।

ওকে এখনই গ্রেপ্তার করছেন না কেন? গ্রেপ্তার করে তথ্য-প্রমাণসহ ভারতের কাছে তুলে ধরার একটা মোক্ষম সুযোগ এসেছে। দুনিয়ার মানুষদের কাছে দেখিয়ে দিতে প্রমাণ করতে হবে, ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে।

স্যার, সেই মহিলাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে গ্রেপ্তার করে থানাহাজতে নিয়ে আসা হয়েছে।

গুড। আর একটা বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বলুন স্যার।

বিরোধী রাজনীতি যেন গড়ে উঠতে না পারে। কোনো সূত্র দেখলেই বিনাশ করে দেবেন।

নিশ্চয়ই স্যার।

ভালো থাকবেন, ফোন রেখে দিলেন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন।

করাচির ফোন রাখতে না রাখতেই আবার ফোন বাজে। রিসিভ করেন নাজিমউদ্দিন, হ্যালো?

স্যার, আমি আফসার খান, আমরা আপনার জন্য আপনার রুমে অপেক্ষা করছি।

কে কে অপেক্ষায় আছেন?

একে একে সকলের নাম বলেন আফসার খান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করাচি থেকে ফোন করেছিলেন। ওনার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলতে হলো। আপনারা বসুন, আমি আসছি।

আধা ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন অফিসে এসে পৌঁছায়। পারিষদের কাছে নারায়ণগঞ্জের ঘটনা শুনে চিন্তিত হলেন তিনি। যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ তো নয়ই, পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। খুবই বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা, যদিও নাম মমতাজ বেগম কিন্তু কয়েক বছর আগেও ছিল হিন্দু। পূর্ব বাংলায় এসে স্থায়ী আসনে গেড়ে এখন...

স্যার, নারায়ণগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ ফোন করেছিলেন, নীরবতার মধ্যে ঢুকে পরেন আজিজ আহমদ। জানতে চাইছিল মমতাজ বেগমকে নিয়ে এখন কী করবে? ওকে নারায়ণগঞ্জ রাখা নিরাপদ নয়। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

কী করতে চান আপনারা?

বোঝা যাচ্ছে, মহিলা নারায়ণগঞ্জে খুবই জনপ্রিয়। ওকে ঢাকায় সেন্ট্রাল জেলে আনা দরকার। নিরাপদ থাকবে, আমরাও স্বস্তিতে থাকব, মন্তব্য করেন দোহা।

নূরুল আমিন তাকান স্বরাষ্ট্র সচিব আফসার খানের দিকে, আপনি কী বলেন?

মাথা চুলকান আফসার খান, মনে মনে বলেন এই দেশটাই ঝামেলার। যেখানেই হাত দেয়, সেখানেই আগুন লাগে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতেই চায়নি আফসার খান চাষাভুষাদের এই মুল্লুকে। কিন্তু বড় মামা হেলাল খান বলল, দেখে আসো। নিজেদের দেশ। আর তুমি তো সরকারের নীতিনির্ধারক, চাষাভুষাদের সঙ্গে তোমার দেখাও হবে না। তুমি ঢাকায় থাকলে আমার সুবিধা হবে।

তাকায় মুখের দিকে, তোমার ব্যবসার?

হো হো হাসেন হেলাল খান, তেজগাঁওয়ে একটা ট্যালকম পাউডারের কারখানা শুরু করেছি। আরও করব, নারায়ণগঞ্জে একটা চটের কারখানার জায়গা দেখেছি। এক ভদ্রলোক আছেন, হিন্দু রণদা প্রসাদ সাহা– ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমার নিজের মিল থেকে চট তৈরি করে জাহাজে করাচি আনতে পারলে প্রচুর লাভ। তুমি পূর্ব পাকিস্তানের থাকলে...

তোমার অনেক লাভ বাড়বে, তাই তো! ডাইনিং টেবিলে কথা হচ্ছিল মামা ও ভাগ্নের। সেই সূত্র ধরে ঢাকায় আসা। কিন্তু কোথায় হাভাতে বাঙালি? এরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সহ্যই করতে পারে না। আফসার খান বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কেনো মাত্র ছয় বছরের মধ্যে দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘৃণার ফলক তৈরি হয়েছে। নিজে যা বুঝেছেন, সেটা কোথাও প্রকাশের সুযোগ নেই। সত্যি, বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, অবকাঠামোর বিস্তারে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। সব অধিকার থাকার পরও যে পিছিয়ে থাকে বা রাখা হয়, সে তো ঘৃণা করবেই। কিন্তু পাকিস্তান এমন একটা রাষ্ট্র, যার কাঠামো বাস্তবের ওপর নয়, স্রেফ ধর্মীয় কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই রাষ্ট্রকাঠামোর একজন হয়ে সত্য প্রকাশ করা সত্যি দুঃসাধ্য। সত্য প্রকাশ করলে আম এবং ছালা দুটোই হারিয়ে যাবে সমুদ্রের স্রোতে।

আফসার খান সমুদ্র থেকে ফিরে আসেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের মুখের দিকে, স্যার এটাই বাস্তবসম্মত হবে। মমতাজ বেগমকে ঢাকায় এসে সেন্ট্রাল জেলে রাখাই উত্তম।

গুড, মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, আপনারা সবাই যখন বলছেন তখন সেটাই করেন। মমতাজ বেগমকে ঢাকায় সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।

স্যার, নারায়ণগঞ্জের এই মুহূর্তের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে ওখানকার এসডিপিও আমিনউদ্দিনের সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে। আদালত কম্পাউন্ড ঘিরে কয়েক হাজার লোক– নারী পুরুষ শিশু শ্রমিক স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাসহ বাড়ির গৃহবধূরাও যোগ দিয়েছে। সবার একটাই দাবি, মমতাজ বেগমের মুক্তি।

অসম্ভব! টেবিলের ওপর চাপর দিয়ে দাঁড়িয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। চোখেমুখে ক্রোধের আগুন, একটা হিন্দু মহিলার কাছে হেরে যাওয়ার জন্য পবিত্র পাকিস্তানের জন্ম হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ অগ্নিপ্রকাশে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত এবং খুশি।

ঘুরে দাঁড়ান স্বরাষ্ট্র সচিবের দিকে, ওই মহিলারে ঢাকায় সেন্ট্রাল জেলে আনার জন্য কী করতে হবে?

স্যার, এখনই ইপিআর পাঠানো দরকার।

আদেশ প্রস্তুত করুন কতসংখ্যক ইপিআর পাঠাতে হবে, আমি সই করছি।

থ্যাংক ইউ স্যার, আফসার খান নিজের রুমে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ান, আমার টাইপিস্ট দিয়ে চিঠি প্রস্তুত করে নিয়ে আসছি।

আপনার রুমে যেতে হবে কেন? নূরুল আমিন ক্ষমতার মগডালে চরে বসেছেন, প্রধানমন্ত্রী অগাধ ক্ষমতা দিয়েছেন, ঠেকায় কে? আপনি আমার স্টাফদের ডাকুন, এখানে বসেই চিঠি প্রস্তুত করুন। আর দোহা, আপনি নারায়ণগঞ্জের আনসার প্রধানকে জানিয়ে দেন, ইপিআরের সঙ্গে যোগ দিতে। পুলিশ প্রধান আহমদ বশীরের দিকে

তাকিয়ে বলেন, আপনি ফোনে ইপিআর প্রধানকে ধরুন। আমি কথা বলব, চিঠি তৈরি হওয়ার আগেই যেন ইপিআর রওনা করে দেয় নারায়ণগঞ্জের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কক্ষ একজন নিরস্ত্র নারী মমতাজ বেগম মিনুর দিকে সকল অস্ত্র শানানোর অতি দ্রুত প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। গোটা পাকিস্তান ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে, গুটিয়ে যাচ্ছে মমতাজ বেগমের পায়ের কাছে। মমতাজ বেগম তখন নারায়ণগঞ্জের সেলে বসে বাইরে তাকিয়ে দেখছেন, মানুষের জন্য মানুষের ত্যাগের মহিমা।

তেরো

বাবা? চলো, আমি তো রেডি। ছোটমুখে মিষ্টি মিষ্টি বোল।

খুকু দুপুরের খাবার পরই সেজে প্রস্তুত। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু কী কবরেন বাবা আবদুল মান্নাফ, বুঝে উঠতে পারছেন না। অফিস থেকে বাসায় আসলে খুকু ভীষণ খুশি হয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে।

বাড়িওলা মহিবুর রহমান, পুরানা ঢাকার আরও পুরনো বাসিন্দা। ঢাকার গোপীবাগে সবচেয়ে উঁচু, ছয়তলা বাড়ির মালিক। লোকটার বিরাট ভুঁড়ি। ভুঁড়ির ওপর সাদা পাঞ্জাবি আর নিচে সাদা লুঙ্গি পরে যখন হাঁটে মনে হয় একটা সাদা হাতি যাচ্ছে। মাথার ওপর থাকে সাদা টুপি, নায়লনের সুতোয় তৈরি। সমগ্র দৃশ্যটা বিকৃত ও কদাকার হয়ে ছড়িয়ে যায় করোটির বিন্দু বিন্দুতে। লোকটার বয়স হলেও, হাঁটতে জড়তা আসলেও যৌবন সময়ের দানব হয়ে উঠতে চায় এখনো। কিন্তু শরীরের অমোঘ নিয়মে পারে না, কয়েক কদম হাঁটলে হাঁপিয়ে ওঠে, দম নিতে পারে না। কিন্তু ঘাড়ের শব্দে চিৎকার দিতে পারে এখনো। লোকটা মহিবুর রহমান পৌরসভার সদস্য ছিল অনেক দিনের। এখন ছেলে শহিবুর রহমান পৌর সদস্য। গোটা এলাকাটা ওদের ইশারায় চলে। সহজে কেউ বাসা ভাড়া নেয় না।

বিরাট বাড়ি, একেকটা রুমও বেশ বড়। বাসায় এসে দুপুরের খাবার খেয়ে খুকুকে ঘুম পাড়িয়ে আবদুল মান্নাফ তিনতলায় বাড়িওলার বাসায় আসে। যদিও মেয়ের কাছে এসেছে অফিস থেকে দ্রুত ছুটি পেয়ে, মনটা পড়ে আছে নারায়ণগঞ্জে। পুলিশ কি ওকে নির্যাতন করছে? শরীরে হাত দিয়েছে? তিনি শিউরে ওঠেন, ইলা মিত্রের ওপর পাকিস্তান সরকারের নির্মম নির্যাতনের ঘটনা এখনো দগদগে ঘা হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা বাংলায়। তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে পাকিস্তানের পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে ধর্ষণ করেছে, পালাক্রমে। আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন–

“কেসটির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। বিগত ০৭/০১/১৯৫০ তারিখে আমি রহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে বলে এসআই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে। আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জলও নয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলাতে এসআইয়ের উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত শুরু করে।... তারা অমানুষিক নির্যাতন চালায়। সেলে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিত করে শুইয়ে দেয় এবং একজন আমার যৌনাঙ্গের ভেতর একটা ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমি আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯ জানুয়ারি ১৯৫০ সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এসআই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমাকে চেপে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময় আধাচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এসআইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এসআই এবং সেপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিল। কিন্তু যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজি হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি ধর্ষণ করতে শুরু করল। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০ জানুয়ারি যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে, আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং কাপড়চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। এরপর আমাকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হলো এবং ২১ জানুয়ারি নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।... কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি।”

এরপর ইলা মিত্রকে পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে নির্যাতনের তৃতীয় ধাপ চলে। মুমূর্ষু অবস্থায় ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা গুরুতর দেখে ১৯৫৪ সালের ৫ এপ্রিল তৎকালীন যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পাঁচ সদস্যের এক কমিটি ইলা মিত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ আরও কয়েকজন নেতা প্রতিবেদনটি লেখেন। কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া যদি ইলাকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে আর তাকে প্রাণে বাঁচানো যাবে না। ইলা মিত্রকে দেখতে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শত শত ছাত্রছাত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের লোকজন ছুটে যায়। শেষপর্যায়ে সরকার তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে কলকাতা যাওয়ার অনুমতি দেয়। তিনি আর ফিরে আসেননি। বর্বর পাকিস্তান পুলিশের এই বর্বরযজ্ঞ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে, পড়ে মানুষ স্তম্ভিত হয়েছিল। একজন নারীর যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল গরম ডিম, তাও ইলা মিত্রের মতো একজন নারীকে। আবদুল মান্নাফ কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। নারায়ণগঞ্জের খবর জানা দরকার। বাড়িওলা মহিবুর রহমানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টেপেন। কাজের মহিলা দরজা খুলে দিলে ভেতরে চোখ রাখেন আবদুল মান্নাফ। বাড়িওলা মহিবুর রহমান সোফায় দুই পা ছড়িয়ে দৈনিক আজাদ পড়ছেন। মান্নাফকে দেখে পত্রিকার ওপর থেকে গলা বাড়ান, কী ব্যাপার বাবা? কিছু বলবেন?

চাচা, জরুরি একটা ফোন করা দরকার।

পত্রিকা রেখে হাসেন মহিবুর রহমান, আসেন আসেন। একটা ফোনই তো করবেন, ভেতরে আসেন।

আবদুল মান্নাফ ভেতরে ঢুকে সোফায় বসেন। সামনের টেবিলের ওপর রাখা সেটটা দেখিয়ে বলেন, করেন, ফোন করেন।

আবদুল মান্নাফ রিসিভার কানে নিয়ে ডায়াল ঘুরাতে থাকেন। ঘুরানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে রিসিভার তোলে একজন, হ্যালো? কে বলছেন?

নারায়ণগঞ্জ খাদ্য অফিস।

জি, কে বলছেন?

আমি ঢাকার খাদ্য অফিস থেকে বলছি, আবদুল মান্নাফ। আপনি কে?

আরে মান্নাফ ভাই, আমি সুকুমার হালদার।

আরে আপনি? দুজনে একই পদে চাকরি করেন। সুকুমার হালদারের বাড়িও গোপালগঞ্জে। সুকুমার দা, আমি জানতে চাইছি নারায়ণগঞ্জের পরিস্থিতি কী?

পরিস্থিতি মারাত্মক। আদালতপাড়া তো জনগণ ঘিরে রেখেছে সেই সকাল থেকে। ইটপাটকেল নিক্ষেপ আর জনতার মুহুর্মুহু স্লোগানে স্লোগানে নারায়ণগঞ্জ কেঁপে উঠছে। তবে ভয়ংকর একটা খবর পেলাম মান্নাফ ভাই। জানি না, বাঙালির কপালে কী আছে?

দমে যান আবদুল মান্নাফ। কী ভয়ংকর খবর? মমতাজকে কী

ওরা মেরে ফেলেছে? বুকের মধ্যে হাজার হাজার ড্রাম বেজে ওঠে মান্নাফের। এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? বাসায় মেয়েটি ঘুমুচ্ছে। খালা চলে গেছে। একটা কাজ করা যায়, খুকুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায়।

অনিয়ন্ত্রিত ভাবনার মধ্যে প্রশ্ন করেন আবদুল মান্নাফ, ভয়ংকর খবরটা কী?

মমতাজ বেগমকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিলিটারি পাঠাচ্ছে খুনি নূরুল আমিন।

গলাটা মুহূর্তেরও আগে শুকিয়ে যায় মান্নাফের, বলেন কী সুকুমার দা।

যা শুনলাম, আপনাকে বললাম। দাদা?

জি বলুন।

আমিতো সবই জানি। ঢাকায় আপনার বাসায় যতবার গিয়েছি বৌদি কত যত্ন করেছেন। কী অমায়িক হাসি বৌদির মুখে। আমাকে ছোট ভাইয়ের স্নেহে দেখেন। আপনিও একটু সাবধানে থাকবেন। পাকিস্তানের সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কখন কী করে বসে, চিন্তায় আসে না।

তা ঠিক। আচ্ছা রাখি, আবদুল মান্নাফ ফোনটা রেখে দেন।

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা? রিসিভার রাখার সঙ্গে সঙ্গে মহিবুর রহমান শুরু করেন, দেখেন কত বড় বেত্তমিজ এক মহিলা, ইন্ডিয়া থেকে এসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছে? আজাদ পত্রিকায় গত পরশু লিখেছে, এই মহিলা, নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার। নামে মুসলমান আসলে হিন্দু। ইন্ডিয়ার কারবারডা দেখেছেন? মালাউনরা কোনোভাবেই পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না। রাজনীতির সঙ্গে এখন ভাষার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হিন্দু মেয়েদের পাঠিয়ে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমার কী ইচ্ছে হয় জানেন? কাশি আসলে মনপ্রাণ ভরে কাশেন মহিবুর রহমান, আমার আগের বয়স নাই। থাকলে আমি নিজে চলে যেতাম নারায়ণগঞ্জে, গিয়ে মমতাজ না ফমতাজ, চুলের মুঠি ধরে রানদার কোপে দুই টুকরো করে রাস্তায় ফেলে রাখতাম। কতবড় ফেরেবভাজি পাকিস্তানের সঙ্গে, ভেবে দেখেছেন? বলেন, আপনার রাগ হয় না?

মাথা নাড়ান আবদুল মান্নাফ, জি।

আপনাদের তো কম বয়স। একটা কিছু করেন। না পারলে পাকিস্তান তো থাকবে না।

আপনার কী মনে হয়, একজন কিংবা দশজন মমতাজ বেগম এসে একটা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারবে? যদি করতেই পারে, সেই রাষ্ট্রের থাকার দরকার কী?

মানে?

পাকিস্তান রাষ্ট্র এত নড়বড়ে বা কাঁচা নয়, কোনো এক মহিলার ষড়যন্ত্রে ভেঙে পড়বে, হুড়মুড় করে। পাকিস্তানের মানুষ অনেক সচেতন...।

ঠিকই বলেছেন আপনি, ঠিকই বলেছেন।

আসি! দাঁড়ান আবদুল মান্নাফ।

আরে আরে বসেন, বাসার ভিতরের দিকে মুখ রেখে চিৎকার করেন মহিবুর রহমান, ওই রহিমার মা, চা দিয়ে যা। খেয়াল থাকে না বাসায় মেহমান এসেছে। আবদুল মান্নাফের প্রতিউত্তরে মহিবুর রহমানের মনোজগতের পাড় ভেঙে যমুনায় পড়ছে, ঝুমঝুম, ঝাপঝাপ। আপনার মতো আমরা চিন্তা করি না। মাথা ঝাঁকায় ভদ্রলোক, আপনি তো ঠিকই বলেছেন, পাকিস্তান! শুনতে কত ভালো লাগে, পবিত্র দেশ, পাক...। পাক স্থান মানে পবিত্র স্থান। এই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এত সহজ না। দারুণ বলেছেন, খুব ভালো বলেছেন, লোকটা মাথা ঝাঁকায় আর বলতে থাকে, দারুণ বলেছেন, খুব ভালো বলেছেন।

চাচা! বাসায় আমার মেয়েটা একলা আছে, ঘুম থেকে উঠে আমাকে না দেখলে চিৎকার করবে। এখন যাই, আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাব।

মেয়ে বাসায় একলা? মহিবুর রহমান কনফার্ম হতে চাইছেন।

জি, মেয়েটা একা। ওর মা স্কুলে, খালাও চলে গেছে। আমি যাই?

ঠিক আছে। যান কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে বসতে হবে। আপনি অন্যরকম চিন্তা করেন। পাকিস্তান যে একটা পবিত্র রাষ্ট্র আমার মাথায়ই ছিল না। আপনি এনে দিলেন, আপনার সঙ্গে বসতে হবে।

বসব আরেকদিন, এখন আসি? দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

আসেন, বিশাল বপু আর পেট নিয়ে দাঁড়ান ধীরে ধীরে মহিবুর রহমান। মহিবুর রহমানের দাঁড়ানোর দৃশ্য দেখছেন আর বিস্ময় মানছেন আবদুল মান্নাফ। মনে হচ্ছে বাড়িওলা মহিবুর রহমান উঠতে উঠতে ঢলে পড়ে যাবেন জলভরা কলসি যেভাবে পড়ে কাঁখের কংকন থেকে। কিন্তু না, মহিবুর রহমান পড়ে যান না, আবদুল মান্নাফকে অবাক করে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং এগিয়ে আসেন দরজার দিকে। এই বিশাল বপুর বাড়িওলা দরজার দিকে আসছেন, বুঝি দরজা বন্ধ করবার জন্য। কিন্তু না, আবদুল মান্নাফ বুঝতে পারেন যখন বিশাল বপু নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন কোলাকুলি করবার জন্য। কিচ্ছু করার ছিল না, অসহ্য হলেও বিশাল বপুর সঙ্গে নিজের পাতলা শরীর মিলিয়ে দিতে বাধ্য হলেন আবদুল মান্নাফ।

চৌদ্দ

বিকেলের দিকে ঢাকা থেকে কয়েকটা ট্রাকবোঝাই ইপিআর এসে নামে নারায়ণগঞ্জ কোর্ট ভবনের অদূরে। নেমেই ইপিআর কর্মকর্তা হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা করে, আপনারা যারা কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থান করছেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। না গেলে, ঠিক পাঁচ মিনিট পর আমরা অ্যাকশনে যেতে বাধ্য হবো। আবারও বলছি, আপনারা যারা...

কিন্তু জনগণ উল্টো দ্বিগুণ উৎসাহে স্লোগান দিতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে কোর্টপাড়ার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা থেকে সরকার ইপিআর পাঠিয়েছে। জনগণ আন্দোলনের বিজয় মনে করে আরও উৎসাহের সঙ্গে স্লোগান দেওয়া শুরু করে, মুক্তি চাই– মুক্তি চাই, মমতাজ বেগমের মুক্তি চাই। কল্লা চাই– কল্লা চাই, নূরুল আমিনের কল্লা চাই। রাষ্ট্রভাষা– রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই– বাংলা চাই।

নারায়ণগঞ্জের পুলিশ, আনসার, প্রশাসন– যারা এতক্ষণ, মানে সকাল দশটা থেকে এই দুপুর বারোটা একটা পর্যন্ত জনগণের কাছে এক ধরনের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছিল, সেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। যেহেতু ঢাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সরাসরি আদেশ করেছেন ফোনে, জেলা প্রশাসক ইমতিয়াজকে, যেভাবেই হোক মমতাজ বেগমকে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করো। মুসলীম লীগ সরকার একজন নারীর কাছে হেরে যেতে পারে না, যে নারী ভারতের চর। বুঝেছ তুমি?

জি স্যার, বুঝতে পেরেছি।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমতিয়াজের শরীরের সব জট খুলে যায়। এসডিপিও আমিনউদ্দিনেকে বলেন, প্রিজন ভ্যান আদালত প্রাঙ্গণে আনার জন্য পুলিশের প্রহরায়।

অবাক আমিনউদ্দিন, স্যার প্রিজন ভ্যান কেন আনার আদেশ দেব?

মমতাজ বেগমকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে, দুজনার মধ্যে আলাপ হচ্ছে কোর্ট বিল্ডিংয়ের মধ্যে। জনগণের ঘেরাওয়ের কারণে কোর্ট বিল্ডিংয়ের কেউ বাইরে যেতে পারছে না। আটকা পড়েছেন মহকুমার প্রায় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী। এদের সঙ্গে আটকে আছেন মমতাজ বেগমও। উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম মাত্র ছয় বছর। পাকিস্তানের আবার দুটি ডানা, দূরত্ব ১২০০ মাইল। একটি দেশ দুটি অঞ্চলের ধর্ম ছাড়া ভাষায়-কথায়, আচার-আচারণে, খাওয়া-দাওয়ায় নেই কোনো মিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম শাসন করছে পূর্বকে ঔপনিবেশিক চিন্তার নির্মম শাসনে,

কলোনিয়াল তৃপ্তিতে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের অবকাঠামোর প্রতি যত মনোযোগ শাসকদের, ঠিক ততটাই অমনোযোগ পূর্বের প্রতি। সেই কারণে নারায়ণগঞ্জ প্রাদেশিক রাজধানীর সবচেয়ে নিকটতম মহকুমা বা শহর হলেও তেমন অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে দোতলা একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে মহকুমা প্রশাসক, এসডিপিওসহ সকলেই ঠেসেঠুসে অফিস করে যাচ্ছেন। সেই ঠেসেঠুসে অবস্থার মধ্যে মমতাজ বেগমকে কেন্দ্র করে মহাপরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এক কথায় অসহ্য।

অসহ্য পরিস্থিতির মধ্যে গুমোট আবহাওয়ায় বাড়িয়ে দিয়েছে উপস্থিত হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক নারী পুরুষ নির্বিশেষ সকল স্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও ভয়ংকর নিনাদের স্লোগানের তরঙ্গ। ইমতিয়াজ দ্রুত চান মমতাজ বেগমকে ঢাকায় হস্তান্তর করতে। তাহলে ঝামেলা থেকে অনেকটা মুক্ত।

ছোট রুমের মধ্যে নিজের চেয়ারে বসে আছেন ইমতিয়াজ। সামনে বসে আছেন এসডিপিও আমিনউদ্দিন। শুনেছে এসডিপিও আমিনউদ্দিন প্রমোশন পেয়ে পেয়ে এখানে এসেছেন। জন্ম পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষক পরিবারে। ইমতিয়াজ ভারতে আইসিএস অফিসার। আরো শুনেছে, বাঙালিরা বিশ্বাসঘাতক। প্রমাণ তো নিচেই পাওয়া গেল পঁচিশ হাজার টাকা আত্মসাতের মামলার আসামি মমতাজ বেগমকে কীভাবে জেলের মধ্যে সম্মান জানিয়ে চেয়ার দিয়েছে ফিরোজ আখতার, বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং আমিনউদ্দিনের সঙ্গে বুঝেশুনে আলাপ করা দরকার। বলা তো যায় না, বাঙালি যেহেতু, বিশ্বাসঘাতক...।

ঢাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন, মমতাজ বেগমকে নারায়ণগঞ্জে রাখা নিরাপদ নয়। সেজন্য মমতাজ বেগমকে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে পাঠাতে হবে।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব? ইমতিয়াজের প্রদত্ত খবরে চমকে ওঠেন আমিনউদ্দিন, এত মানুষের জমায়েতের মধ্যে দিয়ে মমতাজ বেগমকে নিয়ে ভ্যান কেমনে আসা যাওয়া করবে? জনগণ তো ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। হাতে ধরা চায়ের কাপ থেকে চা ছিটকে পরে নিচের মেঝেয়।

আপনাকে সেই বিষয়ে ভাবতে হবে না, কারণ ঢাকা থেকে পাঁচশত ইপিআর আসছে।

নড়েচড়ে বসেন আমিনউদ্দিন, এটা কাজের কাজ হয়েছে স্যার। ইপিআরের লাঠির বাড়ি আর কাঁদানে গ্যাসের তোড়ে সব শালারা দৌড়াবে।

আপনি গেটের কাছে গাড়ি আনার ব্যবস্থা করুন।

এখনই করছি স্যার, এসডিও ইমতিয়াজকে কর্মতৎপরতা দেখানোর জন্য চায়ের কাপে শেষ চুমুক দাঁড়িয়েই দেয় তাড়াহুড়ো করে। চায়ের শেষ বিন্দু চা খেয়ে কাপটা টেবিলের ওপর রেখে রুম থেকে দ্রুত বের হয়ে যান আমিনউদ্দিন।

নিচে নেমেই তিনি পুলিশের ওসি বদরুল করিমকে নির্দেশ দিলেন, কোর্ট ভবনের সামনে প্রিজন ভ্যান নিয়ে আসার জন্য। কোর্ট ভবনের কাছেই, জনতার সমাবেশের কাছেই কয়েকটি গাড়ির সঙ্গে অপেক্ষায় ছিল প্রিজন ভ্যানটি। কয়েক মিনিট পরই প্রিজন ভ্যানটি চলে আসে জনগণের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে কোর্ট ভবনের সামনে। দুপুরের পর, জনগণের মধ্যে খিদের উদ্রেক ঘটেছে। আশাপাশের মানুষজন চলে গেছে বাসায়, খেয়ে আবার আসবে। যারা দূরের মানুষ, তারা কলা মুড়ি চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছে। সকালের স্লোগানের বেগ অনেকটা স্তিমিত। প্রশাসন সেই সুযোগটাই নেওয়ার জন্য কোর্ট ভবনের সামনে প্রিজন ভ্যান নিয়ে আসে। মমতাজ বেগম হাজতে বসে অন্য হাজতিদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

কামরুদ্দিন একটা হত্যা মামলার আসামি। বয়স্ক মানুষ। শরীরে মাংস নেই বললেই চলে। ছোটখাটো মুখের নিচে একখোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো খুব ছোট। একটা মেয়ে আছে, বিবাহিত। আজকে মামলার তারিখ জেনে মেয়েটি গ্রাম থেকে বাপের জন্য মুরগির মাংস আর চাল রান্না করে নিয়ে এসেছে। কামরুদ্দিন গরাদের ফাঁক দিয়ে খাবারের বাটি এনে মেঝেতে বসে খাচ্ছে আর কাঁদছে, জানেন মা, আমি কিন্তু খুনটা করি নাই। আমি জানিও না। কিন্তু চেয়ারম্যানের শালা লিয়াকত, লিয়াকতকে বাঁচাবার জন্য ওরা ষড়যন্ত্র করে আমার নাম আসামি হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভাত মাছ চেটেপুটে খাওয়ার পর জগে করে আনা পানি ঢগ ঢগ করে খায় কামরুদ্দিন। পানি খাওয়ার পর গামছায় মুখ মুছে তাকায় মমতাজ বেগমের দিকে, আমারও মনে হচ্ছে আপনিও কিছু করেননি, ঠিক আমার মতো ক্ষমতার শিয়ালেরা আটকে রেখেছে। গরাদের বাইরে মেয়েটি বসে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে দেখছে, মানুষজনের আসা-যাওয়া, মিছিল। শুনছে স্লোগান। দেখছে পুলিশের লাঠালাঠি। গরাদের মধ্যে একজন নারীও আছেন। তিনি সুকুমারী দেবী।

সুকুমারী দেবীর অপরাধ, তার গরু প্রতিবেশী হাসন মোল্লার ক্ষেতের সবজি খেয়েছে। সেই নিয়ে তুমুল ঝগড়া দুজনের মধ্যে। বিকেলের দিকে ঝগড়ায় গ্রামের শত শত মানুষ উপস্থিত ছিল। সুকুমারী দেবীর বাড়িতে একটা ছেলে আছে, প্রায় জন্মান্ধ। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। কিছু জমিজমা আছে সেই দিয়ে কোনোভাবে চলছে সংসার। কলকাতা রায়টের সময় স্বামী কলকাতায় আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, আর আসেননি। কোনো খবরও পাওয়া যায়নি। হয়তো আর কোনোদিন ফিরবে না, অজস্র মৃত্যুর মিছিলে বিসর্জিত হয়েছেন স্বামী গোরানন্দ মৃধা। ঝগড়ার দুদিন পরে বাড়িতে পুলিশ হাজির। কী ঘটনা? হাসন মোল্লা মামলা করেছে, সুকুমারী দেবী হত্যা করতে চেয়েছেন।

আসলে বুঝলেন মা, সুকুমারী দেবী বলেন, আমার ভিটেমাটি জমি দখলের পায়তারা। সবই বুঝি। তিন মাস হাজতে। জামিন হওয়ার কথা আজ। উকিল বলেছে, জামিন হবে। জায়গা জমিন সব যাক, দুঃখ নাই কিন্তু আমার অন্ধ ছেলেটা... হু হু কান্নায় ভেঙে পড়েন সুকুমারী দেবী।

গারদের সবাইকে আক্রান্ত করে সুকুমারী দেবীর থেঁতলানো কান্না। হাজতের বাইরে এবং ভেতরে প্রত্যেক মানুষ জীবনের বিমর্ষ লোমহর্ষক গল্প-ঘটনার সঙ্গে এভাবে সংসার করে যাচ্ছে। কে কার খবর রাখে? হাজতিদের জীবনের ঘটনা শুনতে শুনতে নিজের মনে হাসেন আর ভাবেন, আমিও কি সুকুমারী দেবী আর কামরুদ্দিনের গল্পের বাইরের কেউ? বরং আরও গভীরে প্রোথিত গল্পের চাকা বুকে নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছেন রক্ত পথের মিছিলে। কী ঘটবে আমাকে নিয়ে, ভাবতেই চান না। যা কিছু ঘটুক, আমি প্রস্তুত, এমন ইস্পাত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। পেটে একটু খিদের উদ্রেক অনুভব করছেন। হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকালেন, দুটো বেজে আট মিনিট। খিদে লাগার উপযুক্ত সময় পার হয়েছে আরও আধা ঘণ্টা আগে। ছোটবেলার অভ্যাস দুপুরের খাবার একটা থেকে দেড়টার মধ্যে সেরে নেন। সেখানে আধা ঘণ্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত! কেউ তো দেখা করতেও এলো না। তরুণ যে ম্যাজিস্ট্রেট বসবার চেয়ার এনে দিয়েছিল, কোনো বিপদে পড়ল না তো? বাইরে হৈ-হট্টগোল আগের চেয়ে ক্রমশ বাড়ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছে। গেটের সামনে মানুষের জটলা বাড়ছে। আমাকে কি জামিন দিয়েছে? লোকজন সেই কারণে কোর্ট বিল্ডিংয়ের দরজা কাছে আসছে?

মমতাজ বেগম মিনুর মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ স্রোত বইতে শুরু করে। জনতার বিজয় হাতের মুঠোয়। কোনোভাবেই বাঙালির বাংলা ভাষাকে অবদমন করে রাখতে পারবে না পাকিস্তানি দানবরা। মমতাজ বেগম আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বাসায় গিয়ে প্রথম কাজ হবে কামরুদ্দিন আর সুকুমারী দেবীর জামিনের ব্যবস্থা করা। পবিত্র ভাবনার মধ্যে কোর্ট বিল্ডিংয়ের বড় গেট খুলে যায়। ভিতরে প্রবেশ করে বারো-তেরো জন পুলিশ, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। পিছনে আরও দশ-বারোজন আনসার। আনসারদের হাতে রাইফেল নেই, আছে বড় বড় বাঁশের লাঠি। যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত পুলিশ ও আনসার। ভেতরে ঢুকে পুলিশের ওসি বদরুল করিম দাঁড়ায় হাজতের সামনে, ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাঠায় ভেতরে,

গারদের ফাঁক দিয়ে।

আপা! মিহি গলায় ডাকেন ওসি বদরুল করিম।

মমতাজের সঙ্গে হাজতের প্রত্যেকে তাকায়, গারদের ফাঁক গলে। এক জোড়া চোখের পেছনে আরও কয়েক জোড়া চোখ ভেসে আছে। প্রত্যেকের মাথায় পুলিশের খাকি টুপি। হাতে অস্ত্র।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন মমতাজ বেগম, বলুন। আমার জামিন হয়েছে?

ওসি বদরুল করিমের মুখে কেউ জামা ঘষে দেয়। যদিও করিম পেশাদারিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে একজন বাঙালির মানুষের মানচিত্রও ফুটে উঠছে ঝিকিমিকি জোনাকির আগুনে। একটা কাশি দিয়ে পিছনের পুলিশদের দিকে তাকায়।

মমতাজ বেগম বুঝে যায়, জামিন হয়নি। পুলিশেরা এসেছে অন্য কোনো মিশনে। বুকের মধ্যে যতটা না ভয়, অনেক বেশি হাহাকার বাজে, খুকুর জন্য। মেয়েটার সঙ্গে কবে দেখা হবে? অবুঝ অভিমানী খুকু সারা দিন, সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত অপেক্ষার পরও দেখবে, মা ফিরে আসে নাই ঘরে, কী করবে মেয়ে? কেমন করে সামলাবে অবুঝ মেয়েবে বাপ আবদুল মান্নাফ?

আপা, আপনি বাইরে আসুন। হাজতের তালা খোলার শব্দ হয়। তালা খুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় লোহার দরজা। ঘটনা কী, বোঝার সাধ্য নেই মমতাজ বেগমের। তিনি বাইরে পা রাখেন। শরীরটা পুরোপুরি বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছনে তাকান। সুকুমারী দেবী এবং কামরুদ্দিন ভেজা চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন মমতাজ বেগমকে। কী বুঝল দুজনে? মমতাজ বেগম বাসায় যাচ্ছেন?

বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা প্রথমে, পিছনে আনসারের দল ঘিরে দাঁড়ায় মমতাজ বেগমকে। মনে হচ্ছে, মমতাজ বেগমকে ঘিরে মানুষের তৈরি অন্ধকারের দুর্ভেদ্য দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। এই ঘন অন্ধকারের দেয়াল ভেঙে আর কখনো বইরের আলো বাতাসের দেশে প্রবেশ করতে পারবেন না তিনি। কেমন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মমতাজ বেগমের।

আপা, বাইরে, গেটের বাইরে চলুন।

গেটের বাইরে তো যাব কিন্তু পরে কোথায় যাব, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?

বাইরে গেলে আপনি দেখতে পাবেন। এখন চলুন– তাড়া লাগান ওসি বদরুল করিম।

অন্ধকার দেয়ালের মধ্যে দাঁড়িয়ে যান মমতাজ বেগম, আমাকে না বললে আমি যাব না। একটা পাও আমি সামনে বাড়াব না।

নারায়ণগঞ্জ থানার দ্বিতীয় দারোগা হারিস মিয়া পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছে আর মিটি মিটি হাসছে।

হঠাৎ মমতাজ বেগমের দৃঢ়তায় ওসি বদরুল করিম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাকান একে একে অন্য পুলিশদের মুখের ওপর। সবার মুখ ভাবলেশহীন, নৈর্ব্যক্তিক। কী করবেন বদরুল করিম? জোর করে গাড়িতে তুলবেন মমতাজ বেগমকে?

দেখুন, আমরা আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি, তার মানে এই নয়, আমরা খারাপ ব্যবহার করতে পারি না বা করব না। আপনি সম্মানিত শিক্ষক, সেই কারণেই বলছি, আপনি নিজে হেঁটে প্রিজন ভ্যানে উঠুন। সেটাই ভালো হবে।

বাইরে জনগণের স্লোগান আবার বাড়ছে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কোর্টের সামনে প্রিজন ভ্যান দেখে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, মমতাজ বেগমকে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছে। মুখে মুখে বার্তা রটে যায়, যেভাবে রটে যায় তারায় তারায়, জনে জনে।

আমি তো আপনদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। করেছিও। কারণ আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আপনি, আপনারা, এই দেশের পাঁচ কোটি মানুষের মুখের ভাষার মর্যাদার জন্য লড়াই করছি মাত্র, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন না, আপনারা বোঝেন সেটা। সুতরাং বলুন, আমাকে প্রিজন ভ্যানে তুলে কোথায় নিয়ে যাবেন? সেটা বললেই আমি গাড়িতে উঠব।

কিন্তু আপনাকে বলতে কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে, জানান ওসি বদরুল করিম।

তাহলে আমি উঠব না প্রিজন ভ্যানে।

বাইরের জনতার দ্রুত বাড়ছে। বাড়ছে স্লোগান। মুক্তি চাই– মুক্তি চাই– মমতাজ বেগমের মুক্তি চাই। কল্লা চাই– কল্লা চাই, নূরুল আমিনের কল্লা চাই। রাষ্ট্র ভাষা– রাষ্ট্র ভাষা, বাংলা চাই– বাংলা চাই। জনগণ স্লোগান দিতে দিতে কোর্টের মুখের কাছে এগিয়ে আসছে। ভয় পাচ্ছেন বদরুল আলম। ঢাকায় গুলি হয়েছে কয়েক দিন আগে। সারা দেশ টালমাটাল, এখন নারায়ণগঞ্জে যদি কেউ গুলি খায় বা মার্ডার হয়, পুরো জাতি আগুনে ঝাঁপ দেবে। আর এই মমতাজ বেগম তৈরি করছে সমস্যা।

স্যার! পানের পিক ফেলে দেয়ালে থানার দ্বিতীয় দারোগা হারিস মিয়া। আপনে আদেশ করেন, মহিলারে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে দিই। জীবনে হিন্দু মেয়েছেলে কোলে নিই নাই, একটা সুযোগ আসছে, দেন সুযোগটা।

কী যা-তা বলছেন? ধমক দেওয়ার চেষ্টা করেন বদরুল করিম।

আমার বড় ইচ্ছা করতেছে স্যার, উনি দেখতেও মাশাআল্লাহ, একটু কোলে নেওয়ার সুযোগ দেন। কোলে লইয়া গাড়িতে তোলার সময়ে ওনার নরম গালে একটু গাল লাগামুনে, এটুকুই আবদার, দারোগা হারিস মিয়ার চোখেমুখে পৈশাচিক উল্লাস। কয়েকজন পুলিশের মুখের দাঁত প্রসারিত হয়ে গেছে। শব্দ করে হাসছে না।

মমতাজ বেগম মিনু শিউরে ওঠেন। হারামজাদার খায়েশ কী, গালে গাল লাগাবে? ছি ছি ছি, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

স্লোগান আর জনতা ঘিরে ফেলেছে কোর্ট ভবনের গেট। লোকজন এত দ্রুত কোত্থেকে এলো? কমেছিল তো, দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। কিন্তু বাঙালি বড় সেয়ানা। ওসি বদরুল করিমের চোখেমুখে চিন্তার ভাঁজ, কী করবেন তিনি? হাতে সময় নেই।

আপা! মরিয়া হয়ে বলেন বদরুল করিম, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, সম্মান করছি, আপনি তো এতজন পুলিশের সঙ্গে পারবেন না। সবাই মিলে ধরে প্রিজন ভ্যানে তোলার চেয়ে নিজের সম্মানে আপনি উঠুন, আমরাও... মুখের বাকি বাক্য শেষ করেন না বদরুল করিম। চোখমুখের কঠোর অভিব্যক্তিতে জানিয়ে দেয়, যা বলেছে তা করবেও। কারণ, উপায় নেই ওদের।

স্যার! হারিস মিয়ার মুখে কুটকুটে হাসি। আমারে একটা সুযোগ দেন।

কী যে বলেন আপনি? ছি। আপা উঠুন, অনুগ্রহ করুন।

মমতাজ বেগম বুঝতে পারেন, নিজের ইচ্ছেয় না উঠলে প্রবলভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সুযোগ আছে। পুলিশের মধ্যে ওই হারামজাদা মুখিয়ে আছে। বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে কী-বা করার আছে, যেহেতু পড়েছেন ফান্দে। হাজতের মধ্যে থাকা সুকুমারী দেবীর দিকে চোখ রাখেন মুখ ঘুরিয়ে মমতাজ বেগম।

সুকুমারী দেবী বলেন, মা জননী আপনি নিজেই ওঠেন গাড়িতে। নইলে আরও অপমানিত হবেন। বুঝতে পারছেন না আপনি?

গভীর বোধ থেকে বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে মমতাজ বেগমের, চলুন। তিনি সামনের দিকে পা বাড়ান। ওসি বদরুল করিমের মুখে স্বস্তির আভাস।

চলুন... অন্ধকারে আবদ্ধ পুলিশের কর্ডনের মধ্যে মমতাজ বেগম বারান্দা পার হচ্ছেন। সামনে পিছনে ডানে বামে পুলিশ ও আনসারদের পায়ের বুটের কর্কশ শব্দ। পুরো কোর্ট বিল্ডিংয়ের লোকজন ভেঙে পড়ছে এই অভিনব অন্তরীণ মিছিল দেখার জন্য, সিঁড়িতে, বারান্দায়। বারান্দা পার হয়ে কোর্ট ভবনের মুখে দাঁড়ানো

প্রিজন ভ্যানের সামনে আসতেই, হাজার হাজার জনতার উন্মত্ত চিৎকার, মমতাজ বেগমরে ভ্যানে উঠাইতেছে, মমতাজ আপারে ভ্যানে উঠাইতেছে। হেরে ঢাকা লইয়া যাইতেছে। ভ্যানের ড্রাইভার আগেই খুলে রেখেছে দরজা। প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় মমতাজ বেগমকে পুলিশের ওসি বদরুল করিম। ভ্যানে তোলার পর নিজের মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পান, ভ্যানে তো তোলা গেল!

কিন্তু না, বদরুল করিমের স্বস্তি কয়েক মুহূর্তও কার্যকর থাকল না। চারদিকে ঘিরে থাকা হাজার হাজার জনতা পুলিশ ভ্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এত এত জনতার মধ্যে কয়েকজন পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে কী করবেন ওসি? সব চেয়ে মারাত্মক ঘটনা, মর্গান স্কুলের মেয়েরা ভ্যানের চারপাশ ঘিরে স্লোগান দেওয়া শুরু করেছে, আমাদের আপার মুক্তি চাই, আমাদের আপার মুক্তি চাই...। মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের পরিস্থিতি দেখে হতবাক, বিস্মিত। এই বাঙাল মুল্লুকের জনগণ পরিস্থিতির সঙ্গে সুন্দর সংগতি রেখে আন্দোলনের মুড পরিবর্তন করে ফেলে। যেমন জনতা এখন মিছিল করছে, স্লোগান দিচ্ছে প্রিজন গাড়িটাকে ঘিরে। মনে মনে আশঙ্কা করছে, জনগণ কি প্রিজন ভ্যান থেকে ছিনিয়ে নেবে মমতাজ বেগমকে? অজস্র মিছিলকারীর মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নেওয়া মহামুশকিল। কয়েকজন মিছিলকারী ছাত্রী ভ্যানের মধ্যে উঠে মমতাজ বেগমের পাশে দাঁড়িয়েছে। আরও উঠছে, পুলিশ ছাত্রীদের টেনে টেনে প্রিজন ভ্যান থেকে নামাচ্ছে। তিনজন নামাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, মুহূর্তে দশজন উঠে যাচ্ছে গাড়িতে। গাড়িতে উঠে মেয়েরা ভিন্ন স্লোগান তুলছে, আপাকে ছাড়া আমরা নামব না, নামব না, নামব না, আপাকে ছাড়া, আপাকে ছাড়া...।

ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে আসা ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্র আর বাঁশের লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে ইপিআর দেখে জনগণ একটু ভড়কে গেলেও কেউ জায়গা ছেড়ে যায় না। বরং তিন-চারগুণ উৎসাহে স্লোগান দিচ্ছে, রাষ্ট্র ভাষা- রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা চাই, বাংলা চাই। মমতাজ আপা- মমতাজ আপা, মুক্তি চাই- মুক্তি চাই। নূরুল আমিনের- নূরুল আমিনের, কল্লা চাই- কল্লা চাই। মিছিলের মধ্যে ঢুকেই ইপিআর জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠির আঘাতে অনেক ব্যথায় চিৎকার শুরু করে, মাটিতে গড়াগড়ি খায় কিন্তু জায়গা ছাড়ে না। ক্রমে ক্রমে জনতার ওপর ইপিআরের লাঠিচার্জ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিপরীতে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরাও এতক্ষণের খোলস পাল্টে রুদ্রদেহী রূপে আত্মপ্রকাশ করে, জনতার ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। একদিকে ইপিআর অন্যদিকে পুলিশ আনসার বাহিনীর আক্রমণ, চিৎকার, স্লোগান, চেঁচামেচি, টিয়ার গ্যাসের ঝাঁজালো আক্রমণে দিশেহারা জনগণের ঘনত্ব কিছুটা কমে যায়। বিশাল গণজমায়েতের মধ্যে ছোট একটা ফাটল তৈরি হলে সুচতুর পুলিশ ভ্যানটা চালিয়ে দেয় সামনের দিকে।

ভ্যানের মধ্যে মমতাজ বেগম ছাত্রীদের বোঝাচ্ছেন, মা তোমরা নেমে যাও। বাড়ির লোকজন মা-বাবা-আত্মীয়স্বজনরা চিন্তা করবে। ইতিমধ্যে তোমরা যা করেছ, অনেক করেছ। তোমাদের কাছে বাংলা ভাষা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

না, আপা আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।

চারদিকে মিছিল, স্লোগান, চিৎকার, মানুষের বেদনার্ত আর্তচিৎকার, টিয়ার গ্যাসের বিধ্বস্ত গন্ধ ও চোখের অসহ্য পানিতে একাকার। এসব জঘন্য পরিবেশের মধ্যে নূরুল আমিন সরকারের পুলিশ বাহিনীর পুলিশ ভ্যান এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। ভ্যান ঘিরে ইপিআর সদস্য আর পুলিশ আনসারের সদস্যরা দৌড়ে দৌড়ে পাহারা দিচ্ছে। ভ্যানের মধ্যে বন্দি মমতাজ বেগম স্বেচ্ছায় বন্দি মেয়েদের বোঝাচ্ছেন, আমি তো বড়। আমার কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু তোমরা কী খাবে, কোথায় ঘুমুবে? শুনেছি, জেলে অনেক কষ্ট। চলে যাও। আমি বললে, গাড়ি থামিয়ে তোমাদের নামিয়ে দেবে।

পারুল, নবম শ্রেণির ছাত্রী, হাত জড়িয়ে ধরে মমতাজ বেগমের, আপনাকে ছাড়া আমরা গাড়ি থেকে নামব না আপা। ছোট্ট করুণ বিষণ্ন বেদনায় ভারাক্রান্ত কিন্তু ভীষণ পবিত্র মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মমতাজ বেগমের সকল সত্তা ব্যাকুল আর্তনাদে ফেটে পড়তে চাইছেন। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু সমগ্র শরীরের কোষ থেকে আনন্দ ও ক্রোধের কান্না ঝড়ের বেগে আসছে, সমুদের অসীম তরঙ্গ ডিঙ্গিয়ে। মেয়েগুলো প্রিজন ভ্যানের মধ্যে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে মমতাজ বেগমকে। মমতাজ বেগমও জড়িয়ে ধরেন দুহাতে বুকের সঙ্গে, চোখ ফেটে অবিরল জল নামছে।

আপা? স্বপ্না ডাকে।

তিনি অশ্রুরুদ্ধ করতে করতে বলেন, কী মা?

আমরা স্লোগান দিই?

মমতাজ বেগমের বুকের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বর্ণমালার পায়রা ডেকে ওঠে, বাকুম বাক, বাকুম বাক। তিনি এই দুস্তর বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে, কান্নার কাতর মুখে হাসেন। স্থির বিশ্বাসে পৌঁছে যান, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা নেই। এই ভাষার কোনো বিনাশ হবে না, ওরা হেরে যাবে। মমতাজ বেগমের ভাবনার মধ্যেই আরতী স্লোগান ধরে, মুক্তি চাই- মুক্তি চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তরে স্লোগান দেয় স্বপ্না, আয়েশা, ঝরনা, সুনয়না, সুরভী– মমতাজ আপার- মমতাজ আপার। প্রিজন ভ্যানের মধ্যে থেকে স্লোগান শুনে প্রিজন ভ্যানের সঙ্গে চলতে থাকা পুলিশেরা অবাক ও বিভ্রান্ত। এই মেয়েগুলোকে নিয়ে কী করবে? সাহস দেখো মেয়েগুলোর? আর কত্তবড় বুদ্ধি? গাড়ির বাইরে স্লোগান, গাড়ির ভেতরে স্লোগান।

একজন পুলিশ বাইরে থেকে ভ্যানের গায়ে থাপ্পড় মারে। বারবার থাপ্পড় মারার কারণে হাতে ব্যথা পেয়ে থাপ্পড় মারা বন্ধ করে। মমতাজ বেগম চোখের সামনের ঘটে যাওয়া অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে যেমন বিচলিত তেমনি আনন্দিত, যত সমস্যা বা সংকটই হোক, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষার মর্যাদা না দিয়ে পারবে না। চারদিকে যেভাবে মানুষ জেগে উঠেছে, পুলিশের নিপীড়ন সহ্য করছে...।

রাইফেলের বাটের বেদম মার, টিয়ার গ্যাস আর লাঠিপেটায় কোর্ট প্রাঙ্গণ এবং আশপাশের লোকজন সরে যেতে বাধ্য হলে পুলিশ মমতাজ বেগমকে বহনকারী গাড়ি নিয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা করে।

পনেরো

বাবা?

কী মা?

চলো, আমি তো সেই কখন থেকে রেডি। চলো মায়ের কাছে... বাবার হাত ধরে টানে খুকু। বিছনায় মেয়ের পাশে শুয়ে ছিলেন আবদুল মান্নাফ। বিচিত্র ভাবনায় মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত। কী হবে সংসারের? মমতাজ সংসারে না থাকলে এই সংসার কীভাবে চলবে? মেয়েটা মাকে খুব কম কাছে পায়। ছুটির দিন ছাড়া মমতাজ বাসায় থাকে রাতের দিকে, আসে বিকেলে। বাসায় আসলে কোথাও না কোথাও মিটিং থাকে। শুরুতে খুব ভাবনা ছিল মমতাজ বেগমকে নিয়ে, প্রথমত বনেদী হিন্দু ঘরের মেয়ে, দ্বিতীয়ত কলকাতার মেয়ে, আলাদা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলার বাঙাল সমাজ ও সংসারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে তো?

মমতাজ বেগম মিনু সত্যিকার অর্থে অসাধারণ এক নারী। সবকিছু ছেড়ে উজাড় করে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও সংসারের সঙ্গে কেবল মানিয়েই নেয়নি, পরম দায়িত্বশীল একজন মানুষ। গ্রামে কয়েকবার গেছে মিনু, ভয় ছিল গ্রামের মানুষ কীভাবে নেবে তাকে। উল্টো মিনুই গ্রামের নারী-পুরুষ সবাইকে আপন মহিমায় আপন করে নিয়েছে। সেই গ্রামের মানুষেরাই খোঁজখবর নেয়, বৌমা কেমন আছে? কবে আসবে? মমতাজ বেগম মিনু গ্রামে যাওয়ার সময়ে, বাড়ির প্রত্যেকের জন্য অনেক কিছু নিয়ে যায়। বাড়ির আশপাশের দরিদ্র আত্মীয়স্বজনরাও বঞ্চিত হয় না মমতাজের মমতা থেকে। যে টাকা বেতন পায় সবটাই খরচ করে উদার হাতে, জমা কিছু রাখে না

মসৃণ ও নিখুঁত মুদ্রণের জন্য
ব্যবহার করুন
সোনালী A4 পেপার
www.younusgroup.com

হাতে। অবাক ঘটনা, মমতাজের শাশুড়িও বৌকে সাপোর্ট করেন।

সেই মমতাজ মিনু এখন পাকিস্তানি পুলিশের হাতে হেস্তনেস্ত হচ্ছে। ওর শরীরে কি হাত তুলেছে? শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায় আবদুল মান্নাফের। আবার সামনে আসে নাচোলের রানীমা ইলা মিত্রের জবানবন্দি। বুকটা হু হু করে আবদুল মান্নাফের, এই পাকিস্তানের জন্য কলকাতার রাস্তায় মিছিল করেছি, সেই মিছিলের প্রতিদান আমার স্ত্রী এখন কারাগারে? পাকিস্তানি পুলিশের হাতে বন্দি? কী অপরাধ মমতাজ মিনুর? ভাষার জন্য, নিজের মুখের ভাষার জন্য লড়াই করেছে, সেই অপরাধে একজন নারীকে এই হেনস্তা করবে সরকার? আবার মুসলীম লীগ? কী পবিত্র শাসন?

ভাবনার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় খুকুর। ড্রয়িংরুমের এক পাশে খাট। খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। চোখ খুলেই বাপকে পাশে দেখে প্রথম জিজ্ঞাসা, মা কই?

মা? খুকুকে আদর করতে করতে বলেন আবদুল মান্নাফ, তুমি? তুমিই আমার মা।

দুদিকে প্রবল মাথা নাড়ায়, তোমার মা নয়। আমি বলছি আমার মা কই?

তোমার মা? ছোট মেয়েটির ছোট প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন আবদুল মান্নাফ? দ্রুত ভাবছেন তিনি। জীবনে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, কত সাবলীল জবাব দিয়েছেন। অথচ আজ ছোট খুকুর ছোট্ট প্রশ্নের জবাবের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

খুকু হাই তুলে বিছনা থেকে নামে।

কই যাও তুমি?

দেখি, মা কই! খুকু দৌড়ে বেডরুমে যায়। উঠে বসেন মান্নাফ। খুব অসহায় লাগছে নিজেকে। তাকিয়ে আছেন দরজার দিকে। পলকমাত্র মেয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে, শূন্যহাতে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যায় পাশের রুমে, পাশের রুম থেকে বারান্দায়, কোথাও খুঁজে পায় না পাঁচ বছরের খুকু মাকে। কিন্তু বারান্দা থেকে আসে না আর। অপেক্ষা করছেন তিনি। বারান্দা থেকে ফিরে আসুক খুকু। কিন্তু আসছে না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের দূরত্ব ওর পক্ষে। বাসার মধ্যে খুকু দৌড়ের ওপর চলাচল করে, একমুহূর্ত স্থির থাকে না। সেই খুকু কেন আসছে না বারান্দা থেকে?

খাট থেকে নেমে আবদুল মান্নাফ বারান্দার দিকে যান। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বারান্দায় চোখ রাখেন। বুকের ভেতরটা হু হু কান্নায় আছড়ে পড়ে। মেয়েটা বুঝে গেছে, মা বাসায় আসেনি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে যাত্রা করছে দিন। আবদুল মান্নাফ দ্রুত লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট গায়ে চড়িয়ে আবার বারান্দায় এলেন। খুকু বড় উদাস চোখে সেই রকম বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এসো মা, আবদুল মান্নাফ এক লহমায় দুহাতে জড়িয়ে মেয়েকে কোলে নেন, চলো।

শ্রীময়ী দুহাতে পিতার গলা জড়িয়ে ধরে খুকু, কোথাও যাব আমরা বাবা?

বাইরে।

মাকে আনার জন্য?

থমকে যান আবদুল মান্নাফ মেয়ের প্রশ্নে। আবদুল মান্নাফ বাসায় আগে এলে বিকেলের দিকে খুকুকে নিয়ে বের হয়ে যান। রিকশায় ঘোরাঘুরি করেন, বুড়িগঙ্গার বাকল্যান্ড বাঁধের কাছে নিয়ে বসে থাকেন। যখন বোঝেন নারায়ণগঞ্জ থেকে বাসে ফেরার টাইম হয়েছে মমতাজের, দুজনে অপেক্ষা করেন বাসস্ট্যান্ডে। একটি কি দুটি বাসের পরই মা চলে আসেন। খুকু মাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে যায় মায়ের দিকে। মমতাজ বেগম মেয়েকে কোলে নিয়ে আবদুল মান্নাফের কাছে আসেন। বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া চাঅলা কিষান মজুমদারের চেনা দৃশ্য। মেয়েক কোলে নিয়ে বাপকে সঙ্গে কিষান মজুমদারের টি স্টলে বসে গল্প করতে করতে চা পান করেন মমতাজ আর মান্নাফ। খুকু খায় বিস্কিট, লজেন্স। রঙিন লজেন্স থেকে খেতে মুখ লাল বা সবুজ করে ফেলে খুকু। মমতাজ বেগম আঁচলে মুছে দেন।

বাড়ির বাইরের গেট পার হয়ে মেয়ের প্রশ্নে উত্তর দেন মান্নাফ, না মামণি। আজকে তোমার মা মনে হয় আসতে পারবে না।

কেন মা আসতে পারবে না?

তোমার মা যে স্কুলে পড়ায়, ওখনে অনেক কাজ তো, তাই।

ওই স্কুলটা পচা। খুব পচা না বাবা?

মেয়ের সঙ্গে সায় দেন আবদুল মান্নাফ, হ্যাঁ মা। স্কুলটা পচা।

মেয়েকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে আবদুল মান্নাফ হাঁটছেন আর বিকেলের বিষণ্ন ঢাকা শহরের উড়ে যাওয়া কাক, রাস্তার পাশে ময়লা খোঁটা শালিক, রাস্তার পাশের বাড়িগুলো থেকে বের হয়ে আসা হাঁস-মুরগির বিচিত্র বিচরণ দেখছেন ঠিকই কিন্তু ভাবনায় আছে মমতাজ বেগম। ওকে কি ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ? নারায়ণগঞ্জ থানায় আটকে নাকি জেলে আটকে রেখেছে? আমার এখন কী করা উচিত? মেয়েটাকে কারও কাছে রেখে যদি একবার যেতে পারতাম? বিক্ষুব্ধ চিন্তার মধ্যে আবদুল মান্নাফ ঢাকার রাস্তায় প্রিয় আত্মজাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছেন, হাঁটছেন আর হাঁটছেন, অনেকটা বিভ্রান্ত, চোখেমুখে অসহায়ত্বের অন্ধ আলো মেখে।

ষোলো

নারায়ণগঞ্জের কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গাড়ি ছুটছে তুমুল বেগে ঢাকার দিকে। মহাকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ, পুলিশপ্রধান আমিনউদ্দিন, থানার ওসি বদরুল করিমসহ সরকারের উর্ধ্বতন সবাই খুশি। ঘাড়ের ওপর দিয়ে একটা মস্ত বড় পাহাড় নেমে গেছে। খুশি বা বিপদ থেকে মুক্তির মহেন্দ্রক্ষণ উদযাপনের জন্য সবাই জেলা প্রশাসক ইমতিয়াজের রুমে বসেছেন।

ইমতিয়াজ শরীর ছেড়ে দিলেন চেয়ারের ওপর, মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান। বেয়ারা সমরেন্দ্র নিয়ে আসছে গরম শিঙাড়া। রাখছে টেবিলের ওপর। মুখে দিয়ে মহানন্দে চিবাচ্ছেন আমিনউদ্দিন। চিবাতে চিবাতে তাকান জেলা প্রশাসকের মখের দিকে।

জেলা প্রকাশক ইমতিয়াজ চক্ষুমুদ্রিত করে ভাবছেন, কেন আমি পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে এলাম? এত যন্ত্রণা তো পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না। কেবল বেলুচিস্তানের স্থানীয় রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার নামে একটা ঘোট পাকানোর চেষ্টা করছিল, সরকার নির্মমভাবে দমন করেছে। অনেককে জেলে পুড়েছে নয়তো হত্যা করেছে ঠান্ডা মাথায়। মাদারে মিল্লাদের এক এলান– শত্রু অঙ্কুরেই বিনাশ করে দাও। বাড়তে দিলেই সমস্যা বাড়বে। তিনি তো সত্যিই বলেছেন। পাকিস্তান একটা নবীন রাষ্ট্র, ইসলামের নামে যার পয়দা। চারদিকে শত্রুর আনাগোনা, হানা দেওয়ার চেষ্টা– সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের নামে এ কি অরাজকতা! অবশ্য বেলুচিস্তান এখন ঠান্ডা। সীমান্তে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান একটু হৈচৈ করার চেষ্টা করেছিল নবীন ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, দিয়েছে ব্যাটাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তান এখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠের মতো শান্ত আর সৌম্য। সেই পেয়ারের পাকিস্তান ছেড়ে এই ক্ষুধার্ত বুভুক্ষু আর পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী এই পূর্ব পাকিস্তানে কেন এলাম? মাত্র চার মাস হলো, তাড়াতাড়ি যে ফিরে যেতে পারব...

স্যার! শিঙাড়াটা খুব টেস্টি।

চোখ খুলে তাকান ইমতিয়াজ, শরীরটা অবসাদে ভরে আছে এসডিপিও স্যার।

হওয়ার কথা, সকাল থেকে কত ধকল সহ্য করছেন। এখন গরম গরম শিঙাড়া খেয়ে এক কাপ চা খান, দেখবেন শরীর চাঙ্গা হয়ে গেছে।

ওসি বদরুল করিমও সমর্থন করে, জি স্যার। আমিন স্যার ঠিকই বলেছে, আপনি শিঙাড়া আর চা খান। দেখবেন, ভালো লাগবে।

আপনারা যখন বলছেন, শরীরের আড়মোড়া ভেঙে বসেন

ইমতিয়াজ। হাত বাড়ালেন পিরিচে রাখা গরম গরম শিঙাড়ার দিকে। টেবিলের ওপর রাখা আমিনউদ্দিনের ওয়ারলেস সেটে হিজিবিজি হিজিবিজি কড়মড়-মড়কড় করতে করতে ভেসে আসে বিদঘুটে কণ্ঠ, স্যার! নারায়ণগঞ্জ পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি। মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগমকে বহনকারী গাড়ি জনগণ আবার আটকে দিয়েছে চাষাড়ার মোড়ে। আরও দুঃসংবাদ স্থানীয় জনগণ পথের পাশের গাছ কেটে রাস্তার ওপর ফেলে রেখেছে। জনগণ আবারও গাড়ির চারপাশে ভিড় করছে। তাড়াতাড়ি সেখানে আরও পুলিশ, আরও ইপিআর পাঠানো দরকার। নইলে জনগণ মমতাজ বেগমকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

ইমতিয়াজ আলী শিঙাড়া রেখে দিলেন। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনে বসা চা পানরত আমিনউদ্দিন আর বদরুল করিমের দিকে। দুজনই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুখের মধ্যে রাখা মুড়মুড়ে শিঙাড়ায় আর চাপ দিতে পারছেন না বদরুল করিম।

বাইনচোদ বাঙালি! দ্রুতগতিতে দাঁড়ালেন নারায়ণগঞ্জ মহাকুমা প্রশাসক, প্রত্যেক শালার হাড্ডিগুড্ডি আমি গুঁড়ো করে দেব। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আমার...।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় আমিনউদ্দিন ও বদরুল করিম।

স্যার! আপনি শুধু আদেশ করুন, আপনার কিছু করতে হবে না, আমিই করছি। চায়ের কাপ টেবিলের ওপর রেখে আমিনউদ্দিন ঢিলে হয়ে যাওয়া প্যান্টের বেল্ট ওপরে টেনে তোলে।

মমতাজ বেগমের গাড়ি ঘিরে যারা যারা মিছিল করছে সব শালাকে পিটিয়ে হাড় ভেঙে দিন। কিন্তু একেবারে মেরে ফেলবেন না। মেরে ফেললে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, দাঁতে দাঁত ঘষেন ইমতিয়াজ আলি। বাইনচোদ বাঙালির গোয়া দিয়ে বাঙলা ভাষা ঢুকিয়ে দিতে হবে। যেখানে জাতির জনক মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ সাহেব বলে গেছেন দুই পাকিস্তানের ইউনিটি আর ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার জন্য একটিই ভাষা থাকবে, আর সেই ভাষা উর্দু, সেই আদেশের বিরুদ্ধে এত মিছিল, এত হট্টগোল, এত প্রতিরোধ– সব ডান্ডার বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেরতে হবে। আপনি এখনই সকল ফোর্স নিয়ে বের হয়ে যান আমিনউদ্দিন।

এখনই যাচ্ছি স্যার, টেবিলের ওপরে ঝিমাতে থাকা খাকি ক্যাপটা মাথায় দ্রুত লাগাতে লাগাতে বের হয়ে যান এসডিপিও আমিনউদ্দিন। যেতে যেতে পিছনে তাকিয়ে বদরুল করিমকে বলেন, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।

আসছি স্যার! মহকুমা প্রশাসকের কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন আমিনউদ্দিন আর বদরুল করিম। দুজনে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইমতিয়াজ আলি ফোনের রিসিভার তুলে ফোন করতে শুরু করেন। তিনটা রিং হওয়ার পর ফোন তোলেন সচিবালয়ে নিজের রুমে বসা পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ, হ্যালো?

স্যার! আমি নারায়ণগঞ্জের এসডিও বলছি, যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বাক্য রচনা করছেন তিনি।

আপেলের টুকরো মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলছেন আজিজ আহমদ, কী খবর ইমতিয়াজ? বিশ মিনিট আগে খবর পেলাম ওই মহিলাকে নিয়ে পুলিশের প্রিজন ভ্যান ঢাকার দিকে রওনা করেছে। আমি তো জানি, তুমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত আমলা। তুমি ঠিকই ভেতো বাঙালির দর্প চূর্ণ করে ঠিকই ওই মহিলাকে, কী যেন নাম, ভাষা আন্দোলনের নামে মহিলাদের নিয়ে মিছিল করে... ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে মমতাজ বেগমকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবে। আমি তো সকাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম। বুঝলে পূর্ব বাংলার সব বাঙালি অলস আর অকর্মণ্য। একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, অফিসে আসে বারোটার পর। সহ্য করা যায়। অনেক কথা বললাম, বলো তো ইমতিয়াজ, কেন ফোন করেছ?

স্যার, খুব বিপদে পড়েছি...

ইমতিয়াজের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলেন আজিজ আহমদ, দেখো ইমতিয়াজ মাদারে মিল্লাত লিয়াকত আলি আমার ওপর মারা যাওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। যদিও তিনি পরপারে কিন্তু আমি তাকে হাজির নাজির দেখতে পাই। পাকিস্তান বিশ্বের নবীন মুসলিম রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। বাংলা ভাষা আন্দোলনের নামে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে, ঘটাচ্ছে এই অস্থিচর্মসার চিরবুভুক্ষ বাঙালিরা? মোটেই না, আমাদের প্রতিবেশী দাদারা অনেক পরিকল্পনা করে ভেতো বাঙালিদের মাথায় ভাষার আবেগ চাষ করেছে। আজিজ আহমদ বাপ পা ডান পায়ের ওপর চালান করে দিয়ে আপেলের টুকরোয় কামড় দিয়ে বলতে শুরু করেন, আরে ব্যাটা তোরা ক্ষুধার্ত জাতি। আমাদের হাতে পড়েছিস বলে দুনিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তোদের চেনে, নইলে কে চিনত? সবার আগে পেটের খিদে নিবারণ কর, না আগে ওরা ভাষা খাবে, যত্তসব হাভাতে বাঙালির বিকৃত নখরামি... আবার আপেলের কামড় দেন আজিজ আহমদ।

স্যার, মমতাজ বেগমকে নিয়ে যে গাড়ি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেছিল, সেই গাড়ির আবার চাষাড়ার মোড়ে জনগণ আটকে দিয়েছে। কেবল আটকে দেয়নি, পথের পাশের বড় বড় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করেছে। আগের চেয়ে লোকজন আরও বাড়ছে।

হোয়াট?

জি স্যার!

তুমি এতক্ষণ আমাকে বলোনি কেন?

স্যার! টেলিফোনের ওপাশের ইমতিয়াজ আলি কেমন করে বলেন, আপনের কথার ঠ্যালায়...

তুমি চিন্তা করো না, আমি দেখছি। এখনই যাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে, আরও ইপিআর পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। প্রয়োজন মনে করলে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈন্য পাঠাব। তবুও মমতাজ বেগমকে আজ রাতের মধ্যে ঢাকার কারাগারে নিয়ে আসব। দেখি, পাকিস্তানের সরকার বড় না মমতাজ বেগম বড়... শেষ করেই ঠাস করে রিসিভারটা রেখে রুম থেকে বের হয়ে যান আজিজ আহমদ।

নারায়ণগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক ইমতিয়াজ আলি আবার আরাম করে চেয়ারে বসেন, যাক শালা। মাথার ওপর দিয়ে গেল, বুকের ওপর দিয়ে নয়।

সতেরো

নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ার মোড়ে সন্ধ্যার আগে আগে রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। পুলিশের সঙ্গে ইপিআর যুক্ত হয়ে জনগণের ওপর নির্মম ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি আর রাইফেলের বাঁটের বাড়িতে জনগণের মধ্যে ভয়াবহ ত্রাস ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন প্রাণের ভয়ে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। পালিয়ে বাঁচছে। বাঁচার চেষ্টা করছে। ঢাকা থেকে আরও তিন ট্রাক ইপিআর এসে যোগ দেয়, আগের ইপিআরের সঙ্গে। এদের প্রস্তুত করেই রেখেছিল নুরুল আমিন সরকার।

ইমতিয়াজ আলির ফোন পেয়ে দ্রুত চলে যান আজিজ আহমদ মুখ্যমন্ত্রীর রুমে। তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন বাসায় যাওয়ার জন্য। গাড়ি লাগানো হয়েছে। আজিজ আহমদের কাছে সব শুনে ইপিআরপ্রধানকে ফোন করেন নূরুল আমিন, এখনই নারায়ণগঞ্জে প্রস্তুত রাখা ইপিআর পাঠিয়ে দিন এবং জরুরি অ্যাকশনে যেতে বলবেন। বাসায় আর গেলাম না। ওই মাগীরে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে ঢুকানোর পর বাসায় যাব।

জি স্যার, এখনই পাঠাচ্ছি, ওপাশ থেকে বলেন ইপিআরপ্রধান।

মুখ্যমন্ত্রীর রুমের মধ্যে আবার জড়ো হতে থাকেন পূর্ব পাকিস্তানের সভাসদরা। সঙ্গে উপাদেয় খাবার। কেবল একজন বাঙালি আর্দালি আবদুর রহিমের ইচ্ছে হয়, হারামজাদাগো খাওনের লগে বিষ মিশাইয়া দিতে পারলে মোর অন্তরটা শান্তি পাইতো!

চাষাড়ায় পৌঁছে ইপিআর জোয়ানরা দ্রুত রাস্তার ওপর কেটে ফেলা গাছ সরানো শুরু করে। জনগণ মার খেয়ে ভেগেছে। রাস্তা পরিষ্কার। মমতাজ বেগম মিনু অথবা কল্যাণী রায় চৌধুরীকে বহন করা প্রিজন ভ্যান দ্রুত ঢাকার পথে ছুটছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
“স্বয়ংক্রিয় চালান” প্রক্রিয়ায়
পাসপোর্ট ফি
আয়কর
ভ্যাট
শুল্ক
সারচার্জ
অন্যান্য সেবা ফি
তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।
আজই “স্বয়ংক্রিয় চালান” পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

মজিদ মাহমুদ

সাহিত্য ও ভাষার জগতে অর্থনীতি

অর্থনীতি ও সাহিত্যের একটি সহজ আলোচনায় যে কেউই অংশ নিতে পারেন এই ভেবে যে, সাহিত্য একটি পণ্য– এটি শ্রম দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং এর একটি বাজার রয়েছে। ভোক্তার চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই পণ্যের উৎপাদন সাধিত হয়। তবে সাহিত্যের বাজারটি অন্যসব ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে একই মাত্রায় প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে বাজারে আসতে পারে না। কারণ সাহিত্য মানুষের শরীর গঠন, আস্বাদন নির্মাণ কিংবা পোশাক ও অলঙ্কারের মতো মানবদেহে কাজে আসে না। সাহিত্যের উপযোগ নির্মিত হয় মানুষের মনোজাগতিক চেতনার সঙ্গে। মানুষের যে চিন্তাশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, কেবল দৃশ্যযোগ্য চাহিদা পূর্ণ হলেই তার তৃপ্তি মেটে না। তার রয়েছে ভাববার অনুভব করবার এবং অফুরন্ত চিন্তা করবার ক্ষমতা। একে সহজ কথায় বলা হয় মনের চাহিদা; আর এই মনের চাহিদার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে দর্শন, মিথ ও সাহিত্য। তাই চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের চিরন্তন সূত্রটি এখানে মিলে যায়। তবে অন্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীদের সঙ্গে সাহিত্যের উৎপাদনকারীদের রয়েছে কিছু মৌলিক পার্থক্য। কারণ, সাহিত্যের উৎপাদনকারীরা মূলত এ ধরনের উৎপাদনের তাড়িত হয়– নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা, চিন্তাশীলতা ও কল্পনাবিলাসের তাগিদে। বাজারের কথা তাদের মাথায় আসলেও সেটা নিজের আনন্দকে ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর দক্ষতা তৃপ্তি জড়িত থাকলেও বাজার চাহিদা ও মুনাফা অর্জন তার মূল অনুপ্রেরণা। আবার এ ধরনের পণ্যের উৎপাদনকারীরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত না থেকেও পূর্ণ মালিকানার দাবি করতে পারেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটি সচরাচর দেখা যায় না। যদিও এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সাহিত্যের উৎপাদনকারীরা বাণিজ্যিক সফলতা না পেলেও বই ব্যবসায়ীরা তা হরহামেশা পেয়ে থাকেন।

সাহিত্য একই সঙ্গে দুজনের জগৎ, লেখক ও পাঠক উভয় মিলেই তার সাফল্য নির্মাণ করে থাকেন। তবে লেখকের বাণিজ্যিক সফলতার পুরো কৃতিত্ব পাঠকের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া মানুষের আয় বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের যে সম্পর্ক রয়েছে সাহিত্যের ভোক্তাদের অনুপ্রেরণা কেবল উপার্জন দ্বারা তাড়িত নয়। মানুষ আয় বাড়লেই বই পড়ে না, কিংবা আয় কমলেও বইপড়া ছেড়ে দেয় না। মানুষ কেন বই পড়ে কিংবা সাহিত্য রচনা করে সে আলোচনার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক কতখানি– সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে মানুষের পাঠ-অভ্যাসের সঙ্গে তার মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি যে অবসর দ্বারা মানুষ সাহিত্যের আনন্দ উপভোগ করে থাকে সেই অবসরের সঙ্গেও অর্থের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এখানে বেকারত্ব ও অবসরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর্থিক বিনিময় ছাড়া অবসর পাওয়া যায় না। আমাদের আর্থিক উপার্জনের পেছনেও থাকে অবসর ক্রয়ের বাসনা। মানুষের হাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত হলেই কেবল সে কর্মবিহীন থাকতে পারে, কিংবা তার সময়কে নিজের মতো করে পরিচালিত করতে পারে।

বর্তমান সময়ে এসে অর্থনীতি জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম প্রধান শাখা হয়ে উঠলেও আঠার শতকের আগে তা ছিল না। বিশ শতকের আগে কেউই এই শাখাটিকে দর্শন, সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাবতে পারেনি। নামকরণের দিক থেকে তারই প্রমাণ মেলে; কারণ পলিটিক্যাল ইকোনমিকে শুধু ইকোনমি হতে অনেক সময় লেগেছে। এখন এই শাখাটি মানবজাতির আর্থিক অস্তিত্বের প্রয়োজনের সঙ্গে মিশে গেছে। আজকাল টেলিভিশনের যত আলোচনা হয়ে থাকে বা রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যত প্রতিশ্রুতি প্রস্তুত করা হয় তার শীর্ষভাগ জুড়ে থাকে অর্থনীতির নানা বিষয়। কারণ, বিশ্বজুড়ে আজ বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ যে অর্থের আজ ভালো থাকাকে চিহ্নিত করেছে তার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থ উপার্জনের সঙ্গে তার নিজের যেমন অনুপ্রেরণা আছে; তেমনি রয়েছে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। এমনকি রাজ্যজয় ও শাসন অর্থনৈতিক তাড়নার বাইরে নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল', পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।' প্রকৃতপক্ষে রাজদণ্ডের সঙ্গে মানদণ্ডের তেমন বিরোধ নেই। তবে এখনো অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়;

কিন্তু রাষ্ট্র যাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তারা নানা রকম মুনাফা লাভে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়।

অবশ্য সমাজ ও রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে না মিলিয়ে এই শাখাটিকে আলাদা করে বিবেচনা করা যায়। আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের সঙ্গে অর্থনীতির এমন এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা এর নির্মাতা বা সমালোচকদের আলাদা করে ভাবার দরকার হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক রাষ্ট্রিক সমাজতাত্ত্বিক শাখার মতো নিবিড়। যদিও সাহিত্যের এমন কোনো দায়িত্ব থাকে না। যার দ্বারা এই শাখা বিশেষ কোনো বিষয়কে বর্ণনা করে থাকে। সাহিত্য এমন সব জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করে, যা অন্যান্য সব শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবা সম্পর্কিত হওয়ার জন্য অবাধ। তবে অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ দুটি প্রবণতা নিয়ে এই আলোচনা পল্লবিত হবে। প্রথমত, সাহিত্য এবং অর্থনীতিক শাস্ত্র একই আকাঙ্ক্ষা থেকে বিকশিত হয়েছে বলে এই রচনায় প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়ত, আর্থিক শাস্ত্রে সাহিত্য নিয়ে তেমন আলোচনা না করা হলেও সাহিত্য তার বিষয় হিসেবে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতে অর্থনীতিকে ধারণ করেছে। শেষ অংশে আমি দেখাব ভাষার জগতে অর্থনীতির প্রতীকী অবস্থান। অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নির্ণয়ের আগে এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্থনীতির ক্ষেত্রে নবীন হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন। ফলে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলো জ্ঞানতত্ত্বের একটি নবীন শাখা কীভাবে আদি অধিবিদ্যক শাখাকে প্রভাবিত করে। আর এ প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে এই দুটি শাখার পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি কোনো শাখা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে জ্ঞানতত্ত্বের অন্যান্য শাখাসমূহের সঙ্গে এটি বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এসব শাখার নানা দিক ও উপায় একটি সংগঠিত শাস্ত্র হিসেবে প্রকাশ পায়। যদিও আজকের দিনের অর্থনীতির সর্বব্যাপ্ত জটিলতা মানুষের শিকার ও কৃষিযুগের সূচনাতে প্রত্যাশা করা যাবে না। তবু মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের সঙ্গে বস্তুত এককভাবে জড়িয়ে আছে তার আর্থিক অনুপ্রেরণা। আর এই টিকে থাকার নানা সংকটের মধ্যে গড়ে উঠেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও অর্থনীতিক অনুপ্রেরণা ও এর নিরাপত্তার বোধ ক্রিয়াশীল ছিল। যদিও এর নানা মাত্রায় তার প্রকাশ ছিল ভিন্ন। এসব ক্ষেত্রে সাহিত্যের কাজ ছিল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের বিশ্বাসযোগ্য বয়ান নির্মাণ। আর তাই সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্রও অর্থনীতির বাইরে থাকতে পারেনি; কারণ মানব ইতিহাসের কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই এটি রচিত হয়েছে। ফলে আলাদা কোনো শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত হবার আগেই সাহিত্য তার অজান্তেই 'অর্থনীতির ইতিহাস রচনা করে চলেছিল। এমনকি আধুনিককালের অর্থনীতিবিদদেরকেও এই শাস্ত্রের ইতিহাস লিখলে সাহিত্যও শরণাপন্ন হতে হয়। সাহিত্যকে বাইরে রেখে অর্থনীতির সামাজিক ইতিহাস রচনা করা প্রায় অসম্ভব। এখানে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, তাহলো আমরা যদি হাজার বছর আগের বাঙালির আর্থিক ইতিহাসের কাছে যেতে চাই তাহলে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ-ই আমাদের অন্যতম প্রধান উপায়। এই বিলুপ্ত প্রায় পদগুলোতে তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবন উঠে এসেছে– মূলত যারা তুলা ধোনে, নৌকা চালায়, মদ চোলাই করে, সাঁকো নির্মাণ করে, পশুপাখি শিকার করে, মাছ ধরে, দই বেচে তাদের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন। যেমন, টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী/হাড়তি ভাত নাহি নিতি আবেশী। তদ্রুপ ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তৎকালীন বাঙালি সমাজের আর্থিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। এমনকি রাজকর্মচারীরা কীভাবে সরকারি তহবিল তসরুপ করে, ট্যাক্স কালেক্টররা মানুষের সঙ্গে কি রকম দুর্ব্যবহার করে, কাজীরা ঘুষ খেয়ে কীভাবে বিচারের রায় পাল্টে দেয়। এসব বর্ণনার সঙ্গে আজকের সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনারও যথেষ্ট রকম মিল রয়েছে। ঠিক একই সময়ে কবি জয়ানন্দ তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে সিলেট অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং বলা যায়, এমন কোনো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া যাবে না যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রেণিসংগ্রাম উঠে আসেনি। কারণ মানুষের প্রায় সকল সম্পর্কের অন্তরালে অর্থনীতিক সম্পর্ক জাগরূক থাকে। পাশাপাশি মুদ্রাবিদ্যাও সাহিত্য ও ইতিহাস নির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। প্রাচীনকালের কোনো রাজাকে জানার জন্য মুদ্রাবিদ্যা দারুণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাচীনকালের কোনো রাজার প্রতিকৃতি পাওয়ার জন্য মুদ্রা প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে; এমনকি তার শাসনামলের সমৃদ্ধি মুদ্রাবিদ্যা প্রকাশ করে। আমরা জানতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব আটশ বছর আগে গ্রিকদের নিজস্ব মুদ্রা ছিল না, তারা রোমানদের মুদ্রায় বিনিময় করত। জ্ঞানী সোলন ক্ষমতায় এসে অ্যাথেনীয় মুদ্র প্রচলন করেন; আর সেই সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা কেবল বর্তমান সময়ে ডলারের বাজার আধিপত্য ও যুদ্ধকালে রুবল ও করোনাকালে চিনামুদ্রার বিকল্প হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে।

সাহিত্য ও অর্থনীতির মধ্যে নীতিগতভাবে রয়েছে একটি দারুণ মিল। যদিও প্রকৃতি বিচারে এই দুটিকে বিপরীতমুখী বলেই ধারণা করা হয়। কারণ অর্থনীতিশাস্ত্র বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হলেও সাহিত্য নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান নয়। তারপরও এটি বিজ্ঞান কিনা– এ নিয়ে রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা সংশয়। কবি রবার্ট সাউদি অর্থনীতিকে একটি মেকি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক কার্লাইন এটিকে ডিসমাল সায়েন্স বলেছেন। তাদের ধারণা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদগণ সুনির্দিষ্ট মতামত এড়িয়ে চলেন। জর্জ বার্নাড শ তাই রাগ করে বলেছিলেন, 'সকল অর্থনীতিবিদকে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিছিয়ে দিলেও তারা কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারবেন না।' আর এখানেই অর্থনীতি শাস্ত্রের বিজ্ঞান হয়ে ওঠা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ শর্ত পূরণ করতে পারলে বিজ্ঞানের ফলাফল সর্বত্র একই হবে। ফলসিফাইবিলিটির সূত্র দিয়ে বিজ্ঞান ও মেটাফরের পার্থক্য নির্ণয় কার্ল প্রপার রেমন একটি বিশালায়তনের গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছেন। সুতরাং বিষয়টিকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, কেবল সাহিত্য নয়, অর্থনীতিশাস্ত্রের অবস্থানও পুরোপুরি কলাবিজ্ঞানের বাইরে নয়। আবার সাহিত্য যে বিজ্ঞান সে ব্যাপারে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। যে পরিস্থিতিতে সাহিত্যের চরিত্র নির্মাণ করা হয় তা পৃথিবীব্যাপী প্রায় একমাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকে। সহজ করে বলা যায়, চিনুয়া আচিবের আফ্রিকান নায়ক, আলবেয়ার ক্যামুর ইউরোপীয় নায়ক কিংবা মার্কেজের ল্যাটিন আমেরিকান নায়ক সকল দেশকালে একই রকম স্পর্শকাতরতার দ্বারা তাড়িত হয়। অর্থাৎ স্থানকালের পরিবর্তন ঘটলেও শর্তানুযায়ী ফলাফল কিন্তু একই থেকে যাচ্ছে। তাই সাহিত্যকে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করলে দোষ দেখি না।

এখানে বলা যেতে পারে, সাহিত্য ও অর্থনীতি শাস্ত্র একই ধরনের অনুপ্রেরণা দ্বারা বিকশিত হয়েছে। যদিও সাহিত্য একটি প্রাচীন কলা, আর অর্থনীতি নবীন শাস্ত্র। তবু কেন মানুষ সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন এবং কেনই বা অর্থনীতি শাস্ত্র রচনাতেই বা তার এমন আগ্রহ। সাহিত্য রচনার জটিল কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, সাহিত্য যে কারণেই রচিত হোক না কেন, তার প্রধান লক্ষ্য মানুষ। মানুষের উন্নত জীবন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক স্বতঃস্ফূর্ততা যা অন্য কোনো কলা বা বিজ্ঞানে সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সৃষ্টিশীলতা এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, যার শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এ ধরনের অন্তহীন সৃষ্টিশীলতা কেবল সাহিত্যেই সম্ভব। এমন অনেক প্রশ্ন অর্থনীতিবিদরা উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছেন যার অধিকাংশ এসেছে সাহিত্যের মাধ্যমে। কেবল সাহিত্য যে অর্থনীতিক শাস্ত্রকে প্রভাবিত করেছে এমন নয়, অর্থনীতিশাস্ত্র ও সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এমনকি সাহিত্যকে সম্যক বুঝতে সহায়তা করেছে। অর্থনীতিশাস্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের অনেক প্রশ্ন এবং মানুষের জটিল সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে সহায়ক হয়েছে। যেমন, অ্যাডাম স্মিথের বাজার অর্থনীতি, বাজারের অদৃশ্য হাত, জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা এবং মার্কসবাদী আর্থিক শাস্ত্র

বিকাশের পর প্রাচীন সাহিত্যগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে।

অর্থনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে সর্বাধিক সম্পর্ক কেবল এই দুই শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রধান পরিপ্রেক্ষিত সক্রিয় থাকে তার প্রয়োগিক সম্ভাবনার মধ্যে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশার পরিবর্তন ঘটলে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন সূচিত হয়। কিংবা অর্থনীতির পূর্বানুমানের মতো সাহিত্যের কল্পিত জগৎ মানুষের মধ্যে নতুন করে অর্থনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। সাহিত্যের নানা শাখায় যে চলমান পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা মূলত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসের যে কালে যে ধরনের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সাহিত্য সেই সব বিষয় ধারণ করে মানবমনের পরিতৃপ্তি দান করতে চেয়েছে। এর মধ্য দিয়েই এই শাখাটি তুলে এনেছে সমাজের নানা রকম বৈষম্য, ন্যায়বিচারের সমস্যা, সুকর্মের প্রণোদনা, নায়ক ও খলনায়কদের চারিত্রিক ও পরিণতিসমূহ। এ ছাড়া সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার প্রতি ছুড়ে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জ। বহুকাল ধরে চলে আসছে বলেই সাহিত্য সকল ক্ষেত্রে তা মেনে নিতে চায়নি। এমনকি সামাজিক ব্যবস্থার বলি অসহায় মানবতার পক্ষ অবলম্বন সাহিত্যের একটি মৌল প্রবণতা। ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, শক্তিশালী সাহিত্যকর্মের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্তরানুপ্রেরণাই কেবল সাহিত্যের সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হতে পারে। সাহিত্য যখন ক্রীতদাস কিংবা তদপেক্ষাও কোনো নিম্নতর শ্রেণির মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করে তখন পরিণামে এটাই ধরে নেয়া হয় যে সাহিত্য রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা এ ধরনের পেশার পরিবর্তন কিংবা উন্নয়ন। এসব ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র একটি সাধারণীকরণ সূত্রের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করে; আর সাহিত্য একক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দ্বারা সমাজ-মানুষের কাছে পৌঁছাতে চায়।

মানুষ সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদরা একটি বিমূর্ত ধারণার জন্ম দিয়েছেন তার নাম হলো 'অর্থনৈতিক মানুষ'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল এই ধারণাটির জন্ম দেন। পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদরা এটিকে আত্তীকরণ করেন। এর দ্বারা অর্থনীতিবিদরা মূলত বোঝাতে চেষ্টা করেন, মানুষকে পুরোপুরি ব্যাখ্যার জন্য তার অর্থনৈতিক সত্তার প্রকাশ জরুরি। মানুষ সারা জীবন আসলে কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে; এবং এই অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাই তাকে সমাজে অন্য মানুষের কাছে ভালো বা মন্দ হিসেবে প্রকাশ করে। তাদের মতে, অর্থনৈতিক মানুষ একটি লোভী প্রাণী, সে সর্বাবস্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করতে চায়। তবে মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে লালসা ও পরার্থপরতার ধারণা। আপাতভাবে সাহিত্যে এ ধরনের ধারণা প্রয়োগ হচ্ছে বলে মনে করা না হলেও বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক মানুষের নানা কর্মকাণ্ডই সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে থেকে যাচ্ছে। সাহিত্যের কাছে হয়তো সেই অর্থনৈতিক মানুষ কখনো প্রেমিক, সে জৈবতাড়না অনুভব করেন; কখনো তার মধ্যে থাকে সন্তান-বাৎসল্য, আবার কখনো টিকে থাকার জন্য সঙ্কীর্ণতা ও কুটিলতা। এমনকি মানুষ যখন সংসারত্যাগী সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করে তখনো সে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অন্য আরেক মাত্রায় প্রকাশ করে– যা অর্থনৈতিক ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব।

ইউরোপের শিল্পবিপ্লব নিয়ে এই বিতর্কের যথেষ্ট সারবত্তা আছে যে, অর্থনীতিবিদরা নয় বরং সাহিত্যিকরাই মূলত এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করেছিলেন। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই উঠে এসেছে মানবসমাজের প্রকৃত অবস্থা, যা তাদের সজাগ ও সতর্ক করেছে। আর সমাজের মানুষ ব্যক্তি-নায়কের আদলে নিজেকে দেখতে চেয়েছে। অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ এ যুক্তির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সাহিত্যের উপাদান থেকে তিনি অনেক নোট গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, ড্যানিয়েল ডিফোই প্রথম উৎপাদন ও সঞ্চয়ের সূত্র সাহিত্যে আমদানি করেন। চার্লস ডিকেন্সের হার্ড টাইমস, এমিল জোলার জার্মিনালে লেবার থিওরি অব ভ্যালুর মতো পরিভাষা প্রথমে সাহিত্যে আমদানি করেন। শেক্সপিয়ার তার মার্সেন্ট অব ভেনিসে ব্যবসা ও অর্থনীতির অনেক গূঢ়তত্ত্ব উপস্থাপন করেন; তখনো প্রতিষ্ঠানিকভাবে এই শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও তার আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ড্যানিয়েল ডিফো তার নির্জন দ্বীপের নায়ক রবিনসন ক্রুশোর মাধ্যমে আবিষ্কার করেন গুরুত্বপূর্ণ ইউটিলিটি থিওরি অব ভ্যালু। যেহেতু নির্জন দ্বীপে বিনিময় করার কোনো উপায় ছিল না তাই সেখানে ক্রুশো মূল্যবান স্বর্ণকেও বাতিল করে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন প্রয়োজনীয়তা সূত্র। অর্থনীতির মূল্য নির্ধারণ হয় প্রয়োজনীয়তার ওপর।

এবার বাংলা সাহিত্যের দু-একটি উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনার ইতি টানব। আগেই দু-একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের বা বাঙালির অর্থনীতি জানতে হলেও সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য যদিও ছিল ধর্ম ও দেবতা নির্ভর; তবু চর্যাপদ ও মঙ্গলকাব্য সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রকাশে বিরত থাকতে পারেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের নানা পদে ছড়িয়ে রয়েছে তৎকালীন অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার চিত্র। বিশেষ করে উনিশ শতকের শুরুতে বণিক শাসনের সুবাদে যে অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামোর সৃষ্টি হলো– বাংলা সাহিত্য তাকে ব্যাপকভাবে ধারণ করেছে। এই সময় নব্য গদ্যভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। এই সূচনাপর্বের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। যেখানে কলকাতা-কেন্দ্রিক নব্য বাবুশ্রেণির অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনের নানা ক্যারিক্যাচার উইট ও স্যাটায়ারের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। একই সময়ে রচিত নীলদর্পণ, সধবার একাদশী কিংবা বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ– তার ব্যতিক্রম নয়। এর অব্যবহিত পরে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পরিত্যক্ত সৌধের ওপরে নব্য বণিকশ্রেণির উত্থানের মনোজটিলতার দলিল হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি অন্যতম। বিপ্রদাস ও মধুসূদনের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই মূলত অর্থনৈতিক শ্রেণিপাতের লড়াই। তাদের আভিজাত্য এবং অহংকার, নব্য ধনী মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর মিলিত হওয়ার মানসিক বাধা– যদিও আপাতভাবে সাংস্কৃতিক লড়াই হিসেবে হাজির হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির জয়ী হওয়ার লড়াই। একই সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসের পান বিক্রেতা নালুপাল কীভাবে লালমোহন পালে উন্নীত হচ্ছে। মানিক ও তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসের আখ্যান বিন্যাসে অর্থনৈতিক শ্রেণিপাতই প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার দরিদ্র বর্গাচাষি কৃষিসমাজের বিলুপ্তি ও কলকারখানা শ্রমিকের আবির্ভাবের সাহিত্যিক ইতিহাস অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে। একটি অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্য দিয়ে আরেকটি অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যে মানুষ কীভাবে যেতে বাধ্য হয় এ গল্প তার সামাজিক দলিল। প্রকৃতপক্ষে হাতিয়ার বা টেকনোলজির পরিবর্তনই মানুষকে নতুন নতুন পেশা বা অর্থনৈতিক সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিয়ে যায়। এই পরিবর্তনকালে পুরনো পেশার লোকজন নতুন পেশার সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি আরেকটি অবহেলিত শ্রেণি– যার নতুন হাতিয়ারের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাদের ঘটে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন এবং দ্বন্দ্বই সর্বদা সাহিত্যের উপাদান হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। এমনকি এই সংঘাতের গল্প প্রাচীনকালের লেখকরাও নানা মিথ ও মেটাফরের দ্বারা প্রকাশ করে গেছেন। যেমন, মানবজাতির সংগঠনকালে দেবরাজ জিউস মানবজাতিকে ধ্বংসের জন্য তাকে আগুন ব্যবহারের প্রযুক্তি থেকে বিরত করতে চাইলেন, কিন্তু প্রমিথিউস অবর্ণনীয় শাস্তিকে উপেক্ষা করে মানবজাতির জন্য আগুন সরবরাহ করলেন। আগুনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এনে শেষ পর্যন্ত মানবজাতি টিকে গেল আর জিউস হলেন ক্ষমতাচ্যুত এসব উদাহরণ থেকে মনে করার কারণ নেই যে, কেবল উপন্যাস ও গদ্য সাহিত্যই অর্থনৈতিক মানুষ ও সমাজ নিয়ে সক্রিয় থেকেছে। কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে মূলত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক ব্যক্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে কাজী

নজরুল ইসলাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারেন। ব্রিটিশের পরাধীন অর্থনীতি থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীন অর্থনীতির স্বপ্ন ছিল তার কাব্যের মূল উপপাদ্য। এমনকি তিনি তার কাব্যগ্রন্থের নাম পর্যন্ত দিয়েছিলেন 'সাম্যবাদী'।

দুই

একইভাবে ভাষার সঙ্গেও অর্থের একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা জানলে অর্থ রোজগার হয় এ কথা কমবেশি সবাই জানেন; কিংবা যারা জানেন না, তাদেরও বুঝিয়ে দিলেই বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারেন। যদিও ভাষার অর্থ বললে একটি দ্ব্যর্থবোধ সামনে চলে আসে; এমনকি যারা জানেন ভাষার সঙ্গে অর্থের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তারাও মনে করেন, এখনো ভাষার শব্দার্থের কথা বলা হচ্ছে। আমি এখন ভাষার যে অর্থের কথা আলোচনা করতে চাচ্ছি তার সঙ্গে শব্দার্থের আদৌ কোনো মিল আছে কি না সে প্রশ্ন আলাদা। কারণ ভাষার সঙ্গে টাকাকড়ির চেয়ে শব্দার্থের মিল সর্বাধিক বলেই লোকজন ধারণা করে থাকেন। কিন্তু যখন ভাষার অর্থনীতির কথা বলা হয়, তখন কোনোভাবে বিষয়টি আরও আলাদা করে দেখা যায় না; এমনকি আমরা যখন ভাষার অর্থনীতি আলাপ করি তখন এটি ধরে নেওয়া হয় যে, এই অর্থনীতির মানে শব্দার্থের প্রণালিকরণ কিংবা ভাষাতাত্ত্বিক কোনো আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এ কথা বলা যায়, ভাষা নিয়ে যে অর্থেরই আলোচনা করা হোক না কেন তার মধ্যে একটি দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ অর্থ বলতে যদি আমরা 'টাকা-কুড়ি' বুঝি তবুও তার সঙ্গে একটি শব্দার্থগত তাৎপর্য থেকে যায়– যার অর্থ স্পষ্ট না হলে শ্রোতার কাছে তা আবেদন তৈরি করেন। এখানে 'টাকা-কড়ি' শব্দবন্ধ ব্যবহারের আগে আমার মাথায় আসে– আসলে এটি টাকাকড়ি হবে না টাকা-পয়সা হবে। এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার ধন্ধ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এর বিলুপ্তগত ঐতিহ্য কিছু সহায়তা করে থাকতে পারে। যেমন টাকার সঙ্গে 'কড়ি' শব্দটি ব্যবহার হলেও 'কড়ি' শব্দটির অস্তিত্ব বিনিময়ের ক্ষেত্রে এখন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না; ঠিক তেমনি পয়সার অস্তিত্বও বিলুপ্ত প্রায়। সরকারিভাবে এখনো পয়সার বিলুপ্ত ঘটানো হয়নি; কিন্তু কালের বিবর্তনে কীভাবে যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে– যা নিয়ে কখনো আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করিনি; এমনকি আমাদের সরকার বাহাদুরের কাছে জানতে চাইনি যে, কারও কাছে যদি এখনো পুরনো দিনের পাই-পয়সা, পাঁচ বা দশ পয়সা থেকে থাকে তাহলে কী তিনি তার বিনিময় পাবেন? তা ছাড়া যে টাকার অস্তিত্ব এখনো আমরা বহন করছি তার গঠন প্রণালির মধ্যে এখনো তো বলা হয়, এক টাকা সমান একশ পয়সা। এক টাকা হওয়ার জন্য একশ পয়সার ধারণা ভাষায় থেকে যাচ্ছে বটে– যার আদতে কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি এক টাকার শারীরিক অস্তিত্বও আমাদের এখানে বিলুপ্ত হতে চলেছে। যদিও কয়েকশ বছর আগের সেন্ট ও পেনি এখনো ব্রিটিশ জাতিসহ অনেকেই বহন করছেন। তাহলে আমাদের এখানে দ্রুত পরিবর্তনের কারণ কী– এ প্রশ্ন কাউকে না করলেও বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই যে অর্থের পরিবর্তনের সঙ্গে ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে একটি সমাজতাত্ত্বিক বা আর্থিক শ্রেণিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে– তার ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে এটি নিছক মুদ্রাস্ফীতির কারসাজিতে। আর এর দ্বারা সমাজের অধিকাংশ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের সীমিত ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এভাবে শব্দের অর্থহীন হয়ে যাওয়া বা অন্য অর্থে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি যে প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে ঘটে থাকে তা আমরা দেখতে পাই না। যেমন এর টাকার সঙ্গে কড়ি শব্দটির কথা এসেছিল। টাকার যে ধারণাটি প্রথমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল, তার একটি ধারণা ও বস্তুগত তাৎপর্য ছিল। যেমন বিনিময় প্রথা হিসেবে বেশ পুরনো ধাতব বস্তুটির নাম ছিল স্বর্ণ বা সোনা– যা বিনিময় ধারণাটি এখনো মানবসমাজে অনেকটা অক্ষুণ্নভাবে ধরে রেখেছে। এই ধাতবটি নমনীয় ও অপরিবর্তনীয় হওয়ায় সর্বদেশে এর কদর একই মাত্রায় ও মূল্যে প্রচলিত হয়েছে। মধ্যযুগেও বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে তাল রেখে ভারতে সোনা আমদানি করা হতো আর এতো মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিত। স্থানীয় পর্যায়ে স্বর্ণমুদ্রার অভাবেরই ফলে বাংলাদেশে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ির আগমন ঘটে। বলা হয়, মুর্শিদ কুলি খাঁর বাংলার নবাব হিসেবে দিল্লিতে আওরঙ্গজেবের কাছে প্রচুর স্বর্ণ শুল্ক হিসেবে পাঠানোর ফলে মুদ্রা

ঘাটতির উদ্ভব ঘটে। আর তা পূরণের জন্য কড়ির প্রচলন ঘটলে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে কড়ির বিনিময়ে যোগ্যতা বৈধ ছিল।

যা হোক, ভাষার অর্থনীতি নামে আমি যে দুটি অর্থের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছি তার একটি খুব সহজ যে ভাষা জানলে অর্থ উপার্জনে কোনো বাধা থাকে না। অর্থাৎ ভাষার অর্থ জানলে অর্থ আসে। আপনার আয়ত্তে ভাষার যত অর্থ জানা থাকবে আপনার উপার্জন তত গুণিতক হতে পারে। আমরা সারা জীবন ধরে যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি, এমনকি প্রচলিত বিদ্যায়তনিক শিক্ষার দ্বারা আমরা মূলত ভাষার অর্থ অর্জন করতে থাকি। সেটি হোক ইতিহাস কিংবা সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা ধর্ম; যান্ত্রিক দক্ষতার ক্ষেত্রেও আমরা ভাষার জগৎ হয়ে তার ব্যবহারিক জগতে পৌঁছতে চাই। তবে এ ক্ষেত্রে ভাষা ও বস্তুর তাৎপর্য একই সঙ্গে ঘটতে হবে। কোনো একটি যন্ত্র কীভাবে কাজ করে কিংবা যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল কী-তার সঙ্গে ভাষার আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। ভাষা ও বস্তুর জগতের যে তাৎপর্য তা একই মাত্রায় বিবেচনা করা যায় কিনা। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে তা কীভাবে সম্ভব এবং বাস্তবিক অর্থেও তা সম্ভব নয়। কারণ ভাষা মূলত বস্তুর প্রতীকী প্রকাশ। আমরা যখন একটি বস্তু ও তার ভাষিক নাম সম্বন্ধে জ্ঞাত হই তখন আমরা বস্তুটি না দেখেও কেবল তা শুনেই ধারণা করতে পারি; এবং একই ধরনের শব্দ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির কাছে তার স্বরূপ ব্যক্ত করতে পারব। অনেক ক্ষেত্রে আমরা কোনো বস্তু না দেখে কেবল তার নাম দ্বারা তার সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ তৈরি করতে পারি না। যদি তা আমরা করেও থাকি তা কেবল আমাদের একই ধরনের পরিচিত জগতের সঙ্গে তুলনা করে অর্থ আবিষ্কার করে থাকি। একে মূলত শব্দবস্তু হিসেবে বলা যেতে পারে। বস্তুর উপযোগিতা কেবল তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কারণেই তৈরি হয় না, তার অস্তিত্বের ধারণাগত কারণেও তৈরি হয়।

এবার অর্থের কাছে ফিরে আসা যাক। যেমন টাকা শব্দটির কোনো মানে হবে না যদি না বাস্তবের টাকা এবং টাকা শব্দটির সঙ্গে একই সঙ্গে আমরা পরিচিত না হই। একই সঙ্গে টাকা এবং টাকা শব্দটির ফলে আমাদের দুটি অভ্যাস অর্জিত হয়েছে। অভ্যাস দুটি যদিও সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়; তবু এটি আমাদের মনে একটি সক্রিয় অনুভূতি তৈরি করে থাকে। যেমন কেউ যদি বলে, তার কাছে তিনশ টাকার একটি নোট আছে; তাহলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। এখানে টাকা এবং টাকা শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনো অর্থময় তাৎপর্য তৈরি করছে না। কারণ আমাদের অভ্যাসের মধ্যে তিনশ টাকার নোটের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই প্রয়োগটিকেও কেউ কেউ নির্ভুল প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করবে না। কারণ নির্ভুলত্বের একটি মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা রয়েছে, যা সর্বদা সাহিত্যিক বা অধিবিদ্যক ধারণা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না।

কেউ যখন কোনো হোটেলে কিংবা দোকানে যায়, তখন ধরে নেওয়া হয় তার পকেটে টাকা আছে; কিংবা টাকা না থাকলে ক্রেডিট কার্ড আছে; এর বিনিময়যোগ্যতা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে সমান আস্থাশীলতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে অর্থে টাকা আছে এ রকম আস্থাশীলতা তৈরি হলেই কেবল শব্দগত টাকার তাৎপর্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। এবং তখন কেবল টাকা শব্দটি উচ্চারণ করলেই উদ্দীপকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে। তখন আর টাকা থাকা বা দেখা সম্ভব হবে না। আমরা যখন ১০ টাকা নিয়ে লটারির টিকিট কিনি তখন থেকে আমাদের মন উদ্দীপনা এবং নানা রকম কল্পনায় সাড়া দিতে থাকে। যদিও সেটি পাওয়া যাবে কী না কিংবা লটারি আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে রকম নানা রকম প্রশ্ন থেকে যায়; এমনকি কয়েক লক্ষ লোক এই টিকিটি কিনে থাকলেও পাবেন মাত্র একজন; তবু সকল টিকিট ক্রয়কারীদের মধ্যে একটি অদৃশ্য লড়াই ও বিজয়ী হওয়ার নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক উপায় টিকিট ক্রেতার মনে সংঘটিত হতে পারে; কারণ টাকার ক্ষমতা সম্বন্ধে টিকিট ক্রয়কারীর সম্যক ধারণা রয়েছে।

এই টাকা শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা নানামাত্রা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন বিবৃতিমূলক, নির্দেশমূলক, আশ্চর্যসূচক ও প্রশ্নবোধক। অবশ্য প্রায় নামবাচক শব্দের ক্ষেত্রেই আমরা এই তত্ত্ব প্রয়োগ করতে পারি। যেমন কেউ যখন টাকা চাক্ষুষ দেখে টাকা শব্দটি উচ্চারণ করে তখন সে টাকার বিবৃতমূলক প্রয়োগ ঘটায়। যখন কেউ টাকা শব্দটি পেতে বা কাউকে দিতে উচ্চারণ করে তখন তা নির্দেশমূলক; আবার কেউ যখন সংশয়িত হয় তখন টাকা কি না জানতে চায়। আবার টাকা আশ্চর্যসূচক প্রয়োগ তো সর্বত্রই হয়েছে। টাকা যখন রহস্যময় আচরণ করে তখন নাটক সিনেমায় তার প্রয়োগ দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা টাকাকে দোষারোপ করে থাকি। ফলে টাকার আড়ালে আসল বস্তুটি থেকে যায়। আসলে মানুষ যে ধরনের বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে থাকে তার সঙ্গে টাকার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। টাকার সঙ্গে বস্তুর কোনো তুলনা চলে না। এমনকি টাকা নিজে যখন বস্তু তখন তার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই; তবু মানুষের সকল আরাধ্যের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে টাকা। কারণ টাকা হলে মানুষের বস্তুগত সকল কামনা পূর্ণ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে টাকা কেবল মানুষের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কড়ি পয়সা শব্দের বিলুপ্ত ঘটেছে, ঠিক টাকা শব্দটিরও দৃশ্যগত পরিবর্তন বা বিলুপ্ত ঘটা আসন্ন প্রায়। টাকা একটি সময়ে দৃশ্য ও সংখ্যাতত্ত্ব হিসেবে কাজ করেছে; এখন অদৃশ্য সংখ্যাতত্ত্ব হিসাবে থেকে যাচ্ছে; রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সেই হিসাব আজ রক্ষিত হচ্ছে– যে ব্যক্তি এই টাকার মালিক সে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না কিংবা দেখা দরকার হচ্ছে না। এমনকি টাকা বিনিময় মাধ্যম হলেও একজন ব্যক্তির কাছে এর সঠিক মূল্য অজানা থেকে যাচ্ছে। কারও একটি বাড়ি, কারখানা কিংবা জমি আছে– তার মূল্য এবং অর্জনের সঙ্গে ব্যক্তির সরাসরি একটি সংযোগ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু টাকার মালিকের কাছেও টাকা একটি ধারণার অতিরিক্ত নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে টাকা থাকার চেয়ে টাকার ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। যেমন কেউ যদি বিবৃতিদান করে যে 'তার কাছে টাকা আছে।' শ্রোতার কাছে এটি কোনো অর্থ তৈরি হবে না যদি না তার টাকার ব্যাপারে শ্রোতার কোনো পূর্বানুমান না থাকে। শ্রোতা পূর্বানুমান ধারণা করতে পারবে না যে, টাকা থাকা বলতে বক্তা কী বলছেন বা কত টাকার কথা বলছেন। অর্থাৎ বক্তার যে কোনো বিবৃতির সত্যতার মাপকাঠি শ্রোতার পূর্বানুমানের ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা। শ্রোতার পূর্বানুমান কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন অপরিচিত একজন ব্যক্তির কাছে যথেষ্ট টাকা আছে কি না অপরজনের কাছে এভাবে প্রতিভাত হতে পারে যে, তার বাহ্যিক পোশাক আশাক হাতঘড়ি এবং গাড়ি কত দামি তার ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং কারও কাছে টাকা এই বোধ কিংবা বিবৃতির দ্বারা সে সুবিধা পেতে পারে না, যদি-না শ্রোতা বা তার পরিপার্শ্বের সবার পূর্বানুমান তৈরিতে সে ভূমিকা রাখতে না পারে।

তবে টাকা ও টাকার অর্থ জানলেই কেবল টাকা অর্থপূর্ণ হয়ে যায় না। কারণ আমি আগেই বলেছি যে, টাকার বস্তুগত রূপ এবং টাকার শব্দগত রূপ একত্রে থাকলেই কেবল টাকার ধারণাটি নেওয়া সম্ভব। কিন্তু টাকা ও টাকার শব্দগত রূপ থাকলেই তা ব্যবহারগত প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এমনকি তার টাকার ব্যাপারে শ্রোতার পূর্বানুমান এবং টাকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও টাকা কোনো গুরুত্ব বহন করে না, যদি কাঙ্ক্ষিত বস্তুর পর্যাপ্ততা না থাকে; কিংবা কেউ তার অর্থের বিনিময়ে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিতে নারাজ হয়। এখানো টাকা শুধু পেটোনিক জগতের ধারণা লাভ করে। আমরা যাকে টাকা বলে জানি, সে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নয়, টাকার প্রকৃত স্বরূপ অন্যত্র বিরাজমান– যা বস্তুজগতে বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে; টাকার মাধ্যমে আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতো আমরা তার বাস্তবরূপ তৈরি করি। প্রায় এক হাজার বছর আগের দশম শতকের দিকে যখন আরব্য উপন্যাস লেখা হয়, তখন আজকের মতো টাকার ধারণা ছিল না। কিন্তু মামুন কিংবা হারুন-অর-রশিদের বাগদাদে কিছু লোকের সমৃদ্ধি ঠিক আজকের ধনতান্ত্রিক বিকশিত সমাজের চেয়ে কম ছিল না; আপনার কাছে সোনার মোহর থাকলেই আপনি যে কোনো জিনিস সহজে আয়ত্ত করতে পারবেন। আর তারই অধিবিদ্যক রূপ ছিল আলাদিনের আশ্চর্য সোনার প্রদীপ, যা ঘষা দিলেই কামনা-

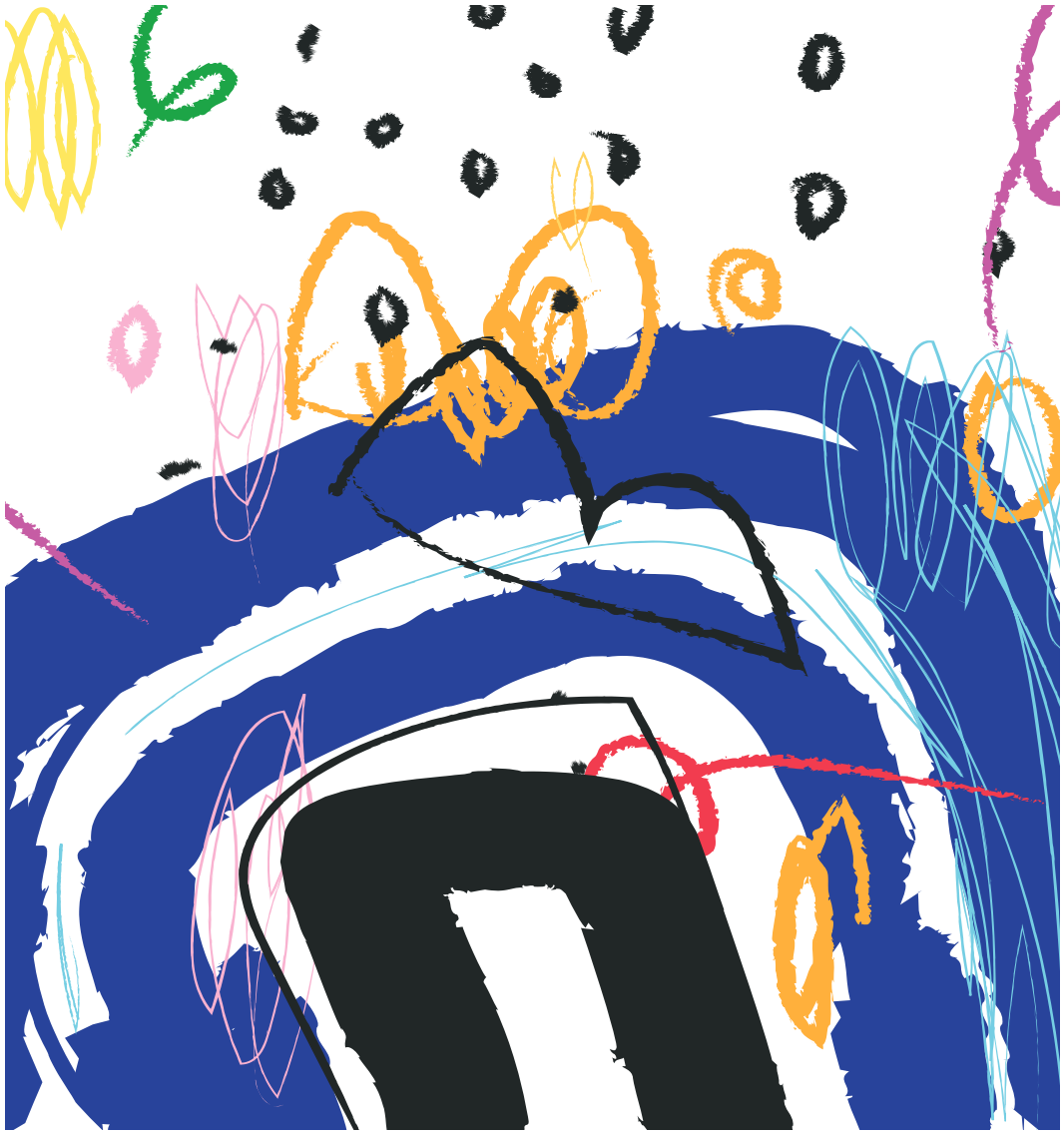

পূরণের দৈত্য বেরিয়ে আসত। আজকের ক্র্যাচ কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে তার কি অদ্ভুত মিলই না আছে! আপনি যেই ক্রেডিট কার্ডটা ছুঁয়ে দিলেন অমনি আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের চেয়েও দ্রুত আপনার মনোবাসনা পূরণ হয়ে গেল। মানব জাতির অভিজ্ঞতার এক মহাগ্রন্থ হিসেবে আরব্য উপন্যাস তাই এখনো ব্যাখ্যার দ্বারা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।

টাকা এবং টাকা শব্দ যদিও এক নয়, তবু পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তা টাকার মতো ক্রিয়া করতে পারে। যেমন বাসের মধ্যে যদি হঠাৎ কেউ বলে 'আমার টাকা'! এমনি বাসের লোকজন সতর্ক হয়ে পড়ে যে বাসে একজন পকেটমার আছে কিংবা লোকটির টাকা পকেটমার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। তখন সবাই বাস্তব কিংবা কল্পিত পকেটমারকে ধরতে কিংবা শায়েস্তা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেক সময় টাকার ব্যবহারিক কিংবা পূর্বানুমান ছাড়া একটি প্রথাগত সত্যতাও রয়েছে। যেমন আমাদের দেশে বিবাহের ক্ষেত্রে কনের জন্য মোহর দেওয়া হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদে পূরণ করা হয় না। বর এবং কনে পক্ষে একটি আলোচনার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করে; অবশ্য এ ক্ষেত্রেও পূর্বানুমান ব্যতিরেকে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তবে যেভাবেই বলি না কেন, টাকার ধারণা একটি জটিল ভাষিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয়। অর্থাৎ আমরা যখন টাকা দাবি করি তখন আসলে কী দাবি করি? আমরা যদিও টাকাটির গঠন প্রক্রিয়া ঠিক আছে কি না তা শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য নানা রকম পরীক্ষা করে দেখি। ধরা যাক, প্রাপ্ত টাকাটি তার সত্য হওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ করেছে; অর্থাৎ টাকাটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে তৈরি হয়েছে। তবু কখনো আমরা প্রশ্ন করে দেখি না, সকল শর্ত পূরণ হয়েছে বলেই সে টাকাটি আমরা চেয়েছি কি না। আসলে এ ক্ষেত্রে টাকা রাষ্ট্রের একটি সাধারণ ইচ্ছা বা চুক্তি হিসেবে ক্রিয়া করে থাকে; যে চুক্তি পূরণে সব নাগরিক বাধা এবং তাতে সফল নাগরিকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে আমরা টাকা বা আর্থিক জগৎকে আলাদা করতে পারি না। ভাষার জগৎ থেকে আর্থিক জগৎ আলাদা করলে আমাদের সব অর্থের জগৎ ধসে পড়বে; তখন বস্তুর জগৎ-ই হবে আমাদের একমাত্র আশ্রয়; আর বস্তু ও বিনিময়ের জগতে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হলেও এ কথা বলা যায়, টাকার জগতে শোষণের যেমন রকমফের আছে, বস্তুর জগতে তার অস্তিত্ব তত তীব্র নয়। এটাও সাহিত্যের মেটাফরের মতো সত্য যে, সমাজে মুদ্রার মান একই থেকে যেতে পারে তার ধাতুর ওজন কমে গেলেও।

দুয়ারে দাঁড়াই ভালোবাসা

লুৎফর রহমান রিটন
আমীরুল ইসলাম
আনজীর লিটন
রোমেন রায়হান

অলংকরণ : মামুন হোসাইন

লুৎফর রহমান রিটন

এই ছড়াটা চোরের

জাগ্রত বা নিদ্রিত বা ঘুমের ঘোরে
সবাই জানে মাসতুতো ভাই চোরে চোরে।
পুত্রস্নেহে অন্ধ মায়ের ছলাকলা
সবাই জানে চোরের মায়ের বড় গলা।

দশটা দিনই চোরের নাচন তাধিন তাধিন
সাধুর থাকে সবেমাত্র একখানা দিন।
সেই এক দিনেই সাধুর হাতে চোরটা ধরা...
চোর-পুলিশের গল্পটা তো সবার পড়া।

চোরের শিকার হচ্ছো তুমি বারে বারে
চোরটা গেলে তবেই তোমার বুদ্ধি বাড়ে?
শুনবে না চোর যতোই শোনাও ধর্মবাণী
হিট সিনেমা চোরের রাজা রূপের রাণী।

চল্লিশ চোর আর একজন আলীবাবা
আরব দেশের গল্পগাথায় দেখতে পাবা।
চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা কে না জানে?
যদি না সে পড়ে ধরা কোনোখানে।

মাওলা তুমি চোরেরে কও চুরি করো
গেরস্তকে সজাগ রেখে ধরো ধরো...
সাধুবেশে পাকা চোরের তেলেসমাতি
ব্যবসাক্ষেত্রে জ্বালিয়ে দেবে লালচে বাতি।

রাজনীতিতে চোরের আমি চোরের তুমি
চোরকে ভালো রাখেন আমার জন্মভূমি।
প্রশাসনে চোররা দেখায় বাহাদুরি
একে চুরি তার উপরে সিনাজুরি!

চোরের প্রতি সব অনুরাগ রাষ্ট্রযন্ত্রে
দীক্ষিত হই আসুন চোরের তন্ত্রেমন্ত্রে...

পার্টি শেষে ভার্টিগো

কাল সারারাত পার্টি ছিল
আহ্ কী দারুণ পার্টি গো!
মধ্যরাতের আসর মানেই
জোক্সগুলো কী ডার্টি গো!

রাম হুইস্কি বিয়ার শেষে
ভদকা খেলাম চারটি গো!
লম্বা ঘুমে দিন করে পার
হইলো শেষে ভার্টিগো!

আউলাঝাউলা আকাশ-পাতাল
ব্যথায় কাতর ঘাড়টি গো!
চউক্ষে সরষে ফুলের বদল
দেখছি বাঁশের ঝাড়টি গো!

শুইয়া থাকি খাই আর ঘুমাই
য্যানো ধর্মের ষাঁড়টি গো!
পারছি না আর করতে বহন
নিজের মাথার ভারটি গো!

একলা একা কানতে কানতে
খাইতেছি কি মারটি গো!
অভাগাকে কে দেখাবে
ভবদরিয়ার পাড়টি গো!

বড়লোক আর পরলোক

বড়লোক দামি জামা-প্যান্ট-টাই-সু পরে।
ঈশ্বর নির্দয় গরিবের উপরে।
বড়লোক তিনবেলা ভরপেট খানা খায়
সন্ধ্যায় হুইস্কি ও বরফের দানা খায়।

স্বর্গীয় প্রাসাদেই থাকে ওরা, মিছা না।
গরিবের বস্তিতে থাকে না তো বিছানা।
একবেলা খাওয়া জোটে তিনবেলা খায় না
ঈশ্বর গরিবকে কিছু দিতে চায় না।

ঈশ্বর প্রাসাদেই থাকে, এটা সত্যি।
গরিবের সংসারে অভাবের দত্যি।
বস্তিতে ঈশ্বর কোনোদিন আসে না
গরিবকে ঈশ্বর মোটে ভালোবাসে না।

গরিবেরা কালো কালো বড়লোক ফরসা
ঈশ্বর করে শুধু বড়লোকে ভরসা।
গরিবের চেহারায় নাই চাকচিক্য
বড়লোক চিরকাল বটের বিরিক্ষ।

ঈশ্বর তুমি খালি অগো পিছে ঘুরবা?
গরিবেরা ঘাস মানে ছোটোমোটো দূর্বা?
তাগো তুমি খালি খালি পদতলে পিষবা?
আর খালি বড়লোক সনে তুমি মিশবা?

গরিবের ছেলেমেয়ে মোটে সুন্দর না
ওদের জীবনে শুধু অভাবের ঝরনা।
অন্ন-বস্ত্র ভালো চিকিৎসা পায় না
কোনোদিন সমুদ্র-কুয়াকাটা যায় না।
শরীরটা লিকলিকে। হাভাতের দিষ্টি!
বড়লোক ছেলেমেয়ে ফুটফুটে মিষ্টি।
ঝকঝকে চকচকে জামা-জুতা পরনে
সুঠাম ও তরতাজা শারীরিক গড়নে।

বড়লোকদের বউ ঝলমলে সেক্সি
ঠিক য্যান হিরুইন! আজীবন দেখছি!
দামি শাড়ি। শরীরটা হুরিদের অংশ
গরিবের বউগুলো পেত্নির বংশ!
রূপ-যৌবন নাই আছে শুধু হাড্ডি
ঈশ্বর খেলিতেছে হাডুডু-কাবাড্ডি...

দুনিয়ার সবকিছু পায় শুধু বড়লোকে
গরিবেরা কবে পাবে? আশাবাদ--
পরলোকে...

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
সারাটা জীবন অন্ধের মতো টাকার পেছনে ছোটার জন্যে?
শুধুই ফুর্তি লোটার জন্যে?
সতীর্থদের ল্যাং মেরে মেরে ওপরে-শীর্ষে ওঠার জন্যে?
'কাগজের ফুল' প্রতারণা করে গোলাপের রূপে ফোটার জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
নীতিহীনতার যাপিত জীবনে 'নীতির গল্প' বলার জন্যে?
অলীক শিল্পকলার জন্যে?
আভিজাত্যের মুখোশে নিজের রূপ ঢেকে ঢেকে চলার জন্যে?
অপরের দ্যুতি চুরি করে করে মিছে আলো হয়ে জ্বলার জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
নয়টা-পাঁচটা কেরানির ছকে জীবনের ঘানি টানার জন্যে?
বুজরুকি আইন মানার জন্যে?
শিবের গীতটা গাইবার ছলে অহেতুক ধান ভানার জন্যে?
নিজ নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের কথা জানার জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
স্বপ্নের বাড়ি দামি শাড়ি গাড়ি কিছু ভালো খাওয়া-পরার জন্যে?
মৃত্যুর সাথে লড়ার জন্যে?
টানাপোড়েনের সংসারে রোজ 'ঝরা পাতা' হয়ে ঝরার জন্যে?
ধুলায় মলিন একঘেয়ে দিন রোজই শেষ ট্রেন ধরার জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট কেনার জন্যে?
কিস্তি ও ধার-দেনার জন্যে?
সখী তুমি কার মিছে সংসার কে আপন পর চেনার জন্যে?
শ্রেণিসংগ্রামে রক্তে ও ঘামে লড়াকু মুক্তিসেনার জন্যে?

বাঁচি কী জন্যে? বাঁচি কী জন্যে?
কিছু লোকে সব লুটেপুটে খাবে মুখ বুজে সেটা দেখার জন্যে?
প্রেমের কবিতা লেখার জন্যে?
নেতাদের কাছে ধনী হইবার শর্টকাট পথ শেখার জন্যে?
সব মরে যাক। আমি বেঁচে থাকি। পৃথিবী আমার একার জন্যে!!?

বাঁচি কী জন্যে?...বাঁচি কী জন্যে??.....

মানুষের চাওয়ার তালিকা

চাওয়ার কি শেষ আছে? মানুষেরা খালি চায়
দুইখানা পেলে পরে পুরো এক হালি চায়।
তারপর আরো চায় আরো চায় আরো চায়
সাইকেল পেয়ে গেলে হুন্দাই কারও চায়!

সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান এটা চায় ওটা চায়
প্লাস্টিক মগ পেলে সিলভার লোটা চায়!
বসবার অনুমতি পেলে পরে শুতে চায়
মাগনায় পেলে সোপ লুঙ্গিটা ধুতে চায়!

প্রার্থিত দড়ি পেলে তার সাথে খোঁটা চায়
খোঁটার প্রান্তে থাকা ছাগলটা গোটা চায়!
মাছের টুকরো পেলে অতঃপর মুড়ো চায়
এক কেজি চিনি দিলে আধ কিলো গুড়ও চায়!

স্যান্ডেল পাওয়া হলে মোজা আর জুতো চায়
চাকরিটা হয়ে গেলে প্রমোশন দ্রুত চায়।

পোষায় না কারো কারো একটায়, জোড়া চায়
লাগামটা পেয়ে গেলে সরাসরি ঘোড়া চায়।

থাকুক না টাক-ভুঁড়ি! নারী ধনী স্বামী চায়
বাড়ি-শাড়ি-গয়নাটা বেশি দামি দামি চায়।

স্বামীগুলো শ্বশুরের বিত্তের ভাগ চায়
কেউ কেউ ইঁদুরের বিনিময়ে বাঘ চায়!

কেউ কেউ স্বর্ণের ডিম পাড়া হাঁস চায়
রাজনীতিব্যবসায়ী মেরেকেটে লাশ চায়...।

দরিদ্র মানুষেরা পেট ভরে খেতে চায়
বস্তিতে কোনোমতে শুধু ঠাঁই পেতে চায়।
ভাতের সঙ্গে যদি সামান্য ডাল পায়
সাথে কাঁচা মরিচের এতোটুকু ঝাল পায়
তাহলেই খুশি থাকে, এর বেশি চায় না।
চিরকাল এটুকুই গরিবের বায়না!

গরিবের চাওয়া-পাওয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র...
গরিবেরা চিরকাল তাই নমঃশূদ্র।
ধনীগুলো ব্রাহ্মণ আছে তার পৈতা
ধনী হলে তুমি দাদা ছড়াকার হইতা?

হইতা না হইতা না শুধু টাকা চিনতা
টাকা দিয়ে পদক আর সম্মান কিনতা!
ফেসবুকে লিখতা না লিখতা না বইটা
চেকবই-এ দিতা শুধু অটোগ্রাফ, সইটা!

ভাগ্যিস টাকা নাই যদি টাকা থাকতো
চামচারা মাথা আর ঘাড়ে তুলে রাখতো।
তুমি কিছু কইলেই একঝাঁক সাহাবা--
উল্লাসধ্বনি দিতো, বাহাবা রে বাহাবা...

সর্বরোগের দাওয়াই জানা চিকিৎসকের খোঁজে

রাতের বেলায় দাঁতের ব্যথা? পোকায় খাওয়া দাঁত?
গোপন অসুখ? ধ্বজভঙ্গ? গিরায় গিরায় বাত?

ফোঁড়া টাটায়? চলা-হাঁটায় হাড্ডিতে কটমট?
চিন্তা কিছু করতে গেলেই মাথায় লাগে জট?

মাথাও ঘোরে? কিডনিও ফেইল? চোক্ষে দেখেন কম?
বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি চলতিছে হরদম?

কিছুই হজম হয় না বুঝি? ডায়াবেটিসও আছে?
অ্যালার্জি হয় মিষ্টিকুমড়া-বেগুন-চিংড়ি মাছে?

পাগল করা চুলকানি খুব বেকায়দা জায়গাতে?
ভুটুস ভাটুস পটকা ফোটে ঘুমের ঘোরে রাতে?

বুকটা জ্বলে? নাক বন্ধ? মাথাটা ঝিমঝিম?
ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্নের ঘোড়ায় পাড়ে ডিম?

কাটা ঘায়ে পাক ধরেছে? ব্যথাটা টনটনা?
হাড় ভেঙেছে? কোমরে পেইন? পিশাবে যন্ত্রণা?

পলিটিক্যাল সমস্যাটাও বাড়বাড়ন্ত? মোটা?
রাষ্ট্রযন্ত্রে গিঁটঠু লাগা? খুলতিছে না ওটা?

মন্ত্রী-আমলা ব্যর্থ সবাই? পারছে না সরকার?
দেশ চালাতে লাগসই এক থিউরি দরকার?

ভুগছো বুঝি ক্রনিক ডিজিজ ইনসোমনিয়াতে?
নতুন অসুখ? দিবানিশিই টিভির রিমোট হাতে?

টিভি সেটের সামনে গেলেই পাগল পাগল লাগে?
আত্মঘাতী হবার পুরান ইচ্ছেটা ফের জাগে?

হার্নিয়া পেইন? ভার্টিগোতে জীবন ফানা ফানা?
প্যানিক অ্যাটাক হয় রেগুলার? সাডেনলি রাতকানা?

ডিমেনশিয়ায় সব ভুলে যান? রয় না কিছুই মনে?
পিত্তথলির ভেতর পাথর? কাতর ক্ষণে ক্ষণে?

সর্দি-কাশি-নিমুনিয়া-ইলেকটিরিক শক?
সর্বরোগের দাওয়াই জানে কোন সে চিকিৎসক?

গরু খোঁজার মতো আপনি খুঁজিতেছেন তাঁকে?
তিনিই দেবেন সব সমাধান এ ঘোর দুর্বিপাকে?

কোথায় তেনার দেখা পাবেন? কোনখানে চেম্বার?
ও দাদাভাই দিচ্ছি বলে নাম-ঠিকানা তার–

মধ্যরাতে টিভি চ্যানেল কার্যালয়ে গেলে
সর্বরোগের দাওয়াই জানা চিকিৎসককে মেলে!

তেনারা হন সর্বজ্ঞানী, সন্দেহাতীত সৎ!!
সব বিষয়ে দিতে পারেন বিশেষজ্ঞ মত!

পরামর্শের খই ফুটিয়ে তোলেন মুখে ফেনা
talk-এর আমি talk-এর তুমি talk দিয়ে যায় চেনা...

আব্বে হালায় কাউলা

হালার জানা কৈ গেলি রে?
আব্বে হালায়! আব্বে?
ছুদ্ধ ভাছায় কী কইলি তুই?
--'ছুধীজন কী ভাব্বে!'

ছুধীজনের গুষ্ঠি কিলাই
পুরান ঢাকার আমরা--
চেইতা গেলে গুল্লি মারুম
বেইচা দিমু চামড়া!

ঠ্যাঙ্গের মইধ্যে লেংড়ি দিয়া
ভাইঙ্গা দিমু হাড্ডি।
হ্যারপরে তর খুল্লি দিয়া
খেলমু রে কাব্বাড্ডি!

কাউয়া হয়া ময়ূর সাজোস?
হালারজানা কাউলা!
মাইগ্রেছনের ঠ্যালার চোটে
হইলি আউলাঝাউলা?

নতুন ঢাকায় ছাদি কইরা
ছিকড়-বাকর ভুইল্লা--
নাচতে নাচতে ভোদাই রে তর
লুঙ্গি গেছে খুইল্লা!

ছুধীজনের খপ্পরে তুই
পইড়া গেলি! হায় রে
তর কারণে পুরান ঢাকার
প্রেস্টিজ তো যায় রে!

ডিকছনারি খুঁইজা খুঁইজা
প্রমিত্ ভাছা হিকলি!
'আছুন'! 'বছুন'! কছ কী ব্যাটা?
লৌড়ামু পাব্লিকলি!

নতুন ঢাকার রাস্তা মোটা?
পুরান ঢাকার চিকনা?
নিজের অতীত নিজের ভাছা
ভুইল্লা যাওন ঠিক না।

আমীরুল ইসলাম

তুমি আমার ছেলেবেলা

তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে
ছুটতে থাকো জোরে।
তুমি আঁকছ হিজিবিজি
তুমি সারাটাক্ষণ বিজি।
তুমি ছাদে ওড়াও ঘুড়ি
আমি তোমার সাথে উড়ি।

তুমি ছাদবাগানে নাচো
তুমি তোমার মতো আছো।
তুমি পথের কুকুর যতো
ওদের খাওয়াও নিজের মতো।
তুমি অনলাইনে পড়ো
তুমি অনেক কিছু করো।

তুমি পাখিদের গান শোনো
তোমার ভাবনা তো নেই কোনো।
তুমি তিনবেলা খাও পোলাও
পেটে দুহাত বোলাও।
তোমার বয়স এখন নয়
তোমার কিছুতে নেই ভয়।

তোমার অনেক খেলনা গাড়ি
তুমি সাগর দেবে পাড়ি।
তোমার ফুলের গন্ধ হাতে।
তুমি ফড়িং ছানার সাথে–
তুমি স্বপ্নগুলো আঁকো
তুমি নিজের মতো থাকো।

তুমি খেলনাপাতি কিনে
তোমার আপুর জন্মদিনে।
তুমি বাজাও পাতার বাঁশি
তোমার মুখে মধুর হাসি।
তোমার সারাটা দিন খেলা
তুমি আমার ছেলেবেলা।

জীবন জুড়ে ছড়া

ছড়া যখন হালুম
তখন হবে মালুম
ছড়া যেন বাঘের থাবা
পালিয়ে তুমি কোথায় যাবা?
ছড়ার কাছে পড়বে ধরা
ছড়া মানেই আগুনঝরা
ছড়া যখন হালুম
বাঘের দুধ খালুম
বাঘের দুধে প্রোটিন খুব
আমরা দিলাম ছড়ায় ডুব
ছড়ায় নাচে অনেক সুর
ছড়া মানেই সমুদ্দুর।

ছড়া যখন হালুম
একটা বেড়াল পালুম
বেড়াল মানে ম্যাঁও ম্যাঁও
খাওন দ্যাও। খাওন দ্যাও
বেড়াল মানে বাঘের মাসি
বাঘের মুখে ছড়ার হাসি
ছড়া নাচে গানের সুরে
ছড়া থাকে জীবন জুড়ে।

জীবন এত ছোট ক্যানে

মনটা এখন ভালো নেই
চারপাশে নেই আলো নেই
নদীর জলে ঢেউ নাই
এই দুনিয়ায় কেউ নাই
একলা একা বেঁচে আছি
মৃত্যু আমার কাছাকাছি।

মৃত্যুকে কি আমি ডরাই
জীবনব্যাপী করছি লড়াই।
ভাবছি এসব গভীর ধ্যানে
জীবন এত ছোট ক্যানে।

বৃষ্টি যখন

বৃষ্টি যখন পড়ে
মনটা কেমন করে
বৃষ্টি যখন পড়ে
মন বসে না ঘরে।
বৃষ্টি যখন পড়ে
আম পড়ে। জাম পড়ে।
বৃষ্টি যখন পড়ে
মাকে মনে পড়ে তখন
মাকে মনে পড়ে।

একটি ছবি

নীল আকাশের তারায় তারায়
মুগ্ধ আমার দুচোখ হারায়
কাশের বনে ঘাসের বনে
একটি ছবি থমকে দাঁড়ায়।

শীষে শীষে হলদে ধানের
সুরে সুরে পাখির গানের
ছবিটা কার? ছবিটা কার?
শেখ মুজিবুর রহমানের।

কবিতা

যখন তুমি রোদে ভিজবে
তখন সেটা কবিতা
বৃষ্টি যখন কাঁদবে একা
তখন সেটা কবিতা।

গোলাপ যখন হাসবে মৃদু
তখন সেটা কবিতা
মনের পাখি উড়বে যখন
তখন সেটা কবিতা।
জুঁইফুলেরা নূপুর বাজায়
তখন সেটা কবিতা।
মেঘের দেশে রবীন্দ্রনাথ
তখন সেটা কবিতা।

ফুলের বনে বাতাস নাচে
তখন সেটা কবিতা
যখন বলি অন্যরকম
তখন সেটাই কবিতা।

আমি একটা মাছি

আমি একটা মাছি
যখন তখন হাঁচি।
তুমি যখন খাচ্ছ তখন
তোমার পাশে আছি।
আমি একটা মাছি
নাচিয়ে ডানা নাচি।
খেতে ভীষণ ভালোবাসি
টাটকা দুধের চাঁছি।
আমি একটা মাছি
তোমার খাবার খেয়ে আমি
বেশ তো সুখেই আছি।

হই চই

এক ছিল হই
এক ছিল চই
দুয়ে মিলে সারা দিন করে হইচই।
দুজনের কখখনো মতে নেই মিল
হই যদি ঘুসি দেয় চই দেবে কিল।
তারপর দুজনই হাসে খিলখিল।

হই যদি খেতে চায় কই
চই বলে আমি খাব দই
এই নিয়ে সারা দিন চলে হইচই
হই যদি ৮০ বলে, চই ৯০।
এক ছিল হই
এক ছিল চই
দুজনই সারা দিন ঘোরে পইপই।

স্বপ্ন ওড়ে সেপটিপিনে

বৃষ্টি ঝরে অঝোর ধারায়
ভিজছে নদী। ভিজছে পাড়া।
ফড়িং হাঁটে হিজল পাতায়
কচুর পাতা নানির মাথায়।
ভিজছে নানা পরোপকারী
সবুজ পাতা। হলুদ বাড়ি।
বৃষ্টি ঝরে অলস দিনে
স্বপ্ন ওড়ে সেপটিপিনে।

আবছা আলোয় পর্দা তোলা
টেবিলে বই মলাট খোলা।
অবাক ছড়া। অবাক পড়া।
বাবা বলেন, হতচ্ছড়া!
ক্লাসের বইয়ের বাইরে পড়ো
তাই তো রেজাল্ট খারাপ করো।
জোনাক জ্বলে আমার হাতে
মন ডুবেছে ফেলুদাতে
টম সয়্যার, আর হাকলফিনে
বৃষ্টিভেজা অলস দিনে।

বাতাসে আজ ঈদের ছুটি
পাতায় পাতায় আলোর মুঠি।
ধবল আলো দশ আঙুলে
বৃষ্টি আসে আকাশ খুলে
চেনা সুরের ঝরনাধারা
ভিজছে পাখি। ভিজছে পাড়া।
আহা, এমন অলস দিনে
মন চলে যায় সাবমেরিনে!
ঈদের দিনে।
সাবমেরিনে
ঈদের দিনে
হাকলফিনে।

রং মিছিলে

যেই ফুটেছে ছড়ার ফুল
হুলুস্থুল। হুলুস্থুল।
সাতটা ছড়ার সাতটা ঢং
এক আকাশে অনেক রং।
ছড়ায় ছড়ায় রঙের সুর
ছড়া মানেই সমুদ্দুর।

নীলকমলের তেপান্তর
সেইখানে কি ছড়ার ঘর?

MOMA– তে

সালভাদর দালি
এক হাতে দ্যান তালি
তাই দেখে ভ্যান গঘ
হাসেন খক খক।
পাবলো পিকাসোকে
দিলেন জোরে বকে
পল গগাঁ। জন মিরো
সবাই তারা হিরো।

এসব দেখে 'মোনে'
হাসেন মনে মনে।
জর্জ সুরাটের ফোঁটা
ম্যাজিক যেন ওটা।

পল সেজানের হাসি
সবাই ভালোবাসি।
ওদের ছবি কোথায় আছে
এক সঙ্গে জমা
বিখ্যাত এক গ্যালারি নাম
নিউইয়র্কের MOMA.

ইকড়ি মিকড়ি

এক যে ছিল ইকড়ি
এক যে ছিল মিকড়ি
পথের মোড়ে দুভাই মিলে
ফুচকা করে বিক্রি।

ইকড়ি দেয় টক
দাঁত কাঁপে ঠকঠক।
মিকড়ি দেয় ঝাল
হচ্ছি বেসামাল।

ইকড়ি এবং মিকড়ি
স্বপ্ন দেখে তারা যাবে
ফ-তে-হ-পু-র- সি-ক্রি।

আমরা

আমরা কোনো বই পড়িনি
জীবন থেকে শিখি
জীবন ঘষে আগুন জ্বালাই
নতুন ছড়া লিখি।
রপ্ত করি তপ্ত জীবন
আগুন জ্বলে মাথায়
কে আমাদের কাব্য লেখে
কোন সে জীবন খাতায়?

তোমরা যখন ঘুমাও ঘরে
আকাশ ছোঁয়া বাড়ি
আমরা তখন পথের মোড়ে
দুঃখ দিলাম পাড়ি।

তোমরা যখন ডাইনিংয়ে রোজ
করছ ভূরিভোজ
আমরা তখন ক্ষুধায় কাতর
কে রাখে সেই খোঁজ?

আমরা শুধুই জন্ম নিলাম
জন্ম মানেই পাপ
জীবন নিয়ে করছি লড়াই
বাড়ছে অভিশাপ।

হা হা

হাতি পুষব। হাতি কিনব হাতি।
নানার আমি অনেক প্রিয় নাতি।
সব শুনে কয় নানা
শোনো নাতি না, না
কে জোগাবে এই আমলে
একটি হাতির খানা।
গোদা পায়ে হাতি দিলে– লাথি
তোমার দেখা আর কি পাব নাতি!

হাতির বদল ঘোড়া পুষব ঘোড়া
কিন্তু আমার হায়রে কপাল পোড়া।
নানা বলল, সহিস লাগে সহিস
আমি বললাম মহিষ পালব মহিষ।
নানা বলল পাগল আমার নাতি
এই বলল ঘোড়া আবার এই বলল হাতি।

আমি বললাম, গরু পুষব তবে?
দুগ্ধ খাওয়া হবে।
নানা বলল, গরুর জন্য
মাঠ দরকার মাঠ
কোথায় পাব এই নগরে
দিগনগরের হাট।

তাহলে কি ছাগল পুষব ছাগল
নানা বলল, ছাগল পোষে পাগল।
আমার প্রিয় নানা
সবকিছুতে না, না।

ছড়ার মিল

আলুর সঙ্গে বালু এবং
বালুর সঙ্গে খালু এবং
খালুর সঙ্গে চালু এবং
চালুর সঙ্গে আলু এবং
আরও অনেক মিল।

কাকির সঙ্গে পাখি এবং
পাখির সঙ্গে ঝাঁকি এবং
ঝাঁকির সঙ্গে বাকি এবং
বাকির সঙ্গে ফাঁকি এবং
আরও অনেক মিল।

খেলার সঙ্গে মেলা এবং
মেলার সঙ্গে বেলা এবং
বেলার সঙ্গে ঢেলা এবং
ঢেলার সঙ্গে খেলা এবং
আরও অনেক মিল।

গাড়ির সঙ্গে বাড়ি এবং
বাড়ির সঙ্গে শাড়ি এবং
শাড়ির সঙ্গে হাঁড়ি এবং
হাঁড়ির সঙ্গে গাড়ি এবং
আরও অনেক মিল।
বুঝলে ভায়া হা হা...
মিল থাকলেই হয় না ছড়া
কেমনে বুঝাই তাহা।

সেই শিশুদের জন্যে

শূন্য থালায় যে শিশুটির
ক্ষুধায় কাটে রাত
তার পাতে দাও শুধু সাদা
জোনাক ফোটা ভাত।

যে শিশুটির ঘরবাড়ি নেই
নেই কো মাথায় ছাদ
পথে পথে ঘুরে বেড়ায়
নেই স্বাদ আহ্লাদ।

সেই শিশুটির ময়লা কাপড়
ছিন্ন পোশাক গায়ে
রোদ বৃষ্টি একই রকম
হাঁটেন খালি পায়ে।

সেই শিশুদের কাছে আমার
ছড়ার নেই দাম
একটা জীবন কাদের জন্য
পদ্য লিখিলাম?

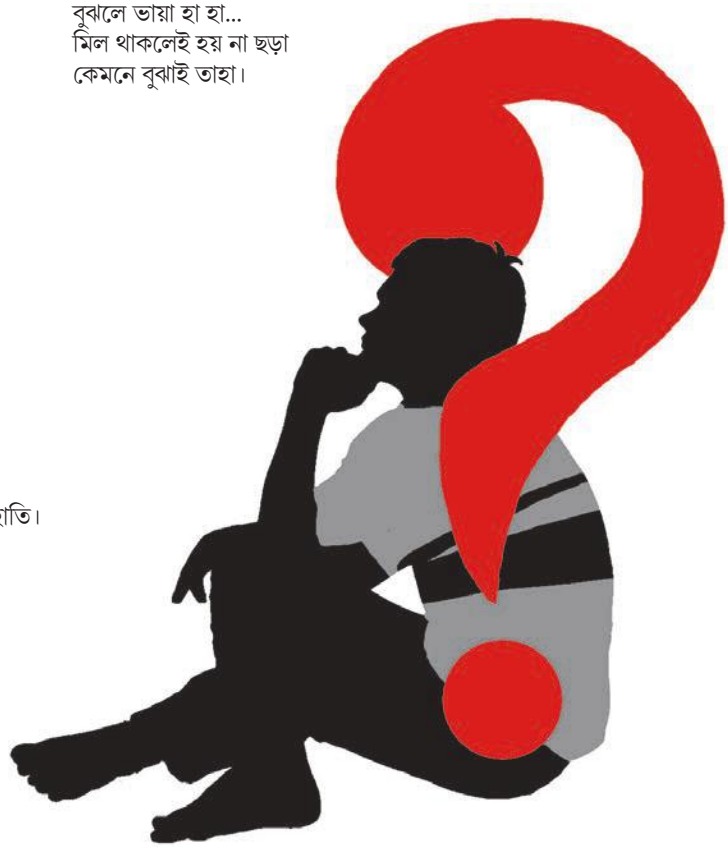

আনজীর লিটন

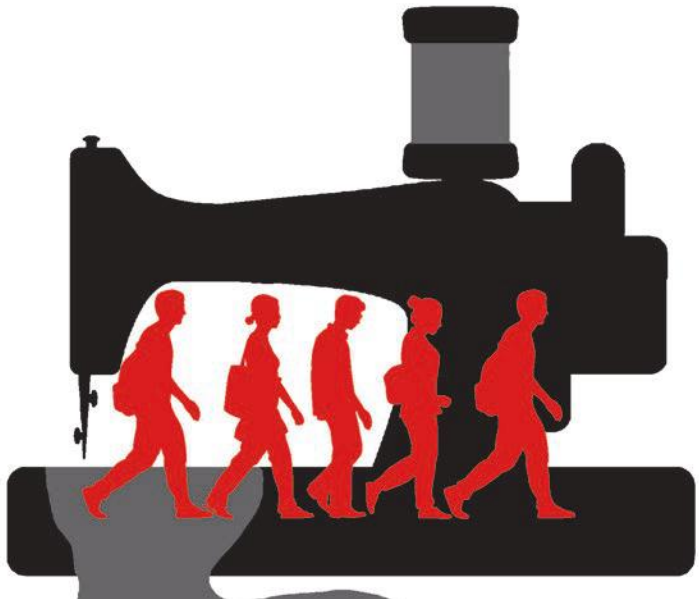

পোশাক-শ্রমিকের গান

কাপড় কাটি কাপড় কাটি
আমরা কাপড় কাটার দল
কারখানাতে যাই হেঁটে রোজ
আমরা সবাই হাঁটার দল।

একসাথে যাই একসাথে খাই
এক ঘরেতে থাকার দল
কাজের আশায় ঢাকায় থাকি
আমরা সবাই ঢাকার দল।

কাপড় কাটি কাপড় কাটি
কাপড় কেটে ডলার পাই
ব্যাংকে মালিক রাখছে ডলার
যাও দেখে যাও, বলার নাই
মাস না যেতে শূন্য ঝোলা
উপায়টা আর চলার নাই।

কাপড় কাটি কাপড় কাটি
আমরা শ্রমিক পুরো খাঁটি
আমরা আনি দেশের সুনাম
সংসারে নেই দুধের বাটি।

কাপড় কাটি কাপড় কাটি
আমরা কাপড় কাটার দল
স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি
আমরা সবাই হাঁটার দল।

হাতির ভাবনা

কানটা কেন কুলোর মতো
দাঁতটা কেন মুলোর মতো
ভাবতে থাকে মুখের ওপর
লম্বা কেন শুঁড়?
পাহাড় সমান শরীর কেন
ভাল্লাগে না, ধুর!

ভাবছে হাতি কালো রঙে
জীবনটা তার বাঁধা
ছোট্টো একটা খরগোশ তার
রূপটা কেন সাদা?

উত্তর নেই, ভাবছে হাতি
তবে কি সে গাধা?

ইলিশ

একটা ইলিশ রূপালী রঙ
এমন করে নাচছিল, তার
লেজের ওপর আলোর খেলা
সূর্য মজা পাচ্ছিল, আর
নদীর ধারে একটা বেড়াল
চুপিচুপি যাচ্ছিল, আর
মনে মনে একলা ঘরে
ইলিশ ভাজা খাচ্ছিল, আর
ইলিশটাকে ডাকছে জেলে
কিন্তু ইলিশ নাচছিল, আর
জেলের জালে দেয়নি ধরা
তাই তো ইলিশ বাঁচছিল, আর
বেঁচে থাকার সুখে আহা
বন্ধুরা তার নাচছিল, আর
নাচের তালে নদীর জলে
ছন্দ আহা বাজছিল, আর
মাছেরা তাই নাচছিল।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং

ছেলের রুমে ফোনটা বাজে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
মেয়ের রুমে ফোনটা বাজে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
বাবার রুমে ফোনটা বাজে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
মায়ের রুমে ফোনটা বাজে ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

গেস্টরুমেতে মামা থাকে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
বুয়ার ফোনটা রান্নাঘরে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
কানের কাছে শব্দ শুধু ক্রিং ক্রিং ক্রিং
ফোন ছাড়া আর কী-বা হাতে ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

দিন কেটে যায় ফোনে ফোনে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
সেই খুশিতে নাচো এবার ডিং ডিং ডিং।

ফোরজি

গায়ের মাপে কাপড় কাটে
পাঠানপাড়ার দর্জি
আমরা এখন অগ্রগামী
যুগ আমাদের ফোরজি।

এ বি সি ডি

এ বি সি ডি
পোকাগুলো ঝিঁঝি
ঝিঁঝি পোকা বিজি
নট ফর ইজি।

ই এফ জি এইচ
আই জে কে এল
এভাবেই লেখা হলো
ছন্দের কত খেল।

ছন্দতে গড়া হয়
ছড়া ছড়া ছড়া
এম এন ও পি
ছড়া হলো পড়া।

অনেক তো পড়া হলো
কত ছড়া গড়া হলো
মাথায় তো আর নাই
এইবার চলে যাই।

টাকা

দেখো দেখো উড়ছে টাকা
টাকারা যাচ্ছে ঢাকা
ঢাকাতে গিয়ে টাকা
মেলে দেবে রঙিন পাখা।

টাকাদের সুবাস পেয়ে
নাচে মন ধেয়ে ধেয়ে।

টাকারা উড়ছে দেখো
শীতাতপ মিটিং ঘরে
টাকারা ঘুরছে দেখো
হাতিরঝিলে রেলিং ধরে।
টাকারা খেলছে খেলা
আলোর নাচন রাতের বেলা।

দেখো দেখো উড়ছে টাকা
টাকারা যাচ্ছে ঢাকা।

কলম

পথে ছিল বাস
মাঠে ছিল গাছ
জলে ছিল মাছ।

বাস, গাছ, মাছ
মাছ, গাছ, বাস
কলমটা বলল এবার,
ব্যাস ব্যাস ব্যাস।

নয়ছয়

কোন শহরে থাকিস রে
কার নাম তুই ডাকিস রে
কাউকে আমি ডাকি না
দুধ-কলা-ভাত মাখি না
দুধের ভেতর পানি পাই
বাবা বলে, 'মানি' নাই।

রোমেন রায়হান

হায় কী গরম

হায় কী গরম, হায় কী গরম! হায় কী প্রখর রোদ!
মগজ গলে লোপ পাচ্ছে বুদ্ধি এবং বোধ।

কোত্থেকে এই গরম এলো! দেশের কি ভাই জ্বর?
কাপড়চোপড় খুলে ফেলে উদোম, দিগম্বর।

চিড়বিড়িয়ে শরীর জ্বলে, বাপরে এ কী তাপ!
ইচ্ছা করে মহিষ হয়ে পুকুরে দেই ঝাঁপ।

দরদরিয়ে গড়াচ্ছে ঘাম, বাঁচার উপায় নাই
ইচ্ছা করে আঁকড়ে ধরি আস্ত বরফ চাঁই।

এসো এসো জলদি এসো! এসো হে বৈশাখ!
কত্ত বড় বেকুব হলে এইভাবে দেয় ডাক!

মামা

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙাত মিসডকলে যে
ক্লাসের ফাঁকি যে শেখাল স্কুল-কলেজে
এই শহরের সবগুলো পার্ক যে চেনালো
চুরির টাকায় ড্রেস-লিপস্টিক-টিপ কেনালো
খাওয়ার শেষে বিল দেওয়ালো রেস্তোরাঁতে
রাখল আমায় ব্যস্ত দিনে, ব্যস্ত রাতে
যে আমাকে পরীক্ষাতে ফেল করালো
যে আমাকে সিগারেটের শখ ধরালো
হাত ধরালো, পা ধরালো, ব্যাগ টানালো
আমায় ছাড়া বাঁচবে না যে স্ট্রেট জানালো
পত্র দিয়ে ডাকল আমায় যে 'ফিঁয়াসে'
আটট বছর প্যাঁচ খেলিয়ে কী দিয়াছে?

বিচ্ছু দুটি বাচ্চা ওকে মা মা ডাকে
বাচ্চাগুলো আমায় পেলেই মামা ডাকে।

রেড কালারের থ্রেড

মাথার ওপর মেট্রোরেল ঝা চকচক ট্রেন
আমি আছি এমনখানে! পায়ের নিচে ড্রেন!
ভাগ্য আমার হয় না সহায়, বিপদ করে থ্রেট
দারিদ্র্যরে আর কবে তুই করবি আমায় গ্রেট?
শুকনা রুটি হলেই চলে, চাই না শখের ব্রেড
পেছন দিয়ে তাতেই বেরোয় রেড কালারের থ্রেড!

রূপচর্চা

শসা খেয়ে ফ্যাট কমাব, কোথায় আমার শসা?
চোখের ওপর শসা নিয়ে গিন্নি দেখি বসা!
কাণ্ড দেখ! চলছে এখন হাত ও পায়ে ঘষা!

আমি হলাম দইয়ের পাগল, দই খাব ফ্রিজ খুলে
দই দেখি না, কোথায় গেল? রাখলো কোথায় তুলে?
আরে! একি! গিন্নি দেখি দই মেখেছেন চুলে!

কতকিছু দেখতে হবে আমায় কালে কালে
চিপছে লেবু মাথার ওপর, এবং দুটি গালে
দিচ্ছে কড়া পলেস্তারা বাটা মসুর ডালে!

যতবারই বাজার থেকে তরমুজ আনি কিনে
আমি থাকি খাওয়ার আশায়, গিন্নি লাগান স্কিনে।
রূপচর্চা কোনদিকে যে যাচ্ছে দিনে দিনে!

কোন পাগলে কামড়েছিল আমারে?

আমি, সোমা শহর জুড়ে
রিকশা করে বেড়াই ঘুরে
ডাকল বাবা চাচা, খালা, মামারে
বললো বিয়ে দিয়ে ঘোরা থামা রে!
কেউ বলে না বিয়ে কবে
সবাই বলে হবে হবে
মানুষগুলো নিচ্ছে কি রূপ চামারে?
ঝগড়াঝাটি হওয়ার পরে
বলল সবাই সমস্বরে
গাধার ডেটেই ঢুকুক গাধা খামারে।
বিয়ে হবে আমার ডেটে!
সুড়সুড়িটা লাগল পেটে
কোন পাগলে কামড়েছিল আমারে?
বিয়ে করার ডেট নিছিলাম সামারে!
শ্বশুরবাড়ির উলেন স্যুটে
ঘামের নদী বইছে ছুটে
কোনোমতেই থামতেছে না ঘামা রে!
আস্ত ছাগল, কাচ্চি খেয়ে
গড়াচ্ছে ঘাম জুলফি বেয়ে
পাইতেছি ভয়, বাবা যেন না মারে!
কোন পাগলে কামড়েছিল আমারে?

আম-দুধ-আঁটি

দিনে যাকে দিচ্ছে গালি
রাতের বেলা বদে
তার সঙ্গেই দিচ্ছে চুমুক
এক বোতলের মদে!

পক্ষ নিলেই বাড়ছে বিপদ
দুই পক্ষ মিলে
যে নিয়েছে পক্ষ তাকে
দিচ্ছে বেদম ছিলে!

কার কে আপন বুঝতে গিয়েই
হচ্ছে জীবন মাটি
আমে দুধে যাচ্ছে মিশে
গড়াচ্ছে কে? আঁটি!

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

রোববারে ফেসবুকে হাই
সোমে ফোন নম্বর চাই
মঙ্গলে সারারাত চ্যাট
বুধবারে লিটনের ফ্ল্যাট
বিষ্যুদে চায়নিজে ডেট
শুক্কুরে মারামারি, থ্রেট
শনিবারে সবখানে ব্লক

মিটে গেল প্রেম করা শখ!

ইকরাম কবীর

আত্মহত্যা কেন্দ্র

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

এক

আত্মহত্যা আইন পাস করার তিন মাসের মাথাতেই কুণ্ডু রাজ্যে আত্মহত্যা করার হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলে, রাজ্যপ্রধান লাল খান দুশ্চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি এবং তার পরিষদ ভেবেছিলেন, আত্মহত্যার অনুমতি দেওয়ার পর দেশে আত্মাহুতির সংখ্যা অনেক গুণে বেড়ে যাবে এবং অতি-বর্ধমান জনসংখ্যার লাগাম টানা যাবে। যেকোনো উপায়ে মানুষের সংখ্যা ধরে রাখতে হবে। না হলে এতগুলো মুখে ভাত দেবেন কেমন করে? কেউ না খেয়ে থাকলে তো সুশীল প্রজাদের উচ্চবাচ্যের ঢেউ সামলাতে পারবেন না। অন্যদিকে আছে আশপাশের রাজ্যগুলো। তারা চিৎকার শুরু করে দেবে যে লাল খানের লোকরা খাবারের অভাবে বেআইনি পথে তাদের রাজ্যে ঢুকে বসতি গাড়ছে এবং তাদের ভাত নষ্ট করছে।

প্রতিরক্ষা বিশারদ ওয়াইল্ড হ্যামিল্টনের বুদ্ধিটি ছিল চমৎকার। তার পারিষদদের মধ্যে ওয়াইল্ডকেই তার বেশি পছন্দ। আপদের সময় সেইই লাল খানকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। কয়েক মাস আগে, এক সভায়, ওয়াইল্ড জানিয়েছিল তার কাছে তথ্য আছে রাজ্যের অসংখ্য মানুষ নিজেকে মেরে ফেলতে চাইছে। আত্মহত্যা আইন-পরিপন্থী, তাই তারা নিজেদের খুন করতে সাহস করছে না। যদি বেঁচে যায়, তাহলে গুরু-শাস্তি হবে সেই ভয়ে। জীবিতাবস্থায় মানুষরা শাস্তির ভয় পায়, তবে নিজেকে খুন করতে তারা প্রস্তুত। ওয়াইল্ড আইন পরিবর্তন করে আত্মহত্যার অনুমোদনের জন্য রাজার কাছে আরজি করেছিল।

বুদ্ধিটা লাল খানের খুব পছন্দ হয়েছিল।

তখনই তিনি আইন বিশারদ দিয়েগো রদরিগেকে আইনের খসড়া তৈরি করতে আদেশ দিয়েছিলেন। বেশ কিছু ধারা-উপধারা নিয়ে উপদেশও দিয়েছিলেন। লাল খান চেয়েছিলেন এক মাসের মধ্যেই এই আইন কার্যকর করবেন। ওয়াইল্ডের বুদ্ধির তারিফ করেছিলেন তিনি। তবে স্বরাষ্ট্র বিশারদ বিয়র্ন লুদভিগ অনুরোধ করেছিলেন, 'মহারাজ, আমার একটা অনুরোধ আছে। তাড়াহুড়ো না করে, আমরা একটা সমীক্ষা চালাতে পারি। জেনে নিই আসলে কারা বা কতজন আত্মহত্যা করতে চাইছে। যুবারা, নাকি মেয়েরা? বিবাহিত মহিলা নাকি বুড়োরা? তাহলে আমরা আইনটি তেমন করেই লিখতে পারব।'

'খুব ভালো বুদ্ধি। কিন্তু সমীক্ষা করতে গেলে সবাই সত্য কথা নাও বলতে পারে।'

'মহারাজ, রাঘব পাণ্ডের দপ্তর যেকোনো বিষয়ে গণসমীক্ষা করার একটা অ্যাপ বানিয়েছে, যা দিয়ে মানুষজন বেনামে হ্যাঁ-না বলতে পারে; আমাদের গালিও দিতে পারে। হাতে ফোন নেই এমন মানুষ আমাদের রাজ্যে আর কেউ নেই; আমরা এমন সব প্রশ্ন তৈরি করে দেব যেগুলোর উত্তর দিতে কারও নাম লিখতে হবে না; আর তা ছাড়া মিথ্যা বললেই বা কী? আমাদের প্রয়োজন একটা পরিসংখ্যান। আইন পাস তো আমরা করবই, উত্তর যাই আসুক না কেন।'

লাল খানের মন চক-চক করে। মনে এক ধরনের ক্ষুধারও জন্ম হয়; বনের বাঘ একাকী হরিণকে দেখে যেমন আনন্দ পায়, তেমন। তবে তিনি তার বহির্বিশ্ব-বিশারদ সাইফ আল নাহিয়ানের দিকে চেয়ে বলেন, 'সাইফ– তুমি একটু উলু সাম্রাজ্যের দূতের সঙ্গে কথা বলো। তাদের কাছে আমাদের এই সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা কতটা; ওদের জানিয়ে রাখা দরকার; ওদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।'

সাইফের ঠোঁটে উত্তর লেগেই ছিল; সে বলে– 'হুজুর, আমি কথা সেরে রেখেছি; ওয়াইল্ডের মাথায় যখন এই ভাবনাটা আসে, তখন আমি আর ওয়াইল্ড একসঙ্গেই আমাদের রাজ-খানায় বসেছিলাম। তার কথা শোনার পরই আমার মনে হয়েছিল, আপনি এটা পছন্দ করবেন। আমি উলুর দূতের সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছি; ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনাকে আগে বলা হয়নি।'

'বাহ, সাইফ; বাহ! আমি খুশি হয়েছি।'

এ কথা বলেই মহারাজা তার তথ্যবিশারদ বিয়র্ন লুদভিগের দিয়ে তাকিয়ে বলেন, 'বিয়র্ন, তুমি আমাদের কিছু তথ্য দাও। আমরা জানতে চাই যে গেল ছয় হাজার বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কটি আছে।'

বিয়র্ন বলেন– 'আমরা তথ্য জোগাড় করে রেখেছি, মহাশয়; কেউ আমাদের মতো এমন বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারেনি, রাজা আমার। রাজ্যের জনসংখ্যা কমাতে সব রাজাই কিছু না কিছু করেছেন; নানা উপায়ে মাথা কমিয়েছেন; অনেকে জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়ে কমিয়েছেন; শান্তি-সাগরের ওপারে আমরু রাজ্যে এক রানী একবার রাজা হয়েছিলেন; তিনি মানুষদের জাহাজে চড়িয়ে ভ্রমণে পাঠিয়ে মাঝ-সাগরে ডুবিয়ে দিতেন। আমাদের মতো এমন সুন্দর পরিকল্পনা কারও ছিল না।'

রাজা সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আইন পাস করলে আমরা কি কোনো ঝুঁকিতে পড়তে পারি?'

দরবারের এক পাশে বসে ছিলেন যুবরাজ শান্ত লাল। তিনি কিছুটা সংশয়ে বললেন– 'মহারাজ, আমার মনে হয় আমাদের অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি। এ সিদ্ধান্ত আমাদের রাজ্যের জন্য শুভ নাও হতে পারে; বিশেষ করে আপনার জন্য।'

লাল খান একটু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন– 'যুবরাজ, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই আমরা সবাই মিলে এই পরিকল্পনা নিচ্ছি। তুমি হবে এই রাজ্যের রাজা; আমাদের সাহায্য করো; বাধা দিয়ো না।'

যুবরাজ নম্র হন। তবে বোঝা যায় তার আরও কিছু বলার ছিল।

দুই

আইন পাসের পর প্রথম এক মাস আত্মহত্যা কিছুটা বাড়লেও, তারপরের মাস থেকে তা দ্রুতই কমতে শুরু করে। যারা আত্মহত্যা করেছে, তারা নিছক শখের বসেই করেছে বলে রাজ্য অ্যাপের মাসিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। পরিষদের কপালে ভাঁজ পড়ে। তারা ভেবেছিলেন যারা মনঃকষ্টে আছে তারাই বেশি আত্মাহুতি দেবে। তারা এও ভেবেছিলেন যে যেসব মানুষ প্রতিকার-অযোগ্য রোগে ভুগছে তারাও কোনো না কোনোভাবে আত্মহত্যা করতে চাইবে। ঘরে ঘরে চিপ স্থাপিত হয়েছে, সেই খবর গণমাধ্যমে আসে। প্রতি ঘর থেকেই কাউকে না কাউকে বের করে দেওয়ার অভিসন্ধি ও প্রস্তুতি চলছে বলে জানা যায়। যাদের বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে তারা কেউই ঘর ছাড়তে চায় না কিন্তু জোর করা হচ্ছে। ওয়াইল্ড অবশ্য চিপে বিশ্বাস করেন না, তাই রাত-বিরেতে ঘুরে, ঘরে-ঘরে গিয়ে দরজায় কান পেতে ভেতরে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। তিনিও তাই-ই বুঝেছেন। এ রাজ্যের মানুষ নিজেকে মারতে চায়। ওয়াইল্ড ও সাইফ দুজনেই রাজ্য চষে বেড়িয়েছেন। রাঘবের অ্যাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহারাজের কাছে নিজেদের প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তারা রাজাকে বেশি ভালোবাসেন। দুজনেই শুনেছেন নির্যাতিত স্ত্রীরা বিলাপ করছে এবং তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জলে ডুবে মরতে চায়, বৃদ্ধরা বলছে তারা গাড়ির চাকার নিচে পড়ে নিজেদের পিষে মারতে চায়, ধর্ষিত কন্যার বাবা-মা বিষপান করতে চায়, পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা মরে যেতে চাইছে।

তিন মাসের মাথায় আত্মহত্যার হার প্রায় শূন্যে নেমে এলে রাজ্যের সুশীল প্রজারা খবরের কাগজে নানা রকমের হাস্যরসাত্মক বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করলে লাল খান সবার ওপর অসম্ভব চটে যান। এই চট যেনতেন রাগ নয়; অতিশয় রাগ। তার কোনো পারিষদই সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। অ্যাপের যুগে এমন তথ্য-বিভ্রাট হয় কী করে? তিনি এতই রেগে যান যে তার অমাত্য সভায় রদবদল আনবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। পারিষদরা রাজার রাগ দেখে ভয় পেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। কেউ কেউ প্রমাদ গোনেন। মহারাজ যা একবার বলেন তা করেই ছাড়েন। কেউ কেউ যুবরাজের কাছে গিয়ে অনুনয় করেন যে তারা মহারাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি যেন এবারের মতো তাদের ক্ষমা করে দেন। তাদের সবচেয়ে বড় ভয় রাজার লাল বাহিনীকে। যদিও

রাজার হয়ে এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন ওয়াইল্ড, তার পরও রাজার রাগ তাদের কলিজা কাঁপিয়ে দেয়।

যুবরাজ ওয়াইল্ডকে বললেন– 'মহোদয়, আপনারাই মহারাজকে এই বুদ্ধি দিয়েছিলেন। বিষয়টি এখন আপনাদেরই সামলাতে হবে। তাকে বিকল্প কোনো বুদ্ধি দিন। তবে এমন বুদ্ধি দেবেন না যাতে তার ক্ষতি হয়। তিনি আমার পিতা; আমি চাই তিনি ভালো থাকুন।'

ওয়াইল্ড ভবিষ্যৎ রাজার কথার মর্ম বুঝতে পেরে আস্তে নত হয়ে বেরিয়ে যান।

তিন

পরদিন লাল খান দরবারে আসেন বেলা এগারোটার সময়। রাতে ভালো ঘুম হয়নি তা চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তবে ঘুম নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তার চিন্তা নিজেকে নিয়ে। তার সিদ্ধান্ত সবই বাস্তবায়িত হয়। তার সিদ্ধান্তে কোনো কাজ হয়নি এমন কোনো উদাহরণ আজ পর্যন্ত নেই। তবে আজ পারিষদদের মধ্যে অদ্ভুত এক অস্থিরতা লক্ষ করে তার ভালো লাগে। তিনি এমনটাই চান। অস্থিরতা। চারপাশে সবাই সব সময় অস্থির থাকলে তিনি এক অপার শান্তি উপভোগ করেন। প্রজারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকলে তার ভালো লাগে। সবাই দৌড়াবে, শুধু রাজা স্থির থাকবেন, তাহলেই নিজেকে রাজা-রাজা মনে হবে। লাল খান জানেন তিনি অনন্তকাল রাজের পদে রইবেন না, তাই শান্তকে রাজত্ব চালানোর জন্য প্রস্তুত করতে চান। তবে তার পুত্র তার মতো হয়নি বলেই তার মনে হয়।

'আমি রাজ্যে আত্মহত্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই কেন্দ্রগুলোতে এসে সবাই আত্মহত্যা করবে। আমার কাঠামো বিশারদ কোথায়? ডেকে আনো ওকে; ওয়াইল্ড, তুমি ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপে বসবে।'

কেউ কিছু বলল না। লাল খান তার ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যুবরাজ দরবারের ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তিনি ওয়াইল্ডকে বললেন– 'যুবরাজকেও সঙ্গে নিয়ে এসো।'

'আজ্ঞে, মহারাজ', ওয়াইল্ড বললেন।

সেদিন লাল খান কোনো দাপ্তরিক কাজ আর করলেন না। বিয়র্নকে আদেশ দিলেন তার সামনে যেন নারী-পুরুষ মিলিয়ে দুইশ প্রজাকে হাজির করা হয়। তিনি ওপেন-হাউজ মিটিং করবেন। পারিষদদের সেদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিলেন। তার ইচ্ছে প্রজাদের জীবন কতটা অর্থহীন তা কথা বোঝানো। অনেক কথা বলার পরও লাল খান যখন বোঝালেন তারা কেউই জীবনকে অর্থহীন মনে করে না, আত্মহত্যা কেন্দ্র তৈরি করার জিদ তখন তার মনে আরও চেপে বসে।

চার

যুবরাজ তার পিতাকে শিশুবেলা থেকেই চেনেন। তিনি একবার মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করেন তা করে এবং করিয়েই ছাড়েন। পিতার পারিষদদের চেয়ে শান্ত খান মহারাজকে অনেক বেশি চেনেন, বোঝেন। মহারাজ সবাইকে দিয়ে শুধুই করান, নিজে কিছু করেন না। যুবরাজ জন্মলগ্ন থেকেই লাল খানকে রাজ্যপ্রধান হিসেবে দেখে আসছেন। কয়েক বছর আগেও বর্তমান পারিষদরা এই মঞ্চে ছিলেন না। পিতা প্রায়ই রাজ্যমঞ্চ পরিবর্তন করেন; কাউকে উপযুক্ত মনে না হলে তাড়িয়ে দেন, নতুন কাউকে মনোনীত করেন। বলা যায় মহারাজ তাদের নিজের হাতে তৈরি করেন, শেখান। এ কাজ তিনি শুধু নিজের রাজপদ ধরে রাখার জন্য নয়; তার পুত্রকে শেখানোর প্রয়োজনেও। লাল খানের পর রাজা হবেন শান্ত খান। এসব কিছুই যুবরাজ বোঝেন, তবে কিছু করতে বা বলতে পারেন না। পিতার বিরুদ্ধাচারণও করেন না। শুধু খেয়াল রাখেন পিতার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

ওয়াইল্ড যখন তাকে নিয়ে রাজার সঙ্গে আলাপে গেলেন, যুবরাজ তাদের আলাপে কোনো কথা বলেন না। শুনলেন। ইদানীং তার কাছে মনে হচ্ছে ওয়াইল্ড তাকে কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে।

'মহারাজ, একটু ভেবে দেখলে হয় না? আত্মহত্যা কেন্দ্র না বানিয়ে, আমরা মানুষের মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারি।'– ওয়াইল্ড বলেন।

লাল খান জানতে চান– 'সেটা কেমন?'

'যেমন ধরুন, আমরা রাঘবকে বলে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করতে পারি'।

'প্রযুক্তি দিয়ে মাথা কমবে কেমন করে?'

'আমরা গণপরিবহনগুলোতে প্রযুক্তি স্থাপন করে দেব এবং তা কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করব; এক বাহনের সঙ্গে আরেক বাহনের

ঢাশ-ঢাশ আমরাই ঘটিয়ে দেব। দূর থেকে; দেখবেন ঝাঁকে-ঝাঁকে পড়বে।'

লাল খানের মন ক্ষণিকের জন্য চক-চক করে। মনের ভেতর আবারও সেই ক্ষুধা-ক্ষুধা ভাবের উদ্রেক হয়।

ওয়াইল্ড বলে– 'শুধু তাই-ই নয়, মহারাজ; আরও পথ আছে। আমরু দেশে এক ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্ট তৈরি হয়েছে, যা খেলে প্রাণীরা প্রথমে উত্তেজিত হয় তারপর হতাশাগ্রস্ত হয়– একসময় বিষাদগ্রস্ত হয়ে জীবনকে অর্থহীন মনে হয়; আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। অনেক আমরুবাসী এই ওষুধ ব্যবহার করে মরে যাচ্ছে।'

'এই খবর আমায় আগে দাওনি কেন?' একটু রাগ করেন লাল খান। একবার যুবরাজের দিকে তাকান। বলেন– 'একটা প্যাকেজ তৈরি করো; আত্মহত্যা কেন্দ্র তৈরি করো এবং এই ওষুধটাও নিয়ে আসো; আমার কল্যাণ বিশারদকে বলো একটা বিল প্রস্তাব করতে; আমি পাস করে দেব।'

রাজা বলেন– 'নাম হবে বিশ্রামাগার। ঘোষণা করা হবে, কল্যাণকর কুণ্ডু রাজ্যে, যারা ক্লান্ত নাগরিক, তারা রাজ্যের খরচে অবসর নিতে পারবেন। এখন তোমরা যাও; আমাদের প্রধান রাজ্য-প্রতিবেদককে পাঠিয়ে দাও; আমি ওকে বলে দিচ্ছি কীভাবে প্রজ্ঞাপন লিখতে হবে; বিয়র্নকেও আসতে বলো।'

পাঁচ

প্রজ্ঞাপন জারি হলে, সারা দেশে আবারও হইচই শুরু হয়– আনন্দের শোরগোল। যেসব প্রজারা পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের ভরণ-পোষণ আর চালাতে পারছে না তারা সবাই ধন্য-ধন্য করল। বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেরাও খুশি হলেন। তাদের সন্তান-সন্ততিদের বাড়িতে যে নানা রকম লাঞ্ছনা সইতে হয়, সেখান থেকে একটা মুক্তির পথ খুলল। খরচমুক্ত থাকা-খাওয়ার কথা শুনে একদল অর্থবিশ্লেষক জিডিপিতে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব নিয়ে বেশ কড়া কড়া বক্তব্য দিলেন, যা খবরে প্রকাশ হলো, তবে তাদের বক্তব্য কেউ আমলে নিল না। মাধ্যমগুলো ভেসে গেল সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে দাদা-দাদি-নানা-নানির ছবিতে। সবাই দাদা-দাদি-নানা-নানিকে ভালোবাসে এবং তাদের বিদায় দিতে সবার কষ্ট হচ্ছে। অনেকে বয়স্কদের উদ্দেশে কবিতা লিখে তাদের প্রতি উৎসর্গ করল। লাল খান এ খবর পেয়ে বিয়র্নের সাহায্য নিয়ে এক সেলফি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করলেন। মহারাজের সঙ্গে ছবি তোলার এই সুযোগ কেউ ছাড়তে চাইল না। দাদা-দাদি-নানা-নানিরাও এলেন। সারা রাজ্যে এক রইরই উত্তেজনা। কেউ বেলুন ওড়াচ্ছে, কেউ পটকা ফোটাচ্ছে, কেউ ক্যাম্প-ফায়ার করছে দাদা-দাদি-নানা-নানিকে নিয়ে, কেউ আবার প্রতিবেশীদের দাওয়াত দিয়ে উৎসবের আয়োজন করল। লাল খান তার প্রজ্ঞাপনের ফলাফল দেখে শান্তি পেলেন।

দরবারে বিল উত্থাপিত হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়ে গেল। মহারাজের মালিকানাধীন পঞ্চাশটি ভবনকে বাছাই করে বিশ্রামাগার বিভাগের কাছে অর্পিত করা হলো এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দশটি ভবনে সংস্কারকাজ শুরু হলো। সেগুলো প্রস্তুত করতে প্রায় এক মাস সময় লেগে গেল। মহারাজ কাজের গতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। মাধ্যমগুলো তার রাগের খবর প্রকাশ করল। ওদিকে ওষুধের চালান আসতে আরও দুই সপ্তাহ বেশি সময়ক্ষেপণ হয়ে গেল। বিদেশি সব মাধ্যমগুলো লাল খানের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে রাজার প্রধান প্রতিবেদক সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সময়ই তিনি সব জানাবেন। এদিকে রাজার উদ্বোধনী বক্তৃতা তৈরি হলো এবং লাল খান তা অনেকবার পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

ছয়

দেখতে দেখতে বিশ্রামাগার উদ্বোধনের সময় এগিয়ে এলো। বিভাগীয় অ্যাপে রেজিস্ট্রেশনে ইচ্ছুক প্রজাদের সংখ্যা দেখে পারিষদরা খুশি এবং তারপর অবাক হলেন। বয়স্কদের চেয়ে যুবারাই বেশি আবেদন করেছে। প্রায় আশি শতাংশই যুবা। রাজ্যপ্রধান আবারও দুশ্চিন্তায় পড়লেও উদ্বোধনের তারিখ পরিবর্তন করলেন না। উদ্বোধনের দিন প্রত্যুষে লাল খান যুবরাজকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তবে তাকে বলা হলো শান্ত খান আগেই সশস্ত্র প্রহরীদের সঙ্গে রাজাকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে চলে গেছেন। যেই বিশ্রামাগারটি দিয়ে প্রকল্প উদ্বোধন হবে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'শান্তির নীড়'।

শান্তির নীড়ের কাছাকাছি আসতেই লাল খান দূর থেকে ভবনের সামনে কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি ভেবেছিলেন লাখো মানুষের সমাগম হবে এবং তার প্রহরীদের লাঠিপেটাও করতে হতে পারে। তিনি তার বাহন থেকে নামতেই কোথা থেকে যেন হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘিরে ফেলল। তাদের সবার সামনে তার পুত্র যুবরাজ শান্ত। রাজা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শান্ত খান বললেন– 'মহারাজ, আমরা আপনাকে এই প্রকল্প উদ্বোধন করতে বাধা দিচ্ছি। আমার সঙ্গে যাদের দেখছেন, তারাও তাই-ই চান। এরা সবাই আপনার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। আপনি ফিরে যান।'

লাল খান তার রাগ সামলে, পুত্রকে প্রশ্ন করলেন– 'যুবরাজ, তুমি এ কাজে আগে বাধা দাওনি কেন?'

'আগেও বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমলে নেননি। সে কারণেই আজ এই চরমপন্থার আয়োজন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি; এর পরও যদি এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন, তাহলে আমার হাতে এই যে ইনসুলিনের কলমটি দেখছেন, এর পুরোটা সবার সামনে নিজের শরীরে ঢুকিয়ে দেব'।

গোলাম কিবরিয়া

চুল

অলংকরণ : রাজীব রাজু

এক

'এসবের মানে কী!!'

অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকতে একটু বিব্রত হাসি দিয়ে মঞ্জুর বললো, 'কিসের কথা বলছেন?'

'কিসের কথা বলছি, সেটা আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন, খামোখা নাটক করছেন কেন?' শেষের বাক্যটা একটু চড়া গলাতেই বলে বসলেন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার আকমল।

সদ্য কামানো মাথায় একবার হাত বুলিয়ে আবারও একটা হাসি দেয়ার চেষ্টা করলো মঞ্জুর। হাসিটা ঠিক ফুটলো না যদিও, তবে সেসব দেখার সময় নেই আকমলের। তার মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। প্রাইম টাইম বুলেটিন আর রাত এগারোটার টকশো নিয়ে। দ্রুত রিপ্লেসমেন্ট ঠিক করতে হবে। এই টেকো মাথার জোকারকে দিয়ে সিরিয়াস টকশো করা অসম্ভব।

'আকমল ভাই, আপনার কাছে আমি তো ছুটি চেয়েই রেখেছিলাম। অন্তত দুই সপ্তাহের একটা ছুটি খুবই দরকার ছিল...'

'বাহ, ছুটি দেই নাই, তাই নিজে নিজেই ব্যবস্থা করে নিলেন? ভালোই ফন্দি এঁটেছেন দেখছি! এখন তো আর ছুটি না দিয়ে উপায় নেই...রীতিমতো ব্ল্যাকমেইলিং...'

'ভাই, বিষয়টা এভাবে দেখবেন না...'

'আরে যান যান..., মুখে নীতি কথা বলা সহজ, কতো ধানে কতো চাল সেটা তো আমি টের পাই; শেষ পর্যন্ত আমাকেই তো চালিয়ে নিতে হয়।'

আকমলের মুখোমুখি চেয়ারটাতে বসে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে মঞ্জুর। যদিও এখন তার মেধা আর মনোযোগের পুরোটা প্রয়োগ করা দরকার বসকে ঠাণ্ডা করতে। সেটা পারা যাচ্ছে না। বসের গরম মাথা ঠাণ্ডা করার চেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে নিজের ঠাণ্ডা মাথাটাকে গরম রাখা, মানে টাক মাথাটাকে বাঁচানো। যে চেয়ারটিতে মঞ্জুর বসে আছে, সেখানে সরাসরি এসির বাতাস এসে লাগছে। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই আকমল ভাইয়ের রুমটা এসির কল্যাণে হিমশীতল হয়ে থাকে। কেন, কে জানে! আগেও এই চেয়ারে বহুবার বসেছে, বলতে গেলে প্রায় প্রতি দিনই কখনো না কখনো বসতে হয়। ব্যাপারটা সেভাবে কখনো টের পায়নি, খুলির উপর চুলের আচ্ছাদন সেটা টের পেতে দেয়নি। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, টাক মাথায় সরাসরি এসির ঠাণ্ডা বাতাস এসে আছড়ে পড়লে সেটা কতোটা অসহনীয় লাগে। মাথার চুল যে নিছক সৌন্দর্যবর্ধনের অনুসঙ্গ নয়; এর আরো অনেক গুরুতর ভূমিকাও রয়েছে সেটা নতুন করে আবিষ্কার করল।

আরেকবার মাথায় হাত বুলিয়ে অস্বস্তিটা দূর করার চেষ্টা করে মঞ্জুর। আর এই দৃশ্যটা দেখে নতুন করে মেজাজটা খারাপ হলো আকমলের।

'বেশ বেশ, এখন আয়েশ করে টাক মাথায় হাত বুলান। আপনাদের আর কী! মাস শেষে বেতন নেবেন, টিভিতে চেহারা দেখাবেন, স্টার হয়ে যাবেন এক একজন। আর আমরা কামলার মতো খেটে মরি! যখন ইচ্ছা চকচকে টাক নিয়ে হাসিমুখে এসে হাজির হবেন, আপনাদের আবার কিচ্ছু বলা যাবে না...হুহ্!'

নাক দিয়ে একটা বিদঘুটে শব্দ করে বিরক্তিটা প্রকাশ করে আকমল। এটাকে তার মুদ্রাদোষ বলা যায়।

আকমলের মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকে মঞ্জুর। এমন প্রতিক্রিয়া হবে, কিছুটা অনুমেয়ই ছিল। আকমল ভাই ভালো মানুষ। একটু চিল্লাচিল্লি করে ভেতরের রাগটা প্রকাশ করছেন, এই আরকি। রাগটা পড়ে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। জানে, বোবার শত্রু নাই।

অফিসে কী হবে, সেটা নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নাই। তীর ছোড়া হয়ে গেছে, ফেরানোর পথ নেই। কয়েকটা দিনের ছুটি তার আসলেই খুব দরকার ছিল। এই মিডিয়া অফিসগুলোর পরিবেশটা এমন, ছুটি চাইতে এলে মনে হয় যেন গুরুতর কোনো অন্যায় আবদার উত্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে চব্বিশ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেলে যেন ছুটি কাটানোটা মস্তবড় পাপ। এই কালচারের পরিবর্তন হওয়া জরুরি, খুবই জরুরি।

আবারো অন্যমনস্কতায় ডুবে যায় মঞ্জুর। সামান্য চুল কি মানুষের চেহারায় এতো বড় পরিবর্তন আনতে পারে? আজ অফিসে ঢোকার মুখে রিসিপশনের মেয়েটা রীতিমতো আটকে দিল।

'কার কাছে যাবেন?'

মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই অবশ্য তাকে চিনে ফেললো। তার টাক মাথা দেখে প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টাটা করছিল অল্পবয়সী মেয়েটা। মঞ্জুর অবশ্য এতে কিছু মনে করেনি। এই বয়সের মেয়েদের সামান্য কারণে বা কখনো একেবারেই অকারণে হাসি পায়। রিসেপশনিস্টের প্রতিক্রিয়াটুকু দেখার পর পরই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। আজ সারাটা দিন তো বটেই আগামী কয়েকটা দিন এমন নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই মনে মনে ভাবছিল এই পরিস্থিতিতে আকমল ভাইয়ের রিয়্যাকশনটা কী হতে পারে! যতোটা ভেবেছিল, প্রতিক্রিয়াটা তার চেয়ে অনেক মৃদু, এটাই বড় স্বস্তির ব্যাপার। অবশ্য মঞ্জুর বিলক্ষণ জানে, এই গরম মেজাজটাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শীতল হয়ে যাবে। আর তার অনুপিস্থিতির বিকল্প একটা ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করে ফেলবেন, এই আস্থাটুকুও বসের প্রতি পুরোপুরি রয়েছে।

অফিস থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরলো মঞ্জুর। কোনো কোনো দিন একটু আগেভাগে বা অসময়ে বাড়ি ফিরতে দেখলে মেয়েটা যে কী খুশি হয়! যতোক্ষণ বাসায় থাকে, বাবার শরীরে লেপ্টে থাকে বাচ্চাটা। সারাটা সময় বাবাকে দখলে রাখতে চায়। তার সাথে খেতে হবে, পুতুল খেলতে হবে, ছবি আঁকতে হবে আর তাকে নিয়ে ঘুমাতে হবে। আজকে অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে বাসায় দেখলে কী করবে মেয়েটা?

এই ভাবনাটুকুতে অজান্তেই ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠল।

দুই

সকালবেলা হুট করেই সিদ্ধান্তটা নেয়া। তার পরই সোজা সেলুনে। বহুদিনের পরিচিত নাপিত মিন্টু রীতিমতো আঁতকে উঠলো।

'কন কি ছার। চুল অফ? পুরা টাক? আপনের চুলে তো খুশকি নাই, উকুনভি নাই....তয়? এই মাঘ মাসে কেউ চুল ফালায়?'

মিন্টু নাপিতের এই তীব্র প্রতিক্রিয়াকে খুব একটা পাত্তা দিল না মঞ্জুর। জানে, সবকিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি রকমের রিয়্যাকশন দেখানোটা তার স্বভাব। ব্যবসার কৌশলও বলা যায়। সে মনে করে ক্লায়েন্টদের যে কোনো বিষয়ে একটু বেশি রকমের আবেগ-আগ্রহ প্রকাশ করলে আন্তরিকতাটা আরো ভালোভাবে প্রকাশ পায়।

মঞ্জুর বোঝার চেষ্টা করে, মিন্টুর এই কনসার্ন কতোটা আন্তরিক আর কতোটা ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ। তার এই উদ্বেগকে পাত্তা না দিয়ে গম্ভীর মুখে নির্দেশ দেয়, 'যা বললাম, সেটাই করো। চুল সব ফেলে দাও। মাথা যেন একদম চকচক করে।'

অগত্যা গলায় সাদা কাপড়ের আচ্ছাদনটা বেঁধে দিয়ে কাজ শুরু করে দেয় মিন্টু। সকাল সকাল দোকানে ভিড় কম তাই খুব বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না মঞ্জুরকে। টেলিভিশনে নিয়মিত চেহারাটা দেখা যায় বলে এলাকায় সে মোটামুটি পরিচিত। সেলুনে এলেই স্থানীয় কয়েকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, মামুলি কুশল বিনিময় চলে। কেউ কেউ দেশ আর রাজনীতির খবরাখবর জানতে চান। আজকে অবশ্য এখনো তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু সেলুনের আরো দুই নরসুন্দর কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখছে। কোনো প্রশ্ন করছে না অবশ্য।

সাদা কাপড়ের উপর গোছা গোছা চুল পড়ছে। মাথায় এত্তোগুলো চুল ছিল! আগে কখনো সেভাবে অনুভব করেনি। কালো চুলের আড়ালে মাঝে মধ্যেই সাদা-রুপালি ঝলক দেখা যাচ্ছে। ইদানীং আয়নার সামনে দাঁড়ালে কালো জঙ্গলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দুএকটা

সাদাটে দলছুট চোখে পড়ছিল বটে, তবে তাদের দলটা যে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল আজ।

'আরে মঞ্জুর ভাই, এ কী অবস্থা! কি, মাথার চুলটুল পড়ে যাচ্ছিল নাকি? টাক পড়ার আগে অনেকেই দেখেছি ঘন ঘন মাথা কামায়। এতে কি আসলেই কোনো কাজ হয়?'

একদমে কথাগুলো বলে পাশের চেয়ারটাতে জুত হয়ে বসলেন রিটায়ার্ড ব্যাংক কর্মকর্তা ভদ্রলোকটি। নামটা মনে পড়ছে না। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি নেই। এখানে আড্ডা চালাতে হলে নাম-ধাম না জানা থাকলেও চলে।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না মঞ্জুর। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। মুখে একটা নিরপেক্ষ হাসি ঝুলিয়ে ম্যানেজ করে নিল। ব্যাংকার ভদ্রলোক অবশ্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। চোখের সামনে প্রথম আলো পত্রিকাটা মেলে ধরে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবসরে যাওয়ার পর তিনি একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস সেকশনে চাকরি নিয়েছেন। দশটার মধ্যে অফিস যেতে হয়। তার আগে এখানে শেভ করে যান। মানুষের কতো রকম অভ্যাস থাকে! এই ভদ্রলোক নাকি কখনোই বাসায় শেভ করেন না। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সব সময় সেলুনেই শেভ করেন। এখানে তার নিজস্ব রেজর, শেভিং ফোম আর আফটার শেভ রাখা আছে।

টাক মাথায় ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে মিন্টু, এ সময় পকেটে ফোনটা বেজে উঠলো। অফিসের ফোন। এই অসময়ে কল আসার কথা নায়। কপালটা একটু কুঁচকে গেল।

'হ্যালো...'

'মঞ্জুর ভাই, অ্যাকাউন্টস সেকশন থেকে বলছি। আপনি লোনের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিলেন, সেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। টাকাটা চেকে নেবেন, নাকি আপনার স্যালারি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেবো?'

যাক, একটা ভালো খবর পাওয়া গেল। অগ্রিম টাকার আবেদনটা করার আগেই অবশ্য বিষয়টা নিয়ে সিইওর সাথে কথা বলে রেখেছিল মঞ্জুর।

'আমার অ্যাকাউন্টেই ট্রান্সফার করে দেন। এখনই তো ডিপোজিট হয়ে যাবে, তাই না?'

'অবশ্যই, অনলাইনে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।'

ফোনটা রেখে আয়নায় তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল মঞ্জুর। মনে হলো একজন অপরিচিত মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের মাথাটা যে এমন নিখুঁত শেপের সেটা একদমই জানা ছিল না। মুখের চেয়ে মাথাটা কয়েকগুণ ফর্সাও লাগছে। ফোনে কথা বলার সময়টাতে সদ্য কামানো মাথায় তেলজাতীয় কিছু মালিশ করেছে মিন্টু, অনুমতির তোয়াক্কা না করেই। সম্ভবত সে কারণেই মাথাটা কড়া রোদে উপুড় করে রাখা নতুন পিতলের কলসের মতো চকচক করছে। সেলুনের উজ্জ্বল হ্যালোজেন বাতির আলো যেন চুইয়ে পড়ছে মাথা গলে।

নিজের টাক মাথা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেল মঞ্জুর।

তিন

দুপুরের আগেই বাসায় ফিরে এলো।

আসার সময় মোড়ের ভ্যান থেকে সবজি কিনে এনেছে। বাব্বাহ, জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, শুধু শাকসবজি খেয়ে দিন পার করাটাও এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। মানুষ কীভাবে যে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে, সেটা এক বিরাট বিস্ময়!

ভারী বাজারের ব্যাগ নিয়ে চারতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়ে মঞ্জুর। চড়া রোদে ঘামে ভিজে গা-টা কেমন চটচট করছে। দ্রুত গোসল সেরে নেয়া দরকার।

দোরঘণ্টিটা বাজানোর মুহূর্তে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। রিমির প্রতিক্রিয়াটা কী হতে পারে সেটা এতোক্ষণ ধরে ভেবে ভেবেও ঠাহর করতে পারেনি। সকালে যখন বাসা থেকে বের হয়ে গেল, তখনো ঘুণাক্ষরে রিমিকে কিছু জানায়নি। এখন জলজ্যান্ত চকচকে টাক নিয়ে বাসায় হাজির।

দরজা খুলে একবার শুধু পূর্ণদৃষ্টিতে মঞ্জুরের দিকে তাকালো রিমি। মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া তো জানালোই না, বিষয়টা তার কাছে আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব বহন করছে বলেই মনে হলো না। এতে খুব বেশি অবাক হলো না মঞ্জুর। ইদানীং সবকিছুতেই এমন নিঃস্পৃহ হয়ে পড়েছে রিমি।

অথচ সে জানে, এই ঘটনাটাই যদি আর কয়েকটা মাস আগে ঘটতো, তাহলে কতোটা ভীষণ পরিস্থিতিতে পড়তে হতো তাকে। বিয়ের আগে, যখন তাদের প্রেম পর্ব চলছে, মঞ্জুর একবার শখ করে গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখলো। আর সেটা নিয়ে কী হুলস্থুল কাণ্ডটাই না বাধিয়েছিল রিমি। গোঁফসহ যেদিন তার সাথে দেখা করতে গেল, মঞ্জুরকে দেখে এমন একটা চিৎকার দিয়েছিল, রাস্তায় রীতিমতো লোক জড়ো হওয়ার উপক্রম। তার পরের ঘটনা আরো ভয়াবহ। মঞ্জুরকে রীতিমতো জবরদস্তি করে তখনই পাশের একটা সেলুনে নিয়ে গেল। দাড়িগোঁফ ছেঁটে ক্লিন শেভ করিয়ে তারপর নিস্তার মিলেছিল সেদিন। তার পর থেকে দাড়ি-গোঁফ-চুল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা বন্ধ করে দিয়েছে মঞ্জুর। অথচ একটা ছিমছাম ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির শখ তার বহুদিনের। রিমির কাণ্ডকারখানার কথা ভেবেই আর সে পথে পা বাড়ায়নি।

'টগর কী করছে?' বাজারের ব্যাগটা রিমির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো মঞ্জুর।

'একটু আগেই ঘুমিয়েছে। তুমি কোনো শব্দ করো না কিন্তু। কাল সারাটা রাত ঘুমায়নি। তোমার সাড়া পেলেই উঠে যাবে।'

'হুম'।

সোজা বাথরুমে গিয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পড়লো মঞ্জুর। মাথায় শীতল জলের স্পর্শে শরীরটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠলো। আচ্ছা, টগরেরও নিশ্চয়ই এমনটাই লাগে, যখন গোসলে যায়। অজান্তেই দুই চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। শাওয়ারের পানিতে সেটা ধুয়ে যাচ্ছে।

'বাবা...বাবা'

বাথরুমের দরজার বাইরে টগর। মেয়েটার এই এক স্বভাব, বাবা বাথরুমে গেলেই ডাকবে। রিমি কতবার মানা করেছে। কে শোনো কার কথা। মেয়ের ডাক শুনে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে দ্রুত বের হয়ে আসে। রোগা হাত দুটো বাড়িয়ে বাবার ভেজা শরীরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো টগর। পেছন থেকে দৃশ্যটা দেখছে রিমি। বাধা দিল না। আজকাল টগরের এসব কাজে আর বাধা দেয় না। এই যে ঘুম থেকে উঠে খালি পায়েই মেঝেতে নেমে এসেছে মেয়েটা, এ নিয়েও কিছু বলেনি।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটুকু কেটে যাওয়ার পর বিষয়টা নজরে এলো টগরের।

'বাবা...তোমার চুল্লু

'ফেলে দিলাম। টাক্কুই ভালো। তুইও টাক্কু আমিও টাক্কু। বাবা-মেয়ে দুজনই টাক্কু, কেমন মজা!'

টগরের চোখেমুখে হাসি উপচে পড়ছে। বাবার চকচকে টাক মাথা দেখে খুবই মজা পাচ্ছে। ছোটরা তো মাঝেমধ্যেই মাথা ন্যাড়া করে টাক হয়। সেটা এমন হাসির কিছু নয়। কিন্তু বড় মানুষের টাক অনেক হাসির।

টগর অবশ্য এমনি এমনি মাথা ন্যাড়া করেনি। ক্যানসার চিকিৎসার জন্য কেমোথেরাপিতে তার চুলগুলো পড়ে গেছে, মাথাটা নিজে থেকেই কেমন করে যেন টাক হয়ে গেল। তার খুব মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন আর খারাপ লাগছে না। বাবাও টাক্কু হয়ে গেছে, তার মতোই।

টগরকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জুর। দুজনের মুখেই হাসি, তবে দুজনের হাসিটা দুরকম।

শিকোয়া নাজনীন

একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা

অলংকরণ : তৌহিন হাসান

সা...

কলকাতা ফেব্রুয়ারির বিকেল। শীত চলে যাওয়া মৃদু হাওয়া আছে কিন্তু ঠান্ডা নেই একদম। বাতাসে অদ্ভুত গন্ধ। নীল আকাশে সাদা মেঘে সিংহের কেশর দোলে। রবিন্দ্রসদনে ঠুমরি ফেস্টিভ্যাল আজ। চারপাশে সদ্য ফোটা লিলি আর হিমঝুড়ির গুঁড়ি গুঁড়ি রেণু বাতাসে উড়ছে। অদ্ভুত সুগন্ধ চত্বরটাকে সিদ্ধের পীঠস্থান করে তুলেছে। কলকাতার গানের স্কুল "শ্রুতিনন্দন" প্রতিবছর এখানে ঠুমরি ফেস্ট করে। অসংখ্য কাঁচা ফুলের সমারোহ আজ। পুজো-আর্চায় কাঁচা ফুল লাগে, নাচ আর গানের মঞ্চ সাজাতে ফুল লাগে। এ শহরে রাস্তায় রাস্তায় টুকরি নিয়ে ফেরিওয়ালা ফুল বিক্রি করে। সাঝি ভরা বেলির সুঘ্রানে ম-ম করে মহল্লার স্যাঁতসেঁতে গলি। নানা জাতের বেলি দেখি এখানে। সুলেখা গলির মোড়ের বাজারে গোলাপ আর রজনীগন্ধার প্রতাপ বেশি। গাঁদার পাপড়ির মালায় মঞ্চ আজ আলোকিত। ওদিকে জবা নেতিয়ে পড়ে থাকে বিকেলের মধ্যে। শেফালিও কালচে হয়ে যায় দ্রুত। গানের আসরে ফুলে ফুলে সুসজ্জিত দরবার কখনো দেখিনি ঢাকায় এমন। এখানে আলোর রশ্মি উপচে পড়ছে মাথার ওপরের ঝাড় লন্ঠন থেকে। মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডে রাধা কৃষ্ণের চিত্রাবলি। সদর দরজায় গাড়ি রাখার একতিল জায়গা নেই, বিদগ্ধ মানুষের ভিড়। বেহালা, মৃদঙ্গ, তবলা, বাঁশি, সেতার মঞ্চে সাজানো। সারা কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছে। মেয়েদের পরনে অফহোয়াইট আর ছাই রঙা জমকালো কারুকাজের কাঞ্চিভরম, তসর সিল্ক। কেউ কেউ বেনারসি পরেছেন। জমিনে হালকা জলছাপ কাজ। ঢাকা থেকে এসেছি বলে কিনা জানি না, তাদের দেখলে মনে হয় এরা সব ফলাহারী। এমন সুহাসিনী আর সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি মাংসাশী প্রাণে কি আর আসে। ভাবি। এমনিতে পশ্চিম অঞ্চলের স্বাস্থ্যবান নারী-পুরুষের মধ্যে একটা আমির আমির ভাব তো আছেই। তবে ঢাকার গানের অনুষ্ঠানে মধ্যবয়সী নারীদের কখনো বেনারসি পরে আসতে দেখিনি। বেনারসি আমাদের শহরে তেমন জনপ্রিয় নয়। বিয়ের অনুষ্ঠানেই একমাত্র যার চল। আমি তো আজ সুতির কাপড় পরে এসেছি। ওপরে একটা জামদানি ওড়না ছিল বলে রক্ষা। জামদানি দিয়ে অনাভিজাত্যকে ঢেকে রাখা যায়। নানা জাতের জামদানি থাকা সত্ত্বেও এর গরিমা শুধু নকশার কৌশলে নামীদামি পোশাকের পাশেও চলনসই। আমি এই যাত্রা পাশের সিটের বেনারসি আর তসরের মধ্যে অদ্ভুত আতরের খুশবু নিতে নিতে বুদ হয়ে থাকার ভান করি। এদের মধ্যে বেশভূষার পরিপাট্য ছাড়াও আছে ঠোঁটের কোণে ধ্রুপদ বিদ্যুৎ। সেটা বেশ মায়াবি। অনেক দিন ধরে ডোবার লেনে ক্ল্যাসিক্যাল শুনে শুনে এই বিদ্যুৎ রপ্ত করেছে এরা, এই অনুষ্ঠানের টিকিট শেষ প্রায় এক সপ্তাহ আগে। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মিলনমেলা। কৌশিকি চক্রবর্তী উপস্থাপনা করবেন। এক মাস ধরে এই অনুষ্ঠানের পোস্টারে সয়লাব ছিল সারা কলকাতা নগরী। কউশিকীর স্নিগ্ধ আভিজাত্য ঝরে পড়ে তাঁর উপস্থাপনায়। জন্মসূত্রে তিনি চন্দনা মুখার্জি আর অজয় চক্রবর্তীর সংগীতের অভাবিত বৈভবের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। এ প্রজন্মের চোখের মণি তিনি। পোস্টারে কৌশিকী তানপুরা হাতে নিয়ে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে আছেন। ভঙ্গিমাটি হিরোইনের মতো। নাকে হীরার ফুল পরে তিনি যখন গান ধরেন "নাথ বেসারে বালাম মাঙ্গয়া দে না...রে বারনা মে তুসে নেহি বলুরে" শ্রোতা আবিষ্ট হয়ে রয়। শুধু তার একশিবিশনারি স্টেজ পারসোনালিটি অনন্য নয়, মেঘধ্বনির মতো মধুর আওয়াজ তার কণ্ঠের জৌলুশ। কৌশিকীর রাগ উপস্থাপনায় পাল্টা আর মিরখান্ডের ঝড় না দেখলে বোঝা যায় না গান কতখানি দেখার, আবেগ প্রশমনের। তার বাবার সৃজনী শক্তি সে রপ্ত করেছে কিন্তু আপন সুষমা পরিস্ফুট করতে রাগ রূপ ফুটিয়ে তুলতে সারগাম আর পাল্টায় প্যাঁচালো হরকতে ভরপুর তার গায়কি। তানপুরার জুয়াড়ির ঝংকারে বাঁধা গলা। কত ঘণ্টা রেয়াজ করেন কে জানে। অনেক দিন আগে যখন শিল্পীরা ঠুমরি গাইতেন, তখন গহরজান বা মাল্কা জানের ঠুমরির রস মাধুরী দর্শককে মাতিয়ে রাখত। আখতারী বাঈ[]র হীরার নাকছাবি জড়োয়ার গয়না, আর অভিজাত বেনারসি ছাড়াও কিংখাবের ওপরে ওড়নার রহস্য আরও বেশি দিওয়ানা করে তুলত শ্রোতাদের। কান্নাকে মুক্তো করে তুলতেন তিনি। সেই বিষাদের নির্যাস এই প্রজন্মে কৌশিকীর ঠোঁট বেঁকিয়ে কান্নার ঢঙে সায়িয়া মোরা রে মোরা রে মরা রে তে কিছুটা মেলে। বাড়ে গুলাম আলীর পাটিয়ালা ঘরানার মতো কৌশিকীর পৌরুষেয় ছুটতান, বোলতান শুনলে বোঝা যায় বহু মেহনতের ফল এই গলা আর গায়কি। ভারতের প্রেসিডেন্ট ভারত রত্ন ডক্টর আব্দুল কালাম বলেছেন, "কৌশিকীর গান শোনার পরে মনে হয় এক মাস কাজ থেকে ছুটি নিই, শ্রুতিনন্দনে গিয়ে গান শিখি। "

বাবা অজয় চক্রবর্তী গল্প করেন ছেলেবেলায় কৌশিকীর নানা কিছু নিয়ে। বাবা অক্টেভের প্রথম নোট সা ধরলে ছোট্ট কৌশিকী উত্তর দিত পা...পঞ্চম নোটে। অর্থাৎ পা সা সা তানপুরার পা...সা। এই অনুধাবন বা রিফ্লেক্স স্বাভাবিকভাবে অনেক মেহনতের পরে আসার কথা আর সেটা কৌশিকীর এসেছিল ১০ মাস বয়সে। এই অলৌকিক ঘটনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কি?

বাবা বলেন, সে মায়ের পেটেই সারে গা রে গা মা শিখে ফেলেছিল। ছোটবেলায় বাবার রেয়াজ সে মন দিয়ে দেখত আর মন্দ্রসপ্তকের সা তিনি পেটের কোঁথ থেকে বের করেন, সেটার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চাইত। বাবার লোয়ার অক্টেভ থেকে স্বর বের করা কৌশিকীর কাছে ছিল দারুণ কৌতূহলের আর আনন্দের উৎস।

তিনি তখন প্রতিদিন এস আর এ (সংগীত রিসার্চ একাডেমি) গানের মাস্টারি শেষে দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরে আসতেন যখন, তখন শহরে লোডশেডিং প্রবল। ফলে দীর্ঘ সময় হাতপাখা দিয়ে স্ত্রী চন্দনাকে বাতাস করতে করতে সুর ভাঁজতেন নানা রাগে-রাগ দারবারির পাল্টা, মিরখান্ড। দৈনিক আট ঘণ্টার কমে কোনো দিন রেওয়াজ করেননি। কৌশিকী তখন মায়ের পেটে। সকালে চার-পাঁচ ঘণ্টা চিড়ের পোহা খেয়ে খরজে একটি আস্ত রাগ গেয়ে সেই রাগ বিকেলে রাতে তানের সঙ্গে নিয়মিত মিলিয়ে অভ্যাস করতেন প্রায় আরও পাঁচ ঘণ্টা। কান মাথা ঝা ঝা করত যখন, তখন একটু জিরিয়ে নিতেন। কলকাতার গরমের দুপুরগুলোতে এমনিতেই স্ফূর্তি আর আহ্লাদে তারসপ্তকের ভৈরবীর কোমল রেখাব গুনগুনিয়ে উঠত। সেই দুপুর সন্ধে আর রাতের রেওয়াজের সময় কৌশিকীর তালিম তাই একরকম মায়ের পেটেই হয়েছিল বলা যায়।

ঠুমরি ফেস্টে গান শুরুর আগে মঞ্চে কৌশিকী চক্রবর্তী এসে আগেকার দিনের ঠুমরি বাঈ নিয়ে বললেন, 'কলাকারদের জাত নেই। গুলাম আলি খাঁ যেমন মুসলমান হয়েও তার গলায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান। কেন আমরা মাথা নত হয়ে যায় বাইজিদের কথা বললে? তারা তো এক একজন গান্ধর্বই। আমরা সেই সুরের দেবীকে যেন করুণা করা থেকে বিরত থাকি, আমরা যেন তাদের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি।'

একজন শিল্পী গাইলেন, 'পানি ভরনে না যাইও নজর লাগি যায় ঠারে রাহিও শ্যাম।' এই ঠারে রাহিওতে নানাবিধ নখরা দেখালেন শিল্পী। ঠুমরি গানের প্রধান এই নখরা। নাটক ছাড়া ঠুমরি হয় না। নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছে শ্রোতা। নিস্তব্ধ পুরো অডিটোরিয়াম। লোকে ঠুমরি রানী আখাতারি বাঈয়ের কথা মনে করে। শুধু গান গাইবার ভঙ্গি নিয়ে কত গল্প আছে। নয়নাভিরাম লতানো শিমের মতো গিলেফল দিয়ে তার দোপাট্টা তৈরি হতো। সাদা মিহি আর্জির চিনেপল আর ঘন মাড় দেওয়া ইস্তিরি করা দোপাট্টা দুই দিকে স্টাইলিশ ক্রেপ পেপারের মতো কড়কড় করা সোনালি পাড়ে বসানো হতো। আর আখতারি বাঈ দুহাত বাড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়া গাইত...কোয়েলিয়া গান থামাইবার...

তারপর শুরু হতো তার অশ্রুময় উজাড় ঠুমরি বন্দনা। আজ সে সবই মনে পড়ছে শ্রোতার।

রে

১৯৫০ সালের কথা। ছোট্ট অজয় তখন গঙ্গার মধ্যে ফেরিতে নিবিষ্ট বাবার গানের দলের সঙ্গে বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায়। কখনো চন্দনগরে, কখনো বেনারসে। নদীর বাতাসে তুমুল স্রোত। বড় বড় ঢেউ। ফেরি রোজ মুলাজোর মন্দির ঘেঁষে তেলিনিপাড়া

ঘাট থেকে চন্দনগরে ছেড়ে যায় প্রথমে, তারপর সেখান থেকে জলালাবাদ, তিলিঙ্গা, বারানসি আরও কত ঘাটে। ফেরিতে বসেই বাবার গানের দল নতুন নতুন গান বাঁধে, সেকি উৎসাহ সবার, নতুন নতুন ছন্দ দুলে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে। এই পারাপারের নদীই হয়ে উঠেছিল ছোট্ট অজয়ের গানের পাঠশালা। যেন স্বর্গের সুরদেবীর সঙ্গে অবাধ বন্ধনহীন যাত্রা, এর শেষ নেই, নদীর মতোই আদিগন্ত ঘন মেঘের মধ্যে তার গতি। ছোট্ট ছেলেটি আবিষ্কার করে নদীর স্রোতের উৎপত্তি হয়েছে আসলে ধ্রুপদ তাল থেকে। সঙ্গে গানের দলের সুকণ্ঠের ক্রিয়া চৌতালে চলছিল। চৌতালের ১২ মাত্রার ঠেকা বাজছে। সঙ্গে সুরের ধুন...

ধা ধা ধিন ধা, কৎ ধাগে ধিন ধা। তেটে কতা গদি ঘেনে।

সা সা জ্ঞ স স সাম জ্ঞা স, স স স ম জ্ঞ জ্ঞ স স

এই সুরে ধুন চলছে। আর সমবেতভাবে ঠেকার ফাঁকে নানা বোলের প্যাটার্ন মুখে মুখে ঘুরছে। সবার চোখে-মুখে একটা অনাবিল আনন্দের ঝরনা। সবাই গান নিয়ে মগ্ন।

অজয় হাতে গুনে তাল। দেখে কী বিস্ময়করভাবে ধামার আর তিব্রা মা তে গিয়ে তাল পাক খাচ্ছে। এই নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে গানের দলের সঙ্গী হয়ে ছোট্ট অজয়ের পৃথিবীতে তাল ছন্দ আর লয়ের এক অতর্কিত তুফান হুড়মুড় ঢুকে পড়ে সেদিন। এরপর থেকে আর নিস্তার নেই তার এই লয় থেকে। চার বছরের ছেলেটির কাছে এই কীর্তন দল যেন স্বয়ং ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন। এই নদীই তার লয় শেখার স্কুল হয়ে উঠেছিল। নদীর মধ্যে বইঠার সঙ্গে জলের স্রোতের প্রতিনিয়ত ধাক্কা সপাট সপাট ছন্দের দোলা। লয় বদলে গেলে নতুন ঠেয়ড়া। মধ্যলয় থেকে ক্রমশ গতিবেগের উত্তেজনায় নানা মেঘ ধ্বনির মতো পাহাড় ভাঙার শব্দ। তাই অজয়ের পৃথিবীতে নদীর একটা আলাদা মানে তৈরি হয়। তার কাছে এই নদী পারাপার ছিল দারুণ আনন্দের। বাংলাদেশের মফস্বল ময়মনসিংহে তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে বাবা শ্যামনগরে স্থিত হয়েছেন মাত্র। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে নতুন দেশে এসে রুজি রোজগার সহজ হয়নি কিছু। ইছাপুর প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নিলেন। কখনো গাড়ি চালিয়ে সুতা কিনে আনেন দূরের বাজার থেকে। তাঁতকলে কাপড় বুনতে বসেন। রাত নেই দিন নেই রঙবেরঙের সুতা দিয়ে তাঁতকল চলতে থাকে। আর ওদিকে অজয়ের মা পুরনো শাড়ি জোড়া দিয়ে দিয়ে রকমারি নকশায় সৃজনী বোনেন। বাড়ির শৌখিন মহিলারা যদি কেউ কেনেন। শুধু গানের দল করে তো চলছিল না সংসার। জীবনের নিত্যপ্রয়োজন বাঁচিয়ে থাকবার জন্য ঘর, আসবাব বাঁচিয়ে বাবা কিনে এনেছিলেন তানপুরা। ছেলের জন্য।

ভারতবর্ষে তখন এই সৃজনীশিল্প বহু প্রাচীন বিদ্যা। বিহার আর ঝাড়খণ্ডের শৈল্পিক সৃজনীর স্নিগ্ধ আকর্ষণ তখনো বাজার মাত করে রাখত। অজয়ের শৈশবের মধ্যে শাড়ির পাড় আর ধুতির নরম তুলতুলে জমিনে নকশাঅলা এই সৃজনী চিরস্থায়ী হয়েছিল। সে জানত এক একটা সৃজনীতে মায়ের কত আনন্দাশ্রু। এ তো মায়ের ঘাম-শ্রমের গন্ধ দিয়ে বোনা। আর লোকে দেয় এর দাম মাত্র তিন পয়সা। হঠাৎ কেউ উদার হলে পাঁচ পয়সা জোটে। কিন্তু এই দিয়ে সারা মাস চলতে হবে। ছোট অজয় সৃজনীর পয়সা আদায় করতে বাড়ি বাড়ি যায়। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। এভাবে কখনো কারও কারও কাছে বহুবারও যেতে হয়। ছোট অজয়ের পৃথিবী বুঝতে শুরু করে মায়ের সারা বছরের খাটুনির সঙ্গে এ কী রকমের প্রতারণা। কিন্তু এই বোঝে সে এই সংগ্রাম শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য নয়। এই সংগ্রাম তার গানের জন্য বাবা-মা করছেন। ছেলেকে শিল্পী বানাতে বাবা দেশ ছেড়ে এসেছেন। বাবা নিজের বাবা-মাকেও ত্যাগ করেন শুধু অজয়কে গান শেখাবেন বলে।

বাবা বলে, "গান না গাইলে আমার পোলা দরকার নাই।" দেশভাগের পর গানের শিল্পীরা সবাই তখন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমের দিকেই চলে গেছে। বাবা নিজে গান শিখতে পারেননি সেই দুঃখ নিয়ে তাই ছেলেকে গান শেখাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটলেন।

না খেয়ে থাকলেও গান এই পরিবারের কাছে বিলাসিতা নয়। সারা মাসের রোজগারের টাকা চলে যায় তানপুরা কিনতে। মাসে আট টাকা সুদে তানপুরা কেনেন। শেষে সুদে-আসলে হয় ৩০০ টাকা। এভাবে তিন গুণ টাকা দিয়ে এই পরিবারটি একদিন খেয়ে না খেয়ে ছেলের তানপুরার টাকা পরিশোধ করেন। অনেক খাটনি হয় বাবার তাঁতকলে যখন কাজ করে এসবের মধ্যেও অজয় লক্ষ করে, বাবা যখন তাঁতকলে সুতা বোনে তখন একটা ক্লিক ক্ল্যাক শব্দের ঝমঝমানিতে একটা আশ্চর্য ছন্দ তৈরি হচ্ছে। অজয়ের পৃথিবী ক্রমশ বদলে যেতে থাকে, সে দেখে ছন্দ বৈচিত্র্য লড়ি সুর আর গমকের গম্ভীর গর্জন দিয়ে অদ্ভুত একটা আবহ, যেন কাপড় নয় গান বুনছেন বাবা। আজ এত বছর পরে পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, 'এই তাঁতকলই আসলে ছিল আমার লয় শেখার পাঠশালা। তাঁতকলে কাপড় বুনতে যে ছন্দ লয় প্রয়োজন, একটা রাগ গাইতে গেলেও একই লয় ছন্দ মাথার মধ্যে বুনতে হয়।'

বাবার কোলে বসে শৈশবেই মাথার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল শ্রুতির মাধুর্য। সে বুঝেছিল ছন্দ লয় তাল আসলে হৃদয়ের স্পন্দন। জীবনেরই আরেক নাম। এখন ছাত্রছাত্রীকে তাই বলেন,

না খেয়ে থাকলেও গান এই পরিবারের কাছে বিলাসিতা নয়। সারা মাসের রোজগারের টাকা চলে যায় তানপুরা কিনতে। মাসে আট টাকা সুদে তানপুরা কেনেন। শেষে সুদে-আসলে হয় ৩০০ টাকা। এভাবে তিন গুণ টাকা দিয়ে এই পরিবারটি একদিন খেয়ে না খেয়ে ছেলের তানপুরার টাকা পরিশোধ করেন

তাল লয় বন্ধ হয় মৃত্যু হলে শুধু, তার আগে নয়।

ছোট্ট অজয়ের সা রে গা মা পা ধা নি-সাতটি নোটের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয় তাঁতকলের এই অবিরাম স্বরধ্বনি থেকে। চার বছর বয়সে বাবার বন্ধু পান্নালাল সামন্তর কাছে গান শেখা শুরু। মনে পড়ে পান্নালালের সাইকেলের টুংটাং বেলের শব্দের মধ্যে অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত ছোট অজয়। সারা দিন মনের ভেতরে সেই বাজ লগ্ন হয়ে থাকত। নদী ঘাট থেকে স্টিমারের শব্দ, পাখির কুই কুই, ট্রেনের হুইসেলের হুসসসসসসসস সবটাই ছন্দ আর তাল দিয়ে বোনা পৃথিবী...

অজয় এই শব্দের পৃথিবীর ধ্বনি ঝংকারে আবিষ্ট হতে শুরু করলেন ক্রমশ।

শ্যামনগর থেকে নৈহাটি

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় পান্নালাল তাকে গান শিখতে কানাই দাস বৈরাগীর কাছে নিয়ে যান। শ্যামনগর থেকে নৈহাটি যেতে গঙ্গা নদীতে আট মাইল পাড়ি দিতে হতো। ১৯৫০ সালের শেষে বাস আর ট্রেনলাইন চালু হলে ট্রেনে করেই যেতেন। এই স্টেশনটি একসময় হয়ে ওঠে তার প্রিয় ঠিকানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এখানে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। নীল আকাশ, মিঠে রোদ, ঝড় জল, বর্ষায় শীতে এই ট্রেনের কম্পারট্মা[]ন্টগুলো হয়ে উঠেছিল তার রাগ আর বন্দিশের অস্থায়ী অন্তরা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার জায়গা। মাস্টার মশাইয়ের শেখানো দরবারি, জয়জয়ন্তী, ললিত, টোরি গলায় গেয়ে গেয়ে আবেগ ঢেলে-বাড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের স্বরপ্রয়োগের

পুরুশালিত কণ্ঠ, গায়কিতে কমলতা, পালটা এনে পাকড়ে কী করে পুরো রাগকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবেএসব নিয়ে ভাবনার জায়গা তার এই স্টেশন। পান-সুপারির সাথে বাহারি জর্দার গন্ধ সেঁটে আছে মানুষের গায়ে, কত রকম মানুষতাদের গায়ের মধ্যে খাইবারপাস আর সমরখন্দের নারগিস ফুলের গন্ধ ভেসে আসে...তারা বিনিদ্র দেখে একটি কচি খোকার মীরখন্ডের স্বরবিন্যাসে রাগ রূপ ফুটিয়ে তোলা আর গমকের সঙ্গে সর কতভাবে ছাড়া আর ধরা, তারা ভাবলেশহীন পরের ট্রেন ধরার জন্য বাক্স পেট্রা নিয়ে নেমে আসে। ছেলেটি এসবে মন দেয় না তেমন শুধু নিবিড় তাকিয়ে থাকা আছে, মানুষ দেখতে তার ভালো লাগে। মানুষ কতভাবে রাতদিন উজাড় করে এই দেখা তার বাসি হয় না। এই মানুষের শ্রুতিকেই কতভাবে অভিব্যক্ত করা যায় এই চেষ্টাই সে করে আসলে। তার এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মানুষের ধ্বনি শুনতেই সময় কেটে যায়। এভাবে ধরা মানুষের বিচিত্র ভাবভঙ্গি দিয়ে একদিন তার কাছে ধরা দিয়েছে রাগ ইয়ামান, সুধ কল্যাণ, রাগ বেহাগ, ভূপালি। নৈহাটির সেই ট্রেন স্টেশন আর সুকুমারের দোকানের কচুরির সঙ্গে রাগ সংগীত মিলেমিশে কখন একাকার হয়ে গেছে। গুনে গুনে কচুরি খাওয়া চলত। সমানতালে। আর তারপর বয়স যখন ২০ কি ২১ গানের মর্মস্পর্শী বর্ণনা শেখা শুরু হলো তার। গুরু জ্ঞান প্রকাশের কাছে। মোগলসরাই জংশনে গাড়ি থামে। অনেকক্ষণ দাঁড়ায় গাড়ি। সেখানে ছেলেটি অপেক্ষা করে। পিঠে একটা ছোট পাটের ব্যাগ। সেখানে মা চারটি নাড়ু দিয়েছেন। সেটা খিদে পেলেই সে খেয়ে নেবে। তাকে নিতে আসবে একজন। দাঁড়িয়ে থাকে সে। অনেক আশা করে এসেছে সে। চিঠি নিয়ে এসেছে সে উস্তাদ মুনাব্বার আলির কাছে। তার গুরুজি চিঠি লিখে দিয়েছেন। সেই চিঠিই একমাত্র ভরসা। সেখানে লেখা আছে তার কথা। ছেলেটির গানের প্রতি অনুরাগের কথা। লেখা আছে একটা পরিবারের সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা অলিক জগতের প্রতি ভালোবাসার কথা। আছে বাবা-মায়ের স্বপ্নের কথা। আছে হয়তো নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার গল্পও। এ ছেলেটি এসেছে উস্তাদ মুনাব্বর আলির কাছে তালিম নিতে। তার কাছে তরাগ সংগীতের তালিম নেবেএই স্বপ্ন তার মনে গুরু জ্ঞান প্রকাশ বুনে দিয়েছেন। ছেলেটি রাতদিন দরবারিতে কি গান্ধার লাগল, ভৈঁরোতে কি রেখাব লাগল, মুলতানে কড়ি মধ্যম লাগবে কি না এসব ভাবত বলে তার গুরুর মনে হয়েছে ছেলেটিকে রাগ সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুরুর কাছে গান শিখতে হবে। গুরু তাকে বরণ করে নিলেন, চিঠি পড়ে ছেলেটিকে পরখ করলেন। এভাবে শুরু হলো তার জীবনের আরেকটি পর্ব। সেদিনও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে এতটা ভাবনা আসেনি যে একদিন গান তার গভীর আনন্দ আর দুঃখের ঘর হয়ে উঠবে। দুঃখের আর পরিশ্রান্ত বাবার বুক ভরা স্বপ্নের মধ্যে সে সসব সৃজনী রজনী ছেলেটি কোনো দিন ভুলতে পারেনি। তার মনে হয় সে সবই যেন আজ গান হয়ে ফিরে এসেছে তার জীবনে। সেই শ্যামানগরের স্মৃতি, সেই রাতজাগা তাঁতকলের দ্রিম দ্রিম শব্দ আর স্টেশনের নিস্তব্ধ দুপুরে কোনো অশ্বত্থ ছায়ের শব্দ এখনো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আজও এত বছর পরেও সময় পেলেই ছেলেটি শ্যামনগরে ছুটে যায় পুরনো জংশনে ট্রেন থামা দেখতে।

গা...

বাইশ-তেইশ বছরের সুদর্শন তরুণ বসেছে মজলিশে। গৌরবর্ণ সুগঠিত শরীর। দীর্ঘকায়, চোখে গভীর দীপ্তি। মাথায় একরাশ বুনো চুল ডাইনে সিঁথি। বাল্যকাল থেকে এমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল আর চেহারা। তখন তার বেশভূষাও পশ্চিমাদের মতো। ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। আর মাথা ভর্তি চুলের সঙ্গে গানের গমক প্রখর ঝাঁকুনি দিলে সেটা মঞ্চে দেখতেও আশ্চর্য রূপের পূর্ণতা হয়ে ওঠে। মুখে শৌখিন ছাঁটের গোঁফ কখনোসখনো। হঠাৎ বাঙালি বলে বোধ হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ আকার-প্রকার সবকিছুতে একটা হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের আভিজাত্য।

মেটিয়া বুরুজের গঙ্গার দিকে সেই পঞ্চাশের দশকের নবাবি কোটির স্মৃতি তার মধ্যে পাওয়া যায়, সে গাইলে ডোভার লেন হয়ে ওঠে ওয়াজিদ আলির ভারত প্রসিদ্ধ সংগীত দরবার।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে তার নিষ্ঠা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হয়ে ফুটে থাক। এত দিন ভারতের মানচিত্রে এক ছোট, অখ্যাত ছোট বিন্দুর মতো ছিল "মাইহার" গ্রামটিপৃথিবী জয় করেছিল একদিন এ গ্রাম। এর সঙ্গে কি যোগ হবে এই গঙ্গার তীরের সবুজ শ্যামনগর? আগ্রা, গোয়ালিয়র, আত্র[][]লি, রামপুর আর কিরানার মতোই তো ভারতের মধ্যেখানে ছড়িয়ে থাকা বিদ্যুৎরেখার মতো সংগীতের এই ঘরগুলো সামান্য গ্রাম হয়েও কলাবৎ-অধ্যুষিত মেহফিল হিসেবে কেমন জ্বলজ্বল করছে সারা পৃথিবীতে। এদের সঙ্গে যোগ হবে কি এই শ্যামনগর একদিন? কলকাতা থেকে মাত্র আট কিলমিটার দূরে। মুলাজোর মন্দির ঘেঁষে এক ছিমছাম পলী এই শ্যামনগর। এখানে অল্প কিছু মানুষ হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সারা দিন নির্জন অলস সময় পুজো আরচা করে দিন কাটে মানুষের। বাংলার শ্যামলিমা, ছায়া সুনিবিড় শ্যামনগরের সঙ্গে মাইহারের তুলনা চলে না। যখন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তার জীবন কাটিয়েছেন মাইহারে, সেটা ছিল রুক্ষ চুনাপাথরের দেশ। সেখানে নদীর কোনো ইতিহাস নেই। জলাশয় নেই। পুকুরে পদ্ম নেই। পাখপাখালি নেই। চারদিকে ধু ধু প্রান্তর। কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁর ভালো লেগেছিল এই নির্জনতা আর প্রান্তজোড়া পাহাড়ের ওপর মা সারদার মন্দিরখানি। হিন্দুদের পীঠস্থান ছিল বলে। রুক্ষ পাথরের মধ্যে তিনি ফুল ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারপর একদিন তার সুর শৃঙ্গারের টানে পাখপাখালি এসেছিল এই পলীতে। আর অজয় চক্রবর্তীর শ্যামনগর এক ছোট্ট বালকের জোছনা লোক হয়ে ফুটে থাকবে একদিন।

মা...

এবার অজয় চক্রবর্তী মঞ্চে এলেন সোনালি জরির জমকালো কারুকাজ করা বাদশাহি কুর্তি পরে। হাতে সোনার ঘড়ি। লোকে বলে, তিনি পাটিয়ালা ঘরানার গায়কির সঙ্গে কসুর ঘরানার আভাযুক্ত গৌরকান্তি চেহারাটিও কী করে রপ্ত করে নিলেন, এটা সবার বিস্ময়। ষাটের দশকে তিনি সারেঙ্গি বাজিয়ে মিয়া কালু আর তার ছেলে আলি বখস খাঁকর উত্তরসূরি মুনাব্বর আলি খাঁর কাছে তালিম নিতে এসেছিলেন। সঙ্গে থলেতে নিয়ে এসেছিলেন একমাত্র মূলধন একটা বাঁশপাতার কাগজে মোড়ানো যত্ন করে লেখা গুরুর চিঠি। সেই চিঠি পড়েই উস্তাদ মুনাব্বর আলি খাঁ তাকে নিয়ে তানপুরায় হাত বোলাতে বোলাতে রাগ ইয়্যামানের সা শোনাতে বলেন। উস্তাদ সেদিন ছেলেটিকে বলেন, "এসরাজে সুরগুলো যেমন তীক্ষ্ণ কিন্তু সারেঙ্গিতে কোমল কেন জানো? নদীর জন্য। আমাদের সুর নদীর কাছে পাওয়া বলে অবাধ এর প্রবাহ। আমরা নানাখানে ঘাট বেঁধেছি এর, কোথাও বলেছি এটা কোমল রেখাব, কোথাও বলেছি এটা কোমল ভৈঁরোর। এই সুর নদীর মধ্য দিয়ে বাধা হয়েছে। "

কলকাতায় গান শিখতে আসা শ্যামনগরের সেই কিশোর আজ কারচুপি কাজ করা পাঞ্জাবি পরে মেহফিলে বসেছে। একটা ঝকঝকে যোগীর শান্ত আলো জমেছে মুখে। পাঞ্জাবির বুকের দিকে নয়নাভিরাম সুচিশিল্প, আলোর রশ্মিগুলো ঠিকরে পড়ছে জলের ঝরনার মতো। সোনালি জরির সুতো দিয়ে ফুল-পাতা সঙ্গে চুমকি পুঁতি, চকমকি পাথর বসানো পাঞ্জাবি থেকে আতরের গন্ধ ভেসে আসছে। ছোটবেলা থেকে অসম্ভব লড়ে পাওয়া ভয়ংকর বেসুরো জীবনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে প্রতাপ দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য দিয়ে আজকের মেহফিল খানিক মুখর হয়ে আছে সংগীত শুরুর আগেই। রাগ হামসাধধানি দিয়ে শুরু হলো সন্ধ্যা।

তেরা ভাগ জাগা।। মান লাগা।। হারি কি চারানানামে...

সারান্নান...।

দৌড়বিদের মতো বুক ভরা দম। তানের ঝংকারে শ্রুতির আবেদনে মনে হলো সেই লড়ে পাওয়া জীবনকে মূর্ত করছেন শিল্পী। পরিমিতি রয়েছে তার স্টেশনে ভিড়ে মানুষের মুখের মতোই, জোড় হাত করে বিহ্বল আর নতজানু হতে হতে রাগ হংসধ্বনি যেন প্রজাপতি হয়ে আকাশে ডানা মেলল। নির্জন পাখা থেকে রেণু ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভিড়ের গায়ে।

মলয় ভৌমিক

নায়ক ও খলনায়ক

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

অভিনয়শিল্পীদের সমবেত নৃত্যগীত

এ কেমন দেশে এলাম রে ভাই,
এখানে স্বর্গ নরকে কোনো ফারাক নাই।
এ কেমন দেশে এলাম রে ভাই।

আমরা রঙিন চোখে স্বর্গটা দেখি,
আমরা কেউবা আসল কেউবা মেকি,
আমাদের সবকিছু যে উলটাপালটা,
ভ্যারিয়েন্টে আলফা না ডেলটা
চিনিয়ে দেওয়ার তো কেউ নাই।

আমাদের লেজ আছে লম্বা
শিক্ষা-দীক্ষায় হরেকরকমবা।
আমরা হুজুগে গুজবে চলি
আমরা শেখানো বুলিতে বলি
কানাগলি পথে শুধু যাই।

লোভকে আমরা পারি না করতে জয়,
ভোগের ভাগে তো নাই নরকের ভয়।
আমরা সত্যকে মিথ্যা বানাই
আমরা হিংসার অস্ত্র শানাই,
আমাদের ভেতরে আছে শুধু খাই খাই।

নৃত্যগীত শেষে এক ও দুই প্রবেশ করে।

দুই একের পেছনে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটছে। একের বারবার সন্দেহ হয় তার পেছন পেছন হাঁটছে কেউ যেন। দুএকবার পেছনে ঘুরে দেখে সে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। দেখতে না পারার কারণ হলো এক যখন ঘোরে দুইও একইভাবে তার পেছনে ঘোরে। সন্দেহ থেকে অধৈর্য বাড়তে থাকে একের।

এক : কে রে?

দুই : কই কে?

এক : কই কে মানে?

দুই : মানে কেউ না। আমাকে দেখা যাচ্ছে না।

এক : দেখা যাচ্ছে না মানে? (ঘুরে দেখে। কাউকে দেখতে পায় না।) এ তো বেশ মুশকিল হলো দেখছি! ভূত নয় তো!

দুই : ভূত বললে খুব একটা মন্দ বলা হয় না।

এক : কিন্তু এখানে তো ভূতের ঢোকার কোনো পারমিশন নেই।

দুই : ভূতের আবার পারমিশন কী? সে তো সর্বভূতে বিরাজিত।

এক : না, এ তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে!

দুই : এতক্ষণে একজন বিচক্ষণের মতো কথা বলেছেন।

এক : আমি যে বিচক্ষণ, সে ব্যাপারে আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

দুই : বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওই যে বললেন না, বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

এক : তো?

দুই : অর্থাৎ আপনার মাথার মধ্যে যে গোলমাল আছে, সেটা আপনি বেশ বিচক্ষণতার সাথে ধরতে পেরেছেন।

এক : মাথামোটা কোথাকার! কারো মাথায় গোলমাল থাকলে তার পক্ষে নিজের মাথার গোলমাল বোঝার কথা কী?

দুই : কিন্তু আপনি গোলমেলে ব্যাপার বলেছেন কিনা?

এক : গোলমেলে ব্যাপার হলে গোলমেলে বলব না?

দুই : ঠিক, শতভাগ ঠিক। তাহলে নিশ্চয়ই আপনার চোখের গোলমাল হয়েছে।

এক : তার মানে?

দুই : মানে আপনি পেছনে ঘুরে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

এক : তাই তো মনে হচ্ছে! কিন্তু এখানে তো কারো বয়স বাড়ার কথা নয় যে চোখের গোলমাল হবে! কী যে সব হচ্ছে!

দুই : আসলে সর্বত্রই একটা ঘাপলা ঢুকে পড়েছে। এবং এটাই হলো বাস্তবতা। যাই হোক, আপাতত আপনি চোখটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন!

এক : যেখানে কেউ অসুস্থ হয় না, সেখানে ডাক্তার পাব কীভাবে? আচ্ছা মানুষ তো নিজের সাথেও নিজে কথা বলতে পারে। পারে না?

দুই : পারেই তো। সব মানুষের মধ্যেই দ্বৈত সত্তা কাজ করে। প্রত্যেক মানুষ একই সাথে মানুষ আবার একই সাথে না মানুষ।

এক : এসব উচ্চ মার্গের কথা আপাতত থাক। আমি বরং চোখের ডাক্তার পাই কি না দেখি। কে আছেন? আমার চোখের সমস্যা হচ্ছে, একটু দেখে দেবেন কেউ?

একজন এবং অন্যজন এগিয়ে আসে। অন্যজন একজনের পেছনে।

দুই : এই তো এসে গেছেন, ডাক্তার ম্যাডাম এসে গেছেন।

একজন : চোখ দুটো বড় করে খুলে আমার দিকে তাকান!

এক : এখানে এতদিন আছি। কিন্তু কোনো চিকিৎসক তো দেখিনি!

একজন : শুনেছি আপনি সমাজের চিকিৎসক ছিলেন, চিকিৎসা নিয়ে হঠাৎ আপনার প্রশ্ন কেন?

দুই : (একের পেছন থেকে) পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার।

এক : ইয়ে, না মানে এখানে চিকিৎসক লাগে না জানি।

একজন : এ প্রশ্নের উত্তর ওপরওয়ালার কাছ থেকে জেনে নেবেন! আমার কাজ চিকিৎসা করা। দেখুন! কজনকে দেখছেন?

এক : (একজনের দিকে তাকিয়ে) একজন।

একজনের পেছন থেকে অন্যজন বেরিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায়।

একজন : এবার?

এক : দুইজন।

একজন : তাহলে চিকিৎসা দিচ্ছি। তবে শর্ত হলো, আপনাকে ভাবতে হবে আপনি একজনকে দেখছেন। অর্থাৎ আমরা নই, কেবল আমি।

এক : আমরা মানে আমরা সবাই। এই রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে কেবল আমি, মানে নিজেকে নিয়ে ভাবতে বলছেন কি?

অন্যজন : একদম তাই। এটাই আধুনিক ভাবনা।

একজন : তাই নাকি! এ তো দারুণ আধুনিক ভাবনা! বাঃ, বেশ!

অন্যজন একজনের পেছনে দাঁড়ায়।

একজন : এবার?

এক : একজন।

একজন : এই তো ঠিক আছে। এবার আপনার চোখের আর কোনো সমস্যা নেই। তবে এক্সারসাইজটা আজীবন চালিয়ে যেতে হবে।

এক : কোন এক্সারসাইজ?

একজন : ওই যে আমরা নয়, কেবল আমি।

এক : এ তো দেখছি, অভিনব চক্ষু চিকিৎসাব্যবস্থা! চোখের চিকিৎসা, কিন্তু চোখ পরীক্ষার কোনো বালাই নাই!

অন্যজন: চোখ নিজে কিছু দেখে না, মস্তিষ্ক চোখকে পরিচালিত করে। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হলো মস্তিষ্ক ধোলাই।

এক : বুঝলাম, কিন্তু মস্তিষ্ক ধোলাই তো বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। ঔপনিবেশিক শাসক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের উন্নত বিশ্ব, এমনকি জঙ্গিরাও এসবের অনুশীলন করছে শুনছি। সত্যজিৎ বাবু তো এর একটা প্রতীকী উপস্থাপনও করেছেন। যন্তরমন্তর ঘরের কথা তো শুনেছেন?

একজন : শুনলেও এসব বিষয়ে আমাদের মন্তব্য করা বারণ। তাছাড়া চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে আপনার অ্যাতো সব মন্তব্য যথার্থ নয়। আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেই আমরা সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। অন্য কেউ হলে আমরা চিকিৎসার জন্য ড্রোন পাঠাতে বাধ্য হতাম।

এক : ড্রোন! ড্রোন বিষয়ে শুনেছি বটে, কিন্তু চোখের চিকিৎসায় ড্রোন! এ তো অভাবনীয়!

অন্যজন: আমরা প্রযুক্তিতে মর্তের চেয়ে যদি পিছিয়ে থাকি, তাহলে মানুষ স্বর্গে আসার আগ্রহই তো হারিয়ে ফেলবে। প্রাচীন ধ্যানধারণা নিয়ে তো স্বর্গ টিকে থাকতে পারে না। দেখবেন, স্বর্গ-মর্ত নিয়ে যারা বেশি ফাল পাড়ে, তারাই অনাধুনিক আদর্শ প্রচারের জন্য অতি আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে।

একজন : মানে আপনি কি ওদের স্ববিরোধিতার বিষয়ে বলতে চাইছেন?

অন্যজন: তা কেন! আপনি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওরাই তো স্বর্গ-নরকের প্রচারক। ওরা না থাকলে স্বর্গ-নরকের ধারণাই তো প্রশ্নের মুখে পড়বে।

একজন : এই থাম! এসব গোপন কথা ফাঁস করার অধিকার আমাদের নেই।

অন্যজন: অ্যাঁ! গোপন কথা ফাঁস করে ফেললাম নাকি? শুনুন, আপনি কিন্তু কোনো গোপন কথা শোনেননি, এটা মনে রাখবেন! আমরা চলি।

একজন ও অন্যজন চলে যায়।

এক : গোপন কথা শুনিনি! এসব কী বলছে ওরা! সময়ের ব্যবধানকে কি আমি ধারণ করতে পারছি না? তবে আমি রাজনীতিবিদ, এটা বুঝলাম যে স্বর্গেও রাজনীতি ঢুকে পড়েছে!

দুই : আর তার পেছন পেছন ঢুকে পড়েছি আমি।

এক : এই, তুই কে রে?

দুই : আপনার চোখের গোলমাল ঠিক হয়ে গেছে, এবার নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে ও চিনতে পারবেন। এই যে দেখুন!

দুই একের পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়।

এক : এ কি আপনি?

দুই : হ্যাঁ আমি।

এক : না আপনি যে আপনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনি এখানে এলেন কী করে?

দুই : ইতিহাস।

এক : ইতিহাস! অবশ্য সব ঘটনাই অতীত হলে ইতিহাস হয়। কিন্তু ইতিহাসের সংজ্ঞা আমি জানতে চাচ্ছি না। আমি জানতে চাচ্ছি আপনি এখানে এলেন কীভাবে?

দুই : ওই যে বললাম ইতিহাস, মানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। ইতিহাস তো আর আপনার হেঁশেলের চালকুমড়া নয় যে ইচ্ছে হলো অর্ধেকটা কেটে ফেলে দিলেন আর অর্ধেকটা রেখে দিলেন।

এক : সে কাজে তো আপনারা সিদ্ধহস্ত।

দুই : না না, আমি ইতিহাস বিকৃতির বিষয়ে বলছি না। আমি বলছি---

এক : অতো জ্ঞান না দিয়ে কী বলতে চান বলুন তো!

দুই : সে কথাই তো বলছি। ধরুন---

এক : ধরব মানে? আমার ধরা না ধরায় কী এসে যায়?

দুই : আচ্ছা আচ্ছা, ধরতে না চান ভাবুন! ইতিহাসে নজাব--- না মানে নবাব সিরাজ দৌলার নাম থাকলে মীর জাফরের নাম থাকবেই। বঙ্গবন্ধুর নাম থাকলে মোশতাকের নামও থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের কথা এলে পাকি-রাজাকারদের কথা আসবেই। আবার ধরুন, মানে ভাবুন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গ এলেই তার রহস্যজনক অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ চলে আসবে। ইতিহাস থেকে এসব বাদ দেওয়ার তো কোনো উপায় নাই।

এক : তাই বলে মীর জাফর মোশতাকরা তো আর ইতিহাসের নায়ক বনে যাচ্ছে না।

দুই : নায়ক বনে যেতেও পারে। সেটা নির্ভর করছে ইতিহাস কীভাবে চর্চা হচ্ছে তার ওপর। এমন ঘটনারও নজির আছে যেখানে ঘটনার উল্লেখ করার সাথে সাথে খলনায়কের নামটাই আগে চলে আসে। তখন মনে হয় খলনায়কই নায়ক।

এক : যেমন?

দুই : যেমন ধরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। ওই যুদ্ধের কথা এলেই হিটলারের নামটা আগে চলে আসে।

এক : কিন্তু ইতিহাস পাঠ করলেই মানুষ জানতে পারবে হিটলার, মুসোলিনি---এরা হলো খলনায়ক।

দুই : একদম ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা শর্ত সাপেক্ষ, যে শর্তটা আপনি দিলেন।

এক : আমি শর্ত দিলাম মানে?

দুই : আপনি বললেন না, ইতিহাস পাঠ করলেই মানুষ জানতে পারবে---- কথা হলো ইতিহাস কি কেউ পাঠ করছে?

এক : কেন? পাঠ্যক্রম থেকে কি ইতিহাস বাদ দেওয়া হয়েছে?

দুই : একদম না, একদম না। তবে---

এক : তবে?

দুই : পাঠ্যক্রমে আছে কিন্তু পাঠ করা হচ্ছে না।

এক : পাঠ না করলে শিক্ষার্থীরা পাস করছে কী করে?

দুই : মুখস্থ করে। পাঠ করা আর মুখস্থ করার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

এক : মানে আপনি বলতে চাইছেন নতুন প্রজন্ম ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে?

দুই : যথার্থ ধরেছেন--- মানে ভেবেছেন।

এক : কিন্তু এতে তো আপনারও ক্ষতি। মানুষ নায়ককে ভুলে যাবার পাশাপাশি আপনাকেও ভুলে যাবে।

দুই : আমি তো সেটাই চাই। ধরুন, আমি কতটা বদমাইশ আর নিমকহারাম ছিলাম সেটা মানুষ ভুলে গেলে যুগে যুগে আর আমার গায়ে থুথু ছিটানো হবে না।

এক : ইতিহাসের কী হবে জানি না, তবে আপনি যে এখনো হাড়েহারামজাদা রয়ে গেছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সে যাক, আমার আসল প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো জানা গেল না। স্বর্গে কী করে আপনার মতো হারামজাদার স্থান হলো?

দুই : স্বর্গের মানুষেরও তো ইতিহাস জানার অধিকার আছে। তারা যদি নবাব সিরাজ দৌলাকে জানতে চান তাহলে মীর জাফরকেও জানতে হবে। আর ইতিহাসে সিরাজ দৌলার পাশে মীর জাফরের স্থান হলে স্বর্গে কেন হবে না? স্বর্গটা তো আর নবাবের বাপের তালুক নয়।

এক : এ তো আপনি আমাকে বোঝালেন। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আপনি স্বর্গের মালিককে কী করে বোঝালেন?

দুই : কেন? আদালত।

এক : আদালত মানে? স্বর্গে আবার আদালত কোথায় পেলেন? এখানে তো অপরাধ হয় না। অপরাধ না হলে বিচারের প্রশ্ন আসে কী করে?

দুই : বুঝলাম, আপনি স্বর্গে থেকেও স্বর্গ সম্পর্কে কোনো খবরই রাখেন না। মর্তে কত পরিবর্তন হচ্ছে। আর স্বর্গে হবে না?

এক : হতেই হবে। আপনার মতো দুর্বৃত্ত যখন স্বর্গে ঢুকে পড়েছে তখন স্বর্গ কি আর স্বর্গ থাকতে পারে!

দুই : দুর্বৃত্ত বলে গাল দেবেন না, মনে রাখবেন এখানে এখন আপনার ও আমার স্ট্যাটাস সমান। আদালত যখন হয়েছে তখন যে কোনো সময় মানহানির মামলায় ফেঁসে যেতে পারেন। যাই হোক আদালত কী কারণে হলো সে প্রশ্নে পরে আসা যাবে। আপাতত এটুকুই জানাচ্ছি যে, প্রকৃত ইতিহাস রক্ষায়, মানে নায়কের নাম থাকলে ইতিহাসের নিয়মেই খলনায়কের নামটাও চলে আসবে, এই বয়ানকে সামনে রেখে আমি একটা রিট পিটিশন দায়ের করেছিলাম এবং সেই মামলার যুক্তিতর্কে স্বর্গপক্ষ হেরে গেলে ইতিহাসে নায়কের পাশে আমার স্থানটাও পাকাপোক্ত হয়।

এক : নায়কের পাশে স্থান পাকাপোক্ত হয়, অথচ নায়ক কিছুই জানে না। এটা একপেশে রায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই : এই মন্তব্য আবার আদালত অবমাননার শামিল হতে পারে।

এক : এই নিয়ে আপনি দুবার আদালতের ভয় দেখালেন! কিন্তু আমি যে মানুষের মুক্তির স্বার্থে আদালতের পরোয়া করি নাই, এ তথ্য আপনার ভালোভাবেই জানা।

দুই : না না সেকথা জানি বলেই তো আপনার প্রতি আমার ছেরেদ্ধা এখনো অটুট।

এক : এখনো মোসাহেবি করার স্বভাব আপনার যায়নি দেখছি!

দুই : মানুষের স্বভাব তো রাতারাতি বদলায় না, বিশেষ করে সে স্বভাব যদি হয় উদ্দেশ্যমূলক।

এক : ওসব তত্ত্বকথা রাখুন! স্বর্গে আদালত কীভাবে হলো, সে বিষয়ে পরে বলবেন বলেছিলেন। এবার ব্যাপারটা বলুন!

দুই : সে এক ঠ্যাটা কবির কীর্তি।

এক : ঠ্যাটা কবি! কবিদের প্রতি আপনার এই বিদ্রূপ কি মানহানির মামলার পর্যায়ে পড়ে না?

দুই : হ্যাঁ হ্যাঁ তা পড়ে। আচ্ছা আমি ঠ্যাটা শব্দটি প্রত্যাহার করছি। এবং তার বদলে পাঁঠা কবি উল্লেখ করছি।

এক : কথার মারপ্যাঁচ রেখে কী হয়েছিল সেটা বলুন!

দুই : বলব?

এক : আপনাকে তো বলতেই বলেছি।

দুই : তাহলে বলি। তবে সেটা কি আমার বর্ণনায় বলব, নাকি ঘটনাটা অভিনয় করে দেখাতে বলব?

এক : সবাই জানে আপনি একজন পাকা অভিনেতা। এখানে এসেও নিশ্চয়ই আরও অভিনেতা তৈরি করে ফেলেছেন। তো আপনার অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করেই দেখান! সবাই দেখে হয়তো মজা পাবে।

দুই : তাহলে চলুন আমরা আপাতত প্রস্থান করি। কই হে অভিনেতারা! প্রস্তুতি নিন! তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য। স্বর্গে আদালত প্রতিষ্ঠা---

এক ও দুই চলে যায়। প্রবেশ করে অভিনেতারা।

অভি-১ : অনেক দিন সভাস্থলে আসা হয় না তো, তাই বুঝতে পারছি না বসব কোথায়! কই, আমার বসার যন্ত্রপাতি কোথায়?

অভিনেতা-৪ বসার একটা হাইট (টুল বা জলচৌকি) এনে নির্ধারিত স্থানে রাখলে অভিনেতা-১ তাতে উঠে বসে। অভিনেতা-১ এর প্রায় গায়ের ওপর হেলে পড়ে ঝিমাতে থাকে অভিনেতা-৪।

অভি-১ : আমার পারিষদবর্গ কোথায়?

অভিনেতা-২ ও ৩ প্রবেশ করে এবং অভিনেতা-১ এর দুপাশে দাঁড়িয়ে একটা দরবারের আবহ তৈরি করে।

অভি-২ এই যে আমরা এসে গেছি।

অভি-১ বেশ বেশ! তবে আসারইবা কী দরকার ছিল? সভাটা তো অনলাইনেই করা যেত। ভা--চু--

অভি-২ : ভা--চু--!

অভি-১ : আরে ভা--চু-- ওই কী যেন বলে? হ্যাঁ, ভার্চুয়াল, মানে হাই---ইয়ে---হাই কেক---

অভি-২ : ও, উঁচু কেক।

অভি-১ : আরে ধ্যাৎ! হা--ই, মানে হাইটেক।

অভি-৩ : বুঝেছি বুঝেছি, হাইটেক, মানে উচ্চ প্রযুক্তি।

অভি-১ : ঠিক। কথা হলো হাইটেক ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে স্বর্গের মর্যাদা যে মেলান হইয়ে যাবে, এটা তোমাদের মাথায় থাকে না কেন? প্রহরী তুমি দূরে দাঁড়াও!

অভিনেতা-৪ বিব্রত হয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

অভি-২ : স্যার! আমাদের ডিভাইসে ন্যানো প্রযুক্তি নেই।

অভি-১ : প্রিভাইস, ন্যানা প্রযুক্তি! এসব কী আজেবাজে কথা বলছ?

অভি-৩ : প্রিভাইস নয় স্যার, ডিভাইস। ন্যানা প্রযুক্তি নয়, ন্যানো প্রযুক্তি।

অভি-২ : এই, প্রযুক্তির তুমি কী বোঝ যে জ্ঞান দিচ্ছ? ডিভাইস, ন্যানো প্রযুক্তি--- এসব কথা তো আমি বলেছি।

অভি-৩ : কিন্তু স্যার বুঝতে পারেন না, এভাবে কথা বলবেন কেন? তাছাড়া স্যারের মতো প্রযুক্তিতে অতি অগ্রসর ব্যক্তির কাছে এসব প্রাচীন শব্দ প্রয়োগ করা মোটেই সমীচীন নয়।

উত্তেজিত হয়ে অভিনেতা-২ ও অভিনেতা-৩ অভিনেতা-১ এর প্রায় গায়ের কাছে চলে আসে।

অভি-১ গায়ের ওপর উঠে আসাটাও মোটেই সমীচীন নয়। দূরে দাঁড়াও!

দুজনেই বিব্রত হয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

অভি-১ : এখন কাজের কথায় আসা যাক। এই যে প্রহরী!

অভিনেতা-৪ দ্রুত এসে অভিনেতা-১ এর গা ঘেষে দাঁড়ায়।

অভি-১ : দূরে দাঁড়াও!

অভিনেতা-৪ আবার পূর্বের স্থানে ফিরে যায় এবং বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

অভি-১ : ঘুরে দাঁড়াও!

অভিনেতা-৪ অভিনেতা-১ এর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

অভি-১ : তুমি বলছিলে কোন এক রবি বাবু দেখা করতে চান।

অভি-৪ : রবি বাবু নয় স্যার, জনৈক ঠ্যাটা কবি বাবু।

অভি-১ : ঠ্যাটা কবি বাবু! সে আবার কে?

অভি-২ : স্যার, সবাই জানে আপনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ আপনি সবই জানেন। ঠ্যাটা কবিকে না চিনলে আপনার মাহাত্ম্য কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়বে!

অভি-১ : তাই নাকি! আসলে বয়স বাড়ছে তো, এখন সবকিছু মনে রাখতে পারি না।

অভি-৩ : স্যার স্বর্গে কারও বয়স বাড়ে না। বিশেষ করে বিধাতার বয়স সময়ের ঊর্ধ্বে।

অভি-১ : তোমাদের ওই এক সমস্যা। কিছুই মাথায় রাখো না। আচ্ছা বিধাতা বলে কি আমি মানুষ না?

অভি-৪ : বটেই তো, বটেই তো!

অভি-২ : তুমি থামো! প্রহরী হয়ে সব বিষয়ে নাক গলাও কেন?

অভি-৪ : প্রহরী বলে কি আমি মানুষ না?

অভি-১ : ঠিকই তো। আমার প্রহরী বলে কথা! যাকগে বলছিলাম বয়স বাড়ছে। এখন আর সবকিছু মনে রাখতে পারি না। আমার এই বিস্মৃতি, মানে ভুলে যাওয়ার বিষয়টি বরং তোমরা নতুন অ্যাপস ডাউনলোড করা হয়নি বলে চালিয়ে দিও! এখন যে বিশেষে এই বিষয় সভা--

অভি-২ : স্যার, যে বিশেষে এই বিষয় সভা নয়, কথাটা হবে, যে বিষয়ে এই বিশেষ সভা।

অভি-১ : তাই নাকি! মানে আবার ভুল!

অভি-৩ : তাহলে স্যার এই ভুলটাও নতুন অ্যাপস ডাউনলোড করা হয়নি বলে চালিয়ে দেওয়া হোক!

অভি-১ : (বিব্রত) ইয়ে--হোক, তাই হোক! এখন আসল বিষয়ে মনোনিবেশ করা জরুরি। ডাকো, ওই ঠ্যাটা রবি বাবুকে ডাকো!

অভি-৩ : স্যার, রবি বাবু নয়, কবি বাবু। এ ছাড়া একজন নোবেল বিজয়ী কবিকে আপনি ঠ্যাটা বলেছেন, এ কথা ছড়িয়ে পড়লে সমূহ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে।

অভি-২ কেন? বিধাতা কি নোবেল বিজয়ীর ঊর্ধ্বে নন?

অভি-৩ : প্রশ্ন সে বিষয়ে নয়। নোবেল পুরস্কারেও তো রাজনীতি আছে। প্রশ্নটা সেখানেই। বেয়াকুব কোথাকার!

অভি-২ : কী, আমি বিয়াকুব? তুই বিয়াকুব! তো চৌদ্দ---

অভি-৩ : দে দে দে---

অভি-২ : দে দে দে--- তোতলা কোথাকার---

অভি-২ দে দে দেখলেন, তো তো তো---

ঝগড়া করতে করতে আবার দুজনে অভিনেতা-১ এর গায়ের কাছে চলে আসে।

অভি-১ : থামো তো! সরে দাঁড়াও! শোনো, নাটক-নভেল আমিও পড়েছি।

অভি-৩ : স্যার, নভেল নয়, নোবেল। আলফ্রেড নোবেল, যার নামে---

অভি-১ : হয়েছে, থামো! এবার ওই কবি বাবুকে ডাকো!

অভি-৪ : এই যে কবি বাবু! আপনাকে ডাকা হচ্ছে।

অভিনেতা-৫ প্রবেশ করে।

অভি-১ : নমেস্কার নমেস্কার! আসুন কবি বাবু!

অভি-৫ : আমি বাবু নই। সাধারণের একজন। বাবু হলেন আপনি।

অভি-১ : এ তো মহা ঠ্যাটা মনে হচ্ছে--- ইয়ে বেশ বেশ! তা বলো কী সমস্যা তোমার?

অভি-৫ : সমস্যাটাই হলো আমার প্রধান সমস্যা।

অভি-১ : অ্যাঁ! ইয়ে--- আর আমার প্রধান সমস্যা হলো তোমাদের মতো ঠ্যাটা-- মানে ইয়ে তোমাদের মতো কবিরা। যেমন মাথামুণ্ডহীন লেখা, তেমন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা। কী বলতে চাচ্ছ, একটু ঝেড়ে কাশো তো বাবা!

অভিনেতা-৪ দ্রুত অভিনেতা-১ এর কানের কাছে এসে খুব জোরে জোরে কাশতে থাকে।

অভি-১ : এই, তুমি থামো! একেবারে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল। বলো কবি, তবে তোমাকে আবার ঝেড়ে কাশতে হবে না! তুমি স্বাভাবিকভাবেই বলো!

অভি-৫ : আমার কিছু ভালো লাগছে না, সবকিছু একঘেয়ে মনে হচ্ছে। মানসিকভাবে খুবই খারাপ আছি।

অভি-১ : সে কী! স্বর্গে তো কারো খারাপ থাকার উপায় নেই। নিয়ম হলো এখানে সবাই ভালো থাকবে। বলো, তুমি কী খারাপ আছ?

অভি-৫ : ভালো আছি।

অভি-১ : তবে?

অভি-৫ : ওই ভালো থাকাটাই তো খারাপ থাকার কারণ।

অভি-১ : আবার প্যাঁচ! আরে বাবা সোজা করে বলো!

অভি-৫ : মানুষ কি ক্রমাগত শুধু ভালো থাকতে পারে? জীবন তো এভাবে একঘেয়ে হয়ে যায়। বৈচিত্র্যহীন জীবন কি জীবন?

অভি-১ : তুমি তো কবি। এখন দেখছি দার্শনিকের মতো কথা বলছ!

অভি-৫ : কবিরা কি দার্শনিক নন?

অভি-১ : তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ যে প্রশ্ন করছ?

অভি-২ : না, স্যারকে কোনো প্রশ্ন করার নিয়ম নেই। স্যারই কেবল সবাইকে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন।

অভি-৩ : বিশেষ করে দর্শন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তো একেবারেই করা যাবে না। কেননা ওই একটি বিষয়ের পরীক্ষায় স্যার---

অভি-২ : হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার?

অভি-৩ : বারবার ফেল করেছেন।

অভি-১ : তুমি থামো! সব সময় সব সত্য উচ্চারণ করতে নেই।

অভিনেতা-৬ প্রবেশ করে।

অভি-৬ : একেবারে খাঁটি কথা।

অভি-৪ : এই তুমি কে? অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়লে?

অভি-৬ : অনুমতি ছাড়া ঢুকব কেন? স্যারের ইচ্ছা ছাড়া এখানে কোনো কিছুই হয় না। আমি তো স্যারের ইচ্ছাতেই এখানে ঢুকেছি।

অভি-১ : ঠিক ঠিক, একেবারে অকাট্য যুক্তি। বলো, তুমি কী চাও?

অভি-৬ : কিছু চাই না স্যার। কেবল খাওয়াদাওয়া, আমোদফুর্তি করা, এ কি সব সময় ভালো লাগে? কারো মনে দুঃখ নাই, উত্থান-পতন নাই, নাই রেষারেষি, বাগবিতণ্ডা, এমনকি তর্কবিতর্কও নেই! একেবারে নিরামিষ জীবন! দূর থেকে শুনলাম এখানে তর্কবিতর্ক হচ্ছে। তাই একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ নিতে--

অভি-১ : এখানে ঢুকে পড়লে, এই তো? কই হে কবি! এ

লোকটাকে কি দলে ভেড়াতে আগে থেকে সাজিয়ে রেখেছিলে নাকি?

অভি-৫ : আমি ওকে চিনি না। তবে আমার মনে হয় এখানে যাদের মেরুদণ্ড এখনো সোজা আছে, তাদের সবার সমস্যাই এক।

অভি-১ : মেরুদণ্ড! খুবই আপত্তিকর কথা! এ বিষয়ে অবিলম্বে একটা আইন--- আইন----ইয়ে--- কী যেন?

অভি-২ : স্যার দৃশ্যটা বোধহয় ঝুলে যাচ্ছে।

অভি-১ : ঠিক ঠিক। ঝুলে যাচ্ছে। আসল বিষয়ে ফেরা যাক। হ্যাঁ কবি, তুমি বলছিলে কেবল ভালো থাকায় কোনো সুখ নেই, আনন্দ নেই।

অভি-৫ : আপনি নিশ্চয়ই জানেন--

অভি-৩ : নিশ্চয়ই কেন? উনি তো সবই জানেন।

অভি-৫ তা হলে তো এই কবিতাটাও নিশ্চয়ই জানা আছে,

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন
কমল তুলিতে/দুঃখ বিনে
সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

অভি-১ : আবার কবিতা!

অভি-৬ : স্যার, এটা ওর কবিতা নয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা থেকে ঝেড়ে দিয়েছে। কবিতাটা অনেক বছর আগে লেখা। অর্থ হলো, দুঃখ ছাড়া সুখের অনুভূতি অর্থপূর্ণ হয় না।

অভি-১ : জানি জানি, তবে অর্থটা জানা ছিল না। এবার অর্থপূর্ণ হলো। কিন্তু কথা হলো সবকিছু কবিতা দিয়ে বোঝাতে হবে কেন? অন্যভাবে বোঝানো যায় না?

অভি-৫ : নিশ্চয়ই যায়। যেমন ধরুন--

অভি-১ : দাঁড়াও দাঁড়াও! একভাবে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। একটু হেঁটে হেঁটে কথোপকথন হোক।

অভিনেতা-১ হাইটের ওপর হেঁটে হেঁটে কথা বলে। অভিনেতা-২ ও ৩ নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে একে অন্যের স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়।

অভি-৬ : মানে একঘেয়েমি থেকে আপনিও বেরিয়ে আসতে চাইছেন।

অভি-১ : থামো! তোমার জানা উচিত আমি হচ্ছি আমি। আর তুমি হচ্ছ--

অভি-৬ : আমি হচ্ছি আমি। দুজন স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে সবাইকে গড় মানুষ করে ফেলা হয়েছে।

অভি-১ : গড়! ও, মহাস্থান গড় তো, গেছি গেছি। এই যে কবি! তুমি যেন কী বলছিলে?

অভি-৫ : আমি বলছিলাম, অন্ধকার না থাকলে আলোর ঔজ্জ্বল্য কোথায়? মন্দ যদি না থাকে কীভাবে ভালোর গৌরব উদ্ভাসিত হয়? নিকৃষ্টের মধ্যে থেকেই তো উৎকৃষ্টকে চেনা যায়, বিরহের যন্ত্রণা থেকেই ভালোবাসার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব---

অভি-১ : আবার কবিতা! থামো থামো! এসব কবিতা আমিও লিখেছি। এগুলো নতুন কোনো কথা নয়। নতুন কিছু থাকলে বলো!

অভি-৫ : আপনার মতো কুৎসিতদর্শন মানুষের কাছে নতুন কিছু বলা অর্থহীন।

অভি-৪ : আপনার দুঃসাহস কিন্তু মাত্রা অতিক্রম করেছে। এবার আপনি আসুন! নাহলে--

অভি-১ : না না, ওকে বলতে দাও! বলো কবি, আমি যে কুৎসিতদর্শন, এটা তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে?

অভি-৫ : আপনি যে সুদর্শন, সেটা আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন?

অভি-১ : আমি--- আমি---

অভি-৫ : অর্থাৎ নিজেকে আপনি সুদর্শন প্রমাণ করতে চাইলে একজন কুৎসিতদর্শনকে টেনে আনতে হবে, যা আপনার ব্যবস্থার মধ্যে নেই।

অভি-১ : আর এজন্যই তোমার জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, এই তো?

অভি-৫ : একদম তাই।

অভি-১ : শোনো কবি, তোমার জীবন যাতে একঘেয়ে হয়ে ওঠে সেজন্যই তোমাকে এখানে আনা হয়েছে। তুমি কবিতায় আমাকে অস্বীকার করেছ, গালিগালাজ করেছ, কাজেই এটা তোমার শাস্তি।

অভি-৫ : সেজন্য তো নরক ছিল। তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে স্বর্গে সবাইকে শাস্তি দেয়ার জন্যই আনা হয়!

অভি-৬ : এটা স্যার একেবারে অকাট্য যুক্তি।

অভি-১ : (বিব্রত) তাই নাকি! আসলে হয়েছে কি, আমার কম্পিউটার সিস্টেমটা আপডেট না করার ফলেই অকাট্য যুক্তি কাট্য, মানে খণ্ড করা যাচ্ছে না।

অভি-২ : আপনার চিপস তো পরিবর্তনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

অভি-১ : ভালো করেছ, ওই একঘেয়ে চিপস খেতে আর ভালো লাগছে না।

অভি-৩ : স্যার, আসলে ওটা খাবার চিপস নয়।

অভি-১ : তাই নাকি? কিন্তু কথা তো একই দাঁড়াচ্ছে। আগের চিপস একঘেয়ে হয়েছে বলেই তো নতুন চিপসের অর্ডার। মানে পরিবর্তন! আর পরিবর্তন মানেই বৈচিত্র্য! বৈচিত্র্য-- কী করা যায় তাহলে? কী করা যায়--(পায়চারি করে) ওহে কবি! তাহলে তোমার কথা অনুযায়ী এখন থেকে এখানে কেবল ভালো নয়, ভালোর পাশাপাশি মন্দও যুক্ত করার নির্দেশ জারি করা হলো---।

অভি-২ : মানে চোর সাধু উভয়ের জন্যই দরজা খোলা?

অভি-১ : তুমি আবার সাধু ছিলে কবে? তোমার তো সুবিধাই হলো। যাকগে ঝুলেটা ইতিমধ্যেই দৃশ্য হয়ে গেছে--

অভি-২ : স্যার ঝুলেটা দৃশ্য হয়ে যায়নি, দৃশ্যটা ঝুলে গেছে।

অভি-১ : হ্যাঁ হ্যাঁ, দৃশ্যটা ঝুলে গেছে। চলো গাত্রোত্থান করি!

অভি-৬ : কিন্তু চোরের বিচার করবে কে? স্বর্গে অপরাধ ছিল না বলে তো বিচারালয় ছিল না।

অভি-১ : তাই তো! তাহলে --- তাহলে---(পায়চারি) তাহলে বিচারের জন্য এখন থেকে এখানে আদালত প্রতিষ্ঠার নির্দেশও প্রদান করা হলো----, চলো চলো, ঝুলেটা ইতিমধ্যেই দৃশ্য হয়ে গেছে।

সবাই গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়।

এবার চালু হলো ভাই বিচারও সালিশ
চুরি করে যারা গড়েছে টাকার বালিশ
ইতিহাসে যারা বনে যায় নায়ক খল
মোসাহেবিতে যারা ঝরায় চোখের জল
তাদের নামে হবে না কোনো নালিশ।

ছিঁচকে চোর যারা উপায়হীন
খাটে যারা উদয়-অস্ত দীনহীন
যাদের ওপর কেবল সবলের হামলা
তাদের নামেই হবে শুধু মামলা!
দেখ নিয়মটা কতো খাঁটি আর নির্বিষ।

প্রবেশ করে এক ও দুই।

দুই : দেখলেন তো স্বর্গে কেমন করে আদালত প্রতিষ্ঠা হলো।

এক : অভিনেতা তো ভালোই তৈরি করেছেন। একটা বানোয়াট কেরিকেচারও দেখলাম!

দুই : বানোয়াট বলছেন! এটা আমি বানাতে যাব কেন? যেটা দেখলেন সেটা তো ফ্ল্যাশব্যাক।

এক : আপনি যা দেখালেন তা সত্য হলে বলতেই হবে, ইতিমধ্যেই পরিবেশটাকে আপনি নরক করে তুলেছেন। অবশ্য আপনাদের মতো মানুষ স্বর্গে যাক আর নরকেই যাক, তাদের মাথা থেকে কেবল ষড়যন্ত্রই বেরোবে।

দুই : আপনি শুধু আমার দোষ খোঁজার চেষ্টা করছেন। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছেন না। সবকিছুর মধ্যেই ষড়যন্ত্র খুঁজে পান। নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য এটা একটা পুরনো কৌশল।

এক : তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি ধোয়া তুলসীপাতা?

দুই : আমি তা বলছি না। আমি বলছি স্বর্গ আর মর্তকে নরক বানানোর জন্য এখন আর আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না।

এক : তার মানে মর্তকেও আপনি নরক বানিয়ে ফেলেছেন!

দুই : জি না জনাব, আমি বলতে চাইছি এখন আর আমাদের প্রায় কিছুই করতে হচ্ছে না। সুযোগ বুঝে একটু হেইও দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যাচ্ছে।

এক : মানে হেইও দেওয়ার কাজ আপনি এখনো বন্ধ করেননি।

দুই : সুযোগ পেলে আমি ছাড়ব কেন? তবে সুযোগটা কে তৈরি করে দিচ্ছে, সেটা একবার খোঁজ নেবেন তো।

এক : এ সবই আপনার নতুন চাল। আপনার স্বভাব পাল্টে ফেলেছেন, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

দুই : আমি বিশ্বাস করতে বলছি না, তবে সরেজমিনে পরিস্থিতিটা একবার দেখে আসতে বলছি।

এক : সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখে আসব! কোথায়?

দুই : কেন, আপনার ফেলে আসা স্থান মর্তে।

এক : সেটা তো আপনারও ফেলে আসা স্থান।

দুই : ঠিক ঠিক। তাই বলছিলাম, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি একবার নিজের চোখে দেখে এলে তো ক্ষতি নেই।

এক : তা নেই। সেখানকার পরিস্থিতি একবার দেখে আসা যেতেই পারে। কিন্তু সেখানে নিয়ে গিয়ে কোনো ঝামেলায় ফেলবেন না তো? মানুষ যতবারই আপনাকে বিশ্বাস করেছে ততোবারই এর জন্য তাদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।

দুই : আপনি তো আর ইহলোকে নেই। তাছাড়া একটা মানুষকে কতবার হত্যা করা যায় বলুন তো? কাজেই আপনাকে আর ঝামেলায় ফেলার সুযোগ থাকছে কোথায়?

এক : সে একটা যুক্তি বটে। তবে ইহলোকে গেলে তো আমাদের চিনে ফেলবে সবাই!

দুই : একদম ঠিক নয়। আমরা সবাইকে দেখতে পাব, কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। প্রয়োজনে ছদ্মবেশে আমরা ওদের সাথে কথাও বলতে পারি।

এক : ঠিক আছে তবে আর বিলম্ব কেন? যাত্রা শুরু করা যাক।

দুই : হ্যাঁ, আসুন আমার পেছনে!

এক : পেছনে মানে! নায়ক যাবে খলনায়কের পেছনে?

দুই : আসল খলনায়কের পরিচয় পেলে আপনি এ কথা বলতেন না। যাকগে আমি আপনার পেছনে থেকেই পথ দেখাচ্ছি।

এক : বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবেন, নির্দেশনা নয়। আমি কখনো ভুলব না যে আমি একজন ইতিহাসের ধিক্কৃত মানুষের সাথে যাচ্ছি।

দুই : ঠিক আছে, তাই হবে। এবার আমরা মর্তে যাওয়ার জন্য মাইমের ঢঙে বৃত্তাকারে হাঁটব। অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু করেছিলাম বৃত্ত তৈরি করে সেখানেই ফিরে আসব। মঞ্চে দূরত্ব অতিক্রম করার এটাই আধুনিক কৌশল।

এক : জীবদ্দশায় আপনি পাকা অভিনেতা ছিলেন, এ কথা সবারই জানা। এখন দেখা যাচ্ছে আপনি মাইম বা মূকাভিনয়ও রপ্ত করেছেন। কিন্তু আমি তো যা করেছি অন্তর থেকে করেছি। কখনো অভিনয় করিনি। মাইম তো আমার জানা নাই।

দুই : আমি শিখিয়ে মানে দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। (মাইমের ঢঙে হেঁটে দেখিয়ে দেয়।) এবার সম্মুখে চলুন! আমি পেছনে আছি।

দুজনে মাইমের ঢঙে হাঁটতে থাকে।

এক : পেছন থেকেই তো সব ষড়যন্ত্র হয়।

দুই : তাহলে কি সামনে যাব? (দ্রুত মাইমের ঢঙে দৌড়ে সামনে চলে যায়।)

এক : আপনি তো সামনে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। পেছনে যান!

দুই আবার পেছনে চলে আসে।

এক : পেছনেই থাকুন, তবে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবেন না!

দুই : আগেই বলেছি ওটা আর আমাকে করতে হবে না।

দুজনে মাইমে হেঁটে একটা বৃত্ত রচনা করে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে।

দুই : এই তো মর্তে পৌঁছে গেছি।

এক : এ কোথায় এলাম? অ্যাতো উঁচু দালানকোঠা, চওড়া রাস্তা, চোখ ধাঁধানো দোকানপাট! এ তো চেনারই উপায় নাই!

দুই : আপনার ফেলে যাওয়া স্থান আপনি চিনতে পারছেন না?

এক : কী করে চিনব? সবকিছু অ্যাতোটা পাল্টে গেছে!

দুই : হতে পারে, আপনি তো পাল্টে ফেলার স্বপ্নই দেখেছিলেন।

এক : তবে অ্যাতোটা পাল্টে যাবে ভাবিনি। তাছাড়া আমি তো এসবের পাশাপাশি মানুষের পাল্টে যাওয়ার স্বপ্নও দেখেছিলাম। আচ্ছা মানুষ কি পাল্টেছে?

দুই : মানুষ কতটা পাল্টেছে তা দেখানোর জন্যই তো আপনাকে এখানে এনেছি।

এক : এ মানুষ যে পাল্টেছে তা কী করে বুঝব?

দুই : সবকিছু তো মাত্র দুদিনে বোঝানো যাবে না। কিছু নমুনা হয়তো দেখানো যাবে। আপনি বিচক্ষণ মানুষ, ওই নমুনা থেকেই বাকিটা আঁচ করতে পারবেন। ওই যে মানুষের কল্যাণে সারা জীবন নিবেদিতপ্রাণ একজন নায়কের ভাস্কর্য দেখা যাচ্ছে, চলুন আমরা ওই ভাস্কর্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি!

এক : আচ্ছা, আমরা যদি এখন অ্যান্টি ক্লক পদ্ধতিতে মাইমে হেঁটে আগের স্থানে ফিরে আসি, তাহলে কি মর্ত থেকে স্বর্গে ফিরে যাওয়া যাবে?

দুই : নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব।

এক : তাহলে আমি সেটাই করতে চাই।

দুই : কিন্তু কেন?

এক : আমি লক্ষ করছি আপনি খলনায়ক হয়ে বারবার মহানায়কের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করছেন।

দুই : আমি নানা বিষয় বিবেচনা করেই এসব বলছি। ঠিক আছে দুজনের দরকার নেই। আমি বরং একাই মহানায়কের মধ্যে ঢুকছি।

এক : মহানায়কের মধ্যে খলনায়ক প্রবেশ করবে, এটা অগ্রহণযোগ্য।

দুই : ঠিক আছে। আপনিই প্রবেশ করুন! তবে সমস্যা হলে আমাকে দায়ী করবেন না আশা করি।

এক : মানে আমাকে যে কোনো উপায়ে সমস্যায় ফেলাই আপনার উদ্দেশ্য।

দুই : এ তো ভারি মুশকিল! যেদিকে যাই সেদিকেই সমস্যা। অ্যাতো ভয় পাচ্ছেন কেন? সারা জীবন জেল খেটেছেন, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। আর এখন একটা সামান্য ব্যাপারে---- ওই তো, আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি করুন!

এক : তাড়াতাড়ি করব মানে?

দুই : কারা যেন এদিকে আসছে। এই যে আপনি এই হাইট, মানে বেদির ওপর উঠে ভাস্কর্য স্টাইলে দাঁড়িয়ে যান। আমি কাছাকাছিই আছি। আপনি আমাকে দেখতে পাবেন, ওরা দেখতে পাবে না। কথাও শুনতে পাবে না। কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবেন। তাড়াতাড়ি করুন!

এক হাইটের ওপর উঠে দাঁড়ায়।

দুই : হ্যাঁ হাতটা ঠিক করুন! মুখে একটা নায়কোচিত অভিব্যক্তি ধরে রাখুন।

এক : আমি কি অভিনেতা যে এসব--

দুই : একদম চুপ! আর কোনো কথা নয়!

প্রবেশ করে জনপ্রতিনিধি। তার পেছনে আসে কয়েকজন চেলা। একটা ফুলের ডালা তাদের হাতে (সম্মিলিতভাবে হাত ও হাতের পাঞ্জা ব্যবহার করেও ফুলের ডালা বোঝানো যেতে পারে)।

জনপ্রতি: কই? তাড়াতাড়ি আসো! এসব কী আজেবাজে ফুল লিয়্যা আস্যাছো! এঁা কোনো ফুলের ডালা হলো? আমার তো একটা পেরেজটিজ আছে। তোমরা দেখছি আমার পেরেজটিজ পাংচার কইরা ছাইড়ব্যা! যাইকগ্যা যা আন্যাছো আন্যাছো, এখন দ্যাও! ধরো, ভক্তি ও আনুগত্য সহকারে দিব্যা, বুজ্যাছো?

সবাই এক যে হাইটে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ফুল দেয়। তারপর একজন চেলা নেতার একটা পা টেনে ধরে, একইভাবে পেছনের জন তার সামনের জনের পা টেনে ধরে, তার পরের জনও সম্মুখের জনের পা টেনে ধরে। এভাবে পা ধরে ধরে একটা লাইন করে দাঁড়ায় এবং সুর করে 'আমার নেতা তোমার নেতা' বলে শ্লোগান দিতে শুরু করে তারা।

জনপ্রতি: উঁহুঁ, না না! শোনো! এই লেতার সামনে আমার নামে কোনো শোলোগান দিব্যা না! এখান থাক্যা পাঁচ গজ দূরে যায়্যা আমার নামে জোরে জোরে শোলোগান দিব্যা! চলো, আমাকে আবার শহীদ মিনারে য্যাতে হবে।

সুর করে 'আমার নেতা তোমার নেতা' বলতে বলতে জনপ্রতিনিধির পেছন পেছন চলে যায় সবাই।

দুই : যাক, একটা শুভ সূচনা হলো।

এক : শুভ সূচনা হলো মানে?

দুই : এই যে আপনি এলেন আর একটা ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হলো।

এক : ঠাট্টা করবেন না! ফুল দিয়ে যে এই ভাস্কর্যটাকে শ্রদ্ধা জানানো হলো, এটা বোঝার মতো বোধ আমার আছে। তবে নেতাকে যে ওরা মনে রাখছে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করছে, এটা দেখে বেশ ভালো লাগল।

দুই : হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রদ্ধা-ভক্তি কেমন করছে, তার নমুনা তো নিজের চোখেই দেখলেন!

এক : তার মানে?

দুই : এই তো বললেন, বোঝার মতো বোধ আপনার আছে। তো ওই পাঁচ গজ দূরে গিয়ে শ্লোগান দেয়ার বোধটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে? নিজের কানেই তো শুনলেন। ভাগ্য ভালো যে আজ কোনো বিশেষ দিন নয়, বিশেষ দিন হলে দেখতেন একেবারে শ্রদ্ধা-ভক্তির ঢল নামত।

এক : আজ কোনো বিশেষ দিন না হলে ওই লোকটা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এলো কেন?

দুই : এটাই এখন রেওয়াজ। দলে বা প্রতিষ্ঠানে কেউ কোনো বড় পদ পেলে বা নির্বাচনে জয়লাভ করলে, তার দায়িত্বের সূচনাই হয় নেতার ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে। তবে---

এক : তবে?

দুই : দুর্দিনে এদের ক'জন থাকবে আর কতজন ভেগে যাবে, এটা একটা হিসাবের ব্যাপার।

এক : ভেগে যাওয়াদের হিসাবটা অবশ্য আমার জানা আছে।

দুই : সেটা কী রকম?

এক : যারা ভেগে যায় তাদের ভাগ করা যায় দুই শ্রেণিতে। একদল ভয়ে ভেগে যায়, আর একদল কেবল ভেগেই যায় না, তারা প্রতিপক্ষের সাথে হাত মেলায়। যেমন--

দুই : যেমন?

এক : যেমন আপনার মতো বেইমানরা।

দুই : ইয়ে, আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?

এক : কেন, আপনাকে টানব না কেন?

দুই : ওসব টানাটানি পরে করবেন, এখন আপনি আবার আগের মতো দাঁড়িয়ে যান!

এক : আবার দাঁড়াব মানে?

দুই : ওই যে এসে গেছে। আর কোনো কথা নয়! হ্যাঁ হাতটা আগের জায়গায় নিয়ে আসুন!

এক আগের মতো করে দাঁড়ায়। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায় দুই। হাতে কল্পিত স্মার্ট ফোন। এবং সেই কল্পিত ফোনের কি-বোর্ড চাপার ভঙ্গিতে প্রবেশ করে এক যুবতী। উদ্ভট যান্ত্রিক শব্দ হতে থাকে। কি-বোর্ডে মনঃসংযোগ থাকায় যুবতী ভাস্কর্যের বেদিতে প্রায় হোঁচট খাচ্ছিল। সামলে নিয়ে অন্যদিকে সরে গিয়ে কি-বোর্ডে টাইপ করতে থাকে। একটু পরে একইভাবে স্মার্ট ফোনের কি-বোর্ড চাপার ভঙ্গিতে অন্যদিক থেকে প্রবেশ করে এক যুবক। সে ভাস্কর্যের গায়ে হেলান দিয়ে বসে গভীর মনোযোগ নিয়ে কি-বোর্ড চাপতে থাকে। যুবতীও একপর্যায়ে ভাস্কর্যের বেদিতে বসে। তাদের মুখ বিপরীতমুখী। দুজনেই চ্যাটিং করছে। নিঃশব্দে হাসছে কখনো। সেসব ছাপিয়ে কি-বোর্ডে টাইপ করার উদ্ভট শব্দ শোনা যাচ্ছে। যুবক-যুবতীর কাছাকাছি গিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে থাকে দুই।

এক : (দুইকে) এইযে শুনুন! এসব কী হচ্ছে?

দুই : কী হচ্ছে জানি না। তবে হচ্ছে।

এক : হচ্ছে মানে?

দুই : হচ্ছে মানে হচ্ছে। যা হবার তাই হচ্ছে।

এক : কী ভয়াবহ! কিন্তু এমন উদ্ভট শব্দ কিসের?

দুই : ওদের ফোনের কি-বোর্ডের শব্দ। আগের দিনে টাইপরাইটার মেশিনেও তো শব্দ হতো। ভুলে গেলেন?

এক : ভুলব কেন? কিন্তু এখন তো প্রযুক্তি এগিয়েছে। এসব উটকো শব্দ বন্ধ করার কোনো পথ নেই?

দুই : নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ওটা বন্ধ করলে ঠিক জোশ আসে না। তাছাড়া সবাইকে জানান দিতে হবে তো। এ হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয় অন্যকে জানান দেবার যুগ।

এক : ব্যক্তিগত বিষয় মানে? এদের দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কী?

দুই : হয় বন্ধু না হয় প্রেমিক-প্রেমিকা।

এক : কী আশ্চর্য! ওরা কথা বলছে না কেন?

দুই : এখন কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন চ্যাটিং। ওটা ছাড়া ইয়ে, মানে ইয়েটা ঠিক আসে না।

এক : না, ইয়ে আমাদের সময়েও ছিল। কিন্তু তখন তো একে অন্যের সাথে কথা বলত। একজন অন্যজনের চোখে চোখ রাখত। ওরা তো তার ধারেকাছেও নেই!

দুই : এখন এটাই রীতি। যাকগে ইয়ের জন্য একে অন্যের সাথে কথা বলার আধুনিক পদ্ধতি তো দেখলেন। বাকি থাকল চোখে চোখ রাখা। এখন সেটা সম্পন্ন হয় ক্যামেরায়। আর সেটা না হলেই নতুন বন্ধু, নতুন ইয়ে, মানে ইয়ে!

এক : এ এক নতুন পরিস্থিতি দেখছি। এখান থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে--- হিঃ হিঃ হিঃ--

দুই : কী হলো?

এক : এরা তো আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে!

দুই : এটা তো তুলনামূলকভাবে অনেক শোভন আচরণ। এখানে এর থেকেও অনেক অশ্লীল আচরণ ঘটে। আপনি সেদিক থেকে অনেক সৌভাগ্যবান।

এক : কিন্তু এসব তো অভাবনীয়!

দুই : এজন্যই তো আমি নায়কের ভাস্কর্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করেননি।

কথার মাঝেই যুবক উঠে কি-বোর্ড চাপতে চাপতে চলে যায়। এবং যুবতী দাঁড়িয়ে ভাস্কর্যের সাথে সেলফি তোলে।

এক : আরে! ও এটা কী করছে?

দুই : সেলফি তুলছে। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওদের সাথে আপনাকে তুলে ধরবে। বলতে পারেন দেশপ্রেমের নমুনা প্রদর্শন করবে।

এক : কী ভয়াবহ!

যুবতী সেলফি তোলা শেষ করে কি-বোর্ড চাপতে চাপতে চলে যায়।

এক : ওরা তো চলে গেল!

দুই : কেন, আপনার কি খারাপ লাগছে?

এক : না না, আমি ভাবছি ওরা এখন কোথায় যাবে!

দুই : হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথাও, হয়তো অন্য কোনোখানে। ওরা খিদে পেলে খাবে, ক্লাস করলে করবে, ঘুম পেলে ঘুমাবে, তবে হাতের যন্ত্রটা সব সময় সক্রিয়ই থাকবে।

এক : সে কী! ঘুমের মধ্যেও চ্যাটিং? কী ভয়াবহ! ওটা যোগাযোগ যন্ত্র, নাকি গোলযোগ যন্ত্র!

দুই : ওরা কখন ঘুমায় আর কখন জেগে থাকে সেটাই তো বোঝা যায় না।

এক : মানে দাঁড়াচ্ছে ওরা জেগে জেগে ঘুমায়। লক্ষণ তো খুবই খারাপ! যাক, আপাতত ওদের হাত থেকে বাঁচা গেছে এটাই যা রক্ষে।

দুই : এর পরে হয়তো যা ঘটবে তাতে আপনার মনে হতে পারে, ওরাই তো ভালো ছিল।

এক : তার মানে?

দুই : সন্ধ্যা হতে তো আর বাকি নাই। একটু পরেই দেখবেন এখানে ভিন্ন একটা আড্ডা হবে।

এক : সে কী রকম?

দুই : ওই যারা ড্রাগে আসক্ত তাদের নর্তনকুর্দন আর কি।

এক : তাই নাকি? আচ্ছা, একটা বিষয় কি আপনার চোখে পড়েছে?

দুই : কী?

এক : ওই যে একটু দূরে আড়ালে বসে একটি ছেলে খাতায় কীসব আঁকিবুঁকি করছে। ওর কর্মকাণ্ড খুবই রহস্যজনক! কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো?

দুই : হতেই পারে। ছেলেটিকে নজরে রাখতে হবে। ও ব্যাটা নেশাগ্রস্তদের চরও হতে পারে।

এক : তাই নাকি? তাহলে তো এসব দৃশ্য দর্শককে দেখানো যাবে না। ষড়যন্ত্র হবে পর্দার আড়ালে। আপনি বরং দৃশ্য থেকে রাতটা ছেঁটে ফেলুন! আগামীকাল সকাল থেকে আবার শুরু করা যাক।

দুই : আপনার যখন ইচ্ছা নয়, তখন তাই হোক। কাল সকাল থেকেই শুরু করি। ভেবেছিলাম ওদের সাথে বসে একটা কষে দম মেরে দেব, তা আর হলো না!

এক : আফসোস করছেন কেন? ড্রাগে আসক্ত করে কাজ হাসিলের কায়দাটা তো আপনারাই চালু করেছেন। একদিন না হয় একা একাই উপভোগ করলেন।

দুই : আরে ও জিনিস কি একা একা জমে নাকি। গাঁতা লাগে গাঁতা। যাকগে রাতের দৃশ্য এখন কেটে দিচ্ছি। চলুন কাল সকালের দৃশ্যে প্রবেশ করি!

এক বেদি থেকে নেমে দুইয়ের পেছনে আগের মতো বৃত্তাকারে হাঁটতে থাকে।

দুই : কী ব্যাপার, এবার যে পেছনে হাঁটছেন?

এক : ভাবছি একটু পেছনেই হাঁটি। তাছাড়া এখানকার ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না।

এক পেছন থেকে বেদির আড়ালে চলে যায়। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

দুই : এখানকার ভাবগতিক দেখানোর জন্যই তো আপনাকে নিয়ে আসা। এই তো রাত শেষ হয়ে এলো।

দুই বৃত্তাকারে আবার বেদির কাছে ফিরে আসে।

দুই : নিন আগের মতো ভাস্কর্যের মধ্যে ঢুকে পড়ুন! কখন কে চলে আসে বলা তো যায় না, তার আগেই দাঁড়িয়ে পড়া ভালো। না না, আর দেরি করবেন না! কী হলো, কথা বলছেন না কেন? (পেছনে তাকিয়ে দেখে) আশ্চর্য! কোথায় গেল? কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল না তো?

এক বেদির পেছন থেকে বেরিয়ে আসে।

এক : হ্যাঁ, কিছুটা সেরকমই।

দুই : সেরকমই মানে? আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

এক : আসলে হয়েছিল কি, আপনি তো রাতে শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লেন। আমি ভাবলাম, যে দৃশ্যটা সাধারণকে দেখানো হবে না বলে আপনি কেটে দিলেন, সেটা আমি একবার দেখার চেষ্টা করি। আর তা দেখতে গিয়েই হলো বিপত্তি।

দুই : বিপত্তি মানে?

এক : এই ভাস্কর্যের চারপাশ ঘিরে শুরু হলো পাঁড় মাতালদের

আড্ডা। এর মধ্যে অদ্ভুত এক কাণ্ড!

দুই : কীরকম?

এক : কোথা থেকে কে যেন এক মাতালের গায়ে ঢিল ছুড়ল। আর যায় কোথা, মাতাল ভাবল, পাশের মাতাল তাকে ঢিল মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাশের জনকে আক্রমণ করল। এভাবে একজন থেকে অন্যজন। শুরু হলো এলাহি কাণ্ড। মারামারি, ছোটাছুটি--- এবং একপর্যায়ে একে অন্যকে ধাওয়া। আর এভাবেই সবাই হলো হাওয়া!

দুই : ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু মাতালকে ঢিলটা মারল কে?

এক : তা জানি না। তবে আপনি যে নন, এটা হলপ করে বলতে পারি। কেননা এমন সুবুদ্ধি আপনার মাথা থেকে আসবে না।

দুই : আচ্ছা বেশ। তবে যে ঢিল ছুড়ল তাকে কি আপনি দেখেছেন?

এক : দেখিনি তবে কিছুটা যেন আঁচ করতে পারছি।

দুই : আঁচ পরে করবেন, আপাতত দাঁড়িয়ে যান! কারা যেন আসছে।

এক আগের মতো বেদিতে দাঁড়ায়। মা তার দুই সন্তানকে নিয়ে বেদি অতিক্রম করে পেছনে দুই সন্তানের পিঠে বিশাল ব্যাকপ্যাক। ব্যাকপ্যাকের ভারে সন্তানরা কুঁজো হয়ে হাঁটছে। মা এগিয়ে গেলেও সন্তানরা তাকে ফাঁকি দিয়ে ভাস্কর্যের দিকে এগিয়ে আসে। গভীর কৌতূহল নিয়ে ভাস্কর্য দেখে সন্তান-২। তারপর ভাস্কর্যের পেছনের পাশে বসে পড়ে। সন্তান-১ দূরে কিছু একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে চলে যায়।

এক : স্কুলের বাচ্চাদের পিঠে অতো ভারী ব্যাগ কেন? আমাদের সময়ে তো ব্যাগের বালাই ছিল না।

দুই : খাবার। এখন অনেক বেশি বেশি খাবার দেওয়া হচ্ছে তো।

এক : হ্যাঁ, এখন দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে শুনেছি। শিশুরা এখন আর না খেয়ে থাকে না। এটা খুব ভালো খবর। আহা! আমাদের সময়ে বেশিরভাগ শিশু না খেয়ে স্কুলে আসত! এখন খাবারে কতো বৈচিত্র্য। তবে আছে বলেই অ্যাতো বেশি দিতে হবে? অপচয় কি ভালো?

দুই : আরে এ তো প্রতিযোগিতা।

এক : খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা!

দুই : এ খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা না হলে, না থাকে মর্যাদা না এগোয় শিক্ষা।

এক : তার মানে? কী রহস্য করছেন?

দুই : এ এমন এক খাবার যা হজম না হলেও শিক্ষার্থীকে গোগ্রাসে গেলাতেই হবে।

এক : সে কীরকম?

দুই : খাবার মেনুটা আগে শুনুন তাহলেই ধরতে পারবেন। প্রথমে একগাদা পাঠ্যবই, তার পরিমাণ মনে করুন বিশ প্লেট। তারপর প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য রয়েছে নোটবই, তার পরিমাণ-- প্লেট--- না না এটা প্লেট হবে না, গামলা লাগবে গামলা। তা ধরুন দশ গামলা। এরপর পরীক্ষায় যাতে কমন পড়ে এর জন্য বি-শে-ষ- অজ্ঞ সব স্যারদের লেখা গাইডবই, তা ধরুন এক, দুই, তিন--- না না এতে হবে না, বেশি লাগবে। সে ধরুন সাত গামলা। এ হলেই তো চলছে না। খাওয়াটাকে তো আবার সৃজনশীল করতে হবে। এজন্য সৃজনশীল গাইডবই লাগবে অন্তত পাঁচ গামলা। তবে এখানেই শেষ নয়। খাবারগুলো তো ভালোভাবে হজম করার ব্যাপার আছে। এর জন্য বোরহানি, মানে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের নানারকম নোটশিট, তার পরিমাণ ধরুন পঞ্চাশ গজ--- না না গজে হচ্ছে না, গ্লাস লাগবে। তা মনে করুন কমপক্ষে পঁচিশ গ্লাস। তারপর--- তারপর ওই তো এসে গেছে---

সন্তান-১ বাইরে থেকে ভেতরে আসে। বেদিতে ওঠার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে ব্যাকপ্যাকের ভারে বেদির নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

দুই : অ্যাঁ--অ্যাঁ-- অ্যাঁই---

এক : আরে ছেলেটা তো ব্যাগের ভারে পড়ে গেল!

দুই : পড়ুক, না পড়লে দাঁড়াতে শিখবে কী করে! তাছাড়া জ্ঞানের ভারে পড়ে যাওয়ার মধ্যে যে গৌরব আছে--- সেটা এই জাতি ছাড়া কি অন্য কেউ বুঝবে?

সন্তান-২ দেখতে পেয়ে এগিয়ে সন্তান-১কে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাগের ভারে সেও পড়ে যায় সন্তান-১ এর ওপর

দুই : এই তো বুঝে গেছে। হেইও--- হেই--- আহা হা হা!

মা ছুটে আসে বাইরে থেকে।

মা : এই, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমরা এখানে কী করছ? তোমাদের না নিষেধ করেছি, স্কুলের সময় কোনো দিকে তাকাবে না, কোথাও যাবে না! তবু রোজ ছুটে আসো এখানে!

দুই : একদম ঠিক।

মা : কী করছ এখানে? ওঠো! স্কুলে চলো!

(দুজনকে তুলতে গিয়ে সেও পড়ে যায় সন্তানদের ওপর।)

দুই : অ্যাঁ--- এই হলো জ্ঞানের ভারে গোটা পরিবারের পতন। এভাবেই পরিবার থেকে হবে প্রতিষ্ঠানের পতন, আর তারপর হবে গোটা সমাজের পতন। এমন সামাজিক পতনের সৌভাগ্য কটা সমাজের হয় বলুন?

এক : পতন নয়, মহাপতন বলুন! আপনারা তো এমন মহাপতনের দিকেই সমাজটাকে নিয়ে যেতে চাইছেন।

দুই : আপনি শুধু শুধু আমাকে দুষছেন। নিজে থেকে উঠে দাঁড়াতে না চাইলে তার পতন কেউ ঠেকাতে পারে? ঠিক আছে দেখুন, আমি একজন ভালো মানুষ সেজে ওনার সাথে কথা বলছি।

দুই ভোল পাল্টে একজন ভালো মানুষের মতো মায়ের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়।

দুই : এই যে ধরুন! এবার উঠুন!

মা উঠে দাঁড়ায়। সন্তানদের তোলে।

মা : কোনো কথা শুনবে না। কী যে পেয়েছে এই ভাস্কর্যের মধ্যে!

দুই : ওরা ছোট। ওদের একটু কৌতূহল থাকবে না? কৌতূহলই তো শিক্ষার অন্যতম প্রাথমিক ভিত্তি।

মা : তাই যদি হবে তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার দরকার কী? ইস, স্কুলের সময় চলে যাচ্ছে! এই চলো! স্কুল শেষে প্রাইভেট টিউটর, সেখান থেকে আবার কোচিং সেন্টার। ওদের কি আর অন্যদিকে কৌতূহলী হবার সময় আছে? আর আমারই বা সময় কোথায়? স্কুল থেকে ফিরে বিউটি পারলার, তারপর টিভি সিরিয়াল, আরও কী যেন? মনে পড়ছে না, সে অনেক কাজ। অ্যাতো কাজের চাপ থাকলে কি সবকিছু মনে থাকে? এই চলো চলো---(চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে আসে) এই তো মনে পড়েছে। তারপর আবার ড্রাইভিং শিখছি। ড্রাইভিং শেষে ল্যাং---

দুই : ল্যাং! আপনাকে আবার ল্যাং মারল কে?

মা : ল্যাং মারবে কেন?

সন্তান-২ : মাম্মি, তুমি না ইংরেজিটা এখনো ভালো করে শিখতে পারলে না। ওটা ল্যাং নয়, ল্যাঙগুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙগুয়েজ।

মা : (সন্তান-২ এর দিকে তেড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে।) দেখলেন তো, আমার এইটুকু মেয়ে কেমন সুন্দর ইংরেজি বলে! আর আপনি বলছেন ল্যাং মারল! আমাকে ভালো করে ইংলিশ লাঙগুয়েজ শিখতে হবে না? তারপর ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা--- বেগমপাড়ার নাম শুনেছেন তো?

দুই : বেগুন পোড়া! ও, খেয়েছি খেয়েছি---

মা : বেগুন পোড়া নয়। বেগুন বেগুন করছে! ওটা বেগমপাড়া।

দুই : ও, এবার বুঝেছি। কানাডার মতো অনেক দেশের কিছু স্থানের নামই নাকি হয়ে গেছে বেগমপাড়া। এখানকার হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একশ্রেণির ধনী সেসব দেশে নিজেদের বেগম আর সন্তানদের রেখে এসে সেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচার করছে।

মা : ঠিক বলেছেন। তবে আপনার ওই 'পাচার' শব্দটা খুবই আপত্তিকর!

দুই : 'পাচার' শব্দে আপত্তি থাকলে তার পরিবর্তে না হয় 'দুর্নীতি' বা 'ডাকাতি' শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই ভাস্কর্যের নেতা তো আজীবন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অকালে দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তাই আমি বলছিলাম, আপনার সন্তানরা এই ভাস্কর্যের সামনে এসে দাঁড়ালেও কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হয়।

মা : এসব তো নোটবইতেই লেখা আছে। এর জন্য ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়াতে হবে কেন?

দুই : একটা বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় যে শিক্ষা হয়, নোটবইতে তো তা হয় না। ওদের বাস্তবতার মুখোমুখি করাটা এজন্য জরুরি। তাছাড়া এটা তো সাধারণ কোনো ভাস্কর্য নয়, এর মধ্যে রয়েছে একটি জাতির স্বাধীন সত্তা গড়ে ওঠার ইতিহাস। আর এই নায়কের স্বপ্নে তো আপনার ওই বেগমপাড়া ছিল না, তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি বেগুন পোড়া খেয়েই বেড়ে উঠেছেন। আর স্বপ্ন দেখেছেন, দেশের প্রতিটি মানুষ অন্তত বেগুন পোড়া খেয়ে হলেও যেন স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তাঁর স্বপ্নে---

মা : ওসব স্বপ্নের কথা আপনার সন্তানকে শোনাবেন! আমার সন্তানদের ওই স্বপ্নের কথা শোনানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ওদের প্রয়োজন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা। যেটা না হলে এই সমাজে আর মর্যাদা বলে কিছু থাকবে না। এই চলো চলো! (সন্তানদের নিয়ে দ্রুত চলে যায়।)

দুই : (ভোল পাল্টে আবার আগের চরিত্রে ফিরে আসে) দেখলেন তো অবস্থা! আপনি যত ভালো মানুষ সেজেই ওদের বোঝান না কেন, ওরা তা বুঝবে না।

এক : এরকম একটা নির্বোধ সমাজ তৈরি হলে আপনাদেরই তো সুবিধা।

দুই : আমাদের সুবিধা মানে?

এক : ওই যে, আপনার ভাষায় পালে হাওয়া বা একটু হেইও দিতে পারেন। মানে হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক উসকানি, জ্বালাও-পোড়াও-ভাঙচুর-লুটপাট-ধর্ষণ, এমনকি গুজব ছড়ানোর একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করা সহজ হয় আপনাদের পক্ষে।

দুই : আপনি কি মনে করেন এমন একটা হাইব্রিড সমাজ পেয়ে বিশ্বমোড়লেরা চুপ করে বসে থাকবে?

এক : মোটেই চুপ করে বসে থাকবে না। তবে তাদের ফন্দি-ফিকির আপনাদের মতো বেইমানের মাধ্যমেই কার্যকর করবে। সুদূর অতীত থেকে এই ব্যবস্থাই চলে আসছে।

দুই : আসলে এখন পরিস্থিতি যে আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে, এটা আপনি মানতে চাইছেন না।

এক : (দূরে দেখে) এ সেই কালকের ছেলেটি না? ওখানে বসে ও কী করছে?

দুই : ষড়যন্ত্র! যাই বলুন, আমার কিন্তু ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না!

এক : একটা কিশোর, ও কি ষড়যন্ত্র করবে?

দুই : কাউকে বিশ্বাস নাই।

এক : আপনি এমনভাবে বলছেন যেন ষড়যন্ত্রের বিষয়টা আপনার জানা। যাই হোক তাহলে কি এখান থেকে

আমরা চলে যাব?

দুই : শেষটা না দেখে যাওয়া কি কাপুরুষোচিত হবে না।

এক : আপনি অতীতে যা করে এসেছেন, তা কি কাপুরুষোচিত ছিল না?

দুই : অতীত নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি কেন? আমরা তো বর্তমানে আছি।

এক : এখানে অতীতের পুনরাবৃত্তি বহুবার হয়েছে।

দুই : সেসব কথা আপাতত থাক। এখন ঠিক করুন, থাকবেন না যাবেন।

এক : আপনিই তো বললেন চলে যাওয়া কাপুরুষোচিত হয়।

দুই : ঠিক আছে। তবে রাতের দৃশ্য আপনি দেখতে চাইলে দেখুন। আমার সময় হবে না।

এক : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার তো আবার শুঁড়িখানায় ঢোকার অজুহাত আছেই।

দুই : কথা তো শুঁড়িখানা নিয়ে নয়। আপনি বলছিলেন না, সব ষড়যন্ত্র হয় রাতের বেলা।

এক : তার মানে আপনি কি শুঁড়িখানায় বসেই ষড়যন্ত্রটা করবেন?

দুই : (হঠাৎ কিছু একটা অনুমান করে চারদিকে দেখে নেয়) শুঁড়িখানায় আর যেতে পারলাম কই। মনে হচ্ছে তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। নেমে আসুন তাড়াতাড়ি, নেমে আসুন!

এক বেদি থেকে দ্রুত নেমে আসে। দুজনে আড়ালে চলে যায়। মৃদু আলোয় কিছু লোক চারদিক থেকে সন্তর্পণে প্রবেশ করে। কাছাকাছি পৌঁছে তারা একটা ছোট বৃত্ত তৈরি করে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে পেছনের জন সামনের জনের কানে কোনো বার্তা দেয়। এভাবে চক্রাকারে বার্তা দেয়ার ভঙ্গি চলে। বার্তা প্রাপকেরা মোবাইল ফোনের কি-বোর্ড টিপে অন্যত্র সে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে। ঘুরতে ঘুরতে চলতে থাকে চক্রাকারে মোবাইলে বার্তা দেওয়ার কাজ। ক্রমাগত বাড়তে থাকে ঘোরার গতি, সেইসাথে বৃত্তটাও হতে থাকে বড়। একপর্যায়ে আবার চার ভাগে ভাগ হয়ে লোকগুলো দ্রুত বেরিয়ে যায়। এক থেকে দেড় মিনিট স্থায়ী প্রতীকী এই মঞ্চক্রিয়ার সময় সংগতিপূর্ণ ভৌতিক শব্দ শোনা যায়। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে আবার প্রবেশ করে এক ও দুই।

এক : কী রহস্যজনক কর্মকাণ্ড! ওরা কানে কানে কী বলছে ওসব?

দুই : এক কান থেকে অন্য কান, এক মোবাইল থেকে হাজারো মোবাইল। বুঝতে পারছেন না? গুজব ছড়াচ্ছে, গুজব! একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটবে।

এক : ঘটবে মানে? কী ঘটবে?

দুই : ওসব প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। চলুন তাড়াতাড়ি! এখানে আর এক মুহূর্তও নিরাপদ নয়। চলুন চলুন!

এক ও দুই দ্রুত আড়ালে চলে যায়। আলো-আঁধারিতে দুই দিক থেকে অনেকটা তাণ্ডব নৃত্যের ঢঙে প্রবেশ করে কিছু সংখ্যক 'হিংস্র মুখোশধারী'। তারা দুই দিকে দুটি বৃত্ত তৈরি করে। দুই হাত ওপরে তুলে সবাই একসাথে হাতুড়ি পেটানোর মতো করে কিছু ভাঙার ভঙ্গি করে। মুখে তাদের প্রবল শক্তি প্রয়োগের সম্মিলিত শব্দ। মুখোশধারীরা এবার এক যে বেদির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সেই বেদিটা বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায় এবং একই কৌশলে কিছু ভেঙে ফেলার ভঙ্গি করে। এরপর চার ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রবেশ করে একজন গণমাধ্যমকর্মী। বেদির চারপাশ ঘুরে দেখে নোট নেওয়ার ভঙ্গি করে সে। বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে জনপ্রতিনিধি।

গণমাধ্যম : এই তো এখানেই ছিল। যখনই কোনো ঘটনা ঘটে তখনই দেখা যায় ঘটনা ঘটার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এলাকা ফাঁকা করে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এসব করে কোনো লাভ আছে?

জনপ্রতি: আমি জনপ্রতিনিধি, এ প্রশ্নের উত্তর আমার দেবার কথা লয়। আপনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রশ্ন করেন!

গণমাধ্যম : এই যে এতোবড় একটা ঘটনা ঘটল, এ ব্যাপারে আপনার কোনো দায়বদ্ধতা নেই?

জনপ্রতি: নাই মানে? আমি যে ঘটনাস্থলে আইসল্যাম, এটা কি আমার দায়বদ্ধতা প্রমাণ কইরছে না?

গণমাধ্যম : বলছিলাম এসব বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আপনি কোনো ভূমিকা নেননি?

জনপ্রতি: লেইনি মানে। তখন আমার কথা কেউ শোনেনি। এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারাই দখুক।

গণমাধ্যম : আপনার কথা শোনেনি মানে? কী বলেছিলেন আপনি?

জনপ্রতি: দেখেন, ইদানীং সারা দেশে প্রায়ই ভাস্কর্য ভাঙা হইচ্ছে। সংখ্যালঘুদের ঘর-বাড়ি, উপাসনালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ হইচ্ছে। এখানেও যে এমন ঘটনা ঘইটবে এ তো জানাই ছিল। সেজন্যই ভাস্কর্যটা বানাতে আমি লিষেধ করইরাছিলাম। এখন কী হ্যলো?

গণমাধ্যম : আপনি ইতিহাসের মহানায়কের ভাস্কর্য বানাতে নিষেধ করেছিলেন?

জনপ্রতি: এই তো সম্বাদিকের প্যাঁচ! আরে বোঝার চেষ্টা করেন। আমি--- মানে সরাসরি লয়, ওই আকারে-ইংগিতে---- বোঝেনই তো---

গণমাধ্যম : আকারে-ইংগিতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কেন?

জনপ্রতি: আমি রাজনীতিবিদ, আমাকে মানুষের ইমোশনের কথা মাথায় রাইখতে হয়।

গণমাধ্যম : আপনি কি মনে করেন, ভাস্কর্য না থাক এটা সবাই চায়?

জনপ্রতি: ভাস্কর্য---

গণমাধ্যম : আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন। এই যে ভাস্কর্যটা ভাঙা হলো, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি কি কোনো পদক্ষেপ নেবেন না? আপনার কোনো দায় নেই?

জনপ্রতি: সম্বাদিকের এই এক সমস্যা! এক সাথে অ্যাতো প্রশ্ন করলে কি হয়? আপনে এক এক কইরা প্রশ্ন করেন!

গণমাধ্যম : আচ্ছা আমি এক এক করেই প্রশ্ন করছি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভাস্কর্য ভাঙার ব্যাপারে আপনি কি কোনো ব্যবস্থা নেবেন?

জনপ্রতি: লিব, অবশ্যই লিব। উপুর থাক্যা নির্দেশনা আসলেই লিব।

গণমাধ্যম : (নোট নেওয়ার ভঙ্গি করে) ওপর থেকে নির্দেশনা এলেই নেবেন, না হলে নেবেন না।

জনপ্রতি: আবার লোট লিছে!

গণমাধ্যম : আপনি কি মনে করেন ভাস্কর্য না থাক, এটা সবাই চায়?

জনপ্রতি: সেসব কি আমি হিসাব কইরা দেইখাছি নাকি! সব আজেবাজে প্রশ্ন কইরছে! তবে আমি-

গণমাধ্যম : হ্যাঁ আপনি। আপনার কথায়ই আসা যাক।

জনপ্রতি: আমার কথায় মানে? আপনি কি বলতে চ্যাচ্ছেন আমি

এই ভাস্কর্য ভাইঙতে ইন্ধন জুগিয়েছি?

গণমাধ্যম : পরোক্ষভাবে সে দায় আপনার ওপরও বর্তায় বই কি। তবে আমি বলতে চাচ্ছি অন্য কথা।

জনপ্রতি: অন্য কথা? আর কোনো কথা লাই। আমাকে আবার অন্য জায়গায় য্যাতে হবে---

গণমাধ্যম : না আমি বলতে চাচ্ছি, নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-সংবর্ধনায় আপনি কি আপনার প্রতিকৃতি ব্যবহার করেন?

জনপ্রতি: পতি! কীসব অসভ্য কথা বুইলছেন?

গণমাধ্যম : পতি নয়, প্রতিকৃতি, মানে ছবি, আপনার ছবি।

জনপ্রতি: ও, মানে আপনি বুইলতে চ্যাচ্ছেন লির্বাচন, সভা-সমাবেশে আমি আমার ছবি ব্যবহার করি কি না? না না আমি ব্যবহার করি না। তবে আমার ভক্তরা কইরছে। ঢাউস ঢাউস সব ছবি। আর একখান দুখান লয়, হাজার হাজার। ওসব ছাড়া নাকি এখন লেতাই হওয়া যায় না। হেঃ হেঃ...

গণমাধ্যম : বেশ। তো আপনি কি চান, আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছবি ভক্তদের মন থেকে মুছে যাক?

জনপ্রতি: তা চাইব কেনে? ভক্তরা তো আমার ছবির মাধ্যমেই আমাকে এবং আমার কাজকে মনে রাইখবে। ওদের মধ্যেই তো আমার ব্যাচা থাকা।

গণমাধ্যম : তাহলে ছবিতে সমস্যা নেই?

জনপ্রতি: লেই।

গণমাধ্যম : টিভিতে ভাষণ দিতেও সমস্যা নেই?

জনপ্রতি: কুনো সমস্যা লেই।

গণমাধ্যম : অনলাইনে লম্বা লম্বা বয়ান দিতেও সমস্যা নেই?

জনপ্রতি: লম্বা লম্বা বয়ান কেনে, ওয়াজ করতেও কোনো সমস্যা লেই।

গণমাধ্যম : কেবল ভাস্কর্যে সমস্যা, এই তো?

জনপ্রতি: এই তো! আরে ছবি আর ভাস্কর্য কি এক হলো নাকি? কাগজ, পেলাস্টিক আর পাথর কি এক হলো?

গণমাধ্যম : এক হলো না। আচ্ছা আপনি কি অভিধান পড়েন?

জনপ্রতি: অভি!

গণমাধ্যম : অভি না, অভি না, অভিধান। মানে ডিকশনারি।

জনপ্রতি: ও, ডিকশনারি। তা বাংলায় বুলবেন তো। হ্যাঁ, তা তো পইড়তেই হয়। ইদানীং ভাষণ বেশি দিতে হয় তো, তাই ভাষার অইর্থ, ভাষার বৈচিত্তর, বিশেষ কইরা শুইদ্ধ শব্দ উইচ্চারণের জইন্য অভিধান দেখতেই হয়। আরে আমি তো শিক্ষিত লেতা।

গণমাধ্যম : শিক্ষিত তো বটেই! তাহলে আপনি অভিধানে নিশ্চয়ই এও দেখেছেন যে, ছবি আর ভাস্কর্য এই দুটো শব্দেরই অর্থ হলো কোনো কিছুর প্রতিমূর্তি?

জনপ্রতি: এইখানেই তো অভিধানের সমেস্যা। আরে অভিধান যারা লিখেছে তারা কি আমার মতো শিক্ষিত লাকি? কাগজ, পেলাস্টিক, পাথর---সব এক কইরা ফেলাছে!

গণমাধ্যম : কাগজ আর পাথর নিয়ে তো কথা নয়, কথা হলো প্রতিমূর্তি নিয়ে। আপনি কলাপাতায় ভাত খেলেন অথবা---

জনপ্রতি: দাঁড়ান দাঁড়ান! কী বুইললেন? কলাপাতা! কলাপাতায় ভাত খাব কেনে? কলাপাতায় ভাত খ্যাতো একসময় আমার বাপ-দাদা। আমি খাই না। আমি তো লেতা।

গণমাধ্যম : ওটা আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছিলাম। ধরুন আপনি কলাপাতায় ভাত খেলেন অথবা সিরামিক প্লেটে ভাত খেলেন, আসল কথা হলো ভাতই তো খেলেন? নাকি অন্য কিছু খেলেন?

জনপ্রতি: আরে অ্যাতোক্ষণ তো ভাইবছিলাম খালি অভিধানের মইদ্দে সমেস্যা, এখন তো দেইখছি সমেস্যা আপনার মইদ্দেও! আচ্ছা এই জ্ঞান লিয়া আপনে সম্বাদিকতা কইরছেন কী কইরা? কাগজ আর পাথর---- ইস---ওরে বাবারে---

হঠাৎ একপাশ থেকে একটা পাথরের টুকরোর ঢিল জনপ্রতিনিধির কপালে লাগে।

গণমাধ্যম : কী হলো? কে, কে ওখানে? না, দৌড়ে পালিয়ে গেল!

জনপ্রতি: পাথর। পাথরের টুকরো দিয়ে ঢিল মাইরেছে রে বাবা!

গণমাধ্যম : কী সাংঘাতিক! এ তো কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি চলুন! এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়!

জনপ্রতি: বুইললাম না, পাথর আর কাগজ এক লয়। দেখলেন তো পাথরের শক্তি!

গণমাধ্যম : হ্যাঁ, পাথরের শক্তি বেশি বলেই পাথরের তৈরি ভাস্কর্যটা যাতে বেশি দিন না টেকে সেজন্য ওটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চলুন তাড়াতাড়ি!

জনপ্রতি: পাথরের ঢিল ছুইরা মাইরা ফেইললো রে বাবা।

দ্রুত স্থান ত্যাগ করে দুজন। প্রবেশ করে এক ও দুই।

দুই : কী দেখলেন? আপনি কি বলতে চান এই জনপ্রতিনিধি লোকটা আমার দলের?

এক : হতে পারে আমার দলের। আপনারা তো নিজেদের লোককে অন্য দলে ঠেলে দিয়ে এভাবে ছুরি মারার কৌশলটাই নিয়েছেন।

দুই : আমি আগেই বলেছি, সুযোগ পেলে আমরা ছাড়ব কেন। কিন্তু আমার লোককে আপনার দলে টেনে নেওয়ার দায়টা কি আমার ওপর বর্তায়?

এক : মোটেই না। শুনুন, নবাব সিরাজ দৌলার সিপাহসালার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি ছিল মীর জাফর, খোন্দকার মোশতাক ছিল বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, যুগে যুগে এই ঘরশত্রু বিভীষণেরা বেইমানি করেছে, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র কখনই সফল হয় নাই (কথা বলতে বলতে এক বেদির ওপর উঠে দাঁড়ায়)। যারা দেশ ও মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, দেশকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডোবাতে চায় যারা, যে চক্রান্তকারীরা বিদেশি শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না, যারা দুর্নীতি করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে, তারা যে দল বা যে ব্যবস্থারই প্রতিনিধি হোক না কেন, তাদের পরিচয় একটাই, তারা হলো খলনায়ক। মনে রাখবেন, অন্ধকার কখনো সত্যর আলোকে নিভিয়ে দিতে পারে না। আমি বিন্দুমাত্র হতাশ নই, কেননা আমি অন্ধকারের মধ্যে বারুদের স্ফুলিঙ্গটাও দেখেছি। ওই যে ওই কিশোরটি, যাকে আপনি ষড়যন্ত্রকারী বলে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই কিশোর কিন্তু সময়ের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র পিছপা হয়নি। শুভশক্তির মধ্যে ডুব মেরে থাকা অশুভ শক্তিকে আঘাত করে প্রমাণ করেছে দেশের স্বার্থে সে সদা জাগ্রত। আর ওই কিশোর তো একা নয়, সে আজকের শত-সহস্র কিশোর-যুবকের যোগ্য প্রতিনিধি। এই যোগ্য প্রতিনিধিরাই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজকের এবং আগামীর নায়ক। মনে রাখবেন, খলনায়কেরা কখনই প্রকৃত নায়কদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

জেবিসির ৫০ বছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রের কল্যাণে
জণগণের পাশে সবসময়
জেবিসি

জেবিসির পলিসি নিন
নিজে সুরক্ষিত থাকুন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখুন

আপনি আপনার বীমা পলিসির প্রিমিয়াম অগ্রণী ব্যাংক, ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সকল শাখায়, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (রকেট, নগদ, বিকাশ) এর মাধ্যমে সহজেই জমা দিতে পারেন।

জীবন বীমা কর্পোরেশন
একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয় ঃ ২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
Email : info@jbc.gov.bd, Web : www.jbc.gov.bd

১৯৭৩ সন থেকে গ্রাহক সেবা ও ভাইয়ান

বিপণনের ‘হালাল’ নায়ক সৈয়দ আলমগীরের মুখোমুখি

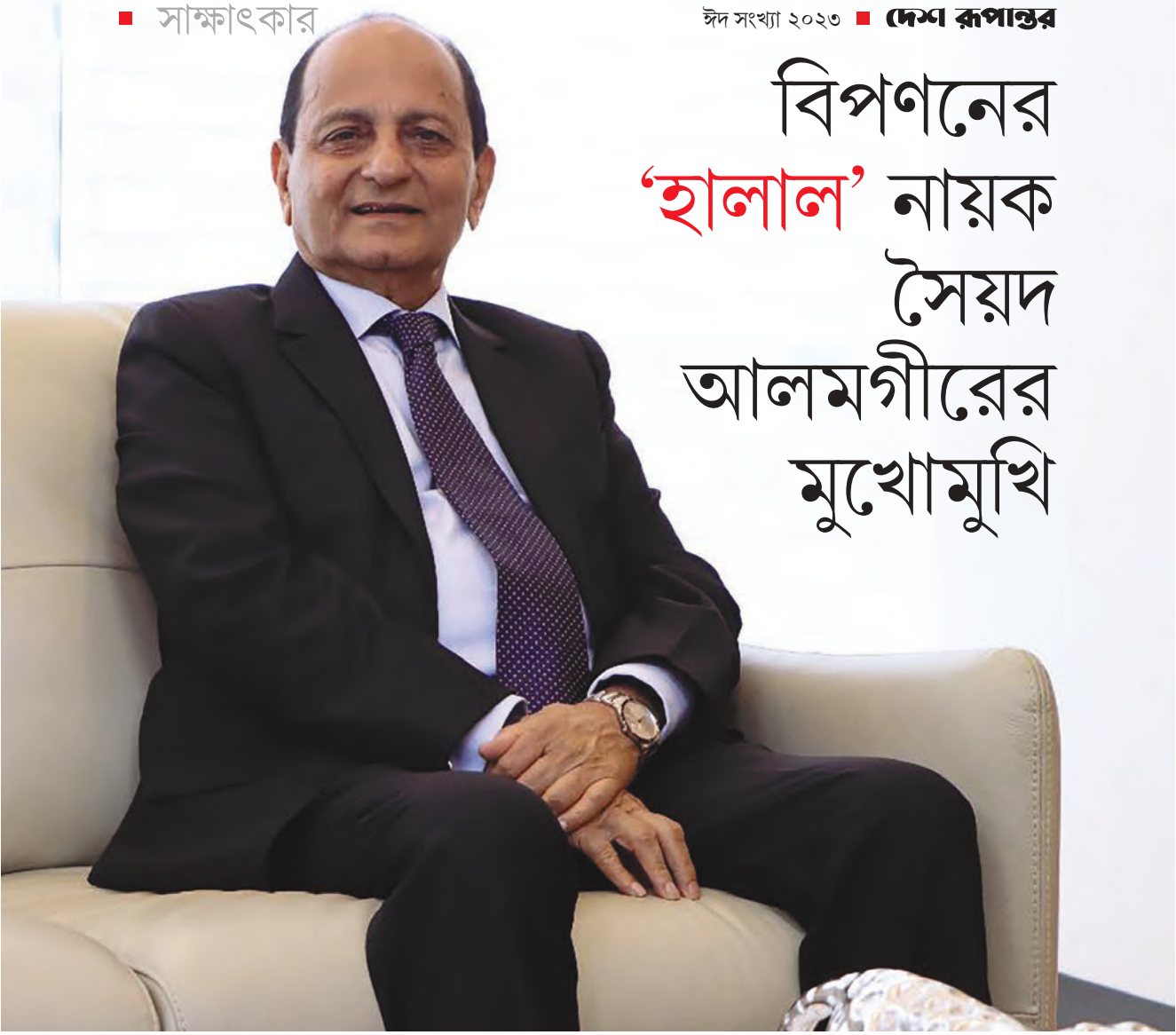

নতুন একটি সাবান বাজারের জনপ্রিয় সব ব্র্যান্ডকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল। সব ব্র্যান্ডের সাবানের বিক্রি নেমে গিয়েছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। নতুন সেই সাবান এক নম্বরে উঠে এলো শুধু একটি ট্যাগলাইন বা স্লোগানের বদৌলতে। সেই স্লোগানটি ছিল ‘শতভাগ হালাল সাবান’। গোসলে সাবান লাগে, তাতে খাওয়ার বিষয় নেই, কিন্তু বাঙালিকে হালাল সাবানে গোসল করার কথা মাথায় ঢুকিয়ে সাবানের বাজার দখল করে ফেলার এ অভিনব মার্কেটিং আইডিয়া এসেছিল যারা মাথা থেকে, তিনি সৈয়দ আলমগীর। সেই আলোচিত বিপণন-ঘটনা এখন পড়ানো হয় বিপণন শিক্ষার্থীদের, বিখ্যাত বিপণন লেখক ফিলিপ কটলার তার বইয়ে ব্যবহার করেছেন সৈয়দ আলমগীরের এই ‘হালাল সাবান কেস’। বাংলাদেশের বিপণন জগতের এই সুপারস্টার সৈয়দ আলমগীর তার বিপণন জীবনে শুরু করেছেন এক নতুন যাত্রা। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। এর আগে তিনি আকিজ ভেঞ্চার্সের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালে চ্যানেল আই এবং বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম তাকে ‘মার্কেটিং সুপারস্টার’ খেতাব দেয়। দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার পাওয়া এই বিপণন ব্যক্তিত্ব ইউনিসেফের প্রাইভেট সেক্টর অ্যাডভাইজরি বোর্ডেরও সদস্য। ১ এপ্রিল ২০২৩ সন্ধ্যায় উত্তরায় বরেণ্য এ মার্কেটিং সুপারস্টারের বাসায় তার মুখোমুখি হয়েছেন দেশ রূপান্তরের হেড অব ইভেন্টস অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং **শিমুল সালাহ্উদ্দিন**

শিমুল সালাহ্উদ্দিন : অভিনন্দন আপনাকে। শুভেচ্ছা সবার আগে, দেশ রূপান্তরের পক্ষ থেকে। আমরা আপনার জীবনের গল্প শুনতে এসেছি। একটা বিস্তারিত পরিসরে আপনাকে ধরতে চেষ্টা করব, যাতে এরপর যারা বিপণনে কাজ করতে আসেন, তাদের সামনে একটা উদাহরণ হিসেবে থাকে এই আলাপটা। আপনার স্ট্রাগলটা যেন তারা জানে, সে সঙ্গে আপনার ডেডিকেশন এবং সাধনার গল্প যেন তারা জানে। আপনার শৈশবের কথা পড়ে মনে পড়ে? আপনার পরিবারে কে কে ছিল, বাবা-মা কী করতেন? আপনার শৈশব কোথায় কেটেছে?

সৈয়দ আলমগীর : একদম, আমার সবই মনে আছে। আমি জন্মেছি ভৈরবে, আমার আব্বা সেখানে চাকরি করতেন। ভৈরবের কোনো স্মৃতি আমার মনে নেই। আমি বেড়ে উঠেছি কেন্দুয়াতে। নেত্রকোনার কেন্দুয়া। ওখানে আমার অনেক স্মৃতি। আমাদের অনেক বড় পরিবার ছিল। আমার আব্বা-আম্মা ছিলেন, আমার ভাইবোন ছিল। নিজেরাই অনেক বড় একটা পরিবার দ্বারা পরিবৃত ছিলাম আমরা। এ জন্য নিয়ন্ত্রিত একটা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই আমার আছে। আমার বড় তিন ভাই, দুই বোন এবং আমরা মোট তেরো ভাইবোন।

তেরো ভাইবোন! আপনি কত নম্বর ছিলেন?

আমি ছিলাম ছয় নম্বরে। আমার ছোট দুই ভাই আর পাঁচ বোন আছে। আমরা সবাই একত্রে বড় হয়েছি। আমার ভাইদের সঙ্গে বয়সে অনেক ডিফারেন্স আছে, কারণ আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার এক বড় ভাই ডাক্তার হয়ে গেছেন অলরেডি। আমার সব থেকে বড় ভাই তিনি। আমরা সব ভাইবোনই উচ্চ শিক্ষিত। আমার আব্বার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল এবং এ জন্যই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

বড় ভাই ডাক্তার হয়ে গেলে ছোটদের ওপর একটা প্রেশার থাকে। এমন প্রেশার কি ছিল আপনাদের?

হ্যাঁ, তা তো ছিলই। আব্বা ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ছিলেন না। তার ছেলেমেয়েদের সবসময় ফার্স্ট হতে হবে। বিভিন্ন ক্লাসে বৃত্তি পাওয়া ও নানান কিছু পারা সবসময় তার চাওয়ার ভেতরে ছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা তার চাওয়ার মতো করেই বড় হতে পেরেছি।

বাবার হাতে মার খেয়েছিলেন কখনো?

না, খাইনি। কারণ আমি কখনো সেকেন্ড হইনি। আমি অলওয়েজ ফার্স্ট বয়। আমার আব্বা অন্যদের তুই করে বলতেন, আমাকে তুমি করে বলতেন। আমার আম্মা আব্বাকে বলতেন, এই ছেলেটা কি আপনার না! একে তুমি করে বলেন কেন!

হা হা হা

আব্বা আম্মাকে বলতেন, একে তুই করে বলার কোনো কারণ ঘটে নাই। প্রথমে কেউ যদি কোনো কারণ ঘটায় তখন আব্বা বলতেন, তুই, তোরে পিটামু। এরপর ওই যে তুই শুরু হলো তারপর তুই চলে। আমার বেলায় তুইটা শুরুই হয়নি। এই কারণে মাইর-টাইর আমাকে খেতে হয়নি।

দারুণ। তার মানে কেন্দুয়াতে আপনার শৈশব কেটেছে। নেত্রকোনার জল, হাওয়া এবং সেটা খুব মরমি একটা এলাকা। আমাদের হুমায়ূন আহমেদের মতো বড় সাহিত্যিক সেখান থেকে এসেছেন। কেন্দুয়া তার বাড়ি। নির্মলেন্দু গুণের বাড়িও নেত্রকোনা।
হ্যাঁ। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের বাড়িও আমার বাড়ির কাছে। আমাদের তিনজনের বাড়ি দুই কিলোমিটারের ভেতরে। হুমায়ূন আহমেদও আমার নিকটাত্মীয় ছিলেন।

ছেলেবেলায় আপনি কী হতে চেয়েছিলেন?
ছেলেবেলায় আমি চেয়েছিলাম যে একজন সিভিল সার্ভেন্ট হবো। তখন তো পাকিস্তান ছিল। সিভিল সার্ভেন্ট অব পাকিস্তান। ২২-২৩ বছর বয়সে একটা জেলার এসডিও। এটাই আমার ইচ্ছা ছিল। আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম আমার ভাইদের, আমার ভগ্নিপতিদের, তখন তারা বলত, তুমি অনেক আউট নলেজ পড়। অনেক সাধারণ জ্ঞান, পড়ার বাইরে অনেক জ্ঞান রাখতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করতাম কীভাবে শিখতে হবে! তারা বলত, প্রথমত সংবাদপত্র। সে সময় মর্নিং নিউজ ছিল, দৈনিক পাকিস্তান ছিল আমাদের ঢাকার বাসায়। আমি এসএসসির পর থেকে ঢাকাতে আছি।

আচ্ছা। আপনার বড় ভাই একজন ডাক্তার, তা থেকে শুরু করে পরিবারের সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, বাবা খুবই শিক্ষাব্রতী ছিলেন।
আমার বাবা ১৯১৯ সালে এনট্রান্স পাস করেছিলেন।

বাহ্, ১৯১৯ সালে, বিশাল ব্যাপার। আপনি বলছিলেন আপনার ভাইবোনসহ বৃহত্তর পরিবার আপনাদের। হুমায়ূন আহমেদ আপনার নিকট আত্মীয় ছিলেন। এর মধ্যে আপনার জীবনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই। তার নাম ছিল সৈয়দ বদরুদ্দিন। উনি আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করতেন। অনেক আদর্শবান ছিলেন তিনি। উনি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান, সাকসেসফুল পার্সন, তো তিনি আমাকে গাইড করতেন। এসএসসি পাস করার পর উনি আমাকে কিশোরগঞ্জে ভর্তি করাতে পারতেন, নেত্রকোনায় পড়াতে পারতেন, কিংবা ময়মনসিংহে পড়াতে পারতেন। উনি নিজেও পড়েছেন ময়মনসিংহে, আনন্দমোহন কলেজে। কিন্তু আমাকে নিয়ে এসেছেন ঢাকাতে। বলেছেন, ঢাকাতে পড়ো। ঢাকায় পড়লে শিক্ষা হবে, অনেক কিছু জানতে পারবে। রাজধানীতে এসে পড়ার কারণে আমার চক্ষুজ্ঞান খুলে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি ভর্তি হলেন কত সালে?
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আরও পরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই ধরেন ১৯৬৯-এ ভর্তি হয়েছি।

মানে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান চলতেছে তখন। সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন ছিল আপনার মনে আছে?
খুবই মনে আছে। খুব সুন্দর ছিল, খুবই ডিসিপ্লিন ছিল। ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু এ রকম মারামারি ছিল না। আপনি জানেন যে, সে সময় এক্সট্রা অস্ত্র ছিল না। কারও বৈধ অস্ত্র থাকলেও সেটা থানায় গিয়ে দেখাতে হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুত্ব কাদের সঙ্গে হলো আপনার?
অনেকের সঙ্গেই। আমি খুব বন্ধুবাৎসল ছিলাম।

তারা কি আড্ডার বন্ধু? খেলাধুলার বন্ধু নাকি পড়াশোনার বন্ধু?
পড়াশোনার বন্ধু। আড্ডার বন্ধু ছিল সীমিত। খেলার বন্ধুও সীমিত।

আলমগীর ভাই, আপনি দুর্দান্ত সব নতুন ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন। অ্যারোমেটিক হালাল সাবান, এসিআই সল্ট, স্যাভলন। একটা ব্র্যান্ড গড়ে তোলার পেছনে আপনার সিক্রেটটা কী আসলে? মানে একটা সাকসেসফুল ব্র্যান্ডের পেছনে আপনার ম্যাজিকটা কী?
যে প্রডাক্টটার নামটা আপনি দিলেন, ধরেন অ্যারোমেটিক দিলেন, একশ ভাগ হালাল সাবান দিলেন। হালাল সাবানটা কেন দিলেন, কেন আপনার মাথায় এলো, এইটাই হলো আপনার আল্লাহ্ প্রদত্ত অথবা নিজস্ব চিন্তা। ধরেন, আমি বললাম এসিআই লবণ মেধা বিকাশে সাহায্য করে। এইটাই হলো ট্যাগ লাইন। আমরা মেধাবী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। মেধাবী কেন বলতে পারি, অন্যরা সেটা কেন বলতে পারে না। আপনি কেন পারেন সেটা আপনি জানেন। আমি কেন বলতে পারি তা আমি জানি। আমি এখন একটা কোম্পানিতে জয়েন করেছি। এদের একটা প্রডাক্ট আছে, নাম গিয়ার। ওরা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দিয়েছে। আমি বললাম যে, এইটা বলো, গিয়ারে থাকুন গিয়ার খান। অথবা, একটা ছেলে দুষ্টামি করছে। তাকে বললাম গিয়ারে আছ যে? সে বলছে, গিয়ার খাচ্ছি, তাই গিয়ারে। সিম্পল, পুরো বিষয়টাই এ রকম।

দারুণ। এই যে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস খুব সিম্পল, সহজ, কমিউনিকেশনটা কি আসল এখানে?
হ্যাঁ, কমিউনিকেশন তো সবচেয়ে সহজ করতে হয়।

অ্যারোমেটিক দিলেন, একশ ভাগ হালাল সাবান দিলেন। হালাল সাবানটা কেন দিলেন, কেন আপনার মাথায় এলো, এইটাই হলো আপনার আল্লাহ্ প্রদত্ত অথবা নিজস্ব চিন্তা। ধরেন, আমি বললাম এসিআই লবণ মেধা বিকাশে সাহায্য করে। এইটাই হলো ট্যাগ লাইন। আমরা মেধাবী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। মেধাবী কেন বলতে পারি, অন্যরা সেটা কেন বলতে পারে না। আপনি কেন পারেন সেটা আপনি জানেন। আমি কেন বলতে পারি তা আমি জানি

আপনার হালাল সাবানে হালালটা তো এসেছে ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে। ধর্মকে মার্কেটিংয়ে ব্যবহার করা– এ প্রশ্নটা আপনাকে কেউ করেছে?
হ্যাঁ, অনেকে করেছে। কিন্তু ধর্মকে তো আমি আনি নাই। আমি বলেছি কোনটা হালাল কোনটা হারাম। হুজুররা তো সবসময় বলছেন, হালাল পথে চলেন, হালাল রুজি খান। এটা কি ধর্মীয় পথে তারা ব্যবহার করতেছেন?

আমি বলতে চাচ্ছি ধর্মভীরু বাঙালিকে...
আরে কী বলেন, ধর্মভীরু না। পুরো ওয়ার্ল্ডে, যেমন জাপানে গিয়েছিলাম সেদিন, প্রত্যেকটা খাবারে লেখা আছে হালাল ফুড, নন হালাল ফুড। এটা মোটেও ধর্মভীরুতা না। বলতে চাচ্ছে আপনাকে, একজন যাতে শূকরের মাংস না খান এ জন্য বলতেছে নন হালাল। এটা যদি ধর্মভীরু হয়, তবুও ভালো। কারণ, আমাদের ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ শূকরের মাংস। সে জায়গায় আমি তো একটা ভালো কাজ করলাম।

স্পেশালি এই ইন্টারভিউটা যে কারণে নেওয়া হচ্ছে, অ্যারোমেটিক হালাল সাবানের যে কেস, ইটস এ বিগ কেস। বিশাল একটা ব্যাপার, এটা ধরেন সারা দুনিয়াতে যেমন পড়ানো হচ্ছে, আমাদের এখানেও এটা আশ্চর্য ব্যাপার। সেই সময় অন্যান্য সাবানের বিক্রি শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।
এখন তো হালাল সব জায়গায়। খাবারে, প্রায় সব ধরনের খাবারে

হালাল লেখা হচ্ছে।

এর আগে তো এ রকম ছিল না?
না, না। কখনোই ছিল না। আমি এটা করার পরে, এখন সৌদি আরবে যে এক্সপোর্ট হয়, কুয়েতে বা কাতারে তাতে মাস্ট লেখা হয় ১০০% হালাল। এবং আপনি দেখবেন, আরবিতে লেখা থাকে, হালাল। প্রত্যেকটা প্রডাক্টে এটা লেখা হয়, যা আগে ম্যান্ডেটরি ছিল না।

একদম, এই বদলটা আপনি এনেছেন। আলমগীর ভাই, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, হালাল সাবান ছাড়াও এসিআই সল্টের আইডিয়াটা আপনি দিয়েছেন।
অনেক। বহু আইডিয়া আমি দিয়েছি। এই যেমন, আজকেও একটা আইডিয়া আমি দিয়েছি। গিয়ারে থাকো, গিয়ার খাও। আবার বললাম আকিজে, ফ্রুটস মানে ফ্রুটিকা। আগে কী বলত? ফ্রুটিকা খাবেন, সত্য কথা বলবেন। এসব ফাউল টক। এখন ফ্রুটিকা ভালো চলছে। ফ্রুটস মানে ফ্রুটিকা। এখন আর হাসাহাসি হচ্ছে না। আগে হাসাহাসি হতো।

এই যে মজা, ফান না কিন্তু মজা। ফ্রুটস মানে ফ্রুটিকা। আপনি এ রকম আশ্চর্য সব ট্যাগ লাইন দেন। আপনি কাদের ট্যাগ লাইনে, কোন ট্যাগ লাইনে মুগ্ধ হন?
আমি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হই ক্যাটবেরি এবং আরেকটা হলো ফেবিকল আঠা। কী হইছে, মুরগি ডিম পাড়ছে কিন্তু তার ডিম হইছে শক্ত, কারণ সেই মুরগি ফেবিকল আঠা খাইছে।

এখন তো আমি ফ্রেশ-এ আছি।

কেন ফ্রেশ, এটা জানতে চাচ্ছি।
আমি আকিজে খুব ভালো ছিলাম। তারা খুব ভালো মানুষ। আমি সুদীর্ঘকাল এসিআইতে কাজ করেছি। তারপর ভাবলাম, একটা চেঞ্জ নেই। আকিজে আসলাম। আকিজে দুই বছর কাজ করেছি। আকিজের অনেক কিছু পরিবর্তন করেছি। যখন ফ্রেশ থেকে আমি অফার পেলাম, তখন ভাবলাম যে এটা আরও ভালো হবে। কারণ, ফ্রেশ ইজ এ মাচ বিগার কোম্পানি। ফ্রেশের যে চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, উনি অনেক বড়মাপের মানুষ। উনি ছোটখাটো একটা অর্গানাইজেশনকে আজকে এত বড় মহিরুহ করেছেন। আপনার হয়তো আইডিয়া নেই ফ্রেশ সম্পর্কে, আমাদের অনেকের আইডিয়া নেই। ওনার জাহাজ আছে ১০০টার মতো। ওনার এখনো ৬০-৭০টা রানিং ফ্যাক্টরি আছে। উনার কাছে অনেক শেখার আছে। আমি উনাকে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করছি।

অসামান্য। আমি যেটা জানতে চাই, এফএমসি বা ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস-এ আপনি একজন বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের এই সেক্টরটা কেমন হবে বলে আপনি প্রেডিক্ট করেন?
অনেক বড় হবে। কারণ এখনো আমাদের বাংলাদেশের মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতেছে। কোথায় একটু চাল পাবে, ডাল পাবে, চিনি পাবে। যখন আমাদের ইকোনমিটা স্টাবল হবে এবং মানুষের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ হবে ব্যয় করার তখনই তারা ব্যয় করবে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখনো স্মল পার্সেন্টেজ অব পিপল আমাদের প্রডাক্টগুলো ব্যবহার করতে

> আমি আপনাকে একটা মার্সিডিজ গাড়ি কিনে দেব, গাড়িটা রক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আপনি যদি সেটা রক্ষণ না করে ট্রাকের সঙ্গে লাগিয়ে দেন তাহলে মার্সিডিজ তিন কোটি না পাঁচ কোটি দিয়ে কিনছেন সেটা বিষয় না। আমি চলে আসছি, সেটা রক্ষণাবেক্ষণের দরকার ছিল। এটা ডায়নামিক। এটা আরও সুন্দর করা লাগত, প্যাকটা সুন্দর করা লাগত, হালালটা একটু অন্যভাবে রাখতে হতো। এসব ঠিকমতো করতে না পারার কারণে বিক্রিটা একটু কমে গেছে

আমি অন্য একটি প্রসঙ্গে যাই। অ্যারোমেটিক হালাল সাবান, কিন্তু স্থায়ী হলো না। স্থায়িত্ব পেল না। এর কারণ কী?
খুব ভালো স্থায়ী হয়েছে। পাঁচ বছরে কোটি কোটি, শত শত হাজার টাকা ইনকাম করেছে। আমি আপনাকে একটা মার্সিডিজ গাড়ি কিনে দেব, গাড়িটা রক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আপনি যদি সেটা রক্ষণ না করে ট্রাকের সঙ্গে লাগিয়ে দেন তাহলে মার্সিডিজ তিন কোটি না পাঁচ কোটি দিয়ে কিনছেন সেটা বিষয় না। আমি চলে আসছি, সেটা রক্ষণাবেক্ষণের দরকার ছিল। এটা ডায়নামিক। এটা আরও সুন্দর করা লাগত, প্যাকটা সুন্দর করা লাগত, হালালটা একটু অন্যভাবে রাখতে হতো। এসব ঠিকমতো করতে না পারার কারণে বিক্রিটা একটু কমে গেছে।

হালাল সাবানের যে আইডিয়া এটা আপনি জেনারেট করেছিলেন কীভাবে? আপনার কি ওই মোমেন্টটা মনে আছে, যখন আপনি আইডিয়াটা পাইলেন।
এটা একদম আমার মাথা থেকে আসছে। সবাই আমাকে না করছিল যে, দিও না। ইংল্যান্ডে আমি তখন ছিলাম। একটা খাবার দোকানে খাচ্ছিলাম। বাঙালি খাবারের দোকান। তো সেখানে লেখা, বিফ, ১০০% হালাল। ভাবলাম, বিফ তো হালালই। ১০০% কেন! পরে আমি ডাকলাম দোকানের লোককে। জানলাম কীভাবে জবাই করা হয়েছে। সে সময় মনে হলো, সাবানটাতে তো গরু অথবা শূকরের চর্বি নেই। তো আমি এটাকে ১০০ ভাগ হালাল করে দেই।

দুর্দান্ত। দীর্ঘ সময় আপনি কাজ করছেন এই সেক্টরে। এখন নিজের প্যাশন নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?
পারে। বাংলাদেশের বহু লোক গরিব আছে, দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে অনেকে। এটা আর থাকবে না। আস্তে আস্তে বিশ্ব রাজনীতি বা করোনার কারণে সরকার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারছে না। কিন্তু এটা তো থাকবে না। আমাদের দেশে একটা বড় কনজিউমার মার্কেট আছে। আমি মনে করি এটা অনেক ভালো দিক।

পৃথিবীর তুলনায় বলছি না, আমাদের আশপাশের দেশের কথা বলছি। সে তুলনায় আমাদের এফএমসি মার্কেটিংটা কোথায় কোথায় আছে?
অনেক ছোট আকারে আছে। ইন্ডিয়াতে অনেক বড় হয়ে গেছে, সেই তুলনায় আমাদেরটা অনেক ছোট। ইন্ডিয়ার ইকোনমি বেটার দ্যান আস, কারণ তাদের টাকার মূল্য অনেক। তারা কত টাকা দিয়ে ডলার কেনে, আমরা কত টাকা দিয়ে ডলার কিনি!

করণীয় কী?
ইকোনমিটা ভালো হতে হয়।

সরকারের ভূমিকা কী আছে এখানে?
সরকারের তো অনেক ভূমিকা আছে। দুর্ভিক্ষ দূর করা, মানুষকে কাজে লাগানো, সবই তো সরকারের কাজ।

এখন একটা বিষয় এসেছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এআইর উত্থান যে হচ্ছে, এটিকে যদি আপনি মাথায় নেন তাহলে বিপণন বিভাগটা কেমন হবে?
আমাদের এখানে এটা আসতে দেরি আছে।

ভবিষ্যতে যে পেশাজীবীরা বিপণনে আসবেন তাদের মধ্যে আপনি কোন গুণাবলিগুলো দেখতে চান?
প্রথমত, তাদের মধ্যে অনেক ধৈর্য থাকতে হবে। মানুষকে জানার অনেক ইচ্ছা থাকতে হবে। মার্কেটিং আসলে কী? মার্কেটিং হলো মানুষের নিড বোঝা। এটা খুঁজে বের করে আপনার প্রপোজ করা। অথ বা বর্তমানে আপনার যা আছে তাকে আরও কী কীভাবে ডেভেলপ করা যায়। এই যেমন, লবণ। মানুষ কি আগে লবণ খেত না? যখন বললাম ক্লিন লবণ, সম্পূর্ণ ময়লা মুক্ত, সঠিক মাত্রায় আয়োডিন যুক্ত এবং ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ, তখন সবাই ভাববে অ্যা, এতদিন কী খাইলাম! আগে কী ছিল, চিনি আমরা ঠোঙ্গায় খাইতাম। কোনো এক ভদ্রলোক চিন্তা করছে যে, এটাকে পলিথিন দিয়ে প্যাঁচানো দরকার। আরেক ভদ্রলোক ভাবছে আমি তো পলিথিন দেবই, সঙ্গে বড় করে আমার নামটাও দেই। এভাবেই তো বিবর্তন আসে।

দারুণ। আপনাকে আমাদের মার্কেটিং সুপারস্টার বলা হয়। আপনার মতো নেতা হতে হলে কী কী করতে হবে? কোন গুণাবলি লাগবে?
আমি এত গুণাবলির অধিকারী না। আমার থট প্রসেস বুদ্ধিমান। একটা জিনিস দেখলে আমি বলে দিতে পারি। এটা আমাকে কোনো ইউনিভার্সিটি শেখায়নি। নিজস্ব কিছু বুদ্ধিমত্তা তো আল্লাহ্‌পাক দিয়েই দেন। আমি যেটা করেছি তা হলো, বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এখনো আমি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াই। লোকদের প্রয়োজনটা বোঝার চেষ্টা করি।

বাংলাদেশের অনেক ব্র্যান্ড আছে, নতুন ব্র্যান্ড, ধরেন কালকে থেকে আমি শুরু করতে চাই এবং তৈরি করতে চাই, মানে ব্র্যান্ডটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে করণীয় কী আসলে?
ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে নাইস ব্র্যান্ডিং লাগবে। সিম্পল। সো, আপনাকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। কী বললে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলবে সেটা বলতে হবে।

যা বললে মানুষের দীর্ঘদিন মনে থাকবে তা করতে হবে তাহলে।
না, মনে থাকুক যতটুকুই, দীর্ঘদিন তো মনে থাকার দরকার নেই। আমার তো বিশ বছর পর মনে রাখার দরকার নেই। এখন মনে রাখলেই চলবে। হঠাৎ করে হালাল সাবানের মতো কিছু এলে তখন দেখবেন আপনি দীর্ঘদিন মনে রাখতেছেন।

সামনে তো ঈদ। ঈদ নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সেটা হলো যে, আপনার ঈদ কেমন কাটে আসলে?
আমার ঈদ খুব ভালো কাটে। আমার দুটি জায়গা। একটা আমার অফিস আরেকটা আমার পরিবার। এই আমার ঈদ। আমার মেয়েরা বিদেশ থেকে এসে গেছে। আমার তিন মেয়ে। এক মেয়ে দেশে আছে, দুই মেয়ে বিদেশে। তারা ঈদ করার জন্য দেশে আসে। আমার তো ছেলে নেই, ওরা মনে করে আব্বার ছেলে নেই, আমরাই তো ছেলে, যাই আব্বার সঙ্গে ঈদ করে আসি। ভাইবোন অনেক আছে। ভাইবোনদের সঙ্গে ঈদ কাটে। তারা আসে, আমরা যাই। আমার বড় বোন আল্লাহর রহমতে এখনো বেঁচে আছেন। তাকে সালাম করতে যাই। এটাই হলো আমার সুন্দর ঈদ।

আপনার প্রিয় খাবার কী?
মাছের মধ্যে আমি কৈ মাছ খুব পছন্দ করি। শিং, মাগুর পছন্দ করি। ইলিশ মাছ পছন্দ করি। মাংসের মধ্যে মাটন। বিফ খুব একটা পছন্দ করি না।

আপনার প্রিয় মানুষের তালিকায় কে কে আছেন?
পরিবারের মধ্যে আমার বড় বোন। আমার যে ভাই মারা গেলেন তিনি আমার অসম্ভব প্রিয়। আমার মা, আমার বাচ্চারা। আমার ভাইবোনরা অনেক প্রিয় আমার কাছে।

আপনার একাডেমিক, প্রফেশনে কেউ কি প্রিয় আছেন?
আমার বসরা, যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তাদের আমার খুবই ভালো লাগে। তারা আমার খুব প্রিয়। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, আমার এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যানকে। তিনি আমাকে অনেক আদর করেছেন। তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তিনি তো একজন মহিরুহ। তার ছেলে আসাফউদদৌলা অনেক ভদ্রমানুষ। তার কথা স্মরণ করি। বর্তমানে আমার যিনি বস আছেন, উনি হাইলি নাইস বিহ্যাভ পারসন। একটা মানুষ শূন্য থেকে এত বড় জায়গায় এসেছেন, তার কত কত গুণাবলি আছে ভাবেন। এ ছাড়া আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি প্রয়াত নুরুল ইসলাম বাবুল, যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান। উনি আমাকে অনেক আদর করেছেন। উনার পেগাসাস, অ্যারোমেটিক হালাল সাবান, আরও কত কিছু। উনি যদি আমাকে স্বাধীনতা না দিতেন তাহলে কি আমি হালাল সাবান করতে পারতাম, এত সুনাম করতে পারতাম!

অসামান্য আলমগীর ভাই। আপনার জীবনের যে প্রাপ্তিগুলো, অনেক ভালোবাসা, প্রচুর মার্কেটিয়ার অনুজ তৈরি হওয়া এসব তো আছেই। বড় প্রাপ্তিগুলোকে কী মনে করেন আপনি?
আমার জীবনের প্রাপ্তির কথা যদি বলেন তাহলে একটা কথাই আমি বলব, আল্লাহর কাছে আমি যা চেয়েছিলাম আর আল্লাহ আমাকে যা দিছেন তার মধ্যে অনেক ফাঁক। আমি অতটুকু চাইওনি, আল্লাহ আমাকে যা দিছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আমার মনে ক্ষুধা নেই। এটাই ক্ষুধা আছে, আমি যেন মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারি, আরও ভালো ভালো প্রডাক্ট দিতে পারি। যারা আমাকে এমপ্লাই করে তাদের যেন অনেক হেল্প করতে পারি, ফোকাসিং দেওয়ার প্রডাক্ট নাইসলি। কনজিউমারদের কাছে যেন প্রডাক্ট দিতে পারি। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে, পাওয়ার অংশ চাওয়ার চাইতে অনেক বেশি। যার কারণে আমি শ্রদ্ধাভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

আলমগীর ভাই, আপনার জীবনের অপ্রাপ্তি কী কী আছে?
আমার জীবনে অপ্রাপ্তি এটাই যে, ভেবেছিলাম এ দেশের মানুষ উন্নত হবে।

মানসিক ভাবে?
না, অর্থনৈতিকভাবে। শিক্ষার উন্নতি হবে মানুষের। এগুলোর সঙ্গেই তো মানসিকতা জড়িত। জানি না আমার জীবদ্দশায় এটা দেখে যেতে পারব কি না। আমি ভাবতাম যে, এটলিস্ট বাংলাদেশের মানুষ খাওয়া, থাকা, পরা– এই তিনটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করবে না। তবেই না সুন্দর একটা দেশ হবে। আমি রাস্তা দিয়ে যখন একটা ভালো ড্রেস পরে যাই, তখন একটা অনেক দরিদ্র লোক দেখি, আমি ভাবি, উনি কেন এখনো কাঠ কাটতেছে, কাঠ তো মেশিন দিয়ে কাটতে পারে। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমটা মানুষ যে করে এটাতে খারাপ লাগে, অবশ্যই খারাপ লাগে।

আলমগীর ভাই, এ দেশ নিয়ে আপনার আশা কী?
আমার এটা আশা যে, মানুষ যেহেতু লেখাপড়া শিখছে, আর অর্থনৈতিক মন্দা যেটা আমরা ফেস করছি বিশ্বব্যাপী, সেটা করোনা হোক আর যুদ্ধের জন্য হোক, সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমাদের দেশ এবং আমাদের সরকার, আমরা উন্নতির দিকে যেতে পারব। যে লক্ষ্য আমাদের আছে তা আমরা অর্জন করতে পারব।

অবসরে কবে যাবেন? অবসরে গেলে আসলে কী করবেন?
অবসরে যাওয়াটা মনে হয় হবে না, যতক্ষণ না আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আমি যেদিন ভাবব যে, আমি কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারি না, কোনো কিছু স্মরণ করতে পারি না, তখন কারও বলতে হবে না, আমি তার আগেই অবসরে যাব। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব মানুষের জন্য কিছু রেখে যাওয়ার। সুন্দর কিছু রেখে যাওয়ার জন্য। এবং আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে মানুষের কাছে যেন গ্রহণযোগ্য করে যেতে পারি সেই চেষ্টা করব।

দারুণ। এই দেশ একজন মার্কেটিয়ার রাজনীতি নিয়ে কিছু ভাবে কী?
কোনো না কোনো দলকে তারা সাপোর্ট করে, কোনো না কোনো আইডলজি তারা মানে। এটা খারাপ কিছু না, ভালো তো। মানুষ তো একটা আইডলজিতে থাকে।

এই যে দীর্ঘ সময় ধরে আওয়ামী লীগ সরকার আছে, এটাকে আপনি আসলে কীভাবে দেখছেন? পজেটিভ দিক কোনোগুলো আর নেগেটিভ দিক কোনগুলো?
এটা সম্পর্কে আমি কোনো কমেন্টস করতে চাই না। কারণ এটার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। প্রত্যেক সরকারের যেমন সাকসেস থাকে তেমন তার ফেইলিউর থাকে। প্রত্যেক সরকারের ভালো দিক যেমন আছে তেমনি খারাপ দিক আছে। অতএব এটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।

নতুন যে প্রজন্ম আছে, তাদের মধ্যে ভোক্তা যেমন আছে, উদ্যোক্তা আছে, নানা রকম মানুষ আছে। তাদের জন্য আপনি কী কী বলবেন?
ভোক্তাদের জন্য আমি এটি বলব, আপনার কষ্টের টাকায় আপনি বাজার করেন। আমি যখন স্বপ্ন দেখতাম, যখন স্বপ্নের চার্জে ছিলাম, তখন আমি একটা স্লোগান দিয়েছিলাম, 'কষ্টের টাকার শ্রেষ্ঠ বাজার'। তো, আপনার কষ্টের টাকা, আপনি ভোক্তা, আপনাকে যেহেতু কেউ প্রেসক্রাইব করে না, তো কোন পোডাক্টটা ভালো, কোন কোম্পানিটা ভালো, কোন টেস্টটা ভালো সেটা আপনি দেখে নেবেন। তাতে করে আপনি ঠকবেন না। কোন কোম্পানি ওজনটা ঠিকমতো দেয়, চিনি বলে অন্য কিছু দেয় না, লবণ বলে এটার মধ্যে অন্য কিছু ঢুকিয়ে দেয় না বা মসলার মধ্যে গুঁড়া ঢুকিয়ে দেয় না– এসব দেখে নেবেন। দামটাও দেখে কিনবেন। যেটা আপনার কাছে মন্দ মনে হবে সেটা কিনবেন না, এটাই তার বড় শাস্তি। সে ভেজাল দিয়ে, বেচতে পারেনি। যারা ট্রেইনার আছেন তাদের বলি, আপনারাও মানুষকে ঠকাবেন না। মানুষকে ভালো প্রডাক্ট দেবেন, বলবেন যে এটার মধ্যে এই আছে ওটার মধ্যে ওই আছে। কোম্পানিগুলোর কাছে আমার অনুরোধ যে, আপনার কাছে যদি অর্থ না থাকে ছোট কিছু করেন। ছোট অর্থ দিয়ে বড় কিছু করার চেষ্টা করবেন না। ব্যাংক লোন নিয়ে ব্যাংককে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাহলে লং রানে ভালো কিছু করতে পারবেন।

আলমগীর ভাই, আপনার 'কষ্টের টাকায় শ্রেষ্ঠ বাজার' শুনে মনে হলো আপনি কি প্রচুর কবিতা পড়েন?
হ্যাঁ, কবিতা পড়ি।

আপনার প্রিয় কবি কে?
প্রিয় কবি তো অনেক আছেন। আমি সিনিয়র লোক, আমি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করব, আমি ইংরেজি কিছু কবিতা পছন্দ করি।

মার্কেটিংয়ে লিটারেচার কতটা জরুরি?
জরুরি আছে। সবকিছুই জরুরি। এই যেমন, আপনি এলেন, আমি একটু আগে সিরিয়াল দেখছিলাম। সিরিয়াল দেখে মেয়েরা, আমিও ওদের সঙ্গে দেখি। ওখানে আমার অনেক কিছু শেখার আছে।
আলমগীর ভাই, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

-শ্রুতিলিপি : **নাদিয়া জান্নাত**

আমার ধ্যানজ্ঞান সবই চলচ্চিত্রকে ঘিরে

ঢালিউডের ইতিহাসের অন্যতম সফল অভিনেতা এম এ আলমগীর। তিনিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নয় বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা। অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনা ও প্রযোজনাতেও সফল তিনি। দীর্ঘ অভিনয় ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছেন **আল মাসিদ**

‘আমার জন্মভূমি’ চলচ্চিত্রে অভিষেক আপনার। প্রথমদিনের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

২৪ জুন, ১৯৭২ সাল, আমার জীবনের প্রথম শুটিং হয় এফডিসিতেই। সন্ধ্যা সময় আমার কাজ ছিল। তার আগে মেকআপম্যান পারভেসি চরিত্র অনুযায়ী সাজিয়ে দিল। আয়নায় দেখি মলিন চেহারা, চুল উস্কোখুস্কো। সব ঠিক আছে কিন্তু চুল কেন এলোমেলো! তখন বললেন, আপনি একটি মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র করছেন, চরিত্র অনুযায়ী এটাই হবে গেটআপ। মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমার চুল নিয়ে ওসিডি আছে। সব সময় পরিপাটি থাকতেই হবে। রুনা (সহধর্মিণী রুনা লায়লা) বলে, আমি নাকি ঘুমের মধ্যেই চুল ঠিক আছে কিনা চেক করি! যা-ই হোক, শট দিতে ডাকা হলো। পরিচালক কিংবদন্তি আলমগীর কুমকুম। উনি প্রথম দিন শুটিং করলেন ‘আমার নিচে কমল মাটির ছোঁয়া’ গানটি নিয়ে। গেয়েছিলেন সাইফুল ইসলাম (জনপ্রিয় মডেল ও নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌয়ের বাবা)। এতে একজন নবাগত হিসেবে আমার সুবিধা হয়। কারণ গানের কথা, তাল, লয় আমার সব জানা ছিল। আর আমার যেহেতু গানবাজনার একটু-আধটু দখল ছিল, তাই কাজটি খুব সহজে করে ফেলেছিলাম।

১৯৭৩ চলচ্চিত্র দিয়ে আপনার চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছিল। তখন আর এখনকার চলচ্চিত্র নির্মাণকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আসলে নির্মাণ নিয়ে আমার কথা বলা সাজে না। আমি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছি ছয়-সাতটি। তখন কোনো খোঁজখবর নিতাম না, অফিসে বসতাম না, কুমকুম (আলমগীর কুমকুম) ভাই ডিরেকশন দিতেন, আর প্রয়োজক হিসেবে আমার নাম চলে যেত। আমি মূলত একজন অভিনেতা, আমি অভিনয় করি। চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটা খুব কঠিন। বহুদিন কাজ করার পর এটা বুঝেছি, এর শেষ পাওয়া যায় না। এর বিশালতা বা গভীরতা এত বিশাল যে, এক জনমে না, শত জনমেও এর শেষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। আর এ সময় তো আমি কাজ করছি না। বিরতি নিয়েছি। তাই এখনকার কথা বলতে পারব না। আমি আমাদের সেই স্বর্ণালি সময়ের কথা বলতে পারব।

আমাদের সময়, আমরা একটি ছবির গল্প নিয়ে প্রযোজক, পরিচালক, স্ক্রিপ্ট রাইটারসহ সবাই বসতাম। গল্প শুনতাম। আড্ডা মারতাম। গল্পটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করতাম। ভালো কস্টিউম নিয়ে ভাবতাম। এ রকম সবকিছু বুঝে নিয়ে তারপর নিজের সেরাটা

দেওয়ার চেষ্টা করতাম। চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটা খুব কঠিন। বহুদিন কাজ করার পর এটা বুঝেছি, এর শেষ পাওয়া যায় না।

আপনি চলচ্চিত্রের 'চিরসবুজ নায়ক'। কীভাবে এই ইমেজ তৈরি করেছিলেন?

আমি ইন্ডাস্ট্রিতে স্টার, মহানায়ক বা সুপারস্টার, কিংবদন্তি হতে আসিনি। আমি অভিনেতা হতে এসেছিলাম। আর ওই যে বললেন, চিরসবুজ। এটা আমি জেনেটিক্যালি পেয়েছি। মানে তরুণ থাকাটা। আমি হাঁটা ছাড়া কোনো শরীরচর্চা করিনি। জীবনে সাঁতারও কাটিনি। জেনেশুনে কোনো কিছু করিনি। বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর অন্যতম প্রযোজক ছিলেন আমার বাবা। ভীষণ শৌখিন মানুষ ছিলেন। সিল্কের কাপড় ছাড়া পরতেন না। সেসময় ঢাকায় নামকরা লন্ড্রি ছিল 'টিপটপ' । সেখানেই তার কাপড় ধোয়া হতো, বাড়িতে নিষেধ ছিল। ছোট করে বলতে গেলে আমার বাবা যা তার ৫ শতাংশ আমি। এর বেশি আর মেইনটেইন করতে পারা যায় না! সেখান থেকেই হয়তো এই ফিট থাকা, ফ্যাশন সেন্স কিংবা স্টাইল আমার মধ্যে এসেছে।

ষাটের দশক থেকে ৯০-এর দশকে আমাদের যে চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হতো সেগুলো পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে আমরা এখন ক্রমে পিছিয়ে পড়ছি। কারণটা কী বলে মনে হয় আপনার?

প্রথম কারণ আমি মনে করি, অশ্লীলতা। ৯০ শতাংশ দায়ী অশ্লীলতা। দর্শক হল থেকে বাড়ি চলে গেছে। মধ্যবিত্তরা আগে পুরো পরিবার নিয়ে ছবি দেখতে যেত। তারা কি ওই সব গালিগালাজ, অশ্লীল নাচ-গান, ওই সব দৃশ্য দেখতে যাবে? ওই দর্শক হলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে। এটার জন্য আমাদের প্রযোজকরা শুধু দায়ী– তা নন, হলমালিকরাও দায়ী। কারণ তখন তারা ওই সব ছবি ২০-২৫ হাজার টাকা বেশি রেন্টাল দিয়ে কাটপিস খুঁজত।

এখন প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছে। ভালো ছবি নির্মিত হয়েছে...

হ্যাঁ, কিছু চলচ্চিত্র হয়েছে, ব্যবসাসফলও হয়েছে। কিন্তু একটি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি কিছু সিনেমা দিয়ে হয় না। আগে বছরে -১২০ ১২৫টি ছবি মুক্তি পেত। সেখান থেকে ৬০-৭০টা ছবি হিট করত। সেই দিনটা কোথায়? এখন ছবি মুক্তি হয়ে গেল ঈদকেন্দ্রিক। ঈদ ছাড়া অনেক আর্টিস্ট ছবি রিলিজ করে না। কারণ ঈদ ছাড়া তাদের ছবি চলে না। আমরা তো ঈদ কবে, অনেক সময় জানতাম না। আমাদের শুরুতে আমরা ঈদ পেতাম না। আমাদের ছবি ঈদে মুক্তি দেওয়া যেত না। অন্য যেকোনো সময় মুক্তি পেত এবং চলত। অশ্লীল ছবি যারা বানাত, তারা অনেক বেশি সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী। আমরা ছিলাম মুষ্টিমেয় কিছু আর্টিস্ট। খুবই দুর্বল কাপুরুষের মতো আমরা সয়ে গেছি। দোষ আমাদেরও আছে। তবে হ্যাঁ, আমি এফডিসিতে আসি। এফডিসি আমার। যেখান থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। কিন্তু আমি এফডিসিতে অভিনয় করতে আসি না।

চলচ্চিত্রবোদ্ধারা মনে করেন এখন চলচ্চিত্রে মেধা সংকট। আপনি কী তার সঙ্গে একমত?

অবশ্যই মেধার সংকট আছে। একজন ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার দিন। আমি ধরে নিলাম পাত্র-পাত্রী মানে নায়ক-নায়িকা বেশ কয়েকজন আছেন। তাদের দিয়ে হবে। কিন্তু পাত্র-পাত্রীকে কী দিয়ে সাজাবে? গয়নাগাটি লাগবে না। এই গয়নাগাটি হলো মা, বাবা, ভাইবোন যারা আছেন। আমাকে একটা ভালো বাবা, ভালো মা বের করে দিন তো। নেই কেউ। কে ছবি বানাবে?

সারা বিশ্বে এখন সিনেপ্লেক্স কালচার শুরু হয়েছে। তবে আমাদের সিনেপ্লেক্সগুলোতে এফডিসিকেন্দ্রিক ছবিকে বাদ দিয়ে বাইরের ছবিগুলোকে বেশি প্রমোট করছে। এটা কি ঠিক?

এফডিসিকেন্দ্রিক ছবিই তো হচ্ছে না। পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের দুটি ধারা আছে। একটা ভালো ছবি, আরেকটা মন্দ ছবি। ভালো ছবি হলো দর্শক যেটা পছন্দ করে। আর যেটা দর্শক পছন্দ করে না, সেটা মন্দ ছবি। এর বাইরে আর কোনো চলচ্চিত্র নেই। যে ছবিগুলো ভালো ছবি হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছে, কিন্তু হলে চলছে না, সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলব না। আমি 'হাওয়া'কে ভালো ছবি বলব। ছবিটা আমি দেখছি। তার মানে গুণগতমান ভালো বলেই 'হাওয়া'র

মতো ছবিগুলো সিনেপ্লেক্স নিচ্ছে।

তাহলে অন্য ছবিগুলোতে কোনো ঘাটতি আছে?
ঘাটতি তো অবশ্যই আছে। আমার কিছু বলার আছে। আমার জানা নেই, পৃথিবীর আর কোনো দেশে সরকারি অনুদানে ছবি হয় কি না। অনুদান দিয়ে ছবি হয় না, সোজা হিসাব। আমরা যে চিৎকার করছি ২০০ কোটি টাকা দেন আমরা ছবি বানাব। ভিক্ষা করে ছবি হয় না। ফিল্ম ইজ আ লর্ড গেম ইউ হ্যাভ টু প্লেড লাইক আ লর্ড। ইউ হ্যাভ টু মেইক আ লাইক লর্ড। আমরা এখন জোড়াতালি দিয়ে ২০-৩০ লাখ টাকা দিয়ে ছবি বানাই। দুঃখিত, ওটা চলচ্চিত্র হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?
পরামর্শ আমরা ইতিমধ্যেই সরকারকে দিয়েছি। একটা পরামর্শ দিয়েছি, অল্প সময়ের জন্য কিছুসংখ্যক বিদেশি ছবির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাহলে দর্শক হয়তো আবার হলমুখী হবে। তাহলে হয়তো আবার হলের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু ৫২ সপ্তাহের মধ্যে ২০ সপ্তাহের বেশি কোনো বিদেশি ছবি চলবে না। ৩২ সপ্তাহ আমাদের দিতে হবে। এবং এটা এক বছর বা দেড় বছরের জন্য। তখন হল বাড়লে যেসব প্রযোজক টাকা নিয়ে বসে আছেন তারা অটোমেটিক্যালি ছবি বানাতে শুরু করতে পারেন।

এই যে শাহরুখ খানের 'পাঠান'-এর দেশে মুক্তির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটাকে কী চোখে দেখছেন?
আমি এটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। একটা কথা বলি, আমাদের 'সূর্যস্নান', আমাদের 'মাটির পাহাড়', 'আকাশ আর মাটি' যখন চলেছে, তখন কি এখানে হিন্দি ছবি আর উত্তম কুমারের ছবি চলত না? আমাদের তো কম্পেটিশন থাকতে হবে। কোনো কম্পেটিশন নেই আমাদের। বিশ্ব একদিকে চলছে, আর আমরা নিজেদের প্রটেকশন দিতে তাদের সঙ্গে ফেস করতে রাজি নই। কেন? আমার কথা হলো বিদেশি ছবি থেকে কিছুটা সাহায্য নিয়ে আমাদের এখন ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কিছু বললেই সরকার করে দেবে। সরকার করে দেবে কেন? উদ্যোগ আমাদেরই নিতে হবে।

সর্বশেষ 'একটি সিনেমার গল্প' পরিচালনা করেছিলেন, তারপর বলেছিলেন ধারাবাহিকভাবে ছবি পরিচালনা করবেন...
ছবি যে বানাব, সে ছবি কোথায় চালাব। আমাদের তো হলই নেই। আমাকে কালকে ১০০ হল দিন, আমি আগামীকাল ছবি নির্মাণে নামব। নাহলে আপনারা আমার ৫০ বছরের সব ইতিহাস থেকে মুছে ফেলেন। আমি অনুদান নিয়ে ছবি করব না। আমি নিজের টাকায় ছবি বানাব। কারণ, আমি দান নিয়ে ছবি করতে রাজি না। দানের টাকায় ছবি হয় না।

এবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। গত ৩ এপ্রিল ছিল আপনার ৭৪তম জন্মদিন। একই দিনে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও নিশ্চয়ই এই বিশেষ দিনটা উদ্‌যাপন করছেন...
বিষয়টির জন্য আমি সত্যি গর্ববোধ করি। কারণ এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আমরা তখন পাকিস্তানের মধ্যে। আমাদের বোঝানো হতো আমাদের দেশের আবহাওয়া ভালো না, ফলে ছবি করলেও ফিল্মের নেগেটিভ নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এ দেশে ছবি হবে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেটি মানলেন না। তিনি বিল উত্থাপন করলেন এবং ৩ এপ্রিলই সেই বিল পাস হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পাখা মেলতে আর বাধা থাকে না। তাই এই দিনটিকে চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা করা হয়। একই দিনে আমার জন্মদিন। ফলে আমার জন্মদিন উদযাপনের চেয়ে 'চলচ্চিত্র দিবস'টিই অনেক বড় করে পালন করতাম। ইদানীং চলচ্চিত্রে ভাটা পড়েছে বলেই ঘটা করে দিবসটি উদযাপিত হয় না। এবার আবার রোজা পড়ে যাওয়ায় কোনো আয়োজন করা হয়নি। তবে তরুণ বয়সে আমার জন্মদিনে বড় আয়োজন থাকত চলচ্চিত্র

পরিবার থেকে। আমার বাসায় চলচ্চিত্র এবং সংগীতাঙ্গনের প্রায় সবাই আসতেন। ভীষণ আনন্দ হতো। সবার সঙ্গে দেখা হতো, আড্ডা হতো। একটি জন্মদিনের স্মৃতি মনে পড়ছে। তখন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার 'আমি সেই মেয়ে' ছবির শুটিং করছিলাম। সেই ছবিতে আমার নায়িকা ছিলেন বলিউডের জয়া প্রদা। দর্শকের মনে পড়বে, 'আগুনের দিন শেষ হবে একদিন' গানটির কথা। এটি সেই ছবিরই গান। যা হোক, হঠাৎ সেটে দেখি দুটি কেক। তখন মনে হলো আজকে তো ৩ এপ্রিল, আমার জন্মদিন। কিন্তু কেক দুটি কেন? একটু পর প্রযোজক আমাকে ডাকলেন। পরে জানতে পারলাম একই দিনে আমার আর জয়া প্রদার জন্মদিন।

আপনি আর গানের কিংবদন্তি রুনা লায়লা অনেকের চোখে আদর্শ দম্পতি। সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলমন্ত্র কী বলে মনে করেন?

আমাদের দাম্পত্য জীবনও কিন্তু টক মিষ্টি ঝাল। সব ইমোশনই রয়েছে। এসব না থাকলে তো সম্পর্ক আর সম্পর্ক থাকে না। রোবটিক হয়ে যায়। তবে সম্পর্কের ঝাল কিন্তু মনে রাখা যাবে না। তাহলে মিষ্টিটা আর মিষ্টি লাগবে না। আমরা দর্শকের চোখে তারকা দম্পতি। কিন্তু আসলে আমরা অতি সাধারণভাবেই জীবনটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করে। তার খাওয়া-দাওয়া, চাহিদা সবই সাধারণ। তার মধ্যে অসাধারণ একটি বিষয়ই, সেটি হলো অসাধারণ গান করে। আমি তার ভক্ত ছিলাম। ছিলাম বলছি কারণ ওই যে কথা আছে না ঘরকা মুরগি ডাল বারাবর (হাহাহা)। এটা মজা করেই বলা। তার মতো শিল্পীর ভক্ত কে না?

আমি রুনাকে শুধু বলব, তুমি আরও অনেক বছর এভাবে গান করে যাও। স্ত্রীর উৎকর্ষের প্রতি এই সাপোর্টিভ মনোভাব সব স্বামীর থাকা উচিত। এতেই দাম্পত্য অনেকখানি সহজ হয়ে যায়।

আপনার মেয়ে আঁখি আলমগীর জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। নায়কের মেয়ে নায়িকা না হয়ে গানে কেন থিতু হলেন?

আমরা আঁখিকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কখনোই তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ছোটবেলা থেকে সে গান শিখেছে, ছবি আঁকা শিখেছে। শিশুশিল্পী হিসেবে 'ভাত দে' ছবিতে অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিল। কিন্তু তারপরও সে কখনো সেভাবে অভিনয়ের ওপর আগ্রহ দেখায়নি। তাই আমিও কখনো তাকে বলিনি অভিনয় নিয়ে ভাবতে। সে গানকেই আপন করে নিতে চেয়েছে। আমরা তাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করেছি। তবে আজকে আঁখির যে অবস্থান তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফসল। আমি বরং তার গানের ভালোর পাশাপাশি সমালোচনা করেছি। যাতে সে আরও ভালো শিল্পী হতে পারে।

অভিনয় থেকে দূরে আছেন কেন?

সেটার আগে একটা কথা বলে নিতে হবে, আমি চলচ্চিত্রের বাইরে কিছু ভাবতে পারি না। আমার ধ্যানজ্ঞান সবই চলচ্চিত্রকে ঘিরে। এখনো সকালবেলা যখন পত্রিকা পড়তে বসি প্রথম পাতা দেখার আগেই বিনোদন পাতাতেই আগে চলে যাই। কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে আমার এসব আবেগ আমি কখনো প্রকাশ করে বেড়াই না। এটা আমার স্বভাবে নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন অভিনয় থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে কতটা কষ্টকর। আমি তো অভিনয়ই করতে চাই। তবে আমার সঙ্গে মানায় এমন একটি চলচ্চিত্র আমাকে দিতে হবে। ভালো স্ক্রিপ্ট, ভালো চরিত্র, ভালো পরিচালক, ভালো সহশিল্পী এবং ভালো বাজেট– সব মিলে গেলেই কাজ করব। নয়তো কাজ করার ইচ্ছা নেই। তবে শিল্পী হিসেবে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা বা ভালো কাজের ক্ষুধা জীবনেও শেষ হবে না। কিন্তু সেই ক্ষুধা পূরণ করার মতো পরিস্থিতি এখন আর আমাদের এখানে নেই। ফলে সেই অতৃপ্তি নিয়েই দিন কাটাতে হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ কেমন বলে মনে করেন...

তারপরও আমি আশাবাদী। চলচ্চিত্র ঘড়ির কাঁটার মতো চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত হয়। আবার সকাল আসে। আমরা একটা সুন্দর সকালের অপেক্ষায় রয়েছি।

সালেক খোকন

কথায় কথায় আদিবাসী লোককথা

আদিবাসীদের লোককথা বা লোকবিশ্বাসের গদ্য শুনব বলেই ঘুরে বেড়িয়েছি আদিবাসী গ্রামগুলোতে। কথায় কথায় শুনেছি আদিবাসী লোককথা ও তাদের বিশ্বাসের মিথগুলো। সেসব জানাতেই এ লেখার অবতারণা।

ধানগাছে ধান হয়। কিন্তু ধানগাছে কেন চাল হয় না? এমন ভাবনার উত্তরে রংপুরের একটি রাজবংশী গ্রামের আদিবাসীরা শোনালেন তাদের বিশ্বাসের কাহিনিটি–

এক সময় সকল মানুষই ছিল সত্যবাদী। তাই ওই সময়কে বলা হতো সত্যযুগ। সত্যযুগে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল ভগবান। সে সময় ধানগাছে 'চাল' হতো। মানুষ খুব সহজেই সরাসরি চাল তুলে রান্না করে খেত। একবার এক ব্যক্তি চালের জমিতে বসে মলত্যাগ করে। মলত্যাগের সময় সে গাছ থেকে চাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তার এমন আচরণে ভগবান ক্ষিপ্ত হন। অতঃপর মানবকুলকে তিনি অভিশাপ দেন, 'আমার সৃষ্টিকে তোরা মলত্যাগের সময় স্পর্শ করে অপবিত্র করেছিস! এখন থেকে তোদের সাতগুণ পরিশ্রম করে চাল বানিয়ে খেতে হবে, তার আগে নয়।' সে থেকে ধানগাছে ধান হওয়া শুরু। আর সেই ধান মাড়াই আর সেদ্ধ করে, বাতাসে শুকিয়ে, ঢেঁকিতে ছাঁটানো ও কুলাতে পরিষ্কার করে রান্নার উপযোগী করে খেতে হয়।

সাপের কেন কান নেই– এমন প্রশ্নে রাজবংশী আদিবাসীরা কাহিনির ঝুড়ি নিয়ে বসেন।

মা মনসা যখন সর্পকুলকে ডেকে বিষ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাল। তখন সর্পকুল পৃথিবীর মানুষকে দংশন করে বহু মানুষকে মেরে ফেলল। এ অবস্থা দেখে মানবকুল গেল মহাদেবের কাছে। তারা মহাদেবকে সর্পকুলের অত্যাচারের কাহিনি খুলে বলল। সব শুনে মহাদেব ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি অভিশাপ দিয়ে সাপদের এক চোখ কানা করে দিলেন। এতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। সাপরা যেন মানুষের কোনো শব্দ শুনতে না পারে সে কারণে তাদের কানও তুলে নিলেন। অতঃপর পৃথিবীতে সাপদের অত্যাচার গেল কমে।

সাপের প্রসঙ্গ আসতেই রাজবংশীরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়– 'ঢোঁড়া সাপের বিষ নাই কেন? উত্তর না মিলতেই আরেকটি কাহিনির শুরু–

মা-মনসা একদিন সব সর্পকুলকে ডেকে বিষ প্রদান করলেন। সে সময় তিনি লক্ষ্মীন্দরকে কামড়ানোর নির্দেশ দিলেন ঢোঁড়া সাপকে। এ কারণে তাকে সবার চেয়ে বেশি বিষও দেওয়া হলো। বিষ পেয়ে লক্ষ্মীন্দরকে কামড়াতে ঢোঁড়া সাপ যাত্রা শুরু করল। পথে পরল গঙ্গা। এই গঙ্গা পার হতে হবে। গঙ্গায় ছিল অনেক মাছ। মাছ খাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না ঢোঁড়া সাপ। সে কচুপাতায় বিষ রেখে মাছ খেতে খেতে গঙ্গা পার হতে থাকল। এদিকে কচুপাতায় রাখা বিষ পিঁপড়ে, শিংমাছ, টেংরামাছ, কাঁকড়া খেয়ে সাবাড় করল। ঢোঁড়া সাপ ফিরে এসে দেখে কচুপাতায় বিষ নেই। বিষ হারিয়ে সেই থেকে ঢোঁড়া সাপ বিষহীন সাপ। তার এই লোভের কর্মে মনসাদেবী হন মনঃক্ষুণ্ন। মনসা অভিশাপ দেন, 'এখন থেকে সমস্ত লোক তোকে পায়ে মাড়াবে।' সে থেকে তাই ঘটে আসছে। ঢোঁড়া সাপের বিষ খেয়েছিল বলেই পিঁপড়ে, শিংমাছ, টেংরামাছ, কাঁকড়া ইত্যাদির কাটায় আজও বিষ রয়েছে।

চন্দ্র ও সূর্য। ওঁরাও ভাষায় বিড়ি নাদ ও চান্দু নাদ। কীভাবে সৃষ্টি হলো এ দুটি? এমনটাই ছিল প্রশ্ন। উত্তরে দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ওঁরাও গ্রামের নিপেন টিগ্গা গল্পের মতো করে বললেন কাহিনিটি–

'পৃথিবী সৃষ্টি করল ধরমেশ। তখন আকাশ ও মাটি ছিল খুবই কাছাকাছি। মানুষ চলাফেরা করার সময়ই আকাশ ঠেকত মাথায়। একবার মানুষের কোনো এক অপরাধে ধরমেশ বেশ বিরক্ত হলেন। তার নির্দেশে আকাশ অনেক ওপরে উঠে গেল। এতে চলাফেরায় মানুষের সুবিধা হলো বটে, কিন্তু চারপাশ হলো অন্ধকার।

বনের মধ্যে ছিল এক মহুয়া গাছ। সে গাছে ফুল যতক্ষণ ফুটে থাকত ততক্ষণ পৃথিবী আলোকিত থাকত। আর যখন ফুল শুকিয়ে যেত, তখন আবার অন্ধকার নেমে আসত।

সবাই ভাবল, গাছটিই অন্ধকারের মূল কারণ। আলো উদ্ধারের জন্য কাটা হোক গাছটিকে- এমন সিদ্ধান্ত নিল সবাই।

একদিন গাছটিকে কাটা হলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! তারপরও সেটি মাটিতে পড়ছে না। এ নিয়ে সবাই চিন্তিত। এমন সময় দৈববাণী এলো। গাছটিতে রয়েছে একটি চিলের বাসা। সে চিলটিকে না মারলে গাছটি মাটিতে পড়বে না।

ঠিক তাই ঘটল। চিলটিকে মারার পর পরই গাছটি মাটিতে পড়ে গেল। পড়ার শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পৃথিবী।

সে দেশের রাজা এসব জানত না। গাছ পড়ার শব্দে তিনি ভাবলেন–

শত্রুরা তার রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনি সৈন্য নিয়ে বনে এসে দেখলেন, বড় মহুয়া গাছটি মাটিতে পড়ে আছে। রাজা ক্ষিপ্ত হলেন। হুংকার ছাড়লেন– কারা গাছটি কাটল। তিনি সৈন্যদের আশপাশের মানুষকে ধরে আনার হুকুম দিলেন। ফলে উভয়পক্ষে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে রাজার সৈন্যরা হলো পরাজিত। অতঃপর গাছটিকে দুই ভাগ করে কাটা হলো। নিচের দিকের বড় অংশটিতে দেখা মিলল সূর্যের আর ওপরের দিকের ছোট অংশটিতে চন্দ্র।

কিন্তু তাদের জীবন দান হবে কীভাবে?

আবারও দৈববাণী এলো। চাষি পুত্রের রক্তে প্রাণ পাবে চন্দ্র আর সূর্য। তাই করা হলো। এক চাষির আদরের পুত্রকে চুরি করে এনে হত্যা করে তার রক্ত ঢেলে দেওয়া হলো গাছের কাটা অংশে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য জীবিত হয়ে আকাশে উঠে গেল।

সে থেকেই ওঁরাওদের কাছে সূর্য পুরুষ এবং সে বেশি রক্ত পান করেছিল বলে তেজি ও লাল। আর চন্দ্র নারী এবং সে কম রক্ত পান করেছিল। তাই চন্দ্র স্নিগ্ধ ও সাদা।'

ঘটককে কেন বাঘে খায় না? এমন প্রশ্নের উত্তরে একটি কাহিনি বলেন রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার ছাতনি পাড়ার সাঁওতাল বৃদ্ধ বিমল মার্ডি। সাঁওতালী ভাষায় কাহিনিটির ভাবার্থ–

'বিয়ের ঘটক থাকে দুজন। একজন কনেপক্ষের, অন্যজন বরপক্ষের। একবার এক বিয়ের প্রস্তাবে কনের বাড়ি ছিল ধাড় দেশে। আর বরের শিলদাতে। বড় একটি জঙ্গলের পাশেই একত্রে এসে মিশেছে ধাড় দেশের নদী ও শিলদার নদীটি। কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র পথটি ছিল সে জঙ্গলের ভেতর দিয়েই। সে জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব হতো প্রায়ই। জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে গেছে

বিয়ের আনন্দে বাঘিনী ঘটকের কথামতো বস্তার ভেতর প্রবেশ করল। ঘটক তখন সেই তেল-হলুদের খালাটি বাঘিনীর হাতে দিয়ে ভালো করে ধরে থাকতে বলল। সরল বিশ্বাসে বাঘিনী তাই করল। ঘটক এবার সেই শণের দড়ি দিয়ে ওই বস্তাটিকে ভালো করে সেলাই করল। অতঃপর বাঘিনীকে বলল, 'মহারানী, নড়াচড়া করো না। তোমাকে এই নদীর জলে নামিয়ে দিচ্ছি। এই জলের নিচেই তোমার স্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে যখন তোমাকে নদীর জল থেকে তুলে নেবে তুমি তখন হাতে থাকা তেল-হলুদ তার মুখে মাখিয়ে দিও।' এ কথা বলেই ঘটক বস্তাটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল

আরেকটি ছোট্ট নদী।

একবার কনেপক্ষের ঘটক, বরের বাড়িতে যাচ্ছিল সে নদীর ধার দিয়ে। দূর থেকে ঘটককে যেতে দেখেই একটি বাঘিনী হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল তার সামনে। হঠাৎ বাঘিনীকে দেখে ঘটকের প্রাণ যায় যায়। বাঘিনী প্রথমে ঘটককে দুই থাবার মধ্যে নিয়ে খেলা করতে লাগল। এটাই তাদের নিয়ম। শিকারকে সঙ্গে সঙ্গে খায় না তারা।

সে সময় বাঘিনী ঘটককে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

বাঘিনীর কথায় ঘটক একটু সাহস পেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'মহারানী, আমি ধর্মের কাজে যাচ্ছিলাম, আমাকে তুমি মেরো না।'

ঘটকের উত্তরে বাঘিনীর বেশ কৌতূহল হলো। বলল, 'কেমন ধর্মের কাজ হে?'

ঘটক বলল, 'আমি দুটি পরিবারকে একত্রিত করি। দুজন আলাদা লোককে একজনে পরিণত করি।'

বাঘিনী বলে, 'কেমন করে?'

ঘটক উত্তরে বলে, 'যার বউ নেই তাকে বউ জোগাড় করে দিই আর যার স্বামী নেই তার জন্য স্বামী জোগাড় করে দিই।'

ঘটকের উত্তর শুনে বাঘিনীর নিজের কথা মনে হয়। সে বলে, 'যদি তাই হয়, আমার জন্যও স্বামী জোগাড় করে দাও।' সে দুঃখ করে বলে, 'বারো বছর আগে আমার স্বামীকে দুষ্ট লোকেরা মেরে ফেলেছে। সে থেকেই আমি একা।'

সুযোগ বুঝে ঘটক বাঘিনীর কথায় রাজি হলো। সে বলল, 'তাহলে তো আমাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, মহারানী।' ঘটককে বিশ্বাস করে বাঘিনী তাকে ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে ঘটকমশাই গেল সেই গ্রামে। অনেক খুঁজে গ্রামের ভেতর পেল একটা দোকান। দোকান থেকে সে দুটো নতুন বস্তা কিনে নিল। তা সেলাই করার জন্য কিনল একটি সুচ ও সুতলি দড়িও। ওই গ্রামের শেষ প্রান্তের বাড়িতে থাকত দুজন বুড়ো ও বুড়ি। গ্রামের যে কোনো বিয়েতে তারাই হলুদ ও পাতা বাছাই করে দিত।

ঘটক সে বাড়িতে গিয়ে খুশি মনে তাদের বলল, 'যাও, একটু হলুদ বেটে এবং পাতা বেছে পরগাছার সরু কাঠি দিয়ে শালপাতার চার কোণের খালা তৈরি করো। সেই খালায় দিয়ে দাও বাটা হলুদ ও তেলটুকু।' বুড়ো-বুড়ি তাই করল।

ঘটক এবার নতুন বস্তা, সুচ, শনের দড়ি ও তেল-হলুদ নিয়ে ফিরে গেল বাঘিনীর কাছে।

বাঘিনীকে সে বলল, 'মাহারানী, তোমার জন্য পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।'

শুনে বাঘিনী তো মহাখুশি।

ঘটক বলল, 'যদি আমাকে বিশ্বাস করো এবং বিয়ে করতে চাও তবে তুমি এই বস্তার ভেতর প্রবেশ করো।'

বিয়ের আনন্দে বাঘিনী ঘটকের কথামতো বস্তার ভেতর প্রবেশ করল। ঘটক তখন সেই তেল-হলুদের খালাটি বাঘিনীর হাতে দিয়ে ভালো করে ধরে থাকতে বলল। সরল বিশ্বাসে বাঘিনী তাই করল।

ঘটক এবার সেই শনের দড়ি দিয়ে ওই বস্তাটিকে ভালো করে সেলাই করল। অতঃপর বাঘিনীকে বলল, 'মহারানী, নড়াচড়া করো না। তোমাকে এই নদীর জলে নামিয়ে দিচ্ছি। এই জলের নিচেই তোমার স্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে যখন তোমাকে নদীর জল থেকে তুলে নেবে তুমি তখন হাতে থাকা তেল-হলুদ তার মুখে মাখিয়ে দিও।'এ কথা বলেই ঘটক বস্তাটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

সে দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে নদীতে বান দেখা দিয়েছিল। অন্য একটি গ্রামে ছিল একটি বাঘ। তার স্ত্রীকেও মানুষেরা মেরে ফেলেছে বারো বছর আগে। সেই বাঘটি প্রতিদিন বান দেখতে নদীর ধারে এসে বসে থাকত। মাঝেমধ্যে বানের জলে গরু, ছাগল, মহিষ ভেসে এলেই নদী থেকে সে তা তুলে এনে খেত। সেদিনও সে নদীর ধারে বসেছিল। একটি বস্তা ভেসে আসতে দেখেই সে জলে নেমে সেটাকে

ওপরে তুলে আনল। দাঁত দিয়ে বস্তাটি ছিঁড়তে যাবে অমনি বস্তার ভেতর থেকে বাঘিনীর গর্জন।

বাঘ তাড়াতাড়ি বস্তাটি ছিঁড়ে ফেলল। ঠিক তখনই বাঘিনী মনের আনন্দে আস্তে আস্তে বস্তা থেকে বেরিয়ে এলো। সে হাতের তেল-হলুদ বাটা ভালো করে মাখিয়ে দিল ওই বাঘটির মুখে এবং তাকে চুমু খেতে থাকল। অতঃপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সুখে-শান্তিতে কাটতে থাকল বাঘ-বাঘিনীর জীবন।

বারো বছর যাবত পুরুষ বাঘটি একাকী ছিল। আর স্ত্রী বাঘটিও স্বামী হারিয়ে ছিল একাকী। ঘটক লোকটিই তাদের বিয়ে করিয়ে দিল। তাই বাঘেরা ঘটকদের ওপর খুব খুশি। এরপর থেকে ঘটকালির কাজ করতে যাবার সময় রাস্তায় বা জঙ্গলে রাত-বিরাতে আসা-যাওয়ার সময় বাঘরা কখনো ঘটকদের ধরত না।'

কলাগাছে তীরবিদ্ধ করা ও লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি ভাঙাকে সাঁওতালরা অশুভ শক্তির প্রতীকী বিনাশ বলে মনে করে। কিন্তু কেন? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই দিনাজপুরের মহেশপুর গ্রামের সানজিলা হাজদার কাছে। তার মুখে শোনা সাঁওতালদের প্রচলিত কাহিনিটি এমনু

'সাঁওতাল রাজা তখভনের রানীর এক গোপন প্রেমিক ছিল। প্রেমিকটি বনের মধ্যে সর্পরাজের বেশ ধরে থাকত। রাজা যখন শিকারে যেতেন, রানী তখন তাকে জঙ্গলের বিশেষ একটি দিকে যেতে নিষেধ করতেন।

একবার শিকার করতে গিয়ে কৌতূহলবশত রাজা ওই বিশেষ দিকে যান এবং সর্পরাজকে দেখতে পান। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে তীর দিয়ে রাজা হিংস্র সর্পরাজকে মেরে ফেলেন।

শিকার থেকে ফিরে রাজা ঘটনাটি রানীকে খুলে বলেন। সর্পরাজের মৃত্যুর কথা শুনে রানী ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যথিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি রাতের আঁধারে জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে সর্পরাজের হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে বাগানে পুঁতে রাখেন। কিছুদিন পর ওই জায়গা থেকে একটি গাছ হয় এবং ওই গাছে একটি আধফোটা ফুল সারা বাগানকে আলোকিত করে তোলে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ রানী কৌশলে রাজার সঙ্গে মেতে ওঠে সর্বনাশা বাজির খেলায়। রাজা যদি বাগানের সব ফুলের নাম বলতে না পারেন তবে রানীর হুকুমে প্রজারা রাজার প্রাণদণ্ড দেবে। নিজের বাগানের ফুলের নাম বলাটা খুবই সহজ ভেবে আত্মবিশ্বাসী রাজা রাজি হলেন।

অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এ খবর সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের প্রজারা 'বাজি খেলা' দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের বাগানে উপস্থিত হলো। রাজা একে একে সব ফুলের নাম বলতে

পারলেন কিন্তু অদ্ভুত আধফোটা ফুলটির কাছে এসে রাজা আটকে গেলেন। সে সময় রাজার পক্ষে প্রজারা রানীর কাছ থেকে আরও সাত দিন সময় চেয়ে নেয়।

খবর পেয়ে রাজাকে বাঁচাতে অন্য রাজ্য থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয় রাজার এক বোন। হাঁটতে হাঁটতে ষষ্ঠ রাতে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল একটি শিমুলগাছের তলায়। হঠাৎ গভীর রাতে বোনটি শুনতে পায় গাছের মগডালে এক শকুনি তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে, পরদিনই সে বাচ্চাদের জন্য রাজার দেহের মাংস তাদের খাওয়াবে। উৎসুক বাচ্চারা কীভাবে তা সম্ভব মায়ের কাছে জানতে চাইলে গল্পচ্ছলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সমস্ত ঘটনা এবং ফুলের নাম ও জন্মবৃত্তান্ত সে খুলে বলল। শিমুলগাছের নিচে বসে রাজার বোনটি সব কথা শুনে ফেলল।

ভোরের মধ্যেই বোনটি রাজার কাছে পৌঁছে ফুলের নামসহ সমস্ত ঘটনা বলল। সাত দিনের দিন রাজা, প্রজা ও রানীর সম্মুখে বললেন, ফুলের নাম হলো, 'কারি নাগিন হাড় বাহা' আর তখনই ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলো। রাজা প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন।

কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রজারা প্রতিহিংসাপরায়ণ রানীকে তীর মেরে ঝাঁজরা করে দিল এবং তাতেও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় লাঠির আঘাতে

কবিরাজ আতপচাল ও তুলসী দোয়া পানি ডুংগার গায়ে ছিটালেন। অতঃপর একটি তাবিজ ও পাঁচটি বড়ি দিলেন। নির্দেশনা– প্রতিরাতে বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হবে। কবিরাজ ডুংগাকে প্রশ্ন করলেন– কেন তুমি স্বপ্নের মধ্যে প্রস্রাব করো?

এক রাতের কথা জানাল ডুংগা– 'ঘুমের মধ্যে আমি খেলছিলাম। হঠাৎ দলনেতা খেলা বন্ধ করে সবাইকে প্রস্রাব করে আসার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। এভাবে...।'

শুনে কবিরাজ ডুংগাকে বললেন, 'ওই দলনেতাই হলো শয়তান। এরপর তোমার দলনেতা বা অন্য কেউ যখনই এটা বলবে তুমি তার কাছ থেকে টাকা চাইবে। স্বপ্নে তো সে টাকা দিতে পারবে না। ফলে তোমাকেও আর বিছানায় প্রস্রাব করতে হবে না।'

কবিরাজের কথা মতোই ডুংগা প্রস্তুতি নিল। রাতে বড়ি খেয়ে সে ঘুমাতে গেল। স্বপ্নে এবার শয়তান মামা হয়ে আসল। সে ডুংগাকে প্রস্রাব করার প্রস্তাব করতেই সে টাকা চাইল। মামা বলল, আমারও কিছু টাকা দরকার। চল একটা কাজ করি। পাশের বাড়ির মণ্ডলের বাড়িতে চুরি করতে যাই। ডুংগাও প্রস্তাবে রাজি হলো। দুজন ঘরের জানালা কেটে মণ্ডলের ঘরে যেই ঢুকল, অমনি চোর চোর বলে সে চিৎকার করতে থাকল। ভয়ে দুজনই মণ্ডলের বাড়ির আমগাছে

একবার শিকার করতে গিয়ে কৌতূহলবশত রাজা ওই বিশেষ দিকে যান এবং সর্পরাজকে দেখতে পান। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে তীর দিয়ে রাজা হিংস্র সর্পরাজকে মেরে ফেলেন। শিকার থেকে ফিরে রাজা ঘটনাটি রানীকে খুলে বলেন। সর্পরাজের মৃত্যুর কথা শুনে রানী ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যথিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি রাতের আঁধারে জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে সর্পরাজের হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে বাগানে পুঁতে রাখেন। কিছুদিন পর ওই জায়গা থেকে একটি গাছ হয় এবং ওই গাছে একটি আধফোটা ফুল সারা বাগানকে আলোকিত করে তোলে

রানীর মাথা গুঁড়িয়ে দিল।

সে থেকেই কলাগাছে তীরবিদ্ধ করা ও লাঠি দিয়ে হাঁড়ি ভাঙা সাঁওতালদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় দুটি খেলা।

আদিবাসী সমাজে এক সময় লোকচিকিৎসাই ছিল প্রধান। মন্ত্রপাঠ, পানিপড়া, তাবিজ, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি ছিল রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর প্রতি আদিবাসীদের যেমন বিশ্বাস ছিল। তেমনি এ নিয়ে প্রচলিত ছিল নানা মুখরোচল গল্প। যা থেকে আদিবাসী সমাজে রসবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কোচ আদিবাসী সমাজ থেকে জানা যায় তেমনি একটি হাস্যরসাত্মক কাহিনি। কাহিনিটি এমন–

এক গ্রামে এক যুবক বাস করত। তার নাম ছিল ডুংগা। বয়স বাইশ বছর। সে নিজেকে খুবই চালাক মনে করত। কিন্তু তার ছিল একটি বিশ্রী রোগ। কী সেই রোগ? ছোটবেলা থেকে প্রতিরাতেই সে বিছানায় প্রস্রাব করত। এ নিয়ে ডুংগার বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অনেক কবিরাজ দেখিয়েও কোনো ফল হয় না। একবার এক নামকরা কবিরাজের কাছে ডুংগাকে নিয়ে যাওয়া হলো। কবিরাজ ডুংগাকে দেখে বলল, 'ওকে বিয়ে করিয়ে দিন। তাহলে এ রোগ আর থাকবে না।' ডুংগার বাবা তাই করলেন।

কিন্তু বিয়ের পরও ডুংগার সমস্যা গেল না। বুদ্ধিমান ডুংগা নিজেকে বাঁচাতে বুদ্ধি আঁটল। সে বিছানায় প্রস্রাব করে তার স্ত্রীর ওপর দোষ চাপাতে থাকল। লজ্জা আর অপমানে ডুংগার স্ত্রী রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

ডুংগার বাবা ছেলের হাল ছাড়লেন না। তিনি ছেলেকে নিয়ে গেলেন আরেক কবিরাজের কাছে।

আশ্রয় নিল। কিন্তু মণ্ডল তো আমগাছের নিচ থেকে সরেই না! চোর ধরতে সে গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

মামারূপী শয়তান এবার ডুংগাকে বলল, 'মামা তুমি মণ্ডলের মাথায় মলত্যাগ করো। তাহলে সে তা ধুতে পুকুরপাড়ে যাবে। আর সে সুযোগেই আমরা নেমে পালিয়ে যাব।'

ডুংগা ভাবল জীবন বাঁচাতে এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি আর কী হতে পারে। সে মামার কথামতো মণ্ডলের মাথায় মলত্যাগ করল। আর অমনি শয়তান হাততালি দিতে থাকল।

ডুংগার ঘুমও গেল ভেঙে। সজাগ হয়ে সে দেখল বিছানাতেই সে মলত্যাগ করেছে। সে হতভম্ব হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'হায় হায় একি হলো! আগে তো বিছানায় প্রস্রাব করতাম। এখন দেখি পায়খানা করে ফেলেছি।'

এভাবেই কবিরাজের পরামর্শ মাঠে মারা গেল। যুগে যুগে দাদি-নানিদের মুখে শোনা এমন গল্পগুলোই কোচ আদিবাসী শিশুদের নির্মল আনন্দ দিয়ে আসছে।

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে এমন অগণিত লোককথা, উপকথা ও পুরাকথা। যুগে যুগে যা তাদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং আছে। কালের বিবর্তনে আদিবাসীরা আজ সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরুদের প্রভাব এবং নিপীড়নে তাদের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন। লুপ্ত হচ্ছে তারা, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে যেসব বিশ্বাস প্রচলিত ছিল আদিবাসী সমাজে, হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোও। সেসব বিশ্বাসের গদ্যগুলো যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়করও। যা সমৃদ্ধ করেছে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে।

ছবি : সালেক খোকন

আশরাফ জুয়েল

থই থই কামিনী

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

ক্রমশ ফিকে হচ্ছে সন্ধ্যাটি- সদ্য বিবাহিতা নারীর স্মৃতিতালু থেকে মেহেদির আলপনা যেভাবে ম্রিয়মাণ হতে থাকে সংসারের ডিটারজেন্টে, ঠিক তেমনি। গাঁজার অনবদ্য ঘ্রাণের দিকে হেলে পড়া সন্ধ্যার নেশা আমাকে বিভ্রান্তির জটে আটকে ফেলছে, বুঝতে পারছি না কখন সিলভিয়া প্লাথ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন- 'আত্মহত্যা করার জন্য ঠিক ক্যামন দিন তোমার পছন্দ! অদক্ষ হাতে দেওয়া নীলশুকনো ছোপ ছোপ সাদা কাপড়ের মতো মেঘাচ্ছন্ন কোনো এক রাত বেছে নিয়ো তুমি, আর চাঁদটাকে বোলো সে যেন কলঙ্কভার নিয়ে হলেও নেমে আসে, শর্তহীন।'

দাঁড়িয়েছিলাম, ঘোরতর শব্দসন্ত্রাস আমার ভাবনা থেকে মুহূর্তকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্লাথ উধাও হচ্ছেন ডাস্টার থেকে খসে পড়া চকের গুঁড়োর মতো। আমার কানে ভারী দুলের মতো প্লাথের কথাগুলো দোল খাচ্ছে। আমি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি? সিলিভিয়া প্লাথ ততক্ষণে গত হয়েছেন মুহূর্ত পেয়ালা থেকে। প্লাথের মিরর কবিতাটির শেষ স্তবক আওড়াচ্ছি- 'ইচ মর্নিং ইট ইজ হার ফেস দ্যাট রিপ্লেসেস দ্য ডার্কনেস। ইন মি শি হ্যাজ ড্রওনড আ ইয়াং গার্ল, অ্যান্ড ইন মি এন ওল্ড উইম্যান রাইজেস টু-ওয়ার্ডস হার ডে আফটার ডে, লাইক আ টেরিবল ফিস।' পূর্বের অংশ মনে করতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না, নিজের স্মৃতিশক্তি আমার সাথে সাপলুডু খেলছে। অথচ একসময় মায়ের হাতের ভাতের লোকমার মতোই পরিচিত ছিল এই কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি।

দু'জনই চাকরি করা বাবা-মায়ের জেদি একরোখা বাচ্চার এলোমেলো কান্নার ঢঙে বৃষ্টি পড়ছে- কখনো স্তিমিত কখনো সাঁড়াশি। আমি, নিজের নাম ভুলে যাওয়া আমি, দাঁড়িয়ে আছি ঠাঁই- দাঁড়িয়েই আছি বৃষ্টিকে ছাতা বানিয়ে। হেঁয়ালি বসন্ত শুরুর প্রাক্কালে, টিকটিকির দেহ থেকে খসে পড়া লেজের অংশবিশেষের মতো শীতের এই সন্ধ্যা- বৃষ্টিদগ্ধ, এই সন্ধ্যা আমাকে স্মৃতিরহিত করে দিচ্ছে অবলীলায়। গুলশান শুটিং ক্লাবের বিপরীতে ফজলে রাব্বি পার্কের চিরবন্ধ্যা গেইটের সম্মুখে সাঁটিয়ে রেখেছি নিজেকে, দেয়ালে লেগে থাকা পোস্টারগুলোর সাথে নিজের কোনো তফাৎ চোখে পড়ছে না। একজন বাদাম বিক্রেতা, শুধু বাদাম নয়- আজকাল এক প্রডাক্টে আটকে থাকলে বিজনেস করা কঠিন। ছোলা ভাজা, শিম ভাজা, হয়তো আরও কিছু আছে, হয়তো আমাদের জানার জগতে সেই জিনিসগুলোর অস্তিত্ব এমনভাবে আছে যা আমরা ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাই। বৃষ্টি থেকে নিজেকে নয়, সে তার সমস্ত মনোযোগ বিনিয়োগ করছে তার প্রডাক্ট রক্ষা করার জন্য। সে-ও জেনে গেছে এই করপোরেট কালচারের দুনিয়ায় প্রডাক্টই সব, এমনকি সে এটাও বুঝে গেছে, সে নিজেও একটা প্রডাক্ট। আশপাশে মাকড়শার খেয়ালি জালের মতো পুলিশ, বৃষ্টিও যাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে- তারা যাকে যখন ইচ্ছে থামাচ্ছে, যাকে যখন ইচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে, যাকে যখন ইচ্ছে গালি দিচ্ছে, যাকে যখন ইচ্ছে চুমু দিচ্ছে।

এসবে মনোযোগ নেই আমার। ইউক্যালিপটাসের পাতারা কীভাবে নিজেকে রাঙিয়ে নিচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটায়- দেখছিলাম। দেখছিলাম বিয়ের রাতের পরের সকালে বিদেশ পাড়ি দেওয়া প্রবাসী স্বামীর বহুদিন পর ফিরে আসার খবর এলে যেভাবে নিজের সকল দুঃখ ধুয়ে নেয় প্রতিটা মাসিকের চূড়ান্ত হিসেব রাখা ত্রস্ত তরুণী বধূ, ঠিক সেইভাবে ধুয়ে নিচ্ছে পাতারা নিজেদের। বিধবা সময় ধুয়ে দিচ্ছে আমাকেও অবশ্য কারও কিছু যায় আসে না তাতে, ঢাকা চাকা ঠিকমতো চলছে কি না অথবা কেন মশা মারার মেশিনগুলোর কর্মক্ষমতার সাথে অবলীলায় জয়ী হচ্ছে মশারা।

বৃষ্টির কামড় ভালো লাগছে আমার? তবে বুঝতে পারছি কামড়ে কামড়ে আমার লোমকূপগুলো তপ্ত হচ্ছে। চোখ না ফোটা বাচ্চা সরীসৃপ যেভাবে লক্ষ্যহীন এগোয়, ঠিক সেভাবেই বৃষ্টির এলোমেলো জল চুইয়ে পড়ছে আমার মেদহীন শরীরের আনাচ কানাচে- এক চমৎকার অস্বস্তি আমার মস্তিষ্কের নাকে ভনভন করছে নির্লজ্জ মাছিটির মতো। ডান হাতের ভেজা তালু দিয়ে তাড়াতে উদ্যত হলাম আমার বিড়ম্বিত কপালে বসে থাকা কল্পিত মাছিটিকে। হাতটি আমার চোখ পেরিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত কপাল ছুঁয়ে দেখার আগেই কিছু ঈশারার চাবুক আঘাত হানল আমার ভাবনার চাতালে।

আজ্ঞাবহ গাধার মতো নিঃশব্দ একটি মার্সিডিজ বেঞ্চ কার আমার অস্বস্তি ঘেঁষে দাঁড়াল। বিস্মরণযোগ্য সহিসের মতো উঠে বসলাম পেছনের সিটে। রাস্তা এগিয়ে চলছে, সবাইকে দেখছি, আমাকে দেখছে না কেউ। যেন আমার উপস্থিতি এই মুহূর্তে এই পৃথিবীর পাশে অহেতুক বসে থাকা অবাঞ্ছিত কমাটির মতো, যাকে চাইলেই অস্বীকার করা যায়। প্রাইভেট কারটির জানালায় অন্ধকারের পেপার লাগানো, বাইরে থেকে কেউ দৃষ্টি হানলে নিজের চেহারার কাবার ছাড়া কিছুই আসবে না চোখে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য গুলশান এলাকাটিকে আমার স্মৃতির রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। গাড়ির পেছনের বরফ শীতল সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদে ভাবছি, সত্য সবসময়ই মিথ্যের মাখনে মোড়ানো শিমুল তুলোর মতো নরম এক কেক- ভবিষ্যৎ এক লোভনীয় ছুরি। সেই ছুরি চালানোর কৌশল যে যত নৃশংস এবং সূক্ষ্মভাবে রপ্ত করতে পারবে সে তত সফল। তাতে কি কাটল, কে রক্তাক্ত হলো তা ধর্তব্যের বিষয় নয়। আমি কি ছুরি চালানোয় আমার বিশ্বাসকে হাতির দাঁতের ধারালো চিরুনি করে তুলতে পেরেছি? সহসা মজিদ স্যারের শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা আমার সামনে চালশে চোখে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা চশমার মতো হাজির, মুহূর্তেই আমি সেই ক্লাস সিক্সের একেবারে সামনের বেঞ্চির রোগাটে হাফপ্যান্টে মোড়ানো পুষ্টিহীন বাচ্চাটির মতো তরল হয়ে উঠি। স্যার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এক নাগাড়ে সঠিক এবং ভুলের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে থাকেন। ভালো এবং খারাপের মধ্যে শুধু বিশ্বাসের পার্থক্য এটা বুঝতে আমার কেটে গেছে এতগুলো বছর, তাহলে কি স্যারের শেখানো উপদেশগুলো সব ফানুস? যে আগুন শুধু ওড়ায়, যে আগুন কিছু পোড়ায় না- সে আগুন কোনো কাজের নয়, এ কথা আমি স্যারের ইবাদতের তসবিতে কীভাবে গেঁথে দেব?

'ঠান্ডা লাগছে? টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেব?' চমকে উঠলাম। ড্রাইভিং সিট থেকে ভীষণ দামি এবং মোলায়েম পারফিউমের মতো উড়ে এলো শব্দগুলো। জানি আমার উত্তরের তোয়াক্কা তিনি করবেন না, তাই উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম। 'ঠান্ডা লাগছে তো!' আবারও বললেন। আমার সমস্ত অবাক লাগা হিম রাতের কুয়াশার মতো জড়িয়ে ধরছে আমায়- ভেজা শরীরকে জোঁকের মতো চুষে খাচ্ছে গাড়ির এসি। গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণ পর থেকে চোখকে শিমুল তুলোর না ফাটা মাকু বানিয়ে রেখেছি। চাই না এই রাস্তা আমাকে তার হিসাবের খাতায় টুকে রাখুক। অবশ্য চোখ বন্ধ থাকলেও মগজের দোকান খোলা আছে। ভাবছি, কত সহজেই আমাকে চিনে নিলো কালো রঙের মার্সিডিজ। পুলিশ প্লাজা সংলগ্ন হাতিরঝিলের ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছি নয়টা একুশ নাগাদ। সেখান থেকে শিফট করে ঠিক নয়টা সাতান্ন মিনিটে ফজলে রাব্বি পার্কের গেইট, কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমার ঠিকানা ছিল সেটাই। দশটা, মানে ঠিক দশটার সময় গাড়িটি দাঁড়ায় আমার পাশে। বৃষ্টির কারণে হোক, আজ রবিবার অথবা রাত দশটা বাজার কারণেই হোক রাস্তা বড় একা। নিভৃতে এগিয়ে চলছে গৃহপালিত গাড়িটি। শব্দহীন! তাই বলে এত! আগে কখনো মার্সিডিজে উঠিনি, এগুলো হয়তো এমনই।

গুলশান দুইয়ের সিগন্যালে কিছু সময়ের জন্য তার লাল ঠোঁটের চুমুতে আটকে রাখে আমাদের। ইতিমধ্যে অভিজাত বৃষ্টি আরও জোরালো হয়েছে। গাড়ির ওয়াইপার শরীরে পরিচিত হাত বোলানোর অলস ভঙ্গিতে গাড়ির গ্লাসের মুখ মুছে দিচ্ছে। আমরা দুজন মানুষ, একজন আরেকজনের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে নিঃশব্দ, চুপচাপ। মৃদু স্বরে গেয়ে চলেছেন আশা ভোঁসলে। লিরিকটা খুব চেনা, রোজ রোজ আঁখো তালে, রোজ রোজ' কে যেন আমার বিস্ময়মোম ঠোঁটে ফস করে জ্বলে ওঠা দেশলাইয়ের কাঠি ঠেসে দেয়। মার্সিডিজে পুরনো সময়ের হিন্দি!

গুলশান দুয়ের আভিজাত্য পিষতে পিষতে গাড়িটি ডানে-বামে-

ডানে-বামে ততক্ষণে আমার মনোযোগ দিকভ্রান্ত বেড়ালের মতো, যেতেই হবে কিন্তু জানি না কোথায়, কোন অজানায়। সাপের মতো সতর্কে এগোতে এগোতে গাড়িটি এক সময় গম্ভীর গেইট পেরিয়ে ঢুকে পড়ে গাঢ়তর অন্ধকারের বিপরীতের ঘন অরণ্যের মতো নিঃসঙ্গ বাড়িটিতে। কালো পোশাকের দুজন সিকিউরিটি লোহার ভারী সদর দরজা খুলতে হিমশিম খাচ্ছে।

গাড়িটি ভেতরে ঢুকতেই কালবিলম্ব না করে গেইট খুলে ড্রাইভিং সিট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, দ্রুত গলে যাওয়া বরফের মতো নিমিষেই আড়াল হলেন চোখের। ভিজে যাওয়া শরীরে আমি তখনো জবুথবু। এ বাড়ির বিশালত্ব আমাকে জবুথবু থেকে জড়সড় বানিয়ে দিয়েছে। একজন মধ্যবয়স্কা, গাড়ির পেছনের বাম দিকের দরজা সন্তর্পণে খুলে দিয়ে বললেন, আসুন। মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা দৃশ্য স্ক্রিপ্টেড, প্রত্যেকটা মানুষ স্ক্রিপ্টেড, সবকিছু রিহার্সাল্ড। শুটিং ক্লাব থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু- যেন দৃশ্যায়ন হচ্ছে, মঞ্চে, নির্দেশক অদৃশ্য।

'প্লিজ আসুন।' মধ্যবয়স্কার দৃষ্টি অনুসরণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম, পরপর দুইবার। মানুষকে চেনার জন্য তার দৃষ্টি পড়া জরুরি। শুধু মধ্যবয়স্কাই নন, তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বেড়ালটা, গেটের মস্তদেহী অ্যালসেশিয়ান, লনের দৃষ্টিনন্দন নাম না জানা বিভিন্ন গাছের চৌকস ফুলগুলো, বাড়ির শরীরে আব্রু আনতে সদা ব্যস্ত দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লম্বা সারি সারি গাছ, সকলের দিকেই তাকালাম। দুর্ভাগ্য আমার, কেউই আমার চোখে চোখ রাখতে রাজি হলো না।

পার্সিয়ান দুধসাদা বেড়ালটার চাইতেও মৃদু পায়ে হাঁটছেন মধ্যবয়স্কা- যেন তার পায়ে কেউ বসিয়ে দিয়েছে তুলোর তুলতুলে প্যাড। পেছনে আমি। সতর্ক, যতটা সতর্ক হলে গেটের বাম পাশে বসে থাকা অ্যালসেশিয়ানটার ধেঁকিয়ে ওঠার ইচ্ছে পূর্ণতা না পায়, তার চেয়েও বেশি। কুকুরকে বড্ড ভয় পাই আমি। কুকুর দেখলেই ছোটবেলার সেই ভয়াবহ স্মৃতি ভরা নদীতে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা শিল মাছের লেজের মতো জেগে ওঠে আমার স্মৃতিস্রোতে। স্পষ্ট মনে আছে, আমরা ভাইবোনেরা মিলে খেলতে বেরিয়েছিলাম। ঠিক সন্ধ্যা নামার আগে, বাড়ি ফিরছিলাম, আমাদের ফেলে আসা পথ ধরে আস্তানায় ফিরছিল চার-পাঁচটা কুকুর। জহির আচমকা ঢিল ছুঁড়ে দিল দৌড়। তার দৌড়ের পিছুপিছু আমরাও, আমাদের পিছুপিছু কুকুরের দল, প্রবল আক্রোশে ফুঁসছে ওরা। পেছন ফিরে তাকানোর ফুরসত নেই কারও। নাভিশ্বাস দৌড়ের ফাঁক গলিয়ে আমার দৃষ্টিকে ঠেলে দিলাম পেছনে, আমাদের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে দেখি সালেহা বুকে ঘিরে ধরেছে কুকুরের দল। না, জহিরদের মতো পালাতে পারিনি আমি। কিছু বুঝে হোক আর না বুঝে, ভয়ের ঘোড়ায় সাহসের জিন চাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কুকুরের দলটার ওপরে। সুযোগ বুঝে সালেহা বুবুকে উগরে দিয়েছিলাম কুকুর আর আমার মাঝ থেকে। কুকুরের দল তাদের কাঙ্ক্ষিত শিকার হারিয়ে সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে আমাকে। আমার সাহসের হাতে-পায়ে তাদের উন্মত্ত নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে অনবরত। নিজেকে রক্ষা করার ফাঁকে আমি দেখছি সালেহা বু, দূরে দাঁড়িয়ে, ফ্রকপরা আমার সালেহা বু, অভ্যাসমতো নিজের ডান হাতের তালু কামড়াচ্ছে, তার দু'চোখ ততক্ষণে বর্ষার চাপকল। সালেহা বু বিপদমুক্ত, আমি নিশ্চিন্ত। প্রবল ঘেউ ঘেউ আক্রোশের মধ্যেও আমার কানে বাজছিল সালেহা বুবুর ফিসফিস কণ্ঠের বৃষ্টিজাত হাসি। সালেহা বু হাসছে, আর আমাকে আঁচড়ে যাচ্ছে কুকুরের দল। কে যেন খবর দিয়েছে- দৌড় দিয়ে আসলেন আমাদের মা। আমাদের মা আসতেই কুকুরের দল চুপসে গেল। আমাকে নিয়ে আমাদের মা ছুটল বাড়ির দিকে, পেছনে সালেহা বুবু। কুকুরেরা ফিরে গেল নিজ নিজ আস্তানায়। নাভির চারপাশে নেওয়া চৌদ্দটা ইনজেকশন কুকুরের ধারালো দাঁতের চেয়েও ছিল ব্যথাদায়ক, অসহনীয়। বেশ কিছুদিন পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া সালেহা বু'কে আত্মহত্যা গলায় পেঁচিয়ে চলে যেতে হলো শ্বশুরবাড়ি, ততদিনে তার ফিসফিস কণ্ঠের বৃষ্টিজাত হাসি হয়ে গিয়েছিল ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়া টর্চলাইট- যে লাইট দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিল ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের প্রত্যাশায়।

মধ্যবয়স্কার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঢুকে পড়লাম আভিজাত্যের অতিশয়ে মর্মরিত বাড়িটির ভেতরে। বাড়িটি সম্ভবত ট্রিপলেক্স। বিশাল এক ড্রয়িং রুম। এমন ড্রয়িং রুম, মাঝেমধ্যে হয়তো টিভি স্ক্রিনে দেখেছি অথবা সিনেমায়। টিভি বা সিনেমার ডিরেক্টরা হয়তো এতটা ভাবতেই পারেনি বা ভাবলেও হয়তো এখানে পৌঁছাতে পারেনি।

'বসুন' বলেই দৃশ্যপট থেকে রোদের মুখ দেখে ফেলা শীত-সকালের শিশিরের মতো মিইয়ে গেলেন তিনি। কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে পার্সিয়ান বেড়ালটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আমায়, বেড়ালরা সাধারণত খুবই সেনসিটিভ, তাদের প্রতি মনিবের মনোযোগে ভাগ বসাতে দিতে ইচ্ছুক নয় কিছুতেই। বেড়ালটি কি আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে? গেইটের কুকুর তখনো আমার স্মৃতিকে অনবরত চাটছে- আমার অতীত স্মৃতি কঁকিয়ে উঠল তাতেই। বারবার মনে পড়ছে সালেহা বুর চিৎকার, মনে পড়ছে আমার কান থেকে হারিয়ে যাওয়া ফিসফিস স্বরের বৃষ্টিজাত হাসি।

ড্রয়িংরুমের চারপাশে তাকালাম- অনেক মানুষ, বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ, শিশু। কম করে হলেও আট থেকে দশজন তো হবেই। কারও মুখে চাপা হাসি, কেউ উচ্ছল, কেউ আভিজাত্যের মুখোশ পরা। সকলের মনোযোগের বড়শি আমার দিকে, তাদের মুখ থেকে কথারা চিরকালীন ছুটিতে গিয়েছে। ভাষালুপ্ত মৃত মানুষেরা ফ্রেমবন্দি হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে দেয়ালে।

প্লিজ হ্যাভ আ সিট– চমকে উঠলাম। ড্রাইভিং সিট থেকে ভেসে আসা সেই কণ্ঠ। সে সময় লক্ষ করিনি বা করার সাহস হয়নি। মানে ইনিই আমাকে তুলে এনেছেন। আমাকে আড়ষ্ট দেখে তিনি সহজ হলেন। চারপাশে বিছিয়ে রাখা সোফাগুলোর একটা সিঙ্গেল সিটারে বসলেন। আমার চোখের মণি তখনো ডানে বা বামে সংখ্যা না পাওয়া শূন্য, স্থির। অস্তায়মান সৌন্দর্যের আলোতেও দৃষ্টিশক্তি ঝলসে যায় মাঝেমাঝে, আমারও ঠিক তেমনি হলো। মনে হলো কোনো এক নিবিড় শিল্পী তার ভাবনার সর্বোচ্চ তুলি দিয়ে এঁকে রেখে গেছেন কোনো এক চিত্রকর্ম- বহুদিন এর খোঁজ কেউ পায়নি। না ফ্রেমবন্দি তো নন, জলজ্যান্ত, আমার সামনে, বসা। বয়স আন্দাজ করার মতো ভুল করতে চাই না আমি।

বসব কি বসব না এই সিদ্ধান্ত নিতে কিছু অতিরিক্ত সময় লাগে আমার। তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে, যেন কিছু খুঁজছেন। তার দৃষ্টির মাইক্রোস্কোপে নিজের অবস্থানকে খুবই ক্ষুদ্র মনে হয়। সামনের নয়, আমি বসার জন্য তার ডান দিকের সোফাটিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'আই থিংক ইউ শুড টেক আ শাওয়ার, কাম, কাম উইথ মি, তুমি ভিজে গেছো।' বলেই সোফা থেকে উঠে ডুপ্লেক্সের সিঁড়ির দিকে দুই ধাপ এগোলেন। ওনিয়ন পিঙ্ক কালারের একটা লম্বা গাউন তার পরনে, ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো বেঁকে গিয়ে সামান্য পেছন ফিরে আমাকে বললেন, কাম, প্লিজ কাম উইথ মি। প্রতি দুই ধাপ পর পর দূরত্বে সিঁড়ির দেয়ালে একটা করে ছবি ঝুলানো। সম্ভবত সিলিলি ব্রাউনের আঁকা, সম্ভবত নয় এগুলো সিসিলি ব্রাউনেরই, 'নাইট প্যাসেজ', 'গার্ল ওন এ সুইং', 'টিন এইজ ওয়াইল্ড লাইফ', আরেকটি, হ্যাঁ 'হাই সোসাইটি'। বাড়িতে টাঙানো ছবি দেখেও বাড়ির রুচির আন্দাজ করা যায়। আমি হাঁটছি, এক ধাপ এক ধাপ করে, তিনিও হাঁটছেন, যেন জানেন আমি এক ধাপ এক ধাপ করে হাঁটব আর কথা বলব দেয়ালে টাঙানো সিসিলি ব্রাউনের সাথে। লাস্যময়ী তরুণীর হেলানো শরীরের মতোই সিঁড়িটি- দোতলায় লম্বা এক টেরেস, সাদা মার্বেলে মোড়ানো, ছাদ থেকে ঝুলে আছে তিনটি বড় বড় ঝাড়বাতি, যাদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সনির্বন্ধ আলোর চুমুর হেঁয়ালি আভা।

'দেয়ার, প্লিজ গো, টেক আ শাওয়ার। বি ফ্রেশ।' আমাকে রেস্ট

রুম দেখিয়ে দিয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে ট্রিপ্লেক্সের সিঁড়ি দিয়ে তিনি তরতর করে উঠে গেলেন তিনতলায়। তার চলে যাওয়ার রেশ মিইয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকলাম সিঁড়ির দিকে। তিনতলায় ওঠার সিঁড়িতেও ঝুলে আছে বেশকিছু ছবি। মধ্যবয়স্ককেও দেখছি না, সম্ভবত তার আজকের ডিউটিতে ইতিমধ্যে 'ইতি' লেখা হয়ে গেছে। বেড়ালটিও, কিছুক্ষণ আগেই আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনিবের ছায়া মেপে মেপে উঠে গেল তিন তলায়। ভিজে গেছি বলে নয়, আমাকে শাওয়ার নিতে হবে এমনটাই লেখা ছিল স্ক্রিপ্টে। রেস্টরুমে ঢুকে চমকে গেছি এ কথা এখন আর বলছি না- এ বাড়ির সবকিছুতেই বড্ড বেশি রকমের বাড়াবাড়ি সে আমি বুঝে গেছি। ঢাকা শহরের যে ফ্ল্যাটগুলোকে বড় বলা যায় সেসব ফ্ল্যাটের মাস্টারবেডের চেয়েও বড় রেস্টরুমটা। পুরো রেস্টরুমটা আয়নায় মোড়ানো। এমনই স্বচ্ছ আয়না তাতে শরীরের চামড়া ভেদ করে হৃদয়ের চামড়াও গোচরীভূত হয়। এখানেও একটা ছবি ঝুলানো। আগে দেখিনি। বেশ বড়, তবে ফার্স্ট কপি নয়। ছবিটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছবির নিচে আর্টওয়ার্কের নাম এবং ছবিটির শিরোনাম লেখা, 'ওউম্যান ইন আ টাব' এডলার ডেগাস, এ আঁকিয়ের নাম আগে শুনিনি। এক সময় এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। আঠারো'শ তিরাশি সালে আঁকা ছবিটি। একজন নারী, ন্যুড, সদ্য স্নান সেরে হাঁটু ভাঁজ করে বসা, বাঁম হাতটি সোজা, ডান হাত এমন ভাবে বুকের আড়াআড়ি নেওয়া যাতে স্তন দুটি চলে গেছে আড়ালে। একটা সাদা টাওয়েল দিয়ে বাম হাত মুছছেন, কী অসাধারণ। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম ছবিটির সামনে। র‍্যাকে ভাঁজ করে রাখা আছে আয়রন করা সাদা পাজামা আর ফতুয়া। পাটপাট করে সাজানো তিনটা ভিন্ন সাইজের সাদা টাওয়েল। শাওয়ার নেওয়ার জন্য আনুষঙ্গিক যা যা প্রয়োজন তার সবই উপস্থিত। বডিশপ থেকে শ্যাম্পু, রেজার, জেল, তেল এবং অন্যান্য। গরম এবং ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ। বাথটাব। এসবে অনভ্যস্ত আমি। কিন্তু সহজলভ্যতা মানুষকে অভ্যস্থ করে তোলে।

মেঘের মুখে তালা পড়ায় বাইরের বৃষ্টি ততক্ষণে বন্ধ। ঢাকার ধুলো আর বৃষ্টির ব্লেন্ড আমার শরীরে মেখে আছে। এই ময়লা না হয় হালকা ঠাণ্ডা হালকা গরম পানির মিশ্রণ আর সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করা যাবে কিন্তু হৃদয়ের দূষণ! জানি না। আপাতত জানতেও চাই না। এখন লম্বা একটা গোসল দেব। ততটাই লম্বা যতটা সময় পানির মধ্যে ডুবে থাকলে হৃদয়ের ময়লাও খানিকটা নরম হয়। বাথটাবে সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে ভালোমতো ঘষে ঘষে স্তরে স্তরে সাজানো ময়লা পরিষ্কার করলাম। রেস্টরুম থেকে বের হব কিন্তু জানি না স্ক্রিপ্টে পরের দৃশ্য কী? তবু বের হলাম। দেখি তিনি টেরেসের শেষ মাথায় ঝোলানো একটা দোলনায় বসা। প্রবল জ্বরে আসা কাঁপুনির মতো দুলছে দোলনাটি।

মৃদু পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি, পরনে সাদা ফতুয়া, সাদা পাজামা- নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না, চিনতে চাইছিও না। আসলে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না কে আমি? আমিও কি চিনি আমাকে? আমরা চিনি কেউ কাউকে?

আই এম হাংরি, ক্ষুধা পেয়েছে খুব। চলো... বাই দ্য ওয়ে, ইউ লুকস গ্রেট।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি হাঁটতে থাকলেন, ক্ষুধার্ত আমিও। তিনতলায় উঠলাম। এত বড় বাড়িতে কাউকেই দেখছি না। মধ্যবয়স্কা, তিনিও উধাও। বেড়ালটা যথারীতি মনিবের গাঁ ঘেঁষা। মিউ মিউ করাতে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। দুধসাদা পার্সিয়ানটা বার দুয়েক চেটে দিল তার মখমল গান, চেটে দিয়েই নিজের চোখ দুটোকে যথাসম্ভব সংকুচিত করে আমার দিকে তাকাল, হয়তো জানান দিল, তুই কে হে? দ্যাখ আমি কে? তিনিও প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন পার্সিয়ানটার কপালে। মুহূর্তে এই বাড়িতে তিনজন মানুষের মধ্যে আমি তিনি আর পার্সিয়ান- আমাকে কি সে শত্রু ভাবছে? ভাবুক। আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। বেড়ালটা হয়তো এমন ভাবছে না। নাকি আমিই অজান্তে তাকে বানিয়ে ফেলেছি শত্রু!

টেরেসের শেষপ্রান্তে জায়গায়টা, দুই ধাপ উঁচু, ডাইনিং স্পেস। ছোট্ট একটা টেবিল। তিনটা চেয়ার। স্পেসটার একদিকের দেয়াল জুড়ে স্বচ্ছ গ্লাস আর গ্লাসের বাইরের দিকে গ্রিল। এখান থেকে দূর দেখা যায়- দূর মানে একটা জলাধার, লেক? হয়তো। আলোরা সেখানে অস্থির, যেভাবে অস্থির আমাদের মন।

তিনজনই বসলাম টেবিলে। যে যার মতো। একটা চেয়ারে বেড়ালটা- তার জন্য বিশেষ এক চেয়ার, উঁচু, যাতে টেবিলে বসা মানুষ আর খাবারগুলো তার নাগালে থাকে। আমি কারও দিকেই সাবলীল দৃষ্টিতে তাকাতে পারছি না। তারা দুজনই সাবলীল। টেবিলে বিভিন্ন ধরনের খাবার তবে ফ্রুটসের আধিক্য। এসবে অনভ্যস্ত আমি, তবু খেলাম। তিনিও ডিনার করলেন। আমাদের সাথে পার্সিয়ানটাও, তার জন্য নির্দিষ্ট খাবার। বাড়িতে ঢোকার সময় লক্ষ করেছিলাম, মূল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আরেকটি ছোট বাড়ি- দুই, তিনটি রুম হবে হয়তো। ধারণা করি সেই বাড়িতে মধ্যবয়স্কা, কাজের মানুষ, সিকিউরিটি বা অন্যরা থাকেন। মূল বাড়িতে থাকার অনুমতি হয়তো তাদের নেই। আমার অবশ্য এত কিছু না জানলেও চলবে। পুরো বাড়িটি কতটুকু জায়গায় হবে? বিঘা দুয়েক?

আমার ভাবনায় বিস্ময়ের জাফরান ছিটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি? নাকি ঐ দুধসাদা বেড়ালটা আর আমি একই? জানি না। তার জিজ্ঞাসায় যতটা সম্ভব মাথা ঝাঁকালাম, যার অর্থ কখনো দাঁড়ায় হ্যাঁ, কখনো না। দুনিয়া তো টিকেই আছে এই হ্যাঁ আর না-এর মাঝে।

জীবনে নতুন এক অথবা নতুন জীবনে এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। অবশ্য এখন পর্যন্ত যা হয়েছে সেগুলো সবই ছিল নতুন। আমাদের খাওয়া শেষ হলো। আরও কিছু সময় বসে রইলাম। কথা চলল, কথাদের ভঙ্গিমায়। পার্সিয়ানটা পাশের আরাম কেদারায় গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল করিনি। বেড়ালরা নাকি তাদের আয়ুর সত্তর ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায়। আহা যদি একটা বেড়াল জীবন পেতাম! বেড়ালটাকেও কি আমার মতোই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এই অবস্থানে আসতে হয়েছে?

তিনি উঠলেন। আমিও। তিনি হাঁটছেন, আমিও। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ব্যক্তিগত ছাদে উঠলেন, আমিও। ছাদের কিনারে রেলিং ধরে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমিও। আশপাশের বাড়িগুলো এ বাড়ির তুলনায় বেঁটে। তিনি ছাদের লেকসাইডে পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসলেন। আমিও। অনেকক্ষণ চুপচাপ তিনি। আমিও। উঠে বসলেন তিনি। আমিও। যেন দুনিয়ায় তিনি আর আমি ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। ছাদে পেতে রাখা ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। আমিও। লক্ষ করলাম ছোপছোপ মেঘমাখা চাঁদটা নেমে আসছে। সিলভিয়া প্লাথের কথা মনে পড়ছে, আত্মহত্যা করার জন্য ঠিক ক্যামন দিন তোমার পছন্দ! অদক্ষ হাতে দেওয়া নীলশুকনো ছোপ ছোপ সাদা কাপড়ের মতো মেঘাছন্ন কোনো এক রাত বেছে নিয়ো তুমি, আর চাঁদটাকে বোলো সে যেন কলঙ্কভার নিয়েও নেমে আসে, শর্তহীন। আমি তবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি? তিনি উঠে বসলেন। আমিও। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মুখ আকাশের দিকে তুলে এলোমেলো ঘুরছেন এখন। আমিও।

ছাদের একপাশের কিছু অংশে টিনের শেড দেওয়া ছোট একটা কুঁড়েঘর। সেখানে পেতে রাখা টি-টেবিলে গিয়ে বসলেন তিনি। আমিও। রেড ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিলেন তিনি। আমিও। এক ঢোক মুখে ঢাললেন। আমিও। তিনি আরেক পেগ মুখে ঢাললেন। আমিও। তিনিও। আমিও। তিনিও। আমিও। তিনি আবার। আবারও তিনি। হয়তো আবার। হয়তো না, আবারও তিনি। আমার কানে এই মুহূর্তে বাজছে সালেহা বু, সালেহা বুর কণ্ঠের বৃষ্টিজাত হাসি বেজেই চলেছে। বাজছেই মাতাল কণ্ঠের সেই রিনিঝিনি হাসি। সালেহা বুবুকে আর কতগুলো কুকুর আক্রমণ করেছিল জানি না, আমিই কি পেরেছি তাকে কুকুরের হাত থেকে রক্ষা করতে! পারিনি। বিয়ের ছয় বছর পার হলে আর শ্বশুরবাড়ি যাবেন না বলে সালেহা বু একদিন আমাদের বাড়ি ফিরে আসেন। তখন আমি

পনের বছরের আর সালেহা বু একুশে। সালেহা বুকে শ্বশুরবাড়ি ফেরত পাঠানোর জন্য অনেক চেষ্টা চলল, সে যাবে না বলেছে তো বলেইছে। মরে গেলেও যাবে না সে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বুবু কেন যাবে না ফিরে? বুবু বলেছিল, তুই কি আবারও কুকুরের মুখে ছেড়ে দিবি আমায়? আঁতকে উঠেছিলাম, জড়িয়ে ধরেছিলাম তাকে। 'না না কিছুতেই না।' সে-ও তার দুই হাতের তালুতে আঁজলা ভরা পানি নেওয়ার মতো তুলে নিয়েছিল আমার মুখ। দুই হাতের মধ্যে পানিকে আটকে রাখা যায় না, ততদিনে তা বুঝে গেছিল সে, কিন্তু আমরা আটকে গেছিলাম একে অপরে। প্রথমবারের মতো সে আমার ডান কানের লতিতে চুমু দিলে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে দিতে বলেছিলেন, আমিও দিয়েছিলাম, কুঁকড়ে গিয়েছিল সে-ও। তারপর চুমু দিয়েছিলেন থুঁতনিতে, আমিও। তারপর কপালে। আমিও। আমার ঠোঁটের উষ্ণতা নিতেই কি না চুমু দিয়েছিল আমার ঠোঁটে। আমিও। প্রথম চুমুতে কেমন একটা সুড়সুড়ি লেগেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল আমার শরীর, উষ্ণতা কমাতেই আমিও...। সেদিনও ছিল আজকের মতো এমনই বৃষ্টিগন্ধা রাত। বুবুর পরনে ছিল একটা পেঁয়াজরং শাড়ি। পেঁয়াজের খোলস ছড়ানোর মতো আমি খুলে ফেলছিলাম তার কোমরের ভাঁজে গুঁজে রাখা শাড়ির কুচি। তার সে কি রিনিঝিনি হাসি! গাঢ় অন্ধকারে জোনাক পোকা হয়ে জ্বলছিল। নিজের শরীরের কাদা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। এঁটেল কাদা দিয়ে বিভিন্ন রকমের খেলনা বানানোয় সুনাম ছিল আমার। সে রাতের বাকিটা সময় আমি পরম যত্নে তার শরীরের কাদা দিয়ে আমার পছন্দের সব খেলনা বানিয়েছিলাম। আর রাতের বাকিটা সময় সে আমার কানে থেমে থেমে হেসেছে। সেদিন রাতেও বিসমিল্লা খাঁ-র সানাইয়ের স্বরে বেজেছিল বৃষ্টি। সে রাতে আমি আমিতে ছিলাম না, সে রাতে সে ছিল না নিজের মধ্যে।

নেশা কি এই মুহূর্তে আমার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে? আমি কি হালকা হয়ে গেছি? পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চির ব্যায়াম করা তেয়াত্তর কেজির আমার সুঠাম দেহ কি কিছুটা হলেও ওজন হারিয়েছে? ঠিক বুঝতে পারছি না, তিনি নিজের কাঁধে আমার ডান হাত রেখে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? কোথায়? বুঝতে পারছি আমরা নামছি, সিঁড়ি দিয়ে, ছোপ ছোপ নীলাক্রান্ত আকাশটাও নামছে, আমাদের সাথে নামছে কলঙ্কিত চাঁদটাও। সিলভিয়া প্লাথ কোথায়? আমার প্রিয় সিলভিয়া প্লাথ, চিৎকার করে ডাকছি তাকে, তার কবিতার আমার প্রিয় পঙ্‌ক্তিগুলো আওড়াচ্ছি, 'আমি হেলান দেই তোমার ওপর, জীবাশ্মের মতো অসাড় আমাকে জানাও আমি আছি তোমাতেই।'

কই আমার প্রিয় সিলভিয়া প্লাথ, একটু জড়িয়ে ধরবেন আমায়? খুব শীত করছে। আমার কথারা নতুন সাইকেল চালাতে শেখা বালক বা বালিকার হ্যান্ডেলের মতো এলোমেলো, নিয়ন্ত্রণহীন।

'রাতের আকাশ যেন শুধু কয়লা কালো কাগজ, তারাগুলো ছিদ্র করে নীলকালো আকাশকে, রাস্তা তৈরি করে দেয় আলো প্রবেশের, আসলে সকল কিছুর পেছনেই মৃত্যু সমান হাড়-সাদা আলো।'

আওড়েই যাচ্ছি আমি। বাতাসের শরীরে আশ্রয় খুঁজে নিতে সচেষ্ট বোঁটাহীন ঝরা পাতাটির মতো অবস্থা আমার পায়ের। টলছি, তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় জানি না। আমি বলেই চলেছি, 'আমি? আমি হাঁটি, একা; তোমার পায়ের তলায় ঘূর্ণায়মান মধ্যরাতের পথ, চোখ দুটি অন্ধ আমার। স্বপ্নজাত বাড়িগুলো সব মৃতপ্রায়, আমার চাওয়ায় ছাদগুলোর মাথায় চাঁদের গোলাকার মুখ ভেসে থাকে, উঁচুতে।'

আমি কী আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। তিনি কেন সেই পরিচিত রিনিঝিনি হাসির ঢেউ তুলেছেন? বুঝতে পারছি আমার পা মাটি খুঁজে পাচ্ছে না। সদ্য বুলি শেখা শিশুদের মতো জড়িয়ে আসছে কথারা। এখনো আমার বাম হাত তার ডান কাঁধে। এই বাড়িতে সাদার এত আধিক্য কেন? সালেহা বুর কণ্ঠের রিনিঝিন আমার কানে বেজেই চলেছে।

আমাদের গ্রামের বাড়িগুলো ছিল একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। দুই-তিনটা বাড়ির একটা করে গুচ্ছ। বাড়িগুলো উঁচু একটা দ্বীপের মতো। আর চারদিকে ধান ক্ষেত। আমাদের বাবারা দুই ভাই। আমাদের যৌথ পরিবার। আমরা সাত ভাইবোন। সালেহা বু সবার বড়। নাসরিন আপাও ততদিনে বড় হয়ে গেছে। খুলনা প্রকৌশল কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছেন। বাকিরা ছোট। আব্বা আর চাচা দুইজনেরই ট্রান্সফারের চাকরি। তাই মায়েরাই আমাদের আব্বা, মায়েরাই আমাদের মা। আমাদের দাদা-দাদি দুজনেই শুয়ে আছেন বাড়ির পেছনের কামিনী তলায়। আমাদের অনেকেই তাদের দেখিনি। সালেহা বুবু যখন নাসের ভাইকে রেখে ফিরে এলো তখন আমি ক্লাস টেনে। পরের বছরেই এসএসসি। খুব ভালো ছাত্র হিসেবে ডাক-নাম আমার। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর সালেহা বুবু আমার অবলম্বন হয়ে উঠেছিল অথবা আমি তার। মূল বাড়ি থেকে আমাদের বৈঠক ঘরটা বকের দেহ থেকে তার ঠোঁটের দূরত্বের মতো প্রায় বিচ্ছিন্ন, বাড়ির একদম পশ্চিমে। দাদা-দাদির কবর ঘেঁষে। কামিনী গাছটা আমাদের বৈঠক ঘরের জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি সেখানেই পড়াশোনা করতাম। আমার বিপরীত পাশে বসে সালেহা বু গল্পের বই পড়ত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ চলে যাওয়া ছিল আমার পড়তে বসার রুটিনের চেয়েও নিয়মিত। বিদ্যুৎ চলে গেলে তাই আমাদের দুজনের অবলম্বন হতো হ্যারিকেনটা। হ্যারিকেনের আলোয় সালেহা বু হয়ে উঠত অচেনা কেউ। ছোটরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ত সন্ধ্যার পরপরই। কর্মক্লান্ত মায়েরা আরও কিছু সময় পর। কিন্তু আমাকে পড়তে হতো। অনেক রাত জেগে পড়তে হতো। সালেহা বু ফিরে আসার পর আমার পড়াশোনার সময় আরও বেড়ে গিয়েছিল। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, তার কিছু সময় পরেই বিদ্যুৎ চলে যেত এবং এটাই ছিল নিয়ম। হ্যারিকেনের আলোয় একেক রাতে বুর চেহারায় ভর করত একেক পরী। অনেকেই বলত কামিনী গাছে নাকি পরী বাস করত। বুবু হ্যারিকেনের আলো আরও কমিয়ে দিত। আমাদের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এলে পড়ার ঘরের পেছনের দরজা খুলে আমরা চলে যেতাম কামিনী গাছের তলায়। সালেহা বু খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন ত্বকের সর্পিণী হয়ে উঠত, তার দংশনে নীল হয়ে উঠতাম আমি। কামিনীর ঘ্রাণে আমার শরীরের বিষ শুষে নিত সে, আর আমি শুষে নিতাম তার সকল বিষণ্ণতা। সালেহা বু দিনদিন ঝরঝরে নতুন চালের ভাত হয়ে উঠছিল। আমি কাঁচা আমের মৌসুমে শামুক ঘষে বানানো ধারালো ছুরি। আমরা একে ওপরকে কাটছিলাম। আমরা একে অপরকে লাগাচ্ছিলাম জোড়া।

পরিচিত সেই ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছি না। আমার চোখে বিস্ময়ের খই ফুটছে। সে কখন কাপড় পালটে সাদা সিল্কের গাউন চাপিয়েছে তার আগুনে। গাউনের আড়ালের জোড়া পায়রা ইবাদতের ভঙ্গিতে নিচু স্বরে ডেকেই চলেছে বাক-বাকুম-বাক...

আমি তার হাত ধরে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আহ কামিনীর ঘ্রাণ, আমার শরীরে বহমান বিষের ওঝা। কামিনীর ঘ্রাণই কি আমাকে টেনে এনেছে এখানে? দুজনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম জানালার পাশে, যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় কামিনী ফুলের গাছ। মৃদু আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। সাদা গাউন, ঘরের পর্দাগুলো সব সাদা, ঘরের তিন পাশের দেয়াল সাদা, এক পাশে টানা আয়না। বিশাল ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে পাতা একটা বিছানা, বিছানার চাদরের রং সাদা। ওয়াইনের নেশা আমার কাটেনি।

সালেহা বুর কণ্ঠের রিনিঝিনি এখনো বেজেই চলেছে এস্রাজের ঢঙে। আমি চোখ বুঝে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে সেসব দুপুরের কথা। আমার ফেরত আসা অব্দি অপেক্ষায় থাকত সবাই। স্কুল থেকে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম ঘোলা পুকুরের জলে। গোসল নয়তো, যেন উৎসব। চারদিকে গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুর। সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমাদের চোখ ঘোলা না হওয়া পর্যন্ত বা আমাদের মায়েদের যে কোনো একজন লাঠি নিয়ে পুকুরপাড়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত চলত আমাদের দাপাদাপি। সালেহা বু ফিরে আসার পর আমার সাঁতারে লাগে নতুন রং। আমি আর সালেহা বু সামনা-

সামনি দাঁড়াতাম। গলা পানিতে ডুবে থাকা আমাদের শরীর কথা বলত নিজেদের আবিষ্কৃত নতুন ভাষায়, সে ভাষা কখনো অক্ষর পায়নি কিন্তু পেয়েছে স্বর, সে স্বরের সাথে আমরা অপরিচিত। সেবার বাড়িতে কেউ ছিল না। পাশের গ্রামে ফুফুদের বাড়িতে ফুপাতো বোনেদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছে সবাই। বিয়েবাড়িতে ঘুমানোর জায়গা না থাকায় সালেহা বু আমি আর ছোটরা ফিরে এসেছিলাম আমাদের বাড়িতে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতের গভীরে সন্তর্পণে সালেহা বুবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল পুকুরঘাটে। বাঁধানো সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে সালেহা বুবু আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলেছিল। অন্ধ অবস্থাতেই বুবু আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে নেমে পড়ে পুকুরে। আমরা সারা রাত গলা পানিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই কাটিয়ে ছিলাম। পুকুরে ঝুলে থাকা শিউলি গাছ থেকে আমাদের ওপর শেষ রাতের দিকে শিউলী ঝরে পড়ছিল। পুকুরের জলে ভাসা আমরা আর শিউলীরা আর শেষ রাতের সীমাহীন নৈঃশব্দ্য একাকার হয়েছিল। ফজরের আজানে ঘোর কাটে আমাদের।

তিনি আমাকে জড়িয়ে আছেন। তার এক হাতে রেড ওয়াইনের গ্লাস। আমার পিঠে তার বুক মিশে আছে জন্মদিনের বড় কেকের গায়ে লেপ্টে থাকা ক্রিমের মতো। পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে সে আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিচ্ছে ওয়াইনের গ্লাস, চুমুক দিচ্ছি আমি। তার আরেক হাতের আঙুলের ডগা ছোবল মারছে আমার বুকের ঘন লোমে। তিনি আলতো করে আমার বাবরি চুল সরিয়ে কানের লতির ঠিক নিচের জায়গাটায় চুমু দিলে কেঁপে উঠি আমি। কেঁপে ওঠে আমার স্মৃতিপর্দা। কোথা থেকে যেন আমার কানে ভেসে আসছে সালেহা বুবুর রিনিঝিনি হাসি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই আমরা মানে আমি আর সালেহা বুর সময় কাটছিল আকাশের রং মেখে উড়তে থ াকা শিমুল তুলোর মতো। নাসের দুলাভাই তিন-চার বার এসে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছেন। বুবু তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় বুর চেয়েও আনন্দিত হতাম আমি। কিন্তু মাস তিন পর সালেহা বুবুই নাসের ভাইকে ডেকে পাঠালেন। কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। নাসের ভাইয়েরা অনেক বড়লোক। এতটাই বড়লোক যতটা হলে দুলাভাইকে কোনোদিনই চাকরি বা আয় নিয়ে ভাবতে হয়নি। বাড়ি ফেরার রাস্তা ভুলে যাওয়া উদভ্রান্ত বাছুরের মতো অবস্থা আমার। যাওয়ার আগের রাতে সালেহা বুবু কামিনী গাছের তলায় আমাকে ডেকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল, তার চোখের জলে ভিজল আমার বুকের বাগান। মাসখানেকের মধ্যে খবর এলো বু সন্তানসম্ভবা। কিন্তু! নাসের ভাইয়ের ব্যাপারে সালেহা বু কী কী যেন বলেছিল! বহুদিন পর বাড়িতে নতুন বাচ্চা আসবে এই জেনেই বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সদ্য কৈশোর ফেলে আসা আমার মনেও। আমাদের মায়েদের আনন্দ ছিল ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। বাড়িতে সে আনন্দের উদযাপন চলে অনেকদিন। নিয়মের বলিতে ঝুলেই পড়তে বসতে হতো আমাকে। পশ্চিমের ঘরে নয়, আমাদের মায়ের ঘরে, আমাদের মা আমার টেবিলের পাশের বিছানায় শুয়ে থাকতেন। আমি বড় বড় উচ্চারণে পড়তাম। পশ্চিমের পড়ার ঘরের জানালা বন্ধ থাকায় আমার নতুন ঘর পর্যন্ত কামিনীর ঘ্রাণ এসে পৌঁছুতে পারত না।

কামিনীর ঘ্রাণ আমাকে জাপটে ধরছে, যেভাবে জাপটে ধরে আছেন তিনি। আমার ঘুম আসছে, তিনি হাসছেন কিন্তু আমার কানে সালেহা বুবুর কণ্ঠের রিনিঝিনি। সেই কামিনীর ঘ্রাণ। তিনি আমাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আমি ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি, ঢুলুঢুলু। না কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। আমার পাশে এসে শুয়ে পড়লেন তিনিও।

সালেহা বুবু মাস কয়েক পর ফিরে এসেছিল। শরীর ভারী হয়েছিল কিছুটা। গর্ভকালীন সময়ের শেষের দিকে মেয়েদের মায়েদের কাছে থাকতে হয়। আমি অবাক হয়ে দেখেছি, ফিরে আসার পর সালেহা বুর শরীর থেকে বেরুতো তীব্র কামিনীর ঘ্রাণ। আমিও তাই ঘুরেফিরে সালেহা বুর চারপাশেই থাকতাম, বুবু ফিরে এলেও আমরা আর পশ্চিমের ঘরে বসিনি কোনোদিন। আরও কিছুদিন পর একদিন বুবুই বলেছিল, কামিনী গাছটা মরে যাচ্ছে, দেখেছিস।

না, আমি আর কোনোদিন কামিনী তলায় যাইনি। বুবুর শরীরে কামিনীর ঘ্রাণ ক্রমশ গাঢ়তর হচ্ছিল। একদিন নাসের ভাই এসে বুবুকে নিয়ে গেলেন এই বলে যে, আগত বাচ্চার নিরাপত্তায় শহরের হাসপাতালের প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের মায়েরা সময়মতো গিয়ে হাজির হবেন, এমনই কথা। আরও কিছুদিন পর খবর এলো সালেহা বু নেই।

রেড ওয়াইনের নেশা আমাকে জড়িয়ে আছে পুরনো দেয়ালের গায়ে লেগে থাকা শ্যাওলার মতো! তার শরীরের কাদায় ডুবে যাচ্ছি, জানি না ইচ্ছেকৃত কি না? কতদিন পর এই পুনরাবৃত্তি? তাও জানি না, কিন্তু কেন? গত সাত বছর তো কেটেছে এভাবেই? কেন নিজেকে পুনরায় সেই কামিনী ঘ্রাণের কাছে সঁপে দেওয়া! তারও নেশা হয়েছে! দীপ্তি, যার নাম, এখনই জানলাম, দুদিকে ধারালো কেঁচির মতো দুই পা ছড়িয়ে আমার বুকের ওপরে উঠে বসে দীপ্তি! আমি যেন নতুন কাপড়ের থান, আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে এলোমেলো করে ফেলবে এক্ষুনি! ওহ দীপ্তি, দীপ্তি কেন তুমি উন্মুক্ত করেছ তোমার বুকের বাক-বাকুম পায়রা জোড়াকে, কেন! বিছানার পাশের ডিভানে এসে বসেছে পার্সিয়ান বেড়ালটা, দেখছে আমাদের। আমাকে দেখিয়ে পার্সিয়ানটা গাল চেটেছিল মনিবের, সে বুঝে গেছে সেটার শোধ তুলছি আমি।

সালেহা বুবু ফিরে এসেছিল আমাদের বাড়িতে, আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, পলকহীন। সে পলক আর পড়েইনি। আমাদের আব্বারা মেনে নিয়েছিলেন, আমাদের আম্মাদেরও মেনে নিতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধনীদের গলার আওয়াজে পুলিশ-থানা-আদালত সবাই বোবা হয়ে গিয়েছিল। বুবুকে দাফন করা হয়েছিল মৃত কামিনী গাছের তলাতেই। অনেক পরে শুনেছিলাম কুকুর নাসেরের বন্দুকের নলের খোঁচায় রক্তপাত হয় বুবুর পেটে, বুবুসহ পাখি হয়ে গিয়েছিল বুবুর পেটের পাখিটাও। কিন্তু সালেহা বু তো মরতে চায়নি।

আমিও মরে গেছিলাম। পড়াশোনা আমার সারা দিনের সালেহা বু হয়ে ওঠে। আমি পালিয়ে আসি এই শহরে। ভর্তি হই নটরডেম কলেজে। সালেহা বুর কথা রাখতে মেডিকেলে চান্স আমাকে পেতেই হতো। চান্স পাই ঢাকা মেডিকেলে। সালেহা বু নেই তাই, চান্স পেয়েও পড়িনি। ভর্তি হই বুয়েটে, আর্কিটেকচারে।

এই এতগুলো বছরে কতজন চেয়েছে আমায়। আমার প্রশস্ত বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দীপ্তির ইচ্ছেরা, তার যৌবনের ঘোড়া বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সে জেনে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্ত হবে ঘোড়া। আমি তো এতদিন কাউকে স্পর্শ করিনি, কাউকেই ঘেঁষতে দিইনি। তবে আজ, কেন এই সন্ধ্যায় নাটাই থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় ঘুড়ি?

আমার ডান কানের লতির নিচে চুমু দেয় দীপ্তি, আমিও দিই। তারপর চিবুকে, আমিও দিই। তারপর কপালে, তারপর তারপর তারপর... আমিও দিই যেখানে যেখানে দীপ্তি দেয়। আমাদের ঠোঁটে জড়ো হয় পৃথিবীর সকল উষ্ণতা। কাদা দিয়ে খেলনা বানানোর সেই পুরনো অভ্যাসের কাছে নত হই আমি। আমাকে জাপটে ধরে দীপ্তি। দীপ্তির শরীরের আগুন পোড়াচ্ছে আমার চাবুককে। স্বর্গীয় চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে সে-ও। সে যেন হয়ে উঠেছে হাপর, সুদক্ষ কামারের মতো পোড়াচ্ছে আমাকে, গলে গলে আকার পাচ্ছি, দৃঢ় হচ্ছি, আবার গলে যাচ্ছি। তাকেও পোড়াচ্ছি, পুড়ছি- দুজনেই। আমার কানে এখনো সালেহা বুবুর কণ্ঠের সেই রিনিঝিনি। দীপ্তির বুকে থই থই করছে আমার বাড়ির পশ্চিমের পড়ার ঘরের জানালায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা কামিনী গাছ থেকে ভেসে আসা সেই পরিচিত ঘ্রাণ। দূর থেকে পার্সিয়ানটা দেখে যাচ্ছে সবকিছু।

প্রবল আবেগে বুকের ভেতরে জড়িয়ে রেখেছিলাম, সহসা কামিনীময় দীপ্তিকে ছুড়ে মারি বিছানার বিপরীত প্রান্তে, সমুদ্র তীরে সহসা ভেঙে পড়া অসহায় ঢেউয়ের মতো কাঁদতে থাকি আমি, কাঁদতেই থাকি।

সাহাদাত পারভেজ

বিশ শতকের বাঙালি জীবন

ভূমিকা

জীবন তো সবাই পায়, কেউ কেউ পায় দীর্ঘ জীবন। তবে গোলাম কাসেম ড্যাডির মতো আলোকচিত্রময় জীবন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। শতায়ুর জীবনে তিনি ৮৬ বছর ক্যামেরা নিয়েই মেতেছিলেন। শুরুটা হয়েছিল কিন্তু হাওড়ার মধুসূদন বিশ্বাস লেনে এলসি নামে এক খ্রিস্টান তরুণীর দম্ভকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে। সেই ১৯১২ সালে ক্যামেরা হাতে নেন তিনি। মায়ের কাছ থেকে ১০ টাকা নিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গি থেকে কেনেন এনসাইন বক্স ক্যামেরা। প্রথমে বাড়ির আশপাশের চেনাজানা মানুষ পরে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঐতিহাসিক স্থাপনা, রেলস্টেশন, পোতাশ্রয় আর চিড়িয়াখানার ছবি তুলতে শুরু করেন। এরপর কলেজজীবন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ, সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি, অবসরের পর ঢাকায় স্থায়ী বসবাস; মোটকথা যখন যেখানে গেছেন ক্যামেরাটা তার সঙ্গেই ছিল। এক অদ্ভুত ক্যামেরার প্রেমে কেটে গেল জীবন! এ এমনই প্রেম যে, সব সঞ্চয় আর সময় তিনি বিলিয়ে দিলেন ছবি তোলার পেছনে। আর এসব কারণেই তিনি হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের আলোকচিত্রের পিতা। শ্রদ্ধার শিরোপা হিসেবে পেলেন 'ড্যাডি' খেতাব। আলোকচিত্রের সাধনাই তাকে করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী।

বিস্মৃত সময়

তিনি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করেন তখন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সমাজে ছবি তোলাটা গর্হিত কাজ হিসেবেই বিবেচিত হতো। ওই রকম একটা প্রতিকূল পরিবেশে ক্যামেরা নিয়ে তাকে লড়তে হয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঘরবন্দি নারীদের তুলে ধরেছেন সবার সামনে। সে সময় এটা ছিল একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। আমাদের অতীতে ভারতীয় উপমহাদেশে তার আগে কোনো বাঙালি মুসলমান আলোকচিত্রীর কাজের বিশেষ কোনো ঘরানা তৈরি হয়েছিল কি না, জানা যায় না। হলে নিশ্চয়ই তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকত। কী আছে তার ছবিতে কিংবা তিনি কেন অন্য আলোকচিত্রকরের থেকে আলাদা; তার ছবি পঠনের মধ্য দিয়ে তা খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশ শতকের বাঙালি জীবন আর আমাদের না দেখা বিস্মৃত সময় ধরা আছে তার ক্যামেরায়। পশ্চাৎপদ সমাজ আর উপনিবেশ রাজনীতির বিপরীতে তার ছবিগুলো বাঙালি মুসলমান সমাজের আধুনিক হয়ে ওঠার এক অবিনাশী দলিল। ড্যাডির ছবি দেখলে বোঝা যায়, কেমন ছিল বাঙালি সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ। তার ছবিগুলোতে আছে বাংলার অদম্য ভবিষ্যতের রূপরেখাও।

টিকে থাকা নেগেটিভ

সারা জীবনে হাজার দশেক ছবি তুলেছেন ড্যাডি। শুরুর দিকের তিন বছরের নেগেটিভগুলোর কোনো হদিস নেই। তবে ১৯১৫ সাল থেকে জমানো অসংখ্য গ্লাস প্লেট বা কাচের পাত পুরনো কাগজপত্রের স্তূপের পাশে তিনি যত্ন করে রেখেছিলেন। তার ছিল বদলির চাকরি। জায়গা বদলের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্লাস প্লেট ভেঙেছে, নষ্ট হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিংবা হারিয়েছে। জীবনের শেষ দিকেও পাঁচশোরও বেশি নেগেটিভ তার সংগ্রহে ছিল। নবতিপর বয়সে নাসির আলী মামুনের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা ফটোজিয়ামে তিনি ১৩৫টি গ্লাস প্লেট সংরক্ষণের জন্য দেন। এগুলোই তার জীবনের সেরা কাজ। জীবনের একেবারে শেষের দিকে বিভিন্ন ফরমেটের ১৬৫টি নেগেটিভ দেন দৃক পিকচার লাইব্রেরিকে। পাঁচটি মিডিয়াম ফরমেট নেগেটিভ ছিল সিনেসিক অডিও ভিজ্যুয়াল ক্লাবের কাছে। তার মৃত্যুর পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেগেটিভসহ ক্যামেরা সরঞ্জাম বেহাত হয়ে যায়। বর্তমানে তার ১৭৭টি দুর্লভ নেগেটিভের অস্তিত্ব শনাক্ত করেছে ড্যাডির প্রতিষ্ঠিত ক্যামেরা রিক্রিয়েশন ক্লাব। বাকি তিন শতাধিক নেগেটিভ এখন কী অবস্থায় আছে তা অজানা। এই নেগেটিভগুলো উদ্ধার করা গেলে আলোকচিত্রশিল্পী ড্যাডিকে আবিষ্কার করা অনেকটাই পূর্ণাঙ্গতার দিকে এগোবে আর নতুন প্রজন্ম বাংলার আদি আলোকচিত্রের নিশানা জানতে পারবে।

ছবিতে গল্পের আবহ

শত বছরের জীবনে ড্যাডি দেখেছেন কত কিছু! ক্যামেরার অন্ধকারে আলো সাজিয়ে বন্দি করেছেন হাজারো মণিমাণিক। শুরুতে প্রকৃতিই তার ভালো লাগতো। এরপর তিনি মানুষের মুখের ছবি তুলতে শুরু করেন। আলো আর অন্ধকার দিয়ে ক্যামেরার সাহায্যে বলে গেছেন কত যে গল্প, আর নির্মাঠু করেছেন কত চরিত্র। তার ছবির চরিত্রগুলো দ্যুতিময়, তাদের চাহনি-শরীরী ভাষা অর্থপূর্ণ। কম্পোজিশন সরল আর গভীর আবেগ ধরা। সেই আবেগে ভর করে নরম আলোর সুনিপুণ সুষমা। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যই সমসাময়িকদের থেকে ড্যাডিকে আলাদা করে দেয়। আন্তর্জাতিক শিল্পবিষয়ক লেখক স্কাই অরুন্ধতী থমাস লিখেছেন, 'ড্যাডির ছবিতে স্পষ্ট অথচ ঘোলাটে বিচিত্র আলোর দেখা মেলে। তার ছবির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের খানিক মিল পাওয়া যায়। ভিগনেটিং [ছবির মাঝখানে আলো রেখে চারপাশ থেকে কালো হয়ে আসার শৈলী] এবং ওভার এক্সপোজারের এমন কাব্যিক ব্যবহার দুর্লভ।'

অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের মতো তিনিও ছিলেন চিরশিশু, তাই তার তোলা শিশুদের ছবি সবচেয়ে জাদুকরী। তার ক্যামেরায় ধরা শিশুদের অভিব্যক্তি আমাদের আজও শৈশবের স্বাদ এনে দেয়। শিশুদের ছবিতে এমন জাদুটোনার মন্ত্রটি তিনি পেয়েছিলেন কলকাতায় বসবাসরত বিখ্যাত ব্রিটিশ নারী আলোকচিত্রী এডনা লরেঞ্জের কাছ থেকে। এডনার কাছে তিনি পেয়েছিলেন পোর্ট্রেট তোলার মন্ত্রও। বিখ্যাত মানুষজনের ছবি তুলতে পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষের প্রাণময়তাই তুলে ধরতে চাইতেন। তাই পোর্ট্রেট তোলার সময় মুখের পরিবর্তনটা খেয়াল করতেন সবার আগে। মানুষের চেহারা একেক সময় একেক রকম হয়। দুঃখ কিংবা আনন্দ সবকিছুই চেহারায় প্রকাশ পায়। তিনি তার প্রত্যাশা মতো সরল কম্পোজিশনে চেহারাটা ধরতেন। অনেকের মনে হতে পারে, তার কম্পোজিশন এত সরল কেন। সরলতাই হচ্ছে ড্যাডির ছবির সৌন্দর্য। এই সরলতাকে বহু সাধনার মধ্য দিয়ে তাকে রপ্ত করেতে হয়েছে। ড্যাডির ছবি দেখে বোঝা যায়, তিনি নিজেও ছিলেন এক সরল মানুষ। এই সরল হৃদয় দিয়ে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন অসাধারণ সব শিল্পকর্ম।

গ্লাস প্লেট থেকে সেলুলয়েড

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে গ্লাস প্লেট নেগেটিভ দিয়ে ফটোগ্রাফিচর্চা শুরু করেছিলেন ড্যাডি। এই ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন গত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত। তিনি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করেন তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর কলকাতার স্টুডিওগুলোতে কোডাক ও আগফার গ্লাস প্লেট নেগেটিভ পাওয়া যেত। চার থেকে ছয় আনায় পাওয়া যেত ছয়টা গ্লাস প্লেট। ড্যাডির কাজের ধরন দেখে বোঝা যায়, তিনি ফটোগ্রাফির মূলধারার সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। প্রযুক্তিগত কারণে শেষের দিকে অবশ্য ওয়ান থার্টি ফাইভে ছবি তুলেছেন। ফটোগ্রাফিকে আর্ট মনে করতেন বলে সব সময় সাদাকালো ফিল্মেই ছবি তুলতেন। গ্লাস প্লেট থেকে সেলুলয়েড; এসব রুপালি রসায়নে কেটেছে তার সমস্ত জীবন। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে ড্যাডি ছাড়া আর কোনো আলোকচিত্রীর গ্লাস প্লেট নেগেটিভের অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায় না। ফলে তার কাচের পাতগুলোই এখন আমাদের সামাজিক ইতিহাসের মহামূল্যবান উপাদান।

আলোকচিত্রের অগ্রপথিক

ড্যাডিকে নিয়ে শিল্পবোদ্ধাদের আগ্রহ নানা কারণে। ইতিহাস বলে, এই ধীমান মানুষটির হাত ধরে এ দেশে আলোকচিত্র শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকার মনিপুরীপাড়ায়

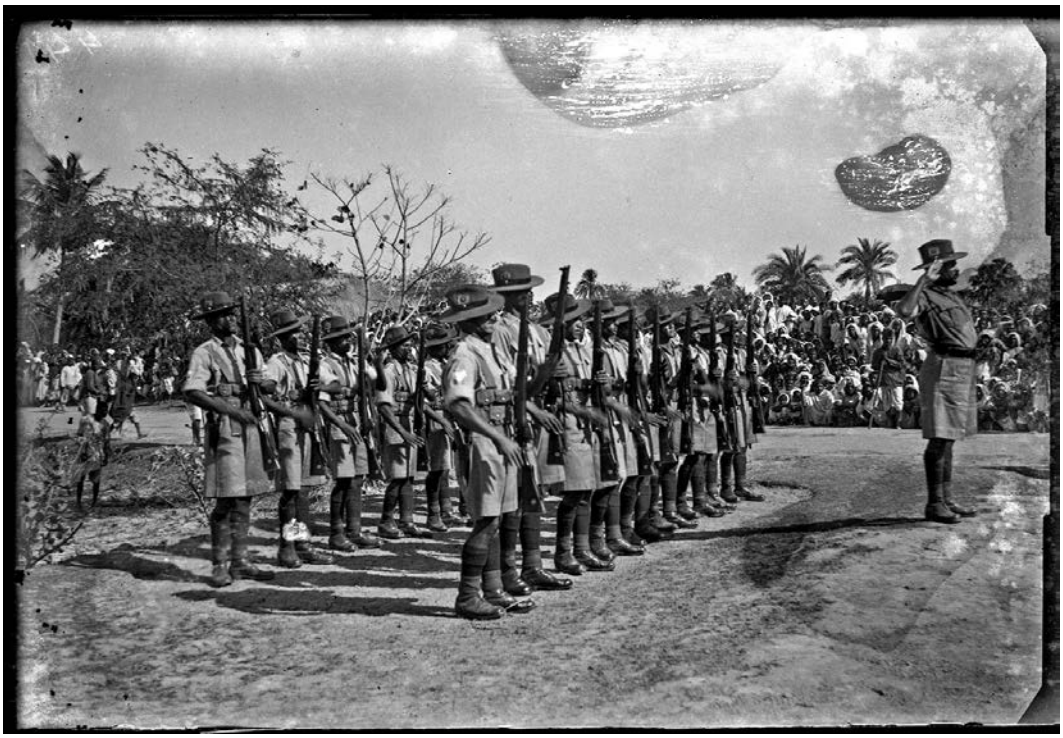

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রশিক্ষণ, মধুপুর, বিহার, ভারত ১৯১৫। মাধ্যম : গ্লাস প্লেট। আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি গড়ে তোলেন। এটিই পূর্ববঙ্গের আলোকচিত্র শিক্ষার প্রথম বিদ্যায়তন। ১৯৬২ সালে তার প্রতিষ্ঠিত ক্যামেরা রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাধ্যমে আলোকচিত্রের সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভিত তৈরি হয়। সে সময় তার ৭৩ নম্বর ইন্দিরা রোডের বাড়িটি এ দেশের সৃষ্টিশীল তরুণ-তরুণীরা গুলজার করে রাখতেন। ১৯৬৪ সালে লেখেন ফটোগ্রাফি শিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকা 'ক্যামেরা'।

ড্যাডি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রশিক্ষণ পর্বের অসংখ্য ছবি তুলেছেন শতাব্দীকাল ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি ছিল অজানা। সাধক স্বভাবি ছিলেন বলে নিজের কথা প্রচার করতে চাইতেন না। তার অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব আর নিভৃত জীবনযাপনের কারণে তার কালের মানুষরাও তাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে তিনি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও বিহারের মধুপুর রণপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অসংখ্য ছবি তোলার সুযোগ পান। ছবি তোলার পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে বসে তিনি যে গল্প লিখতেও শুরু করেন কিংবা তিনিই যে প্রথম বাঙালি মুসলমান ছোটগল্প লেখক সে কথাও কাউকে কখনো বলেননি। ড্যাডির শততম জন্মদিনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের মুখে শোনা গেল সে কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে অবশ্য ড্যাডি বলেছেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমি যত ছবি তুলেছি, আমার তো মনে হয় না ভারতবর্ষের আর কেউ এত ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছেন।'

আইকনিক ছবি

ড্যাডির ছবিগুলোকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাত্যহিক জীবন, প্রতিকৃতি, প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক স্থাপনা ছিল তার মূল আগ্রহের জায়গা। আত্মপ্রতিকৃতিও তুলেছেন। ছবি সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। তার এই সচেতনতা তৈরি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিলিটারি প্রশিক্ষণের কারণে। এই প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি তার নেগেটিভগুলো আলাদা আলাদা খামে ভরে পরম যত্নে সংরক্ষণ করতেন। খামের ওপর ে অক্ষরে ছবি তোলার সময় ও স্থান লিখে রাখতেন। তবে ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে তার ছবির মানুষজনের পরিচয় ছিল অজানা। বিশ শতকের নানা দশকে আলো ফেলে তার ছবির মানুষদের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছি ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে। কিছু পরিচয় ও ছবি তোলার নেপথ্যের ঘটনা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। সব পরিচয় উদ্ধার করা নিবিড় গবেষণা ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সামগ্রিক গবেষণার মধ্য দিয়েই বিষয়টি বেরিয়ে আসতে পারে। আমার সামান্য গবেষণার আলোকে ড্যাডির কিছু আইকনিক ও অদেখা ছবি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

বিশ্বযুদ্ধের দলিলচিত্র

মধুপুরের বিশাল প্রশিক্ষণ ময়দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফ্যানট্রি কোরের সদস্যরা। সবার হাতেই রাইফেল। প্রশিক্ষণের অগ্রভাগে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন মি. গ্রে। ঘন গাছগাছালির ছায়ায় বসে রণপ্রশিক্ষণ মহড়া দেখছেন উৎসুক মানুষ। প্রখর রোদের কারণে ইউনিফর্ম পরা প্রশিক্ষণার্থীদের দীর্ঘ ছায়া মাঠে প্রতিফলিত। স্লো রের কারণে সশস্ত্র অভিবাদনের সময় প্রশিক্ষণার্থীদের হাতগুলো সেইক করায় ছবিতে যোগ হয়েছে গতিময়তা। ড্যাডির এই ছবির মাধ্যমে যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের সমাজচিত্রের একটা দৃশ্যগত ধারণা পাওয়া যায়। সে সময় ভারতীয় সাধারণ নাগরিকরা যে ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সেই সাক্ষ্য দেয়। তা না হলে মধুপুরের মতো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন ব্রিটিশ সেনা ক্যাম্পের আশপাশে ঘেঁষতে পারতেন না। শত বছরের পুরনো নেগেটিভটির ওপরের দিকে ফাঙ্গাসের দঙ্গল। কিছু জায়গায় ছোপ ছোপ দাগ। নেগেটিভের বিস্তীর্ণ জমিন জুড়ে হালকা ছেপিয়া টোন। এসব অবশ্য ছবির অ্যান্টিক মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। এই ছবিটির জন্য ঐতিহাসিকদের কাছে ড্যাডি চিরকাল স্মরণীয় থাকবেন। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, তাঁবুর সামনে দুই ব্যক্তির সাহেবি ভঙ্গি। বোঝা যায়, ছবিটি অনুমতি নিয়ে তোলা। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কারও দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে নয়। তার মানে এ দৃশ্যটি তুলতে গিয়ে ড্যাডি একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ডের তাঁবুটি হঠাৎ দেখলে পিরামিডের মতো মনে হয়। তাঁবুটি ছবিতে একটা ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জণা তৈরি করে। ছবির দুজন

রহস্যময় তরুণী
হাওড়া, ভারত, ১৯১৮
মাধ্যম : গ্লাস প্লেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

রূপসী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৫৭। মাধ্যম : গ্লাস প্লেট।
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

লস্ট ইন ড্রিম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭২। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/সিআরসি

ব্যক্তি কে কিংবা কী তাদের পরিচয় এ ব্যাপারে ড্যাডি কাউকে কিছু বলে যাননি। তবে রণপ্রশিক্ষণের ছবিটার সঙ্গে এই ছবিটার মিল খুঁজলে হ্যাট পরা লোকটিকে ক্যাপ্টেন গ্রে বলেই মনে হয়। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা; এমন ধারণা করা অমূলক নয়।

দুই কিশোরী

পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই কিশোরী। দুজনের গায়ে নরম কালো পাড়ের সাদা শাড়ি। তেলে জবজবে চুল। মাঝখানে সূক্ষ্ম সিঁথি। চোখে মায়া জড়ানো সারল্য। পেছনে কালো পর্দা। ওপরের দিকে একটু সাদা অংশ বের হয়ে আছে। তাতে একটা কার্ভ লাইন তৈরি হয়েছে। ড্যাডি ইচ্ছে করেই হয়তো ফ্রেম থেকে ওটুকু বাদ দেননি। দুই কিশোরীর চোখ ঠিক ক্যামেরার দিকে নয়; একটু ওপরে অন্যদিকে তাকানো। একজনের স্নেহের হাত আরেকজনের কাঁধে রাখা। একজনের মুখে মৃদু হাসি। আরেকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি। মনে হয় ক্যামেরার পেছন থেকে ইশারায় কেউ তাদের কিছু বলার চেষ্টা করছে। ১৯২০ সালে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের ১৭ নম্বর টার্ফ রোডের বাড়িতে ছবিটি তুলেছিলেন ড্যাডি। ছবির এই দুই কিশোরীর নাম জামাল আরা ও জাহান আরা। ওই সময় মুসলমান মেয়েদের এই ভঙ্গিতে ছবি তোলা রীতিমতো বিশেষ ঘটনা। মুসলমান মেয়েরা তখন স্বেচ্ছায় ক্যামেরার সামনে আসার সাহস দেখাত না। পর্দায় থাকত বলে কারও পক্ষে তাদের চেহারা দেখারও সুযোগ ছিল না। ড্যাডির তোলা এই দুই বালিকার অপূর্ব পোর্ট্রেট বাংলার আলোকচিত্রের প্রথম দিকের নিদর্শন।

রহস্যময় তরুণী

নরম আলোয় ঝোপাল বাগানে বেতের চেয়ারে বসা এক রহস্যময় তরুণী। বসার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। পাটের ভাঁজের মতো চুল, মাঝখানে সিঁথি। মাথার ওপর উজ্জ্বল আলো। ফ্রেম ভেদ করে বেরিয়ে আসে তার দৃষ্টি। কালো মণিটা কী যেন বলতে চায়। ক্যামেরার সামনে যে সহজাত লাজুকতা থাকে, এই মেয়ের চোখে তা অনুপস্থিত। ছবির মেয়েটি ডিফোকাসড। একজন তরুণীর তীক্ষ্ণ নজরের সামনে আরেকজন রোমান্টিক তরুণের লেন্স কেন ডিফোকাসড হয় তা আন্দাজ করতে অবশ্য বেগ পেতে হয় না। কৈশোরে এলসির প্রেমে পড়েছিলেন ড্যাডি। তিনি এলসির ছবি তুলে কোয়ার্টার সাইজ প্রিন্ট করে উপহার দিয়েছিলেন। ছবির কারণে এলসির কাছ থেকে ধন্যবাদও পেয়েছিলেন। এরপর ড্যাডি সিদ্ধান্ত নিলেন, বাকি জীবনটা তিনি ফটোগ্রাফি নিয়েই থাকবেন। চেয়ারে বসা মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে ক্যামেরার পেছনের মানুষটির সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার বিষয়টি অনুমান করা যায়। রহস্যময় মেয়েটি এলসি কি না, ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে গেলে এমন এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসে। ছবির মেয়েটিকে 'ড্যাডির মোনালিসা' এমন আখ্যা দেন অনেকে। ছবিটি ১৯১৮ সালে হাওড়ায় তোলা।

অনবদ্য নাচ

'তার প্রথম নাচ' শিরোনামের ছবিটি একটা অনবদ্য আলোকচিত্র। এক অপূর্ব কন্যাশিশু সবার সামনে নেচে চলেছে। সবাই চোখে প্রশংসার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওভার এক্সপোজারের কারণে মেয়েটির পেছনে একটা স্বপ্নময় আবহ তৈরি হয়েছে। মাথার ওপর সম্ভাষণ জানাচ্ছে গাছের পাতা। ছবির জমিনময় কালো কালো ছোপ নির্দেশ করে সূর্যের তপ্ত আলো। দাঙ্গা-পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শক্তিশালী এই প্রতীকী চিত্রটি বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে তোলা। ছবির এই কন্যাশিশুর নাম নাইমা আফছার রুবি। ছবিটি আলোকচিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষের অনন্য উদাহরণও।

রূপসী

মেয়েটির খোঁপায় গাঁথা স্পাইডার লিলি। দাঁতে কাটছে গমের শিষ। মাথাটা খানিক হেলিয়ে দুষ্টুমিমাখা চোখে, ক্যামেরার দিক থেকে মুখ সরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে কোথাও। কানে দুল, গলায় মুক্তার মালা, নখে নেইলপলিশ, হাতে একগাছি চুড়ি। ১৯৫৭ সালে ঢাকায় তোলা কালো ব্যাকড্রপের সামনে রূপসী এ তরুণীর পোর্ট্রেটের শিরোনাম ড্যাডি দিয়েছিলেন 'হ্যাপি গার্ল'। ড্যাডির তোলা ছবিতে যে অদ্ভুত প্রেম থাকে, একটা পালকের মতো ভালোবাসা থাকে; তা কোথা থেকে আসে হয়তো আমরা আঁচ করতে পারি। এই ছবির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, গত শতকের ষাটের দশকেও গ্লাস প্লেট নেগেটিভে ফটোগ্রাফি করতেন ড্যাডি।

ঠেলা জাল

কোমরে বাজু পরা এক নারী নদীতে মাছ ধরছেন। তার উরু পানিতে ডুবে আছে। হাতে ঠেলা জাল। সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি বিশাল মালবাহী নাও। নদীর শেষ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরের গ্রাম। শাশ্বত বাংলা বলতে যা বোঝায়, ছবিটি ঠিক তাই। কিন্তু ভাঙা কাচের নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট করা বলে ছবিতে মাকড়সার জালের মতো আবহ তৈরি করেছে। ছবিটি ধারণা দিচ্ছে একটি শুষ্ক পৃথিবীর অথবা শীতের রুক্ষ ত্বকের, যা ছবির বিষয়ের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রকাশ করে। ছবিটি ১৯২২ সালে ভারতের কলকাতায় তোলা বলে উল্লেখ করেছিলেন ড্যাডি।

গৃহবধূ

গৃহস্থবাড়ির উঠানে কাঠের চেয়ারে বসা এক হিন্দু নারী। গায়ে জড়ানো কালো শাড়ি। আঁচলে চিকন সাদা পাড়। কপালে কালো টিপ। হাতে শাখা ও বালা পরা। ঘোমটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দিঘল কালো চুল। খালি পা মাটিতে ভর করা। ছবিটি অ্যারেঞ্জ করে তোলা। সাজানো ছবিতে মানুষের চাহনি সাধারণত ক্যামেরার দিকে থাকে। এই ছবির বেলায় অন্তত সেই বিচ্যুতি নেই। ছবিটি ১৯২৭ সালে ভারতের মেদিনীপুরে তোলা। তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের আবহ বুঝতে এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় মুসলমান নারীদের ছবি তোলা কল্পনাতীত ব্যাপার হলেও হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান নারীদের ছবি তোলা অত কঠিন ছিল না। ক্যামেরার সামনে আসতে তাদের এত বিধিনিষেধ ছিল না। ক্যামেরার কারণে ড্যাডি হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেতেন।

অনাহারী শিশু

১৯২৯ সালে বাঁকুড়ার সাংগারি ক্রিশ্চিয়ান মিশনের ধর্মযাজক মি. ফ্রেড তাকে একটি সাঁওতাল গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনাবৃষ্টিতে ফলন না হওয়ায় ওই গ্রামের মানুষ খুবই করুণ দিনাতিপাত করছিল। না খেতে খেতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ছিল। অতি সাধারণ মানের কোডাকের ফোল্ডিং ক্যামেরায় তিনি অভাবী মানুষ ও ক্ষীণকায় শিশুদের দুর্দশা বন্দি করেছিলেন। শিশুরা ড্যাডিকে ঘিরে জানতে চেয়েছিল, কালো রঙের অদ্ভুত জিনিসটা কীভাবে নিজের পেটের ভেতর তাদের আটকে ফেলে! ড্যাডির তোলা ওই ছবিগুলো মিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য আনতে সহযোগিতা করেছিল, সেই বর্ণনা আছে তার লেখা এক ছোটগল্পে।

পুকুরঘাটে

ড্যাডি কোনো প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠাতেন না। ছবি তুলতেন সাবজেক্টকে বুঝতে না দিয়ে। এতে তার আনন্দ হতো। ড্যাডি তখন রাজশাহীর ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার। ড্যাডির পোষ্যকন্যা আনোয়ারা আহমেদ বাড়ির সামনের পুকুরঘাটে কাপড় ধুচ্ছেন। পরনের সাদা শাড়ির একপাশে সকালের নরম আলো এসে পড়েছে; ঘাটের সিঁড়িতে আলোছায়ার মায়ারঞ্জন খেলা করছে। ড্যাডি ছবিটা তুলে তিনি তার কন্যাকে তাক লাগিয়ে দেন। কয়েক দিন পরের ঘটনা। পত্রিকায় 'অল পাকিস্তান আগফা ফটো কনটেস্ট'-এর বিজ্ঞাপন বের হয়। আনোয়ারা ড্যাডিকে না জানিয়ে ছবিটি করাচিতে পাঠিয়ে দেন। দুই মাস পর খবর আসে ছবিটি আগফার কনটেস্টে প্রথম পুরস্কার জিতেছে। এই ছবির নেগেটিভের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে ছবিটির

অনবদ্য নাচ, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৪৭। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট। আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

গৃহবধূ, মেদিনীপুর, ভারত, ১৯২৭। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

অনাহারী শিশু, বাঁকুড়া, ভারত, ১৯২৯। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

বিস্মিত মুখ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৬৬। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/সিআরসি

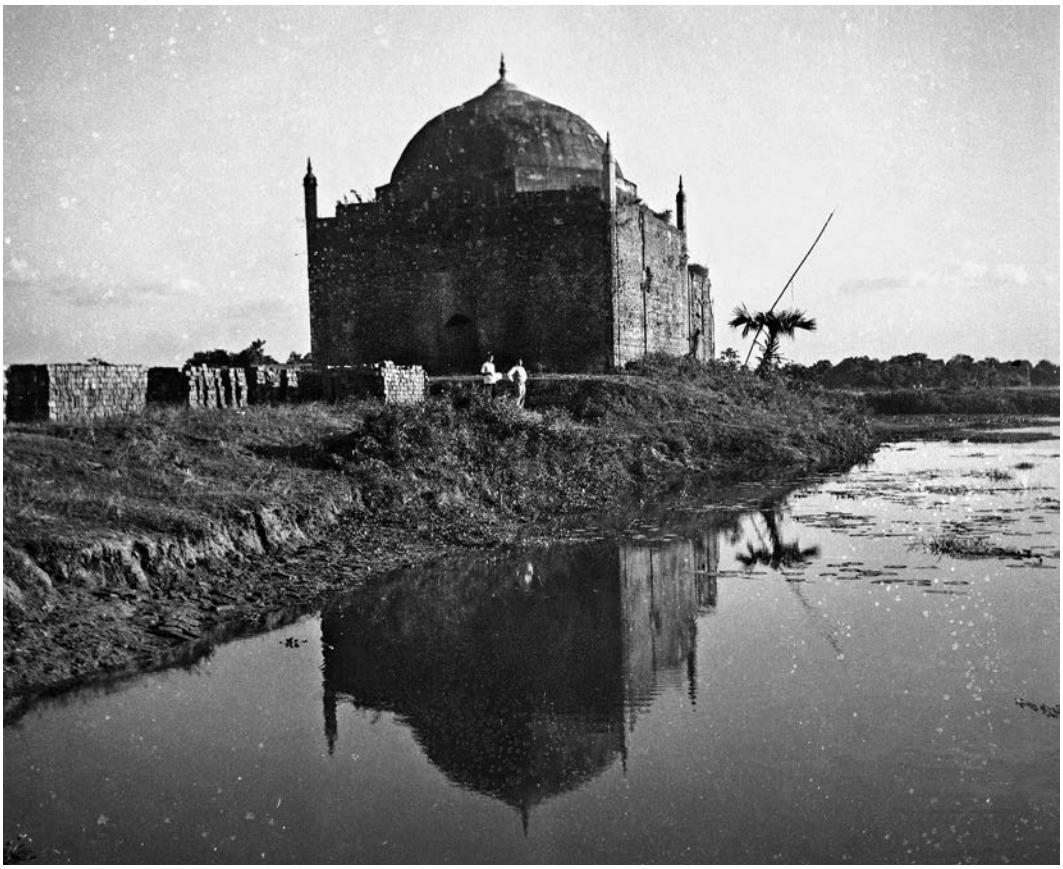

রিফ্লেকশন, দারা বিবির মসজিদ, লালমাটিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৫৯। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

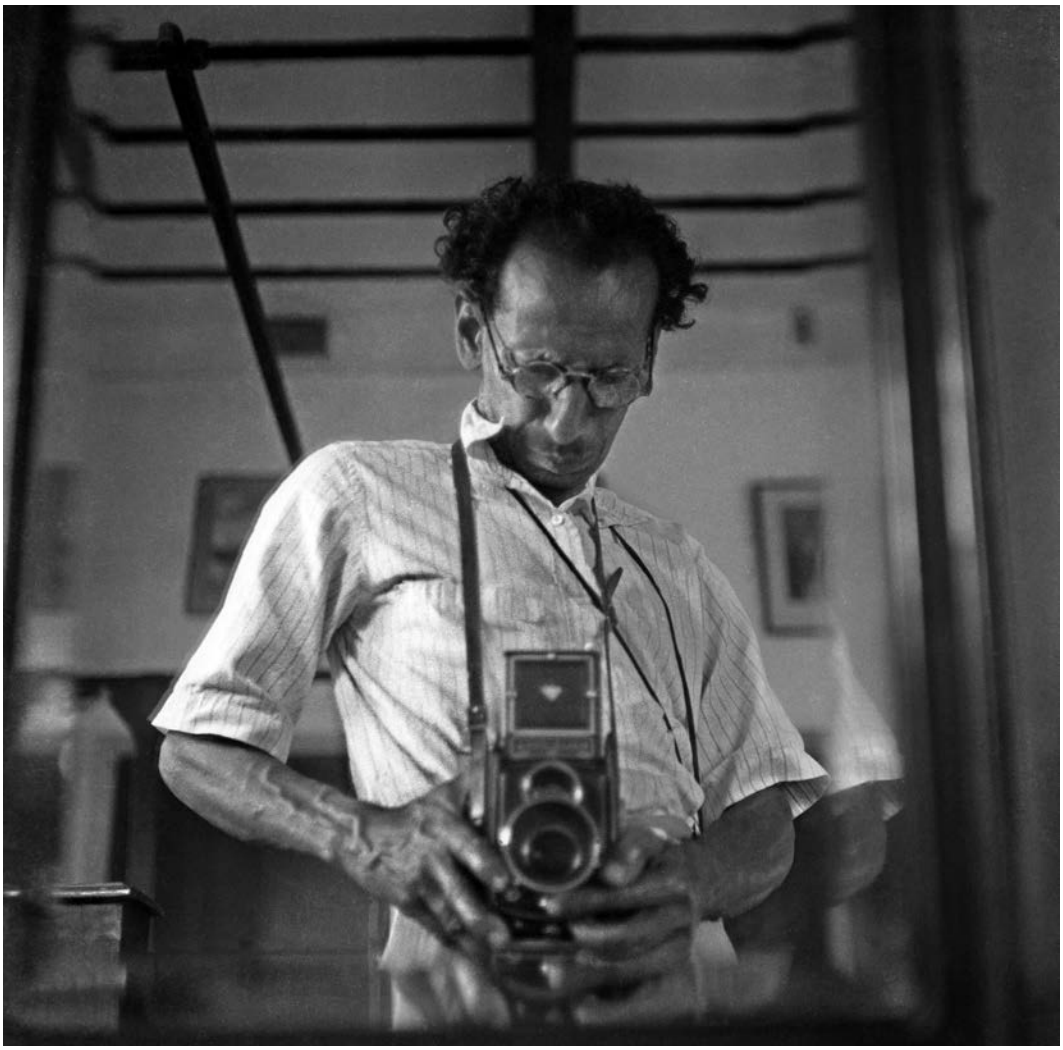

সেলফ পোর্ট্রেট, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৫১। মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট। আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

রাজ্যের কৌতূহল, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৬৬।
মাধ্যম : মিডিয়াম ফরমেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

ঠেলা জাল, কলকাতা, ভারত, ১৯২২। মাধ্যম : গ্লাস প্লেট
আলোকচিত্র : গোলাম কাসেম ড্যাডি/দৃক

একটি ছোট প্রিন্ট পাওয়া গেছে প্রয়াত আনোয়ারা আহমেদের পারিবারিক অ্যালবামে। অনেক বছর অ্যালবামে থেকে ছবিটির রঙ কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে। ছবির নিচের দিকের বাঁ-পাশের কিছু অংশ খেয়ে ফেলেছে কাগজকাটা পোকা।

রাজ্যের কৌতূহল

গায়েহলুদের সকালে বরপক্ষের পাঠানো বিশাল আকৃতির দুটি রুই মাছ কনে বাড়ির বারান্দার টেবিলে সাজিয়ে রাখা। কাগজে মোড়ানো সেই মাছ ঘিরে পাঁচ শিশুর চোখে রাজ্যের কৌতূহল। একটা উচ্ছ্বাসের আলো সবাইকে ঘিরে আছে। দুটো অচেনা জীবের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়! ১৯৬৬ সালে ঢাকার গোপীবাগে তোলা ছবিটার শিরোনাম 'টেম্পটিং ফিশ'। ড্যাডির প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতা ছিল এমন সব মুহূর্তকে ধরার। যে ছবি পলকে হারিয়ে যেত, ড্যাডির ক্যামেরায় তা হৃদ্যতা আর বন্ধনের অমলিন স্মারক হয়ে উঠত। এই ছবির চার শিশু লিজি, ইমু, ফ্লোরা ও বাবু এখন পরিণত বয়সী।

লস্ট ইন ড্রিম

বিকেলে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। রোদের তীক্ষ্ণতা এড়াতে লম্বা ঘন কেশী মেয়েটি তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। মনে হয় কিছু নিয়ে মগ্ন। একটা মিষ্টি কেনডিড। ড্যাডি এই ছবিটার শিরোনাম দিয়েছিলেন 'লস্ট ইন ড্রিম'। ১৯৭২ সালের ড্যাডি তার বাগানবাড়ির সামনে তুলেছিলেন ছবিটা। সাম্প্রতিক সময়ে ছবিটির সন্ধান মেলে। ড্যাডির তোলা অন্যান্য ছবির সঙ্গে এই ছবিটি স্থপতি সালমা শফির ব্যক্তিগত অ্যালবামে ছিল। ড্যাডি নিজে তাকে অ্যালবামটি উপহার দিয়েছিলেন। সালমা শফির ডাক নাম ঝিনু। তবে ড্যাডি তাকে ডাকতেন ঝিনুক বলে। ড্যাডি মাঝে মাঝে ঝিনুককে মডেল করে ছবি তুলতেন, তাকে নিয়ে আউটিংয়ে যেতেন। ড্যাডির কাছে ফটোগ্রাফি শিখেছিলেন ঝিনুক।

রিফ্লেকশন

নির্জন পুকুর পাড়ে মলিন চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে পুরনো একটি মসজিদ। সকালের নরম আলোয় মসজিদের ছায়া ভাসছে পুকুরের শান্ত পানিতে। পাশেই অনাদরে বেড়ে উঠছে একটি তালগাছের চারা। মসজিদের সামনে মাঠে নতুন ইট সাজিয়ে রাখা। দেখে মনে হচ্ছে জৌলুস হারানো মসজিদটির সংস্কারের জন্যই ইটগুলো আনা হয়েছে। ছবিটি ১৯৫৯ সালে ঢাকায় তোলা বলে নেগেটিভের খামে উল্লেখ ছিল। কিন্তু মসজিদের নাম উল্লেখ না থাকায় মসজিদটি শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ফলে শনাক্তকরণের জন্য মসজিদের ছবিটি কয়েকজন ইতিহাসবিদের কাছে পাঠানো হয়। ছবি দেখে তারা ধারণা করেন, মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত এবং এই মসজিদের সঙ্গে মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক সাতগম্বুজ মসজিদের দৃশ্যগত কিছু মিল রয়েছে। এই সূত্র ধরেই অনুসন্ধানে নেমে খোঁজ মেলে মসজিদটির। লালমাটিয়ায় অবস্থিত এই মসজিদটির নাম দারা বিবির মসজিদ। কয়েক দফা সংস্কার ও রঙ পরিবর্তনের কারণে মসজিদটি এখন চেনা মুশকিল। পঞ্চাশের দশকে কেমন ছিল ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা, ইতিহাসের নিবিড় পাঠকদের সেই বয়ান দেয় ড্যাডির তোলা এই ছবি।

বিস্মিত মুখ

আয়নায় বিস্মিত এক মেয়ের মুখ। মিষ্টি মুখটায় যেন আলোছায়া খেলা করছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো কাপড়ের কারণে আয়নার মুখটি জীবন্ত মনে হচ্ছে। নিজের ঘরে ড্যাডি এই ছবিটা তুলেছিলেন ১৯৬৬ সালে। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের [১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ] বৈশাখ সংখ্যায় বিপিএস নিউজলেটারের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল ছবিটা। মায়াবী এই ছবিটা কেমন করে তোলা সেই কথা বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে। মিডিয়াম ফরমেট ক্যামেরায় একটা মেয়ের ফুল ফিগার ছবি তুলেছিলেন ড্যাডি। পরে নেগেটিভ এনলার্জ করে শুধু মুখের ছবিটি প্রিন্ট করলেন। নিজ হাতে পিজবোর্ড দিয়ে বানালেন আয়না। আয়নার ফ্রেমে সেট করলেন মুখটা। তারপর জানালার ফাঁক গলে আসা আলোয় তুললেন ছবিটা। এমন নানা উপকরণ যোগ করে দ্বিতল ছবিতে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করতেন ড্যাডি।

সেলফ পোর্ট্রেট

এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক হিসেবে ড্যাডি সেলফ পোর্ট্রেট তুলতে পছন্দ করতেন। তার টিকে থাকা তিনটি সেলফ পোর্ট্রেটের মধ্যে প্রথম পোর্ট্রেটটি ১৯২০ সালে তোলা। ছবিটির পেছনে কালো কাপড়। ওই আমলে সাধারণত এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা হতো। ড্যাডি ক্যামেরা থেকে খানিকটা ওপরে তাকিয়ে আছেন। কিছুটা বিষন্ন মনে হচ্ছে। একটা টুলের উপর বসে এক হাত পরিমান শাটার রিলিজ কেব্‌ল বাটনের মাধ্যমে ছবিটা তুলেছিলেন। শতবছর আগে তোলা মূল নেগেটিভের উপরের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ড্যাডির এই সেলফ পোর্ট্রেটটি সেলফি যুগের এক অনন্য স্মারক। অপর পোর্ট্রেটটি ১৯২২ সালে তোলা। সাদা শার্ট আর কালো কোট গায়ে বেশ আয়েশে বসা। হাতের ওপর হাত রাখা। মাথার একপাশে সিঁথি। সাহেবি ভাব হলেও চেহারায় শান্ত শীতল অভিব্যক্তি। তবে ১৯৫১ সালে তোলা সেলফ পোর্ট্রেটটি একটা গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষাধর্মী কাজ। ছবিটি তার শয়নকক্ষে তোলা। মিডিয়াম ফরম্যাট টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা গলায় ঝোলানো। ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাটার প্রেস করার সময় তার হাতের রগগুলো যেন ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

উপসংহার

১০৪ বছরের বিচিত্র জীবন ছিল তার। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি একটা শিল্পপ্রজন্ম তৈরির চেষ্টা করেছে। ফটোগ্রাফি যে একটা মস্ত বড় শিল্প তা মানুষকে জানাতে চেয়েছেন। আজকে যে এ দেশের ছেলেমেয়েরা ছবি তুলে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় সেখানেও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন ড্যাডি। জীবদ্দশায় অনেকে তাকে বলতেন, 'আপনি যে সারা জীবন ফটোগ্রাফি করলেন এতে আপনার লাভ কী হলো?' ড্যাডি বলতেন, 'এদিক থেকে দেখলে ফটোগ্রাফি করে পয়সাকড়ি কিছুই হয়নি, বরং আর্থিক ক্ষতিই বেশি হয়েছে। কিন্তু ফটোগ্রাফি আমাকে যা দিয়েছে চাকরি কোনো দিন তা দিতে পারত না। আমার জীবনে ছবি না থাকলে, ফটোগ্রাফি না থাকলে এত বড় বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতো না। এত ভালোবাসা, খাতির-যত্ন পাওয়া যেত না। এই যে এত মানুষের সঙ্গে পরিচয়, সৌহার্দ্য লাভ; এটি সামান্য ব্যাপার নয়।' অনেকে জানতে চাইতেন, 'হাজার হাজার ছবি তো তুলেছেন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ছবি কি পেয়েছেন?' উত্তরে ড্যাডি বলতেন, 'মনের মতো ছবি এখনো পাইনি। কেননা সৌন্দর্যের তো সীমা নেই, সে যে অসীম!'

তথ্যসূত্র

পূর্ব বাংলার ফটোগ্রাফি : রাজসাক্ষী গোলাম কাসেম ড্যাডি, নাসির আলী মামুন, আদর্শ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ২৬ ডিসেম্বর ২০২০

ড্যাডিসমগ্র [চার খণ্ড : গল্প, প্রবন্ধ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, আলোকচিত্র ও বিবিধ], সাহাদাত পারভেজ সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২১

গোলাম কাসেম ড্যাডি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আলোকচিত্রী, সাহাদাত পারভেজ রচিত প্রবন্ধ, কালের খেয়া [দৈনিক সমকালের শুক্রবারের সাময়িকী], প্রকাশকাল : ২২ জুলাই ২০২২, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫

গোলাম কাসেম ড্যাডির আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ [হয়েন দ্য মাইন্ড সেইজ ইয়েস], কিউরেটিং : এ এস এম রেজাউর রহমান, আয়োজক : দৃক, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

When The Mind Says YES by Shahidul Alam, The Daily Star, 8 January 2022

The Legacy of Golam `Daddy' Kasem, The Father of Bangladashi Photography by Rahel Aima, artnews.com, 30 March 2020

Golam Kasem Daddy by Skye Arundhati Thomas, artforum.com, March 2020

সাদাত হোসাইন

সরীসৃপ

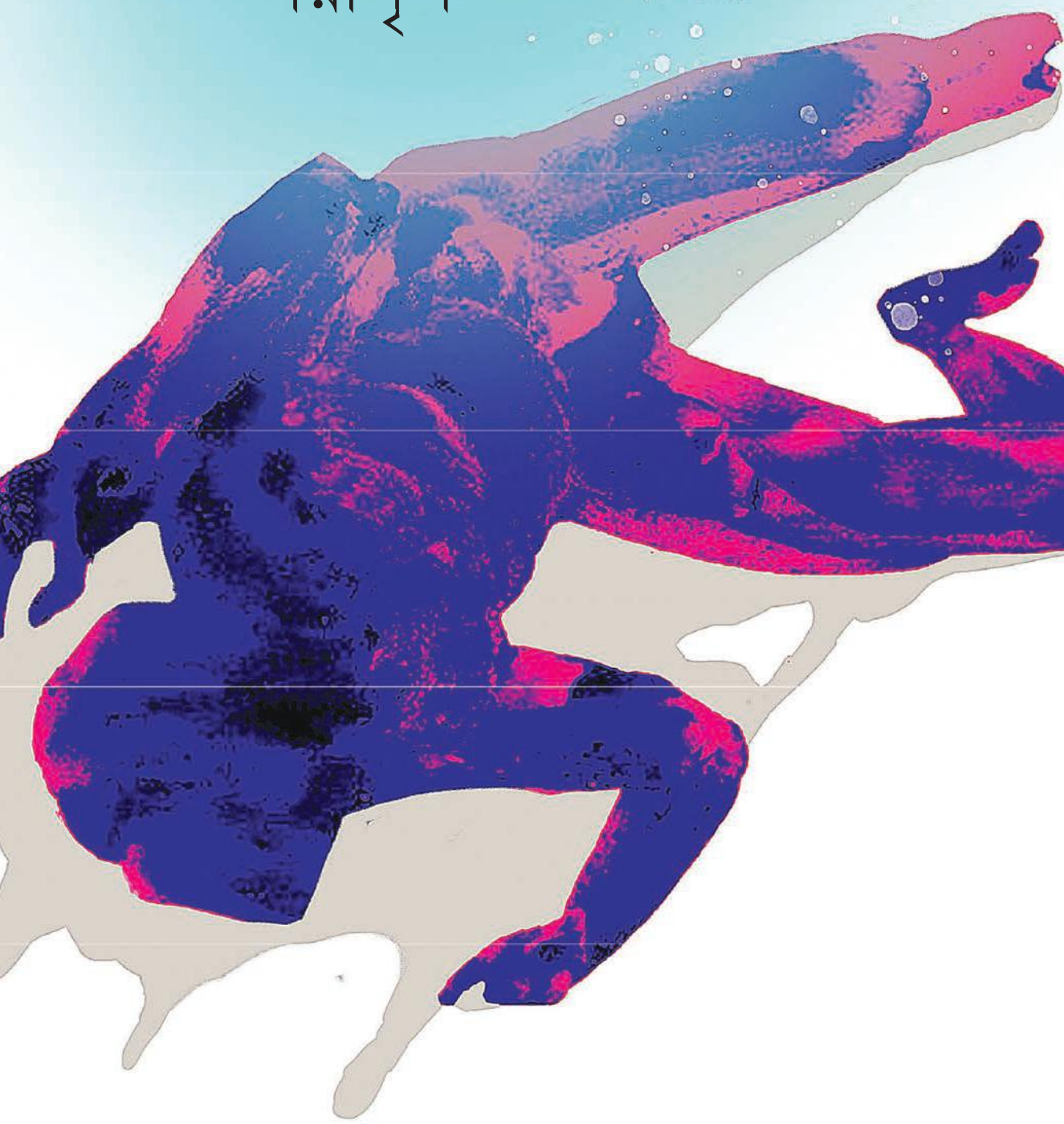

অলংকরণ : রাজীব রাজু

বেড়ালটা কদিন ধরে মাছ খাচ্ছে না। বিষয়টা চিন্তার। তা মতিন মিয়া চিন্তিতও। তার ধারণা, মাছে আজকাল ফরমালিন বেড়ে গেছে। এ কারণেই বেড়ালটা মাছ খেতে চাইছে না। বরং মাছের চেয়ে তার কাঁটার প্রতি আগ্রহ বেশি। বেড়ালের খাদ্য হিসেবে কাঁটার জুড়ি নেই। সমস্যা হচ্ছে, এ বাড়িতে কাঁটার মূল ভাগিদার মতিন মিয়া নিজে। সে মাছের সঙ্গে কাঁটাও খায়। বিশেষত, কড়া করে ভাজা মাছের ভেতরের কুড়মুড়ে কাঁটা। একটু সাবধানে, মাঝখানে ভেঙে, আধখানা মুখে পুড়ে দিতে হয়। তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে চাবাতে হয়। কিছুক্ষণ চাবালেই ওই শুষ্ক, রুক্ষ কাঠির মতো কাঁটার ভেতর থেকেও কীভাবে কীভাবে যেন মজ্জার মতো খানিক রসালো নোনতা স্বাদযুক্ত তরল বের হয়ে আসে। সেটুকু ভারি উপাদেয়। ওই স্বাদ মতিন মিয়ার পছন্দ। আর পছন্দ বলেই বেড়ালটাকে খুব আদর করে মাছ খেতে দেয় সে।

মতিন মিয়া ভেবেছিল, বেড়ালটা এতে খুশিই হবে। তা হওয়ারও কথা। এ জগতে কটা বেড়ালই বা কাঁটার বদলে মাছ খেতে পায়? সবাই তো সেই মানুষের এঁটো, চুষে-চিবিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলা কাঁটা-হাড়গোড় খেতে পায়। মতিন মিয়া সেখানে তেল মসলা দিয়ে ভালো করে রেঁধে চামচে ছাড়িয়ে নরম তুলতুলে রসালো মাছ খেতে দেয় বেড়ালটাকে। সমস্যা হচ্ছে, সেই মাছ আর আজকাল সে মুখেই তোলে না। মতিন মিয়া যখন ঘুমায়, রাতে, তখন সে তার পায়ের কাছে এসে গা ঘষতে থাকে। আর মিউ মিউ করে ডাকতে থাকে। বিষয়টা মতিন মিয়ার ভীষণ অপছন্দের। সে সামান্য শব্দ হলেও ঘুমাতে পারে না। আর এ তো পায়ে পায়ে ঘষাঘষি। ডাকাডাকি। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে উঠে বসে সে। বেড়ালটার কাছে এটা-সেটা জানতে চায়। কিন্তু বেড়ালটা কেমন উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকায়। ওই দৃষ্টি দেখে অস্বস্তি হতে থাকে মতিন মিয়ার। এই মাঝরাত্রিতে একা বাড়িতে খানিক ভয়ও হয়। নিঃসঙ্গ লাগে। কিন্তু কী করবে? ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য তার স্ত্রীকে থাকতে হয় ঢাকায়। মতিন মিয়া মফস্বলে ছোট চাকরি করে। তার উপার্জনের উৎসও এই। ফলে আলাদা থাকতে কষ্ট হলেও সন্তানদের উন্নত পড়াশোনা, নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য এইটুকু বিচ্ছিন্নতা সে মেনেই নেয়।

কিন্তু আজ যেন একটু বেশিই এলোমেলো লাগে তার। সে বেশিক্ষণ বেড়ালটার ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেট মোটা চর্বিযুক্ত ইঁদুর চোখে পড়ে। তার থেকে সামান্য দূরে আয়েশী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তবে ইঁদুরটার এত কাছে অমন হোদল কুত কুত একটা বেড়াল থাকার পরও যেন কোনো ভয়-ডর নেই তার। বিষয়টাতে ভারি অবাক হয় মতিন মিয়া। তবে কিছু বলে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাকে আরও অবাক করে দিয়ে বেড়ালটাও চুপচাপ বসে থাকে। ইঁদুরটার দিকে ফিরেও তাকায় না। যেন মাছের মতো ইঁদুরেও তার অরুচি ধরেছে। মতিন মিয়া বিস্মিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। আর ঠিক তখনই ইঁদুরটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আপনার খুব সমস্যা হয়ে গেল, না?'

'কী সমস্যা?' মতিন মিয়া জিজ্ঞেস করে।

'এই যে বেড়াল বাবু আর মাছ খাচ্ছেন না।'

'হু। তা একটু হয়েছে বৈকি।'

'এ জন্য আমরা দুঃখিত।'

'তোমরা কারা?'

'আমরা ইঁদুর সমাজ।'

'ওহ। তা তোমরা দুঃখিত কেন?'

'আমরা চেয়েছিলাম মাংসের প্রতি বেড়ালের অরুচি হোক।'

'তাতে তোমাদের লাভ?'

'তাহলে আমাদের দেখলেই আর ওভাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসবে না। বেড়ালদের কাছে তো আমরা একেকজন স্রেফ মাংসের দলা।'

কথাটা মতিন মিয়া ভাবল। ইঁদুর মন্দ বলেনি। সে তার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেছে। সমস্যা হচ্ছে, জগতের নিয়ম এই যে, একজনের অতিরিক্ত নিরাপত্তা বেশির ভাগ সময়ই অন্যদের অনিরাপদ করে তোলে।

সে বলল, 'সে ক্ষেত্রে বেড়াল না হয় মাংস খাওয়াটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু মাছ কেন?'

'তার কাছে মাংসও যা, মাছও তা। কাঁটা কিংবা হাড়টাই কেবল আলাদা।'

'ওহ!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মতিন মিয়া। 'তাহলে এখন উপায়?'

'কীসের উপায়?'

'আমার? তোমাদের মাংসে অরুচি ধরাতে গিয়ে তো আমার খাবারের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিলে। এখন আমি কী করব? আমায় একটা উপায় বলে দাও যাতে আমি ওকে কাঁটায় অরুচি ধরিয়ে দিতে পারি।'

'আপনি কাঁটা খাওয়া বাদ দিলেই তো পারেন। আপনার খাবার তো কাঁটা নয়, মাছ। তাহলে কাঁটা কেন খাচ্ছেন?'

'খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে।' বিড়বিড় করে কথাটা বলল মতিন মিয়া। তবে ইঁদুরটা তা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে আচমকা সুড়ুৎ করে পাইপের ভেতর ঢুকে গেল। ফিরল পরদিন রাতে। তারপর বলল, 'আপনি কীসে রুচি ধরাতে চান?'

'তা-ই ভাবছি। কিন্তু আমি যেটা চাইব, সেটাই হবে?' মতিন মিয়া চিন্তিত মুখে বলল।

'হবে।'

'তাহলে মাছের আগ্রহই বাড়িয়ে দাও।'

'উফ!' যেন বিরক্ত হলো ইঁদুরটা। বলল, 'তাহলে তো সেই আগের সমস্যাই। বললাম না, বেড়ালদের কাছে মাছও যা, মাংসও তা। তখন তো আবার মাংসের ওপর আগ্রহ বেড়ে যাবে। আমরাও পড়ব বিপদে। অনেক কষ্টে হাতে-পায়ে ধরে রুচি বদলেছি।'

মতিন মিয়া ভালো সমস্যায় পড়ল। সে এখন কী করবে? আরও দুটো দিন ভাবার সময় চেয়ে নিল সে। কিন্তু পরদিন দেখল তার ঘরের মেঝে, এখানে সেখানে ছোট ছোট মাংসের পিণ্ড পড়ে আছে। সেই পিণ্ড জুড়ে ইঁদুরের শরীরের লোমের মতো লোম। মতিন মিয়া একটি মাংসের দলা দেখবে বলে যেই হাত বাড়াল, অমনি দলাটা নড়ে উঠল। তারপর সরে গিয়ে বলল, 'কী কাণ্ড হলো, বলুন তো?'

'কী কাণ্ড?'

'বেড়ালটা তো আমাদের এই অবস্থা করে ফেলেছে। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমরা কারা? আমরা ইঁদুরেরা...।'

মতিন মিয়া এতক্ষণে বুঝল, এগুলো সব ইঁদুর। মাংস না খেলেও বেড়ালটা তাদের শরীরের ভেতর থেকে হাড়গোড় বের করে খেয়ে ফেলেছে। ইঁদুরটা বলল, 'এখন আমরা কী করি বলুন তো?'

'কী করবে?'

'এই যে আমাদের শরীরে হাড়গোড় নেই। আর হাড়গোড় নেই বলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি না। মাথা উঁচু করে দেখতে পারি না। সারাক্ষণ এভাবে মাটির সঙ্গে মিশে থাকি। গড়িয়ে গড়িয়ে চলি।'

মতিন মিয়া কথা বলল না। চুপ করে রইল। ইঁদুরটা বলল, 'একটা সুবিধা অবশ্য হয়েছে'।

'কী সুবিধা?'

'এই যে শরীরে হাড় নেই, মেরুদণ্ড নেই। তাই জলবৎ তরলং হয়ে গেছি। নরম, তুলতুলে। এখন যে কোনো জায়গায় ফিট হয়ে যাই। এই ধরুন সরু গোল পাইপ, চারকোনা ছিদ্র, বিছানার তলা, ঘটি, বাটি, মেঝে– যা যেখানে আছে, সেখানেই সুড়ুৎ করে ঢুকে যেতে পারি। ফিট হতে পারি। আগে তো সেটা পারতাম না। শরীরে হাড়

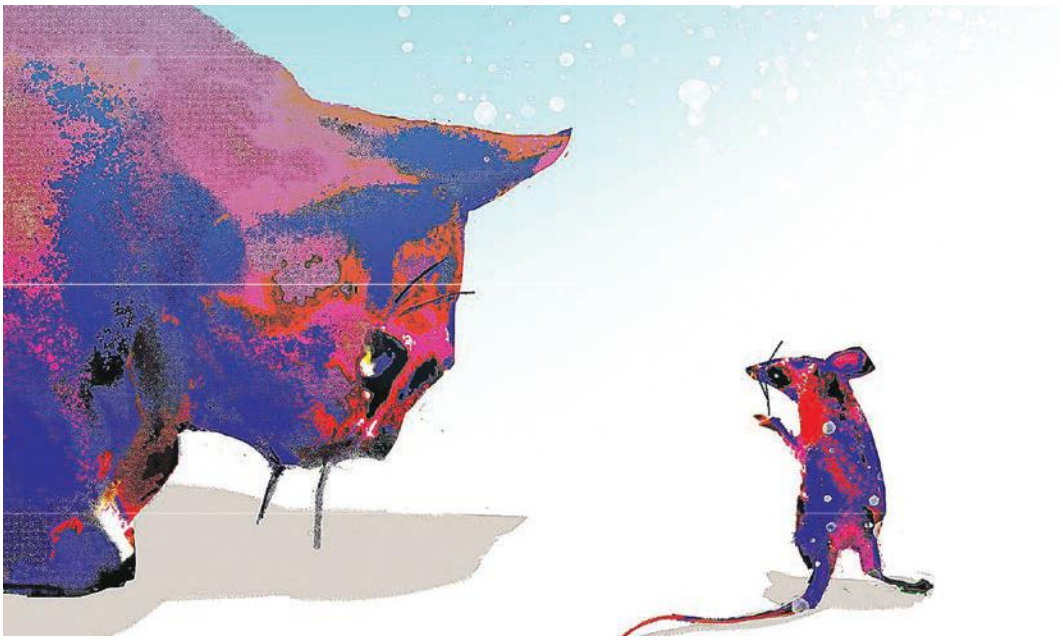

থাকলে নানান অসুবিধে, বুঝলেন কিনা?'

মতিন মিয়ার ধারণা সে বুঝেছে। সে মিনমিন করে বলল, 'তার মানে এখন সব ঠিকঠাক?'

'হু। ঠিকঠাক।' বলে যেন একটু থমকাল ইঁদুরটা। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'না মানে... একটু সমস্যা তো আছেই।'।

'কী সমস্যা?'

'এই ধরেন, মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারি না। ঘাড় উঁচু করে তাকাতে পারি না। এইটুকুই সমস্যা। তবে তাতেও যে খুব ঝামেলা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আসল কথা হলো, বেড়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তো আর টিকে থাকতে হচ্ছে না। এখন নিরাপদ ভয়-ডরহীন নিশ্চিন্ত একটা জীবন। এমন নিশ্চিন্ত জীবন পেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর আর দরকারটাই বা কী?'

কথাটা খট করে কানে বিঁধল মতিন মিয়ার। সেই দিন আর কথা বলল না সে। তবে রাতে ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখল। তার সামনে বড়সড় একটা বাঘ। বাঘটা দেখতে অনেকটা ওই বেড়ালের মতোই। তবে তার চেহারায় যেন পরিচিত কোনো মানুষের ছাপ। মতিন মিয়া অবশ্য সেই চেহারাটা মনে করার সময় পেল না। তার আগেই বাঘটা আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তার শরীরের মাংসগুলো চিঁড়ে আলাদা করে ভেতর থেকে বের করে আনল তার শিরদাঁড়াটা। তারপর শিরদাঁড়ার হাড়গুলো মুড়ির মতো কুড়মুড় করে খেতে লাগল। তীব্র যন্ত্রণায় মতিন মিয়ার শরীরটা কুঁকড়ে উঠল। তবে যন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ রইল না। খানিকবাদেই সে আবিষ্কার করল, একটা খুব শীতল, শান্তিপূর্ণ অনুভব তার শরীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্যা হচ্ছে, এরপর আর উঠে দাঁড়াতে পারল না মতিন মিয়া। শিরদাঁড়াহীন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবে কী করে? সেও তখন ওই ইঁদুরগুলোর মতোই একতাল মাংসপিণ্ড হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকল।

বিদঘুটে এই স্বপ্ন ভাঙলেও বিষয়টা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারল না সে। ঘুম থেকে উঠে বেশ কয়েকবার নিজের পিঠে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, তার মেরুদণ্ডের হাড়গুলো ঠিকঠাক জায়গা মতো আছে কিনা। সে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারছে কিনা! গলা উঁচু করে তাকাতে পারছে কিনা। সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু সারাক্ষণই কী যেন এক অস্বস্তি তাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। পরদিন অফিসে ঝিম মেরে বসে রইল সে। সন্ধ্যার আগে আগে হঠাৎ বড় স্যার তাকে ডাকলেন। তারপর এ কথা সে কথার পর বললেন, 'কী ব্যাপার মতিন সাহেব, ওই ফাইলটা এখনো ছাড়েননি? ওই যে ওই দিন বললাম?'

মতিন মিয়ার খুব বলতে ইচ্ছা করছিল, 'স্যার, ওই ফাইলটা আমি ছাড়তে পারব না। ওটাতে বিস্তর ঝামেলা আছে। ফাঁকফোকর আছে। ওতে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে স্যার।' কিন্তু কথাটা সে বলতে পারল না। তার আগেই বড় স্যার একটা খাম বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'ছেড়ে দিন মতিন সাহেব। ফাইলটা খুব আর্জেন্ট। আজই ছেড়ে দিন। আর এই যে... এই নিন... এটা আপনার ভাগের...।'

মতিন খুব করে চাইছিল খামটা না নিতে। স্যারকে ফিরিয়ে দিতে। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে, ঘাড় শক্ত করে, মাথা উঁচু করে 'না' বলতে। কিন্তু সে পারল না। একটা যুদ্ধহীন, নিশ্চিন্ত-নিরাপদ জীবনের জন্য এসব খাম-টাম খুব দরকার। গত রাতে স্বপ্নে দেখা সেই বাঘটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। বড় স্যারকে অবিকল সেই বাঘটার মতো লাগছে। যে তার শিরদাঁড়ার হাড়গুলো কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেয়েছিল। মতিন মিয়া চেয়ার ছেড়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথা উঁচু করে তাকাতে চাইল। কথা বলতে চেষ্টা করল ঘাড় উঁচিয়ে। কিন্তু পারল না। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার শরীরটা হাড়হীন মাংসের দলার মতো এলিয়ে পড়ছে। মিশে যাচ্ছে ওই চেয়ারের আদল আর খামের শরীরের সঙ্গে। সে অনেক চেষ্টা করেও আর তার শিরদাঁড়া সোজা করে, টানটান হয়ে বসতে কিংবা দাঁড়াতে পারল না। বরং একতাল মাংসপিণ্ডের মতো চেয়ারের পায়া বেয়ে নেমে যেতে লাগল নিচে। আরও নিচে। তারপর মেঝের সঙ্গে মিশে, সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে লাগল তার ঘরে। মতিন মিয়ার আচমকা ইঁদুরটার সেই কথাটা খুব মনে পড়তে লাগল, 'একটা নিশ্চিন্ত জীবন পেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দরকারটাই বা কী?'

সেই রাতে আর ঘুমাতে পারল না সে। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ইঁদুরটার জন্য। তা ইঁদুরটা এলোও। ঠিক তার মতোই অবিকল একতাল মাংসপিণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে এলো। তারপর তার শরীরের সঙ্গে প্রায় মিশে যেতে থাকল। মতিন মিয়া চোখ তুলে তাকাল। কী আশ্চর্য, তাদের আর আলাদা করা যাচ্ছে না! তবে তার চোখ পড়তেই ইঁদুরটা হাসল। শ্লেষের হাসি। তারপর বলল, 'কী মশাই, এবার বুঝলেন তো, শরীরে হাড়, মেরুদণ্ড না থাকার কত সুবিধা!

ঈদ সংখ্যা ২০২৩ ■ দেশ রূপান্তর

হামীম কামরুল হক

গিঁট

অলংকরণ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

১. মাসুমবিল্লাল

আশপাশে যা কিছু যেমন চলে, তার থেকে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা ছিল আমার ছোটবেলা থেকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কেন আলাদা করতে চাইছিলাম। এই সিদ্ধান্তই আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। সবার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

পুরান ঢাকাতে বড় হয়ে পুরান ঢাকার মানুষের মতো কথা আমি বলতে চাইলাম না। বাবা আমাকে সেন্ট গ্রেগরিতে ভর্তি করে দিয়েছিল। সেখানে বাংলা স্যার সুবীর ডি কস্টার ক্লাসগুলো আমার কাছে প্রতিদিন নতুন নতুন পৃথিবী খুলে দিতে থাকল। আমি ঠিক করলাম পরিচত গণ্ডি থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সবার আগে আমার পরিচিত ভাষার হাত থেকে। এ জন্য আমাকে অনেক টিটকারিও শুনতে হয়েছে : পিচ্চি আঁতেল। সমস্যা একটাই ছিল আমি একটু মোটাসোটা লোক। ওজনটা কোনোভাবেই কমাতে পারছিলাম না। আর সেজন্য আমার চেষ্টার কমতি ছিল না। নিজের এই শরীরে স্থূলতাকে আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি। এর হাত থেকে যেকোনোভাবেই হোক আমার মুক্তি মিলতে হবে। কিন্তু কী উপায়ে আমি জানি না। কম খাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব না। বেশি আমি তাই বলে কখনোই খাই না।

আমার বাবা আমার জন্য বাংলা গণিত ও ইংরেজির জন্য তিনটি টিউটর রেখেছিলেন। সবাই ছিল নারী ও সুন্দরী। তার ধারণা শিক্ষকরা সুন্দর হলে ছাত্রের লেখাপড়ায় বাড়তি মনোযোগ তৈরি হয়। আমার ওই সুন্দরী শিক্ষিকাদের তেমন ভালো লাগত না। আমি এখন এসে যদ্দুর বুঝতে পারি, কেবল ইংরেজিতে যে মেয়েটি আমাকে পড়াতেন তিনি ভালো পড়াতেন। অন্যরা খারাপ পড়াতেন না। কিন্তু তাদের পড়ানো আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতো না। বাংলা পড়ানোর মহিলার একটা কথা মনে আছে, সেটা বেশ ভালো কথা, তিনি বলেছিলেন, গল্প পড়তে হলে গল্পের ঘটনার ভেতরে ঢুকতে হবে, চরিত্রের ভেতরে ঢুকতে হবে। আমাদের দেশে লেখকরা সেটা কম পারেন। অনেক পরে জানি সেই মহিলাটি ছোটগল্প লেখতেন। তার বেশ কিছু বইপত্র আছে। কলেজে পড়াতেন। কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। একটি বিয়েও টিকেনি।

অনেক দিন পর, অনেকদিন আগেই আমাকে পড়ানোর পাট চুকে গেছে। তিনি হঠাৎ একদিন আমার বাবার কাছে এসেছিলেন কিছু টাকার জন্য। কারণ কয়েক মাস ধরে বলে তার চাকরি ছিল না। আমি সেই সময় দোতলার খাবার টেবিলে খেতে বসেছি। আব্বা তাকেও আমার সঙ্গে জোর করে খেতে বসিয়ে দিলেন। তিনি দুপুরে তখনও খাননি। তাকে খুব বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। সেদিন অনেকটা সময় ওই মহিলা আমাদের বাসায় ছিলেন। আমি সন্ধ্যায় বেরিয়ে রাতে ফেরার সময় তার সঙ্গে বাড়ির গেটে দেখা হয়। আমাকে দেখে একটু চমকে ওঠেন।

ও তুমি?

আমি বললাম, যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

রাত হয়ে গেল! আমতা আমতা করে কী যেন বলেন। আমার কানে এল : তুমি ভালো থেকো।

আমার মুখে কেন জানি এসে গিয়েছিল, রাতটা থেকে যেতে পারতেন। আমাদের গেস্ট রুমটা বেশ ভালো। তিন মহিলার ভেতরে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী ও আকর্ষণীয়। আর অন্যদের চেয়ে তিনি আমাকে পড়ায় বেশি সময় দিতেন। শুধু বাংলা নয়, বাংলায় লেখা অন্য বিষয়গুলোও দেখিয়ে দিতেন। আমার সঙ্গে খুবই নরম ও মিষ্টি করে কথা বলতেন।

আমি খেয়াল করেছি, তিনি কখনো এদিক ওদিকের কোনো কথা বা গল্প বলে সময় নষ্ট করতেন না। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন।

আব্বাকে বলতে শুনেছি, আপনি ম্যাডাম এটা দারুণ কাজ করচেন, মাসুমবিল্লালের খোমার থন ঢাকাইয়া জিনিসটা গায়েব ভি কইরা দিচেন। থ্যাংকু ম্যাডাম। পোলা আমার পুরা সুদ্দ ভাষায় বাতচিত করে।

আসলে বাপ কতটা চাইতেন জানি না, আমার কথার শুনে কেউ টের পাক, আমি কোন এলাকার বা কোথা থেকে এসেছি, এটা আমি একদম চাইতাম না। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করতাম। যেভাবে বাপ আমার এই ম্যাডামের সঙ্গে তার আসলে কী চক্কর চলে না কি চলে না, বুঝতে দিতেন না। ওই আপা মাঝেমধ্যেই আসতেন।

আমাকে যেচে আমার বাপ বলতেন, গপসপ করি আর কী! তুমি মাঝখান দিয়া অন্য কিছু ধইরা লইয়ো না।

বলতেন তো গল্প করেন। আসলে কী হতো সেগুলো বুঝে নেওয়া খুব কঠিন ছিল না। ফাঁকা বাসায়, চাকর-বাকরদের নিচের তলায় দিয়ে ওপরে তারা দুজন সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি একা থাকতেন, এর মানে তো অস্পষ্টও নয়।

নিজের বাপ সম্পর্কে এসব ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু তার সম্পর্কে আমি সত্যটা দেখব না– বা দেখলে এড়িয়ে যাব, এই মানসিকতা আমার ছিল না।

আমি ছিলাম বয়সের চেয়ে একটু বেশি বয়স্ক। আর এই বোধ একটু একটু করে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছিল। অনেক পরে জানি, বুদ্ধি হলো স্ত্রীলিঙ্গ, আর বোধ হলো পুরুষলিঙ্গ। সেদিন নিরাজুল একইটা কৌতুক বলল : ভগবান দোকান খুলেছেন– বুদ্ধি বিলাবেন। তো পুরুষরা সবার আগে হাজির। মেয়েরা তখনো কেউ আসতে পারেনি। তাদের সাজগোজ করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারা যখন গেল, ততক্ষণে সব বুদ্ধি বিলানো শেষ। তখন আর কিছু বাকি নেই। তারা বলল, এটা কী হলো, তাদের তো কিছু দিতেই হবে। সেটা যেভাবে হোক। তখন ভগবান বললেন, শোনে, বুদ্ধি তো সব তারা নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমাদের তিনটা বর দিই। এক হলো, মেয়েরা যখন হাসবে, তখন পুরুষদের বুদ্ধি কাজ করবে না। দুই হলো, মেয়েরা যখন কাঁদবে, তখন পুরুষদের বুদ্ধি কাজ করবে না। আর মেয়েরা যখন রাগবে বা ঝগড়া করবে, তখন পুরুষদের বুদ্ধি কাজ করবে না।

শুনে একটু জোরেই হেসে উঠেছিলাম।

আমি সাধারণত হো হো করে হাসি না। নিজেকে আমি সারাক্ষণ একটা আয়নার মধ্যে দেখতে পারি। আমার আরেকটা আমি সারাক্ষণ আমাকে দেখছে। একই সমান্তরালে আমার পাশে থাকছে। আমি যাতে সারাক্ষণ 'আমি আমি' না– করতে পারি– সেজন্য ওই আরেকটা আমিকে– আমি কী করে তৈরি করতে পেরেছিলাম আমি জানি না। আমাকে যে হুজুর কায়দা সিপারা আমপারা পড়ে কোরআন শরিফ পড়াতেন, তিনি একটি বিশেষ তরিকার লোক ছিলেন কি না জানি না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ আছেন, শয়তান আছে, আর আছো তুমি। তুমি যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে 'আমি আমি' করো, সেই 'আমি আমি' করাই হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। ফলে সাবধান, আর যাই করো না করো শয়তানের ফাঁদে পড়া যাবে না। শয়তান হলো সমস্ত কিছুর অনিষ্টকারী। তুমি যা করতে চাইবে তাকে নস্যাৎ করে দেবে। বা তুমি যদি কিছু করোও, তোমার 'আমি আমি'ই তোমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আমার জগৎটা ছোট ছিল। আমি চাইতাম এটাকে বড় করতে। আমার জগৎ বলতে, আমার বাবা, বাড়িতে তিন জন চাকর আর আমি। আর আমার স্কুল, পরে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুলটায় আমি খুব সুবোধ বালকই ছিলাম।

আমার স্কুলের জীবন একবারেই অন্যদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমি নিজের মতো করে তেমন কিছু আমার মনে তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু কলেজে এসে আমার একটা পরিবর্তন আমি টের পেলাম। আমার ওই যে আমাকে দেখার আমিটা তৈরি হতে শুরু করল। নিরাজুলের সঙ্গে বন্ধুত্বটা জমে গেল। তাকে আমার প্রায় সব কিছু বলতাম। বলেওছি। নিরাজুল অবশ্য নিজের কিছুই বলত না। তাকে আমার বুদ্ধিমানও মনে হতো না, আবার বোকাও মনে হতো না। সে আমাকে শুধু বলেছিল, সে কারও এতটা কাছে যেতে চায় না,

যেন পরে সবচেয়ে দূরে সরে যেতে হয়, আবার সে কারও এতটা দূরে সরে যেতে চায় না, যাতে সারাক্ষণ কাছে কাছে থাকার ইচ্ছা তৈরি হয়।

আমি বলেছিলাম, প্রথমটা না হয় বোঝা গেল। দ্বিতীয়টা কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে রইল। অবশ্য এটাকে হেঁয়ালিও মনে করতে পারি। আর হেঁয়ালি দিয়েই সব কিছু তৈরি বলে মনে হয়। যেমন, এই জন্মের মানে কী? এই যে পড়ালেখা– এসব করার দরকার কী? কারণ পড়ালেখার কাউকে সফলতা ব্যর্থতা এনে দেয় না। দেয় তার পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত আর নিজের উদ্যোগ। সবচেয়ে বড় কথা তার আয় রোজগার। যার নেই আয়/সে করে হায় হায়। নেই টাকা তো সব ফাঁকা। আবার বেশি টাকা তো সব ফাঁকা।– টাকা এক আশ্চর্য রহস্যময় ব্যাপার।

টাকা নিয়ে আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন তাজমুন্নেসা। বলেছিলেন, তোমার বাপের অনেক টাকা। কেউ কিন্তু টাকা কামিয়ে বড় লোক হয় না। হয় টাকা জমিয়ে। আরও বড়লোক হতে হলে, হতে হবে টাকা খাটিয়ে। তাই কামিয়ে নয়, জমিয়ে, জমিয়ে বসে থাকলে চলবে না, টাকা খাটিয়ে লাভ উঠিয়ে নিতে হবে। আর টাকায় টাকা বাড়ে। সেটা বাড়ে টাকা খাটিয়ে।

তাজমুনকে আমার বাড়ির আদিল চাচা, জবা খালা আর দাউদ চাচা সব সময় তাজমুন বিবি বলতেন। তাজমুন বিবি এমনিতে আমাদের বাসায় আসতেন না। মহল্লায় নতুন কোনো লোক কারও বাড়িতে এলে কীভাবে কীভাবে রটে যেত। আমি যেমন একদিন নিরাজুলকে নিয়ে গেছি। পরের দিন কেউ না কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কে এসেছিল, কার সঙ্গে আমি বাড়িতে সময় কাটালাম?

দেখতে দেখতে পাড়া-মহল্লা বদলে গেল। আব্বা একটা নতুন জায়গায় আরেকটা বাড়ি করলেন। উত্তরা সেখানে আবার তাজমুন ও তাথৈ প্রায় যেত। দিলুরোড থেকে সেখানে যাওয়া সোজা ছিল। তাথৈ ভিকারুন্নেসা নুনে পড়ত। ওর সঙ্গেও নিরাজুলের দেখা হয়েছিল।

সেদিন আমি নিরাজুলকেসহ নিউ বেইলি রোডে হাঁটছিলাম। একটু পর স্কুল ছুটি হবে। বিকেল হয় হয়। তাথৈকে স্কুল থেকে বেরুনোর পথে যেদিক দিয়ে যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেও সেদিন তাথৈ আসেনি। পরে জানি : সেদিন তার শরীর খারাপ করেছিল, তাই স্কুলে যেতে পারিনি।

আমি ও নিরাজুল দিলু রোডের বাসায় যাই। আমি জানি না, আমি বাসায় গেলে তাজমুন বিবি বেশ খুশি হতেন। আমাকে অনেক যত্নআত্তি করতেন। দেখলাম নিরাজুলকে নিয়ে যাওয়া তিনি একটু বিরক্ত। যদিও নিরাজুল তার সঙ্গে খুব সুন্দর আচার-আচরণ করেছিল।

নিরাজুল কথার খুব কায়দা জানে। সে মানুষজনকে এমন কিছু কথা বলে, এমনভাবে প্রশংসা করে, যা ফোলানোর জন্য নয়, তার ঠিক জিনিসটি যে ঠিকমতো খেয়াল করছে, এটা নিরাজুল কথায় নিয়ে আসতে পারে। তাতে যাকে কথাগুলো বলে, তার মুখে খুশির আলো খেলে যায়।

নিরাজুল প্রায়ই বলে, মানুষের খুশিকে চিনলে তুমি মানুষকে চিনবে। আমাদের নেতারা আমাদের খুশি নিয়ে তো খেলে। তাদের খুশিকে আমাদের সঙ্গে ভাগ করতে চায় না। ক্ষমতার একটা বলয়ে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরুনো যায় না।

নিরাজুল মুক্তিযুদ্ধের কথা খুব বলত। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে করা কোনো ভাস্কর্য বা ম্যুরাল দেখলেই অনেকক্ষণ ধরে বলত। বলত, রাজাকারদের নাম। তারা এখন কোথায় কী করছে। পরে জানি, নিরাজুল এক ভাই মুক্তিযুদ্ধের সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেই ভাইকে সে দেখেনি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পর তার জন্ম। সে তার বাপের শেষ পুত্র। তার পর অবশ্য তার আরেকটা বোন হয়েছিল।

আমি বলি, কীসে কে খুশি হয় তা দিয়ে তো অবশ্যই চেনা যায়। সেটা অর্ধেক চেনা। মানুষ কীসে অখুশি হয় সেটাও সমানতালে চেনা দরকার। মাঝেখানেও একটা জায়গা থাকে। সেটাও চেনা দরকার। এভাবে খুশি অখুশিও না খুশি না অখুশি– মানুষকে তো এক ভাবে চেনা যায় না।– নিরাজুলর সঙ্গে আমার তর্ক হয়, হারজিতের তর্ক নয়। তর্কে আমরা নিজেদের জানাবোঝাকে আরেকটু সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। নিরাজুল অবশ্য বলে, আমার সঙ্গে কথা বলে সে মজা পায়। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া ও তর্ক করার মধ্যে দিয়ে দিন দিন সে নতুন মানুষ হয়ে ওঠে।

নিরাজুলকে নিয়ে আমি কয়েকটা জায়গায় ঘুরতে গেছি। সিলেটে, কক্সবাজারে, বান্দরবানে, সেন্ট মার্টিনে আর সুন্দরবনে। শুধু যাওয়া হয়নি হাওর এলাকায়। এর ভেতরে নিরাজুল একবার আজব কাণ্ড করেছিল। সেটা এখানে না বলি, তারপর থেকে আমি কোথাও নিয়ে যাওয়ার আগে বলি, যে কক্সবাজারের মতো কাণ্ড কিন্তু করা যাবে না। কক্সবাজারে যেতে ভালো লাগাটা নষ্ট হয়ে যায় প্রচুর মানুষের ভিড়ের জন্য।

বেড়াতে যাওয়া মানে তো নিরিবিলি একটা বিষয় থাকবে। শহরের ভিড়ভাট্টা পার হয়ে বেড়াতে গিয়ে ফের ভিড়বাট্টার মধ্যে পড়লে সেই বেড়াতে যাওয়া মানে কী? কোনো মানে নেই। বেড়ানো মানে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া।

একবার টেকনাফে নেমেছি। এতিমখানার বাচ্চাদের নিয়ে একটা বাস যাচ্ছে সেন্টমার্টিন। সীমান্ত রেস্তোরাঁর পাশে সারি দিয়ে থামা গাড়িগুলোর ভেতরে এতিমখানার বাচ্চাদের নিয়ে আসা গাড়িটির গায়ের কথাটায় চোখ আটকে গেল : "যারা ভ্রমণে বের হয় না, তারা জীবনের একটা পৃষ্ঠা পড়ে।" অনেক পৃষ্ঠাই তাদের পড়ার বাকি থেকে যায়।

কথাটা আমার কাছে খুবই চমকপ্রদ মনে হলো। আমি নিরাজুলকে সেটা বলি। নিরাজুল আসলে বেড়াতে খুব ইচ্ছুক নয়। সে নিজের জগতে থাকতে আগ্রহী। এখন কেমন হয়েছে কে জানে? বিয়ে করে সংসারে সেঁটে গেছে বলেই মনে হয়। সে এক আজব কথা বলে, নতুন নতুন জায়গা যাওয়ার চেয়ে নতুন নতুন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক হলে, বন্ধুত্ব হলে সেটাও বেড়ানোর চেয়ে কম নয়। সম্পর্ক মানে তুমি আবার শারীরিক সম্পর্ক মনে করো না। তোমার সঙ্গেও তো আমার একটা সম্পর্ক আছে। সেটা কি শারীরিক সম্পর্ক?

নারীদের, বিশেষ করে যে দেখতে সুন্দর হলেও নয়, যে নারীরা আকর্ষণীয়, বা যে নারীদের মধ্যে আবেদন আছে– তাদের প্রতি নিরাজুলের দুর্বলতা টের পাওয়া যায়। কিন্তু এ জন্য সে পাগল হতে পারে না। তার ভেতরের চাওয়াটা আলাদা। সেটা অবশ্য খুব খোলামেলাভাবেও সে বলে না।

নিরাজুলকে সঙ্গে নিয়ে একবার ধামরাই বালিয়াটি প্রসাদ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে সে প্রসাদ না ঘুরে একটা মেয়ের পেছনেই নাকি সময়টা পার করল। আমি যতবার ফোন করি, বলে আসছি। কাছেই আছি দূরে কোথাও যায়নি। অনেকটা সময় পর এসে বলে, দারুণ একটা মেয়ে এসেছে এখানে। মেয়েটা একটু আগে সাথের লোকজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

তাই তোমার সময় হলো আমার কাছে আসার।

তুমি কি রাগ করেছ?

রাগ নয়। মেয়ের জন্যই তো ঘুরবি। ঘোরার এলাকাকে তো কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে যায় তার স্মৃতি। এই সূত্রের সঙ্গে সে মিলিয়ে দেয় আরেক আজব কথা : তেমন, যে মেয়ের জন্য ঘুরবি, তাকে কোনো দিন পাবি না। পাবি এমন কাউকে যার জন্য তুই ঘুরিসনি, পাবি তাকেই। খোঁজার জিনিস পেয়ে যাওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই। তখন সময় হয়ে যায় পানসে।

নিরাজুল বলে, তুমি কী খুঁজতে গিয়ে পাচ্ছো না?

আমি বলি, আমি কিছু খুঁজি না। কারণ আমার পাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি কেবল দেখে বেড়াই। যখন যেটা দেখে বেড়াই সেটা সঙ্গে থাকে। পরে মুছে যায়। নিজে থেকেই আপনা আপনি।

তোমার কোনো মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে কোনো কিছু কাজ করে না?

এ কথায় আমি তাথৈয়ের কথা ভাবি। তাথৈয়ের প্রতি আমার আসলে কী কাজ করে? যা কাজ করে সেটা কী প্রেম? সে আমার সম্পর্কে কী হতে পারে, তার কোনো ব্যাখ্যা আমি দাঁড় করাতে পারি না। তাথৈ নায়িকা হতে চায়, এমন একজন হতে চায় যাকে এক নামে সবাই চিনবে। এক দেখায় যাকে চিরদিন মনে রাখবে। তেমন আচার ব্যবহার সে শিখতে চায়। বিখ্যাত ও বিমুগ্ধ বিস্ময়ের স্মরণীয় মানুষ হতে চায় তাথৈ।

আমি চাই সবার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। একবার দেখলে আর কখনো যেন আমাকে কেউ মনে না করতে পারে। একদিন দেখলে যেন চিরদিনের জন্য ভুলে যায়। কারও মাথায়, কারও মনে মগজে, স্মৃতিতে ভাবনায় আমি থাকতে চাই না। আমি যে নিজের জীবনটা খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে চাই তাও তো নয়।

অনেক চেষ্টা করেও নিজে মোটা থেকে পাতলা হতে পারছি না। নিজের শরীরটাকে নিয়ে আমি খুব বিব্রত। মোটা ছেলেদের কোনো মেয়েই সাধারণত পছন্দ করে না। কেন করে না? মোটা মেয়েদের আবার অনেক ছেলে আছে পছন্দ করে। আগে দেখতাম বাংলাদেশের নায়িকারা সব মোটা মোটা। ক্ষুৎকাতর বা না-খেয়ে থাকা বাঙালির কাছে স্থূল শরীরের নায়িকারা কি তাদের ভাবনার ক্ষুধা মেটায়!

আমি সব সময় নিজেকে তো বটেই, জীবন থেকে একদম কী কী বাদ দেওয়া যায়– বা জীবনে যে কটা জিনিস না হলেই নয়, সেগুলি নিয়ে থাকতে চাইতাম। তবু দেখলাম, আমি পারছি না। মানুষের জন্য কবরের সমান মাপের ঘর হলে তো চলে না।

মানুষে থাকার ঘর, তার চলার পথ, তার পোষাক আশাক, খাওয়াদাওয়া, সবচেয়ে বড় কথা রুচি– সে কেমন? সেইসব বিষয় তাকে চেনার বোঝার সংকেত হয়ে ওঠে। বিশাল বাড়ি, চলার পথে সংক্ষিপ্ততা ও দিঘলতা যার যার রুচি ও জীবনধারণারই প্রকাশমাত্র। আমি থাকি বড় ঘরে। চলি গাড়িতে। ঢাকা শহরের ভিড়েবাট্টায় ভরা পথ, যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি আটকে থাকতে পারি।

নিরাজুল বলেছিল, তোমার একবার পশ্চিমের কোনো দেশে যাওয়া দরকার। তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে বিষয়টা ধরতে পারতে।

নিরাজুল এমন অনেক কিছুই বলে, তার নিজের খুব দেশ-বিদেশ নাকি ঘুরতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পাসপোর্টই করেনি কোনোদিন। এসব হাওয়াভরা কথা সে যে খুব গাল ভরে বলে তাও না। আজকাল কী করছো? উত্তরে : 'বুক ফুলিয়ে বলবার মতো কিছু করছি না।' এই কথাটি নিরাজুলের খুবই প্রিয়। বুক স্বাভাবিক রেখেই যা কিছু করার করছি। বেঁচে আছি। বেঁচে আছি যতদিন, ততদিন যেন বেঁচে থাকি– এটুকু করতে পারলেই নাকি সে খুশি।

বড় ভাইয়ের যুদ্ধে গিয়ে মরে যাওয়ার ঘটনা নিরাজুল নিজে থেকে কখনোই বলেনি। আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে বলে, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য অনিবার্য ছিল। কিন্তু এ যুদ্ধে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি যে পূরণ করতে হবে– আমরা কোনোদিন সেদিকে নজর দিলাম না। আমরা যে কীসের জন্য এই দেশটি তৈরি করলাম, দেশটি পাওয়ার পরপরই সবার আগে এটাই ভুলে গেলাম। এমন একটা বেকুবি দশায় আমরা পড়ে আছি। যা জোগাড় করলাম, সেটির কোনো ব্যবহার করলাম না। তার পড়ে পড়ে মরচে ধরে গেল না অন্য নিয়ে গেল, তাও আমাদের আর জানাবোঝার বিষয়ের মধ্যে পড়ল না। আমাদের দেশ আমাদের হাত থেকে অন্যদের হাতে চলে গেছে কি না গেছে, তা নিয়েও আমাদের খুব কিছু যায় আসেনি।

আমার দেশ নিয়ে কথা বলতে যদিও একদম ভালো লাগে না। নিরাজুল অনেক দিন পর আমাকে একবার দেখা হলে বলেছিল, অদ্ভুত একটা কথা, তার নিজের স্ত্রী দেশ নিয়ে বর্তমান জটিল বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে একটা কথাও বলে না। এসব নিয়ে না ভেবে যে দিব্যি জীবন কাটানো যায়– বৌকে দেখে টের পেয়েছে। নিরাজুল অবশ্য আমাকে বলেছিল যে সে বেশি কিছু করতে পারবে না, একটা ভালো জীবন, নিরাপত্তায় ঘেরা জীবন, তৃপ্তিদায়ক সংসার, সুখী নিরাপদ গৃহকোণ তৈরি ছাড়া আর কোনো কোণ সে তৈরি করতে পারবে না।

বলেছিল, তুমি তো জানো : প্রতিভাবানের কোণ হলো ১০টা নয় অসংখ্য, এর ভেতরে যে 'ওয়ান লাইফ ওয়ান চয়েস'-এ জীবনটা বানিয়ে নেয়– হ্যাপি ওয়াইফ, হ্যাপি লাইফ– এই ছিল নিরাজুলের পাওয়া। সে এর বেশি কিছু আশা করেনি নিজের কাছ থেকে। আমি তাকে চাইতাম সে বড় কিছু করুক। কারণ তার ভেতরে প্রতিভা ছিল কিন্তু আগুন ধরানোর জন্য জীবনের যে ঠোকাঠুকিটা দরকার, সেই ঠোকাঠুকিটা ছিল না।

ছোটবেলায় সে ভয় পেত শান্তিবাহিনীর কথা ভেবে। নামে শান্তিবাহিনী, কিন্তু অশান্তির চূড়ান্ত করতে এদের নাকি জুড়ি নেই। কেন পাহাড়ে তারা সেই সব নিয়ে আছে তাও স্পষ্ট জানত না। অনেক পরে কাপ্তাই বেড়াতে গেলে জানে এই হ্রদকে ঘিরেই পাহাড়ে আগুন জ্বলে ওঠে। জলও যে আগুন ধরাতে পারে, তা তো আর নতুন নয়। সেই জলের আরেক খোঁজ নাকি আছে মেয়েদের ভেতর। দেখতে হরিণী, আসলে বাঘিনী– এমন একটা মেয়েকে সামাল দিতে দিতেই নাকি তার জীবন যাচ্ছে। যে নিরাজুল আগে নিজের তেমন ব্যক্তিগত কথা বলত না, সেই নিরাজুল অবলীলায় বিয়ের পর তার একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলে ফেলত। একটু বেশি পরিমাণেই বলত। প্রায় কোনো কিছুই বাদ দিত না। মাঝেমধ্যে আমার কান আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসত।

আমি তাকে বলেছি পাঁচটি জিনিস সব সময় গোপন রাখতে। এক হলো নিজের গভীরতম ইচ্ছা, দুই তোমার প্রেমজীবন, তিন আয়-ব্যয়, চার তোমার পরের দান বা চাল, পাঁচ তোমার পরিবারের কোনো কাহিনী। এসব শুনে নিরাজুল বলত, জীবনের কোনো ছক হয় না। নিজের প্রেমজীবন বলতে সে কী কী স্ত্রীর সঙ্গে করে, সেসব বলাটা তার কাছে কোনো লুকিয়ে রাখার বিষয় বলে মনে হয় না।

পরে দেখলাম নিরাজুল আবার বদলে গেছে।

আমার উপদেশ শুনেই কি না কে জানে : নিরাজুল সত্যিই নিজের কোনো কথাই এখন বলে না। বরং আমি ভাবি তার বদলে যাওয়াটাকে সে দারুণভাবে উপভোগ করছে বোধ হয়। বদলে যাওয়াটাকে আনন্দময় করে তোলাই তো মানুষের ভালো থাকার আসল রহস্য। ভালো থাকা নিয়ে সব সূত্র জানা সত্ত্বেও আমি সেই সব সূত্রের ওপর মূত্রত্যাগ করি।– মানে আমি নিরাজুলের জীবনটা যাপন করছি, আর নিরাজুল আমারটা। আমাদের এভাবে অদল বদল হয়ে গেছে। এটাই আমার নিজের কাছে আশ্চর্যের। আমি যা ভেবেছিলাম আমার জন্য, সেটা করছে নিরাজুল আর নিরাজুল যেটা ভেবে রেখেছিল তার জন্য, সেটা করছি আমি।

কোথাও একটা রোখ চাই– কথাটা নিরাজুল খুব বলত। রোখ ছাড়া চলে না। অসম্ভব বজ্রকঠোর দৃঢ়তা ছাড়া জীবনে কোথাও দাঁড়াতে যায় না।– কথাগুলি একসময় আমার ছিল। পরে সেইসব কথার কোনো মানে আমি পাইনি। নিরাজুল বলে, নিজের বাপের এমন বাড়ি, গাড়ি, প্রভাবপ্রতিপত্তি থাকলে এ সবের কথা কেউ ভাবে না। নিরাজুলের চোখের সামানে আমর বাপ এলাকার সাংসদও হয়ে গেল। আমি ভেবে আশ্চর্য হই, এটা আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ছিল। কারণ আমি জানি বাপ আমার যে পার্টি থেকে মনোনয়ন পেল, বরাবরই আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি সে সেই পার্টির বিপরীত বিশ্বাসের লোকই ছিল। তারপর আমার বাপ কীভাবে অন্য আরেক মানুষ হয়ে গেল, তাও আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি।

নিরাজুল মজা করে বলত, রাজনৈতিক দলগুলি হওয়া দরকার ক্লাবের মতো। এর মালিকরা দাবাঘুঁটির মতো সবাইকে চালাবে। আর ভালো রাজনীতিবিদরা তাদের দল চালানোর যোগ্যতা দেখে, চুক্তিভিত্তিতে কিছু দিন এ দলে, কিছু দিন ওদলে কাজ করাবে। এতে

করে তাদের কাজের দক্ষতা যেমন টের পাওয়া যাবে, তেমন দলে ও দলের চেয়ে দেশের কাজে রাজনীতিবিদরা বেশি জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে। এমন ভালো ভালো খেলোয়াড় নিয়ে যেমন জাতীয় দল তৈরি করা হয়, তেমন করে দেশ চালানোর সবচেয়ে যোগ্য লোকদের এভাবে বাছাই করে নেওয়া যেতে পারে।

খুব হাসতে হাসতে বলেছিল। তখনও সে কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ে। ওর পাকামি শুরু হয়েছিল হ্যারাল্ড লাস্কি পড়ে। বলে 'রাজনীতির ব্যাকরণ' নামে লাস্কির একটা বই আছে। এটাই নাকি তার নিত্য পাঠ্যবই হয়েছিল বেশ কয়েক বছরের জন্য। সেই বই থেকে সে নিজে বুঝেছিল, ব্যাকরণটা জানা লাগে– ব্যাকরণ ভাঙার জন্যই। তার কথায় যে যতই ছক দিন, ইউরোপীয়রা যতই আধুনিক হোক, তাদের ছক দিয়ে তারা নিজেরাও সবসময় চলে না, নীতিটা তারা সাজিয়ে রেখেছে ভাঙার জন্য। আমাদের তো সেই নীতি মানারই কোনো দরকার নেই। প্রেম যুদ্ধ রাজনীতি– অ্যান্ড অলওয়েজ জাস্টিফাইস দা মিনস।

২. নিরাজুল

সামনের মাস থেকে কী করে চলব, বুঝতে পারছি না। দুটো ছেলের পর একটা মেয়ে হলো গত পরশু। গীতি কিন্তু অনেক খুশি। তার বলে আরও ছেলেমেয়ে চাই। আমি অবাক হয়ে তার বদলে যাওয়া দেখি। কী মেয়েছিল। আমোদফুর্তি ছাড়া সে একটা দিন চলতে পারত না। আর এখন? পুরো সংসারে ডুবে মগ্ন থাকার দশায় নিজেকে নিয়ে গেছে। কী করে আরও ভালো থাকা যায়, বাচ্চাদের জন্য কী কী করা যায়– এই তার দিনরাতের চিন্তা। আদতে চিন্তাও করতে হয় না। টাকার একটা জোগান তার আছে। তার বাপ তার নামে আস্ত একটা ফ্ল্যাট লিখে দিয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন জীবনে কোনো বাড়তি সুবিধা বা নিরাপত্তা বলয়ে ঢোকার জন্য আমি গীতিকে বিয়ে করিনি। তবে গীতির সঙ্গে প্রেম করে আমার বিয়ে, তা ঠিক বলা যাবে না। আমরা হরদম দুর্দমভাবে মিশেছি। কিন্তু গীতি সবসময় বলেছে, কোনোভাবে তার প্রেমে পড়া যাবে না। তার প্রেমে পড়লে পরে মারাত্মকভাবে পস্তাতে হবে।

আমার ধরে নিতে ইচ্ছা করে যে, গীতি আমাকে বিয়ে করে খুশি হয়েছিল। এখনো সুখীই আছে। আমি নিজে কোনো দিন অভাবে বড় হইনি, বিত্তেও বড় হইনি। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। ঈশ্বরদীতে রেলের চাকরি। রেলের কোয়াটারে থাকতাম। আমরা অনেক ভাইবোন : চার বোন, তিন ভাই।

বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধের সময় শুরুতেই পালিয়ে যায়। আব্বা তার ছেলে মরে গেছে বলে রটিয়ে দেন। নইলে যুদ্ধের সময় আব্বাকে ধরে নিয়ে যেতেও পারত। ভাইটি যে আসলে মরে যাবে, কে জানত? যুদ্ধের একদম শেষ সময়ে আমরা খবর পাই: কামালপুরের যুদ্ধে বড় ভাই শহীদ হয়েছেন। চোখ জল ভরে ওঠে। আবার এত গর্ব হয়! যে গর্বটা জগতের সবচেয়ে দামি হীরের টুকার মতো লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।

বড় ভাইকে আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে ছবি দেখেছি। ছোটবেলায় আমার যখন মন খারাপ হতো, ওই যখন বারো তেরো বছর বয়সে, আমি বড় ভাইয়ার ছবিটার দিকে তাকাতাম। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল। সাদা শার্ট পরা একটা ছবি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্টুডিওতে তোলা। যুদ্ধের পর আম্মা ওই ছবিটার সামনে এলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আঁচল মুখে চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতেন। হুবহু এই দৃশ্য অনেক সিনেমায় টিভি নাটকে দেখেছি। তখনও জানতাম না জীবন থেকে সিমেনা হয়, নাকি সিনেমা থেকে জীবন হয়।

দ্বিতীয়টা সংখ্যায় কম, কিন্তু আমি যদি 'অমরসঙ্গী' সিমেনাটা না দেখতাম তাহলে মুনিয়ার সঙ্গে আমার ভালোবাসাবাসিটা হতো না। যদিও মুনিয়া আমাকে ভালোবাসত কি না নিশ্চিত নই। যতগুলি মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে : এরা কেউ কোনো দিন নিজের মুখে আমাকে ভালোবাসার কথা বলেনি। বলেনি, রাজু আমি তোমাকে ভালোবাসি। ইংরেজিতেও বলেনি, রাজু আই লাভ ইয়ু। আচ্ছা, এই নিয়ে আমার ভেতরে কি কোনো হাহাকার কাজ করে? মুনিয়া আমার হাত ধরত। তার কোনো বয়না দেখা দেওয়ার সংকেত হলো, আমার হাত ধরা। ধরেই বলত, নিরাজুল যা, আমাদের তিন জনের জন্য সিঙ্গারা নিয়ে আয়। তখন সিঙ্গারার দাম আর কত ছিল : এক টাকা।

মুনিয়া কথা বলতে বলতেই আমার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিত। আমি বলতাম পাঁচ টাকা কেন? বলত, একটা তো তোর জন্য। আর এক টাকা হলো তুই যে কষ্ট করে নিয়ে আসবি, সে জন্য। আমি প্রায় সময় বাকি দুটো টাকা ফিরত দিয়ে দিতাম। মুনিয়া কেমন মন খারাপ করে টাকাটা নিত। কথাটা ঠিক, স্কুল থেকে মতি সওদাগরের দোকানের পাশে সেই হোটেলে যেতে টিফিন সময় শেষ হয়ে আসত। স্কুলেও সিঙ্গারা সমচা বিক্রি করতেন দপ্তরি হুজুর। দপ্তরি হুজুরকে কারী হুজুর বলেও আমরা ডাকতাম। তিনি ভারী সুন্দর করে কোরআন পড়তেন। ঝাড়ফুঁক পানিপড়া এসব দিতেন। জিন তাড়াতেন। আর ছিলেন বড় হুজুর।

দপ্তরি হুজুর আসলে হুজুর না। ওই মাথায় একটা ফুলের মতো সাদা গোলটুপি পরতেন। কালো গায়ের রং। খয়েরি পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরতেন। দোহারা গড়নের চোহারা। দেখলে মনে হতো গায়ে অনেক শক্তি। কথা বলতেন খুব নরম করে। যে কারও না পুরোটা বলে, ভারী মিষ্টি করে ডাকতেন। বাবা আবদুর রহমান রতন, তোমাকে সুভাষ স্যার একটু দেখা করতে বলেছেন।

দপ্তরি হুজরের কাজ ছিল স্কুলের অফিসে কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া-দিয়ে আসা। এটা স্কুলের ভেতরেই ঘটত। আর হলো ক্লাস শেষে ঘণ্টা বাজাত। স্কুলের সেই ঘণ্টার বেজে উঠত যখন টিফিন সময়ে তখন এক আনন্দ ছিল। আর ছিল স্কুল ছুটির ঘণ্টা। প্রতিদিন কানে একদম মধু ঢেলে দিত।

মুনিয়া ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে আমার খাতির হওয়ার কারণ আছে। মুনিয়ারা আমাদের পাশে বাসা এসে উঠেছে। তিন মাস আগে। তারা এসেছে খুলনা থেকে। আসার পরের দিন মুনিয়ার আম্মা মুনিয়া আর তার ছোট বোন সোনিয়াকে নিয়ে বড় মামির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি তখন বড় মামার সঙ্গে থাকি।

আব্বা মুক্তিযুদ্ধের পরপর হঠাৎ করে হার্টঅ্যাটকে মারা গেলে আমরা পুরো পরিবার গড্ডায় পড়ে যাই। কয়েকটা বছর খুব কষ্টে কাটে। তারপর আমার বড় মামা তখন পাকিস্তান নেভিতে ছিলেন। করাচিতে বন্দি ছিলেন যুদ্ধের সময়। পরে চুয়াত্তর সালের দিকে বন্দিবিনিময়ে মুক্তি পান। এসে ঢাকায় কদিন বেকার বসেছিলেন। তারপর চট্টগ্রামে তার কাজের জায়গা তৈরি হয়। প্রথমে ছিলেন পোর্টকলোনিতে, পরে এসে ওঠেন দক্ষিণ হালিশহরের সেইলার্স কলোনিতে।

পোর্ট কলোনিতে আমাদের দারুণ সময় কাটে। প্রতি বছর নানাভাই আমাদের বাসায় বেড়াতে আসতেন। তখন আমার মামাত বোন নিশাত একেবারেই ছোট। ওর ভালো নাম নিশাত আঞ্জুম। দু বছর বয়স। কিন্তু হাঁটার বদলে দৌড়াতে পছন্দ করে বেশি। নানাভাই এলে প্রতিদিন ভোরে দুহাতে আমাকে আর নিশাতকে নিয়ে হাঁটতে বেরুতেন। গাছপালায় ভরা কলোনির ভোরের সেই নির্জন পথ দিয়ে হাঁটার স্মৃতি আমার সারা জীবনে সুখের স্মৃতিগুলোর একটা হয়ে আছে। গীতির সঙ্গে প্রায় এই স্মৃতির কথা বলি। গীতি যখন বলে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আট পর্যন্ত তার সময়। এ সময় আমি তার সঙ্গে গল্প করব। চাইলে আদর করব ইত্যাদি যা খুশি, কিন্তু তাকে এই দেড় ঘণ্টা প্রতিদিন দিতে হবে।

গীতির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন জানতে পারি তার ভালো নাম গীতি হাসান। তার বড় ভাইয়ের নাম ইমন হাসান, মেজ ভাই রিদম হাসান, ছোট ভাই রাইম হাসান, সে গীতি হাসান আর পরের বোন, সবার ছোট তার নাম পূরবী হাসান। বাবা সিরাজুল হাসান কাফী, মা তারানা হাসান। কী আধুনিক পরিবাররে বাবা। একটু ভয় ভয় লেগেছিল। সবার নাম কবিতা ছন্দ আর সংগীতের রাগরাগিণীর

নামে। ওদের তুলনায় আমরা খুব পিছিয়ে পড়া, ব্যাকডেটেড।

পরে বলেছিলাম, তোমাদের এমন মিলল কী করে? কী নাম একেকজনের। গীতি বলে, আমাদের দাদাবাড়ি নানা বাড়ি সব ইন্ডিয়ায়। কোথায়? কোথায় আবার একদম খাস কলকাতায়। পার্ক সার্কাস থাকতেন নানারা। আর দাদারা খিদিরপুর। গীতি আরও বলেছিল, পার্টিশানের তিন বছর পর মানে একান্ন বাহান্নর দিকে নানারা ও দাদারা অপশান দিয়ে পুরো পূর্ববাংলায় মানে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তারা মা বাবা, দাদাদাদির কথায় কথায় আমাদের দেশ কলকাতার কথা বলেন। এখানকার বাঙালদের সঙ্গে মিশে মিশে আমরা সব হারিয়ে ফেললাম– এই আফসোস হরদম শুনেছে সে তাদের মুখে।

বিয়ের আগে কি পরে অনেক মজার কথা হতো এসব নিয়ে যে বাঙালদের প্যান্ট পরা শিখিয়েছে ঘটিরাই।– বাংলা এক ছিল বলেই বাঙালির শক্তি ছিল। এখন বাংলা খণ্ডবিখণ্ড, বাঙালি শেষ। এখন নেই বাংলা/বাঙালি হয়েছে হ্যাংলা।– এগুলি মজা করে বলত কলকাতার গর্বে গর্বিত গীতিকে।

আমি বলতাম, তোমার মুখে 'আমরা কলকাতার'– এটা তো উদ্বাস্তু সংবাদ। গর্বের কিছু নয়।

এগুলো বলতে বলতে হাসতে হাসতে ইচ্ছা করে খুব রাগানো গীতিকে। গীতি অবশ্য রাগতে চাইত না। রাগলে কেঁদে ফেলত। তখন আবার আরেক মুশকিল। গীতি রেগে গেলে তাসমিয়ার কথা বলত। তাসমিয়া আসলে মুনিয়ার আরেক নাম।

কোন আক্কেলে আমি মুনিয়ার গল্প গীতির কাছে করেছিলাম। পরে এ থেকে আর রেহাই মেলেনি। রেহাই মেলার একটাই উপায় ঘটি-বাঙাল প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলা। সেই চেষ্টাটাই আমি করতাম।

এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল তাসমিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতির সহপাঠী ছিল, তাও একই বিভাগে। মুনিয়ার কাজ নাকি ছিল একটার পর একটা ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুনিয়াকে কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে কেউ কোনো দিন রিকশায় যেতে দেখেনি, কোথাও খেতে দেখেনি। মুনিয়া ছিল এক রহস্যময় মেয়ে।

আমি নিজে এমন আরেক রহস্যময়ী পেয়েছিলাম। মেয়েটার নামও মনে আছে : হৃদিতা দিলশান। তখন আমি একটা স্কুলে পড়াতাম। নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ত ছেলেটা। সেই স্কুলে বেশিদিন পড়াইনি। কিছু ছাত্রছাত্রী আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার ভেতরে একটি ছাত্র একটা ত্রিভুজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। এটাকে আসলে ঠিক ত্রিভুজ বলা যাবে না। ক ভালোবাসে খ-কে খ ভালোবাসে গ-কে। গ- যে কাকে ভালোবাসে সেটা কেউ জানে না। আবার ক-কে কেউ ভালোবাসে কি না তাও তো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ছাত্রটি আমাকে তার এই পাগলের মতো প্রেমে পড়ার বিষয়টি বলেছিল। বলেছিল, তাকে এর হাত থেকে বাঁচতে হবে। তখন আমি তার বোঝার জন্য কিছু সহজ গল্প বলেছিলাম। যেগুলির মূল কথা হলো : যে টান মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, সেটা প্রেম নয়। যে টান মানুষকে আরও বড় কিছু করে, সেটা তার বেদনা অপ্রাপ্তি হলেও সেটি আসলে তার প্রেম। হৃদির কাছ থেকে সে মুক্তি পেয়েছিল বলেই পরে জেনেছিলাম। কিন্তু সে ছেলেটি নাকি এর পর একটার পর একটা প্রেম করেই চলছিল।

অনেক পরে বুঝতে পারি, আমি নিজে কোন টানে কীভাবে কখনো ধ্বংসের দিকে, কখনো নির্মাণের দিকে– এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মুনিয়া তো বাছুরপ্রেমের কাহিনী। তিয়াসার জন্য আমার মাথা কিছু দিনের জন্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি অদ্ভুতভাবে একটা ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। যতটা না তাদের মতাদর্শ দলের কাজ করার জন্য, তারচেয়ে বেশি তিয়াসার চিন্তা মাথা থেকে দূর করার জন্য। কিন্তু ওই দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য আমাকে কয়েকটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

কেন আমি বামপন্থি হলাম? এই নিয়ে কথা নেই বার্তা নেই ছাত্রদলের কয়েকটি ছেলে এক রাতে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। পরের দিন আমার পরীক্ষা। আমি তাদের দেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রথম বিজয়টা হয়। তাদের সালাম দিই। বসতে বলি।

–পোলা তো ব্যাপক ভদ্র আছে।

–আরে হের বাপমায়ে বেশি ভদ্র।

–চিনছ তুই অর বাপেরে। মায়েরে।

–হ, চিনুম না ক্যান। আমাগো মহল্লায় অয়ে ছিল তো দুই বছর।

কথা সত্যিই সূত্রাপুরে মেজ বোনের বাসায় আমি কলেজে পড়ার সময়টা ছিলাম। কবি নজরুল কলেজে পড়তাম। যতটা কলেজে পড়তাম, তার চেয়ে ঘোরাফেরা করা হতো বেশি। কারণ পুরান ঢাকার এক বড় লোকের ছেলের সঙ্গে আমার দারুণ জমে গিয়েছিল। মাসুমবিল্লাল নামের সেই ছেলেটি বাপের অনেকগুলো ট্রাক। তার নিজের জন্য বাপ একটা গাড়ি দিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। মাসুমবিল্লাল লাল টুকটুকে দেখতে। কেমন যেন একটা মেয়েলি ব্যাপার আছে।

পুরুষ মানুষের মেয়েলি ধরন আমার কোনো কালেই পছন্দ ছিল না। তবু মাসুমবিল্লালের সঙ্গে আমার জমে গেল, কারণ সে খুব সিনেমা দেখতে পছন্দ করত। তাও হিন্দি সিমেনা নয়। সব হলিউডি সিমেনা, তাও সামাজিক ধরনের। আমি মনে করতাম সিনেমা মানেই নারীপুরুষের প্রেম আর মারামারি। কিন্তু মাসুমবিল্লাল এমন সব ছবি আমাকে নিয়ে দেখত সেসব দেখে আমি জীবনে প্রথম জানলাম: আমেরিকানরাও কান্নাকাটি করে। কত মজার ঠাট্টাতামাশা করে।

ছবিদেখার সময় মাসুমবিল্লালকে একেবারেই অন্য মানুষ মনে হতো। তার মেয়েলি ভাবটা উবে যেত। র‍্যাঁদার থিংকারে মতো থুঁতনির নিচে হাত দিয়ে একটু ঝুঁকে বসলেও স্থির চোখ থাকত টিভিতে। তখন ভিসিআরের চল ছিল খুব। অবস্থাপন্ন মানুষদের বাসায় ভিসিআর ছিল একটা ঠাঁটের প্রতীক। তখন বুঝলাম, মাসুমবিল্লালের ভেতরে ঢাকাইয়া উচ্চারণ কেন নেই। খুব সুন্দর করে ইংরেজি বলত।

একদিন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কলেজ পাস করে কী করবে?

আমি বললাম, ঠিক করিনি।

–সে কী এটা কোনো কথা হলো। ডোন্ট ইয়ু হ্যাভ অ্যা গোল।

আমি মজা করে বলি, ওসব ফুটবল হকিতে হয়। মানুষের জীবন হলো ক্রিকেট নয়, বাস্কেটবল খেলা। সেখানে কেবল একটা স্কোর বোর্ড আছে।

–মজার কথা তো। অবশ্য সব খেলার সঙ্গে তুমি জীবনের তুলনা দিতে পারো। কিন্তু লাইফ ইজ নট অ্যা গেইম।

–আমি তো জানি জীবনটাও খেলা।

–দ্যাটস নট ট্রু। জীবন হলো জীবন।

মাসুমবিল্লালের মুখে এসব ভালো লাগছিল না। কেমন দার্শনিক ধরনের কথাবার্তা। কে জানত আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে দর্শনের মতো বিষয়ে পড়তে হবে। পরে নিতে হবে কলেজের চাকরি। জীবন এঁটে যাবে নটা পাঁচটার ঘেরাটোপে।

অবশ্য আমি কেমন জীবন চেয়েছিলাম তা তো আমি জানি না। নিশ্চিতভাবে ঠিক করিনি। দর্শন পড়তে ও পড়াতেই যে আমি জীবন নিয়ে খুব ভাবিটাবি তাও না। মাসুমবিল্লালের কথাটা তখন খুব মনে পড়ে : জীবন হলো জীবন। জীবন কোনো খেলা নয়।

মাসুমবিল্লালকে বলেছিলাম, তোমাদের তো কোনো অভাব নেই। টাকা আর টাকা। চাইলেই টাকা। কিন্তু অভাব যে নেই। বা অভাব কী জিনিস তা তুমি টের পাও।

সে বলে, অভাব নেই– এটাই তো সবচেয়ে বড় অভাব। অভাববোধ ছাড়া জীবনে কিছু করা যায় না। কোনো একটা তীব্র অভাববোধ ছাড়া কেউ কিছু হতে পারে না। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

হঠাৎ একদিন জানতে চাইলাম, মেয়েদের কেমন মনে হয়।

–মানুষ মনে হয়।

–মানে?

–মেয়েদের মানুষ মনে হয়। মেয়েরা মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী এই যে ভাগটা আছে না। আমি এটা ঠিক মানতে পারি না। যদিও শরীরে বেশ কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু মেয়ে মানেই এমন, ছেলে মানেই এমন– এটা আমাদের মগজে সেঁটে দেওয়া। আসলে বিষয়টা ঠিক এমন কিছু নয়।

সেদিন বলেছিলাম, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। মাসুমের সঙ্গে যত দিন যাচ্ছিল, ততই সে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। আগের মতো মেয়েলি মেয়েলি আর মনে হতো না। ওর ভেতরে চাপা অনেক বিষয় আছে। একদিন নিয়ে গেল একটা বাসায়। বলল, এই মহিলা তার বাপের রক্ষিতা টাইপের। মহিলা বলে সিনেমায় কাজ করে।

–তাহলে তোমার সঙ্গে এত কথাবার্তা, খুব তো দেখি আদরযত্ন করে। তাহলে তোমার মা?

সেদিন মাসুম প্রথম বলল, তার মা নেই। অনেক আগেই মারা গেছে। তবে বাপ আর বিয়ে করেনি।

–বয়স কত তোমার বাবার?

মাসুম উত্তর দিল না। তার বদলে বলল, পরে বলল।

আসলে গাড়ির ভেতরে বোধ হয় মাসুম প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছে। অনেক ব্যক্তিগত কথা বললেও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ও ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করে না। মাসুমকে যত নরম ভাবি, তত নরম আসলে নয়। একদিন বলি, তোমার সঙ্গে অনেক দিন আলাপ। কোনো দিন বাসায় নিয়ে গেল না যে!

বলল, যাব। নিশ্চয়ই যাব। এজন্য একটু সময় দিতে হবে।

মাসুম বলেছিল, তার বাপের সঙ্গে একদিন আলাপ করাবে। বাপের তাল সে বুঝতে পারে, আবার পারে না। বাপের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সে। মা জন্মের সময় মারা যায়। তারপর বিস্ফোরণ যেটা ঘটায় সে বলে, তার মায়ের কোনো পিতৃপরিচয় ছিল না। তার মা ছিল এক বেশ্যার মেয়ে।

শুনে অনেকক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারিনি। কী বলব বুঝতেও পারছিলাম না। আমাকে চুপ দেখে মাসুম বলে, কী আকাশ থেকে পড়ে পাতালে চলে গেছ নাকি! শোনো নিরাজুল, তুমি যদি তোমার মা বাবা এরা আসলে কারা কে কীভাবে কোথা থেকে এল, কেন তুমি তোমার মতো, তুমি অন্যদের মতো নও, তাহলেই তুমি এই নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। নিজের শেকড়ের সন্ধান হলো সবচেয়ে বড়। মোদ্দা কথা, তুমি কে? তুমি কেন এসেছো এ জগতে? কোন কাজের জন্য? হ্যাভ ইয়ু অ্যানি পারপাস? কী করতে হবে? এই তো মূল বিষয়।

এসব কথা মাসুমকে আমি একেবারেই নতুন করে চিনতে শুরু করলাম। ওর এসব ভারী ভারী কথায় মনে হলো, ওর সম্পর্কে আমি আসলে তেমন কোনো কিছু জানতে চাইনি। যতটুকু সে নিজে বুঝেছে যে, এটা আমাকে জানানো যেতে পারে, জানিয়েছে– ততটাই আমি তার কাছ থেকেই জেনেছি।

মাসুম বলে, নিজেকে জানার চেয়ে যন্ত্রণার আর কিছু নেই। কিন্তু মজার বিষয় হলো : এই যন্ত্রণাই সবচেয়ে বড় আনন্দের হয়ে দেখা দেয়। কী এক রোমাঞ্চ। মাঝেমধ্যে যখন ড্রাইভার গাড়ি চালায়। আমি তাকে বলি, একদম আরিচা অবধি সে গাড়ি চালিয়ে যাবে। আমি তখন গাড়িতে যেতে যেতে কেবলই ভাবতে থাকি কে আমি কে? কী আমাকে ডাকে? হোয়াট ইজ মাই কলিং? হোয়াট উই বি মাই ভকেশান? আমি মনে কি কানে– কোনো ডাকই শুনতে পাই না। শুনতে চাই, কিন্তু পাই না। কারণ ওই যে আমার কোনো অভাব নেই। অভাব নেইটাই হলো সবচেয়ে বড় অভাব। আই অ্যাম এম্পটি, ইউথ মাই টোটাল এম্পটিনেস। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ? হয়তো পারছ, হয়তো পারছ না। শোনো, কলেজে ক্লাসে এত ছেলে থাকতে তোমাকে আমার কেন পছন্দ হলো? সাম হাউ আই ফিল দ্যাট ইয়ু আর ফুল অব এম্পটিনেস। চমকে ওঠো না। তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ইয়েস, দিস ইজ দ্য ম্যান হু ইউল গোয়িং টু মেইক মাই লাইফ মিনিংফুল।

আমি বলি, কী পাগলের মতো যা তা বলছ? পাগল তুমি!

–না, আমি কোনো পাগল নই। কিন্তু আমার ভেতরে পাগলামি আছে। আমি নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু এভাবে টের পাই। যেমন আমি জটিল নই, কিন্তু আমার ভেতরে জটিলতা আছে। তেমন করেই আমি সরল নই, কিন্তু আমার ভেতরে সরলতা আছে। আমি এক নই, অবিমিশ্র নই। আমি বহু অনেক কিছুর মিশ্রণ আমি। আসলে মানুষকে তুমি কোনোভাবেই একটা নিশ্চিতভাবে দাগিয়ে দিতে পারবে না। আবার মানুষ একটি না একটি নির্দিষ্ট তালে পড়তে চায়। এজন্য একদিকে সে সেনাবাহিনী তৈরি করে। রাজনীতি করে। সিনেমা করে। আরও যা যা করে, সবই হলো তার একটা পরিচয় তৈরি করতে। কিন্তু ওই যে কি তোমাকে ডাকে, হোয়াট ইজ ইয়োর কল?– এই কল হয়তো একটা ভোকেশান তৈরি করতে পারে, অকুপেশান তৈরি করে। কিন্তু সেটাই মানুষের একমাত্র আইডেন্টিটি নয়। সেটিকে যে মনে করে তার আত্মপরিচয়, সে আসলে ভুল একটা জায়গা পা দেয়।

আমি চুপ করে থাকি। কারণ মাসুমকে কথা বলতে দিতে হবে। সে এখন কথার তোড়ে আছে। কিন্তু এটা কি আসলে তার নিজেকে প্রকাশ নাকি নিজেকে আরও রহস্যে ঢেকে ফেলার প্রয়াস। মানুষ নিজেকে যতটা জানাতে চায়। ততটাই অজানার দিকে চলে যায়। নিজেকে যতটা খুলেমেলে ধরতে চায়। ততটাই অতল রহস্যের ভেতরে সে প্রবেশ করে।

মাসুম প্রতিদিন আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। একদিন বলে, আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। কিন্তু কোনো দিন সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না। তার সঙ্গে আমার কিছুই হবে না। তবুও ভালোবাসি।

–কে সে?

–আমার বাপের একজন মহিলার সঙ্গে যাওয়া আসা আছে। মহিলা আমার কোনো আত্মীয় নয়। কিন্তু আমার বাপ তার কাছে গিয়ে সময় কাটাত। বিনিময়ে তার থাকা খাওয়া ব্যবস্থা হতো। মহিলার নাম তাজমুন্নেসা বা জমুনা বা মুনা এই নামে ডাকতে শুনতাম। তার মেয়ে আছে একটা। মেয়েটা ঢাকার একটা ভালো স্কুলে সে পড়ে। ভারী সুন্দর দেখতে বলে নয়, সঙ্গে এত ভালো গান গায়, এত সুন্দর নাচতে জানে। মেয়েটাকে আমি বলেছিলাম, তুমি কী হতে চাও? বলে : আমি প্রথমত ডাক্তারি পড়তে চাই, আর অভিনয় করতে চাই। ঠিক নায়িকা নয়। আবার নায়িকাই হতে চাই। আমি থিয়েটার করব। তুমি এটা কীভাবে টের পেলে। বলে, গান গেয়ে। গান গাইতে গাইতে আমি বুঝতে পারি, সুর দিয়ে সত্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। যে সুর মিথ্যা বলে তা সুর নয়, অসুর। তাতে তুমি বিরক্ত হবে। বিযুক্ত হতে বাধ্য হবে। ক্লাস টেনে পড়ে মেয়ে! বিস্ময়কর কথাবার্তা।

আমার হঠাৎ মেয়েটার নাম জানতে ইচ্ছা করে, বলে ওর নাম তারানা জান্নাত তাথৈ। আমি বলি, নামটা ভারী সুন্দর। তাজমুন্নেসার মেয়ে তাথৈ। ও বলে, ও দেখতেও খুব সুন্দর। ওর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যাই, বড় হয়েছে কিন্তু অদ্ভুত এক শিশুর সরলতা দিয়ে ঘেরা। সারাক্ষণ প্রজাপতির মতো উড়ছে যেন। তোমাকে একদিন তাথৈয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমিও মনে মনে এটাই বলতে চাইছিলাম।

তাথৈর সঙ্গে আমরা আলাপ তখনও হয়নি। হয়েছে এমন একটি সময়ে যখন আজমত তাসমিয়ার প্রেমে পড়েছে। তাথৈর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল যদি না মাসুমবিল্লালের বাবা জুনায়েদবিল্লাল হাজির না হতো। কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে খুন হয়ে যায় আজমত। আর খুনের মামলা পড়ে মাসুমবিল্লালের ওপর, কারণ বাপের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছিল সে। ঠিক তখন লোকজন ঘিরে ফেলে। আজমতের লাশ পড়ে আছে। আর সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়ানো মাসুমবিল্লাল। ঠিক বাংলা সিনেমার মতো হলেও জুনায়েদ তখন আবার পিস্তলটা কেড়ে নেয় ছেলের কাছ থেকে। বলে, আপনার কী দেখবার আইছেন। যান পুলিশরে খবর দিন। মারডার মাগার আমি করচি। কেস আমি সামলামু।

এসব অনেক আগের কাহিনী। আমি কোনো দিন রঙ্গমঞ্চে এই দৃশ্যের আবতারণা ঘটবে সেটি ভাবতে পারিনি। আমি ও মাসুম সেদিন গিয়েছিলাম তাসমিয়ার গান শুনতে, নাচ দেখতে। সেদিন আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হলো, জুনায়েদ কী মনে করে ঠিক করেছিল সে তাসমিয়ার মাকে বিয়ে করবে। মাসুম চায় না বিয়েটা হোক। কারণ তাতে তাসমিয়া হয়ে যাবে তার সৎবোন। এটা সে জুনায়েদকে কয়েকদিন ধরেই বলেছে। কিন্তু বলতে পারেনি যে তাঁথেকে সে ভালোবাসে।

আমাকে কাহিনীটা বললে আমি বলি, আমি এ ব্যাপারে কোনো কাজে আসতে পারি কি না।

–তুমি আমার বিষয়টা সমর্থন করো কি না।

–আমি বলি, একজন রক্ষিতার মেয়ে তা সে যতই গুণী হোক, সমাজের চোখে কেমন না?

–তাসমিয়াকে নিয়ে আমি বিদেশে চলে যাব। তখন কোনো সমস্যা হবে না।

মাসুমের কথায়, তাকে আগের চেয়ে বোকা বোকা মনে হয়। প্রেমে পড়লে মানুষ তো আসলে বোকাই হয়ে যায়!

–তুমি কিন্তু বোকার মতো কথা বলছ!

–আমি তো বোকাই। বুদ্ধিমান হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। নেই।

আমি বলে, আমার মা বলতেন, নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভালো। কিন্তু ফকির হওয়াটা কিন্তু কোনোভাবেই ভালো না। ফকির মানে টাকাপয়সা শূন্য। দরবেশ সন্ন্যাসী ধরনের ফকির নয়।

৩. তাজমুন্নেসা

আমার ডাক নাম জমুনা। তাজমুন্নেসা থেকে জমুনা হয়েছিল কি না ঠিক জানি না। জমুনা নদীর বদলে জমুনা। কারণ জমুনা হিন্দু নাম। নামের যে হিন্দু-মুসলমান আছে– এটা টের পাওয়ার আগেই আমি টের পাই, লাহোরে খুব কাছেই হীরামন্ডিতে আমার বাপ নিয়মিত যেত। এ নিয়ে সংসারে নিত্য অশান্তি করার উপায় ছিল না। বাপের ছিল বিরাট ব্যবসা। আর মা বাংলাদেশে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের নিরুপায় নারী। লেখাপড়া বেশি করেননি, বিদ্যা না থাকলে বুদ্ধি তো মানুষের থাকে, আমার মায়ের তেমন কোনো বুদ্ধিও ছিল না। বাপ যা বলতেন, চুপচাপ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমার বাপের লাম্পট্যর কারণেই কি না কে জানে, আমার ভেতরে এটা বাঁধভাঙা কী যেন কাজ করত। কিছুতেই আমার স্থিরতা ছিল না। ফলে আমাকেও বেশি দিন স্কুলে পড়তে দেওয়া হলো না। মায়ের কাছে বাপ যেমাত্র শুনলেন, মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সেদিন থেকে আর দেরি করেননি।

দশাসই মাঝবয়েসী এক লোক আমার স্বামী হিসেবে পাওয়াটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বুঝতে পারতাম না। লোকটা বিচিত্রসব কায়দা পদ্ধতি বিচিত্র সুখের এক জগৎ তৈরি করেছিল। আবার কারণে অকারণে আমাকে পেটাত। পেটাতে পেটাতে আবার আদর শুরু করত। ভয়ানক আদর। বিকট শরীরের লোকটা সব কিছু ছিল বিকট উৎকট। আমার ভেতরে যখন আসত মনে হতো প্রতিটি ধাক বুকে গিয়ে লাগছে। সুখের চেয়ে যন্ত্রণা হতো বেশি। পরে অবশ্য সয়ে গিয়েছিল।

তখন সত্তরের নির্বাচন হয়ে গেছে। লোকটি আর আমার বাবা একসঙ্গে হীরমন্ডিতে পাশাপাশি থাকা দুটো মেয়ের কাছে যেত। লোকটির বিপুল টাকাপয়সার কথা জেনে, আমার বাপ আমাকে দিয়ে ফাঁদ পাতে। তখন আমার বয়স, যেটা বলেছিলাম, সবেমাত্র বালিকা থেকে কিশোরী দশায়। আসলে আমার বাপ শুনেছিল : লোকটা নাকি দুঃখ করে একজনকে বলতে, একটা ভালো মেয়ে পেলে, সে এসব ছেড়ে দেবে। খোদা তাকে কম দেননি। পাকিস্তানে ব্যবসা করে সে কম জমায়নি।

সেই বাপকে বলেছিল, টাকা কামিয়ে ধনী হওয়া যায় না, ধনী হওয়া যায় টাকা জমিয়ে। সেটাকে আরও বাড়ানো যায়, জায়গামতো টাকা খাটিয়ে। সে বলেছিল, টাকাই আমাদের একমাত্র ধর্ম হওয়া দরকার। টাকা কামানো এবং পরিশ্রম করে সেটা কামানো। আর ব্যবসা ছাড়া ধনী হওয়ার আর কোনো পথ নেই। যে তুমি ডাক্তার হও বা যাই হও। বিষয় সম্পত্তি কিছু হতে পারে, কিন্তু ছাপ্পড় ফেঁড়ে টাকা আসার পথ ব্যবসা ছাড়া আর নেই। আল্লাহ যারে দেয়, ছাপ্পড় ফাইড়া দেয়– এটা ওই ব্যবসা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভাই, এমন পরিশ্রমের কাজ, এর জন্য একটা ভালো আরামের মানুষ চাই। যে মানুষটার কাছে গিয়ে মন ও শরীর জুড়াবে।

নভেলটি সিনেমা হলে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত আমার বাপ আর স্বামী। তখন সিনেমা হল ছিল জমজমাট। কী একটা সিনেমা দেখে, আমার স্বামী বলেছিল, এই সিনেমা দেখে তার মনে হয়েছে, পুরুষ মানুষের উচিত কিশোরী মেয়ে বিয়ে করা। যত অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করা যাবে, ততই পুরুষের শরীর স্বাস্থ্য আয়ু বাড়তে থাকবে। কিন্তু তার বয়সটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। ব্যবসাবাণিজ্য আর টাকার পেছনে ছুটে শরীরের আরামের জন্য বাজারে মেয়েমানুষ ঘাঁটা ছাড়া সংসার করার সময় সে পায়নি। ভালো কোনো মেয়ে পেলে এজন্য বিপুল টাকা সে খরচ করতে রাজি আছে।

তখন আমাকে নাকি একদিন সে দেখে ফেলে এবং ইশারা ইঙ্গিতে বলে যে আমাকে যদি সে স্ত্রী হিসেবে পায়, তাহলে বিপুল টাকা খরচ করবে। তখন আমার বাপ বেশ বড় অঙ্কের ধারদেনায় ডুবে গিয়েছিলেন। আমার স্বামী, নামটা বলি, আফতাব জৈনুদ্দিন, আমার বাপকে বড় অঙ্কের টাকাটা দেয়। ফলে আমার বাপের এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়।

আমি অনেক দিন ভেবেছি, আমার বাপ কী এমন আমার মায়ের কাছে পায় না, যার জন্য তাকে হীরামন্ডির রান্ডিদের কাছে যেতে হয়। কী আছে তাদের যা আমার মায়ের নেই। রূপ? আমার মায়ের রূপ কারও চেয়ে কম ছিল না। শরীরের গড়নগঠন বাঁধুনি, সেটাও খুবই পোক্ত ও সুন্দর ছিল। তাহলে? এই প্রশ্নটাই আমাকে আজকের আমি বানিয়ে দিয়েছে।

এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার। আমার স্বামী পাকিস্তানে থাকার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের হাওয়া-বাতাস টের খুব একটা পেত না। ফলে, ঠিক বিয়ের পরপর মানে সত্তরের নির্বাচনের পর পর, পুর্ব পাকিস্তানে একটা নতুন ব্যবসার জন্য, ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করে চলে আসে। তার কাজের ব্যস্ততার জন্য, আমাকে রেখে যায়, আমার স্বামীর বাড়ি কুমিল্লায়। যুদ্ধের কারণে কিছুদিনের জন্য যোগাযোগ কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন আফতাব জৈনুদ্দিন কুমিল্লায় এলো। কয়েকটি দিন থেকে চলে গেল। কারণ তার অনেক কাজ পড়ে আছে। লোকটাকে কেমন যেন অচেনা লাগছিল। কিছু একটা নতুন। পরে যেটা জানা হয়, তখন আর কিছু করার ছিল না। ততদিনে পেটে তারানা এসে গেছে।

যুদ্ধের শেষ সময়ে, তখন আগস্ট মাস। আমি ঢাকায় আসি। পরিস্থিতি যে ভালো নয়, বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমি নিজেও কোথাও বের হতে চাইতাম না। একেবারে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘরের বাইরে কোথাও যেতে দেয়নি। রাতে কেবল দেখতাম বস্তা বস্তা কী নিয়ে একটা ঘরে আটকে রাখছে আফতাব। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এসে শুধু বলে গিয়েছিল, চিন্তা না করতে। নিজে কখনো মুখে মুক্তির নাম নিত না। এরা সব ভারতের চর। পাকিস্তান ভাঙতে চায়। কিন্তু যেকোনোভাবে হোক পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। কোনোভাবেই ভারতীয় অপচেষ্টাকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। এগুলি সে একদিন কাকে যেন বসার ঘরে বলছিল। দেশ সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর না রাখা লোকটা হঠাৎ দেশরক্ষার জন্য এত উতলা হয়ে উঠল কেন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষবার দেখা হওয়ার সময় সে বলেছিল, আমরা লাহোরেই ফিরে যাব। এদেশে থাকা আপাতত নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমি সেই সময় থেকে আজ অবধি টের পেয়েছি, যুদ্ধ কি শান্তি বা কোনো পরিস্থিতিতেই কেউ সত্যিকারভাবে নিরাপদ থাকতে পারে না। প্রতিনিয়তই মানুষ ঝুঁকি

ও বিনাশের মধ্যে আছে।– এসব কথা বলতে গিয়ে তারানার কথা বলা দরকার।

যুদ্ধের পরপরই আফতাব জৈনুদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের হাতে ধরা পড়ে। তাকে তার কোথায় হত্যা করে কী করেছিল, সেই খবর আমি ঠিকমতো পাইনি। আমি সেই সময়ে অনেকদিন হিন্দু মেয়ে সেজে ছিলাম। কেন এটা আমার মাথায় এসেছিল– তাও জানি না। আর একটা কাজ করেছিলাম তা হলো বাসাবদল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

জুনায়েদবিল্লাল এসে হাজির হলো জীবনে। পুরান ঢাকার ভয়ংকর এক মাস্তান ছিল সে। কিন্তু সব পাপ তার ধুয়ে গেছে যুদ্ধে গিয়ে। পঁচাত্তর পর্যন্ত এক মহাপুরুষই হয়ে উঠছিল সে। কিন্তু ফের সে আবার বিপদে পড়ে। দিনে পর দিন পালিয়ে থাকে।

জুনায়েদবিল্লাল কলমা পড়ায়ে কোনো কাবিন-টাবিন ছাড়া আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। তার আগের স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু সে নতুন করে কাউকে ঘরে আনবে না। কিন্তু আমার কাছে সে আসবে। ততদিনে তারানা একটু বড়ে হয়েছে। একদম পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটিকে দেখেই আমি ঠিক করেছিলাম, আমাকে যেকোনো মূল্যে তারানার জন্যই বেঁচে থাকতে হবে। তারানার কারণেই আমি জুনায়েদবিল্লালকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু সে যেভাবে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাতে আমার বুঝতে দেরি হয়নি যে, এভাবে আমি সত্যিকারের স্ত্রীর মর্যাদা তার কাছে পাব না।

আমি বুঝতে পারি, বোধ বুদ্ধি খাটিয়ে আমি যে জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম, সব উল্টে দেয় যুদ্ধটা। স্বামী রাজাকার। যুদ্ধে সময় সে নানান লুটপাটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুবাড়ি থেকে স্বর্ণ টাকা দামি জিনিসপত্রই যে বস্তা ভরে ভরে বাড়িতে রেখেছিল, সেটাও আমি বুঝতে পারি। অনেক মেয়েকে পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। অনেক বাড়িতে আগুন দিয়েছিল। খুন নিজে না করলেও খুনের অনেক ঘটনার তার কারণে ঘটেছিল। রোষ ছিল অনেকেরই। ফল যা হওয়ার হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মেরে ফেলেছে। অবশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি অপকর্ম করেও অনেকে দিব্যি বেঁচে গিয়েছে। আবার কম করেও অনেককে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। আমার চিন্তা ছিল তারানাকে নিয়ে। তারানাকে কীভাবে কোথায় পড়াব, কীভাবে মানুষ করব।

জুনায়েদ আমাকে ব্যবহার করলেও তারানার জন্য তার কিছুটা দরদ মনে হয়ে ছিল। কিন্তু ওর ভাদাইম্যা পোলা মাসুমবিল্লালটারে আমার একেবারেই পছন্দ হতো না। আমি তাকে খাতির করতাম যাতে জুনায়েদবিল্লাল আমার ওপর খোশ থাকে। সঙ্গে তার এক বন্ধু আসত নিরাজুল নামে। আমার দিকে ছেলেটা এমনভাবে তাকাত। আমাকে বলেছিল, আমাকে নাকি ঢাকাইয়া ফিল্মের রিনা খানের মতো লাগে। এতেই যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছিলাম। ছেলেটার নজর ভালো না। একদিন দেখি শাড়ি সরে যাওয়ায় বুকের চিপা বেরিয়ে থাকার দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছে।

–তোমার এই দোস্ত, নিরাজুল, ছেলে কেমন?

–ভালো ছেলে। একটু উদাসীন আছে।

–উদাসীন নাকি ভান করে?

–না ভান করার কী আছে! কেন কোনো সমস্যা করেছে নাকি?

–সমস্যা করে নাই, তবে করবারও পারে।

–আপনি মিছামিছি সন্দেহ করছেন।

–তয়, ওরে কিন্তু একদম গোবেচারা মনে হয় না।

–গোবেচারা কেন হবে? সাদাসিধা ছেলে তো।

–আরে অর সাদাসিধাটাই হলো ওর ভান। ঘাগু মাল।

–কী জানি আমার এমন মনে হয় নাই।

এজন্যই ভাদাইম্যা বলি। আমি স্পষ্ট টের পাই নিরাজুলের নজর খালি আমার শরীরে ঘোরে। অসভ্য যেন কোথাকার! মাইয়া মানুষের সারা শরীরে যে চোখ, খানকির পোলাটা জানে না মনে হয়।– মনে মনে গালি দিলেও কথা বলতে পারিনি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ওরে নিয়ে আমি একটা বাজে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে সে আমার সঙ্গে মেলামেশা করছে। আর আমিও অনেক আনন্দ পাচ্ছিলাম, বিকটভাবে গোঙাচ্ছিলাম, যেভাবে বিয়ের প্রথম দিকে আফতাবের কাছে গোঙাতাম– এর মানে কী?

আমার অজান্তেই ওর প্রতি আমার একটা টান তৈরি আছে? সেটা কী করে হয়। ওইটুকু পোলা! ভালো করে গোঁফও ওঠেনি। তবে আজকালকার পোলাপান খুব খারাপ হইছে। ভিসিআর আসার পর বাজে ছবি দেখার হিড়িক পড়েছে ওদের ভেতর। ওই ছেলে নিশ্চিতভাবেই ওইসব বাজে ছবিটবি দেখে। কারণ ওরে আমি একদিন পল্টন দিয়ে যাওয়ার সময় বাজে পত্রিকা কিনতে দেখেছিলাম।

রিকশাটা জ্যামে পড়েছিল। তখন খেয়াল করেছিলাম। ও একটা পত্রিকা কিনেছিল, জলসা নামের। কিনেই কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভেতরে চালান করে দিয়েছিল। অসভ্য পোলাপান। এসব পোলাপানের হাত থেকে তারানাকে বাঁচাতে হবে। আর সেজন্য আগে আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাটাকে পোক্ত করতে হবে।

আমি যেটা করেছিলাম : সময়মতো গয়নাপত্রগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলাম। বিহারিদের একটা বাড়ি কিনে নিয়েছিলাম। এই সময়ই আসলে পুরান ঢাকার মাস্তানদের সঙ্গে আমার খাতির হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে আমার বাসাই ছিল ওদের আনন্দের জায়গা। এরা আমি যখন যা চাইতাম, তাই এনে দিত। এই চাওয়া ও পাওয়ার ভেতরে তাদের উদ্দেশ ছিল একটাই আমাকে পাওয়া। পাওয়ার মূল্য দিতে গিয়ে আমার নিজেকে তাদের পাইয়ে দিতে হলো।

বাইরের অনেক কথাই কানে আসত। ঢাকা শহরের নানান জায়গায় মাস্তানদের এমন চক্র থাকত। কিন্তু এখানে কয়েকটি মাস্তান বা গুন্ডা আমার কাছে আসত। প্রায় দিনই কিছু না কিছু নিয়ে আসত। তাদের বেলবটম প্যান্ট, বাবড়ি চুল, ঝোলানো গোঁফ, কারও কারও চোখে রোদচশমা। সবার ধরনধারণও ছিল এক। এতগুলি মানুষ যে প্রায় একরকম হতে পারে, চলনে বলতে আচরণে– সেই প্রথম আমি জানলাম। একরকম বলতে বাইরের আচরণে এক রকম। ভেতরে তো কিছু আলাদা। একই রকমের কাপড় পরা, একই ধরনের স্বরে কথা বলা, এমনকি সিগারেট ধরানোর কায়দাটাও। এজন্যই বলা হতো গুন্ডার মতো, মাস্তানের মতো। এই 'মতো'টা আমি বুঝতে পারি।

এর ভেতরে আইজল একটু মরিয়া ছিল। অন্যরা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আসত। আইজল আসত একা। এলেই আমাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ত। আর সব কাপড়চোপড় খুলে উদোম হয়ে যেত। কোনো আপত্তিই সে শুনত না। বলত, এ-অবস্থায়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে আরাম লাগে। অত্যন্ত লোমশ শরীরের সব কিছু ছিল কেমন বিকট। বিকটদের সঙ্গেই কী করে আমরা গিঁট লেগে যায়। বিকট প্রকট উৎকট– আমারও মন্দ লাগত না। তাও আইজলকে দেখলে আমার গা গোলাত। নিজেই বলত, জিনিসটা দেখছ? একদম ঘোড়ার জিনিস। কী কও? তাই না? আর অণ্ডকোষ দুটো হাতের তালুতে নিয়ে দেখি বলত, এই দুটা পুরো ষাড়ের। বলে ঘর কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে হাসত। তার হাসির শব্দ বাড়ির বাইরে থেকে পাওয়া যেত।

তবে সে আমাকে কখনো জোর করত না। ওর জন্য শোবার ঘরে আমাকে একটা সোফা এনে রাখতে হয়েছিল। আমি বিছানায়, আর সে সোফায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টাও পার হয়েছে। রাজ্যের আবোল-তাবোল কথা বললেও অনেক মজার কথাও বলত। অনেক কৌতুক বলত। কৌতুকগুলো বেশিরভাগই বড়দের। আর দেখতে হতো তার বিকট প্রত্যঙ্গ নিয়ে হাতের খেলা। মেঝেটা অনেক সময় নোংরা করে চলে যেত। মেঝেতে পড়ে থাকা রেতঃ তো এখনকার মতো টিস্যু পেপারে সহজে মুছে নেওয়ার উপায় থাকত না। এই ঘিনঘিনে ব্যাপাটাতে আমি মনে হয় মজাও তেমন। আমাকে নাকি খুব দলাই মলাই করতেই তার বেশি ভালো লাগত। আমি না চাইলে সে কিছুই

শুরু করত না। আশ্চর্য এক লোক ছিল এই আইজল।

সে বলে সেন্ট গ্রেগরির ভালো ছাত্র ছিল। তার সঙ্গে পড়ুয়ারা এখন বড় বড় চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য করে। সে কেন এমন হলো সেই ইতিহাসের কথাও বলত।

কোনো দিন কয়েকটি গুণ্ডা একসঙ্গে আসত। তার সব বসার ঘরে পাশাপাশি নানান কায়দা বসে থাকত। আমার কাজ ছিল তাদের সঙ্গে নখরামি করা। ডিভানে এলিয়ে এককাতে, কখনো চিৎ হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে চুলের প্রান্ত হাতে জড়াতে জড়াতে আর খুলতে খুলতে হাসিতামাশা করা। আমার কারণে নাকি তারা অনেক ভালো হয়ে যাচ্ছে। বলে হা হা করে হাসত।

কয়েক বার পুলিশও এসেছিল আমার বাসায় তল্লাশি করতে। ইয়াদুদ্দিন দারোগার কথাবার্তা ছিল গুণ্ডাদের চেয়ে খারাপ। একটা কথা সে গালাগালি ছাড়া বলতে পারত না। আর গায়ে হাত দিয়ে এখানে ওখানে চাপাচাপি করত। তার কনস্টেবলদের সমানেই শাড়ি ব্লাউজের ওপর দিয়ে খাবলা দিয়ে বুকে হাত দিত। কিছুক্ষণ চাপাচাপি করে তারপর বোঁটা ধরে মোচড় দিয়ে জঘন্য গালি দিয়ে কথা শুরু করত।

–স্টার্ট দিলাম। বল, খানকি মাগি, তোর রুপ্পু নাগরের খবর বল।

–আমি কি জানি রুপ্পুর কথা?

–তুই জানস না তো কে জানে?

–আমি তার কে?

–ও হো, তুই তার কে তা কি তোরে মনে করায়া দিতে হইবে।

–দেন মনে করাইয়া, দেখি মনে পড়ে নাকি!

–খানকি মাগি! তোর গুদের ভিত্রে লেওড়া হান্দায়া দিলে বুঝবি, খানকি মাগি!

তখন ইয়াদুদ্দিন আমার চোয়াল বাঁ হাতের তালুতে শক্ত করে ধরে, ডান হাতে পাছার ওপর বাড়ি দিতে দিতে বলত, খানকি মাগি, একদম পাট লইবি না। একদম হজম কইরা ফালামু গাঁড়মারানি মাগি।

তখন আমাকেও গালাগালি করতে হতো। আমিও মুখে যা আসত বলতাম। চুতমারানির পুত, একদম খিস্তি দিবি না। তোর খিস্তির গুষ্টি চুদি।

আমার নামে কোনো অভিযোগ ছিল না। এখানে আসতই গুণ্ডাদের খোঁজ নিতে তাও না, আমাকে একটু না ঘাঁটালে ইয়াদুদ্দিনের ভালো লাগত না। লোকটা মদ খেত খুব। কিন্তু পেটানো শরীর ছিল। ঘোড়ার মতো কাজ করতে পারত। তেজ ছিল ভয়াবহ। কোনো কিছুকে পরোয়া করত না।

এর ভেতরে আমার কয়েকবার মুচলেকা নিয়ে গেছে। আমি তাজমুন্নেসা জমুনা নাম লিখলে বলত, যমুনা ঠিক করে লিখতে। আমি বলতাম, আমার নাম জ দিয়ে, য দিয়ে না। ওটা নদীর নাম থেকে আসেনি, ওটা এসেছে তাজমুন্নেসা থেকে। আমারে কি আপনার নদী মনে হয়?

–তুই নদী হইবি ক্যান। তুই হইলি দরিয়া। দিলদরিয়া।

৪. গীতি

নিজের কথা বলবার আগে আমার বাবার কথা একটু বলে নিই। আমার বাবা সিরাজুল হাসানের সকালবেলার কাজ ছিল কোনো দিন কোরআন, কোনো দিন গীতা, কোনো দিন বাইবেল কোনোদিন ধর্মপদ পড়া। অনেক পরে জোগাড় করেছিলেন জেন্দাবেস্তা আর গ্রন্থসাহেব। তারপর থেকে সেগুলো নিয়মিত পড়তেন। এমনকি তার কাছে দ্যা স্যাটানিক বাইবেলও ছিল। আমার জন্মের সময় বাবা পাবনার ডিসি। আরও কয়েকটি জেলা ঘুরে আমরা ঢাকায় থিতু হয়েছিলাম। বাবা তখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব। বাবাকে আমি কখনো খালি গায়ে দেখিনি। কোনো দিন কাউকে গালাগালি করা তো দূরের কথা রাগারাগিও করতে দেখিনি। অনেক বড় হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি এত শান্ত থাকেন কী করে? তার মেয়ে হয়ে আমার অন্তত এই গুণটি আয়ত্ত করা দরকার।

তিনি বলেছিলেন, হয়তো তিনি ভেতর থেকেই শান্ত। আলাদা করে এজন্য আমাকে শান্ত হতে হবে, আমি যেকোনো অবস্থায় পরিস্থিতিতে শান্ত থাকব– এমন কোনো মন্ত্র জপ করতে হয়নি। বলতে পারিস, আমার ওই সকালে নানান ধর্মগ্রন্থ পড়ার ফল। প্রত্যেকটির ভেতরে একটা শান্ত স্বর আছে।

গীতা আকারে ছোট বলে তিনি প্রায় সব সময় গীতা রাখতেন। তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল রাধাকৃষ্ণণের ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করা গীতাটা। ওটা তিনি ভারত থেকে এনেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর আগে আব্বা কলকাতা চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তার পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের একসঙ্গে করেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করতে। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে পাগলের মতো কাজ করছিলেন। সব নস্যাৎ হয়ে গেল ১৯৭৫ সালে।

সুরা বাকারা-র ১৫৩ আয়াত 'ইন্নালাহা মা আস সবেরিন' আর সুরা সাফ-এর ১৩ নম্বর আয়াত 'নাসরুম মিনাললাহে ওয়া ফাতহুন কারিব'– এই দুটি বাণী তার খুবই প্রিয় ছিল। আর ছিল বাইবেলের একটা কথা নিশ্চয়ই অতি শিগগিরই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে শিগগিরই সুসংবাদ আসবে।

মানুষ খুবই অনিষ্টের মধ্যে আছে।– এই কথাটা তিনি বার বার মনে করতেন। তার মেয়ে হয়ে আমি একটু ছন্নছাড়াই ছিলাম। মতিছন্ন যাকে বলে। বাবা বলতেন, ধৃ থেকে ধর্ম, যেটি যা ধারণ করে সেটিই তার ধর্ম। ফলে ধর্ম নাম দিয়ে হয় না, কাজ দিয়ে গুণাগুণ দিয়েই হয়।

আমরা ভাইবোন সবাই ছোটবেলায় কমবেশি নামাজরোজা কোরআন পড়া প্রায় নিয়মিত করতাম। এ নিয়ে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। একটা রুটিনের মতো। আম্মা সব ঠিক করতেন। কার কাছে আরবি পড়ব। কখন নামাজ পড়ব।

আমি ঠিক উচ্ছন্নে যাওয়া লোক না হলেও, প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম আরেক উচ্ছন্নে যাওয়া নিরাজুলের সঙ্গে মিশে মিশে। অল্প বয়সে সব মজা নিংড়ে নিয়ে আমরা সময় কাটাতে কাটাতে আমাদের মনে হয়ছিল যখন এবার আর কিছু বাকি নেই। হয় জীবন শেষ করে দিতে হবে, নয়তো নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। সেই সময়ে আমরা দেখেছিলাম, নিজেদের ঠিক পথে আনার জন্য আমরা প্রায় কিছুই করিনি। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবন আমরা একদম হাওয়ায় ফুঁকে দিয়েছি।

ক্লাসে একদিন স্যার বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা হলো তিন প্রকার : এক হলো জীবন্ত, দুই হলো মৃত, তিন হলো যন্ত্র। জীবন্ত তারাই যাদের শেখার আগ্রহ আছে, অবিরাম যাদের মনে নতুন নতুন প্রশ্ন জেগে উঠতে থাকে, তারা; মৃত হলো যাদের কোনো আগ্রহ নেই, প্রশ্ন নেই; আর যন্ত্ররা হলো যা শোনে, নোট করে ও পড়ে সব মনে থাকে, যন্ত্রের মতো কপি করে পরীক্ষার খাতায় যন্ত্রের মতো ঢেলে দেয়, মুখস্থবিদ্যাই হলো এদের সম্বল। শুনে নিরাজুল বলে, স্যার, আরেকটা আছে।

–কী রকম?

–উড়ন্ত।

শুনে ক্লাসের সবাই হো হো হেসে উঠল।

সবাই যখন হাসছিল, আমি নিরাজুলকে দেখছিলাম। ক্লাস শেষে নিজেই গেলাম নিরাজুলের কাছে। আমি বললাম, –আমি গীতি, গীতি হাসান।

–আমি নিরাজুল। নিরাজুল আলম।

এই দিয়ে শুরু। প্রথম বর্ষের একেবারে শুরুর দিনগুলিতে, প্রতি ক্লাসে নতুন নতুন স্যার ম্যাডামরা আমাদের নাম বাড়ি কোন কলেজ থেকে এসেছি, জানতে চায়। আমরা পালা করে বলে যেতে থাকি।

কেউ কারওটা মনে রাখতে পারি না। স্যার ম্যাডামরাও কিছু মনে রাখতে পারেন না। এত ছেলেমেয়ের নামই মনে রাখা যায় না তো : বাড়ি কোথায়, কোন কলেজ থেকে এসেছে, কোন বিভাগ–বিজ্ঞান, মানবিক না বাণিজ্য– এসব তো মনে রাখা আরও কঠিন। এগুলোর কোনো মানে হয় না। ঘোড়ারডিমের জন্য এসব বলতে হয়। এটা আনুষ্ঠানিকতাও নয়। একেবারেই কোনো মানে হয় না।

নিরাজুল আমাকে সে কোথায় বাড়ি, কোন বিভাগে পড়েছিল, কোন কলেজ থেকে এসেছিল, এসব কিছুই বলেনি। আমিও অন্যদিকে আলাপ করছিলাম। আলাপ করতে করতে কখন বেলা চলে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। আমাদের আরও ক্লাস ছিল, সেটাও খেয়াল ছিল না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কলাভবন থেকে বেরিয়ে টিএসসির পাশ দিয়ে দোয়েল চত্বরে এসেছিলাম।

বাংলা একাডেমি দেখে, নিরাজুল বলে, আরে এখানে দেখি বাংলা একাডেমি! এত দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই পড়েছে। বিষয়টা আগে জানলেও আমি নিজেও খেয়াল করিনি। পরে আমি দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছেলেমেয়েই জানে না বাংলা একাডেমি কোথায়। তারা চেনে নীলক্ষেত, নিউমার্কেট আর গাউছিয়া, চাঁদনী চক। নীলক্ষেত যেতে বইপত্র নোটপাত্তি, রেফারেন্স বই কিনতে, ফটোকপি করতে, আর গাউছিয়া কাপড় কিনতে আর বানাতে। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কোনো জগৎ নেই। অথচ হওয়ার কথা ছিল সারা জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তৈরি হয় এখানে পড়ার সূত্র ধরে। একটা জায়গা পড়বে কিছু ছড়িয়ে যাবে ভুবনময়।– এসব বলছিল নিরাজুল।

তারপর আমরা ঠিক করি যদ্দিন এখানে থাকব, তদ্দিন খাবদাব, ঘুরব, বেড়াব, আর মাঝেমধ্যে পড়ব, পরীক্ষা দেব। স্রেফ পাস করব। পড়ব আর্টসে, ঘুরব ডাঁটসে– এর মানে : কোনো পড়ালেখা নেই, তাই মজাসে ঘুরব– তা নয়। বরং পড়ব অনেক গোগ্রাসে পড়ব। আর দমে উদ্যমে পরানভরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁচব– সেটা তখন আমাদের কে বোঝাবে।

নিরাজুল সারিবেঁধে দিয়েছিল আমাদের মতো মানুষদের মাত্র পাঁচটা কাজ : ভোজন-রমণ-শয়ন-ভ্রমণ-পঠন। এটা প্রায় স্লোগানের মতো তৈরি করেছিলাম আমরা। আমরা বলতে নিরাজুল, আমি, রুদাবা, আর বুমেদিন। বুমেদিনের সঙ্গে নিরাজুলের কঠিন দোস্তি হয়েছিল। সেই দিক থেকে আমি ও রুদাবা তত ঘনিষ্ঠ ছিলাম না।

বুমেদিন প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। কেমন একলা একলা থাকত। নামটা বাহারি। পরে জানি এটা আলজেরিয়ার এক প্রেসিডেন্টের নাম : বুমেদিন। হাওয়ারি বুমেদিন। আর ওর নাম হলো : আহমেদ বুমেদিন আবু।

আহমেদ বুমেদিন নামে সে কবিতা-গল্প লেখত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার দুই বছরের মাথায় উপন্যাস লেখতে শুরু করে। সেই বুমেদিন বলল, ওই পাঁচটা পুরোপুরি চালাতে পারলে তবে হবে লেখন। সে আমাদের পাঁচটা কাজের সঙ্গে লেখনকে যোগ করে। এই পাঁচকাজের শেষটা হচ্ছে লেখন। ওটাই ওর মতে 'আসল কাজ'। বলছিল, আসলে এই যে, প্রচুর মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, এর প্রধান ফলটা হওয়ার কথা প্রচুর লেখক। বা লেখালেখির কাজটা বিপুল পরিমাণ মানুষ করতে শুরু করবে।

আবু তার নিজের ডাক নাম নয় আহমেদ বুমেদিনের সংক্ষিপ্ত হলো আ.বু.। আবুকে দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো সময়টায় রুদাবার সঙ্গে ঘুরতে। রুদাবা গড়নে লম্বা-চওড়া, দেখতে কালো। দেখতে উৎকট উগ্র লাগত। আর রুদাবার সব কিছু ছিল বিরাট বিরাট। ছেলেপেলে বলত, আবু তো ওর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেলে নিজেকে আর খুঁজে পাবে না।

সারা দিন দুটিতে আঠার মতো লেগে থাকত। মেয়েটি আবার লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো ছিল। ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার কারণে তার আর বিদেশে যাওয়া হয়নি। চাচা ফুফুরা তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। একটা মাত্র ভাই আছে। ছোট। রুদাবাই বড়।

রুদাবা টিউশনি করে, কোচিং সেন্টারে ইংরেজি পড়ায়। সে আর তার ছোট ভাই ঢাকা শহরে একটা গলিতে এখন থাকে। ওর আসল মা খুবই বিলাসী জীবনযাপন করত। মদ-সিগারেট খেত। মায়ের চরিত্রের দোষের কোনো সীমা ছিল না। বাবার বন্ধু, এমনকি রুদাবার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক করত আর ভাঙত। তার মায়ের জন্যই তাদের সর্বনাশ হয়েছে– বাবা মারা যাওয়ার পর একদিন প্রচণ্ড ঝগড়ার পর মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। প্রথম প্রথম রুদাবা এটা নিয়ে খুব ভুগত।

জীবনটা বেঁচে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পেয়ে আরও বেঁচে গেল আহমেদ বুমেদিনের দেখা পেয়ে। বুমেদিন বলেছে, অতীতের জন্য কোনো আফসোস করা যাবে না, বর্তমানে বাঁচতে হবে। জীবন মানেই লড়াই আর লড়তে হবে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ভবিষ্যৎকে মোকাবিলা করতে হবে ভয়হীনভাবে। গতস্য শোচনা নাস্তি।– এটা ছিল রুদাবার জীবনে আহমেদ বুমেদিনের প্রধানতম প্ররোচনা।

নিরাজুল বলেছিল, বুমেদিন আল মাহমুদের 'ঘটনা' কবিতাটা পড়ে শুনিয়েছিল। এর আগে এত মন দিয়ে কোনো কবিতা শোনেনি রুদাবা। আর শুনে কবিতাটা নিজে পড়ার জন্য বইটা কোলে টেনে এনেছিল। তখন বুমেদিন বলছিল, এই কবিতাটা কেন আমার এত ভালো লাগে জানি না। পড়লেই মন উদাস হয়ে যায়। রুদাইবা আর রুদাবা তো একই, কী বলো?

উলন রোডের ইমতাহামদের ফ্ল্যাটে বুমেদিনের ওপর চড়ে রুদাবা কবিতার সংলাপটা বলেছিল, রুদা তোমহারাই হোগী। রুদাবার গরম নিশ্বাসে তখন বুমেদিনের গাল পুড়ে যাওয়ার দশা।

আহমেদ বুমেদিন ওই পাঁচটি কাজের শেষ কাজটি মিলে যে ছক কেটেছিল, তার মতে, মানুষে প্রথম দুটো কাজ হলো : ভোজন ও শয়ন। মানে খাওয়া ও ঘুম। বাকি চারটা না হলেও কেমন কোনো অসুবিধা হবে না। আর ভেতরে কাছাকাছি অনিবার্য হলো : রমণ। ভ্রমণ পঠন লেখন–এগুলো কোনো ঘটনা নয়। তারপরও ওই তিনটার ভেতরে ভ্রমণকে সবার আগে রাখে।

বুমেদিন ডায়েরি লেখত। আর সমস্ত ডায়েরি শুরু পাতায় একটা কথা লিখে রাখত : "পুরো পৃথিবী একটা বই এবং যারা ভ্রমণ করে না তারা কেবল একটি পৃষ্ঠা পড়ে। সুতরাং ঘোরো, পড়ো এবং লেখো।" সেন্ট অগাস্টিনের উক্তিটার সঙ্গে নিজের উক্তিটা যোগ করেছিল।

আমাদের বলত, আসলে তো সে পড়তে লেখতে চায় না, জীবন উপভোগ করতে চায়। ঠিক বালজাক যেমনটা মনে করতেন। সে মার্কস, গ্রামসি পড়া অনেক অনেক বামপন্থির পরবর্তীকালে ভোগবাদী জীবনযাপন করার কারণটা মনে করত : তারা জগতের নিয়মটা দেখিয়ে দিয়েছেন, পাল্টানোর কথাও বলেছেন। কিন্তু নিয়মটাই দেখা যায়, মানুষ যাতে বিদ্যামান অবস্থা থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, তরল সাহিত্য আর গণমাধ্যমে গণমনোরঞ্জন– এই তিন হলো বর্তমান দুনিয়ার কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

যত্ন করে জার্মান শিখেছিল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে, বুয়োং-সুল হানের 'সেভিং বিউটি'-র অনুবাদ করতে করতে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছিল সে। অনেক পরে বুঝেছে : রুদাবার মতো বাল্কি কালো মেয়েকে পছন্দ করার পেছনে নাকি সুল হানের বইটা কাজ করেছে।

বুমেদিনের অনেক কথাই আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না। ও আমাদের সঙ্গে থেকেও আসলে দূরে দূরেই থাকত। ওকে যা বোঝার বুঝেছিল রুদাবা। আর এজন্যই রুদাবা ওকে বিয়ে করেনি। রুদাবা বলেছিল, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব সবসময় সারাজীবন, কিন্তু বিয়ে করলে সুখী হতে পারব না।

নিরাজুল বলেছিল, বিয়ে করে যারা সুখী হতে চায়, তাদের চেয়ে বোকা আর কেউ নেই। বিয়ে করার মানে এলোমেলো জীবনটাকে একটু গুছিয়ে যাপন করা; আর কিছু না। বিয়ে উল্টো দেখা যায় : অনেকের গোছানো জীবনকে এলোমেলো করে দিতে পারে। সেই পুরোনো কথা বিয়ে কাউকে পূর্ণ করে, কাউকে ধ্বংস করে। আইদার

ইউ ইউল বি কমপ্লিট অর ইউ উইল বি ফিনিসড। তবে ধ্বংসটা সৃষ্টি জন্যও হতে পারে। এমন মজার কথাও তো কম নেই। বিয়ে সুখের হলো তো ভালো, অসুখের হলে দার্শনিক বানিয়ে দিতে পারে যেকাউকে। হাঃ হাঃ হাঃ!

রুদাবা বলেছিল বুমেদিনের পারভার্ট না, কিন্তু মগজে ভয়াবহ পারভার্সন, এজন্য বেচারা জিনিয়াস হতে গিয়েও হলো না। জানিস তো : এভরি জিনিয়াস ইজ পারভার্টেড।

–এসব বাজে কথা। এগুলি হলো, কী বলব, ধরে কেউ তেমন হলে এই কথা বলে সামাল দেবে, যে পারভার্ট, কারণ সে জিনিয়াস বা তার ভেতরে তেমন সম্ভাবনা আছে। আর কেউ জিনিয়াস হলে কি বলবে, সে পারভার্ট? বলবে না বোধ করি। মজাটা এখানেই। পারভার্ট হলে জিনিয়াসকে টানবে, কিন্তু জিনিয়াস হলে কিন্তু পারভার্শনকে যোগ করবে না।

–তাও বুমেদিন কেমন যেন। বোঝা যায় না।

– তুই কি নিজেকে বুঝিস? আমরা সবাই কি আমাদের নিজেদের বুঝি?

রুদাবা বলে, বোঝাবুঝি, খোঁজাখুঁজি বড়ই ঝামেলার জিনিস, জানিস। সব কিছুকে সারাক্ষণ সূক্ষ্মভাবে দেখা যায় বল? বুমেদিন পড়ে আই আর এতে, কিন্তু সারাদিন মাথায় উপন্যাস লেখার চিন্তা। কিন্তু লিখতে তো পারছে না। এই না লিখতে পারাটা আবার তাকে হতাশও করছে না। কিন্তু, একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেইখানেই তার আমাকে নিয়ে মেতে ওঠা। যে মাত্র উপন্যাসটা পেয়ে যাবে, আমি অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে হয়তো।

–এসব আমাকে বলে কী হবে? বুমেদিনকে বলেছিস?

–বলিনি আবার!

একটু থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদাবা বলে, ওর সঙ্গে মিশি কেন জানিস?

– কেন?

– ওকে সব বলা যায়। সব। আমি কী করি, কী ভাবি– নিজের সম্পর্কে, ওর সম্পর্কে, অন্যদের সম্পর্কে। আমার খুশি, কষ্ট, দ্বিধাদ্বন্দ্ব কী নয়, উদ্ভট আজব সব চিন্তাভাবনা, হেন জিনিস নেই যে ওকে বলা যায় না।

আবার একটু থেমে বলে, এজন্যই ওকে আমার বিয়ে করা ঠিক হবে না।– এটা আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি।

–মানে কী!

–মানে বন্ধুত্ব আর বিয়ে এক হলে মুশকিল হয়। সবার জন্য হয়তো হয় না, আমাদের জন্য ভালো হবে না।

– বৌকে বন্ধু, বা স্বামীকে বন্ধু বানানোটাই তো সবচেয়ে সেরা সম্পর্ক তাই না!

রুদাবাও বুমেদিনের মতো দুর্বোধ্য। কোনো কোনো জায়গা ধরা যেত, বেশির ভাগটাই বোঝা যেত না। মানতেই হবে, ওর জীবনের জটিলতাই ওর নিজের দুর্বোধ্যতার কারণ।

বুমেদিনের সঙ্গে মিশে যেটা হয়েছিল, কবিতার প্রতি ভালোবাসা। বুমেদিন হেন দিন নেই, যেকোনো একটা কবিতা, নতুন পুরোনো, তাকে পড়ে শোনাত বা, পড়তে বলত । সঙ্গে বলত, আমি সারাক্ষণ কবিতা নিয়ে ঘুরি কারণ বাস্তবতাই আমার মূল বা শেকড় হলো মাটি। কবিতা আমার ডানা। মানুষ যেমন দূরে যাওয়ার দ্রুততম উপায় হিসেবে উড়োজাহাজ তৈরি করেছে, তারও আগে তৈরি করেছে কবিতা। কবিতা নিমিষে মানুষের মগজে ডানা তৈরি করে দিতে পারে। এজন্য কবিতার ওপরে আর কিছু নেই। কবিতা উড়োজাহাজের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু আমি কবিতা লিখতে পারি না, আমার খুব বাস্তবতার মাটি ঘাঁটাঘাঁটি করার বাতিক আছে। কিন্তু কবিতাই আমাকে উপন্যাসে জগতে ঠেলে দিয়েছে। মাথায় সারাক্ষণ কাজ করে কবিতা, কিন্তু লেখতে চাই উপন্যাস।

বুমেদিন বার বার রুদাবার কাছে ওর মায়ের নানান বিষয় জানতে চায়। এমনকি মায়ের একটা ছবি নিয়ে রেখেছিল। বেলবটম প্যান্ট আর শার্ট পরা ছবি। ভ্রূ প্লাক করা আর কাজল দেওয়া চোখের সেই ছবির দিকে এক ঠায় তাকিয়েছিল। কোথায় যেন কার সঙ্গে মিল আছে।

হঠাৎ মনে হলো হ্যাঁ তাই তো। মুখে বলে, সোফিয়া লরেনের সঙ্গে মিল আছে।

–অনেকটাই। আর খুব সেক্সি ছিল, রুদাবা বলে।

নিজের মায়ের ও বাপের মিলন দৃশ্য কত যে দেখেছে! তারা ছোট ছোট ছিল বলেই কি না কে জানে খুব বেখেয়ালে থাকত। দুজন দুজনকে নিয়ে মেতে উঠলে আর দরজা বন্ধ করে খেয়াল থাকত না, খেয়াল থাকত না জানালায় পর্দা টেনে দেওয়ার। চিৎকারে শীৎকারে ঘরমাতোয়ারা করে দিত। রুবাদার ভেতরেও এটা ছিল। বুমেদিন বাধা দিত না। কোনো দিন ওর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলেনি, আস্তে।

রুবাদার কাছে বুমেদিন প্রায়ই ওদের ছোটবেলার বাড়ির কথা শুনত। সেগুলো আবার নিরাজুলকে বলত। নিরাজুল বলত আমাকে। বুমেদিনকে রুদাবা বলেছিল, বনানীর বাড়ির প্রতিটি তলায়ই চারপাশেই বারান্দা। টানা বারান্দা। মাঝখানে থাকার ঘর। সিঁড়ি আছে বাড়ির ভেতর দিয়ে। তিন তলার পুরোটা নিয়ে থাকত। তার বাপ একদিকে ব্যবসা আরেক দিকে রাজনীতি করত। ফলে বেঁচে থাকার সময় এলাকার লোকজন, আরও কত লোকজন, খুব পাত্তা দিত সবাই। পাপা মাম্মিকে সময় দিতে পারত না। তার মাম্মি এ নিয়ে অভিযোগ করলে, দ্বিধাহীনভাবে বলত, তুমি কিছু প্রেমিকট্রেমিক জুটিয়ে নিলে তো পার। মাম্মি বলত, তাই করব। তখন আবার গা জ্বলবে না তো?

–চিন্তা করো না। পারলে তোমার প্রেমিকদের সঙ্গে ক্যাম্পফায়ার চলার সময় খবরও দিতে পার। এসে দেখে যাব। কয়েকটা সিগারেট টেনে যাব। তোমাদের জ্বালানো আগুন থেকেই সিগারেট ধরিয়ে নেব। কয়েকটা ম্যাচের কাঠি বেঁচে যাবে। বলে হো হো হাসত।

–এসব গল্প মাম্মি আমাকে নেশা করতে করতে বলত। মদ ছাড়া তার একটা দিনও চলত না। বাপের কাছে এক ঘর ভর্তি মদের কালেক্টশন ছিল। কী যে জীবন ছিল আমাদের! চিন্তাও করতে পারবি না। প্রতিবার খাবারের সময় কত পদের তরকারি, কত কী যে খাবারে টেবিল ভরে উঠত, ইয়ত্তা নেই। এই তো সেদিনও। আর মাত্র তিন বছরের ভেতর সব উল্টে গেল। এখন মনে হয়, মাম্মি ওই ঘরে বসে আমোদফুর্তি না করে নিজে যদি কোনো একটা কাজ করত, যেখান থেকে নিয়মিত একটা টাকা আসে, তাহলেই আর এই বিপদে পড়ত হতো না। অবশ্য জানি না, আমার চাচারা আমাদের সম্পত্তির পুরোটা দখল করে নিয়েছিল, বলে, আমার বাপ ঢাকা যে বাড়িতে এক মহিলাকে রেখেছিল, বিয়ে করেনি কিন্তু তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাকে ঠিক আমার বাবার কেপ্টও বলা যাবে না। তার জন্য একটা ছোটবাড়ি কিনেছিল। দোতলা। সেটাই এখন আমাদের দুই ভাই-বোনের থাকার জায়গা। সেই বাড়িটার এক তলাটা ভাড়া দিয়ে আমরা চারজন দোতলায় থাকি। ওই মহিলাই আমাদের এখনকার মা। ওনার নিজেরও একটা ছেলে আছে। ছেলেটা আমার পাপাই ছেলেটার বাবা। ওই বেচারিকেও তার স্বামীর মৃত্যুর পর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওর শ্বশুরের গুষ্টি। আমার বাপের মৃত্যু মায়ের আত্মহত্যা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আর আমার বাপের মৃত্যু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে।

জগতে প্রকৃত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন এই মহিলা। শ্বশুরবাড়ি থেকে খেদিয়ে দিলে তিনি নারায়ণগঞ্জে তার বোনোর বাসায় এসে ওঠেন। তার বোন জামাই একটা কাজের জন্য আমার বাবাকে বলে। ওই লোকটি বাপের ব্যবসায় যেমন কাজ করত, বাবার পার্টির কাজকর্মের অনেকটা সে করত। একদম হুট করে নিয়ে গিয়েছিল আমার বাপের মতিঝিলের অফিসে।

– কী নাম ওনার?

–অদ্ভুত নাম। মদিনা মুনাওয়ারা। সেই নাম ছেঁটে হয়েছিল দিনা, আব্বা নাকি ডাকতেন মুনা। আমি মুনাম্মা বলি। এটা আমার নিজের আবিষ্কার।

– তোমার এই মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে।

– আমার এই মাকে দেখলে যেকোনো বয়সের পুরুষ মানুষের মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

–তাই!

রুদাবার সঙ্গে আমরা তিনজন, নিরাজুল, বুমেদিন ও আমাকে, ওদের বাসায় যাই। মহিলাকে দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। রুদাবার পাশে তাকে মা নয়, বড়বোনের মতো দেখায়। যদিও রুদাবার আসল মা তো তিনি নন। লম্বায় পাঁচ ফুট চারের বেশি বলে মনে হয়। কারণ নিরাজুলই তো পাঁচ-পাঁচ, বুমেদিন একটু বেশি লম্বা পাঁচ-নয়। রুদাবাও পাঁচ-চার। আমি বরং একটু খাটো সে তুলনায়।

মহিলা দোহারা গড়নের। খুব সেজেগুজে শাড়ি পরা। কোমরে একটু মেদ তাকে ভারী আকর্ষণীয় করেছে। নাভির অনেক নিচে শাড়ি পরে। নাভির গভীর অন্ধকার চোখে এসে বিঁধছিল। বুমেদিন নাকি নিরাজুলকে বলেছিল, মহিলাকে দেখে তার বিশেষ কারণে অস্বস্তি হচ্ছিল। তার দিকে সে তাকাতে পারছিল না।

–রুদাবার মা বলে?

–আরে না।

–তাহলে?

–ভীষণ অ্যাপিল। এড়ানো যায় না।

আমার কাছে বিষয়টা আরেকদিক থেকে চমকপ্রদ। রুদাবার বাবা নিজের স্ত্রীর চেয়ে এর কাছে বেশি আসতেন। এই মহিলাই তাকে স্বস্তি আরাম দিয়েছেন– এমনটা কেন ঘটেছিল, তার কারণ এই মহিলার কথায় আচরণে স্পষ্ট হয়েছি। কেমন লাজুক লাজুক, মুখে আধো আধো বোল। যেমন আমাদের সামনে হঠাৎ করে গায়ে গতরে বড় হওয়া কোনো শিশুকে ডেকে আনা হয়েছে, আর সে লজ্জা পাচ্ছে। মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না। কণ্ঠতেও বাচ্চা মেয়ের মতো মতো।

অনুমান করি বয়স চল্লিশ পার হলে ত্রিশের বেশি দেখায় না। আসলে আরও কম দেখায়। রুদাবা তার পাশে বসে বার বারই তাকে একটা হাত পেছন থেকে বেড় দিয়ে ধরে কথায় কথায় তার বাহুতে চাপ দিচ্ছিল। এই হচ্ছে আমার মা। আমার গর্বের মা। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইয়ু মা আমার।

মহিলা শোনে আর মাথা নিচু করে আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ায় আর খুলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে চলে যান। আমাদের জন্য অনেক নাস্তা নিয়ে আসেন। ছমচা, আলুর চপ, আপেল, আঙুর। আমরা তখন হৈ চৈ করছিলাম। বুমেদিনকে দেখলাম সে ঘরটার সব কিছু লক্ষ করছিল। ঘরে বেশ কয়েকটা বাঁধানো ছবি। মাঝখানে একটা টি-টেবিল ঘিরে দুটো তিন জনের আর দুটো একজনের বসার সোফা।

রুদাবাও ভেতরে চলে গিয়েছিল। মাকে সাহায্য করতে। রুদাবার ভাই আরাফ এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাই বলে। বেশ চটপটে ছেলে। বুমেদিন বলে, এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।

–না, না। আমি ভেতরে নিচ্ছি।

বলেই সরে যায়।

বুমেদিন বলল, আন্টির কপি একদম।

নিরাজুল বলে, গীতি না থাকলে জীবনে এই মেয়েটাকেই বান্ধবী বানাতাম।

বুঝলাম নিরাজুলও বুমেদিনের মতো রুদাবার মায়ের রূপে মজেছিল। আমি অবশ্য অন্য কথা ভাবছিলাম। জীবন কোন দিক থেকে কোনো দিকে যায়! কোনো কিছুর গতিপথ আগে থেকে ঠিক করা যায় না। আবার মনে হলো, এটা তাদেরই যায়, যারা আসলে সেই গতিপথ ঠিক করে নিতে চায় না। তার সময়ের গতির স্রোতে নিজেদের ছেড়ে দেয়। বা ভাসিয়ে দেয়।

আমি ও নিরাজুল সময়ের স্রোতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছিলাম কিছু দিনের জন্য, কিন্তু সবসময় খেয়াল রেখেছিলাম এর লাগাম টানতে হবে।

কলেজ ক্যান্টিনে এক বড় আপার বলা একটা কথা সারা জীবনের মতো মনে বিঁধে আছে। তিনি বলছিলেন, জীবনে সব কিছু করা যায়। সব রকম কোট আন কোট 'পাপ', অভিশপ্ত যা কিছু, সব। কিন্তু সবই করতে হবে পরিমিতভাবে। অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। মানুষের জীবনে ভালো থাকার একটাই চাবি : সীমালঙ্ঘন করো না।– এ কথা শুনে আরেকজন বলে, তুই দেখি মোল্লা টাইপের কথা বলছিস!

–কথাগুলি গোল্লা টাইপের, তুই মানলে মান, না মানলে না মান।

আমি মেনেছিলাম। আমি ও নিরাজুল যা যা করলে পাপ বা গুনাহ হবে সবই অল্পস্বল্প করছিলাম। ওই অল্পতে আমাদের কোনো ক্ষতি আসলেই হয়নি। এক পেগ হুইস্কি খেলে তো দুনিয়া অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তাও খুব আয়োজন করে নয়। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া যদিও শরীর খুব টাটাতো, কিন্তু শারীরিক মেলামেশাটার অত সুযোগ ছিল না। দুয়েকবার করে মনে হয়েছে, এভাবে হয় না।

বুমেদিনকে নিরাজুল বলেছিল, এগুলো সব মগজের বিষয়। মগজ থেকে ছেঁটে না ফেললে কোনোভাবেই হবে না। বুমেদিন নিজে বলে সব ছেঁটে ফেলেছিল। তার কোনো কিছু নিয়ে কোনো অরুচি ছিল না। গ্লানিবোধ অপরাধবোধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই নাকি আসল মুক্তি। অতীতের ভুলের জন্য আফসোসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া, অনেক কিছুর সুযোগ হাত ছাড়া হওয়া– এগুলো যেমন মুক্তি, তেমন ষড়রিপুর প্রাবল্য থেকে মুক্তিও আসল মুক্তি। সে যেটা করে রিপু তাড়িত নয়, সেগুলি সে করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। আগের দিনের যে মানুষটা সে, কোনো কাজ করার পর আজ ও আগামীকালের যে মানুষটা সে, তাতে কয়েকটা নতুন বিষয়ের যোগ ঘটে।

আমি তো জানি, রুদাবা না সাধলে বুমেদিন তার সঙ্গে কোনো বাড়িতে যেত না। রুদাবা বুমেদিনসহ আমাদের ওর নতুন মায়ের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল বুমেদিনের সঙ্গে মূলত ভালো মতো করে পরিচয় করাতে, যাতে করে এ বাসা সে বাসায় না গিয়ে, তার নিজেদের বাসায়ই সময় কাটাতে পারে। আর তাই নাকি করত। তবে বুমেদিন সেখানে খুব সহজে যেতে চাইত না। নিজেকে আর যাই হোক সহজ করা যাবে, কিন্তু সস্তা করা যাবে না, একদম না। বুমেদিন অবশ্য খুব সহজ মানুষও ছিল না।

রুদাবার বরাবরই বলত, ওকে ঠিক বুঝতে পারি না। কাউকে বোঝার জন্য শরীরি মেলামেশাটা নাকি কাজে দেয়, কিন্তু তার নিজের মনে হয়েছে এতে বুমেদিন নাকি আরও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

৫. বুমেদিন

অপরাজেয় বাংলার পাশেই রুদাবার থাকার কথা ছিল। বুমেদিন গিয়ে দেখে রুদাবা নেই। কাউকে না পেলে বা কিছু না পেলে, আকাশের দিকে তাকানোর একটা অভ্যাস আছে ওর। এবারও তাই করল। আকাশের দিকে এমাথা ওমাথা তাকাল। চোখের সামানে আকাশটা নানান গাছগাছালির শাখা প্রশাখার ভেতরে দিয়ে যতটা দেখা যায় দেখল।

রুদাবার দেরি করার স্বভাব নতুন নয়। আর বুমেদিন যে সময় যখন যেখানে যাওয়ার কথা বলে, তখন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এতে এখন অবধী কী লাভ হলো বা কী লোকশান হলো সে সব হিসাব করে দেখেনি। সে ঠিক করেছে এই একটি কাজ সে অন্তত করবে।

ছোটবেলায় স্কুলে 'সময়ানুবর্তিতা' নামে রচনা লেখতে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারে সময় মেনেই নাকি সেরাদের সেরা হওয়া যায়, শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। সে শ্রেষ্ঠ হবে কি সেরা হবে– সেজন্য সময় নেমে চলে না, সময় মানে যাতে সময় নষ্ট না হয়, সেজন্য। এটা একটা দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে তৈরি হতে পারে।

জীবনের স্টেশানগুলি নাকি কুড়ি, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ দিয়ে তৈরি। পাঁচ বছর পর পর নতুন একেকটা সুযোগ আছে। শেষ সুযোগ নাকি হলো ষাট। ষাটের পর আর কিছু করার নেই। তবে পঞ্চাশের ভেতরেই যা হওয়ার হয়ে নিতে হয়। এখন তো পঁচিশ বছরেই অনেক দেশে বড় বড় কোম্পানির সিইও হয়ে যাচ্ছে ডিম ফুটে ঠিক মতো বেরও হয়নি এমন বাচ্চারা। এরাই হতে পারত আরেকটা নতুন পৃথিবীর নির্মাতা, তার বদলে পুরোনো ব্যবস্থাকে আরও শক্ত করে গাড়তে এরা কাজ করছে।

পৃথিবীতে লেখাপড়া জ্ঞান অর্জনের নেশা যাদের পেয়ে বসেছে, গড়ুড়ের ক্ষুধা নিয়ে যারা আবিশ্ব দুই হাতের মুঠায় নিতে পারত, তারা এখন সব বইয়ের পাতায়, বা অক্ষরজীবী মানুষ হয়ে গেছে। নিজেকে নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে ফেলেছে, পড়ালেখার নামের সবচেয়ে বড় ধোঁকা দিয়ে। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফাঁদ।– বুমেদিন এসব অল্প লোকের মধ্যে বলেই পাগল নামে পরিচিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ রুদাবার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর বলেছে ওই একটা ফন্দিবাজ, ধান্দাবাজ, মাগিবাজ লোক।

বুমেদিন ঠিক বুঝতে চেয়েছিল, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় সে তার জীবনকে নিতে পারবে। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন কিছু বন্ধু। জন্ম তো সূত্রপাত, তারপর শিক্ষাপর্বর সমান্তরালে চলতে থাকে একে একে বন্ধুপর্ব, বান্ধবীপর্ব– এটাকে লম্বা করা যেতে পারে, আবার সংক্ষিপ্তও করা যেতে পারে, পরে আসে সংসারপর্ব, পরকীয়াপর্ব, মুক্তিপর্ব– এই নাকি জীবনের পরম্পরা হতে পারে। রুদাবা বলেছিল, তাহলে তুমি এখন কি বান্ধবীপর্বতে আছো?

বুমেদিন তখন রুদাবার বিশাল দুই স্তনের উপত্যকায় মুখ দাবিয়ে বলে, হ্যাঁ, বান্ধবীর পর্বতে আছি।

নিরাজুল জানে, বুমেদিনের বন্ধুপর্বের ইতি হয়ে গেছে। এখন সে একা এবং তার এখন আর কোনো কিছুর জন্য বন্ধুদের লাগবে না। এখন থেকে হলো কাজের সম্পর্ক। নিজেকে এমন একটা কাজে দক্ষ করতে হবে, যার বাজারমূল্য আছে এবং সে মতোই তার সঙ্গে লোকজনের লেনাদেনা হবে। আর এর ভেতরে যদি বন্ধু হয় তো হলো; না-হলে না-হলো– কিছু যায় আসে না।

এর প্রধান নিয়ম বিষয় টাকার মাধ্যমে তৈরি হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রকের লাগাম নিজের হাতে রাখতে হয়। মগজধোলাই কখনো হতে দেওয়া যাবে না। এ কারণে বুমেদিন কোনো কিছুর ওপর শেষ অবধি আস্থা রাখতে পারত না। সব কিছু সাময়িক ক্ষণিক এবং ক্ষণস্থায়ী। সবচেয়ে বেশি ক্ষণস্থায়ী তো সে নিজে। যেকোনো সময় উবে যেতে পারে পৃথিবী থেকে। আর গেলেই ঠুস। কোথাও তার কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

নিরাজুলের সঙ্গে অনেক বিষয়েই অমিল ছিল। কথা বলতে গেলেই তর্ক লেগে যেত। পরে দেখল এসব তর্ক করার কোনো মানে হয় না। নিরাজুলের আরেক বন্ধু আশরাফ আনোয়ার জেরি, বুমেদিনকে একদম সহ্য করতে পারত না। নিরাজুলকে অনেক সময় বলেছে, ওরে ধইরা কঠিন একটাভাবে বানানো দরকার। পুরো সাইজ করা দরকার। এভাবে আলতুফালতু কথা যাতে আর না বলে। জগতের কোনো কিছুই ঠিক নাই, শুধু ও একাই ঠিক– এটা কোনো কথা হইলো নাকি! ফাউল জানি কোনহানকার!

জেরির কথা শুনে নিরাজুল হো হো করে হাসে। বুমেদিন তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছে, হাঁটার ভেতরে কেমন একটা উদাসীনভাবে, যেন হাঁটার বদলে ভেসে যেতে পারলে ভালো হয়। এই মাটির পৃথিবীতে সে পা ফেলতে ইচ্ছুক নয়। সবখানে ময়লা, নোংরা আর অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা। মানুষ একটা আগাপাশতলা বাজে নোংরা কুৎসিত-কদর্য জিনিস। যে যেভাবে উৎপাদিত হয়, যেখানে দিয়ে উৎপাদিত হয়, প্রত্যঙ্গগুলোর কী বিভৎস নোংরা। নারী শরীরকে তোমরা আর্ট বলে, আমি তো দেখি এরচেয়ে বিশ্রি জিনিস আর হতে পারে। তার ভেতরে সবচেয়ে বিচ্ছিরি হলো তাদের যোনিপথ। নারীদের সবচেয়ে ভালো হলো মুখটা। এছাড়া বাকিটুকু পুরো বেকার। বাকিসব কিছু পাথরের হলেও কোনো সমস্যা ছিল না।

এসব শুনে রাগে গা জ্বলে যেত জেরির। জেরি একটা মিষ্টি সুন্দর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। জেরির কেন যেন মনে হয়েছিল, আগেরদিন মেয়েটার সঙ্গে জেরিকে দেখেছিল বলেই কদিন পরে জেরির সামনে ইচ্ছা করে বুমেদিন এসব বলছে। জেরি বুমেদিনের নাম দিয়েছিল : বদবুঁ। মানে বাজে গন্ধ। সোজা বাংলায় পাদ। শালা সব পাদমার্কা কথা বলে। ওর কথা ওর গোয়ার ভ্রিতে হান্দায় দেওন দরকার। বাল একটা!

নিরাজুল জেরিকে বলে, তোর এত লাগে কেন? ও তো কথা বলে আমার সঙ্গে। আর তুই, ও আসলে, চলে যেতে পারিস না?

–আমি চলে যাব কেন? এটা কি ওর বাপের জায়গা, না ওর জায়গা?

–আহা আমি তো সেটা বলিনি। তুই ওকে বলিস, বদবুঁ। তো, তোর একটা বদবুঁর পাশে থাকতে খুব আনন্দ হয় না?

–তুই সহ্য করিস কী করে এই বালটাকে?

–তোর কাছে বদবুঁ, বাল এসব হতে পারে। আমার কাছে তো ও তা নয়। অন্য কারও কাছে সে হয়তো আরেক রকম। বরং তুই যা মনে করিস ভাবিস ওকে, ওসবের পুরো উল্টাটা ওকে অনেকেই মনে করতে পারে? কী পারে না?

জেরি চুপ করে থাকে।

নিরাজুল বলে, শোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কারণেই জগতে প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন, আমার কাছে এটার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে কাজটা হয় : নানান ধরনের নানান জায়গার মানুষের সঙ্গে দেখা আলাপ পরিচয়। আমাদের দেশে এটা হয় বিভিন্ন জেলার লোকজনের দেখা-সাক্ষাতে, আর বিদেশে হয় নানান দেশের মানুষের দেখা সাক্ষাতে। এই যে নিজের ছোট গন্ডি থেকে বেরিয়ে কি গন্ডিটা ভেঙে একটা বিরাট পথ খুলে যায়, এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ালেখার চেয়ে এটা কোনো দিক দিয়ে ছোট কিছু না দোস্ত।

বুমেদিনের নাক উঁচু– কথাটা কমবেশি সবার ভেতরে ছড়িয়েছিল। এই নাক উঁচুর কারণ কী নিরাজুল একদিন বুমেদিনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলে, নাক আমার উঁচু নয়। এখন লোকজনে নাক নিচুর দিকের জিনিসের গন্ধই বেশি নিতে চায়। দোষ হয় আমার। আমি আগের লেভেলেই আছি। যেটা যুক্তির ও আধুনিক– সেই তালে। বাকিরা সব তলে।

আমি আধুনিক মানুষ– এটা বুমেদিনের সমস্ত কথাবার্তার মূল দিক– এটাই নিরাজুল মনে করত। সে আবার এতটাই আধুনিক অতীতের সীমারেখাগুলো মুছে দিয়ে সেগুলোকে আগামীর দিকে টেনে আনতে চাইত। যেকালে যেটা নিষিদ্ধ ছিল, সেটা সেকালের বিষয় ছিল। তখন যেটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, এখন সেটা বজায় রাখা বরং বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

কথাগুলো আরও জোর দিয়ে বলতে চাইল, কারণ রুদাবাদের হলের, যদিও রুদাবা হলে থাকে না, তাদের হলের কোনো এক মেয়ের গোসল করার ছবি তুলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে রুদাবার সহপাঠী লামিয়া রীতিমতো আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। পত্রপত্রিকায়ও খবরটা ছাপা হয়েছে। কোথাও কোথাও আন্দোলনকারী ছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘটের ছবিও ছাপা হয়েছে। সেই ধর্মঘটে রুদাবাও ছিল। ধর্মঘট নিয়ে এতে নেতৃত্ব দেওয়া লামিয়াকে হলের অফিসে ডাকা হয়। কারণ সে একটা তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। এটা যাতে না হয়, সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার হবে– এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও লামিয়া কেন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করে যথাযথ শাস্তি দেওয়া না হলে মেয়েরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাবে– লামিয়ার এগুলো তারা আর বরদাস্ত করতে রাজি নন।

এর কিছুদিন পর তাহিয়া, ওরফে হিয়াকে নিয়ে আরেকটা সমস্যা। সে বলে তার পিসিতে নীলছবি দেখছিল। এজন্য তাকে হলে তলব করা হয়। তার কাছ থেকে নীলছবির সিডি সিজ করা হয়। বিষয়টা একদম হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। হিয়া এ নিয়ে এতটুকু টলে না গিয়ে বলে, সে আঠারো বছরের বেশি বয়সের। ফলে এগুলো দেখার

আধিকার তার আছে। তাকে বিচিত্র প্রক্রিয়া আক্রমণ করা হয়। বাড়ি কোথায়, কোনো স্কুলে, কলেজে পড়েছে, বাবা কী করে, মা কী করে, ভাইবোন কী করে, কোথায় কে আছে– ইত্যাদি হাজারো কথা দিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা হয়েছে। পরিবারের শিক্ষার অভাব, বাবা ও মায়ের বিচ্ছেদের জন্যই এমন ধারা মানসিকতা হয়েছে।– এ নিয়ে হিয়ার মতো শক্তমনের মেয়ে শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারেনি। নাকেমুখে কান্নাকাটি করে তবে রেহাই সেদিনের মতো ছাড়া পেলে, পরে ঘটনাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, হিয়াকে মানসিকভাবে নির্যাতনের জন্য হলের সব প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের পদত্যাগের জন্য লামিয়ারা ফের আন্দোলনে নামে। কিন্তু বিষয়টা নীলছবি দেখা না-দেখার মতো নাজুক একটা বিষয় বলে, প্রথমে জোর না পেলেও, পরে বড় হয়ে ওঠে হিয়াকে মানসিক নির্যাতনের কাহিনী।

রুদাবা ইংরেজিতে একটা দারুণ স্মারকলিপি লেখে। তার সেই ইংরেজিতে লেখার স্মারকলিপির বক্তব্যের অনেকটা কয়েকটি ইংরেজি দৈনিকে ছাপা হয়। রুদাবা কয়েকদিনের জন্য পাদপ্রদীপের নিচে চলে আসে। রুদাবাকে ডেকে আর বিভাগের এক নারী শিক্ষক বলেন, সে দারুণ ইংরেজি লেখে, আন্দোলন করছে, সেটাও ভালো, কিন্তু তার উচিত লেখাপড়ায় আরও মন দেওয়া তাহলে সে অনেক দূরে যেতে পারবে।

ঠিক ওই সময়টায় বুমেদিন গিয়েছিল সেন্টমার্টিন বেড়াতে। তাও একা। দুনিয়ার সমস্ত কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ কেটে দিয়ে তিনদিন পর ফিরে আসে। রুদাবাকে জানিয়েই গিয়েছিল। কিন্তু কে জানতে ওই তিনদিন রুদাবা আর তার বন্ধুরা আরেকটা গোলযোগের মধ্যে পড়বে। সব শুনে বুমেদিন বলে, তোমার ম্যাডামের কথাটাই শোনা দরবার। দেখো, জগতের কোনো কিছুর কোনো মানে নেই। অত বড় বড় যুদ্ধ হলো? খুব ভালো করে ভেবে দেখরে দেখা যাবে, তাতে পৃথিবী কি এগিয়েছে? মানুষের প্রতি মানুষে আস্থা মমত্ব যদি না বাড়ে তাহলে কোনো কিছু দিয়ে কোনো কিছু হয় না, সে তুমি আমি বস্তু দিয়ে যতই নিজেদের আধুনিক করি না কেন? মমত্ব বাড়ে মানে তার সঙ্গে লেপ্টে পড়ে থাকা নয়, মানবিক মানুষ হওয়া। ভালোভাবে ভালোকাজে থাকা, কারও কোনো অনিষ্ট না হোক, ভালো থাকে যেন সবাই– এই শুভবোধই মমত্ব। সেই আদ্যিকালে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, জগতের সব প্রাণী সুখী হোক– আমরা তো এই জায়গাটাতেই পৌঁছাতে পারিনি!

রুদাবা বুমেদিনের এসব তত্ত্বকথা শোনে চুপচাপ।

নিরাজুল বলে, অন্য কেউ হলে তোর তত্ত্বের খ্যাতাপুড়ি বলে চলে যেত।

–তাতে আমার কিছুই ছেঁড়া যেতে না।

–রুদাবারও ...

–ও কী কথা, রুদাবা আর আমি দুজন দুটি স্বাধীন আলাদা মানুষ। আমাদের বন্ধুত্ব প্রেম বা সম্পর্ক অ্যাফেয়ার অ্যাফিনিটি যাই থাকুক, যে-পর্যায়ে থাকুক, আমরা কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করি না। আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কোনো গোল নেই। ফলে এর ভেতরে আমরা কোনো কৌশল করি না যে, যেকোনো মূল্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য আমরা একে অন্যের কাছে সৎ থাকি, অথচ উল্টাটাই হতে পারত, তাই হওয়ার কথা। কোনো দায় নেই তো সৎ থাকার দরকার কী! আমাদের কথা হলো, এ জন্যই সৎ থাকতে হবে। সম্পর্কের দায় নয়, একে অন্যের প্রতি সৎ থাকার দায়টাই আসল।

–ভাগি বাবা! তোর সব আজব জিনিস শুনলেও কিছু বুঝতে পারি না। বুঝলেও রাস্তা পাই না– তোরা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছিস আর আমরা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছি।

–আমরা মানে?

–মানে আমি আর গীতি।

–তোরা আবার কোন দিকে যাবি? তোরা তো ঠিকই আছিস। বিয়ে করবি, সংসার করবি, এর আগে আচ্ছাসে মৌজ মেরে নিচ্ছিস!

–তোরা মারছিস না?

–আমি-রুদাবা? আমাদের কোনো ল্যাপ্টালেপ্টি নেই দোস্ত। আমরা দুই মেরুতে থাকি। ওপরে অনেক দূরে। বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তলে একটা যোগাযোগ আছে। উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর সঙ্গে যেমন যোগাযোগ, যে শিরদাঁড়ার ওপর জগৎ পাক খায়, আমাদের সম্পর্ক তেমন করেই তৈরি।

–এটা আধ্যাত্মিক নাকি বস্তুগত?

–মাত্র দুইটা বলিল! এটা বিচিত্রভাবে যোগ দেওয়া। অনেক প্যাঁচ খেয়ে অনেক গিঁট মেরে তৈরি। ও তোরা বুঝবি না দোস্ত।

–তা ঠিক। আমাদের এখরো বাংলা সিনেমার গান, হিন্দিগান মাত করে। তোকে তো আর করে না। তুই তো এসবের উর্ধ্বে উঠে গেছিস।

বুমেদিনের হাসি পায়। সে নিরাজুলের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, আরে আমি হলাম গিয়ে মফস্বল থেকে আসা সাধারণ একটা ছেলে। তোদের মতো শহরে তো আর বড় হইনি। এখানে এসে মুণ্ডু ঘুরে যাওয়ার দশা। কয় না, ইডিয়টের মাথায় বেশি ফ্যান্টাসি ঢুকাতে নেই, তাতে সর্বনাশ হবে। আমি তো ইডিয়ট, তবে ফ্যান্টাসি থেকে সাবধান আছি। এই আর কী! ফ্যান্টাসি তোদের মতো বুদ্ধিমানদের জন্য।

–আর তোর জন্য কী?

–আমার জন্য সিরিয়াস সাহিত্য।

বুমেদিন কয়েকটি বিষয় ধরে ফেলেছিল। বর্তমানের সব কিছুকে বিদ্যমান রাখতে পারলেই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এর ভেতরে সবার আগে ধর্ম বিশ্বাসের প্রচলিত জায়গাটাকে রক্ষা করা, এর পরেই হলো তরল চিন্তা তৈরি করাতে পারে, এমন সব কিছুকে উৎসাহিত করা, নইলে কোনো সবখানে এত রং দেওয়া নায়ক-নায়িকা কেন? এদের তো এদেশে তেমন কোনো বাজার নেই, তারপর এই সিনেমা, সেই সিনেমা হয়েই যাচ্ছে। এই নাটক, সেই নাটকে সয়লাব সব টিভি। আর ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে থিয়েটারকে। এর তালে তাল দিচ্ছে সব মিডিয়া। এরা যত না আসল জিনিস সামনে আর আনে, লুকিয়ে রাখে তারচেয়ে বেশি। বরং ছোট জিনিস ধরিয়ে দিয়ে বড় বড় অপকর্মকে পার করে দেয়।

–তোর এই সব মনগড়া চিন্তা তোর বারোটা বাজাবে। আচ্ছা তুই কি বামেদের পাল্লায় পড়েছিস?

নিরাজুল জানতে চায়। বুমেদিন চুপ করে বলে, তোর বিষয়টা আগে বল।

নিরাজুল বলে, আমি কিন্তু আয়ান র‍্যান্ডের ভক্ত। পুঁজিবাদ ছাড়া কারও বিকাশের কোনো পথ নেই। ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের ভেতরে দিয়ে। যার যোগ্যতা আছে, সে থাকবে যার নেই, সে ঝরে যাবে।– এটা কিন্তু প্রকৃতির ভাষ্য।

–ডারবিনের ওই কথাই তো বললি। আমি বিবর্তনবাদ মানি, কিন্তু তুই যেভাবে ধরছিস, সেভাবে ঠিক নয়।

বুমেদিনের দিন কেটে যায়। দিনে এক প্যাকেট সিগারেট ফুঁকে দেয়। রুদাবাও সিগারেট ধরতে চেয়েছিল, বুমেদিন মানা করেছে। রুদাবা বলেছে, তুমি আমার গুরু। তাই মেনে নিলাম।

রুদাবা মাঝেমধ্যে এখন শাড়ি পরে। আগের মতো জিনস ফতুয়া পরার চেয়ে সালোয়ার কামিজ বেশি পরে। বুমেদিন বলেছে, সে বিকিনি ও বোরখা কোনোটাই পছন্দ করে না। সে চায় রুচিস্নিগ্ধ শালীন পোশাক। রুদাবা বলে, সেটা তুমি ঠিক করে দেবে না, আমি যেটা মনে করব সেটাই আমার রুচি। ভিন্ন রুচির অধিকার থাকাটা সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক অধিকার। নয় কি?

–আমি তো কোনো তন্ত্র মানি না। একচ্ছত্র, এককাট্টা তন্ত্র মন্ত্র সব যন্ত্রের জিনিস। মানুষের জন্য তন্ত্রমন্ত্র। তন্ত্রমন্ত্রের জন্য মানুষ নয়।

–তুমি নিজেকে কত মানুষ মনে করো?

–মানুষ মনে করার বিষয় না, সারা জীবনটা যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটাই মানুষ হওয়া প্রক্রিয়া। এটা কোনো স্টেশন নয়। এটা নিজেই একটা রেলগড়ি। চলতেই থাকে চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। শুধু সামনে এবং সামনে এবং সামনে।

একদিন বুমেদিনের নিরুজলাকে কিছু কথা বলেছিল। বলেছিল, মাঝেমধ্যেই নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না। তখন মনে হয়, সে অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। যেমন সবচেয়ে বড় সুযোগ নিচ্ছে রুদাবার। ওর মতো বাল্কি, কালো, দেখতে ভালো নয়, মেয়ের সঙ্গে যে মনোদৈহিক সম্পর্কে যে জড়িয়ে পড়েছে, তার কোনো পরিণতি নেই, তারা কেউ এ নিয়ে ভাবনা চিন্তাও করেনি যে এই সম্পর্ককে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চায়। আদৌ এর কোনো মানে আছে কি না? যে মাত্র, আর এটা এই বয়সে একটু বেশি পরিমাণে ঘটে, শরীরী টান জেগে উঠল, তো জেগে ওঠামাত্র দুজনে একসাথ হলো। তাতে তো প্রেম ভালোবাসাকে একটা শরীরী বিষয় ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

রুদাবা অবশ্য বুমেদিনের চেয়ে এগুনো। অল্প বয়সেই সে এসবে অভ্যস্ত হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সে তাদের স্কুলের পেছনের একটা জায়গায় এক ছেলেকে প্রথম চুমু খেয়েছিল। পরে ওই ছেলের সঙ্গে সব কিছুই হয়েছিল। ওই ছেলে, ওইটুকু ছেলেকে, পি সি মাসলের ব্যায়াম শিখিয়ে নিয়েছিল। অকালপ্রপাত বন্ধ করতে। খুব কাজেও দিয়েছিল। বুমেদিনকে ওটা শেখাতে হয়নি, কিন্তু মিলনের সময়টা দীর্ঘ করতে, পি সি মাসলের ব্যায়ামটা বুমেদিনও অনুশীলন করত।

বুমেদিনের বড় দোষ সিগারেটের নেশা। বার বারই বলে ওটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু আপাতত কোনো লক্ষণ নেই। নিজে সিগারেট খেলেও রুদাবাকে খেতে দিতে চায় না। এটা ওর মেল শোভেনিজম কি না রুবাদা জিজ্ঞাসা করেছিল।

বুমেদিন বলেছিল, মেয়েরা তো সন্তানের জন্ম দেয়। ফলে ছেলেদের মতো মেয়েরা যা খুশি করতে পারে না।– এই কারণেই মেয়েদের জন্য এত নিষেধাজ্ঞা। আর মেয়েরা মনে করছে, তাদের বন্দি করে রাখা হচ্ছে। পুরুষতন্ত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু যেকোনো নারী চাইলে এটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফারদাফাই করে দিতে পারে। পুরুষতন্ত্র কোনো লোহার বেড়ি নয়, বেহুলার বাসরঘরও নয়। এটা একটা কাচের দেওয়াল, অতি ঠুনকো।

রুদাবা বলে, তোমার এমন মনে হতে পারে। আসলে পুরুষতন্ত্র এত পাতলা নয়। পাতলা হলে আমার নিজের মায়ের পরিণতি ও বর্তমান মায়ের পরিণতি এমন হতো না। আমার বাবা বুদ্ধি করে যদি ওই বাড়িটা না রাখত, তাহলে তো আমাদের নতুন মা, তার পুত্র ও আরাফ আর আমি পথে গিয়ে বসতাম। তাও হিসাব করে দোতলা বাড়ি। আর বিলাসবাসনের জায়গা থেকে হঠাৎ টানাটানির মধ্যবিত্ত হয়ে যাওয়া আমি না হয় পার হতে পেরেছি, আমার মা সেই ভয়াবহ জীবন কল্পনাও করতে পারেনি, বলে আত্মহত্যা করল। কারণ তো আমার মায়ের রক্তে ছিল। মাঝেমধ্যে মনে বাবামায়ের অশুদ্ধ জীবনের ধারা ছেলেমেয়ের ওপর কাজ না করে পারে না। ফলে মাবাবা যদি বাজে কিছুতে জড়ায়, সেটার ভার ছেলেমেয়েরা তাদের রক্তের ভেতরে বয়ে বেড়ায়।

রুদাবা বলে, আমার বাপের আমার নিজের মায়ের প্রতি আস্থাহীনতা। এছাড়া তো আর কিছু না। পুরুষতন্ত্র ঠিক থাকে নারীর পুরুষের প্রতি আস্থার জন্য। সেটা ভেঙে ফেললেই সব গেল। তবে এটাও মনে হয়, যদ্দিন নারীর যৌনটান থাকবে, ততদিন পুরুষতন্ত্র যাবে না। সবাই তো এলজিবিটি হয়ে যাবে না। ফলে পুরুষতন্ত্রের কাচের দেওয়ার নারীদের ঘিরেই থাকবে।

বুমেদিন জানে, মানুষ সব সময় মানুষ থাকে না, আবার পশুও থাকে না। পশুরাও সব সময় হিংস্র হয়ে ওঠে না। মানুষও তাই। মানুষের আহারনিদ্রামৈথুন বা শিশ্নোদরপরায়ণ দশা সারাক্ষণ কাজ করে না। কিন্তু মানুষ তো বসন্তের কোকিলও নয়, আবার দুধের মাছিও নয়। মানুষ বৃক্ষও নয়, আবার নদীও নয়। এই সমস্ত কিছুর লক্ষণ মানুষের জীবনে আছে। কিন্তু মানুষ কোনো উপমায় থিতু নয়। জীবন যেমন ব্যাখ্যাতীত, মানুষও তাই। জীবনকে বুঝলে মানুষ বোঝা যায়, মানুষকে বুঝলে জীবন বোঝা যায়।– আমাদের নিদেনপক্ষে এই টুকু বোঝার চেষ্টা না করলেই নয়। আর এজন্য সাহিত্য ছাড়া মানুষের হাতে আপাতত কিছু নেই। বাকি সব হচ্ছে, সাহায্যকারী। সবচেয়ে সহজ কিন্তু গভীরভাবে যে কেউ মানুষ ও জীবনকে বুঝতে চায় তো তার সাহিত্যে আসতে হবে।– এই সত্যই আমার উপলব্ধি। ফলে আমাকে লোকে আঁতেলফাতেল যাই বলুক, আমার এছাড়া উপায় নেই।

তাই বলে আমি জীবন ও মানুষের চেয়ে সাহিত্যকেও বড় বলে মনে করি না। সাহিত্যের চেয়ে মানুষ বড়, মানুষের চেয়ে জীবন বড়। এই সমীকরণে আমাকে আসতেই হলো। মানুষ থেমে যায়, কিন্তু জীবন আদিমধ্যঅন্তে হাজারো সমান্তরালে বয়ে যেতেই থাকে। এই বয়ে যাওয়াই জীবনের প্রধানতম লক্ষণ, একমাত্র নয়।

থিও অ্যাঞ্জেলোপুলুসের সিনেমার দর্শন

অনুবাদ : সৈকত দে

(মহান গ্রিক পরিচালক থিওডোরাস অ্যাঞ্জেলোপুলুসের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৭ এপ্রিল। প্রথম সিনেমার মুক্তি ১৯৭০ সালে, 'রিকন্সট্রাকশন'। মোটর বাইক দুর্ঘটনায়, ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারি নিহত হওয়ার আগে তিনি সব মিলে দেড়খানা তথ্যচিত্র, একাধিক শর্টফিল্ম ও তেরোটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিল্ম নির্মাণ করে যেতে পেরেছিলেন। নিজের দেশ গ্রিস ও তার ইতিহাস, বিশ্বজুড়ে ভাসমান শরণার্থী মানুষ এবং নিজের ব্যক্তিইতিহাসকে দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা ছিল তার আরাধ্য। আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষ করে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার অনূদিত হলো। সাক্ষাৎকারটি ১৯৯০ সালে গেরাল্ড ও'গ্রাডি নেন। আমি সাক্ষাৎকারটি নিয়েছি ড্যান ফাইনারু সম্পাদিত 'ইন্টারভিউজ' নামের থিও অ্যাঞ্জেলোপুলুসের সাক্ষাৎকার সংকলন থেকে -অনুবাদক)

থিও অ্যাঞ্জেলোপুলুস গ্রিকে উত্তর দিচ্ছিলেন, আমার প্রশ্নের। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ, দুপুরবেলা তার অফিসে বসেই কথা হচ্ছিল। গ্রিক ফিল্ম সেন্টারের জর্জ কালোয়েরো ছিলেন আমাদের সাথে, পরে তিনি উত্তরগুলোর অনুলিখন করেন। স্টিভ ডান্ডোলোস আর স্তে ফানোস পাপাজাচারিয়াস ইংরেজিতে অনুবাদ করেন গ্রিক থেকে।

প্রশ্ন

একুশ বছর সময়কালে আপনি আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। আপনার সিনেমাগুলো ইউরোপে আর জাপানে সাড়া ফেলেছে, অজস্র প্রাইজও পেয়েছেন কিন্তু এখানে, এই আমেরিকায়, মাত্র অল্প কয়েকটাই দেখানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে আপনার সম্পূর্ণ রেট্রোস্পেক্টিভ হয়ে গেল, তার আগে বিক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয়েছিল। মাত্র এই মাসেই, আপনার দুটো ফিল্ম, পনেরো বছর আগের আর সদ্যনির্মিত, একসঙ্গে কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে গেল। আন্তর্জাতিকভাবে এই মতটি প্রতিষ্ঠিত, আপনার অবস্থান আন্তনিওনি, মিজোগুচি এবং তারকোভস্কির মতন মাস্টারদের সাথে তবুও মার্কিনি ফিল্ম ক্রিটিক, অ্যাকাডেমিশিয়ান, সাধারণ দর্শকের কাছে আপনার কাজ একেবারেই অপরিচিত। আমাদের প্রথম কাজ হবে, মার্কিনি মডেল থেকে আপনার কাজের ধরন কতটা আলাদা সে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা যদিও আমি জানি, এখানকার চল্লিশ দশক থেকে অদ্যাবধি জনপ্রিয় ধারার পরিচালক সম্পর্কে আপনি সম্যক অবগত। টিপিক্যাল মার্কিনি পরিচালকদের তুলনায়, আপনার কাজের উদ্দেশ্য আর পদ্ধতি বিশদে জানতে আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। আপনি হয়তো, আমি আশা করি, বলবেন ছয় বছরের ভেতর মাত্র তিনখানা ফিল্ম কেন নির্মাণ করলেন? - ডেজ অফ থার্টি সিক্স, দ্য ট্রাভেলিং প্লেয়ার্স এবং দ্য হান্টার্স- এ তিন ফিল্মে আপনার জন্ম থেকে শুরু করে গ্রিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশটি বছরকে এক্সপ্লোর করতে চেয়েছে। কোনো আমেরিকান এ ধরনের কাজ করেননি। কেবল মাইক নিকলকে উদাহরণ হিসেবে নিন, তিনি প্রথমে এডোয়ার্ড আলবির নাটক অবলম্বনে একটা সিনেমা বানালেন, হু'জ এফ্রেইড অফ ভার্জিনিয়া উল্ফ? আর তারপর একটা জোসেফ হেলারের উপন্যাস, ক্যাচ২২- নিয়ে, তার বাদে দ্য ডে অফ দ্য ডলফিন। আপনি কি আমাদের দর্শকদের আপনার কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলবেন?

উত্তর

প্রথমত, আমি ভাবি না কেউই পরিষ্কার নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারবে আমেরিকান আর ইউরোপিয়ান ফিল্মের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য আছে। কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রেই, স্বাধীনতার প্রথম কয়েকটা বছরে, চুয়াল্লিশ থেকেই ধরা যাক, গ্রিসে একমাত্র আমেরিকান সিনেমাই সহজলভ্য ছিল, আর সে কারণেই আমার প্রজন্মের প্রথম দেখনসম্ভব ফিল্ম ছিল এইসব। আমি জানি, সিনিয়র পরিচালকরা যেমন অ্যান্তনিওনি, ফেলিনি, কিংবা ভিসকন্তি আমেরিকান সিনেমার চেয়ে ফরাসি সিনেমা দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন কিংবা আমার বলা উচিত, তারা দুই ধরনের ফিল্ম সম্পর্কেই সঠিক ধারণা নিয়ে ফিল্ম কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ভেবে দেখতে গেলে, আমেরিকান সিনেমার প্রভাব ইউরোপে প্রথমবারের মতো বোঝা গিয়েছিল যুদ্ধের পর। আমেরিকান সিনেমাগুলো ছিল গোয়েন্দা কাহিনিনির্ভর, মিউজিক্যালস কিংবা সামাজিক নাট্যধর্মিতা, মেলোড্রামায় ভর্তি। এক রকমের বিশেষ ন্যারেটিভে বলা তাদের গল্প বিশাল সাধারণ দর্শকের কাছে খুব আদর পেয়েছিল। যেমন ধরা যাক, প্রথম যুদ্ধপরবর্তী প্রজন্ম, নাম করে বললে আমার প্রজন্ম, হয়তো আমার পরের দুটি প্রজন্ম। যখন, পঞ্চাশের শেষে, ফ্রান্সে নিউ ওয়েভ বিস্ফোরণ ঘটাল, আমার মতো লোকেরা নতুন বিকল্পের সন্ধান পেল। যে ফিল্মটা আমার ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটি হলো, গোদারের ব্রেথলেস, একটা গোয়েন্দা গল্পের ছদ্মবেশে, সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখা এক গল্প। জন হাস্টনের লেখার ধরনের সাথে গোদারের লেখার ধরনের চমকপ্রদ ফারাক আছে। কিন্তু, আমাদের জন্য, গোদার একেবারে ঠিকঠাক উত্তেজক ফিল্ম উপহার দেন ভিন্ন ধরনের ডিসকোর্স আবিষ্কারের মাধ্যমে। অবশ্যই তিনি পুরোপুরি মৌলিক ছিলেন না এবং তার রাস্তাও একমাত্র রাস্তা নয়। তার আগে ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম ছিল, ভিন্ন ধরনের লেখার এপ্রোচ ছিল যার সঙ্গে 'টাইমিং'-এর একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, আন্তনিওনির ফিল্মগুলোতে যেমন। আরও যোগ করা যায়, আমাদের মতো যারা এর অনুসারী ছিলাম, জাপানি ফিল্মও আমাদের আগ্রহের সীমানায় ছিল। এসব ফিল্ম আমাদের সিনেমা রচনা ও নির্মাণের চিন্তার অনেক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। এসব উপলব্ধি ছাড়াই, নিজেকে নানারকম পছন্দে শামিল হতে দেখি, যদিও এই কথাটা বলতেই হবে, আমার প্রাথমিক বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে। সেজন্য বলা যায় আমি সম্পূর্ণ আলাদা ডিসকোর্সের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। টেক্সটের প্রেমিক ছিলাম। আমি প্রধানত মহান ইউরোপীয় লেখকদের পড়েছিলাম, আমেরিকান লেখকদেরও ভালোভাবেই জানতাম। হুইটম্যান থেকে হেমিংওয়ে, স্টেইনব্যাক, ফকনার এবং ডস পাসোস। এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে, আমেরিকান লেখকরা সবসময়েই ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে গিয়েছেন। কিন্তু সিনেমায় এটি ঘটেনি। ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান সাহিত্য তাদের সিনেমার তুলনায় অনেক কাছাকাছি। অবশ্য, গ্রিক সাহিত্য এবং বিশেষ করে গ্রিক ট্রাজেডি, থিয়েটার করতে গিয়ে পড়তে হয়, এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায় আমার ভেতরে। এসব অভিজ্ঞতার আলোয় কোন কাজটা পছন্দ ভাবতে ভাবতে আমি সিদ্ধান্তে এলাম গল্প আর গল্প লেখার পদ্ধতি একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, বলে রাখি, অনেকবার লেখাটা শেষ অব্দি হয়ে উঠেছে ফিল্মের গল্প। এই কারণেই, যে গল্প আমি বলছি সেটি কেবল নয়, কেমন করে বলছি দুটোই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প আগে জন্মে যাওয়ার ফলে, আমি ইতিহাসচিহ্নিত হয়ে পড়াটা এড়াতে পারিনি। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, আমার নিজের দেশের ইতিহাস। যুদ্ধের আগের স্বৈরতন্ত্র, তারপর যুদ্ধশেষে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো, গৃহযুদ্ধ আর তারপর আরেকজন স্বৈরশাসক, নিজের জীবন আর অভিজ্ঞতা থেকে রেহাই পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার ক্ষেত্রে, ইতিহাস বুঝতেই আমি হয় ইতিহাসনির্ভর বা ইতিহাস বিষয়ে মন্তব্য করতে ফিল্ম বানাই। খুবই স্বাভাবিক আমার পক্ষে, নিজের গল্প বলবার জন্য নিজের অতীতেই ডুব দেওয়া, একটা স্থানিক গল্পের স্বার্থে। '-৬৭'৭৪ গ্রিক স্বৈরশাসনের কঠিন বাস্তবতার ধাক্কা আমাকে আক্রান্ত করে। বাবার সাথে থাকা ছোট এক ছেলে আমি। বাবাকে জেলে পোরা হলো, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, আরও নানা সব ব্যাপার। এইসব ঘটনা আমার অস্তিত্বের দিকে ফিরে ফিরে আসে আর ব্যক্তিগত ইতিহাসটা দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবার উপাদান হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

আমাদের দর্শকরা, ব্যারিমানের কাজের সাথে পরিচিত, আপনার

মতোই যিনি নিজের চিত্রনাট্য নিজেই রচনা করেন। কিন্তু আপনি, ঠিক তার মতোই, একজন নিয়মিত ক্যামেরাম্যানকে সাথে রাখেন। আপনার ক্ষেত্রে গিয়র্গস আরভানিটিস, আপনার সকল ফিল্মেই তিনি আছেন। আর একই কুশীলবের সাথে কাজ করবার প্রবণতা আছে আপনার। আমি অনুভব করি, আপনাদের দুজনের কাজে একটা বড় ফারাক আছে। তিনি, মনে হয়, অভিনেতাদের ভেবেই চিত্রনাট্য লেখেন কিন্তু আপনি লেখেন না। আরও কথা হচ্ছে, যখন তার সিনেমাগুলোর বিষয় ব্যক্তিগত স্নায়ুচাপ, এমনকি স্নায়ুর অভ্যন্তরীণ অসুখ (আমি কিন্তু সমালোচনা করতে বলছি না এসব)। আপনার কাজের অধিকতর কেন্দ্র, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঘুরে বেড়ায় আপনার সব ফিল্ম, হোমার, অ্যাসকাইলাস, ইউরিপিদিস আর সোফাক্লেস এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নানা রেফারেন্স। ব্যারিমানের সাথে তুলনামূলকভাবে আপনি যদি আপনার কাজের পদ্ধতিটা বলতেন তাহলে জানা জিনিসের মাধ্যমে আমরা অজানা জিনিসের জন্য প্রস্তুত হতে পারতাম, আমার মনে হয়।

উত্তর

আমি আমার কাজের সাথে ব্যারিমানের কোনো মিল পাই না। আমার সিনেমা মনস্তাত্ত্বিক না, এটা হলো এপিক। ব্যক্তিমানুষকে এখানে সাইকোঅ্যানালিসিসের ভেতর ফেলা হয় না বরং একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতায় রাখি তাকে। আমার চরিত্ররা এপিক সিনেমার সব উপাদান উপলব্ধি করতে পারে। অথবা আমি এ-ও বলতে পারি, সেসব এপিক কবিতা, স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের টিপিক্যাল উপস্থাপনা। হোমারে, অডিসিউস চোখ বুজে থাকা এক লোক; একিলিস সাহসী, বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ত- এসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একেবারেই পরিবর্তিত হয় না। ব্রেশটের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, চরিত্রেরা জীবনের চেয়েও বড়, তারা ইতিহাস কিংবা চিন্তার বাহক হিসেবে কাজ করে। আমার চরিত্রেরা অ্যানালিসিসের ভেতর পড়ে না, তারা ব্যারিমানের কাজের মতো মানসিক নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যায় না। তারা অনেক কোমলহৃদয়, হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজে, আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতার টানাটানিতে হারিয়ে যাওয়া সবকিছু। বেশিদিন আগের কথা নয়, দুনিয়ার ইতিহাস ছিল আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো একভাবে দুনিয়া বদলে ফেলার আকাঙ্ক্ষা। এখন শতাব্দীর শেষে এসে আমরা বুঝতে পারছি, যা চেয়েছিলাম কখনোই আসলে সেসব ঘটেনি এবং যেসব কারণে ওসব ঘটেনি তা ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো সেই সময়ের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা কোনোকিছু পাল্টানো অসম্ভব ছিল। কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক, আমরা আমাদের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাসহ রয়ে গিয়েছি, অপূর্ণ স্বপ্নের ছাই নিয়ে। আমার শেষ তিন সিনেমা এই ছাইয়ের স্বাদের প্রতিফলন। ভবিষ্যতে কোনো একদিন স্বপ্ন পূর্ণ হবে এই আশা রেখে যাওয়া পরের ডিসকোর্সের জন্য। আমার লেখাপত্তর আর ব্যারিমানের ভেতর কোনো সম্পর্ক নেই। তার ফিল্মে শক্তপোক্ত মেটাফিজিক্যাল এলিমেন্টস আছে যা কিনা ঈশ্বরকে মান্য করা বা বাতিল করে দেওয়া এক পিতৃপ্রতিম চরিত্র সন্ধান করে। আমার মতে, আমার কাজে সেই পিতৃপ্রতিম চরিত্র নিজে কোনো উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমার সিনেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান। আমার ফিল্মেরা তার মতো মেটাফিজিক্যাল না। সেসব, একটা আশ্চর্য উপায়ে, ব্যারিমানের চেয়ে বেশি অস্তিত্ববাদী। এইসব কথা, ভয়েজ টু সাইথেরা, দ্য বি কিপার আর ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট নিয়েই বললাম।

প্রশ্ন

আপনার ঐতিহাসিক ট্রিলজির ভেতর ডেজ অফ থার্টি সিক্স, ট্রাভেলিং প্লেয়ার্স এবং দ্য হান্টার্স; এর মধ্যে দ্বিতীয় ছবিটা আবার মেগালেজ্যান্ড্রোস, যা কি না আংশিকভাবে প্রকৃত ইতিহাসভিত্তিক। ১৮৭০ সালে ঘটা একটা ঘটনা। ম্যারাথন থেকে গ্রিক দস্যুরা একদল ইংরেজ পর্যটককে অপহরণ করেছিল, এই সিনেমাটি ইতিহাসের নানা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে ভাবিত ছিল, এমনকি পরাবাস্তবতা নিয়েও। পনের শতকের একটা কিংবদন্তির পুনর্বয়ান ঘটায় সিনেমাটা। একটা দেশের অপেক্ষা থাকে, একজন মসীহা ধরনের মুক্তিদাতার। যখন তার উদয় ঘটল, দেখা গেল তিনি কিন্তু দানবে পরিণত হলেন। একই সময়ে সিনেমাটা আধুনিক স্বৈরশাসক বিষয়ে এক ধরনের অ্যালিগরিক্যাল মেডিটেশন। এটা কি ঠিকভাবে বললে ভিন্ন পদ্ধতিতে ইতিহাসের অনুসরণ? বাস্তবতা আর পরাবাস্তবতার টানাপড়েন আপনার কাজের মূল কেন্দ্র? এ বিষয়ে কী ভাবেন?

উত্তর

মেগালেজ্যান্ড্রোস একটি দার্শনিক, রাজনৈতিক প্রতিবেদন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমস্যা বিষয়ে আগের তিন ফিল্মে এসবের তিক্ত পরিণতি দেখিয়েছি। মানবিক আশা হিসেবে আমার আগের কাজে যা কিছুই চিহ্নিত হবে, মনে হচ্ছে এটাতে আমি সবকিছু সরিয়ে নিয়েছি, ভেতর থেকেই সরে যাওয়া, এই ঘটনা বেদনার। মেগালেজ্যান্ড্রোস পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয়ের বহু আগেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নিয়ে মন্তব্য করেছিল এবং দুনিয়ার এই অংশে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার বিপর্যয়কে বিষয় করে এটা এক প্রফেটিক ফিল্ম। সে সময়ে আমি অন্যভাবে কথাগুলো বলতে পারিনি। আমাকে পুরাণের ফর্ম ব্যবহার করতে হয়েছিল। আমি অথেনটিক তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করতে চাইনি কেন না তাহলে কাব্যিক ভাষা থেকে সিনেমাটা দূরে সরে যেত। আমি বিশ্বাস করি, একটি ফিল্ম অবশ্যই, অন্য যে কোনো কিছুর আগে, একটি কাব্যিক ঘটনা, নইলে এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। যেসব পরিচালকদের আমি ভালোবাসি, তাদের ক্ষেত্রে এটি সত্য। যেমন অসিমা (নাগিসা অসিমা) আর তাভিয়ানিস, তারাও একই পদ্ধতি ব্যবহার করেন, বর্তমান সম্পর্কে বলবার দরকারে অতীতে চলে যান।

প্রশ্ন

আমার মনে হচ্ছে, দুনিয়ার যে কোনো পরিচালকের চেয়ে আপনার ফিল্মের চরিত্রেরা কেবল এক স্বতন্ত্র স্থান নয় আলাদা সময়েরও অধিবাসী। প্রশ্নাতিরিক্তভাবেই, আপনার চিত্রমালা গ্রিসের শরীরী উপস্থিতিতে স্পন্দিত হয়- পাথরের রাশি, রাস্তাঘাট, দেয়াল, ছাদ, আকাশ, বৃষ্টির ঝরে পড়া, কুয়াশা। স্থানের এই অনুভূতিটুকু আপনার সহমর্মীদের কাছে, যদি থাকেন তারা, পৌঁছে যায়। কিন্তু আমি ভাবছি, সময় আর ইতিহাসের জন্য আপনার গহন অনুভবটুকুর কথা, এসবই আপনাকে আলাদা করেছে। আপনার প্রথম ফিল্ম রিকনস্ট্রাকশন ছিল একটা সত্যিকার খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ। পত্রপত্রিকার রেকর্ড আর কোর্টের রেকর্ডপত্র অবলম্বনে; এবং এমনকি স্পাইরোস, দ্য বিকিপারে গ্রিসের উত্তর থেকে দক্ষিণ অব্দি ঘুরে বেড়াচ্ছে, নানা স্মৃতি নিজের মনে ফিরিয়ে আনছে, প্রায় সিনেমা ভেরিতের ফ্ল্যাশব্যাকের কায়দায়, তার জীবনের শুরুর দিনসমূহের দৃশ্যাবলি। আপনি মন জিনিসটাকে ইতিহাসের সুনির্দিষ্টতায় বেঁধে ফেলেছেন। এমনকি আপনি যদি এসবকে নতুন করে ফলিয়ে তোলা বলে চিহ্নিত করে তুলতে চান, দেখা যাচ্ছে আগের আমলের গ্রিক ইতিহাসের নায়কদের রেফারেন্স হিসেবে রেখে চরিত্রগুলোকে তৈরি করছেন ধারাবাহিকভাবেই, পরোক্ষভাবে ধ্রুপদী সাহিত্যেরও উল্লেখ থাকে যা ওপরে বললাম। আপনি কেমন করে ইতিহাসের এই তীক্ষ্ণ অনুভব ব্যাখ্যা করবেন? ফিল্মগুলোতে এই 'তথ্যচিত্রমূলক হস্তক্ষেপ' সম্পর্কেই বা কী বলবেন?

উত্তর

আমি কিন্তু ইতিহাসের এই অনুভবটিকে 'তথ্যচিত্রের হস্তক্ষেপ' বলতে চাই না। আমি বরং ভাবতে চাই, এটি গ্রিক ঐতিহ্য। আমরা যদি গ্রিক ধ্রুপদী শিল্পের দিকে তাকাই, দেখব তাদের বেশিরভাগের কাজ প্রাচীন পুরাণ নিয়ে। আর এ পটভূমিতে ইতিহাস ধারাবাহিক পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিবেচনা থেকে স্বাধীন হয়েই। আমাদের ইতিহাসের সাথে আমার সংযুক্ততার উৎস এই তথ্যটি, আমি একজন গ্রিক। ইতিহাস মিশে আছে আমার সার্বিক পরিমণ্ডলে। গ্রিক চিত্রমালা আর বিশেষত সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক। আর এই শতাব্দীতে, গ্রিক সিনেমার সাথে। অনেক বছর ধরেই, আমার দেশে ইতিহাসের প্রতি প্রথাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ জন্মসম্ভব বলে মনে হয় না। সাধারণ ঐক্যই ছিল একমাত্র

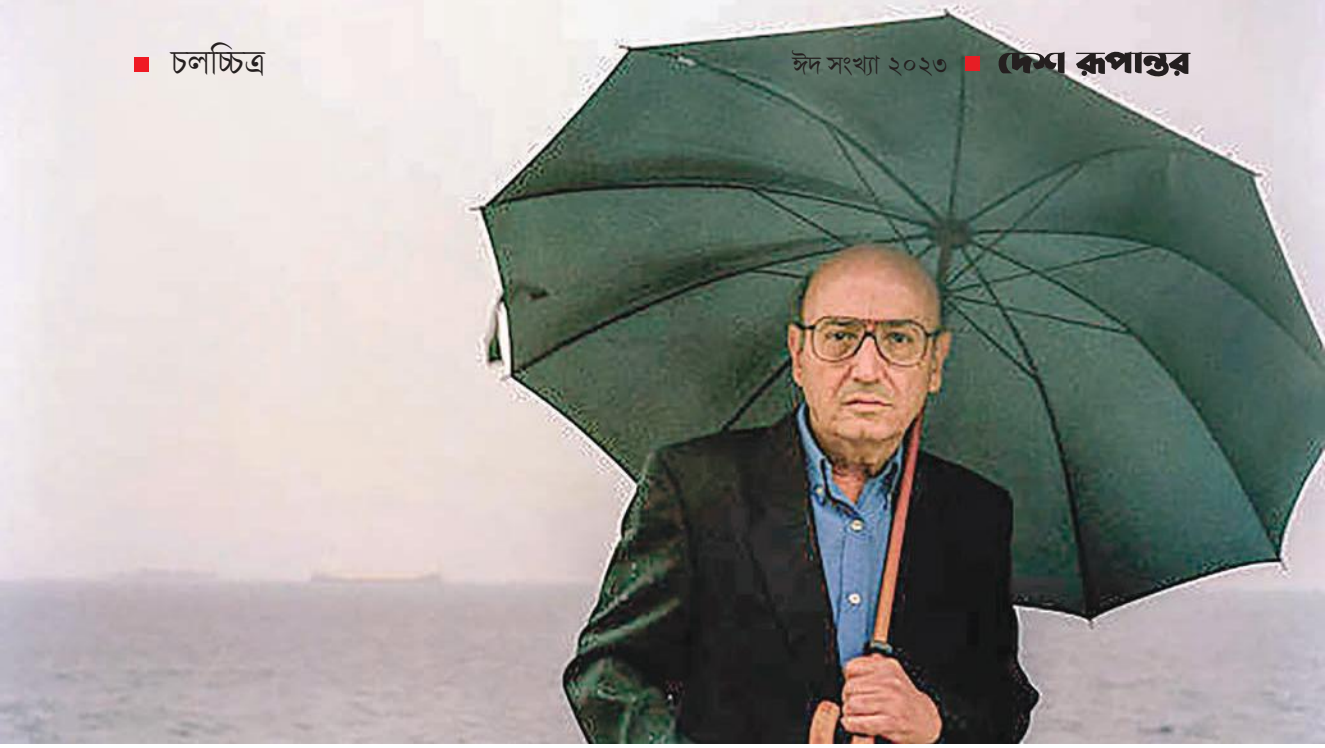

গ্রহণযোগ্যতার দিক। কিন্তু চুয়াত্তরের স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর, গ্রিসে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ফিল্মের বিস্ফোরণ ঘটল। এসব ফিল্ম অনেক বছর আগে থেকেই বানানো দরকার ছিল। আমি অবশ্যই নিছক আমার ফিল্মের কথা-ই বলছি না। কেননা এই অঞ্চলটি স্বৈরতন্ত্রের সময়ই আবিষ্কার করে দেখবার চেষ্টায় ছিলাম। আমি বোঝাতে চাইছি, সাধারণভাবে ওরা চলে যাওয়ার পরেই কেবলমাত্র গ্রিক সিনেমা এসব নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে। এবং, ইতিমধ্যে অনেক দেরি ঘটে গিয়েছে। একই সময়ে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, গ্রিক সিনেমা রিসোর্সের অভাবজনিত কারণে, কমেডি কিংবা তারাখচিত ছিচকাঁদুনে ফিল্মনির্ভর ছিল। এভাবেই নিজেদের অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য ছ্যাবলামি ধরনের ফিল্ম আর মেলোড্রামাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। অনেকদিনের মধ্যে একবার দুবার দু-একটা ফিল্মের মধ্যে সত্যিকার ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল, যেমন কাকোয়ান্নিসের স্টেলা, কন্দোরুসের ড্রাকোস, লোককথার ওপর নির্ভর করে বানানো এবং ইতিহাসভিত্তিক ফিল্ম। আর একটু আগে বলা কন্দোরুসেরই পারানোমি। আমরা যদি সময় নিয়ে কথা বলা স্থির করি, আমাকে এই পুরো বিষয়কে দুভাগে ভাগ করতে হবে; ঐতিহাসিক সময় আর 'টাইমিং'। সাধারণের সময়ের ভেতরের একটা নড়াচড়া ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়, কাটের ভেতর দিয়ে ঐতিহাসিক সময়ে হাত দেওয়া যায় না। একটা পুরনো আমলের আমেরিকান ফিল্মের কথা বলি, বানিয়েছিলেন লাজলো বেনেনডেক, বর্তমান সময় থেকে অতীতের মুভমেন্ট আলোর সামান্য পরিবর্তন সাধন করে একই স্পেসের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। একটা সুইডিশ ফিল্ম, মিস জুলিতে, সময় চরিত্রদের ব্যক্তিগত মেমোরিচারণের ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করেছে। অন্য দিক দিয়ে বললে, প্রত্যেক সময়ে তাদের মধ্যে কেউ অতীত থেকে কিছু একটা সংগ্রহ করে নিচ্ছে। আমি যা করেছিলাম তা ছিল সিনেমার ইতিহাসে অর্জিত প্রথম ঘটনা। আমার নিজের কাজ ছিল, আমরা যাকে বলি, কালেকটিভ মেমোরি, সেটা নিয়ে, এবং সম্মিলিত ব্যক্তিগত স্মৃতির চেয়েও সম্মিলিত ঐতিহাসিক স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে, একই স্পেসে নানা সময়কে মেশানো, ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্য দিয়ে সময়ের বদল দেখাইনি। এসব ঘটনা একজন মানুষের চেয়ে সামষ্টিক স্মৃতির প্রতিই মানানসই হবে এবং সেটি সুন্দরভাবে সম্ভব হয়েছিল কোনো ধরনের কাট ব্যবহার না করেই। একটা শটে তিন চারটে আলাদা ঐতিহাসিক সময়খণ্ডকে পাশাপাশি রেখে বদলটা ঘটিয়েছিলাম। সময়ের একেবারে গভীরে ধারাবাহিক আর্তিভারাতুর ঝাঁপ দেওয়া বলতে পারেন। উদাহরণ দিই আপনাকে। ট্রাভেলিং প্লেয়ার্সে, ট্রেন যখন ১৯৪০ চিহ্নিত বছরে ছুটছিল, একজন অভিনেতা এশিয়া মাইনর সম্পর্কে বলছিলেন, যুদ্ধ শুরুর কথা। যখন ট্রেন থামল, অভিনেতা নামলেন এবং ক্যামেরার দিকে সোজা তাকিয়ে এশিয়া মাইনরের ১৯২২ সালে ঘটা যুদ্ধের কথা বলতে থাকলেন, কিন্তু তিনি যখন ক্যামেরার দিকে চেয়ে এসব বলছিলেন, মুহূর্তটা হচ্ছে এখন, 'এখন' এই সময় হয়ে উঠছে যখন প্রত্যেকে ফিল্মটা দেখছে। এই পদ্ধতিতে তিনটি আলাদা ঐতিহাসিক সময় পরস্পরমিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানকাল, ১৯৪০ এবং ১৯২২। অন্য একটি দৃশ্যে, 'দ্য ট্রাভেলিং প্লেয়ার্স' এর নতুন কুশীলবদের দেখা যায় ১৯৫২ এর রাস্তা ধরে হাঁটছেন যতক্ষণ অবধি না তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। আর ঠিক এই সময়ে শটটা প্যানারোমিক হয়ে যাচ্ছে আর আমরা দেখছি একই শটে ১৯৪২ সালের জার্মান ভিন্টেজ গাড়ি এসে ঢুকছে। ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জায়গাটায় ক্যামেরা রিফোকাস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জার্মান সৈন্যদের, দৃশ্যটিতে যেন কোনো ইন্টারাপশন ঘটেনি। এটা নানারকম ঐতিহাসিক মুহূর্তের ধারাবাহিক ও দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা হয়ে উঠছে কিন্তু দেখুন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত হচ্ছে না। এসব কারণে, দৃশ্যটি দেখার সময়, অন্য এক অনুভূতি, সিনেমাভাষার কারণেই একেবারে প্রথম অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়। আমি বলতে চাইছি, যে পদ্ধতিতে সময়কে ব্যবহার করি আমি, সময়টা স্পেস আর স্পেসটা অদ্ভুতভাবে সময় হয়ে ওঠে। আমি জানি না, বোঝার মত ভাষায় বলতে পারছি কি না কিন্তু সময় আর স্থানের ভেতর এক ছন্দের অস্তিত্ব আছে, এই ধারাবাহিক ছন্দ ঘটনাগুলোর নানারকম মাত্রা উপস্থিত করে পর্দায়।

প্রশ্ন

আপনার কাজগুলোর দৃশ্যায়নের চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করছে যে ব্যাপারসমূহ সেসব নিয়ে আলাপ তোলা যাক। যেমন, লং টেক, ট্র্যাকিং শট, ৩৬০ সার্কুলার শট, এসব কৌশল দর্শককে সাহায্য করে কিংবা 'তৈরি' করে যাতে তিনি 'সত্য' দৃশ্যটিকে তার সুনির্দিষ্ট সময়কালসহ দেখেন। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন, আপনার উদ্দেশ্য কী? সময় ও স্থানের সাথে সম্পর্ক আছে এসবের অথবা কোনো মিথস্ক্রিয়া? কিংবা, আপনার কিছু ছবি বেশ দীর্ঘ এই তথ্যের সাথে এসবের সম্পর্ক আছে নাকি আপনার দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক চরিত্র স্থাপনের সাথে?

উত্তর

আমার কাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উৎস দীর্ঘকাল ধরে ফিল্ম দেখা। বছরের পর বছর ধরে, আমার চারপাশের সংখ্যাতীত ফিল্ম আমি দেখেছি, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র শুষে নিয়েছি। আর যখন, পরে লেখালেখি আর সিনেমা বানাতে শুরু করলাম, সিনেমার উপরিতলে সবকিছু ফিরে এলো ও স্টাইলে পরিণত হলো। লেখাপত্র, ব্যক্তিগত লেখাপত্র, আমি যদি ব্যাখ্যা করে বলি, বলতে পারি, এই লং শট, সিকোয়েন্স শট সম্পর্কে আমার দুর্বলতার উৎস হচ্ছে সাধারণভাবে যাকে সমান্তরাল সম্পাদনা বলে সেটিকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাই কারণ আমার বিশ্বাস এসব বানিয়ে তোলা, ফেনিয়ে তোলা ব্যাপার। ঐতিহাসিক কারণেই যারা এ ধরনের মন্তাজের আশ্রয় নিয়েছেন তাদের কাজ আমি সমর্থন করি, আইজেনস্টাইনের মতো, কিন্তু এসব আমার ধরনের ফিল্ম নয়। একেবারে স্পষ্ট করে যদি বলি, আমার কাছে, প্রতিটি দৃশ্য জ্যান্ত, তার নিজস্ব শ্বাসস্পন্দনসহ, শ্বাসের ওঠানামা টের পাওয়া যায়। এটা এমন এক পদ্ধতি যা কোনোরকম বাধা সহ্য করে না। প্রতিটি দৃশ্যের প্রাকৃতিক শুরু ও শেষ আছে-আজকালকার সিনেমায়, তথাকথিত স্তব্ধ সময়ে- নীরবতা আর স্তব্ধতা- এসব বাতিল মাল। এই অনির্দিষ্ট সময় যা কিনা দুটো দৃশ্যে সম্পর্কসাধন করে, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার জন্য, এমনকি নীরবতাকেও সুরেলা বাঙ্ময় হয়ে উঠতে হয়, কাট কিংবা নিথর দৃশ্যে ফলিয়ে তোলা নয় বরং দৃশ্যের ভেতরকার সুন্দর অক্ষুণ্ন রেখে। আমি দ্রুত আর মন্থর অভ্যন্তরীণ ছন্দ ব্যবহার করেছিলাম লং শটে, একটা উৎসবের উপাদানকে ফুটিয়ে তুলতে। মেগালেজ্যান্ড্রোসের গড়নটা হলো, বাইজেন্টিয়ান পূজাবিধির মতো, এখানে মঞ্চায়নের ধরনের উৎসবাদির উপাদান আছে, এসবকে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হতো। কোরিওগ্রাফি টার্মটা আমার সিনেমা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। আমি এইভাবে বলতে চাই না কেননা মানুষের মুখের কোনো কোরিওগ্রাফি হয় না। ধারাবাহিক গতির মধ্যে স্থানের কোরিওগ্রাফি সম্ভব যা এই স্থানকে সুরেলা অ্যাকর্ডিয়নের মতো খুলতে ও বন্ধ করতে সাহায্য করে। সম্পাদনা অভ্যন্তরীণ জিনিস, একটা সিকোয়েন্সের হয়তো দশখানা শট দরকার প্রথাগত সম্পাদনা সিস্টেমে, এখন একটাতেই পেয়ে যাচ্ছি যার ভেতর দশটাই আছে কারণ সত্যি বলতে গেলে অনেক শটে কাটা হয়েছে এই পুরো ব্যাপারটা। আমি এসব করেছি তথাকথিত স্থবির সময়, নীরবতা বাদ না দিয়েই। আমেরিকান মডেলের দিকে তাকান। প্রত্যেকটা আলাদা দৃশ্যের জন্য তার নানারকম অ্যাঙ্গেল লাগে। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেকটা শটের জন্য কেবল একটা এঙ্গেলই থাকবে। খেলাটার প্রাথমিক নিয়ম এইটাই। কিছু ব্যাপার আমরা আলোচনা করিনি, সুনির্দিষ্ট শট ব্যবহারের পদ্ধতি। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, আমার শেষ ছবিতে (ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট) ধর্ষণ দৃশ্যটি ফিক্সড শট যেখানে দেখা দৃশ্যের চেয়ে শব্দের অধিকতর অর্থ আছে। এই দৃশ্যে, শব্দ স্পেসকে অনেক বেশি ছন্দময় করে। ফিল্মের বহিরঙ্গে এই কারণে একটা নতুন অর্থের স্তর দাঁড় করায়। এটা চিত্রকর্মের মতো, ফ্রেমের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না, বাইরেও কাজ করে যায়। দর্শককে সাজেশান দেওয়ার শক্তিটা বহুমাত্রিকভাবে চর্চিত হয় কেবলমাত্র দর্শকদের কল্পনার শক্তিকে মুক্ত করে দিতে যাতে তারা ফিল্মের ভেতরে আরেকটা ফিল্ম নিজেদের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। দর্শকরা অস্তিত্বমান থাকেন নানামাত্রায় এবং নিষ্ক্রিয় হন না কখনোই, তারা পরিচালকের কল্পনার সাথে নিজেদের কল্পনাটুকুও যোগ করে দেন। আপনি অবশ্যই জানবেন, গ্রিক ট্র্যাজেডির সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই মঞ্চের ওপর ঘটে, কখনোই মঞ্চের পেছনে ঘটে না। আমার ক্ষেত্রে, ক্যামেরা ভ্রমণের মাধ্যমে ট্র্যাকিং শট একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পেস তৈরি করে। ফিল্মে তোলা জিনিসের দিকে তাক করে রাখা লেন্সের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে স্পেস সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। একটা ধারাবাহিক গতি শটের অভ্যন্তরে দুর্দান্ত নমনীয়তা তৈরি করে, বয়ে চলা জলের গতির মতো। দ্য ট্র্যাভেলিং প্লেয়ার্স তোলার সময়ে ক্যামেরা সবসময়েই চলন্ত ট্র্যাকে ছিল এমনকি গতিসঞ্চারে এটিকে দশ সেন্টিমিটার নড়তে হলেও। ৩৬০ ডিগ্রি শট ফিল্মের ভেতর বৃত্তের যে ধারণা রয়ে গিয়েছে তার অর্থবিস্তারে জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মেগালেজ্যান্ড্রোসে, ধরে নেওয়াই ছিল যে বৃত্ত সকল ফর্মের অংশ, এবং এটি এসেছে প্রাচীন মঞ্চ ব্যবস্থাপনার বৃত্তাকার মঞ্চের ধারণা থেকে যেখানে সব অভিনয় ঘটে। দেখুন, আজকের দিনে কেউ যখন সিনেমা বানানো শুরু করেন, সিনেমাই হচ্ছে তার শুরুর বিন্দু। আমার প্রজন্ম ভিন্নভাবে শুরু করেছিল। আমার বৃদ্ধি ঘটেছিল সাহিত্যপ্রভাবিত হয়ে। আমি কবিতা আর ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে শুরু করেছিলাম। আর তারপর সিনেমায় এসেছি সুতরাং, আমি ভিন্ন স্পেস দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে লেখার কাজটা খেলার নির্ধারক নিয়ম। পর্যায়ক্রমিকভাবে আমি ব্যাপারটা সিনেমায় নিয়ে এসেছি।

প্রশ্ন

আপনার বাফেলো রেট্রোস্পেক্টিভ শুরু হবে দ্য বিকিপার দিয়ে, এবং আমি দুটো প্রশ্ন এই ফাঁকে সেরে রাখতে চাই। দুটোই আইকন বা ইমেজ সংক্রান্ত। দ্য বি কিপার প্রথম ফিল্ম যেখানে আপনি একজন আন্তর্জাতিক ' নক্ষত্র'-কে ব্যবহার করলেন, মার্সেলো মাস্ত্রোইয়ানি খুবই আলাদা এক আইকন, অন্য অনেক কাজে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আপনি এই আইকনকে কেমন করে বোঝেন, এবং কেমন করে আপনি তাকে ব্যবহার করলেন আর পুনর্নির্মাণ ঘটালেন তার? আরেকটা প্রশ্ন লিখিত চিত্রনাট্য আর শ্যুটিংয়ের সত্যিকার বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। মিজ-অ-সিনের সকল সম্ভাবনাগুলো- স্পাইরোসের বাড়ি, যে হোটেলে সে থাকে, তার বালকবেলার বাড়ি, তার নিজস্ব গন্তব্য, জুকবক্স আর কোমল পানীয়ের দোকানের দৃশ্য দুটি না হয় বাদ দিলাম- সব মিলে এক মৌচাকের সম্ভাব্যতার দিকে নিয়ে যায় আমাদের। এসব কি আগে থেকে বানিয়ে রাখা অত্যন্ত জটিল আইকোনোগ্রাফিক উপস্থিতি নাকি এটি সিনেমার সাথেই ফলে উঠেছে- এবং কীভাবে পদ্ধতিটা সম্ভব হয়ে উঠল?

উত্তর

মাস্ত্রোইয়ানিকে ব্যবহার করবার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি বরং চেয়েছিলাম তার দৃশ্যমান ইমেজ পালটে দিতে। আমি এমন একজন অভিনেতার সন্ধানে সচেষ্ট ছিলাম যিনি সিনেমাটা নিজের কাঁধে বহন করতে সক্ষম। চরিত্রটি বিশিষ্টতার যে কোনো প্রকার দৃশ্যায়ন থেকে ছিন্নতা আর আন্তরিক নীরব অভিনয় দাবি করছিল। আমার মনে হয়, তাকে এতদিন ধরে যেভাবে দেখানো হচ্ছিল তার ঠিক উলটো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে কোনো অভিনেতা বা গ্রিসে যাকে ভালো করে চিনি তিনি চরিত্রের ভারেই মারা পড়তেন। অন্যদিকে মাস্ত্রোইয়ানি ভালো অভিনেতা বলেই ছবিটা টেনে নিয়ে যাননি বরং এই ভারকে ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো আমার ফিল্মগুলো চিত্রনাট্যের অবিকল আয়না; অন্য সময়ে, চিত্রনাট্য নোট আকারে থাকে, এবং ছবি তোলার পদ্ধতি ইম্প্রোভাইজেশনের ওপর নির্ভর করে। কোনো সময় কিছু ঘটনা আপনাকে ইম্প্রোভাইজ করতে প্রাণিত করবে আবার আরেক সময় প্রবলভাবে চাইবেন লিখিত চিত্রনাট্যকেই অনুসরণ করতে। এটা সম্পূর্ণভাবে যে সকল উপাদান নিয়ে কাজ করছেন তার ওপর নির্ভর করে এবং সিনেমা বানানোর সময়ের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে না। যে সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমি গিয়েছি তা নানা রকম। খুব ভালো থেকে খুব খারাপ। কিন্তু আমি যা করতে চেয়েছি তা থেকে কখনোই পেছনে সরিনি। বলতে পারি, ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট চিত্রনাট্যের নিঁখুত প্রতিলিপি আর দ্য ট্র্যাভেলিং প্লেয়ার্স শুরু হয়েছিল আমার নোট থেকে। ভয়েজ টু সাইথেরা মূল চিত্রনাট্য থেকে অনেক দূরের এবং দ্য বি কিপার খুব কাছের। আমি চিত্রনাট্য লেখার সময় নানা মানুষজনের সাথে কথা বলি লেখাটা নিয়ে, পিংপং খেলার মতো, যেখানে তারা শয়তানের উকিল কিংবা অনুঘটকের কাজ করে। চিত্রনাট্য লেখার সময় অন্য লোকেদের সাথে কথা বলা উপকারী হয়ে ওঠে; এই ধারাবাহিক আবিষ্কারের ঘটনা তখনই ঘটে যখন তাদের সাথে কথা বলি। ভয়েজ টু সাইথেরা সমুদ্রের মাঝখানে ভাসমান ভেলায় দুটো বুড়ো মানুষের দৃশ্য দিয়ে শুরু করেছিলাম। ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্টের প্রথম দৃশ্য ছিল শহরটা কুয়াশায় প্রায় অদৃশ্য আর একটা হাত তাতে ডুবে যাচ্ছে।

ঈদ সংখ্যা ২০২৩ ■ দেশ রূপান্তর

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

থ্রি মার্ডার

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

১

: স্যার, কেসটা ক্লোজ করবেন না প্লিজ।

: এই কেসে আর কী আছে? এখান থেকে আপনি কিছুই বের করতে পারবেন না।

: তার পরও স্যার, আরেকটা চেষ্টা করা দরকার।

: কীভাবে করবেন? ছেলে তিনটারে রিমান্ডে নেওয়া হলো। তার পরও তো কিছু বের হলো না। আমার ধারণা, আপনার সন্দেহ একেবারেই আজগুবি।

: স্যার, আমি এখনো বলি, কাজটা ওরা তিনজনই করেছে।

: কীসের ভিত্তিতে বলছেন? কিছুই তো প্রমাণ করতে পারলেন না।

: স্যার, আমার মন বলছে।

: দেখুন আপন সাহেব, মনের কথায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ চলে না। আপনি একজন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হয়ে এসব হাস্যকর কথা বলতে পারেন না।

: স্যরি স্যার। কিন্তু ওদের সম্পর্কে এই একটা খুন আর একটা আত্মহত্যা; দুটোরই সম্পর্ক ছিল।

: খুন বলছেন কেন? দুটোই তো আত্মহত্যা।

: ছেলেটা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মেয়েটার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তো দেখেছেন। সেখানে বলাই হয়েছে, মেয়েটাকে শ্বাসরোধ করে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

: মেয়েটার বাসায় এসে এই কাজ কে করবে?

: তা জানি না। মেয়েটার প্রেমিক আত্মহত্যা করায় কেসটা জটিল হয়ে গেছে। আর ওই প্রেমিক ছেলেটার নোট আরও সন্দেহজনক না? সে লিখেছে : বন্ধুত্বর প্রতিদান।

: সেটা তো মেয়েটার উদ্দেশেও লিখতে পারে। আপনি ওই তিনটে ছেলেকেই সেই বন্ধু ধরে নিচ্ছেন কেন?

: সেই বন্ধুটা কে বা কারা সেটাই তো আমরা নিশ্চিত না বলে এত ঝামেলা হচ্ছে।

: আপনি তো কিছুই নিশ্চিত না। খালি ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে মাথাটা গেছে।

: আর স্যার ইংরেজি নোটের ফ্রেন্ডস শব্দটা নিয়েই আমার যত খটকা। এর মধ্যেই কিছু একটা আছে।

: শব্দের মধ্যে আপনি আবার কী খুঁজে পান? খালি খালি ছেলে তিনটেকে ধরে এনে রিমান্ডে নিলেন। লাভ কী হলো?

: খালি খালি না স্যার। তিনটে ছেলেরই এই প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

: ফালতু কথা বলবেন না। এই প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে ঢাকা শহরে আরও হাজারখানেক লোকের নিশ্চয়ই সম্পর্ক ছিল। আপনি সবাইকে এনে রিমান্ডে ঢোকাবেন? ফালতু।

: স্যরি স্যার। কিন্তু ওদের মাখামাখিটা চোখে পড়ার মতো ছিল। আমি ওদের ভার্সিটিতে কথা বলে কিছু একটা ইঙ্গিত পেয়েই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি।

: কী ইঙ্গিত? কী ইঙ্গিত? ওদের একটা ছেলের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক ছিল, এটুকু! আর ছেলেটার সঙ্গে এই তিনটে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। এটা কি কোনো অপরাধ? এই অপরাধে তিনজন প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ছেলেকে এভাবে হেনস্তা করা যায়?

: স্যরি স্যার।

: আপনি তো স্যরি বলে খালাস। আমার এখন জীবন যাচ্ছে জবাব দিতে দিতে। শোনেন, কেস ক্লোজ করে দিচ্ছি। আর আপনি ছুটি-ফুটি নেন। অনেক জ্বালিয়েছেন।

: স্যার, আমাকে একটা সপ্তাহ সময় দিন স্যার। একটা সপ্তাহ।

: কী করবেন? আবার ওদের অ্যারেস্ট করবেন? আপনাকে তাহলে আমি ইউনিফর্ম খুলিয়ে ছাড়ব।

: না স্যার। অ্যারেস্ট করব না। ওদের আর ডিস্টার্বও করব না। আমাকে শুধু একটা সপ্তাহ সময় দেন। এরপর আপনি কেস ক্লোজ করে দেবেন।

: এক সপ্তাহ পর?

: এক সপ্তাহ পর আমি নিশ্চিত আপনাকে আর কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। আপনি সবাইকে সন্তুষ্ট করার মতো জবাব পেয়ে যাবেন।

: আপনার এসব লেকচার তো এই তিন বছর ধরে শুনছি। আজ পর্যন্ত কোনো একটা কেসে কিছু করে দেখিয়েছেন?

: এবার একটা সুযোগ দিয়ে দেখেন স্যার। সারাক্ষণ তো অফিস-আদালতে ডিউটিতে থাকি। এই একটা ভালো কেস পেলাম।

: মানে কী! আপনাকে আমি কাজ করার সুযোগ দিই না?

: স্যার, রাগ করবেন না। আমি তা বলিনি... শুধু আমাকে একটা সপ্তাহ সময় দেন।

: আর ওপরে আমি কী বলব? তারা তো কেস ক্লোজ করে আপনাকে সাসপেন্ড করতে বলেছে।

: আমাকে সাসপেন্ড করুন, সমস্যা নেই। আপনি কেসটা ওপেন রাখেন। কিছু একটা বলেন। বলেন, ছেলেগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্য কোনো অপরাধী খুঁজে বের করবেন আপনি। এসব বলে কেস ওপেন রাখেন।

: আপনাকে সাসপেন্ড করলে আপনি কী করে দেখাবেন? কেস কার কাছে থাকবে?

: আপনার নিজের কাছে রাখেন? বলেন, আপনিই তদন্ত করবেন। আর আমার কাজ আমি এক সপ্তাহ সাসপেন্ড থেকেও করতে পারব।

: শোনেন, ধাপ্পা দিচ্ছেন না তো আপন সাহেব?

: স্যার, বিশ্বাস করেন, এটা আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন।

: থাক। সিনেমার ডায়ালগ দেবেন না। আমি এক সপ্তাহ কেসটা বলে-কয়ে চালু রাখছি। আপনাকেও সাসপেন্ড করছি না। সময় নেব। এক সপ্তাহ পর কিছু না হলে কিন্তু আর সাসপেন্ড না, সোজা ডিশমিশ।

: থ্যাংকইউ স্যার, থ্যাংকইউ। আরেকটা পারমিশন দরকার ছিল।

: বলেন।

: নূপুরের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। ওর মোবাইলটা বন্ধ...

: গেট আউট, গেট আউট। এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন, দিয়েছি। এখন আবার আমার মেয়ের সঙ্গে কথা! আপনি আমার ডিপার্টমেন্টের না হলে এত দিন আপনাকে আমি রিমান্ডে দিতাম। সোজা বের হয়ে যান। নূপুরের কাছেও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। ফালতু একটা ছেলে। যান, নিজের কাজে যান।

: ঠিক আছে স্যার। এত রাগ করবেন না। মেয়ের বাবা হিসেবে এত রাগ করা ঠিক না।

: আপনি যাবেন! নাকি আমি উঠব।

: স্যরি স্যার। আমিই যাই।

২

মানুষের একটা খারাপ অভ্যেস থাকতে পারে, দুটো খারাপ অভ্যেস থাকতে পারে। কলিমের নেই নেই করেও গোটা দশেক খারাপ অভ্যেস আছে।

সবচেয়ে খারাপ হলো সকাল বেলায় খালি পেটে একটা সিগারেট নিয়ে টয়লেটে যাওয়া। তারপর খারাপ হলো, টয়লেট থেকে

বেরিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে কম্পিউটার অন করে ফেসবুকে বসে যাওয়া।

এই নিয়ে কলিমের জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ নেই। দুলাভাইয়ের বিশাল বাসার এক কোনায় চিপা একটা ঘরে থাকে। দুলাভাইয়ের কাছে বিড়ি খাওয়ার টাকাটা পর্যন্ত চায় না। তার পরও সকাল বেলার এই দুই কাজের জন্য সারা দিন খ্যাট খ্যাট করে রুনা আপা।

আজও টয়লেট থেকে বের হওয়া মাত্র চিৎকার করে উঠল, 'তোর জ্বালায় তো বাসায় টেকা যায় না। তুই কি মানুষ হবি না? বাথরুমে ঢুকে সকাল বেলায় সিগারেট খাস। অসভ্যতার একটা সীমা আছে...'

কতক্ষণ ধরে রুনা আপা এ রকম ক্যাট ক্যাট করবে, তার কোনো ঠিক নেই। সাধারণত কলিম এসব কথার কোনো উত্তর দেয় না। তার পরও আজ বিড়বিড় করে বলল, 'সিগারেট বাথরুমে খেলেও যা, রুমে খেলেও তাই।'

এবার রুনা আপা একেবারে ক্ষেপে গেল, 'চুপ থাক! বাউণ্ডুলে অসভ্য এট্টা। সারা দিন সিগারেট আর কম্পিউটার। তুই কি করিস না করিস, কেউ বোঝে না ভাবিস? তোর দুলাভাই বাইরে মুখ দেখাতে পারে না তোর জন্য।'

কি আমার মুখ! দুলাভাই যেন মহাত্মা গান্ধী; যে কলিমের জন্য মুখ দেখাতে পারবে না। রুনা আপা মাসে মাসে যখন বাড়ি যায়, এই দুলাভাই-ই কাজের মেয়েটার সঙ্গে থাকে। এই দুলাভাই-ই অফিসে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে বার-তিনেক ধরা খেয়েছে। অফিসারদের ঘুষ দিয়ে পার পেয়েছে।

নিজে দুই হাতে ঘুষ খায়। চাকরি করে কাস্টমসে। দুলাভাই ঘুষ খাইতে না চাইলেও, ঘুষ দৌড়ায়ে দৌড়ায়ে দুলাভাইয়ের বাসায় আসে।

সেই দুলাভাই নাকি কলিমের জন্য মুখ দেখাতে পারে না!

মেজাজটা খিচড়ে গেল। মুখটা মুছে কম্পিউটারের সামনে এসে বসে পড়ল কলিম। বিছানার পাশেই কম্পিউটার টেবিল। চেয়ারটার একটা পা একটু নড়ে গেছে। চাইলে দুলাভাইয়ের রিডিং রুম থেকে একটা চেয়ার আনা যায়। তাতে আবার ঝামেলা। ওসব না ভেবে ফেসবুকে লগইন করে ফেলল।

ঢুকতেই মেজাজটা আরও খিচড়ে গেল। একগাদা নোটিফিকেশন আসছে, গোটা দশেক মেসেজ আর সাতটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। এত্তো নোটিফিকেশন যে কই থেকে আসে! যে যা করে সবকিছুর খবর জানতে হয় বাধ্য হয়ে।

ইনবক্সটা খুলে মেসেজগুলোয় চোখ বুলিয়েই উঠবে কলিম। আজ একটা ক্লাস করতে হবে। দেড়টায় ক্লাস। গত দিন-পনেরো হলো ভার্সিটি যায় না। আজ যেতেই হবে। লাবু আর মিল্টন আসবে। ক্লাস করাটা বাহানা। আসলে ওদের দারুণ একটা কাজ আছে।

ক্লাসে গেলে সোহানার দেখা পাওয়া যাবে। কাল সোহানার সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ যদি রাজি হয়ে যায়, তাহলে খেল খতম। লাবুরে কাল রাতে ফিট করে রাখছে। ওর বাসা ফাঁকাই আছে। ক্যামেরা-ট্যামেরাও সব ফিট। সোহানাকে ফিট করার দায়িত্ব কলিমের। বাকিটা ওর দুজন করবে।

আজ তাহলে আবার বড় একটা দাও মারা যাবে। শালার হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই। এ সময় সোহানার মতো একটা মেয়েকে লাবুর বাসায় নিতে পারলে নিশ্চিন্ত...

এখন অবশ্য একটু সাবধানে সবকিছু করতে হবে। পুলিশ নজর রেখেছে। অনিক-শায়লা মরার পর থেকে ঝামেলাটা শুরু হয়েছে। শালারা মরার আর সময় পেল না। ওদের মরার জন্য কলিমদের হাজতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে।

একটা ভাগ্য ভালো অবশ্য যে, পুলিশ এখনো লাবুর বাসা সম্পর্কে কিছু টের পায়নি। আর পুলিশকে খুব বেশি ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

মিল্টনের আব্বা সব ম্যানেজ করে ফেলেছেন। পুলিশের বড় কর্তাদের এমন ধাতানি দিয়েছেন যে, বাপ বাপ করে ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছে, আর ডিস্টার্ব করবে না।

ফলে সোহানার ফাইলটা যদি আজ হয়, ঝামেলা হবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং কিছু আমদানি শুরু হবে।

এমন সুন্দর একটা দিনের শুরু হলো কি না রুনা আপার ঝাড়ি খেয়ে। অবশ্য প্ল্যানটার কথা মনে হতেই ঝাড়ির জন্য যেটুকু মেজাজ খারাপ হয়েছিল, তা ঠিক হয়ে গেল। ইনবক্সের মেসেজগুলোতে দ্রুত চোখ বোলাতে শুরু করল। প্রথম মেসেজ কি একটা গ্রুপ থেকে, পরেরটা পাঠিয়েছে ইমন; ওর ফেসবুক ফ্রেন্ড।

ইমনটা শালা বলদ আছে। ভাবে ফেসবুকে কলিম যেমন ভদ্র-বিপ্লবী ভাব নিয়ে কথা বলে; আসলেও তাই। মেসেজ পাঠিয়েছে, 'ভাইয়া, আমরা পথশিশুদের জন্য কিছু একটা করতে চাই। আপনি কি আমাদের নিয়ে একটু লিখবেন?'

ঝটপট কলিম লিখে দিল, 'অবশ্যই করব। কেন করব না ভাইয়া। তোমাদের এ ধরনের যেকোনো উদ্যোগে আমাকে পাশে পাবে।'

পথশিশু! নিজেরা সব সময় আছে টাকার টানাটানিতে। লাবুর বাসা না থাকলে তো ছিনতাই করতে নামতে হতো। কলিম এর মধ্যে করবে পথশিশুদের জন্য কাজ! ফাউল কথার আর জায়গা পায় না।

পরের মেসেজটা... ও মাই গড! এটা কার মেসেজ?

বড় বড় করে লেখা : মেসেজ ফ্রম অনিক!

একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল কলিম। পরে বুঝল স্প্যাম। অনিকের দুই বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া অ্যাকাউন্ট থেকে আর মেসেজ আসে কী করে। নিজে নিজেই হেসে ফেলল। অনিক তো বিষ খেয়ে মরেছে; না, বিষ খেয়ে না, হারপিক খেয়ে মরেছে।

হারপিক খেয়ে মরা মানুষ কি মেসেজ দেয়!

তার পরও মেসেজটা খুলল কলিম। মেসেজে ইংরেজিতে লেখা : চেক ইওর মেইল। নিশ্চিত হলো, এটা স্প্যাম। তার পরও মেইলটা একটু চেক করতে হবে। অনিকের এই মেসেজের জন্য না। মিল্টন একটা লিংক পাঠানোর কথা। সেটা দেখতে হবে।

জি-মেইল খুলে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল কলিম। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। কাল রাতে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। এখন খালি পেটে ধোঁয়া সহ্য হচ্ছে না। কিছু খেতে হবে। মেইলটা চেক করে উঠবে।

ইনবক্সে শত শত মেসেজ। দ্রুত চোখ বোলাল। মিল্টন লিংক পাঠিয়েছে। খোলার জন্য কার্সর ঘোরানোর আগেই চোখে অনিকের মেসেজ। এবার শরীরটা একটু শির শির করে উঠল। আসলেই কি অনিক!

ধুর, এটাও স্প্যাম হবে। শালার অনিক তো ইচ্ছেমতো বাজে সাইটে ঘুরত। ওর অ্যাকাউন্টগুলো সব স্প্যামে ভরে গেছে। এখন অটোমেটেড মেইল আসছে। তার পরও মেইলটা খুলল।

এবং ভয়ে কেঁপে উঠল কলিম।

ইংরেজিতে লেখা নয়। অভ্রতে একেবারে পরিষ্কার বাংলা লেখা কয়েক লাইনের একটা মেইল।

'প্রিয় কলিম,

তোরা তিনজন আমার সঙ্গে যা করেছিস, তাতে তোদের আমি খুন করে যেতে পারলে অনেক ভালো হতো। আমি গাধা, তাই তোদের খুন না করে নিজে আত্মহত্যা করেছি। তোরা তিনজনই আমার সঙ্গে চিট করেছিস। চিট করা ক্ষমা করে দেওয়া যায়। কিন্তু শায়লাকে নিয়ে যা করেছিস, তা ক্ষমা করা যায় না।

তোদের ক্ষমা নেই। শায়লার কাণ্ডটা যে করেছিস, তার মরতেই হবে।

বাকি দুজন যদি বাঁচতে চাস, রাতে চন্দ্রিমা উদ্যানে চলে আয়।

দুজনকে ছেড়ে দেব। শুধু তোরা আমাকে বলে যাবি, শায়লার কাণ্ডটা কে করেছিস। তাকে রেখে যাবি।

অনিক।'

***

এখন প্রথম কাজ লাবুদের কাউকে ফোন করা।

কিন্তু ফোন করতে পারছে না কলিম। হাত-পা কাঁপছে। এখনো চেষ্টা করছে, মেইলটাকে অবিশ্বাস করার। কিন্তু চোখের সামনে এমন মেইল খোলা দেখে অবিশ্বাস করে কীভাবে?

তাহলে কি অনিকের মেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে? হ্যাক করবে কেন? হ্যাক করলেও সে কী করে এসব পুরনো কথা জানতে পারবে?

লাখ লাখ প্রশ্ন এখন কলিমের মাথায়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন– চন্দ্রিমা উদ্যানে কি যেতে হবে?

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কলিম। ফোন করতে হবে। মোবাইলটা কই?

তুহি মেরে মন্দির, তুহি দেবতা... এমন সময় এমন প্রেমের গান! মোবাইলের রিং টোনটা এর আগে কখনো এমন বিচ্ছিরি মনে হয়নি। ফোনটা কেটে দেবে বলেই হাতে নিয়েছিল। কিন্তু নামটা দেখে আরেকটু অবাক হলো– লাবু ফোন করেছে।

: কিরে শালা ফোন ধরস না কেন?

: আরে ফোনের গুল্লি মার। সকাল বেলায় যা হইছে।

: তোর আর কী হইছে? আমার কাছে তো এক মেইল আসছে...

কলিমের হাত-পা আসলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকল। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে মেইল করেছে?'

'অনিক। অনিক খান।'

৩

অনিক আর শায়লা সেই স্কুল লাইফ থেকে প্রেম করত। লাবু, কলিমরা জানত। ওরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। না জানার কারণ নেই।

স্কুলে অনিক, লাবু আর কলিমই ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড। বেস্ট ফ্রেন্ডের প্রেম হলে সবাই জানে। কলেজে উঠে ওদের আরেক বেস্ট ফ্রেন্ড হলো মিল্টন। মিল্টন ওদের চেয়ে অনেক বড়লোক।

কলেজে উঠতে উঠতে অনিকের সঙ্গে একটু কেমন দূরত্ব তৈরি হলো। অনিক পড়াশোনা ভালো করত, ছড়া লিখত, গাঁজা খেত না। কিন্তু লাবু আর কলিম দিব্যি গাঁজা ধরে ফেলল; মিল্টনের সঙ্গে। মিল্টন আরও অনেক কিছু ধরালো ওদের। সিডি ধরালো, বোতল ধরালো।

কলিমদেরও মনে হলো, এটাই লাইফ। ইউনিভার্সিটিতে উঠতে উঠতে লাইফটা আরও মজার হয়ে গেল। অনিক ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেল। শায়লাও পেল; পাবলিক অ্যাডে। কিন্তু কলিমরা কেউ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেল না।

মিল্টন আর লাবুর বাপের টাকা ছিল। প্রাইভেট ভার্সিটিতে ভর্তি হলো। কলিমের বাপের টাকা না থাকলেও দুলাভাইয়ের ঘুষের টাকা ছিল। সেও ওই ভার্সিটিতে ভর্তি হলো। ভার্সিটিতে ভর্তির পর আবারও মনে হলো– এটাই লাইফ। সব করা যায় এখানে। সব করা যায়।

কিন্তু ঝামেলা হলো, সবকিছু করতে অনেক অনেক টাকা লাগে। এত টাকা মিল্টনদের বাপও দেয় না, কলিমের দুলাভাইও না। শালার ঘুষ খাওয়া টাকা; তার পরও টাকা বের করতে জান বেরিয়ে যায়। তাহলে টাকার উপায়?

উপায় হয়ে গেল লাবুর বাসা। লাবুর বাপ-মা থাকে কানাডা; বড় আপার কাছে। ধানমণ্ডিতে বিশাল ফ্ল্যাটে লাবু একা থাকে। একটা কাজের বুয়া কাজ করে দিয়ে যায়। বাকি সময় এই ফ্ল্যাট হয়ে ওঠে কলিমদের অভয়ারণ্য। অরণ্য শুধু শুধু পড়ে থেকে লাভ নেই।

মিল্টনই বুদ্ধিটা দিল। এই ফাঁকা অরণ্যকে কাজে লাগাতে হবে। এখান থেকে আয় হবে।

কীভাবে?

মিল্টনের মাথায় অসাধারণ সব বুদ্ধি। কলিমরা প্রেম করতে শুরু করে দিল। ঠিক প্রেম না, ভালোবাসাবাসি। ঢাকা শহরে সুন্দর চেহারার তিনটে ছেলের ভালোবাসাবাসি করতে খুব সময় লাগে না। ভালোবাসাবাসির জায়গা হলো এই ফ্ল্যাট।

ফ্ল্যাটের একটা রুমে তিনটে ক্যামেরা লাগানো হলো। তিনটে ক্যামেরা পুরো রুমটা কাভার করে। আরেকটা ক্যামেরা বসল বাথরুমে। আজকাল দারুণ সব হিডেন ক্যাম পাওয়া যায়। মেয়েটার অনুমান করারও উপায় থাকে না। চারটে ক্যামেরা চলছে তাদের অনুসরণ করে।

ভালোবাসাবাসি শেষ হয়। কম্পিউটার হার্ডডিস্কে জমা হয় ভিডিও ক্লিপ। মিল্টনই কোত্থেকে সলিম নামের এক লোককে ধরে নিয়ে এলো। মোটা টাকায় ক্লিপ কিনে নিয়ে যায় সলিম। অনেক অনেক টাকা আসে।

ভালোবাসাবাসির এই ব্যবসায় কলিমরা তখন দারুণ সুখে আছে। তখন ওদের বারবার মনে হতো– এটাই লাইফ। বিশেষ করে অনিক যখন বছর-তিনেক পর হঠাৎ এক দিন উদয় হলো, তার ভাঙাচোরা চেহারা দেখে কলিমরা বুঝতে পারল, ওরাই অনেক ভালো আছে।

অনিক রীতিমতো হাত পাতল ওদের কাছে, 'দোস্ত, তোরা তো ভালোই আছিস। আমার একটা উপায় করে দে?'

কলিম হাসি চেপে বলেছিল, 'তোর আবার কী সমস্যা? তুই তো পড়াশোনা করিস, ছড়া লিখিস।'

'ঝামেলায় পড়ছি রে দোস্ত। শায়লারে নিয়ে ঝামেলা।'

'শায়লারে নিয়ে কীসের ঝামেলা?'

'ওর বিয়ে দিয়ে দিতে চায়?'

'তুই বিয়ে কর।'

'ধুর শালা। এখন বিয়ে করে খাওয়াব কী? আপাতত ওকে বাসা থেকে বের করে আনা দরকার।'

'মানে কী! তুলে আনতে হবে? আমরা এসবের মধ্যে নেই'– লাবু আঁতকে উঠেছিল। যেন পাপকাজের কথাও শোনেনি কোনো দিন।

'আরে নাহ। তুলে আনতে হবে না। ও নিজেই আসতে পারবে। ওর থাকার একটা জায়গা দরকার।'

প্রথমটা হ্যাঁ-না কিছু বলেনি লাবুরা। পরে মিল্টন ফোন করেছিল কলিমকে, 'লাবুর ফ্ল্যাটে অনিকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলে কেমন হয়?'

'ধুর ব্যাটা। তাইলে আমাগো তো ব্যবসা বন্ধ। আর লাবু থাকবে কই?'

'কেডা কইল ব্যবসা বন্ধ। লাবু থাকবে আমার বাসায়। আর ব্যবসা বন্ধ হবে না, স্থায়ী ব্যবসা হবে।'

'মানে!'

'শায়লা থাকলে অনিক আসবে না ওই ফ্ল্যাটে? অনিক আসলে ভিডিও হবে না? রোজ ভিডিও ক্লিপ হবে। রোজ ব্যবসা।'

'ক্লিপ নিবি কী করে?'

'ওরা দিনে একবারও বের হবে না? ওরা বের না হলে আমরা আড্ডা দিতে যাব বিকেলে ওই ফ্ল্যাটে। ওদের ববে ঘুরে আয়; কত আর বসে বসে বোর হবি। হো হো হো...'

মিল্টনটার মাথায় জিনিস আছে।

দারুণ জমে উঠেছিল ব্যবসা। সব্বনাশটা ওই অনিকই করল। এক দিন হঠাৎ কী করে একটা ক্যামেরা আবিষ্কার করে ফেলল। তারপর কী চিৎকার-চেঁচামেচি। বলে, 'তোগো নামে আমি পুলিশে মামলা করব। র‍্যাবের কাছে যাব।'

লাবু সেয়ানা মাল। দ্রুত পরিস্থিতি ম্যানেজ করল, 'দ্যাখ দোস্ত তোগো ভিডিও হইছে, এটা মানি। কিন্তু তোগো নিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছে আমাদের নেই। তোরা এখন পুলিশের কাছে গেলে বরং ভিডিওগুলো মার্কেটে চলে আসবে।'

এটা হুমকি ছিল নাকি ভালো কথা; তা অবশ্য পরিষ্কার না। তবে যাই হোক, তাতে কাজ হলো। অনিক চুপ মেরে গেল। শায়লাকে শুধু ওর বাসায় দিয়ে এলো। বোঝা গেল, ওদের সম্পর্ক এখানেই শেষ। ঝামেলাটাও এখানে শেষ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শালার শায়লাই এক দিন টেসে গেল। নিজের বাসায় বিষ খেয়ে মরল।

ফাঁকা বাসা ছিল। বাবা-মা নাকি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। সে সময় শায়লা বিষ খেল। আর পুলিশ পোস্টমর্টেম করে বলল, এটা খুন।

তাও ভালো যে লাবুদের বাসায় ঘটনাটা হয়নি। ফলে ওরা এই বড় ঝামেলায় আর পড়েনি। আবারও হাফ ছেড়ে বেঁচেছিল কলিমরা। কিন্তু কদিন পর অনিকও বিষ খেল, বিষ নয় হারপিক। শালারা পাল্লা দিয়ে সুইসাইড করল যেন।

তাও ভালো অনিকও নিজের বাসায় নিজের বাসায় মরল। আর

মরার আগে কী এক নোট লিখে গেল। সেই নোট নিয়ে পুলিশ ওদের অ্যারেস্টও করল। অ্যারেস্ট করে রিমান্ডে নিল।

বারবার শুধু প্রশ্ন করে শায়লাকে কে খুন করেছে?

আরে বাবা। শায়লাকে খুন করার ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই করা যেত। ওরা কেন শায়লাকে খুন করতে যাবে?

এখন আবার সেই প্রশ্নটা উঠল– শায়লাকে কে খুন করেছে?

৪

'তার আমি কী জানি? শায়লাকে খুন করলে তোরা দুজনের একজন করেছিস?'

চন্দ্রিমা উদ্যানে এসে ওদের মধ্যে এখন কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। উদ্যানের মধ্যে এসে তিনজনই মাজারের পেছন দিকটায় বসে আছে। লাবুকে পাঠানো মেইলটায় এখানে থাকতে বলেছিল অনিক।

কলিম আর লাবু ফোনেই ঠিক করেছে– ওরা যাবে। ওরা যেহেতু খুন করেনি, অনিক ওদের কিছু বলবে না। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মিল্টনও একই কথা বলল, 'আমি যাব। আমি তো খুন করিনি। অনিক মারলে তোদের মারবে।'

সারা দিনে ওদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, অনিক বুঝি বেঁচেই আছে। বেঁচে আছে এবং ওদের মধ্যে যে খুনি তাকে মারবেই। এটা বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে ওরা। খুনিকে একজন ভূত এসে মেরে যাবে– ব্যাপারটায় আর তেমন বিস্ময়কর কিছু পাচ্ছে না কলিমরা।

মাজারের পেছন দিকটায় তখন ঘন কালো অন্ধকার। মানুষের মুখ দেখা যায় না। সঙ্গে প্রথম শীতের কুয়াশা এসে অন্ধকারটা আরও গাঢ় করে দিয়েছে। ওরা তিনজন বসে বসে তর্ক করছে আর অনিকের জন্য অপেক্ষা করছে।

কলিমের সন্দেহ খুনটা মিল্টনই করেছে। তাই বলে উঠল, 'শোন মিল্টন, তুই শায়লার সঙ্গে ওই ঘটনার পরও দেখা করেছিস, তা আমরা জানি।'

'ওই শালার ভাই। দেখা তোরা করিসনি? এখন নাটক করে লাভ নেই। তিনজনই তো আলাদা আলাদা করে দেখা করেছি। একই কথা বলেছি– আমাদের সঙ্গে লাবুর ফ্ল্যাটে একবার না গেলে ভিডিও ফাঁস করে দেব।'

কলিম চুপ। লাবু কথা বলে উঠল, 'কিন্তু আমি তো খুন করিনি।'

মিল্টন ক্ষেপে গেছে, 'তাহলে আমি করেছি!'

কলিম বিড়বিড় করে বলল, 'করতে পারিস। কারণ, শায়লা তোর সঙ্গে আবার লাবুর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল।'

'তুই দেখছিস। বানায়ে বানায়ে বলিস কেন?'

'মিল্টন। মোশন সেন্সর দেওয়া ক্যামেরা এটা ভুলে গেলি কেন? সব ভিডিও হইছে। আমরা জানি, শায়লা তোর সঙ্গে আবার ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিল।'

মিল্টন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ঝিম ধরা ভঙ্গিতে বসে থেকে বলে উঠল, 'আমার ভিডিওটা অনিকও দেখছে?'

'দেখছে।'

আবার খানিকক্ষণ সবাই চুপ। মিল্টনই বলে উঠল, 'আমার কী মনে হয় জানিস? অনিক শালাই শায়লারে মারছে।'

চমকে উঠল কলিমরা। কেউ কিছু কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু কথায় পেয়েছে মিল্টনকে। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, 'আমরা তো অনিকের লাশ দেখিনি। এমনকি হতে পারে না যে, অনিক মরেই নাই। আসলে পুলিশের সঙ্গে মিশে ওই আমাদের ফাঁসাচ্ছে।'

লাবু বলে উঠল, 'না, তা কী করে হবে? পত্রিকায় লাশের ছবি ছাপা হইছে।'

মিল্টন তর্ক করেই যাচ্ছে, 'সে তো সাজানোই হতে পারে। পুলিশের সাজানো। আমার মনে হয়, অনিক মরে নাই।'

কলিম আর সহ্য করতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'আরে শালার ফাউল। এক কথা বারবার বলে। বলছি, অনিক মরছে। আমি নিজে গলা টিপে মেরে ওর মুখে হারপিক ঢেলে দিয়ে আসছি।'

কলিমের কথাগুলোর প্রতিশব্দ মেলাল না। তার আগেই মাজারের পেছনের একঝাঁক লাইট জ্বলে উঠল। কুয়াশাঘেরা সেই ফ্লাশ লাইটের আলোয় কলিমরা দেখতে পেল সাত-আটজন পুলিশ ঘিরে ধরেছে ওদের।

৫

: দেখলেন স্যার, রিমান্ডে যা হয়নি; ওদের তর্ক করতে দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে।

: দেখলাম। বিশ্বাসই হচ্ছে না। অনিক ছেলেটা আসলে নিজেই শায়লাকে খুন করেছিল?

: হ্যাঁ স্যার। সেটা আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল।

: কিন্তু অনিক নিজেও যে খুন হয়েছে, তা তো তুমি বলোনি।

: প্রথমে বুঝতে পারিনি। ওর পেটেও হারপিক পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবত শেষ মুহূর্তে ঢোক গিলে ফেলেছিল। পরে আবার পোস্টমর্টেম হয়েছে। তখন দেখা গেছে ঘাড়ের হাড় ভাঙা।

: কিন্তু তুমি অনুমান করলে কীভাবে যে, এরা কেউ জড়িত?

: ওই যে স্যার ফ্রেন্ডস শব্দটা দিয়ে?

: আবার হেঁয়ালি করে! ফ্রেন্ডসে কী বোঝা গেল?

: স্যার আপনি তো ফেসবুক-টুক ইউস করেন না। আসলে ফেসবুকে বন্ধুদের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একটা তালিকা করা যায়। অনিক সেই তালিকা করেছিল সম্প্রতি। তার প্রোফাইলে সেই তালিকায় চারজনের নাম ছিল– কলিম, লাবু, মিল্টন আর শায়লা।

: ওরে বাবারে বাবা! এ তো জটিল ব্যাপার।

: আচ্ছা, ওদের এখানে আনলে কী করে, তাও তো বললে না।

: বলা কি ঠিক হবে স্যার?

: বলো, বলো।

: আসলে আমার এক বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিলাম। ছেলেটা হ্যাকার। ওকে দিয়ে অনিকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করিয়ে সেখান থেকে মেইল পাঠিয়ে ডেকেছি এদের।

: কী সর্বনাশ। তোমার ওই বন্ধু তো ক্রিমিনাল।

: এই যে স্যার। বলেই ভুল করলাম।

: আচ্ছা থাক। আমি ভুলে যাচ্ছি তার কথা। এখন তাহলে কাল থেকে ডিউটি জয়েন করো। ভালো কাজ করেছো। থ্যাংকস। এখন আমি দেখি এই উৎপাত কীভাবে সামলানো যায়।

: স্যার, আমার আরেকটা কথা ছিল।

: আবার কী?

: ওই যে নূপুরের মোবাইলটা যদি ওকে ফেরত দিতেন। একটু কথা বলতাম...

: ইন্সপেক্টর আপন তারিক! তোমাকে আমি রিমান্ডে নিয়ে ডলা দেব। ফাজিলের ফাজিল। আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাও! গেট লস্ট।

: স্যার, এখানে গেট তো নেই।

: এই ফরিদ, ফরিদ। এদিকে আসেন তো। এই আপনকে ধরে নিয়ে যান...

: ধরতে হবে না স্যার। যাচ্ছি। নূপুরের ব্যাপারটা একটু দেখবেন...

আহমেদ খান হীরক

সান্ধ্যমেঘের ভেতর

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

মিখাইলকে এখানে জবাই করা হয়েছে।

জবাইয়ের আগে বা পরে, কোনো এক সময়, তার বুকে এবং পেটে, গেঁথে দেয়া হয়েছে, কয়েকটি বুলেট। চোখের দেখায় এরচেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না।

আমরা যারা মিখাইলকে চিনি না, তারা সবাই, এখানে, এই রক্ত আর ধুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে, ধুলোর ভেতর রক্তের মুখ থুবড়ে থাকার স্তব্ধতার মধ্যে, মিখাইলকে খোঁজার চেষ্টা করি। এবং আদতে কী, আমরা সবাই জানি যে এটা আসলে নিতান্তই এক ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু আমাকে, এবং আমার মতো সংবাদ বলা আরও অন্য লোকগুলোকে, এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের শূন্যের ভেতরেই, প্রয়োজনে, মিখাইলকে খুঁজতে হবে।

আমরা আগেও এরকম চেষ্টা করেছি, এবং আমরা এখনো, চেষ্টাটা করে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ, এর বাইরে কী করতে হয় আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি, মিখাইলকে এখানে জবাই করা হয়েছে। এবং যেহেতু এখানে এখনো কিছু রক্ত ধুলোর সাথে জমে আছে, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যে-মিখাইলকে জবাই করা হয়েছে, তার শরীরে, অদ্ভুতভাবে, রক্তের উপস্থিতি ছিল। এই আবিষ্কার আমাদের শিহরিত করে। কেউ কেউ ফিসফাসও করে, বিস্ময় গোপন রাখতে পারে না, বলে ফেলে এত রক্তও আছিল তাইলে?

রোধ হওয়া রক্তের মধ্যেই পুলিশ তাদের হলুদ রঙের ফিতা দিয়ে জায়গাটা ঘিরে রাখার উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছে। এবং ইতিমধ্যেই মতিহার তাকিয়ে থাকাও শুরু করেছে আমার দিকে। তার চোখের ভেতর একটা অশালীন ইশারা। আমি বুঝতে পারি আমাকে কী করতে হবে। কিন্তু এতটুকু নড়তেও ইচ্ছা করে না আমার। ইচ্ছা করে না পুলিশের কাছে গিয়ে, তাদের যে কাউকে একটা বিধবা ব্যানসন সেধে, ভেতরের কিছু গল্প হাতিয়ে নিতে। আদতে আমার কখনোই কিছু হাতিয়ে নিতে ইচ্ছা করেনি। আর এ ব্যাপারে আমাকে প্রথম সচেতন (সচেতনই হবে যে শব্দটা তা নিয়ে আমার এখনো যথেষ্ট সন্দেহ আছে) করেছিল অরুন্ধুতি!

অরুন্ধুতি সুন্দর ছিলেন বা এখনো হয়তো সুন্দরই আছেন। তার চুল অরুন্ধুতি রায়ের মতো ঝাঁকড়া হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে অরুণই ডাকতাম। মানে যখন যখন ডাকার সুযোগ পেতাম আরকি। আর আমার এ ডাক শুনে অরুন্ধুতি খিলখিল করে হাসতেন। অরুণ হাসলে গ্লাসে মার্বেল ফেলার মতো ঝনঝন আওয়াজ হতো; এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এখনো তেমন আওয়াজই হয়। আমি ওই আওয়াজ শুনে হয়ে যেতাম বধিরের মতো। অনেকক্ষণই শুনতে পেতাম না কিছু। অথচ অরুণ আমাকে দেখলেই হাসতেন। অবশ্য কোনোদিন জিজ্ঞেস করি নাই এ হাসির কারণ কী! তবে মাঝেমধ্যে মনে হতো জিজ্ঞেস করলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি তো নাই!

তো, আমার এ ধরনের দ্বিধাবস্থাকে অরুণ বুঝে ফেলতেন বলেই আমার ধারণা। ফলে তিনি আরও হাসতেন এবং বলতেন, তুমি তো একটা বেকুব কিসিমের আদমি! তুমি তোমার জীবন আটকায়া রাখছো দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের দেয়ালের ভেতর! এই রকম একটা পাখির গল্প শুনছিলাম আমি!

আমি তখন, অভ্যাসবশতই, গল্প শোনায় আগ্রহী হয়ে উঠতাম। আর অরুণ, হঠাৎই গম্ভীর হয়ে বলতেন, তুমি শালা একটা বালের সাংবাদিক... গল্পের জইন্য এমন ছোকছোক করো ক্যান?

আমি বলতাম, শুনতে ভাল্লাগে। ছোটকালে নানা গল্প শুনাইতেন! কত যে গল্প। একটা গল্প ছিল টিপটিপার ভয়... একটা বাঘ ছিল ওই গল্পে! বাঘটা ভরসন্ধ্যায় মুরগি চুরি করতে গেছিল এক গৃহস্থের বাড়িতে... গিয়া শোনে গৃহস্থ বলতেছে যে তার খুব ভয় লাগতেছে টিপটিপার... তো বাঘ ভাবে যে এই টিপটিপাটা আসলে কে? যে গ্রামে তার মতো ডোরাকাটা আছে সে গ্রামের মানুষ অন্য কিছুতে ভয় পায় ক্যামনে? তারপর থেইকা বাঘও টিপটিপার ভয় পাইতে লাগল। আর বাঘের দেখাদেখি আর যত সাপখোপ বেজি শিয়াল ছিল সবাই... সবাই খালি বলতে লাগল খুব ভয় করতেছে... টিপটিপার ভয় করতেছে... ! এইটা একটা ভয়ের গল্প!

শুনে ঠোঁট উল্টিয়ে অরুণ বলেন, বালের গল্প! গল্পটারে ঠিক কইরা বলবার ক্ষমতাও তোমার নাই... টিপটিপা কী ছিল আসলে জানো তুমি?

আমি মনে করার চেষ্টা করি নানা আসলে টিপটিপা বিষয়ে কী বলেছিল; কিন্তু আমার মনে পড়ে না। অরুণ ফুঁ বলে সিগারেট ধরান। টানেন। আমি অপেক্ষা করি উনি বলবেন টিপটিপা আসলে কী ছিল... কিন্তু উনি তা বলেন না। উনি বলেন, না তুমি সাংবাদিক হইতে পারছ, না তুমি লেখক হইতে পারবা। তোমার কিচ্ছু হইব না জীবনে!

পরে দেখলাম সত্যি, আমার জীবনে সত্যিই কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তারপরও আমি আমার কিছু-না-হওয়া জীবন নিয়েই অরুণের কাছে যেতাম। অরুণ যখন যখন ডাকতেন। বেশির ভাগ সময়েই ডাকতেন না অবশ্য। অরুণ গান গাইতেন এবং লুকিয়ে একটা বিয়ে করেছিলেন; ফলে তার জীবনে বিভক্ত ও ব্যস্ত থাকার মতো, অনেক জীবন ছিল। তবে মাঝেমধ্যে মানুষ একটা জীবন থেকে অন্য জীবনে যেতে পছন্দ করে বলেই হয়তো তিনি আমাকে নিয়ে কখনো কখনো সিনেমা দেখতে যেতেন এবং পপকর্ন চিবাতে চিবাতে আফসোস করতেন যে আমার মতন বেহুদা মানুষ তিনি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। আর আমি তখন থ্রিডি চশমা চোখে সিনেমা দেখাতেই থাকতাম ব্যস্ত। উনি আমাকে মাঝেমধ্যে চড়-চাপড়ও দিতেন। আমি 'মাইরেন না' বললে উনি জোরে জোরে হাসতেন আর পেছনের দর্শকেরা বিরক্ত হয়ে পাশের জনকে ফিসফিস করলে উনি ধমক দিয়ে বলতেন আমাকে আর আপনি বলবা না, বুঝলা?

কিন্তু আমার আপনিতেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের অফিসের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অরুন্ধুতি আসছিলেন এবং নদী আপন বেগে পাগলপারা গেয়ে সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। অথবা সবাইকে না, করেছিলেন কেবল আমাকেই। অনুষ্ঠান শেষে কাটা কেকের একটা টুকরা অরুন্ধুতিকে দিতে দিতে বলেছিলাম, আপনি খুবই সুন্দর গাইছেন! এই গানটা আমার ফেবারিট। আম্মা গাইতেন। আব্বা বাঁইচা থাকা-কালীন সময়ে!

অরুন্ধুতি বলেছিলেন, শুধু গান সুন্দর গাইছি, না আমিও সুন্দর? আপনে তো দেখি এখনো আমার বগলের দিকে তাকায়ে আছেন!

আমি আর কিছু বলতে না পারায় অরুন্ধুতি ঠাঠা করে হেসে উঠেছিলেন। আর ওনার সাথে যে তবলা বজিয়েছিল তাকে বলেছিলেন, দেখ, পাগল পারা নদীর তোড়ে উনার জোড়াসাঁকো কেমন ভাইঙা পড়তেছে!

আমি তখন আধো হাসির একটা ভাব ধরে তাকিয়ে ছিলাম। আর অরুন্ধুতি ঘাড়খানা বাঁকিয়ে বলেছিল, শোনেন স্টেজে যে আমি গাই আর এই খানে যে আমি দাঁড়ায়া দুইটা দুই মানুষ... দুইটার দুই ভাব, দুই গল্প!

তো এটা আমার ভেতরে সেদিন খুব শক্ত হয়ে ঢুকে যায় যে একই ব্যক্তির আসলে অনেক মঞ্চ থাকতে পারে, এবং একেক মঞ্চের থাকে একেক রকমের গল্প। কোনো গল্পে সে বাঘ হয়, কোনো গল্পে গৃহস্থ... আর কোনো গল্পে বোধহয় হয় টিপটিপা। কিন্তু টিপটিপাটা যে কী সেইটা আমি অনেক পরেও ধরতে পারি না। নানা এ বিষয়ে কিছু বলেছিল কি না সেটাও পারি না মনে করতে।

আর এসব মনে হওয়ার ভেতর দিয়েই অরুণের সাথে আমারও একটা গল্প তৈরি হতে থাকে। সেদিন, বিস্ময় জাগিয়ে, অরুণ আমাকে তার ফেসবুকে অ্যাড করে নেয়। পাঁচ হাজার বন্ধুর ভেতর আমিও এক শ্বাসরোধী অবস্থান তৈরি করে নিই তার বন্ধুলিস্টে। তার বানানো গানের ভিডিওগুলোতে লাইক দিই দিনের পর দিন। তার ছবি দেখি যে তিনি সুন্দর। বড় বড় ছলছলে চোখ আর এক টুকরো অশ্লীলতা মাখানো মাদকীয় ঠোঁট। স্লিভ ছাড়া ব্লাউজ ও

বাহুমূলের আছড়ে পড়া ভাঁজ। আর এসবের মধ্যেই একদিন, সন্ধ্যায়, তিনি আমাকে ডেকে ফেলেন তারই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। কিছু গান ও বেশ কিছু পান হওয়ার পর, অনেকে বিদায় নিলে, এবং একটা সময় শুধু আমরা দুজনে বাকি থাকলে, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি হাবলু হইলেও দেখতে খুব সুন্দর আছো। শরীরটাও ঠিক আছে। জিম-টিম করো নাকি?

আমার কণ্ঠ বুঁজে আসতে শুরু করে ততক্ষণে। কিন্তু তার মধ্যেই আমি জানাই যে ছোটবেলায় মাইলের পর মাইল সাঁতরানোর জন্য শরীরটা এমন হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এখন তো একটু ভুঁড়িও আছে আসলে ...

অরুণ জিভ বের করে হেসে দিয়ে বলে, ওইটুক ভুঁড়িতে আমার অসুবিধা নাই!

রুফটপ থাকায়, আকাশে মেঘলা মেঘলা চাঁদ থাকায়, অথবা পেটের ভেতর হুইস্কি থাকায়, নাকি এমনিতেই কে জানে, আমার ভেতরও তৈরি হয় একটা অদ্ভুত অনুভূতি; এবং আমিও অরুণকে একেবারে জাপটে ধরে ঝটকায় বলে ফেলি, ভালোবাসি। আপনারে খুব ভালোবাসি!

অরুণ উদগ্রীব ছিলেন তখন। চাহনিতে ছিল উষ্ণ চাহিদাও। কিন্তু আমার কথা শুনেই যেন আবেগের ইলাস্টিকটা ফটাস হয়ে যায়। ব্যবহারে বিদীর্ণ হওয়া অন্তর্বাসের মতো ম্লান হয়ে যায় তার চেহারা। এরপর অনেকটা মুখ ফস্কেই যেন বলেন, যাসসসসশালা!

আর বলার পরেই, আমাকে ছেড়ে, কিছুটা টলে, ছাদের অন্য একটা কোণায়, যেখানে রেলিংটা ভাঙা, সেখানে গিয়ে বসেন। আর মাঝেমধ্যে, ভাঙা রেলিঙের ভেতর মাথাটা বাড়িয়ে শূন্যে যাওয়ার চেষ্টাও করতে থাকেন। আমি তাকে ধরতে গেলে তিনি ঘুরে একটা ধমক দিয়ে বলেন, দূরে গিয়া মর!

দূরে আমি যাই, কিন্তু মরি না। তবে মরার এক অনুভূতি হতে থাকে আমার। ভেতরে টগবগ করে প্রস্রাব ফুটতে থাকে আমার কিন্তু কোথায় গেলে ভারমুক্তি ঘটবে বুঝতে পারি না। আমি দূর থেকে অরুণকে দেখতে থাকি ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর্মন জমে থাকে জলের ভেতর। আমি তার গতিধারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না। আমি স্বাভাবিক হতে চাই, কিন্তু পারি না।

ফলে, একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমাদের সময় কাটতে থাকে। এবং প্রায় ঘণ্টা খানেক পরও কোনো ঘটনা না ঘটলে শাড়ি ছড়িয়ে ছাদে শুয়ে থাকা অরুণকে কিছুই না বলে আমি রাস্তায় নেমে আসি। আর এসেই একটা ভাঙা ফুটপাতে নিজেকে মুক্ত করি। একরাশ ছলকানো প্রস্রাবের ভেতর আমার আর কিছুই মনে থাকে না। শুধু মনে হতে থাকে এই বিচ্ছুরণই সত্য... মনে হতে থাকে এই বিচ্ছুরণই পৃথিবী!

পরে অরুণ জানিয়েছিলেন তার বিয়ের কথা।

সিলেটে এক প্রোগ্রামে গান গাইতে গিয়ে তার স্বামীর সাথে পরিচয় হয়েছিল অরুণের। পরিচয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই তারা গোপনে বিয়ে করে নিয়েছিলেন। এবং সিলেটের সমস্ত চা-বাগানকে বিধ্বস্ত করে নিজেদের মধুচন্দ্রিমা উদযাপন করেছিলেন। স্বামীটিকে তিনি পছন্দ করেন কারণ স্বামীটি তাকে ভালোবাসেন না।

ভালোবাসার মতো ফ্যাকড়ার জিনিস আর নাই দুনিয়াতে। ভালোবাসা ভালোবাসেন না অরুণ। আমার হাত ধরে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমার সাথে শুইতে চাইছিলাম, তোমার সাঁতার না ভাতার কী যে দেওয়া শরীর এইটা... এইটা আমার ভাল্লাগছিল... কিন্তু তুমি তো আমারে ভালোবাইসা ফেলছো মিয়া! তোমার সাথে এখন আমি ক্যামনে শুই? শোনো বাল, ভালোবাসা নিয়া শোয়ার মতন বেকায়দার জিনিস আর নাই!

আমার ভেতর আফসোসের আর শেষ ছিল না!

ছিল নিজের জন্য আফসোস, আর অরুণের স্বামীটির জন্য ঈর্ষা। অথচ এত ঈর্ষার ভেতরও বুঝতে পারতাম লোকটাকে আমি ভালোবেসে ফেলছি। কী দারুণ একটা মানুষ!

একটা মানুষ... যে ভালোবাসে না কাউকে!

বা কাউকে হয়তো বাসে। কিন্তু যাকে পায় তাকে ভালোবাসে না!

পরে, আমি কতবার, অরুণকে জানিয়েছি আমি তাকে আর ভালোবাসি না একটুও! সব ভালোবাসা পুরনো দাম্পত্যের ন্যাকড়ার মতো দলা পাকিয়ে ভেসে গেছে নর্দমায়। আমি তাকে এখন সেদিনের মতো চাই! যেহেতু আমি তাকে আর ভালোবাসি না!

অরুণ তখন লম্বা শুয়ে থাকেন বাসার ডিভানে। ঝাঁকড়া চুলগুলোর মতোই তার হাত-পাগুলো ছড়িয়ে থাকে চারপাশে। আমি নানার গল্পের সেই বাঘের মতো ধীরে ধীরে গৃহস্থের বাড়ির দিকে যাই। কিন্তু গৃহস্থ বলে, ভয়... টিপটিপার বড় ভয়...

আর অরুণ হাসেন খিলখিল করে। মাথা নাড়ান। বলেন, চোখ দেখছো মিয়া তোমার? তুমি আমার দিকে তাকাইলেই একশখানা গোলাপ ফুইটা যায় ফটাস ফটাস কইরা। আর বলে যে সে নাকি ভালোবাসে না!

আমি অরুণের হাত ধরতে চাই। বলতে চাই, এইগুলা ভুল... খুব ভুল! আমার চোখের সব গোলাপ ভুল!

কিন্তু অরুণ তারও আগে উঠে গিয়ে শিশুর মতো আমার গাল নেড়ে দিয়ে বলতে থাকেন তুমি একটা বাচ্চা। দুগ্ধপোষ্য!

তারপর অরুণ আরও হাসেন। কী যেন নিজে নিজে ভেবে আরও আরও বেশি বেশি হাসতে থাকেন। তারপর বলেন, ওই হিসাবে অবশ্য মিখাইলও দুগ্ধপোষ্য!

অরুণ নিজের বুকের ওপর হাত রাখেন আর হাসতেই থাকেন। হাসতেই থাকেন।

মিখাইল, যাকে আমি ঈর্ষা করি, অরুণের গোপন স্বামী।

কিন্তু আমার সন্দেহ হয় অরুণের স্বামী মিখাইল আর এই ধুলোরক্তের মিখাইল হয়তো এক না! এবং এ মনে হওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি আমি দিতে পারি না; অথচ মনে না-হওয়ার পেছনেও আমার পক্ষে তেমন কোনো যুক্তি দাঁড়িয়ে পড়ে না।

অথচ ওদিকে মতিহার দাঁড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত, মতিহার, এরই মধ্যে থানা হয়ে গেছে এক। তাকে ঘিরে কয়েকটা পুলিশ। আর মতিহার, তার প্যাকেট থেকে, দেদারসে সিগারেট বিলিয়ে বিলিয়ে হেসে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি মতিহার এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে, যেদিকে যাওয়া উচিত আমাদের সবার। ফলে, আমি ফোন দিই। ওপ্রান্তে অরুণ বলেন, ভেজাল কইরো না রবীন্দ্রনাথ্ আমি কামের ভেতর আছি!

আমি বলি, আপনার গোপন কি ঢাকায় ফিরছেন?

অরুণ হাপাতে থাকেন কিছুক্ষণ। থরোথরো কাঁপে তার কণ্ঠ।

আমি বলি, আপনার স্বামী কি ঢাকায় আসছেন এই সবের মধ্যে?

তখন একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন হতে থাকে বিজবিজ। তারপর বড় বড় শ্বাস ফেলে অরুণ বলে, হারামিটার আসার কথা ছিল গেল সপ্তায়। আসে নাই। তিন দিন থেইকা ফোনও বন্ধ! যন্ত্রের আওয়াজ পাইতেছ না? রাখো ফোন, শেষ করতে দাও!

আমি বলি, শোনেন শোনেন... আচ্ছা মিখাইলের শরীলে কি রক্ত ছিল? লাল?

অরুণ বলেন, রাখ শুয়োরের বাচ্চা!

অরুণ গোঙাতে থাকে ওপ্রান্তে; আমি ধুলোর ভেতরে থাকা রক্তগুলোকে দেখতে থাকি। রক্তের কালচে হয়ে আসছে। আর ধীরে ধীরে তাদের চিহ্ন ধুলিস্নাত করছে ধুলোগুলো। আমার মনে হয় এগুলো হয়তো অরুণের গোপন স্বামীর রক্ত। গত

সপ্তাহে মিখাইলের আসার কথা ছিল ঢাকা। চা-বাগানের চাকরির ছুটি নিয়ে। এসে অরুণকে নিয়ে একটা সপ্তাহে গাজিপুরের কোনো রিসোর্টে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। কোন রিসোর্ট তা বলে নাই অরুণ। হতে পারে গত সপ্তাহ না এসে মিখাইল গত রাতে এসেছিল। এসে এখানে জবাই হয়েছিল। শরীরে রক্ত না থাকলে জবাই হওয়া এত সহজ বিষয় না!

কিন্তু মিখাইল কেন জবাই হয়েছিল এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় মতিহার। থানা হয়ে ওঠার পর তার হাসির স্থায়িত্ব বেড়েছে অনেক। এবং এই স্থায়ী হাসির সাথে গতরাতের খাবারের কণা দুর্গন্ধ হয়ে আমার শ্বাসের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে বাধাহীন। মতিহার বিশেষ ষড়যন্ত্র করছে এমনভাবে প্রায় আমার মুখের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে মিখাইলকে নিয়ে বলতে থাকে। যে মিখাইল অরুন্ধুতির গোপন স্বামী হতে পারে, নাও পারে। যে মিখাইলের শরীরে রক্ত থাকায় ধুলোর রাস্তায় জবাই হয়ে গেছে সেই মিখাইলের জন্ম পর্যন্ত এখন জানে মতিহার। অন্তত সে মনে করে সে জানে। ফলে বমি ওল্টানো দুর্গন্ধকে পাকস্থলিতে চালান করতে করতে মিখাইল আমাদের জীবনে নতুনভাবে ধরা দিতে থাকে। যে মিখাইল পুরান ঢাকায় বেড়ে ওঠে এবং বুড়িগঙ্গা যার বুকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর বুড়িগঙ্গার মতোই ধীরে ধীরে, মিখাইল দূষিত এবং কেবলই দূষিত হতে থাকে। ওপর থেকে, আসলে যেকোনো দিক থেকেই, বুড়িগঙ্গাকে যেমন আর নদী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, তার ভেতর নামলে যেমন শুধুই দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ, আর বিস্মৃতি, যদি মিখাইলের ভেতরও কেউ ঢুকতে পারত, তাহলে তাদেরও ওই একই রকম অনুভূতি হতো। হতো কারণ মিখাইল তার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিল ঢাকাইয়া প্রেতদের সাথে। প্রেত, যাদের আলোর একটা যাপন হয়তো ছিল, কিন্তু জীবন ছিল একান্তই অন্ধকারের। তারা নিজেদের মাফিয়া বলতো হয়তো, বলতো আন্ডারওয়ার্ল্ড কিংবা এমনই কোনো বাহারি নাম। কিন্তু বস্তুত তারা নিজেদের ভালোবাসতো প্রেত হিসেবে। আর তাদের ভালোবাসতো মিখাইল। পনের বছর বয়সেই মিখাইল স্কুলের হেড স্যারের পেটে নেইলকাটার ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। হেড স্যার তাতে মারা যায়নি ঠিকই, কিন্তু মিখাইলের স্কুল ও পড়ালেখা, চিরদিনের জন্য সেখানেই, মরা নখের মতো, ঝরে পড়েছিল।

তাতে অবশ্য মিখাইলের তেমন কোনো নিরানন্দ হয় না। বরং সে এক নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারে। যে জীবনের রং কালো হতে পারে; কিন্তু কে না জানে কালো সব সময় শোকের তো হয় না।

কালো হয় ক্ষমতারও।

মিখাইল প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমতা আর ক্ষমতা হয়ে ওঠে। এবং আঠারো যে একটা দুঃসহ বয়স যা সুকান্ত বলে গেছে কখনো জানেই না মিখাইল, অদ্ভুতভাবে সে বয়সেই প্রথম খুনটা সে করে। ক'রে, জেলে যায়, আর তিন বছর পর ফিরে আসে। ফিরে এসেই চলে যায় চিল্লায়। এবং সেখান থেকে ফিরে পুরান ঢাকার গলিতে একটা শরবতের দোকান দিয়ে বসে। এবং সবাই মনে করে যে মিখাইল ভালো হয়ে গেছে। কারণ তাকে আর প্রেতদের সাথে দেখা যেত না তখন। রাত ৮টার পর ভালোমানুষ বাড়িতে চলে যেত এবং ঘুমাত কবুতরের সাথে। কবুতর যে আসলে শান্তি এ ব্যাপারে মিখাইল নিশ্চয় জেনেছিল। চিলেকোঠায় শুক্রবারের বিকেলে সে ওড়াতো গিরিবাজ।

কবুতর ওড়ানোর জন্য হোক বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক না কেন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মিখাইলের শরবতের দোকান ঢাকায় আসা ভাসমান জনস্রোতের চাইতেও ফুলেফেঁপে উঠেছিল; আর তাতেই মিখাইল শরবতকে ঢাকার বাইরের শহরগুলোতেও ছড়াতে থাকে। সে এক এলাহি ব্যাপার-স্যাপার! দোকানের ওপর দোকান... শরবতের ওপর শরবত! চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা...

নাড়ি ওল্টানো গন্ধটা চাপতে আমি কোনোমতে বলে উঠি, সিলেট? সিলেটে তার শরবতের দোকান যায়নি? চা-বাগানের কাছেপিঠে?

মতিহার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মুখ বন্ধ করে। তাতে আমি একটু শ্বাস নিতে পারি। এবং মতিহার সিগারেট ধরায়। আমিও একটা ধরিয়ে ভাব নিয়ে তাকাই মতিহারের দিকে। যেন এই দেখ, তুই যা পুলিশকে নিকোটিক খাইয়ে জেনেছিস, আমি তা এমনি এমনিই জানি ...

কিন্তু মতিহার বলে, সিলেটে কোনো দোকান ছিল না মিখাইলের শরবতের!

সিগারেটের আগুন ছেড়ে ছাইটা পড়ে যায়। আমি সেদিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। অথচ আমি বেশ বুঝতে পারি কোনো আশার অবশিষ্ট নেই আমার। নেই সেইদিন থেকেই যেদিন অরুন্ধুতি বলেছিলেন, তুমি তো আমারে ভালোবাসো। তোমার চোখ দিয়া মিয়া তুমি বালের গোলাপ ফোটাও!

ভালোবাসা থাকলে পর আর আশা থাকে না। কিশোর কুমার কিশোরমার্কা একটা গান গাইয়ায় খালাস যে আশা ছিল ভালোবাসা ছিল... ! বাল ছিল আর দিন শেষে বালই থাকবে বাল আসলে!

সিগারেটের ছাইয়ের ওপর পিচিক করে আমি থুতু ফেলতে চাই আমি। কিন্তু থুতুটা লক্ষ্যভেদ করে না। ছাইয়ের পাশে পড়ে কিছু, আর কিছুটা আমার মুখের সাথে আঠার মতো লেপ্টে ঝুলতে থাকে। মতিহার বলে, মুখ বন রাখেন ভাই ... আপনার মুখ দিয়া গন্ধের শেষ নাই!

মনে হয় মতিহারকে চড় মারি একটা। কিন্তু মারি না আসলে। কত কিছুই তো মনে হয় আমাদের; করা তো হয় সামান্যই। কিন্তু মতিহার জানায় মিখাইল করে গেছে নাকি তার মনের ইচ্ছা হওয়ার সব কিছু! চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা আর ঢাকা... এটাই ছিল মতিহারের নেটওয়ার্ক! এই নেটওয়ার্ক ধরেই মাল আসা-যাওয়া করত মিখাইলের। আসলে মিখাইলের না, কিন্তু মিখাইলেরই।

এরশাদের আমলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার বর্ডার বেশ্যাপট্টির মতো হয়ে যায়। কে কখন কোন দিক দিয়ে ঢুকছে বের হচ্ছে আবার ঢুকছে, ঢুকাচ্ছে বের করছে ঠিক ঠাওর করা যায় না। এই শাড়ি, এই লবণ, এই চিনি, এই সাইকেল তো এই ভিসিআর ... ছোট ছোট কালোবাজারি তখন বর্ডারের ঘরে ঘরে। ভোটের সরকার তৈরি হলে এই কালোবাজারি আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়। ইন্ডিয়া হঠাৎ করে বাইজিপাড়া থেকে হয়ে উঠতে চায় গৃহস্থ। বর্ডারে বর্ডারে কাঁটাতারের গল্প শোনাতে শুরু করে। বাংলাদেশেও দেশীয় পণ্য কিনে হও ধন্য শুরু হলে বর্ডারের সিলের ভেতর আসতে শুরু করে অন্য জিনিস। সে জিনিস কৈশোরকালে মিখাইলের হাতেও পড়ে দুয়েকটা। কফ সিরাপ। ফেনসিডিল। খেলে সারাদিন ঝিমাতে হয়। চিনি বাড়িয়ে দুধচা খেতে হয়। সারাদিন কাটে ঘোরে ঘোরে। কিন্তু মিখাইলের এসবে খুব বেশি আগ্রহ ছিল না কোনোকালেই।

বাংলাদেশের কিশোর-তরুণ যখন ফেনসিডিল খেয়ে-খেয়ে ধ্বজভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় সারা রাত উত্থান-রহিত হয়ে যাচ্ছে, সকালে সূর্য উদিত হলেও তাদের কিছুই আর উদিত হচ্ছে না; কেবলই একটা চামড়া মোড়ানো চামচিকা নিয়ে তারা ঘুরছে, তখন মিখাইলের শরীরে ঢুকে গেছে রক্তের নেশা। হেড স্যারের পেটের ভেতর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল সেই রক্ত মিখাইলের ভেতর নিয়ত প্রবাহিত হতো। তাতে তার অশান্তি হতো। ঘুমাতে পারত না মিখাইল। রক্তই তার নিয়তি ছিল। আর বর্ডারকে তাই সে বানিয়েছিল নিজের চাতাল। যে চাতাল দিয়ে শাড়ি, সাইকেল, লবণ, চিনি, ভিসিআর ঢুকত; যে চাতাল দিয়ে ঢুকত ফেনসিডিল যে ফেনসিডিল আরামে যেন ঢুকতে পারে তার জন্য বর্ডার ঘেঁষেই ইন্ডিয়া বসিয়েছিল নিষিদ্ধ ফেনসিডিলের কারখানা; বাংলাদেশের টর্চলাইট হয়ে যাওয়া শিশ্নের দামে যারা বিহার ইউপি মহারাষ্ট্রকে বাইজির চকচকে চোলি পরাচ্ছিল, তারা শুধু মুজরাতেই যে থামবে না তা কোনো না কোনোভাবে মিখাইল জানতে পেরেছিল; অথবা

তাকে কেউ জানিয়েছিল ... মিখাইল তারই ধান মেলেছিল তার উদাম চাতালে।

তবে ধান তো শুধু আলাপের কথা ... মিখাইলের শরবতের ব্যবসায় ট্রাক ভরে ভরে আসতো আসলে আম। আম আম আর আম। নানা জাতের আম। চাঁপাই নবাবগঞ্জের সে আম ঢাকায় জমতো; তারপর চলে যেত চট্টগ্রাম আর খুলনায়। আমের রসের ভেতর মুখ গুঁজে থাকত বর্ডার পার হয়ে আসা কাটা রাইফেল, ওয়ান শাটার আর পিস্তল। সাথে নানান সাইজের বিচি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ-মায়েনমারজুড়ে যে প্রেতাত্মার জন্ম হয়েছিল সেইসব প্রেতাত্মাদের একটা ছোট্ট কৌটা ছিল মিখাইল। কিন্তু জানেই তো সবাই যে ... প্রেতাত্মের প্রাণ ছোট্ট কৌটার ভেতরেই লুকানো থাকে। ফলে, মিখাইল প্রেতাত্মাদের প্রাণভোমড়াও হয়ে উঠছিল অচিরেই ...

আমি আবার প্রশ্ন করি সিলেট যেত না সেই সব কাটা রাইফেল?

মতিহার একটা ঢেকুর তোলে। তাতে তার পাঙ্গাস মাছ বেরিয়ে আসতে চায় দাঁতের নর্দমার ভেতর থেকে। তাড়াতাড়ি ঢোক চেপে পাঙ্গাসের মাথাটা ঢুকিয়ে ফেলে সে থলথলে পেটের ভেতর। বলে, সিলেট সিলেট ক্যান করতেছেন জানি না ... সিলেটে কী এই কৌটার?

আমি বলি, কিছু না। কিন্তু মরল ক্যান?

মতিহার হাসে। বলে, এইগুলাতে যা হয় ... প্রেতাত্মাদের সাথে প্রেতাত্মাদের ফাইট হয় না? তখন কোনো কোনো প্রেতাত্মার প্রাণ ওড়ানোর জন্য প্রাণভোমরাকেই তো মারতে হয়! মিখাইল মরছে ... ভালো হইছে! ওঝাদের ঝামেলা কমছে!

মতিহার দূরের পুলিশদের দেখায়। হাসে। আবার সিগারেট জ্বালায়। আবারও হাসে। বলে, আমার মা একটা গল্প শুনাইত ... জোলার গল্প। জোলা গামছা বুনতো। খুব ভালো হইত না সে গামছা। তাই কেউ কিনত না। তাই জোলার গরিবিও কাটত না। একশ দুইশ গামছা নিয়া জোলা হাটে যাইত; গামছা ওই রকমই থাকত। তো জোলার বিবি একদিন বলল তুমি রুকো ... আমি যাই ... জোলার বিবি গেল গামছা বিক্রি করতে ... আর সে সময়ই এক বাঘ আসলো জোলাকে খাইতে ... ওইদিকে বৃষ্টিও তো নামছে টিপটিপ কইরা ... জোলা তার পোলারে বলতেছে খুব ভয় হইতেছে রে বাপ ... টিপটিপার ভয় ... বাঘ হুংকার দিতে গিয়াও দেয় না। এই টিপটিপা আবার কী রে? কার ভয়ে মরতেছে অরা?

আমি বলি, তুমিও রুকো মিয়া। এই গল্প তো এমন ছিল না! এইটা জোলার না, একটা বাঘের গল্প আছিল ... বাঘটাই মেইন ...

মতিহার বলে, বাঘটা মেইন নাও হইতে পারে। হয়তো গামছাটা মেইন ... কিন্তু মেইন নিয়া আপনার এত টেনশন ক্যান বাল ...! সব খবর তো দিয়া দিছি ... এখন বাঘের মতন গিয়া লিখ্যা ফালান পাতা ...! আমগো কাজ তো পাতা ভরানিই!

অবশ্য মাথা ভরা থাকলেও রাতে আর পাতা ভরাতে পারি না। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা উষ্টা খাই এবং খেয়ে সোজা বাসার দিকে না গিয়ে বামের গলির দিকে যেতে থাকি। আর যেতে যেতে গলিটা শেষ হয়ে আসলে এক দারোয়ান আমাকে সালাম দেয়। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয় আর আমি দারোয়ানকে বলি, আপনি কি কোনো বাঘের গল্প জানেন ভাই? গল্পটায় এই রকম টিপটিপ বৃষ্টি হয় ... আর বাঘটা একটা গৃহস্থকে বা জোলাকে খাওয়ার জন্য রওনা দেয়, কিন্তু তাদের খাওয়ার আগেই তারা ... তারা মানে গৃহস্থ বা জোলার যে কেউ একজন বলে যে এখন খুব টিপটিপার ভয় ...

আমার কথা শেষের আগেই দারোয়ানের ফোন বেজে ওঠে। আর দারোয়ান তাতে জ্বি জ্বি বলে মুখে ফেনা তুলে ফোন নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ম্যাডাম আমার সাথে গল্প করতে মানা করতেছে। বলতেছে আপনাকে ফিরা্য যাইতে ... এখন ম্যাডামের কাছে যাওন যাইত না!

ফলে আমি ওপরে যাই।
এবং কলিংবেলে চাপ দিই।
এবং কলিংবেল মধুর সুরে বাজে।
এবং অরুণ দরজা খোলেন।
এটা একটা সুবিধা যে অরুণের কাছে আসলে উনি কিছু না কিছু খাওয়ান। হোমমেড পাস্তা দিয়ে বলেন, চিজ বেশি হইছে। খাইতে ভালো না লাগলে জোর কইরা খাওয়ার দরকার নাই!

আমি খাই। এবং মাথা নাড়িয়ে বলি, ভালো হইছে তো!

অরুণ তাচ্ছিল্য করেন। বলেন, তোমার তো কিছু পাইলেই হয় খাইতে! এমন বুভুক্ষু আমি আর জন্মে দেখি নাই!

আমি বলি, অস্ত্র হাতে নিছেন আপনি কোনো দিন?

অরুণ ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। তারপর বলে, শুধু হাতে না মুখেও নিছি বুঝলা! কিন্তু কারও কারওটাই খালি অস্ত্র হয় ... বেশির ভাগেরটা হয় না! তোমারটা হইতে পারত ... কিন্তু তার আগেই তুমি ভালোবাসার রাজা পরাইয়া দিলা তার ওপর!

আমি এইসব কথার ধার দিয়েও যাই না। বা যাইও একটু একটু। বলি যে আপনের স্বামীর অস্ত্র ... দেখছেন? মাংসের না লোহার ... !

অরুণ আবার হাসেন। তবে তাচ্ছিল্যের বদলে এইবার আনন্দমতো থাকে। বলেন, বাল জানো তুমি দেখতাছি! মাংস লোহা হইতে কতক্ষণ?

আমি বলি, পিস্তল? আছিল না তার?

অরুণ এবার স্থির তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তারপর নিজের গ্লাসটায় হুইস্কি ঢালেন। খান ঢকঢক করে। আমি একটা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবি তাতেও যদি ঢালেন তিনি। কিন্তু ঢালেন না। নিজের হুইস্কিটা নিট শেষ করেন এবং ভেতরে চলে যান।

একটা শূন্য গ্লাস এবং ভরা হুইস্কির বোতল নিয়ে আমি কিছুটা দ্বিধার সাথে বসে থাকি। পাস্তার ভেতর সসেজ দেয়া আছে। সেই সসেজ যদি আলাদা করি তাহলে হুইস্কির সাথে খেতে আরাম হওয়ার কথা। কিন্তু বোতল থেকে হুইস্কি ঢালা ঠিক হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে অরুণ চলে আসেন। আমার দিকে একটা কালো পিস্তল বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, মিখাইলের থাকতে হইব ক্যান, আমারই আছে! নেও। কারে খুন করবা কর ... অবশ্য তুমি কাউরে খুন করতে পারবা বইলা আমার মনে হয় না! তয় সুইসাইড করতেও তো এই জিনিস কামে লাগে ... নেও ... নিয়া যাও ... !

আমি পিস্তলের দিকে তাকিয়ে থাকি। বলি, এইটা কি মেডইন ইন্ডিয়া?

কিছুক্ষণ হাসে অরুণ। পিস্তলটা ছুঁড়েই দেন আমার দিকে। ক্রিকেট না শিখলেও কিছু একটা কাজে লাগে। ধরে ফেলি পিস্তলটা। মেইডইন ইন্ডিয়া কি না বুঝি না। ট্রিগারে চাপ দিলে বুঝি ভেতরে কোনো গুলি নেই। অরুণ বলে, শালা ভালোবাইসা ফেলছিল!

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। অরুণ ডিভানে শুয়ে আছে দুহাত ছড়িয়ে। পোশাকহীন। শুধু তাকে ভালোবাসি বলে কাছে যেতে পারছি না। শুধু ভালোবাসি বলে রিপোর্টের নামে লিখে চলেছি একটা রূপকথা।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। গৃহস্থের বাড়িতে এসেছে বাঘ। বাঘ আজ গৃহস্থকে খাবে। কিন্তু গৃহস্থ বলছে টিপটিপার যে ভয় ...

আমার রূপকথা এগিয়ে যেতে থাকে ভালোবাসাহীনতার দিকে। কারণ সেটাই আমার অভীষ্ট। ক্রমশ আরও কোনো টিপটিপা বৃষ্টির ভীতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রেম গিলে খেতে থাকি নীরবে। আর তখনই তরুণ খসখসে কণ্ঠে বলে, আসেন ...

আমি জানি, আমার চোখের গোলাপ মুছে যেতে শুরু করেছে সান্ধ্যমেঘের সাথে।

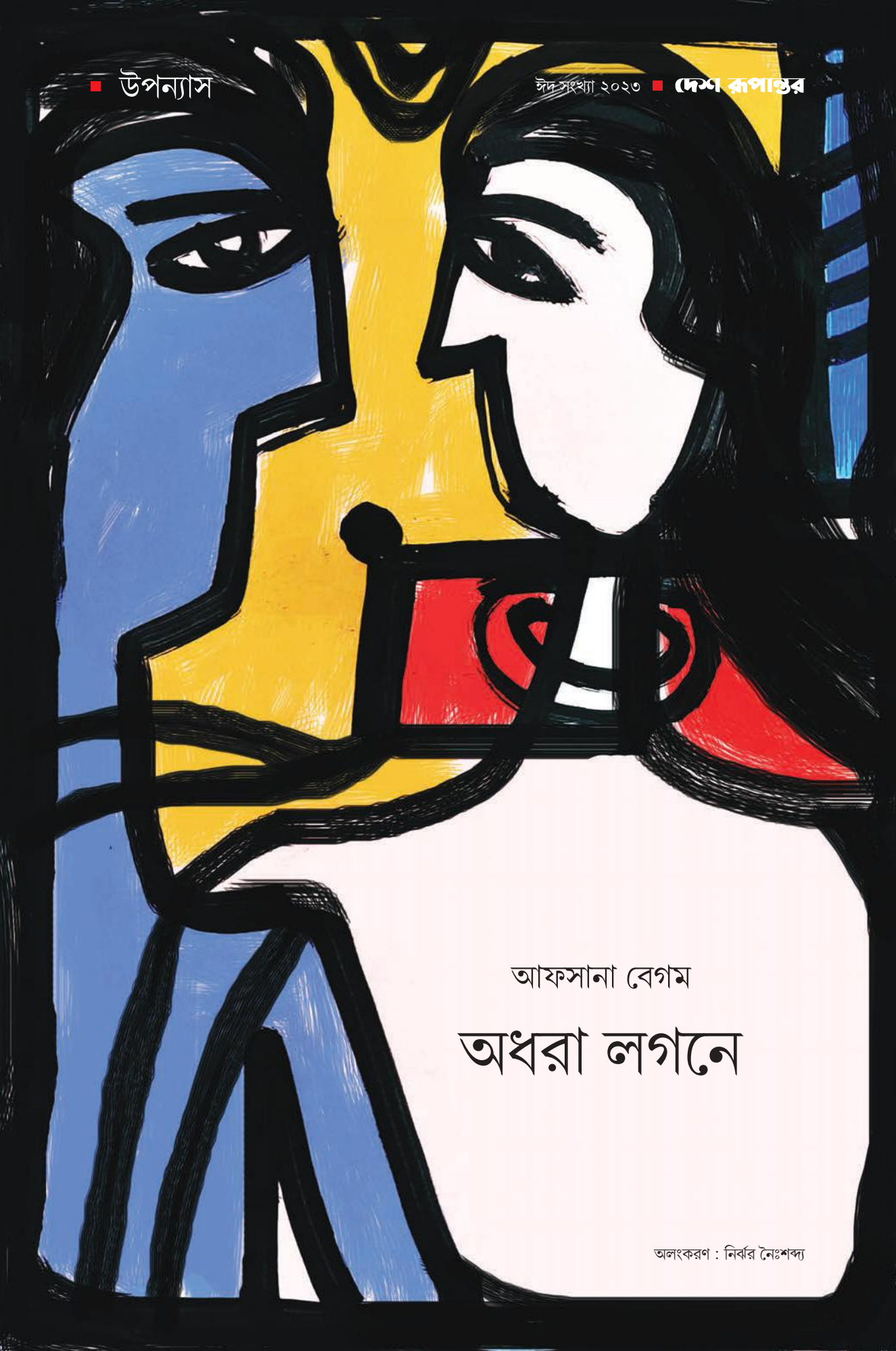

আফসানা বেগম

অধরা লগনে

অলংকরণ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

ছাদের সমান্তরালে পেয়ারার ডাল চলে গিয়েছিল। ঝরা শুকনো পাতার ওপরে বৃষ্টির পানি পড়ে পড়ে ছাদে কালচে বাদামি ছ্যাতলা। পাঁচিলের পাশের বিশাল আমলকীগাছ প্রায় অর্ধেক ছাদকে রাখত ছায়া করে। নিতু সারা দিন একটা ডালে হেলান দিয়ে পেয়ারা আর আমলকী পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। পেয়ারার সবুজটা সে কচকচ করে খেত কিন্তু মাঝখানে বীজে ভরা অংশটা তার ভালো লাগত না। পেয়ারা খেতে খেতে এক ধরনের দুষ্টুমিতে পেয়ে বসত তাকে। গাছে ঝুলে থাকা পেয়ারা চারদিক কামড়ে খেয়ে রেখে দিত, ডালের বোঁটাগুলোতে বীজের অংশটা শুকিয়ে ঝুলতে থাকত। আস্তে আস্তে সেগুলো কালচে বাদামি হয়ে গিয়ে দেখতে হয়ে যেত বিশ্রী। খাঁ খাঁ রোদের নিস্তব্ধ দুপুরে বড় বোন ঋতু মাঝে মাঝে ছাদে এসে বলত, 'নিতু, এই কাউলা পেয়ারার মাঝখানে বসে তোকে পেতনির মতো লাগে। এভাবে কেউ পেয়ারা খায়?'

সেদিনও ঋতু তেমনই বলল। আর নিতুরও একই উত্তর, 'তোমার পেয়ারা খাওয়া দেখলেও আমার অসহ্য লাগে আপা। তুমি সবুজটা ফেলে দিয়ে খালি বীজটা খাও। আচ্ছা, এইটা কি একটা খোসা ছিলে খাওয়ার জিনিস?'

'তাহলে পেয়ারার ওপরটা খেয়ে তুই আমাকে বাকিটা দিয়ে দিলেই পারিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খাও আপা, এই যে চারদিকে কত ঝুলতেছেহ্

ঋতু তাকে মারতে গেল, 'পাজি কোথাকার, এই শুকনো পেয়ারার বীজ চাবায়ে খাব? আমি কি তোর মতো পেতনি?'

সাইকেলের বেল শোনা গেল তখন। নিতু মারের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে বেল শুনে দাঁড়াল, 'আপা, ওই যে চলে আসছে তোমার নায়ক, যাও যাও আর আমার পেছনে লাগবা না—'

ঋতুর ওঠানো হাতটা নেমে গেল। লজ্জায় লাল অথচ খুশিতে আটখানা হওয়া মুখটা লুকিয়ে পিঠের ওপরে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, 'লক্ষ্মী নিতু, যা না একটু দেখে আয় মা ঘুমিয়েছে কি না। যদি ঘুমাতে দেখিস, তাহলে তপু ভাইকে এখানে পাঠায়ে দে আর না পারলে আমাকে বলিস, আমিই নিচে যাব।'

হাতের আধ-খাওয়া পেয়ারাটা থেকে যতটা সম্ভব বড় করে কামড়ে নিয়ে ঋতুর হাতে চালান করে দিল সে। তারপর মাথা একদিকে হেলিয়ে নিচে চলে গেল। প্রথম গন্তব্য মায়ের ঘর। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে সামান্য ফাঁক করলে মাকে দেখা গেল, বিছানায় নিশ্চল শুয়ে আছেন, ভেজা চুলগুলো বালিশের ওপর দিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, চুলের ডগা থেকে গড়ানো ফোঁটা ফোঁটা পানি মসৃণ লাল মেঝেতে পড়ে মেঝের রঙ গাঢ় করেছে। ফ্যানের বাতাসে ছোট চুলগুলো এলোমেলো ওড়া ছাড়া মায়ের আর কোনো নড়াচড়া নেই, নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে ঘণ্টা দুয়েকের এই আরামের ঘুমের মধ্যে মাকে কেউ জাগালে মা তাকে একটা চড়ও মারতে পারেন। নিতু যেভাবে খুলেছিল সেভাবেই ধীরে ধীরে দরজা টেনে দিল। ঝোলানো লোহার গোল কড়াটা আস্তে করে দরজার ওপরে রাখল, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙল। সিঁড়ির ধারে পুরনো আমলের সরু ইটের গাঁথুনি থেকে কোথায় একটা ইট খসে গেছে, কোন জায়গাটা ছাদ থেকে স্রোতের মতো বৃষ্টির পানি পড়ে পড়ে শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে, সব নিতুর মুখস্থ। সেই হিসেবে কোথাও দুই সিঁড়ি লাফিয়ে কোথাও নড়বড়ে রেলিং ধরে ভীষণ দ্রুত নিচের তলায় নেমে এলো। উঠোন পার হওয়ার সময় মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল ওদিকের বারান্দায় চাচিদের কাউকে দেখা যায় কি না। তারপর সোজা সদর দরজায় হাত। দরজার ওপাশে তপু ভাই সাইকেলের পাশে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুরুতর কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। নিতু বোঝেনি, এতই যদি লজ্জায় মরে, তাহলে না এলেই তো হয়! নিতুকে দেখে যেন আরও লজ্জা এসে ভর করল তার মুখে, লালচে হয়ে গেল। কোনো রকমে তপু বলল, 'রিংকু আছে?'

'না, ভাইয়া নাই।'

নিতু জানত তপু ভাই ভাইয়ার কাছে আসেনি; বরং ভাইয়া কখন বাসায় থাকবে না, সেটা জেনেই সে এসেছে। তবু এলেই তপু ভাই এ কথাটা প্রথমে জানতে চাইবে, নিতুও স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবে। আরও একটা নিয়ম আছে তপু ভাইয়ের, সেটা ভাবলে নিতুর খুব হাসি পেত। সে জানত, তখনই নিয়মমাফিক পরের কথাটা বলবে তপু ভাই। বলবে, 'বাহ্, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ, নিতু!'

এমন করে বলত যেন আজ অনেক দিন বাদে সে নিতুকে দেখল। সপ্তাহে অন্তত এক দিন যার সাথে দেখা হয় তার এ রকম বোকাবোকা কথার পিঠে কী বলবে নিতু ভেবে পেত না। তাই উত্তরে কিছু বলত না। একেবারে প্রথমবার যখন তপু ভাই এ কথা বলেছিল, তখন অবশ্য নিতুও তা নিয়ে কথা বলেছিল। বলেছিল, 'যাহ্ কদিন আগে আমি ছোট ছিলাম নাকি?' তপু ভাই হাসি হাসি মুখ করে বলেছিল, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো!' তারপর থেকে বললে নিতু কেবল একটু হাসত, ঝুঁকে দরজা লাগাত আর তপু ভাই ভেতরে ঢুকলে ঘুরে বলত, 'ছাদে আছে, চলে যান। যার কাছে আসছেন তিনি ওইখানে।' তপু ভাইয়ের ফরসা মুখ এক ঝলকে রক্তশূন্য হয়ে যেত তখন। সাইকেলটা বারান্দার ক্ষয়ে যাওয়া একটা পিলারের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে তপু ভাই আর পেছনে তাকাত না। তখন তপু ভাই কী করবে নিতুর জানা ছিল। প্রথম কয়েকটা সিঁড়ি একেবারে স্বাভাবিক গতিতে উঠবে, তারপর আড়াল হয়ে গেলে তিনটা-চারটা করে লাফিয়ে একবারে উড়ে চলে যাবে আপার কাছে। নিতু অনেক দিন ধরে এসব লক্ষ করছিল কিন্তু এমন কেন করত সে সেভাবে বুঝতে পারত না। কেন আপা তপু ভাইকে দেখলে আর তপু ভাই আপাকে দেখলেই তাদের ভাবভঙ্গি একইরকমের হয়ে যেত? মনে হতো যেন দুজনে মিলে কোথাও কিছু চুরি করছে বা করার ফন্দি আঁটছে?

তপু ছিল নিতুর বড় ভাই রিংকুর বন্ধু। পাশের পাড়ায় বাসা, রিংকুর সাথে একই কলেজে পড়ত। ওই পাড়ায় তপুকে সবাই চিনত, বাবা উকিল শহিদ হোসেন এলাকায় বেশ পরিচিত, ভালো নামডাক ছিল। নিতুদের বাসায় তপু যখন-তখন আসতে-যেতে পারত। নিতু দেখেছে চাচি একবার বারান্দায় তপু ভাইকে দেখে বলেছিল, 'তুমি শহিদ উকিলের ছেলে না?'

'জি।'

'তাই তো চেনা চেনা লাগছে, তোমাকে অনেক ছোট দেখেছি, তোমার বাবা তো আমার মামাকে একটা ভয়ানক মামলা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমরা তার কাছে চিরঋণী। তা, তুমি ভালো আছ তো, বাবা?'

'জি ভালো, দোয়া করবেন।'

পরে চাচির কাছে তপু ভাইয়ের বাবা-মা আর বড় বোনের কথা শুনেছিল নিতু। বোন আমেরিকায় থাকত, মা মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে থাকত। আগে একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে নিতু একদিন তাদের বাসা দেখেছিল। সাজানো বাগানের ঝকঝকে উঁচু বারান্দাওলা বাসার গেটের সামনে নেমপ্লেট, অ্যাডভোকেট শহিদ হোসেন, এলএলবি। তার পাশে আর একটা কালো সাইনবোর্ডে সাদা রঙে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'। বাসায় ফিরে বারান্দায় ভাইয়ার সাথে তপু ভাইকে গল্প করতে দেখে নিতু জানতে চেয়েছিল, 'আচ্ছা তপু ভাই, তোমার আব্বা শহিদ হয়ে গেছে নাকি? একাত্তরে?'

তপু ভাই কেন যেন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আর রিংকু বিব্রত বোধ করছিল। ভাইয়া একটু পরে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'বেশি কথা বলিস তুই, যা এখান থেকে।'

'আচ্ছা, বাদ দাও, তপু ভাই, কুকুরটা কি অনেক বড়? কামড়ে খেয়ে ফেলে?'

'ওহ্, তাই বলো, কুকুরটা তো খুবই ছোট, কিছুই করে না। অনেকটা বিড়ালের মতো, পায়ে-পায়ে ঘোরে।'

দুই হাত দিয়ে তপু কুকুরের লম্বা-চওড়া বোঝানোর চেষ্টা করে, নিতু সেদিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকায়।

'তাহলে ওভাবে লিখে রেখেছ কেন?'

'বাবা লাগিয়েছে সাইনবোর্ডটা, মনে হয় বাইরের লোকদের ভয় দেখাবে বলে, এই আর কি।'

নিতু তবু আশ্বস্ত হয়নি। মনে মনে সে ঠিক করেছিল কোনো দিন তপু ভাইদের বাসায় যাবে না, আপা বললেও না। অবশ্য তপু ভাইয়ের নরম স্বভাব দেখলে কেউ বলবে না যে বাসার ভেতরে তলে তলে হিংস্র একটা প্রাণী লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তবু নিতু কিছুতেই স্কুল থেকে ফেরার পথে আর ওই গলিতে ঢুকবে না, পাশের গলিটা নেবে। এসব কুকুরটুকুরে কোনো বিশ্বাস নেই। দেখা গেল পাঁচিল টপকে ধপ করে সোজা নিতুর সামনে! দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে তার দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝিলিক দিয়ে উঠবে, একতিল নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আচ্ছা, কুকুররা কি দাঁত ব্রাশ করে? তাদের দাঁত এত সাদা হয় কী করে? পোষা কুকুর দাঁত ব্রাশ করলেও করতে পারে, কিন্তু স্কুলের সামনের বটগাছের তলায় যে কতকগুলো বেওয়ারিশ কুকুর ঘুরঘুর করে, তাদের দাঁতও নিতু কখনো ময়লা দেখেনি। তপু ভাই বিশাল, হিংস্র আর কালো কুচকুচে এক কুকুরের দাঁত ব্রাশ করছে আর কুকুরটা গড়গড় করে গার্গল করতে করতে ফেনাওলা পানি কুলি করছে, দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে নিতুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

নিতু এমনি এমনি তো আর কুকুরকে যমের মতো ভয় পায় না! সে বছর বর্ষায়, ঘাসের মধ্যে পানি লুকিয়ে থাকা মাঠে পাড়ার সবাই মিলে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছিল। পা দিলেই পানি ফোয়ারার মতো লাফিয়ে ওঠে অথচ এমনিতে দেখলে মনে হয় শুকনো মাঠ। রুনার হাতের ছোঁয়া বাঁচাতে যেই নিতু দৌড়োতে যাবে, পিছলে পড়ল রুনারই গায়ের ওপরে, ডিগবাজি খেয়ে দূরে ছিটকে গেল। দুজনের হাত-পা এমনভাবে পেঁচিয়ে গেল যে ছাড়াতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। তা ছাড়া ব্যথায় অথবা হাসিতে দুজনই বারবার দুদিকে গড়িয়ে পড়ছিল। রুনার পোষা কুকুর ভেবেছিল তার মনিবের বিপদ আসন্ন, নিতু নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করেছে। মাঠের আরেক দিক থেকে ছুটে এসে নিতুর উরুতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল মনিবের যত্ন আর খাবারদাবারের প্রতিদান হিসেবে। নিজেকে কোনো রকমে ছাড়ানোর পরে কুকুরটাকে নিতুর পা থেকে ছাড়াতেও রুনাকে কম চেষ্টা করতে হয়নি। ব্যথায় নিতুর চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল আর চোখ মেলেই দেখে রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাঁটুর একটু ওপর থেকে নিচের দিকে। রুনা নিজেই তাদের বাসায় নিয়ে রক্ত ধুয়ে-মুছে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিয়েছে। মাঠে সবাই বলেছে, এবারে চৌদ্দটা ইনজেকশন, কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। নাভির চারদিকে একে একে চৌদ্দটা ইনজেকশন ঢুকে যাচ্ছে ভাবতেই পেটের চামড়ায় সুড়সুড়ি লাগছিল, পেটের ভেতরে টনটন করে কুঁকড়ে যাচ্ছিল নিতুর। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই, মাকে বললে তা-ই হবে, নিতু জানে। তাই ভয়ে বলেনি। পাড়ার শেষ মাথায় থুথড়ে এক বুড়ির কাছে পরপর সাত দিন ওষুধ খেয়েছে। কলার মধ্যে পোরা অদৃশ্য ওষুধ। রুনাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সাদা মাটিতে লেপা ঝকঝকে উঠোনের একধারে তুলসীতলা সে বাড়িতে। তুলসীগাছের চারদিকে আয়তকার ইটের কেবল একটি করে কোণ দেখা যায় এমনভাবে লাইন করে মাটিতে বসানো। সেই ঘেরাটোপের ওপরে চন্দনের ফোঁটা। ওই বাসায় নিতু আগে কখনো যায়নি। কারণ সমবয়সী কেউ ছিল না সেখানে। সকালবেলা খালিপেটে কলা আনতে গেলে বাড়ির বারান্দায় রাখা স্টিলের থালা দেখতে পেত নিতু। ছবিতে দেখা আমাজান লিলির পাতার আকৃতির, আয়নার মতো ঝকঝকে স্টিলের থালায় তখনই তুলে আনা জবা ফুল প্রতিদিন নিতুর চোখে পড়ত। ফুলগুলোর পাপড়িতে রাতভর ঝরা বৃষ্টির পানি লেগে থাকত। সকালের হালকা বাতাসে পাপড়িগুলো থেকে থেকে মৃদু নড়ত। পানির বিন্দুরা যেন নিতুর মতোই ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠত। কলাটা দেবার সময়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ত বুড়ি। নিতু অবাক হয়ে বুড়ির ঠোঁট নাড়ানো দেখত। তার হাত, গলা আর গালের কুঁচকানো চামড়ার ভাঁজে নিতু মাঘের পাতা ঝরে যাওয়া বয়স্ক বৃক্ষের ডালপালা দেখতে পেত। কোনো সন্ধ্যার মুখে রাস্তায় নিজের পেছন পেছন গম্ভীর আর রহস্যময় এই বুড়িকে হাঁটতে দেখলে নিতু নিশ্চিত আঁতকে উঠবে। কুকুরের কামড়ের কথা বাসায় সে কাউকে বলেনি। অনেকে বলেছে, এসব তুকতাক করে কোনো লাভ নেই, জলাতঙ্ক হবেই। বাঁচতে হলে ইনজেকশন দিতে হবে। কিন্তু কেন যেন তখন চৌদ্দটা সুঁইয়ের খোঁচা খাওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে সহজ মনে হয়েছিল নিতুর কাছে। একটা একটা করে সুচগুলো শরীরে ঢোকানোর চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া তখন অনেক বেশি কাম্য। আর দিন সাতেক গভীর মৃত্যুচিন্তায় ডুবে থাকার অনুভূতিটা ছিল একেবারে আনকোরা। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হতো। একবার ভাইয়ার বই ছিঁড়ে ফেলায় নিতুকে ভীষণ জোরে চড় মেরেছিল সে। আর তখন সে কথা ভাবতে গিয়ে ভাইয়াকে মনে মনে মুহূর্তের মধ্যে মাফ করে দিল নিতু। আপা তাকে ফেলে বান্ধবীদের সাথে পিকনিক করতে গিয়েছিল সেবারে। ছোট বোনদের নেওয়ার নিয়ম থাকা সত্ত্বে সে নিতুকে নেয়নি। নিতু ভেবেছিল এই নিষ্ঠুরতার জন্য আপাকে কোনো দিন মাফ করবে না। কিন্তু তখন মনে মনে তা-ও করে দিল। সবকিছুর জন্য সবাইকে মনে মনে মাফ করে দিয়ে মনটা হালকা হলে আবার তীব্র কান্নাও পেত। তখন দোতলায় আপা হয়তো হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে, চলে যায় বসন্তের দিন, মরি হায়... কানে এলে নিতুর কী যে হতো! বসন্তের দিন কেন চলে যায়, কী হবে চলে গেলে, সে বুঝত না, বুঝতে চাইতও না। শুধু চলে যাওয়ার প্রবল ব্যথায় কান্নায় ভেঙে পড়ত। নির্জন দুপুরে বৃষ্টি থামার পরে সে একা একা ছাদের পেয়ারাগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াত। চোখের পানি টপটপ করে ছাতলা পড়া ছাদে গড়িয়ে ছাদটাকে যেন আরও একদফা ভিজিয়ে দিত। নিতু সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কদিন পরের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু কেন যেন কী কারণে সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, মৃত্যু বলে কারও দেখা মিলল না। নিতু স্কুলে গেল, ছাদে গেল, দিনের সব কাজকর্ম করে গেল, অথচ মৃত্যু এলো না। পরে কে যেন বলেছিল, 'কুকুরটার নিশ্চয়ই জলাতঙ্ক ছিল না, তা না হলে তোমার কিন্তু হতো। এ যাত্রা বেঁচে গেছ।' সে কথা শুনে ওই মুহূর্ত থেকেই মৃত্যুচিন্তার ঘোর কেটে গেল।

২

তপু ভাই ছাদে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে নিতু ভাবল আপা ব্যস্ত, মা ঘুমাচ্ছেন তাই তপু ভাইকে চা-নাশতা দিয়ে আসার দায়িত্ব তার। মা সব সময় বলতেন পিরিচে একফোঁটা চা পড়ে থাকলে বা কাপের গা বেয়ে চা পড়তে দেখলে তার চায়ের রুচি চলে যায়। তাই কাপ থেকে যেন চা ছলকে পিরিচে না পড়ে এ রকম একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিতু ট্রে হাতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। এত ধীরে, যেন একবারে শব্দহীন, বেড়ালের চলাফেরা। সিঁড়িঘর পেরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপা আর ঠিক সামনে তপু ভাই, আপার কানের দুপাশে দেয়ালে হাত ঠেকানো হ্যান্ডস-আপ তার ভঙ্গি, হাতের তালুর ওপরে আরেকজনের তালু আর সব কটি আঙুল আরেকজনের সব আঙুলের মধ্যে ঢোকানো। দুজনই এমন অপলক তাকিয়ে ছিল যেন ক্লান্ত হলেও মানুষের চোখের পলক ফেলার দরকার পড়ে না। এত দেখার কী থাকতে পারে নিতু জানত না। তা ছাড়া সেদিনই তো আর প্রথম দেখছে না! আর এ রকম দৃষ্টির অর্থই বা কী, নিতুর বোধগম্য হতো না। নিতুকে এত কাছে দেখে দুজনেই চমকে উঠল, হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল। থতমত ভাব কাটিয়ে তপু ভাই প্রথম কথা বলল, বলার আগে এমনভাবে গলা পরিষ্কার করে নিল যেন অনেক পুরনো কাশির রোগী।

'বাহ্ নিতু! চা রেডি? তাই তো বলি, তুমি সত্যিই বড় হয়ে গেছ। রিংকু কই, আসেনি এখনো?'

'না, ভাইয়া তো প্রাইভেট পড়তে গেছে, সন্ধ্যার আগে আসবে না।'

নিতু নিশ্চিত যে তপু ভাই জানত ভাইয়া তখন আসবে না। তবু কেন আবার জানতে চাইল? নিতুর হাসি পেল। আরও বেশি হাসি পেল আপার অবস্থা দেখে, যেন চায়ের ফ্যাক্টরির টেস্টারদের মতো মনোযোগ দিয়ে চা খাওয়ার বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছে আপা। আর একবারও কাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতুর দিকে তাকাল না। ছাদের এক ধারের বেঞ্চে বসে ওরা চা খাচ্ছিল। ওদিকটা চাচিদের

বারান্দা থেকে দেখা যেত না। এমনিতে তপুর জন্য নিতুদের বাড়ি অবারিতদ্বার হলেও কেউ জানত না তপু দিনে-দুপুরে বাসার ছাদে ঋতুর সাথে যখন কিনা বাসায় রিংকু নেই। তাদের অস্বস্তি দেখে নিতুর আর বুঝতে বাকি থাকল না যে সে ওখানে অনাকাঙ্ক্ষিত। ফিরে আসতে গিয়ে বলল, 'আপা, চা খাওয়া হলে ট্রে নিয়ে নিচে নেমো আর আমি বারান্দায়ই আছি।'

আপাকে ট্রে আনতে বলে বোঝাতে চাইল যে সে আর ওপরে আসবে না, তারা যা খুশি করতে পারে, আর বারান্দায় থাকার কথা বলে জানাল যে অন্য কেউ ছাদের দিকে রওনা দিলে নিতুই সামলাবে। সেদিন নিতু নিজের বুদ্ধিতে নিজেই মুগ্ধ... সে কি তাহলে সত্যিই বড় হয়ে গেল! আগামী বছর ক্লাস সেভেনে উঠলে সে আপার মতো সালোয়ার-কামিজ পরে স্কুলে যাবে। ইশ্ বড় হয়ে যাওয়া কতই না মজার! টিফিন পিরিয়ডে নিতু দেখত আপা তাদের ক্লাস টেনের সামনের বারান্দায় বান্ধবীদের সাথে বসে চেঁচামেচি করে গল্প করে। বসার সময়ে তারা কামিজের পেছনের অংশটা হাত দিয়ে উঠিয়ে এমনভাবে বসে যেন কামিজের পেছনে বারান্দার ধুলোময়লা না লাগে, নিচে সালোয়ারে ধুলা লাগলে তো আর কেউ দেখছে না। নিতুদের ফ্রক ওভাবে উঠিয়ে বসা যেত না। পরের বছরে ওই সালোয়ার-কামিজটা যখন নিতুর স্কুলড্রেস হবে, তখন সে-ও ওভাবে বসবে। টিফিন পিরিয়ডে আপাদের আড্ডার কাছে ঘেঁষলে আপা ধমকে উঠত, 'অ্যাই, তুই এখানে কী চাস? যা নিজের ক্লাসের মেয়েদের সাথে গিয়ে গল্প কর, খালি বড়দের কথা শোনা!' সবার সামনে আপাকে ওভাবে বলতে শুনলে নিতুর কান্না পেত, আপা আর তার বন্ধুরা এমন কী আলাপ করে যে তার শোনা যাবে না? তাদের মুখগুলো কথা বলতে বলতে লাল টুকটুকে হয়ে গেল, আবার কখনো তারা কানে কানে কিছু বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল– নিতুর বোধ হয় কখনোই এসবের কারণ জানা হবে না।

কেন যেন সেদিন বিকেল থাকতেই রিংকু এসে পড়ল, সাথে বড় চাচা। চাচা উঠোনের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'সাইকেল কার?' নিতু কিছু বলার আগেই রিংকু বলল, 'তপু এসেছে, না রে?' তারপর সারা সন্ধ্যা তপুর সাথে রিংকুর আড্ডা চলছিল তার ঘরে। মা ঘুম থেকে উঠে মুড়ি মাখল, নিতু আর ঋতু রান্নাঘরে বসে মায়ের সাথে গল্প করছিল। মা হঠাৎ ঋতুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাও গিয়েছিলি নাকি তুই?'

'না তো, কেন?'

'না, এত সাজগোজ করলি যে?'

ঋতু চমকে উঠে বলল, 'এমনিতেই করলাম, মা।'

মা হাসল আর ইচ্ছে করে ঋতুর লজ্জা পাওয়া মুখটা এড়াতে হাত উঠিয়ে উঠোনের কাক তাড়াল। নিতু দেখল আপার চোখে সরু করে কাজল আঁকা, কানে দুল। আগে খেয়াল করেনি, কাজলের জন্যই আপার চোখগুলো এত ভাসা-ভাসা লাগছিল। অবশ্য আপাকে না সাজলেও সুন্দর দেখাত। মাকে পাড়ার লোকজন বলত, 'এমন রূপসী মেয়ে, কোথায় যে এর জন্য তেমন ছেলে পাবেন!' নিতু তখনো তত বড় হয়নি বলে বোধ হয় তার ব্যাপারে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু সে জানত আপাকে আর তাকে দেখতে একইরকম, স্কুলে কতবার কতজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ক্লাস টেনের ঋতু আপা তোমার বোন নাকি?'

মাখানো মুড়ি দিতে নিতু রিংকুর ঘরের দিকে যেতেই উত্তেজিত দুটো গলা শুনতে পেল। ভাইয়া আর তপু ভাই কথা বলছিল। তাদের এ রকম গলা আগে শোনা যায়নি। তাই দরজার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল সে। ভাইয়া বেশ রেগে কথা বলছিল তপু ভাইয়ের সাথে।

'আমার ভালো লাগে, আমি খাই। তাতে তোর তাতে সমস্যা কোথায়?'

'বাদ দিয়ে দে, রিংকু। এসব খুব খারাপ, তুই ওদের সাথেও আর মিশিস না।'

'তোর কথায়?'

'আমি তো তোর ভালোর জন্যই বলছি।'

'আমার ভালো-মন্দ তোকে দেখতে হবে না। তুই আমার বাপ নাকি?'

'আচ্ছা, বাপের কথা যখন বলছিসই তোর বাবা-মা জানলে কী বলবে বল তো!'

'কী করে জানবে? তুই বলবি? যা তুই এখান থেকে, আর আসবি না।'

নিতু বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। আর থাকতে না পেরে মুড়িমাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তা ছাড়া মা তো বলেই দিয়েছিল তাড়াতাড়ি দিয়ে আসতে, না হলে মুড়ি নরম হয়ে যাবে। তাকে ঢুকতে দেখে রিংকু মুখ ঘুরিয়ে নিল, তবে নিতু তার আগেই ভাইয়ার সেই চোখ দেখে ফেলল যেটা ভাইয়া ভয়ানক রেগে গেলে দেখতে পায়। আর ওরকম সময়ে কিছু বলা মানে বকা অবধারিত। সারা সন্ধ্যা ভেবেও কোনো সুরাহা করতে না পেরে রাতে ঘুমানোর সময়ে পাশে শোয়া আপার কোমরের ওপরে পা উঠিয়ে নিতু বলল, 'আপা, জানিস আজ ভাইয়া আর তপু ভাই ঝগড়া করছিল?'

'তাই? বন্ধুদের মধ্যে তো একটু-আধটু ঝগড়া হয়ই।'

'ভাইয়া যেন কী খায় আর তপু ভাই মানা করছিল। ভাইয়া রেগে গিয়ে তপু ভাইকে বাসায় আসতে নিষেধ করল।'

'ভাইয়া কেন ওকে আসতে নিষেধ করবে! খালি বড়দের কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা, ঘুমা এখন।'

নিতু আপার শরীরের সাথে আরেকটু ঘেঁষে ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনে হলো আপা চিন্তায় পড়ে গেছে আর তার মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আপা ছাদের দিকে স্থির তাকিয়ে ছিল। মোটামুটি অন্ধকারেও আপার মুখের আশঙ্কা স্পষ্ট টের পেল নিতু।

৩

তখন শহরের বড় রাস্তাগুলো থেকে সাদা লম্বা টিউব লাইটগুলো হারিয়ে গেল। সেই জায়গায় উঁচু, মাথা থেকে বেঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা ইলেকট্রিক পোল থাকল নুয়ে। আর সেই পোলের মাথায় দেখা গেল হলদে বাল্বের সারি। ফকফকে সাদা রাস্তা আর নেই, হলদে আর ঘোলাটে হয়ে গেছে। নিতুদের স্কুলে কে যেন বলছিল, সোডিয়াম বাতি মিডিয়াম জ্বলে।

শুধু রাস্তায় কেন, অনেক জায়গায় অনেক কিছু বদলে যাচ্ছিল। নিতুদের স্কুলে তখন কী সব নতুন নিয়ম হয়েছিল, তার একটুও ভালো লাগত না। জাতীয় সংগীত গাইবার পরে তখন আবার অন্য আরেকটি গানও গাইতে হতো। তখন যেন তাদের দুটো জাতীয় সংগীত হয়ে গেল, 'নতুন বাংলাদেশ গড়ব মোরা নতুন করে আজ শপথ নিলাম'– খোদ দেশের প্রেসিডেন্টের লেখা গান। এটিও তাদের লাইনে দাঁড়িয়েই গাইতে হতো তবে পার্থক্য হলো এই যে গানটা গাওয়ার সময়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মতো গম্ভীর হয়ে থাকবার প্রয়োজন নেই। সবাই গানের তালে তালে হাত তালি দেবে আর গাইবে, এমনই নিয়ম। কয়েক মাস পরে পরে প্রেসিডেন্ট নিজেও আসতেন, ওটাই তার বাড়ির এলাকা কিনা, সারা বছর ধরে তার বন্দনা চলত। যখন তিনি আসতেন, সরকারি স্কুল থেকে সব মেয়েকে বড় মাঠে যেতে হতো কাকডাকা ভোরে। তারপর হেলিকপ্টার থেকে তিনি নামলে ওই গান হাততালি দিয়ে গাইতে হতো, তখন আর জাতীয় সংগীতের কোনো বালাই নেই। একেক সময়ে একেক কল্পনার রঙের সাফারি স্যুট পরে প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজেও তৃপ্ত আর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সাথে গলা মিলিয়ে গাইতেন। তারপর শুরু হতো ভাষণ, অনেক রাজনৈতিক কথাবার্তা, উন্নতির জোয়ারে ভাসার কথা, নিতু বা তার বান্ধবীরা যার একবর্ণও বুঝত না, কিন্তু তাদের আটকে রাখা হতো যতক্ষণ অনুষ্ঠান শেষ না হয়। সারা দিন মাঠে বসে থাকা আর রোদে পোড়া নিতুর একদম ভালো লাগত না। দুবার শিঙাড়া, মিষ্টি আর পেপসি

পাওয়া যেত, অনুষ্ঠানের ওই ব্যাপারটাই কেবল ভালো লাগত তার। আপা বলেছিল তারা ছোট থাকতে প্রেসিডেন্ট এলে অন্য একটা গান গাইত, 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ', সেটা ছিল আগের প্রেসিডেন্টের প্রিয় গান। নিতুর কাছে মনে হতো প্রেসিডেন্টরা গান শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন আর তাদের প্রিয় গান সবাইকে গাইতে হবে, এটাই দেশের আইন। লম্বা-চওড়া পরিপাটি প্রেসিডেন্টকে দেখলে মনে হতো অমায়িক মানুষ। তবে তার ব্যাপারে যে অন্য রকম ধারণা সবাই দিত তা-ও নিতুর মনে পড়ত। ঢাকা থেকে রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের দলটি যখন তাদের ছোট শহরে প্রশিক্ষণের জন্য আসত, ঋতুর সাথে সে-ও তখন গানের স্কুলে যেত। একটি ছেলে হেঁড়ে গলায় গায়ের শক্তি দিয়ে সা-রে-গা-মা উচ্চারণ করছিল দেখে প্রশিক্ষক ওয়াহিদুল হক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এমনভাবে সা-রে-গা-মা বলছ যেন জেনারেল এরশাদ!'

মাঠের অনুষ্ঠানে একদল ছেলেপেলে থাকত, যারা, নিতু জানে না কেন, খুব ব্যস্ত। তারা সারাক্ষণ এদিক-ওদিক দৌড়ে যেত, একে-ওকে ধমকাত, আবার স্টেজের দিকে হেলে পড়া মানুষের ঢল সামলাত। পেছনের মানুষের চাপে সামনের সারির মানুষেরা রঙিন দড়িগুলো ছিঁড়ে আছাড় খেয়ে পড়লে কখনো না পারতে গিয়ে তারা লাঠিও ব্যবহার করত। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হতো ওই মুহূর্তে তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর, এমন কিছুই নেই যা তারা করতে পারে না, তাদের ইশারায় সমগ্র বাংলাদেশে ভয়ানক ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দলের একটি ছেলেকে যেন নিতুর কাছে রিংকুর মতো লাগছিল! জায়গা থেকে ওঠার নিয়ম নেই বলে নিতু কাছে গিয়ে দেখতে পারছিল না। মুখ স্পষ্ট দেখতে না পেলেও হাঁটাচলা দেখেই নিতু বলে দিতে পারত যে ওটা রিংকু। কিন্তু ভাইয়া ওখানে কী করছিল? তার তো তখন কলেজে থাকার কথা। নিতু সকালের কথা মনে করার চেষ্টা করছিল। হ্যাঁ, সেদিন সকালে তো কলেজের কথা বলেই বাসা থেকে বের হয়েছিল। কলেজের ছাত্রদেরও কি তাদের মতো ওখানে যেতে হতো? বোধ হয় না। আর সেভাবে গেলে নিশ্চয়ই এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে হবে, ছোটাছুটি করে তদারকি করতে পারবে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ভাইয়াকে দেখা যাচ্ছিল, তারপর আবার যেন কোন দিকে হাওয়া। একবার কাকে যেন একটা কাগজ দিতে চৌকি দিয়ে বানানো উঁচু স্টেজটার ওপরে উঠে গেল, তখন নিতু নিশ্চিত হলো, ওটা ভাইয়াই। নিতু সেদিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে ছিল, ভেতরে-ভেতরে নানা রকম সন্দেহ আসতে লাগল। ভাইয়া কি তবে ওইরকম একটা দলে যোগ দিয়েছিল যেগুলোকে বাবা খুব খারাপ বলত? বাবা প্রায়ই ভাইয়াকে বলত, 'শোন, রাজনীতি-টাজনীতি করলে কিন্তু এ বাসার ভাত উঠে যাবে তোর, মনে রাখিস।' কিন্তু নিতুর জানামতে, নেতারা এলে এই ছোটাছুটি, এই সমস্ত কাজকর্ম রাজনৈতিক দলের ছেলেরাই করত। তাদের আর পড়াশোনা তেমন হতো না, ওরকমই নিতু অনেক দিন ধরে শুনছিল। ভাইয়া কি তাহলে কলেজের নাম করে ওসব করে বেড়াচ্ছিল? নিতুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, বাবা যা রাগি, জানতে পারলে কী হবে কে জানে! বাবাকে বলার সাহস অবশ্য নিতুর ছিল না।

বাসায় ফিরে সেদিন আপাকে বললে আপা অবাক হয়ে গেল, বারবার জানতে চাইল, 'তুই ঠিক দেখেছিস তো?' তারপর খাওয়ার সময় আপা বলল, 'ভাইয়া, আজ তোমার এত দেরি হলো– ভাইয়া সাথে সাথে বলল, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছিল তো, তাই।' ব্যস, আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে ভাইয়া ওসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই বাবার ভয়ে বলছে না। সেদিন ভাইয়ার ঘরে রাগারাগি হওয়ার পর থেকে তপু ভাই আর আসেনি। তবু আপার খুব একটা মন খারাপ বলে মনে হয়নি। রাস্তায় অবশ্য তপু ভাইয়ের সাথে তার মধ্যে একবার দেখা হয়েছে নিতুর। সাইকেল থামিয়ে তপু ভাই বলেছিল, 'নিতু, ভালো আছ?' নিতু ভালো আছে বলাতে বিষণ্ন হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'ঋতু কেমন আছে?' মনে হচ্ছিল উত্তরটা জানাই আছে, কেবল আপার নামটা নিতে ইচ্ছে হলো বলে প্রশ্নটা করা। আপার ভালো থাকার কথা শুনে একইরকম দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে আবার সাইকেলে প্যাডেল দিয়েছিল। নিতু ওসবের মানে বুঝত না, কী যে হলো ওদের মধ্যে! আপাকে জিজ্ঞাসা করলে আপা বলত, 'ধ্যাৎ, তপু শুধু শুধু ভাইয়ার নামে যা-তা বলে। বলে ভাইয়া নাকি ফেনসিডিল খায়, বুঝলি? তপু মিথ্যুক একটা।'

'ফেনসিডিল কী আপা?'

'ফেনসিডিল কাশির ওষুধ।'

'কই, আমি তো ভাইয়াকে কাশতে দেখিনি!'

'আরে ধ্যাৎ, গাধা কোথাকার! মানুষ নেশা করার জন্য ওটা খায়। তপু খামাখা ভাইয়ার নামে আজেবাজে কথা বলে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করি না। ভাইয়া বলেছে কলেজে তপু সবার কাছে ভাইয়াকে খারাপ দেখাতে চায়।'

'তুমিও কি তপু ভাইকে বাসায় আসতে মানা করেছ?'

'না, তবে আমি ওর সাথে ভীষণ রাগ করেছি।'

কয়েক দিন পরে তপু ভাই দুপুরের পরে একবার এলো। মুখে কোনো লজ্জা লজ্জা ভাব ছিল না তার। তার বদলে কেমন যেন অসহায় মুখ করে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে মনে হলো যেন না আসতে পারলেই বেঁচে যেত, কিন্তু কোনো একটা কিছু যেন তাকে টেনে এনেছে। নিতু তাকে দাঁড়াতে বলে আপাকে খবর দিতে এলে আপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'গিয়ে বল, আমি বাসায় নেই।' মিথ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে নিতুর এত খারাপ লাগছিল! শুনে তপু ভাই আর কোনো কথা বলেনি। পেছনে রাস্তা খালি আছে কি না, দেখে নিয়ে রওনা দিয়েছিল। মুখটা এক ঝটকায় কালো হয়ে গিয়েছিল তার। শুধু মিথ্যে বলার জন্য নয়, তাকে মনমরা দেখেও নিতুর কষ্ট হচ্ছিল। নিতু নিজেও বুঝতে পারছিল তার মিথ্যে বলার কায়দাটা সুন্দর হচ্ছে না। কিন্তু তবু তপু ভাই হাসেনি বা বলেনি, 'দুষ্টুমি করলে ভালো হবে না, নিতু!'

তপু ভাইয়ের জন্য নিতুর খারাপ লাগত, মাঝে মাঝে বুকের ভেতরে ব্যথা করত। কোনো কোনো রাতে তপু ভাইয়ের মুখ মনে করে খুব বিষণ্ন লাগত, ঘুম আসত না। আপার ওপরে খুব রাগ হতো, তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে ইচ্ছে হতো না। আপা তার গায়ের ওপর হাতটা দিলেও ইচ্ছে করত সরিয়ে দেয়। দু-এক সপ্তাহ পর পর তপু ভাই আসত আর একইভাবে নিতুর কথা শুনে ঘুরে চলে যেত। নিতুর কান্না পেত তাকে আসতে দেখলে। তবে আপাকে গিয়ে বলার দরকার ছিল না আর। আপা তো বলেই দিয়েছিল, 'তপু এলে বলবি আমি বাসায় নেই।' তখন কেন যেন নিতুর ইচ্ছে করত তপু ভাইয়ের হাতটা একটু ধরে, একেবারে বলেই দেয়, 'কেন আসো বারবার? তুমি কি কিছুই বোঝো না? আপা মিথ্যে বলে তোমাকে ফিরিয়ে দেয়, বুঝতে পারো না?' কিন্তু বলত না। তপু ভাই মাঝে মাঝে আসত, বিষণ্ন চেহারায় কখনো নিতুর দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসত, না এলে তা-ও তো নিতু হারিয়ে ফেলবে, সেটাই ছিল তার ভয়। ওই সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত তপু ভাইকে দেখার লোভ সামলাতে পারত না নিতু। কখনো ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সে নিচের রাস্তার দিকে ঘনঘন তাকাত, বারবার মনে হতো, এখনই সাইকেলের পরিচিত বেল শুনতে পাবে। তারপর হেমন্তের পরিষ্কার আকাশে উদাস চোখ রাখত– আকাশ কি আগেও এতটা নীল ছিল? বোধ হয় আগে কখনো সেভাবে খেয়াল করেনি। মেঘ এমন সাদা আর তুলোর মতো নরম হয় তাও কোনো দিন সেভাবে ভাবা হয়নি। পেয়ারাগাছের নিচে শুধু শুধু বসে থাকতে আর ভালো লাগত না। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে একগুচ্ছ মেঘের সাথে তার দৃষ্টি আকাশের এদিক থেকে ওদিকে চলে যেত। সন্ধ্যার আগে আগে দল বেঁধে পাখিরা তাড়াহুড়ো করে কোথায় যেন চলে যেত, পাশের বাঁশঝাড়টায় অসংখ্য চড়ুই পাখির মেলা বসত। দিনশেষে কে কোথায় সারা দিন কী করেছে, চেঁচামেচি করে সেসব একজন আর একজনকে বলত। নিতু কান খাড়া করে তাদের ভাষা আর বাচনভঙ্গি ধরার চেষ্টা করত। পাখসাটকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আবার আকাশের ক্যানভাসে চোখ রাখত। পুরোটা আকাশে কে যেন নানান রঙ ছিটিয়ে দিত, মেঘগুলোর গায়ে লালচে গোলাপি আর বেগুনি

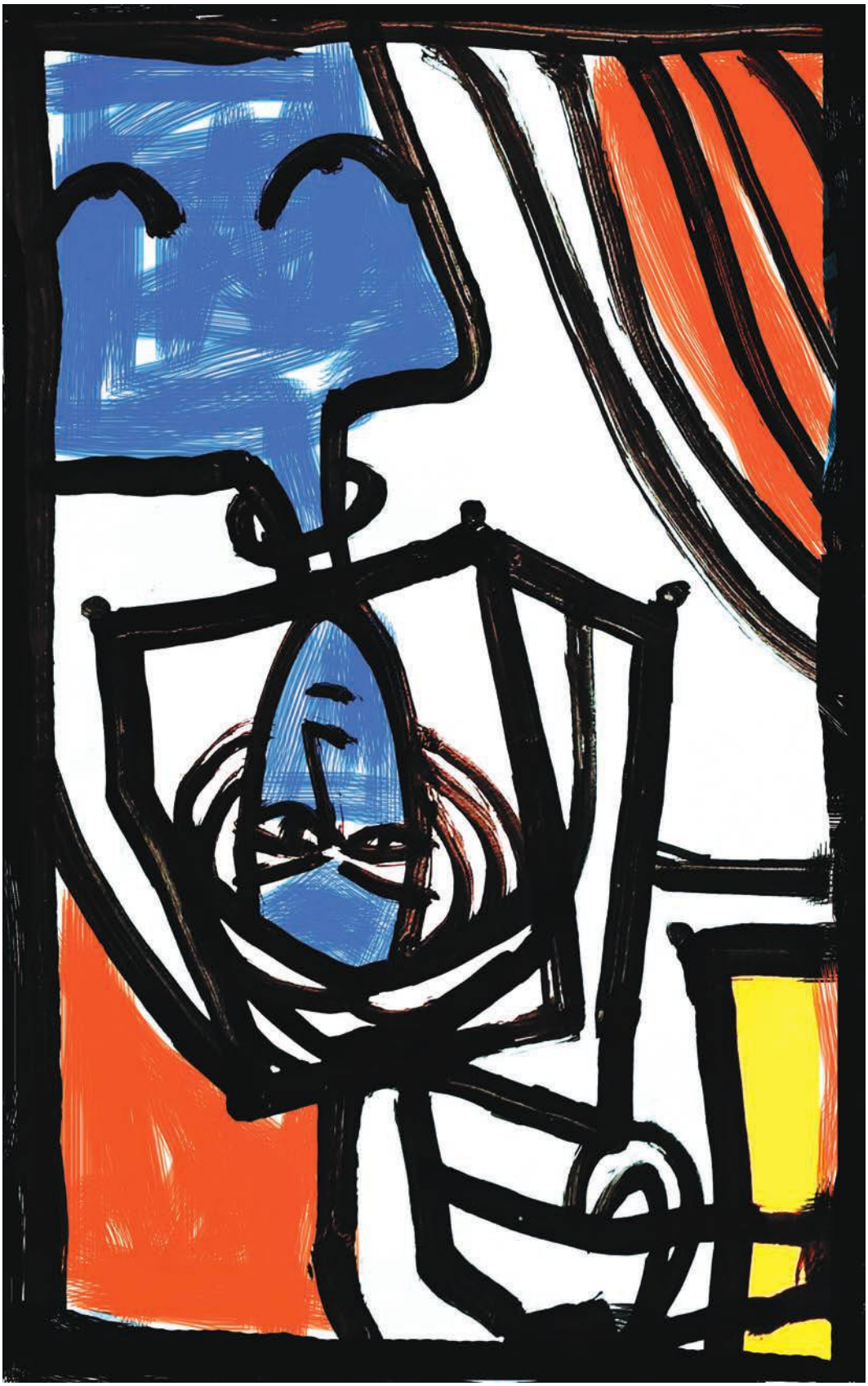

রঙ লাগত। নিতুর হঠাৎ খুব কান্না পেত, গাল বেয়ে পানি পড়তে থাকত, কিন্তু ঠিক কী কারণে তা সে বুঝত না। ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একদিন যেন তক্ষুনি খবরটা প্রথম জানতে পারল– তপু ভাইয়ের মন খুব খারাপ। মনে হলো ভেতর থেকে কে যেন বলল, তপু ভাই কি আগের মতো হাসবে না? সেই মুহূর্তে তপু ভাইকে খুশি দেখার চেয়ে বড় কোনো চাওয়া নিতুর ছিল না।

সে সময়ে যখন-তখন অচেনা কিছু ছেলে ভাইয়ার খোঁজে বাড়িতে আসত। নিতুর চোখে তাদের দেখতে গুন্ডাপান্ডার মতো লাগত। তাদের মধ্যে কারও কারও মুখ চেনা চেনাও মনে হতো। গার্লস স্কুলের সামনে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকত তাদের কেউ কেউ। স্কুল থেকে কাউকে নিতে আসত বলে মনে হতো না, কেবল বড় মেয়েরা স্কুল থেকে বের হলে তাদের দিকে ইশারা করে নিজেদের মধ্যে নানান রসিকতা করত, শিস দিয়ে গান গাইত। ক্লাসে একদিন ম্যাডাম বলেছিলেন, 'তোমরা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলোর সাথে কখনো কথা বলবে না। ওরা কিন্তু নিজেদের স্কুল-কলেজে যায় না। গার্লস স্কুলের সামনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তাদের জীবন কেটে যায়।' ছেলেগুলো ভাইয়ার কাছে এলেও অবশ্য বাসায় ঢুকত না, কেবল তাকে ডেকে নিয়ে চলে যেত। ভাইয়া আগে যেকোনো সময় বাসার বাইরে যেতে পারত না, বাবার কড়া নিষেধ ছিল। কলেজ পেরিয়ে যাচ্ছে বলে হয়তো বাবা আর তেমন কিছু বলতেন না। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাইয়া তখন মায়ের কাছে কলেজের জন্য বের হবার আগে টাকাও চাইতে আসত না। আগে বাড়তি টাকার জন্য মায়ের কাছে কত ঘ্যানঘ্যান করত! বাবাকে লুকিয়ে মাকে টাকা বের করে আনতে হতো ভাইয়ার জন্য। আজ বই বা খাতা, কাল কারও জন্য জন্মদিনের উপহার– লেগেই থাকত। আপা ভাইয়ার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'নিতু তোমাকে জনদলের ছেলেদের সাথে দেখেছে ভাইয়া, তুমি কি রাজনীতি করো?'

'করি। তাতে তোর কী? আর শোন, বাবাকে বললে এক থাপ্পড় খাবি।'

'কেন করো ভাইয়া? জানোই যখন বাবা পছন্দ করেন না–' অসহায় গলায় বলেছিল ঋতু।

'কেন, রাজনীতি করলে কি মানুষ নষ্ট হয়ে যায়? বাবার এসব ভুল ধারণা। বাবাকে আমি বোঝাতে পারব না, তাই বলারও দরকার নেই।'

'তোমার কী লাভ ভাইয়া এসব করে? তোমার কলেজ, তোমার পড়াশোনা-হু

'লাভ মানে? পড়াশোনা করে শেষ পর্যন্ত তো একটা চাকরিই করব। এটাও একটা চাকরির মতো! দলের কাজ করলে আমি টাকা পাই, লাভ না? আর ক্ষমতা নামে একটা জিনিস আছে, সেটা জানিস? এখন আমাকে সবাই ভয় পায়। মানুষ ভয় পেলে খুব মজা লাগে।'

'তুমি আর এখন বাবাকে ভয় পাও না, না ভাইয়া?'

ভাইয়া আপার এই প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলেনি। এমন চোখে অন্যদিকে তাকিয়েছে যেন কিছু খারিজ করে দিল। আপা মরিয়া হয়ে জানতে চাচ্ছিল, 'তোমার এত টাকার কী দরকার পড়ল ভাইয়া? মা কি তোমাকে টাকা দেন না?'

'টাকার দরকার কার নেই বল তো? মা যে টাকা দেয় সে টাকায় আমার হয় না। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চলাফেরা করতে হলে অনেক টাকার দরকার, বুঝলি? সারাক্ষণ মায়ের এই নেই নেই শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

আপা আর কোনো কথা বাড়ায়নি। কেন যেন নিতুরও মনে হয়েছিল ভাইয়া অনেক দূরে চলে গেছে, তাকে আর ফেরানো যাবে না, ভাইয়া অন্য কেউ হয়ে গেছে। তবে কি ভাইয়া ফেনসিডিলও খেত? তপু ভাই হয়তো ঠিকই বলেছিল। আপা শুধু শুধু তপু ভাইয়ের সাথে রাগ করল। এই সব ভাবনার ঘোরে নিজের অজান্তে হাতে টান লেগে নিতুর হাতের পুঁতির চুড়ি ছিঁড়ে গেল, ঘরের মেঝেতে চারদিকে পুঁতি ছড়িয়ে পড়ল, খাট কি আলমারির নিচে চলে গেল। অন্যমনস্কভাবে কখনো কখনো নিতু চুড়ির পুঁতিগুলো গুনত। তেইশটা পুঁতি ছিল চুড়িটাতে। বারবার ঝাড়ু দিয়ে টেনেও বাইশটা খুঁজে পেল, আরেকটা কিছুতেই পেল না। পুঁতিগুলো গাঁথতে বসে নিতুর হারানো পুঁতিটার জন্য মন খচখচ করছিল, চুড়িটা একটু ছোট হয়ে যাবে, চোখের সামনে দিয়ে গেল কোথায় পুঁতিটা? তারপর হঠাৎ বুক ভেঙে কান্না এলো, ভাইয়া কি তাহলে ওরকমই হারানো একটা পুঁতি?

নিতুর মনটা তখন খারাপই থাকত। বছর ঘুরে নিতু সেই কবে সালোয়ার-কামিজ পরে স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু কোনো কিছুই আর আগের মতো মজা লাগত না। তার কাছে মনে হতো এই বড় হয়ে যাওয়াটাই কাল হলো, কিছুতেই আর আগের মতো চট করে আনন্দে লাফিয়ে ওঠা যায় না। এত দিন যা যা বুঝতে চাইত, সেসব বুঝতে পেরে কষ্ট তো বাড়ছিলই, কখনো আবার আনন্দও যাচ্ছিল কমে। অবশ্য নিতু তার মনের ব্যাপার-স্যাপার কাউকে বুঝতে দিত না। সে তো আর তখন তত ছোট নেই যে মন খারাপ করে কাউকে দেখিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। তবে ঋতু তেমন বদলায়নি। এসএসসি পরীক্ষা শেষ, তাই বিকেলের দিকে মা ঘুমিয়ে পড়লে সে সেজেগুজে এখানে-ওখানে বেড়াতে যেত। নিতু জানত না কোথায় যায়, তবে একদিন স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তায় ঋতুকে একটা ছেলের সাথে কথা বলতে দেখেছিল। কথা বলার সময়ে ঋতুর মুখের ভঙ্গি আর হাসিতে ঢলে পড়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে দেখে নিতুর গা জ্বলে উঠেছিল। আপার ওরকম মুখ সে আগে অনেকবার দেখেছিল, তপু ভাইয়ের সামনে। সহজেই আপার সাথে নতুন নতুন নানান ছেলেদের বন্ধুত্ব হয়ে যেত। সবার সাথে তার মেলামেশা দেখলে মনে হতো বহুদিনের চেনা আর আপন। এদিকে তপু ভাই দিনের পর দিন, মাস কি বছর, থেকে থেকে আপার খোঁজে আসত। নিতুও অরিরাম একই কাজ করত, একইভাবে হাসত, গেট খুলত, মিথ্যে বলত, গেট লাগাত– নিতুর কখনো ক্লান্ত লাগত না। শুধু তপু ভাইয়ের মুখটা যেদিন দেখত, সেদিন সারা দিন রাগে আপার দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করত না।

নিতু যখন ক্লাস নাইনে, তখন একবার বিকেল বেলায় তপু ভাই এসেছিল বহুদিন বাদে। সাইকেলের বেল বাজেনি। ঘরে বসেই নিতুর হঠাৎ মনে হয়েছিল গেটের সামনে কেউ হর্ন বাজাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে থেকে মোটরবাইকের গিয়ার বাড়াচ্ছে-কমাচ্ছে। নিতু দৌড়ে গিয়ে দেখল তপু ভাই মোটরবাইকে বসে আছে। বহুদিন পরে তপু ভাইয়ের হাসিমুখ। সেই খুশি দেখে নিতু চমকে উঠে বলল, 'হোনডা কিনেছ তপু ভাই?'

'অ্যাই বোকা, হোনডা কোথায়? এটা তো ভেসপা।'

'ওই হলো।'

'ওই হলো মানে? সব মোটরবাইকই হোনডা নাকি? সব জ্বরের ওষুধের নাম প্যারাসিটামল না, আর সব স্লিকার্স কেড্‌স না, বুঝেছ?'

'আচ্ছা বাদ দাও, বাইক নতুন?'

'হ্যাঁ, বাবা কিনে দিল, ঋতুকে ডাকো না একটু, বলো আজ যেন আর রাগ করে না থাকে। আমার সাথে দূরে কোথাও যাবে নাকি জিজ্ঞাসা করে আসো না, প্লিজ। বলো আমি বাইকে বসে আছি।'

মোটরবাইকের হ্যান্ডেল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে এমন করে বলছিল তপু ভাই, যেন কড়া আত্মবিশ্বাস আছে যে ঋতু শুনেই ছুটে আসবে। নিতুর মন খারাপ হয়ে গেল। মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল সে। তপু ভাই অধৈর্য হয়ে বলল, 'কী হলো, নিতু? যাও না তাড়াতাড়ি!'

ঋতু যথারীতি সেদিনও বাসায় ছিল না। আপার ওপর এমন রাগ হলো নিতুর! সামনে থাকা তপু ভাইয়ের ওপর সেই রাগ দেখাতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে করল বলে, 'তুমি কি একটা গাধা? আপা তোমার জন্য এখনো বসে আছে মনে করো? আপা কি আর সেই আপা আছে? গাধা কোথাকার। তুমি বোঝো না কেন, তপু ভাই?' তারপর আবার ভাবল কত দিন পরে তাকে হাসতে দেখছে, কত আশা নিয়ে

এসেছে আপাকে অবাক করে দেবে বলে, তাই কিছুতেই ওরকম করে বলতে পারল না, বরং তাড়াহুড়ো করে বলল, 'তপু ভাই, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

দৌড়ে ওপরে উঠল নিতু। মা ঘুমিয়ে ছিল, ডাকার সাহস হলো না। চুলটা আঁচড়ে নিল তাড়াতাড়ি। তারপর দৌড়ে নেমে জুতোর খোঁজে বারান্দায় এলো। সামনে চাচিকে পেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'চাচি, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। মা ঘুম থেকে উঠলে বলো।'

'কোথায় যাও?'

'এই তো একটু সামনে।'

'ওই যে বাইরে তপু বসে আছে, ওর সাথে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চাচি, তপু ভাই নতুন হোনডা– না না ভেসপা মোটরবাইক কিনেছে তো, তাই।'

'আচ্ছা যাও। ছেলেটা ভদ্র, ভালো বাবা-মায়ের ছেলে, বুঝলে? আমি তোমার মাকে বলে দেব, যাও।'

এক পায়ে জুতো পরে আরেক পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে নিতু বেরিয়ে এলো। তপু হয়তো মোটরবাইকের দিকে তাকিয়ে গুনগুনিয়ে কোনো গান গাইছিল, নিতু এসে দাঁড়ানোর শব্দে থেমে গেল। ঋতুকে দেখতে না পেয়ে তপুর মুখটা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নে বদলে যেতে থাকল। নিতু হুড়মুড় করে বলল, 'তপু ভাই, আপা তো নেই, আমি আসি তোমার সাথে? আমাকে নিয়ে একটু ঘুরবে?' লজ্জায় একটু থেমে নিল তারপর মিষ্টি করে হেসে বলল, 'আমার না খুব বাইকে চড়ে ঘোরার শখ।'

'তুমি যাবে!'

ঋতুকে এত নিশ্চিতভাবে আশা করছিল তপু যে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। একটু ভেবে বলল, 'বাসায় বলে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ, চাচিকে বলে এলাম।'

তপু একটু সামনে এগিয়ে বসে বলল, 'ওঠো, ভালো করে ধরো কিন্তু। ওড়নাটা ঠিক করে পেঁচিয়ে নিয়ো, দেখো ঝুলে থাকে না যেন, চাকায় ঢুকে যাবে, সাবধান।'

নিতু প্রথমে তপু ভাইয়ের ঘাড়ের পেছনে একটা হাত রাখল তারপর সিটে বসল। বাইক স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সে তার চেনা গণ্ডিতে ঘুরপাক খাওয়া জীবন ছেড়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে! এইমাত্র সে স্বাধীন হয়ে গেল। বাতাস গায়ে জোরে ধাক্কা দিল, আনন্দে নিতু হাঁ করে বাতাস গিলতে থাকল। একটু শীত শীত করছিল কিন্তু তাতে ভালো লাগাটা কমেনি। তপু ভাই চিৎকার করে বলল, 'ঠিক করে ধরেছ তো, নিতু-উ-উ?' নিতু তার শার্ট খামচে ধরে চিৎকার করে বলল, 'ধরেছি, তপু ভাই–' বাতাসের ঝাপটায় কথাগুলো ভেঙে গেল। সামনে-পেছনে বসেও কেউ কারও কথা ঠিকমতো শুনতে পেল না। মুখ থেকে বের হয়েই শব্দের তরঙ্গ ভেঙে ভেঙে যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের পাড়াটা পার হয়ে দূরে যেতে থাকলে নিতু আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, তপু ভাই?'

'কোথায় যেতে চাও?'

'আমি তো কোথাও যাই না। জানি না বেড়াতে চাইলে কোথায় যায় মানুষ।'

'হা হা হা... মানুষ কোথায় যায়?'

'হাসির কী হলো?'

'চলো, তোমাকে আমার একটা প্রিয় জায়গায় নিয়ে যাই।'

'কোথায়?'

'আগে চলো, তারপর দেখবে। মানুষ যেখানে যায় না।'

'আমরা কি মানুষ নই, তপু ভাই?'

নিতুর মুখে 'আমরা' শুনতে তখন এত বেশি ভালো লেগে গেল কেন তপু বুঝতে পারল না। বুঝতে না পেরে চুপ হয়ে থাকল। নিতুও তাকে শক্ত করে ধরে বসে থাকল। আরও কিছু পরে তারা শহরের প্রান্ত পেরিয়ে একবারে শান্ত বড় রাস্তায় চলে এলো। সে রাস্তায় মানুষজন তেমন দেখা যাচ্ছিল না। খানিক পরে পরে বাস বা ট্রাক চলে যেতে দেখা গেল। একটা কাঁচাবাজার পার হয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠলে নিতু জানতে চাইল, 'আর কত দূরে, তপু ভাই?'

'এই তো চলে এলাম।'

'এটা কি অনেক দূর?'

'ধুর বোকা, দূর কোথায়! তোমার অবস্থা হয়েছে পথের পাঁচালির অপুর মতো।'

খানিকটা যাওয়ার পর মোটরবাইক বড় রাস্তা থেকে নেমে সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোতে লাগল। এবড়োখেবড়ো রাস্তার ঝাঁকিতে বাইক থেকে নিতুর পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। খুব সাবধানে কাঠ হয়ে বসে থাকল। সামনে তাকিয়ে দেখল ছোট ছোট টিলার মতো। টিলা ওখানে কোথা থেকে এল? নিতু জানতই না তার বাসার এত কাছে এমন পাহাড়-টাহাড় আছে! একটা বড় জায়গাজুড়ে উঁচু উঁচু টিলাগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। নিতু অবাক হয়ে দেখছিল, পাহাড় তো এমনই হয়। সে শুধু ছবিতে দেখেছিল। ছবিতে পাহাড়ের রঙ জায়গায় জায়গায় সবুজ অথবা নীল। ওখানে পাহাড় সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু বিছানার মতো। সিনেমায় গানের দৃশ্যে নায়িকারা আনন্দে ওড়না উড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে যেমন ছুটে যায়, নিতুর ইচ্ছে করছিল মোটরবাইক থেকে নেমে দৌড়ে একটা টিলার ওপরে সে রকম করে উঠে যায়। তারপর একেবারে চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখে নিচের পৃথিবীটা কেমন দেখায়। ওপর থেকে তপু ভাইকে দেখতে কেমন লাগবে? টিলাগুলোর একেবারে পাশে এসে তপু ভাই মোটরবাইক থামাল। বলল, 'এবারে নামো, নিতু।'

'এটা কোথায়?'

'এটা এমন একটা জায়গা যে কেউ জানে না। গোপন জায়গা বলতে পারো।'

'মানে?'

'মানে এটা শহর থেকে একটু দূরে তো, এদিকে মানুষজনও কম, তাই কেউ অত আসেটাসে না।'

'আমাদের এখানে এত পাহাড় আছে আমি জানতামই না, তপু ভাই।'

'হা হা হা... পাহাড় কোথায় বোকা? আসো দেখাই–'

নিতু তপুকে অনুসরণ করল। একটা টিলা পেরোলে সামনে আরেকটা। সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেই এগিয়েছে নিতুর চোখের আর পলক পড়ছিল না। সামনে বিশাল এক দীঘি আর তার ওপরে হাজার হাজার গোলাপি পদ্ম– যেন নিতুর দিকে তাকিয়ে। পুরো দীঘিটাই শুধু সবুজ আর গোলাপিতে মাখামাখি। নিতু থমকে দাঁড়াল, চোখ ফেরাতে পারল না। দীঘির চারদিকে সারি হয়ে দাঁড়িয়ে টিলাগুলো, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যে বাইরের কিছু দেখা যাবে। বাইরে থেকে এ জন্যই বোঝা যায়নি ভেতরে দীঘির অস্তিত্ব। একটা সাদা বক দুদিকে পাখা মেলে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে পাড়ে বসল। নিতু তখন আর নিজের মধ্যে নেই, হঠাৎ তপুর হাত চেপে ধরে বলল, 'এটা কি একটা দীঘি, তপু ভাই?'

'হ্যাঁ, দীঘিই তো, দেখতে পাচ্ছ না? আর তোমার পাহাড় হলো এই দীঘির মাটি দিয়ে তৈরি, মানুষের বানানো দীঘি আর পাহাড়, বুঝেছ? হা হা হা.... আসো বসি ওই গাছের নিচে।'

'তুমি কি এখানে প্রায়ই আসো?'

'দু-তিনবার এসেছি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না নিতু। বারবার যেন ভুলে যাচ্ছিল সে কোথায় আছে, কার সাথে আছে, সব কেমন গোলমাল লাগছিল। কাছাকাছি একটা পদ্মের দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল সে। মাঝখানে গাঢ় গোলাপি আর ধারের দিকে ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে, ওপরে একটা ভোমরা উড়ে উড়ে বসছিল বারবার। বকটা খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছিল। আরেক পাড়ে এক সাথে বেশ কিছু দুধসাদা বক দাঁড়িয়ে ছিল।

বোধ হয় এখানে মাছ পেত তাই ভিড় করত। চারদিকে কোথাও কোনো মানুষ ছিল না, টিলার সারির বাইরেও যেন আর কিছু নেই, সেখানেই সেই ঘেরাটোপের মধ্যে চারদিকের পৃথিবীটা যেন শেষ হয়ে গেছে। কোনো শব্দ ছিল না, এমনকি দূরে পাখিদের নড়াচড়ার শব্দ, তপু ভাইয়ের আর নিজের নিশ্বাস পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল নিতু। তার মনে হলো এটা কি অপার্থিব কোনো জগৎ? স্বপ্ন নয় তো! মনে হলো নিজেকে চিমটি কেটে দেখা যেতে পারে। হঠাৎ একটা নীল পাখি নিতুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে সামনের পদ্মফুলগুলোর পাশে বসল। ঠোঁট আর চোখ তীক্ষ্ণ করে পানিতে মাছ খুঁজতে লাগল।

'এটা কি মাছরাঙা, তপু ভাই?'

'এটা মাছরাঙা। তবে আর কিছুদিন পরে শীত এলে শীতের পাখিরাও আসবে দল বেঁধে। তখন অবশ্য এখানে একটু ভিড় হবে, দূর থেকে মানুষ বেড়াতে আসবে, পাখি দেখতে আর পিকনিক করতেও আসবে।'

'আশ্চর্য লাগছে, বাসার কাছেই এমন একটা জায়গা আছে অথচ আমি জানিই না!'

'কাছে কোথায়? তুমি না বললে দূর!' তপু মুচকি মুচকি হাসে। লজ্জা পেয়ে হাসে নিতুও। বলে, 'আসলে জানবই বা কী করে। যা-ই হোক, তোমাকে কী যে বলব, তপু ভাই, আজ এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি। সুন্দর আর লম্বা একটা স্বপ্ন।'

উত্তেজনায় নাকি কৃতজ্ঞতায় নিতুর গলা ধরে এলো, চোখ ভিজে গেল। নাক দিয়ে জোরে বাতাস টেনে সে নিজের অনুভূতিটা লুকোতে চাইছিল। তারপর হঠাৎ বলল, 'তপু ভাই, শীতের পাখিদের কী মজা, না? কত জায়গা, কত দেশ ঘুরতে পারে!'

'মজা আর কী? দুদিন পরপর দূরে উড়ে যাওয়া, ক্লান্তি আর তা ছাড়া নিজের বাড়ি ফেলে এসে আবার নতুন করে বাসাবাড়ি বানানো—সেসব ঝামেলাও তো আছে।'

'তবু, একখানে ভালো লাগল না তো চলে গেলাম অন্য কোথাও, মজা না?'

'বাসায় তোমার ভালো লাগে না, তাই না নিতু?'

'তুমি কী করে জানলে?' নিচু গলায় জানতে চায় নিতু।

'তুমি খুব ইমোশনাল, নিতু। ঋতু কিন্তু এ রকম নয়। সে খুব শক্ত। আমাকে তার আর ভালো লাগে না, আমি জানি। সে একজন মানুষকে বেশিদিন ভালোবাসতে পারে না, কারও জন্য তার মায়া হয় না।'

'বোঝোই যখন তাহলে কেন বারবার আপার খোঁজে আসো?'

'তা তো জানি না। আমার শুধু মনে হয় ঋতুর কোনো দিন আমার কথা মনে পড়বে, সে হয়তো আমাকে খুঁজবে। আমি তো আর তার মতো শক্ত নই। তবে আর বেশিদিন আসব না। আমিও চলে যাব শীতের পাখিদের মতো।'

'কোথায়?'

'আমেরিকা।'

'তাই নাকি! কবে?'

'এই তো, বিকম পরীক্ষার পর। বাবা রাজি হয়েছে। যাওয়ার চেষ্টা করছি, দেখি কী হয়।'

নিতু চুপ করে থাকল। তার মনে হলো সে কথা বলতে গেলেই কেঁদে ফেলবে। মনে হলো তপু ভাই নিশ্চয় আপার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে করল ওই মুহূর্তে তপু ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তপু ভাই, তুমি প্লিজ যেয়ো না।' কিন্তু কেন যেন কিছুতেই তা করতে পারল না। নিজেই নিজের ভাবনার জন্য লজ্জা পেল। তপু ভাই হয়তো ভালোই থাকবে সেখানে গেলে। এখানে একই শহরে বসে থেকে থেকে আপার জন্য কষ্ট পেয়ে কী লাভ? দূরে গেলে হয়তো ভুলে যাবে। সেই ভালো। তারপর আবার কেন যেন অবাধ্য মনটা ভেতরে-ভেতরে উচ্চারণ করতে লাগল, 'তপু ভাই, আমি যে তোমাকে আর দেখতে পাব না—সেটা কি তুমি একবারও ভেবেছ?' তখন সত্যিই নিতুর চোখ থেকে দুই ফোঁটা পানি ঘাসের ওপরে পড়ে শিশিরের বিন্দুর মতো হয়ে থাকল। তপু দুই হাত পেছনে ঠেস দিয়ে পা এলিয়ে বসে ছিল, মুক্তোর মতো বিন্দু দুটোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল, 'আরে, কী হলো নিতু? তোমাকে নিয়ে তো দেখি ভারি ঝামেলা! এখন আবার কাঁদছ কেন?'

নিতুর ইচ্ছে করল তপু ভাইয়ের হাতটা একটু ধরে তারপর যত কান্না গলার কাছে আটকে আছে সব উগরে দেয়। তার বদলে নিতু কেবল একটু ফুঁপিয়ে উঠল একবার। তপু তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। বলল, 'প্লিজ, চুপ করো। হঠাৎ কেউ চলে এলে ভাববে আমি তোমাকে জোর করে এই নির্জন জায়গায় ধরে এনেছি। প্লিজ, কান্না থামাও।'

নিতু সাথে সাথে চোখ-মুখ মোছা শুরু করল। তারপর চুপচাপ দেখতে লাগল সামনের ফুলগুলোকে। অন্য ভাবনায় ব্যস্ত হতে চাইল। সামনের পদ্মফুলগুলোর দিকে ভেজা ভেজা চোখে তাকাল। ঝাপসা থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল সবুজ আর গোলাপি রঙ। এই ফুলেরা কি প্রতিদিনই এমন করে ফোটে? নিতু কখনো পদ্ম দেখেনি; আর একসাথে এতগুলো তো নয়ই। কোনো দিন লাল বা নীল শাপলাও দেখেনি। কেবল সাদাটা দেখেছিল, বাসার আশপাশের ডোবায় যেগুলো ফুটে থাকে। নিতু ভাবছিল আর হাসছিল। তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, 'আমি না আসলে জীবনে কিছুই দেখিনি।' তপু তখন অন্য মনস্ক। বলল, 'কী বললে, নিতু?'

নিতু মুখ নিচু করে বলল, 'কিছু না, তপু ভাই।'

বাতাসে নিতুর খোলা চুল উড়ে উড়ে মুখের ওপর আছড়ে পড়ছিল। হাতে পেঁচিয়ে খোঁপা করতে চাইল সে। তপু বলল, 'রাখো না, ভালো লাগে তোমাকে খোলা চুলে।'

নিতুর হাত থেমে গেল। তপুর দিকে তাকিয়ে হাসল। দেখল তপু ভাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিতুর মনে হলো এভাবে কেউ কখনো তাকায়নি তার দিকে। তারপর ঘাস খুঁটতে খুঁটতে তপু বলল, 'নিতু, তুমি দেখতে একেবারে ঋতুর মতো, এটা কি তুমি জানো? শুধু ঋতুর চুল কোঁকড়া আর তোমারটা ঝরঝরে সোজা।'

নিতু দেখল তপু ভাইয়ের মুখে সেই বিষণ্ণতা আবার ভর করেছে। বছর দুয়েক ধরে নিতু তাকে যেমন দেখছিল। মাথা নেড়ে সে 'হ্যাঁ' বলল আর মুখে বলল, 'আপা তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, তাই না তপু ভাই?'

'হ্যাঁ, তা তো দিয়েছেই, কষ্ট কি আর চাইলেই সবাই দিতে পারে?'

তপুর মুখ হতাশ না নিশ্চিন্ত নিতু সেদিকে কয়েকবার তাকিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। টিলার ওপারে সূর্য লাল হতে হতে ডুবে যাচ্ছিল। পুরো জায়গাটা আরও থমথমে হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কেমন এক বিষাদে ডুবে গেল সবকিছু। ওরকম সুন্দর একটা পরিবেশ অথচ এত মন খারাপ করা! নিতু আগে কখনো জানত না যে ভয়ংকর সুন্দর কিছু দেখলে কাউকে সুখের অনুভূতির জায়গায় কোনো যন্ত্রণা চেপে ধরতে পারে। আবার ওই কষ্টে যে তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তা-ও নয়। কিন্তু যেন কারও সহানুভূতি পেতে ইচ্ছে করছিল...কার? হয়তো তপু ভাইয়ের। তবে নিতু সে কথা মুখ ফুটে বলেনি। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সেই মুহূর্তটিতে নিতু জানতে পেরেছিল, পৃথিবীর সব সৌন্দর্যই সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে অসহায় করে দেবার জন্য।

ওদিকে তপু কেমন যেন মূর্তির মতো হয়ে গেল। সূর্যটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিতু, চোখ সরিও না, দেখো এক্ষুনি উধাও হয়ে যাবে তোমার ওই পাহাড়ের নিচে।'

নিতু তার কথামতো একভাবে সেদিকে তাকিয়ে ছিল। কদিন আগেও ছাদ থেকে এ রকম ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকালে তার মনে হতো আকাশ জুড়ে বিশাল একটা ডিমপোচ। তবে তখন কেন যেন কিছুতেই তেমন মনে করতে পারেনি। সূর্য ডুবতে লাগল আর

চোখের সামনে পুরো জায়গাটা অন্য রকম হয়ে গেল। একই পদ্ম, বক, দীঘি, অথচ একেবারে আলাদা ছবি তখন। যেমন নিতুদের বাসার সাদাকালো টেলিভিশনে দেখা একই বিজ্ঞাপন চাচিদের রঙিন টেলিভিশনে অন্য রকম লাগত, নিতু খেয়াল করেছে। তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, এত দিন সে কেবল চোখ দিয়ে দেখত, সেদিন দেখছিল চেতনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে। চোখ আর চেতনা একসাথে মিলে যে ছবি তৈরি করছিল তা হয়তো কখনো হারিয়ে যাবে না, নিতু জানত। কোনো দিন ভুলবে না সেদিনের সেই সন্ধ্যাটা। ধূসর আকাশে লাল বৃত্তটা হারিয়ে গেলেও নিতু সেদিকেই তাকিয়ে থাকল। স্তব্ধ হয়ে থাকা নিতুকে দেখে তপু বলল, 'উঠবে না? রাত হয়ে যাবে বাসায় যেতে যেতে। অসুবিধা নেই তো?'

'হায় হায়, বাসার কথা তো আমার এতক্ষণ মনেই পড়েনি। তপু ভাই, চলো চলো, বাবা হয়তো এতক্ষণে বাসায় ফিরে এসেছেন।'

গেটের সামনে এসে মোটরবাইকে ব্রেক করার সাথে সাথে বাসায় চাপা উত্তেজনা প্রথম লক্ষ করল নিতু। নিতুর চাচা গেটের সামনে পায়চারি করছিলেন। পাড়ায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। অন্ধকারেও চাচার অস্থির চলাফেরায় ভয়াবহ কিছুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ওরা নামতেই চাচা দৌড়ে এসে জানতে চাইল, 'নিতু, ঋতুকে দেখেছ নাকি কোথাও?'

'না তো। কেন, কী হয়েছে?'

'ঋতু এখনো বাসায় ফেরেনি।'

'চলে আসবে চাচা, আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?'

'কী জানি মা, তাকে নাকি এক বখাটে ছেলের সাথে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়তে দেখা গেছে। তোমার বাবার অফিসের পিয়ন দেখেছে। বুঝতে পারছ নিশ্চয়। এখন কী হবে মা? আমাদের মানসম্মান তো আর কিছুই রইল না। তুমি বরং তোমার মায়ের কাছে যাও।'

নিতু বাসায় ঢোকার আগে তপুর দিকে একঝলক তাকাল। তার মুখটায় যেন ওই মুহূর্তে কেউ চাচার মুখের চেয়েও বেশি কালি লেপে দিয়েছে। মানসম্মান যা যাওয়ার গেছে যেন তার। চাচা কোনো কথা না বলে লাফিয়ে মোটরবাইকের পেছনে উঠে বসল, পা জায়গামতো রাখতে রাখতে বলল, 'তপু, চলো তো ঋতু যেসব বাসায় যায়, একবার খুঁজে আসি। বাসস্ট্যান্ডেও না হয় যাই একবার।'

তপু বাইকে স্টার্ট দিয়ে মাটি থেকে পা উঠিয়ে নিল।

৪

লম্বা বারান্দার শেষ মাথায় শোয়ানো ইজি চেয়ারে বাবা বসে ছিলেন। অন্ধকারে স্থবির বাবাকে স্বর্গের গেটের দারোয়ান বলে মনে হলো নিতুর কাছে। মনে হলো বাবা কিছুই দেখছে না বা ঝিমিয়ে পড়েছে কিন্তু স্বর্গের সীমায় পা দিলেই খপ করে ধরে ফেলবে। নিতু যেই গুটি গুটি পায়ে বাবাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল, বাবার হুঙ্কার শোনা গেল,

'এই যে একজন এসেছে! আরেকজন কই? এত রাত করে কোথা থেকে আসছ?'

'আমি তো তপু ভাইয়ের সাথে একটু বাইরে গিয়েছিলাম, বাবা।'

'কোন তপু? ঋতু কোথায়?'

'পাশের পাড়ার তপু ভাই। আমি বের হওয়ার আগেই আপা বেরিয়ে গেছে।'

'বাহ্! ছেলেটা হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেছে অনেক আগেই। এখন তোমরা দুই বোন মিলে করছটা কী? তোমাদের মা কিছুই জানে না! তুমি তোমার মাকে না বলে বাইরে গেছ কেন?'

'মা তো তখন ঘুমিয়ে ছিল বাবা, আমি চাচিকে... '

'ঘুমিয়ে থাকলে ডাকা যায় না? যাও। ওপরে যাও।'

বাবার শেষ ধমকটা সারা বাড়িতে গমগম করতে লাগল। সামনে দাঁড়ানো নিতুর কানে তালা লেগে গেল। জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে ওঠার সময়ে নিতুর মনে হলো, বছরের পর বছর দুই-তিন প্রজন্মের ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া বাসার ভিতটা আজ সত্যিই নড়ে উঠল; তবে বাবার চিৎকারে নয়, আপার চলে যাওয়ায়।

নিতু জানতই এমন কিছু একটা হবে। আপাকে আজ এই ছেলের সাথে কাল ওই ছেলের সাথে এখানে-ওখানে দেখা যেত। নিতুর বান্ধবীরাও সেসব বলত। ছোট শহর, সবাই সবাইকে চিনত। মা অনেক মানা করেও ঠেকাতে পারেনি আপাকে। বাবা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অফিসে কাটিয়ে সহজেই এই সবকিছুর বাইরে থাকত। আপাকে নিয়ে নিতুর ভাবনা হতো ঠিকই, কিন্তু আপা যা করল তেমন কিছু করলে পরিস্থিতিটা ঠিক কেমন হতে পারে তা নিয়ে কিছু ভেবে রাখেনি সে। মা মরার মতো বিছানায় শুয়ে ছিল, দরজার কড়ার শব্দে ধড়ফড় করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'ঋতু এলো?' তাকে দেখে মনে হলো হঠাৎ করেই তার বয়স বেড়ে গেছে। কপালে সব সময় যে টিপ থাকত, সেটা নেই; শাড়িও আলুথালু। মা বুকের কাছে শাড়ির পাড় সব সময় টানটান করে রাখত কিন্তু তখন সব অগোছালো। বিকেলের ঘুম থেকে জেগে চুলে চিরুনি পড়েনি, বোঝাই যাচ্ছিল। বিছানায় নিতু মায়ের পাশে বসল। মা মরা মরা গলায় জানতে চাইল, 'নিতু, তোর কি মনে হয়, ঋতু আসবে না?'

দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিতু দেখল সাড়ে সাতটা বাজে। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে বলল, 'আমি কী করে বলব মা, আরেকটু দেখি।'

'সত্যি করে বল, তোকে কি কিছুই বলে যায়নি?'

'সত্যি মা, আমাকে কিছুই বলে যায়নি। জানলে আমি এত নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াই? অন্তত তোমাকে তো বলতাম!'

মা হতভাগ্যের মতো কান্না শুরু করল। ওভাবে মাকে কখনো কাঁদতে দেখেনি নিতু, যেন বুকের গভীর থেকে চাপ চাপ বেদনা উঠে আসছিল। নিতু ঠিক জানত না, মায়ের অতটা ভেঙে পড়া কি আপার ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে, নাকি নিজেদের অপমানের কষ্টে? পাড়ায় তখনো কেউ জানেনি। কাল যখন সবাই জানবে– কী হতে পারে তখন! নিতু চুপচাপ বসে ভাবার চেষ্টা করল। মাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করল না। নিতু জানত সান্ত্বনা দিয়ে কোনো লাভ নেই। চাচি নিঃশব্দে ঘরে এলো, মায়ের ঘাড়ে হাত রাখল। নিঃসন্তান চাচি কি ওই মুহূর্তে মায়ের আর্তনাদের মানে ধরতে পারছিল? নিতু সব সময় দেখত তাদের ভাইবোন তিনজনকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হলে চাচি যদি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আসত তো মা বলত, 'তোমার ছেলেমেয়ে নেই, খুব ভালো হয়েছে। থাকলে বুঝতে কী জ্বালা!' তখন চাচিও কিছু বলছিল না আর মা-ও কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিল না। তবে চাচির স্পর্শ পেয়ে মাথা তুলল মা, তার গায়ে হেলান দিয়ে নতুন করে ডুকরে কেঁদে উঠল। সেদিন বোধ হয় মায়ের মনে হয়েছিল যে চাচিও তার দুঃখ বুঝতে পারছে।

রাত নটার দিকে তপু ভাই চাচাকে নিয়ে ফিরল। ছোট শহরে রাতের ফাঁকা রাস্তায় এমাথা-ওমাথা ঘুরে চক্কর দিয়ে আসতে কতক্ষণ আর লাগে। তপু ভাই ঠোঁট উলটে ইশারায় ঋতুকে খুঁজে না পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে দিল আগেই। চাচা এমন মুখ নিয়ে মায়ের ঘরের দিকে গেলেন যেন আপাকে খুঁজে না পাওয়াটা তারই অক্ষমতা। নিতুর মা দৌড়ে গিয়ে চাচার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কী হলো? কোথায় গেছে ঋতু, জানতে পারলে?'

'না। তবে ধারণা করছি রতন নামে একটা ছেলের সাথে সে ঢাকার বাসে চড়ে চলে গেছে। তাকে শেষ দেখা গেছে বাসস্ট্যান্ডে রতনের সাথে। এর বেশি কিছু জানা যাচ্ছে না। রতনের মা বললেন, রতন আজ ঢাকায় গেছে। ঢাকায় কোথায় গেছে তা অবশ্য জানেন না আর ঋতুকেও চেনেন না।'

'রতন কে?'

'ওই তো, ওই পাড়ায় থাকে।'

নিতুর মা ধপ করে বিছানায় বসে পড়েন। মনে হয় আর কিছু জানার

আগ্রহ নেই। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। শেষে তপু বলল, 'চাচা, আমি তাহলে আসি।'

'হ্যাঁ, তুমি যাও, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম।' তপু ভাইয়ের ঘাড়ে হাত রাখলেন চাচা।

'না না, আমি কোনো খবর পেলে জানাব।'

নিতু তপুর পেছনে পেছনে বারান্দায় এলো। বলল, 'তপু ভাই, তুমি রতনকে চিনতে, না?'

'চিনতাম।'

'আপা আর রতনের ব্যাপারেও জানতে?'

'জানতাম।'

'তারপরও তুমি আপার জন্য অপেক্ষা করছিলে!'

'করছিলাম। ভেবেছিলাম ঋতু একদিন বুঝবে আর আমার কাছে ফিরে আসবে।'

'এখন কী হলো, আপা তো চলেই গেল।'

'কেউ চলে যেতে চাইলে তো তাকে আটকানো যায় না। আমিও চলে যাব। ভালো থেকো নিতু, যাই।'

তপু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল রিংকু গেট ঠেলে ঢুকছে। তপুকে দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, তুই এত রাতে?'

'কারও বোন হারিয়ে গেলে সে নিজে যদি খুঁজতে না যায়, তখন অন্য মানুষকে আসতে হয়।'

'বোন হারিয়ে গেলে মানে? অ্যাই নিতু, কী বলছে ও?'

'ভাইয়া, আপা রতন নামে কার সাথে যেন পালিয়ে ঢাকায় চলে গেছে।'

'রতন! ওই হারামজাদাটার সাথে? আমার পলিটিক্যাল এনিমির সাথে ঋতু ভেগে গেল? আমি পার্টি অফিসে মিটিং করছি রাত দশটা পর্যন্ত, কেউ আমাকে বললও না যে শয়তানটা বাড়ি থেকে আমার বোনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে!'

'উঠিয়ে নিয়ে নয় ভাইয়া, আপা নিজের ইচ্ছেতেই গেছে তার সাথে।'

'ইমপসিবল! আমাকে এক্ষুনই পার্টি অফিসে একবার যেতে হবে। শালাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

ভাইয়াকে হন্তদন্ত হয়ে গেটের দিকে যেতে দেখে তপু ভাই বলল, 'যা, আবার যা। গিয়ে দেখ এতক্ষণে তুই নিজেই ওর শালা হয়ে গেছিস কিনা।'

রিংকুকে বিভ্রান্ত দেখাল। তপু মোটরবাইকে স্টার্ট দিলে নিতু আর দাঁড়ায়নি। তাকিয়েও দেখেনি রিংকু তখনো হাঁ করে তপু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে নাকি চলে গেছে। কী যায়-আসে? ভাইয়া বাসায় থাকত না থাকার মতোই। কখন আসত কখন যেত কেউ বলতে পারত না। নিতুর বাবা তো তাকে সেই কবে বাসা থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। কয়েক দিন রাগ করে এদিক-সেদিক ঘুরে তারপর মায়ের কান্নাকাটির চোটে আবার ফিরে এলো। মায়ের তার একমাত্র ছেলেকে ছাড়া চলত না। মায়ের পক্ষপাতিত্বের জন্য বাবা বিরক্ত হতে হতে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। রিংকু বরাবর খুব ব্যস্ত থাকত। কী নিয়ে তা অবশ্য বোঝা যেত না। মাঝেমধ্যে চাচিদের ঘরে ফোন আসত ভাইয়ার জন্য, এপাশ থেকে শুধু শোনা যেত, 'জি ভাই, হ্যাঁ ভাই, এখনই আসতেছি ভাই।' তারপর রিংকু লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেত। পার্টির দেওয়া মোটরবাইক আর তার ওপরে বসা রিংকু, একসঙ্গে এক নিমেষে হাওয়া। মনে হতো কোনো ওস্তাদ তাকে আহ্বান করত, বাধ্য শিষ্যের মতো গায়ে শার্ট গলাতে গলাতে দিত দৌড়। বাসার কোনো কিছুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিতু অবাক হয়ে লক্ষ করল আপার চলে যাওয়াতে মা-বাবা, চাচা যেমন বাসার মানসম্মান নিয়ে শঙ্কিত, ভাইয়া মোটেই তা নয়। সে তার পলিটিক্যাল এনিমির কাছে একরকম হেরে গেল–এটাই ছিল তার জন্য বড় ব্যাপার। সে হয়তো সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে পার্টি অফিসে বসে রতনকে কোনো প্যাঁচে ফেলার মতলব আঁটছিল, আর তখনই কিনা রতন তার বোনকে নিয়ে বাসের টিকিট কাটছিল। এটা ভাইয়ার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা।

সে রাতে নিতুদের বাড়িতে কেউ কিছুই খায়নি। খাওয়ার কথাও কেউ বলেনি। যেন একটা মৃত কোনো লাশ পড়ে আছে বাসার কোথাও, একটা মৃতের বাড়িতে কী করে খাবারের আয়োজন হয়! অদৃশ্য লাশটাকে কিছুতেই পাশ কাটানো যাচ্ছিল না। নিতু যেদিকে তাকাল শুধু ঋতুকে দেখতে পেল। ঋতু হাসছে, নিতুকে ধমকাচ্ছে, ঋতু ওড়না উড়িয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে...নিচে বাবা বারান্দার ইজি চেয়ারে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মা অজ্ঞানের মতো পড়ে ছিলেন বিছানায়। মাঝে একবার জ্ঞান ফিরে আসার মতো হলে যেন সামনে থাকা যে কারও উদ্দেশে বললেন, 'ঋতু এলো?' তারপর তার অস্থির চোখ নিতুকে খুঁজল খানিকক্ষণ, 'দেখ তো নিচে গিয়ে ঋতু এলো নাকি!' ঋতু না এলেও আরও বেশি অন্ধকার এসে অন্ধকারকে গাঢ় করল। নিস্তব্ধতার চাদর ফুঁড়ে দূরে রাস্তার স্বাধীন কুকুরের ডাক শোনা গেল। রাত আরও বাড়লে পা টিপে টিপে নিতু নিচতলায় নামল। তাদের বাড়িতে এত গভীর রাত যেন কোনো দিন নামেনি। বারান্দার ইজি চেয়ারের সঙ্গে মিশে থাকা বাবার অসার শরীরটা দেখা যায় কি যায় না। বাবাকে ডেকে নিতু বলল, 'আপনাকে মশা কামড়াচ্ছে, ঘরে গিয়ে ঘুমান। কিছু খাবেন?'

'আর কী খাব? এখানেই ঘুমাই, তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও।'

অসহায় শোনাল বাবার গলা। পরপরই চোয়াল শক্ত হতে থাকল তার। কঠিন সংকল্প যেন মুখের শিরাগুলো ঘনঘন কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। অসহায় কণ্ঠস্বরটি আকস্মিক ভারী হলো, 'শোনো নিতু, আমার দুই ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এবার তোমাকে কিন্তু আমি কিছুতেই তা হতে দেব না।'

'আমি তো কিছু করিনি, বাবা।'

'করোনি তাতে কী, করতে কতক্ষণ? আমি তোমাকে সে সুযোগ দেব না।'

'বাবা, আপনি শান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমান।'

নিতু জোর করে বাবাকে উঠিয়ে নিয়ে নিচের তলার একটা ঘরের দিকে নিয়ে গেল। বাবার এত কাছাকাছি অনেক দিন আসা হয়নি। তিনি ছেলেমেয়েদের সাথে সব সময় দূরত্ব রাখতেন। তাদের তিনি দম দেওয়া পুতুল মনে করতেন। যা বলা হবে, ততটুকুই তারা করবে– এমনই ছিল তার ধারণা। কিন্তু সে রকম হয়নি। দুটো ছেলেমেয়েই সামান্য বড় হতে না হতেই তার শত্রু হয়ে গেল। নিজের আশপাশে যে ভয়ের ইমেজ বাবা বানিয়ে রেখেছিলেন, তা আসলে কবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, বাবা নিজেই জানতেন না। ছেলেমেয়েগুলো ভয়ের কিংবদন্তি বাবাকে লুকিয়ে যা করার করতেই স্বস্তি পেত। বাবা যে কথায় কথায় বলতেন, 'ব্যস, এটাই আমার শেষ কথা–' বাবার সেই কথাকে অচল প্রমাণ করাই যেন রিংকু আর ঋতুর জেদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তারা বারবার তা করে দেখিয়েছে।

ঘরে এনে বাবাকে শুইয়ে দিল নিতু। পাতলা চাদরে তাকে ঢেকে দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। অন্য কোনো রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নিতু ভয় পেত। অথচ সেদিন ঘোর অমাবশ্যার মতো অন্ধকারেও নিতুর ভয়ডর সব উবে গিয়েছিল। সেখানে জায়গা করে নিয়েছিল তীব্র একাকিত্ব আর অনিশ্চয়তা। কেন যেন বারবার ভাবতে ইচ্ছে করছিল আপা হঠাৎ কোথাও আটকে গেছে, কোনো ঝামেলায় পড়েছে, ফিরতে দেরি হচ্ছে, এমনটা কি একেবারেই হতে পারে না? মনে পড়ল, আপা তো আরও একদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরেছিল। এসে বলেছিল রাস্তায় কী একটা মিছিল-টিছিলের জন্য দেরি হয়ে গেছে। নিতু মনে মনে কল্পনাগুলোই আওড়াচ্ছিল। তেমন কি আজও হতে পারে না? আজ তেমন হয় না কেন? মিছিলের চেয়েও জটিল কিছু হোক। আপা এসে বলুক কেন দেরি হলো। রাগ করা তো দূরের কথা, কেউ কিচ্ছু বলবে না, সবাই খুশি হবে, নিতু জানত। কিছুদিন আগে আপা

ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে ভুরু আঁকতে আঁকতে বলেছিল, 'নিতু, আমার নতুন ফ্রেন্ড কাল কী বলে জানিস?'

'কী?'

'বলে, ঋতু তোমার মতো সুন্দরী মেয়েরা যদি শুধু একজনের হয়, তাহলে চলে? এ রকম অপ্সরীদের থাকা উচিত সবার মনোরঞ্জনের জন্য হা হা হা...'

'তোমার কোন ফ্রেন্ড বলেছে আপা?'

'র– বাদ দে, তুই চিনবি না।'

আপা 'র' বলেই থেমে গিয়েছিল। কেন? আপা কি তখনই জানত যে সে তার সাথে পালিয়ে যাবে? তাই রতনের নামটা জানাতে চায়নি? আপা কি এত দিন ধরে হিসাবনিকেশ করে তাদের সবাইকে এই অশান্তি দিয়ে গেছে? উত্তরের বাতাস আমলকীগাছের ছোট ছোট পাতাগুলো উত্তাল করে দিল তখন। নিতুর ভাবনাও এদিক-ওদিক করে কোন দিকে যাবে পথ পেল না। শীত শীত করতে লাগল তার। পতপত করে উড়তে থাকা ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে নিল সে। বাতাস থেমে গেল একসময়। ঠিক তখনই নিস্তব্ধতার মধ্যে মায়ের ঘর থেকে চিৎকারের শব্দ নিতু স্পষ্ট শুনতে পেল। সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে যেতে তার বলতে গেলে এমনিতেও তেমন সময় লাগত না। গিয়ে দেখল মা ঘুমের ঘোরে মেঝেতে পড়ে গেছে আর কী সব আবোলতাবোল বলছে। নিতু তার কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারল না। একবার শোনা যায় গেল, 'ঋতু– আর সামনে যাস না, পানিতে পড়ে যাবি।' তারপর আবার কিছুক্ষণ ঘুম। আবার বিড়বিড় করে মায়ের উচ্চারণ, 'সেদিন তোর মতো তিন বছরের একটা বাচ্চা ডুবে মরল, দেখিসনি? রিংকু কই? রিংকু–' তারপর ঘুমটা এমনই যেন মা অজ্ঞান হয়ে গেল। নিতু মায়ের মাথাটা আলতো করে ধরতে না ধরতেই মা বলে উঠল, 'ছোট বোনটাকে একটু দেখে রাখবি না? রিংকু?'

নিতু 'মা মা' বলে তাকে ওঠাতে চাইল, শরীরটা আরও বেশি এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। আবার গভীর ঘুম। নিতুর অসহায় লাগছিল। মাকে তো তার পক্ষে টেনে বিছানায় তোলা সম্ভব না। তাই তার মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিলে মেঝেতেই ঘুমিয়ে থাকেন তিনি। ব্লাড প্রেশারের ওষুধ নিতু নিজে হাতে মাকে খাইয়ে দিয়েছিল রাতে। তার মনে হলো চাচিও কি আরেকবার দিয়েছেন? মানে, ভুলে ডাবল ডোজ দেওয়া হয়নি তো মাকে? ওভাবে অজ্ঞানের মতো ঘুমাচ্ছেন কেন? নিতু ভাবল চাচিকে ডাকবে। কিন্তু অত রাতে ডাকতে কেমন সংকোচ হলো। ডাকবে কি ডাকবে না– ভাবতে ভাবতে মায়ের পাশে নিজেও শুয়ে পড়ল সে। আধো তন্দ্রার মতো কিছুক্ষণ কাটল তারপর হঠাৎ পিছলে ওপর থেকে ধড়াম করে নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার ওজনহীনতা! এক সেকেন্ডেরও কম কিন্তু অনুভূতিটা মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাল। চমকে উঠে দেখল ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে, সে কোথায় পড়ে গেছে? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল সে মেঝেতে আর পাশে মা অঘোরে ঘুমিয়ে। কান্না পেল, 'আপা' বলে একটা চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল, রাগে না দুঃখে– নিতু জানে না। আপা চলে যাবার কথা প্রথম যখন শুনেছিল, তখন থেকেই তার ওপরে অসম্ভব রাগ হচ্ছিল। তারপর কেন যেন আস্তে আস্তে সেটা আর জমে থাকা গম্ভীর রাগ থাকল না, চোখ বেয়ে গলে গলে বেরিয়ে এল জমাট সবকিছু। নিতু চোখ বন্ধ করে ফেলল। বন্ধ চোখের সামনে আপা বহাল তবিয়তে চলাফেরা করা শুরু করল। ওই মেঝে সেদিন সকালেও আপা মুছেছিল। নিতু মেঝের ওপরে হাত রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। আপার সেই শেষ ছোঁয়াটায় আঙুল বিস্তৃত করে মনে মনে বলল, 'আপা, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, এটা নিয়ে ভাবার রুচি এই মুহূর্তে কারও নেই। তুমি বাড়ি ছাড়ার সাথে সাথেই সবার কাছে মরে গেছ। এখন জীবিত মানুষেরা শুধু তাদের মানসম্মান নিয়ে চিন্তিত। আমিও তাদেরই দলে, আপা।'

কাঁদতে কাঁদতে নিতু ভোরের দিকে একসময় ঘুমিয়েও গেল। ভয়াবহ সকালটা নিষ্ঠুরের মতো এলো আবার সেই একই সময়ে। মায়ের প্রলাপে নিতুর ঘুম ভাঙল, 'তোর বাবার কোনো আক্কেল আছে? এত দিনের জন্য ঋতুকে ফুপুর বাড়িতে রেখে এলো! মাকে ছাড়া এত ছোট বাচ্চা একা কত দিন থাকতে পারে? রিংকু তোর বাবার সাথে গিয়ে ঋতুকে নিয়ে আয়– যা না বাবা।' নিতু চমকে উঠে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। স্কুলে না গিয়ে নিতু বসে বসে জলপট্টি দিল মায়ের কপালে। এমনিতেও ওই অবস্থায় সে স্কুলে যেতে চায়নি। ক্লাসের সবাই ঋতুর ব্যাপারে কত প্রশ্ন করবে! কী জবাব দেবে সে? হয়তো অসহায়ের মতো কেঁদেও ফেলতে পারে। রাস্তায় বের হলে সবাই নিশ্চয় তার দিকে ভূত দেখার মতো তাকিয়ে থাকবে। মনে মনে হাসবে। কেউ বলেও ফেলতে পারে, 'আরে ওই যে ওর বোন, সেদিন যে ও পাড়ার রতনের সাথে পালিয়ে গেল।'

'তারপর কী হলো?'

'কী আর হবে, কদিন ঘুরেফিরে ঘরের মেয়ে দেখো আবার ঘরে ফিরে আসবে। এসব মেয়েদের কী আর সংসার হয়?'

'আর যদি না আসে!'

'তাহলে বুঝবে যে রতন একেবারে গায়েব করে ফেলেছে, কোথায় পাচার করবে কেউ বলতে পারবে না।'

'ইশ্, মেয়েটা খারাপ হয়ে গেল।'

'মানুষ করতে পারেনি ছেলেমেয়েগুলোকে, বুঝলে? ভালো করে মানুষ করলে তো আর এমন হয় না।'

দুটো অচেনা কণ্ঠস্বর ঋতুর মাথায় কথোপকথন চালাচ্ছিল, মাথা তখন পুরো তাদের দখলে। তাচ্ছিল্যে ভরা গায়েবি আওয়াজগুলোর হাত থেকে চাইলেও ছাড়া পাওয়া গেল না। কখনো কখনো শব্দের সঙ্গে আকারও যোগ হচ্ছিল। রসের সন্ধান পাওয়া চোখে, বিকৃত আর ভেঙচি কাটা মুখগুলো কথা চালিয়ে গেল বহুক্ষণ।

মা জ্বরের ঘোরে দিনের পর দিন পড়ে থাকলেও বাবার চেঁচামেচি অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল। রান্নাটা বেশির ভাগ চাচিই দেখত। নিতু বাসা থেকে বের হতো না, মায়ের কাছে বসে থাকত। রিংকু মেহমানের মতো আসত-যেত, মাঝে মাঝে মায়ের বিছানায় বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঋতুর জন্য খুব দুঃখ করত। সে সময় ওর মুখটা নরম হয়ে যেত। আবার একটু পরেই হিংস্র চোখ ভেসে উঠত, রতনকে পেলে নাকি কুচি কুচি করে কেটে ফেলবে, এটাই ওর প্রতিজ্ঞা। পারিবারিক নাকি রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা, তা ঠিক বোঝা যেত না। এমনিতে তার দিনকালও ভালো যাচ্ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর চারুকলার ছেলেরা প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য জোর আন্দোলন শুরু করেছে তখন। তারা বলছিল, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসার পদ্ধতিটি সঠিক নয়। আর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে নাকি তিনি দুর্নীতি বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। প্রশাসনের একেবারে উঁচু থেকে নিচু পর্যায়ে একইরকমের ঘুষ আদান-প্রদান চলছিল। ধীরে ধীরে সারা দেশের ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিদিন নতুন নতুন আন্দোলন দানা বাঁধার নতুন নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এসব খবরের প্রভাবে শহরের অন্যান্য দলের ছাত্রসংগঠনের ছেলেরা কদিন হলো বেশ দুঃসাহস দেখাচ্ছিল। এপাড়ায়-ওপাড়ায় সরকারি দলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল তারা। সরকারের সমালোচনা করে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখিও হচ্ছিল। বিরোধী মতগুলোকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে, দরকার হলে দু-একটা লাশও পড়তে পারে। নিতুদের শহরে রতন ফিরে এলে তার লাশটাই আগে পড়ত, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এত বড় ঢাকা শহরে ঋতুকে নিয়ে কোথায় সে ঘাপটি মেরে ছিল– রিংকু দিনের পর দিন খোঁজ লাগিয়েও কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি। তাই সব মিলিয়ে অসম্ভব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল রিংকু। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না, তারা হলো গিয়ে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন, কার এত সাহস যে তাদের গায়ে হাত দেবে?

জ্বর ভালো হলেও নিতুর মা বিছানা ছাড়তে পারেননি। শরীরে কোনো না কোনো একটা ঝামেলা লেগেই ছিল। মেয়ের চিন্তায়

শুয়ে শুয়ে তিনি দিনভর অকুলপাথারে ভাসতেন। দুপুরবেলা নিতু বিরস মুখে মায়ের পাশে বসে একটা বই পড়ছিল। চাচি এসে দরজা ভিড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'নিতু, খবর আছে।'

'কী হয়েছে?'

'ঋতু ফোন করেছিল।'

'আপা? কখন? কী বলল?'

'আস্তে বলো– ঋতু রতনকে বিয়ে করেছে। রতনের মামার বাসায় লুকিয়ে আছে, ভালো আছে। বারবার করে বলল, আমরা যেন দুশ্চিন্তা না করি। সময়মতো চলে আসবে।'

নিতু চাচিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। চাচি মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'মন খারাপ করো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।' নিতুর মা ধড়মড় করে উঠে বসলেন, 'তোমরা কী ঋতু ঋতু বলাবলি করছিলে?'

৫

সেই প্রথম রিংকুর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার পরিবারের কাজে এলো। রাস্তায় কি এখানে-ওখানে কেউ তাদের ঋতুর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করল না। নিতু যেসব সংকোচে কুঁকড়ে ছিল, তেমন কিছুরই মুখোমুখি হতে হলো না। মা ভালো হয়ে যাওয়ার পরে সে স্কুলে যাওয়া শুরু করল। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা তাকে টেনে ধরে স্কুল বিল্ডিংয়ের পেছনের বাগানে নিয়ে গেল। তাদের কৌতূহলের সীমা নেই, 'কী হয়েছে, ঘটনা কী বল তো!' তাদের মধ্যে দু-একজন যারা দুনিয়ার ভাও নিতুর আগেই বুঝে গেছে, তারা বলল, 'ঋতু আপা তো গেছেই নিতু, তার আর কী! ঝামেলা যা হবে তোকেই পোহাতে হবে, দেখিস।' নিতু সে কথার মানে তেমন বুঝল না। সে কেবল মানুষের খারাপ কথা বলা নিয়ে আশঙ্কায় ছিল কিন্তু ভাইয়ার কল্যাণে সেসব হয়নি। বাড়ি বয়ে এসে একটা কথা বলার সাহস কারও ছিল না। নিতু জানত না যে ভাইয়াকে সত্যিই মানুষে এত ভয় পায়। ভাইয়া একদিন বলেছিল যে কেউ ভয় পেলে অনেক মজা লাগে। শুনে ভাইয়াকে নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল নিতুর কাছে। কিন্তু ঋতু পালিয়ে যাওয়ার পরে সেই প্রথম নিতু তার সুফলটা ভোগ করল। এ ছাড়া পরে তাদের কী সমস্যা হতে পারে, সেটা অবশ্য তার কাছে তখন পরিষ্কার হয়নি।

ঋতু চলে যাওয়ার পর থেকে সে ঘরের যে কাজগুলো করত, সব নিতুকে করতে হতো। বাসার প্রতিটা ঘর পরিষ্কার করা, ওপর-নিচের লম্বা বারান্দা ঝেড়ে মুছে সাফ করা তখন নিতুর দায়িত্ব। কিন্তু রিংকুর ঘরে সে খুব কম যেত। হুট করে ঘরে কারও আসা রিংকু পছন্দ করত না। ঋতু থাকতে বেশ কয়েক দিন পরে একবার গিয়ে আবর্জনার স্তূপ হয়ে থাকা ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসত। নিতু জানত ভাইয়া তাকে ঘরে দেখলেই হয়তো ধমকে বলবে, 'আমার জিনিসপত্রে হাত দিবি না, নিতু।' সেধে ধমক খাওয়ার কী মানে হতে পারে। তাই সেদিকে না যাওয়াই তার জন্য ভালো ছিল। এখন কোনো উপায় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

ভাইয়ার ঘরটি বাসার অন্য সব ঘর থেকে ছিল আলাদা, দামি জিনিসপত্রে ঠাসা। বাসার অন্য সব ঘরে সেই আদ্যিকালের ফার্নিচার, জায়গায় জায়গায় রঙ ওঠা আর নড়বড়ে। জানালার পর্দাগুলোর অনেক জায়গায় ধুতে ধুতে লম্বালম্বি ফেঁসে গেছে। ফ্যানের বাতাসে পর্দা নড়ে গেলে নিতু আবার কুঁচির মধ্যে ফেঁসে যাওয়া জায়গাটা লুকিয়ে রাখত। মা অনেক সময় মাসের শুরুতে পর্দা বদলানোর, কী একটা নতুন ডাইনিং টেবিল কেনার পরিকল্পনার কথা বলতেন। কিন্তু নিতু জানত, মাস শেষ হতে হতেই সেই স্বপ্নটা প্রতিবারের মতো হারিয়ে যাবে। তবু কথাটা বলার সময়ে মাকে থামাত না। আসন্ন সুখের আনন্দে মায়ের চকচকে মুখটা দেখতে ভালো লাগত। অনেক চেষ্টা করেও মা সংসারের কিছুই আর বদলাতে পারেনি। অথচ রিংকুর ঘরটা নিতুর চোখের সামনে একেবারে বদলে গেল। বাবা বরাবরই আপত্তি করেছেন তাই রিংকু চাইলেও তাদের পুরো বাসাটাকে নতুন করে সাজাতে পারেনি। তবে নতুনত্বের আশাও ছাড়েনি কখনো। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে একদিন একটা চব্বিশ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন এনে রিংকু বসার ঘরে লাগিয়ে রেখেছিল। ভয়ানক একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল নিতুদের বাসায় সেদিন। ভাইয়া ভেবেছিল বাবাকে খুব অবাক করে দেবে। বসার ঘরের যেখানে ছোট সাদাকালো টেলিভিশন মুখ গোমড়া করে পড়ে থাকত, সেদিন ভাইয়ার বদৌলতে সেখানে নতুন রঙিন টেলিভিশনটি মাথা উঁচু করে হাসতে লাগল। দুপুরে চ্যানেল খুলত না, তাই নতুন টিভিতে ছবি কেমন দেখা যায় কাউকে দেখাতে পারছিল না রিংকু। শেষে আবার দৌড়ে গিয়ে যেন কার কাছ থেকে একটা ভিসিআর আনল। বাবার ঘর থেকে টেবিল ফ্যানটা এনে ভিসিআরের দিকে তাক করে চালিয়ে দিল। বড়সড় একটা ক্যাসেট তার মধ্যে ঢোকাতেই সিনেমা শুরু হলো। সিলসিলা। ভাইয়া সিনেমার প্রশংসা শুরু করল, 'রেখা আর অমিতাভের অ্যাক্টিং দেখলে বুঝবি অ্যাক্টিং কাকে বলে।'ঋতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর এই সিনেমা করতে গিয়ে ওদের প্রেম হয়ে গেছে...হা হা হা...' নিতুকে বলল, 'যা, চাচিকে ডেকে নিয়ে আয়।' এমন গম্ভীর গলায় আদেশ করল যেন বোঝাতে চায়, রাজার ঘরে যে ধন আছে, টোনার ঘরেও সে ধন আছে। চাচি দেখে খুব খুশি যিনি জন্মেছেন হিংসা ব্যাপারটা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে। চাচিও তাদের সাথে সিনেমা দেখতে বসে গেলেন। সবাইকে আনন্দ দিতে পেরে সবচেয়ে বেশি খুশি ভাইয়া, খবর দেখার সময়ে বাবা যে চেয়ারে বসতেন, সেটাতে পা উঠিয়ে বসে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। মা তো আনন্দে আত্মহারা! বাবার পক্ষে কখনো যে জিনিস কিনে আনা সম্ভব হতো না, তিনি জানতেন, ছেলে তা এনেছে, এ তো খুবই আনন্দের ব্যাপার। নেদারল্যান্ডসের রঙধনুর মতো পপিখেতে মুগ্ধ নিতু যখন গানের তালে তালে পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিল, ঠিক তখন বাবা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সিনেমার গানের চড়া শব্দে গেট খুলে বাবার বাড়িতে ঢোকা বা বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ঘরের মাঝ পর্যন্ত পৌঁছানোর কোনো শব্দই পাওয়া যায়নি। আরামে এলিয়ে বসা ভঙ্গিগুলো থেকে নড়েচড়ে উঠতে না উঠতেই রাগে পাগল হয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর সবাই শুনতে পেল, 'এই টেলিভিশন কার? এটা কে এনেছে আমার বাড়িতে?'

'আমার, আমি এনেছি।' ভাইয়া স্বাভাবিক স্বরে বলে দিল।

'আমার পুরনো টেলিভিশন কই?'

'দোকানে দিয়ে এসেছি বিক্রি করার জন্য। কে আর কিনবে আজকাল ওই ভাঙাচোরা টিভি, তবু দিয়ে এলাম, যদি বিক্রি হয়। এটাতে আরও ভালো দেখা যায়, এই যে দেখেন।' ভাইয়া রিমোট টিপে গানের আওয়াজ আরও বাড়িয়ে দিল। বাবা তার হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে সোফার দিকে ছুড়ে মারল। গদির ওপরে পড়ল বলে রক্ষা।

'তুই এখনই তোর অসৎ টাকা দিয়ে কেনা এই জিনিস নিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। আর আমার টিভি এনে যেখানে যেভাবে ছিল, ঠিক সে রকম করে রেখে দে। যা এখনই।'

'টাকার আবার সৎ-অসৎ কী বাবা? একটা ভালো জিনিস আমাদের বাসায় থাকুক, আপনি চান না? আমরা একটু ভালো থাকি, আপনি চান না কেন বাবা?'

'নেতাদের চামচামি, সাধারণ মানুষ আর অন্য দলের ছেলেদের ঠ্যাঙানোর বিনিময়ে তুই যে টাকা পাস, সেটাই অসৎ টাকা। আর আমার মতো কেরানির ঘরে এই জিনিস মানায় না। এটা নিয়ে এখনই বের হ। আমার বাসার পরিবেশ নষ্ট করবি না, চলে যা।'

'আপনার জন্য আমরা কি আমাদের জীবনে নতুন একটা কিছু করতেও পারব না, বাবা? এই ঘুণে ধরা বাসায় এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে আমাদের? এত সুন্দর টিভিটা, কত্ত দেখেশুনে কিনলাম, এখন কোথায় ফেলে দেব বলেন তো!'

'তার আমি কী জানি, তুই এখনই আমার টিভি এনে দে।'

'আমি তো আপনাকে খুশি করার জন্যই...'

'তুই আমার টিভি এনে দিবি কি না?'

বাবা রিংকুর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন। শার্টের কলারের দিকে হাতও উঠে গিয়েছিল। কী মনে করে সেই হাতটা মুঠো পাকিয়ে নামিয়ে আনলেন। বাবার রাগি মুখটা কেন যেন হুট করে অসহায় হয়ে যাচ্ছিল। তিনি হয়তো সেই মুখ দেখাতে চান না বলে দ্রুত সরে যেতে চাইলেন। নিতু আর তার চাচি আড়াল থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুনছিল। তাদের গলাবাজির মাঝখানে নিতুর মা কাঁদো কাঁদো গলায় এসে বাবার পথ আগলে ধরলেন। বললেন, 'তুমি কি আমার ছেলেটাকে শখ করে একটা জিনিসও আনতে দেবে না বাসায়? তোমার ভয়ে সে তার মোটরসাইকেল বাইরে রাখে। কিন্তু টিভি তো আর বাইরে রাখার জিনিস না, এটা অন্তত ঘরে রাখতে দাও।'

'আমি তোমার ছেলেকে এই বাসায় থাকতে দিয়েছি শুধু তোমার কথায়। তারপর ওর আর কিছু রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না। তুমিই তার নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। তোমার প্রশ্রয়েই সে এত সাহস পেয়েছে। আমি মরে গেলে বাসাটাকে যা খুশি সে করতে পারে। তার চাচারও কোনো ছেলেপুলে নেই। সুতরাং পুরো বাসাটাকেই সে সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য উৎসর্গ করতে পারে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়।'

মায়ের জেদ রক্ষা হবে ভেবে রিংকু তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মা যখন চোখ মুছে বললেন, 'অ্যাই যা, তার-টার যা আছে সব খুলে নিয়ে যা। আর তোর বাবার মূল্যবান টিভিটা এনে দে।' তারপর আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গেল না, আস্তে আস্তে সে তারগুলো খোলা শুরু করল। ঋতু পেছন থেকে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভাইয়া, তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখো না, বাবা জানতে পারবেন না।' সেটাই করেছিল রিংকু। ঋতু না বললেও তা-ই করত। একসময় পুরো বাসাটা প্লাস্টার আর রঙ করাতে চেয়েছিল সে। জায়গায় জায়গায় প্লাস্টার খসে, মেঝে উপড়ে এমন ভয়ালদর্শন হয়েছিল বাসা থেকে বের হতো না যে তার বন্ধুবান্ধব আর পার্টির লোকজনকে বাসায় ডাকতে পারত না। বাবা বলেছেন তাঁর নিজের যখন সামর্থ্য হবে, তিনি করাবেন, রিংকু যেন তার বাড়ির দেয়ালে হাত না দেয়। এদিকে চাচাদের অংশটা ঠিকই প্রতিবছর বর্ষা চলে গেলে নতুন রঙে রঙিন হয়ে টান টান চামড়ার তরুণীর মতো তাদের বুড়ো বাসার পাশে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভেঙচি কাটত। রিংকুর ভালো লাগত না। বলতে বলতে হতাশ হয়ে সে তার নিজের ঘরে প্লাস্টার আর রঙ করিয়ে নিয়েছিল। বাবা জানতে পারেননি। দোতলার শেষ মাথায় যেখানে রিংকুর ঘর, সেদিকে বাবা সাধারণত যেতেন না। তাই তার অজান্তেই ধীরে ধীরে রিংকুর ঘরের ফার্নিচার বদলে গিয়েছিল, পর্দা বদলেছিল, ছোট গোল একটা কার্পেট খাটের সামনে মেঝের খুঁতগুলো ফুল লতাপাতার আড়ালে ঢেকে দিয়েছিল। জরাজীর্ণ বসার ঘরের বদলে সেদিন রিংকুর ঘরেই বড় টেলিভিশনটা তাই আরও বেশি মানিয়েছিল সত্যি। বাবার ওপরে রাগ করে তারগুলো টেনে খুলে রিংকু টিভিটা ভিসিআর থেকে আলাদা করে নিয়ে যখন বেরিয়ে যায়, ক্যাসেটটা হাতে নিয়ে গড়গড় করে মাকে বলেছিল, 'চার ঘণ্টার জন্য ভিসিআর আর এই ক্যাসেটটা ভাড়া করে এনেছিলাম, বাবার জন্য ভাড়াটাও নষ্ট হয়ে গেল! এমন সুন্দর সিনেমাটা দেখতে পারলে না তোমরা।'মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, 'মন খারাপ করিস না বাবা, পরে দেখব। তুই যখন নিজে ভিসিআর কিনবি, তখন আবার এই ক্যাসেটটা আনিস।' পরে সে একটা ভিসিপি কিনে এনেছিল। ঋতু আর মা দুপুরে মাঝেমধ্যে সেখানে বসে সিনেমা দেখত। নিতু হিন্দি বুঝত না, কোনো আকর্ষণও বোধ করত না। তবে হয়তো মায়ের কথাতেই, সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ভাইয়া ভিসিপিটা কিনে এনেছিল। এ জন্য নিশ্চয় তাকে পার্টির বেশি রিস্কি কোনো কাজ করতে হয়েছিল। কী তা অবশ্য নিতুরা জানতে পারেনি। নিতু তার বাবার মনোভাব জানত, তাকে ভয় পেত। তাই মা-বোনের সাথে ভাইয়ার তৈরি মহলে ঢুকতে অস্বস্তি হতো তার। মনে আছে প্রথম যখন পার্টির কাজ করে বেশ ভালো টাকা সে পেয়েছিল, তখন নিতুকে নিয়ে গিয়ে একটা জামা কিনে দিয়েছিল, ঋতু আর তার মায়ের জন্য শাড়ি কিনেছিল। বাবার জন্য কিনতে সাহস পায়নি। নিতুর জামাটা ছিল মেরুন রঙের, টিস্যু আর কর্ডের কাপড় দিয়ে বানানো। ওরকম দামি একটা জামা নিতু কখনো কিনবে, স্বপ্নেও ভাবেনি। একদিন অফিস থেকে ফিরে বাবা নিতুর গায়ে সেই জামা দেখে সামান্য হেসে বলেছিল, 'বাহ্! চাচি কিনে দিয়েছে বুঝি? পছন্দ কার, তোর না চাচির?'

'চাচি না, ভাইয়া কিনে দিয়েছে, ভাইয়ার পছন্দ।' চট করে মিথ্যে আসেনি নিতুর মুখে। তবে সত্যিটা নিজের কানেই কেঁপে কেঁপে ঢুকছিল। শুধু পছন্দ নয়, রিংকু বাসা থেকে নিতুকে নিয়ে গিয়ে জোর করে জামাটা কিনিয়েছিল। জামার গায়ে লাগানো ট্যাগ দেখে নিতু কম দামের একটা জামা পছন্দ করেছিল। কিন্তু রিংকুর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল কিনলে সবচেয়ে বেশি দামেরটা কিনতে হবে। কম দামেরটা যে নিতুকে কম মানাত, তা নয়। অন্তত নিতুর তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাইয়ার পীড়াপীড়িতে ওই জামাটা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। সেসব কথা বাবাকে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। নিতু কেবল নিচু স্বরে বাবার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

'ভাইয়া কিনে দিয়েছে! সে টাকা পেল কোথায়, টিউশনি করছে নাকি আজকাল?'

'আমি জানি না তো, বাবা।'

'নাকি নিজের খরচ থেকে টাকা জমিয়েছে?'

বাবাকে চিন্তিত দেখাল। তিনি চিন্তার ঘোরে বারান্দার দিকে হাঁটা দিলে নিতু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে মিথ্যে বলেছিল বাবার ভয়েই। কে জানে বাবা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলেন কি না। আর বাবা তো একদিন না একদিন জানবেনই ভাইয়ার রাজনীতিতে জড়ানোর কথা। হয়তো বাসায় তাণ্ডব শুরু হবে। বিশাল ঝড় ঝাপ্টার আশঙ্কা। মাঝখান থেকে এই এক জামার জন্য নিতুর ওপর দিয়ে সেই ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টাটা বয়ে যাক সেটা সে কিছুতে চায়নি। পরে বাবা বাইরে থেকে জানতে পেরেছিলেন। সেই জেনে ফেলাটাও হয়েছিল অদ্ভুতভাবে।

নিতুর বাবা যে পত্রিকা অফিসে কাজ করতেন, সেই দৈনিক তিস্তা অফিসে একদিন খুব ভাঙচুর হলো। তিন দিন আগে এলাকায় সরকারি কোনো একটা কাজের তুমুল সমালোচনা করে রিপোর্ট ছাপানো হয়েছিল। সরকারের আদেশে সেই পত্রিকা বন্ধ করার কথা ছিল, কী কারণে আদেশটি আসতে দেরি হচ্ছিল বোঝা যায়নি। নিতুদের এলাকার বহু বছরের পুরনো আর জনপ্রিয় কাগজটির বিক্রি ওই রিপোর্ট ছাপানোর পর আরও বেড়ে গেল। রিপোর্টের ফলোআপ পড়ার জন্য মানুষ এমনভাবে কেনা শুরু করল যে পরের দিন দ্বিতীয়বার নগর সংস্করণ ছাপতে হলো। সরকার কিছুই করছে না অথবা করতে অনেক সময় লাগবে ভেবে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন এক বিকেলে সেখানে হামলা করল। রিংকুকেও যেতে হয়েছিল, দলের ভেতরে থেকে নিশ্চয় না গিয়ে উপায়ও ছিল না। বাবার সাথে দেখা হয়ে যাবে ভেবে হয়তো অফিসের ভোতরে ঢোকেনি সে, বাইরে পাহারায় ছিল। একটু দূরে তাদের সমর্থনে পুলিশও ব্যারিকেড বানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন এই ভাঙচুরের সময় অন্য কোনো দলের কেউ গিয়ে বাগড়া দিতে না পারে। পুরো অফিস তছনছ করে ফেললে ভেতর থেকে পত্রিকা অফিসের মানুষেরা প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছিল। হুড়োহুড়ি আর ঢিল ছোড়াছুড়িতে ভাঙা কাচের টুকরো লেগে নিতুর বাবার হাত কেটে গেল তখন। রক্ত বন্ধ করার জন্য আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরে দৌড়ে আরও অনেকের সাথে অফিসের পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন। সেখানে রাস্তায় ইয়া বড় এক হকিস্টিক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল রিংকু; চোখেমুখে উন্মাদনা, বাবাকে দেখেও চিনতে পারছে বলে মনে হলো না। তিনি হাতের ব্যথা, আত্মরক্ষার প্রয়োজন সবকিছু ভুলে রিংকুর দিকে এগিয়ে গেলেন। ভূত দেখার মতো চমকে জানতে চাইলেন, 'এই রিংকু, তুই এখানে কী করছিস?'

'বাবা, আপনি দৌড়ে ওইদিকে চলে যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, যান।'

'তুই আগে বল, তুই এখানে এসেছিস কেন? তোর হাতে এটা কী?

তুই ওই ছেলেগুলোর দলের না তো, যারা আমার অফিস ভাঙছে?'

'আপনি যান, এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ না। সবাই চলে গেছে।'

'তুই আমার কথার জবাব দে আগে'

'আপনার হাত থেকে অনেক রক্ত পড়ছে বাবা, আপনি যান, ওইদিকে একটা ডাক্তারখানা...'

'তুই আগে বল তুই ওদের দলের কি না?' বাবার হুঙ্কারে রিংকুর কথা বন্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে অবশ্য নিজেকে সামলে নিল সে। পার্টির কাজে তার একাগ্রতা ছিল। সেটা মিছিলই হোক, ষড়যন্ত্র হোক বা হোক না ভাঙচুর। সেসব কাজে আবেগ বা পরিবারের প্রতি অতিরিক্ত মমতা প্রকাশের কোনো স্থান নেই। তাই খানিক থতমত খেলেও রিংকু সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপে ফিরে এলো।

'আমার সাথে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। এটা রাস্তা, আপনার বাসা না।'

'রাস্তা বলে কি তুই যা খুশি তা-ই করে বেড়াবি? আমার একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিবি না?'

বাবা রিংকুর কাছ থেকে কোনো জবাব না নিয়েই সেদিন বাসায় চলে এসেছিলেন। কারণ রিংকু কোনো কথা না বলে পত্রিকা অফিসের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুক্ষণ বিস্মিত চোখে রিংকুর চলে যাওয়ার পথটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হকিস্টিকের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করেছিলেন, কী রঙ ছিল সেটা? মনে পড়েনি। ভাবছিলেন, তখন যদি তিনি আবার অফিসে ঢুকে গিয়ে ছেলের দলকে ভাঙচুর করতে বাধা দেন, তাহলে কি রিংকু ওই হকিস্টিক দিয়ে তার মাথায় একটা বাড়ি দেবে? পারবে সে? তার মন বলেছিল রিংকু পারবে না। তবু পরীক্ষা করার জন্য অফিসে কোনো রকমে গিয়ে ঢোকার কথাই ভাবছিলেন তিনি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন চারতলা বিল্ডিংয়ের সমস্ত জানালার কাচ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে চারদিকে। দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে অসংখ্য হীরার দ্যুতি সেখানে তখন। ভেতর থেকে আর তেমন শোরগোল শোনা যাচ্ছিল না। বোধ হয় ভাঙার মতো আর কিছু ছিল না। সেদিকে যাবেন ভেবে ঘুরে দাঁড়াতেই বিল্ডিং থেকে জুনিয়র সাংবাদিক আনিস দৌড়ে এলো, 'শফিক ভাই, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসেন আসেন। আমি গার্ডের বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম, এখন ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে এলাম। 'হাতের দিকে তাকিয়ে আনিস বলল, 'ইশ্, এ তো দেখি অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, আসেন তো...'

জুনিয়র সাংবাদিক আনিসের কথায় হাতের আঘাতের কথা মনে পড়ল তার। রিংকুকে হকিস্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার পর থেকে ব্যথাটা একটুও টের পাননি তিনি। কতক্ষণ সেখানে ওইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা-ও মনে করতে পারছিলেন না। আশপাশে তখন আনিস ছাড়া কেউ ছিল না। পুরো রাস্তা যত দূর দেখা যায় জনমানবহীন। মনে হচ্ছিল শহরে কারফিউ হয়েছে। রক্ত পড়তে পড়তে শরীর দুর্বল লাগছিল। আনিসের হাতের ওপরে যখন শরীর ছেড়ে দিতে হয়েছিল, তখন দুপুরের চড়া রোদেও কেন যেন অন্ধকার মনে হচ্ছিল তার। বাসায় ফিরেছিলেন রাত করে, সরকারি হাসপাতাল থেকে হাতে চারটা সেলাই আর ব্যান্ডেজ নিয়ে। আনিস সাহেব হাসপাতাল হয়ে নিতুদের বাসায় তাকে পৌঁছে দেন। যাওয়ার সময় ঋতুকে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, শরীরে আর কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি কিন্তু কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন। শুধু হাতের এটুকু আঘাতে তো এমন হওয়ার কথা নয়।'

ঋতুকে চুপ করে থাকতে দেখে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার বললেন, 'রক্ত পড়েছে বেশ। তা ছাড়া নিজের এত বছরের অফিস চোখের সামনে ভাঙচুর হতে দেখে হয়তো মনে আঘাত পেয়েছেন। ঠিক হয়ে যাবে। আমি এসে খবর নেব। পত্রিকা তো বন্ধ হয়ে যাবে আপাতত। অফিস এমনিতেই বন্ধ থাকবে। বাসায় রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নিতুর বাবা ঘুমাতে পারছিলেন না। ঋতু বারবার জানতে চাচ্ছিল, 'ব্যথা কমেছে, বাবা?' তিনি কোনো উত্তর দেননি। রাত বারোটার দিকে বাবা নিতুকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোর চাচাকে ডাক।' চাচা ঘুম থেকে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এলে সবাইকে স্তম্ভিত করে বাবা তার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। তার মতো কঠিন মানুষকে কেউ কোনো দিন চোখের জল ফেলতে দেখেনি। নিতুর মনে আছে দাদি মারা যাওয়ার সময়েও বাবার চোখ টলটল করছিল কেবল, পানির কোনো ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়নি। একটাই কথা বারবার বলছিলেন, 'ভাই রে, আমি হেরে গেছি। আমি হেরে গেছি রে, ভাই!'

এই ঘটনার পরে প্রথম প্রথম কয়েক দিন নিতুর বাবা ঝিম মেরে বারান্দায় বসে থাকতেন। কারও সাথে কথা বলতেন না। দরকারি প্রশ্ন বেশ কয়েকবার করলে তারপর উত্তর দিতেন। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আর ভাঙচুরের প্রতিবাদে লেখালেখি বেশি মাত্রায় হতে থাকলে পত্রিকা অফিস আবার খুলে দেয় সরকার। তার মনের জোর ফিরে আসে। তিনি আবার স্বমূর্তি ধারণ করেন। বাসায় সারাক্ষণ চেঁচামেচি চলতে থাকে। তখন একবার তপু বাসার সামনে এসে দাঁড়ালে বাবা ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই এদিকে আসো, তুমিও কি রিংকুর সাথে আছ নাকি?'

'রিংকুর সাথে কোথায় চাচা?'

'আরে বাবা, তুমিও কি ওই ফালতু রাজনৈতিক নেতাটেতা নাকি?'

'না চাচা, আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

'সত্যি বলছ? তোমার বাবা তো তাহলে ভাগ্যবান!'

বসে বসে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া নিতুর বাবার আর কিছুই করার ছিল না। কারণ রিংকু তখন তার মুঠোর ভেতর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়েছিল।

৬

একবার ছুটির দিনে বেলা বাড়লেও ঋতু বিছানায় গড়াগড়ি করছিল। নিতুকে ডেকে বলেছিল ভাইয়ার ঘরটা গুছিয়ে আসতে। নিতু গিয়ে দেখে ভাইয়া বাথরুমে, শাওয়ারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বিছানা ঠিক করার জন্য যেই বালিশ হাতে উঠিয়েছে, দেখে তার নিচে নিঃশব্দে শুয়ে আছে রিভলভার। কালো কুচকুচে আর বরফের মতো ঠাণ্ডা। হাতে নিয়ে ভাবছিল নিতু, এই ঠাণ্ডা জিনিসটা থেকে এত গরম ধোঁয়া ওঠা গুলি বেরিয়ে যায়! ভাইয়া কি কাউকে তার উত্তপ্ত গুলির স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে এর মধ্যেই? রিভলভারের ওপরে হাত রেখে নিতুর শরীরটাও সেটার মতোই শীতল হয়ে যাচ্ছিল। কত রকমের ভাবনা আসছিল মনে। ভাইয়া কি সন্ত্রাসী? আজকাল পত্রপত্রিকায় যাদের বলা হয় পলিটিক্যাল ক্যাডার, ভাইয়া কি সেই রকমের একজন মানুষ? যাদের ভয়ে পুরো বাংলাদেশের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, যাদের স্বার্থে আঘাত করলে মানুষের জীবনের শেষ দিনটা চলে আসে, ভাইয়া কি সে রকম একজন? তাই যদি হয়, তবে ভাইয়া এখন সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তার আপন ভাই, দুষ্টুমি করে এই তো কদিন আগেও স্কুলে যাওয়ার আগে চুলের বেণি টেনে খুলে দেরি করিয়ে দিত, রাস্তায় হেঁটে আসতে দেখলে ডেকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠিয়ে নিত। সেই ভাইয়া এখন আশপাশের যেকোনো মানুষের জন্য ভয়ানক। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যে কাউকে লক্ষ্য করে সে এর থেকে একটা গুলি ছুড়তে পারে। নিতুর মনে হচ্ছিল তার চোখের সামনে একটা মানুষ রক্তাক্ত হয়ে ঢলে পড়ছে যার কারণ ভাইয়ার ছোড়া একটা গুলি। নিতুর হাত আর চলছিল না। বাথরুমে শাওয়ারের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলে নিতু তাড়াতাড়ি চাদরটা ঠিক করে বেরিয়ে এলো। রিংকু কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল নিতু থতমত খেয়ে চলে যাচ্ছে। তার একটু পরেই দেখা গেল রান্নাঘরে বসে মায়ের আদরের ছেলে রুটি ছিঁড়ে খাচ্ছে আর মায়ের সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে। রান্নাঘরের আরেক দিকে বসে নিতুর শরীর থেকে ঘাম ছুটতে থাকল। দৌড়ে গিয়ে ভাইয়ার বালিশের নিচে দেখে রিভলভার নেই। আবার ফিরে এসে তার পকেটের দিকে বারবার চোরা চোখে তাকাচ্ছিল সে। রিংকু অনেকক্ষণ ধরে নিতুকে খেয়াল করছিল। বাসা থেকে বেরিয়ে

যাওয়ার সময় পকেট থেকে রিভলভারটা হাতে নিয়ে নিতুকে বলল, 'এই বোকা, তুই এটা খুঁজছিলি?' নিতুর মুখ সাদা হয়ে গেল। কোনো কথা খুঁজে পেল না সে। কেবল ফ্যালফ্যাল করে কালো জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল। রিংকু নিতুর একটা হাত টেনে ধরে তার ওপরে রিভলভারটা রাখল। নিতু পাথর হয়ে গেল। ভাইয়ার শরীরের তাপ শুষে নিয়ে তখন সেটা গরম। তবু নিতুর হাত শীতল হয়ে গেল। রিংকু বলল, 'শোন, এটা থাকা মানেই কি আমি মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছি? আমাকে যদি কেউ অ্যাটাক করে তো সেটা ঠেকাতে হবে না? সে জন্যই তো পার্টি আমাকে এটা দিয়েছে, এতে এত ভয় পাওয়ার কী হলো!'

নিতু কোনো উত্তর দেয়নি। গেট লাগানোর আগ মুহূর্তেও ভাইয়া নিতুর দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল খানিকটা।

'আরে কী রে, এখনো ভয় পাচ্ছিস? ভয়ে আবার বাবাকে বলে দিস না যেন। তবে তুই ঠিকই ধরেছিস, প্রয়োজন পড়লে এটা দিয়ে মানুষকে মারা যায়।'

সেদিন থেকে ভাইয়া তার কাছে অনেক দূরের অচেনা একটা মানুষ। যতই চেষ্টা করুক, কোনো দিন সে আর আগের মতো ভাইয়ার কাছে যেতে পারবে না। সেদিন থেকে নিতু সেটা জেনে গিয়েছিল।

আপা চলে যাওয়ার পর তখন তাকে ভাইয়ার ঘর গোছাতে হচ্ছিল। তার ব্যক্তিগত এসব অবৈধ জিনিস দেখতে নিতুর মোটেও ভালো লাগত না। সেদিন খাটের নিচে ঝাড়ু দিতে গিয়ে কিসে যেন ঝাড়ুটা বারবার লাগছিল। নিতু মেঝেতে শুয়ে দেখে খাটের নিচে একেবারে শেষ মাথায় ছোট একটা ছালার বস্তা। ঝুল ঝাড়া ঝাড়ু দিয়ে টেনে বের করতে বেশ কষ্ট হলো। বস্তা খুলে দেখে নিতুর চোখ ছানাবড়া, বস্তা ভরা ফেনসিডিলের খালি শিশি। হলদে বাদামি কাচের বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে নিতুর চোখে পানি এসে গেল। আজ যদি আপা থাকত তো এখনই ডেকে তাকে দেখানো যেত। এই সেই জিনিস যেটা নিয়ে তপু ভাইয়ের সাথে আপার ঝগড়া হলো। তপু ভাই তাহলে সত্যি বলেছিল। তখন হঠাৎ তপু ভাইয়ের জন্যও মন কেমন করে ওঠে। আর তো এলো না! তপু ভাই নিজের থেকে না এলে নিতুর পক্ষে তার খবর নেওয়া সম্ভব না। তা ছাড়া নিতুর সামনে টেস্ট পরীক্ষা। বাসার কাজের বাইরে সে যেটুকু সময় পায় পড়াশোনা করে কাটায়। তবু মাঝে মাঝে তপু ভাইয়ের কথা খুব মনে হতো। মাস ছয়েকের বেশি হলো তার সাথে দেখা নেই। নিতুর যেমন চোখে প্রায়ই ভেসে ওঠে যে সে পদ্মদীঘির ধারে তপু ভাইয়ের সাথে বসে আছে, সে রকম কি তপু ভাইয়েরও হয়? মাঝে মাঝে সামনে বই খোলা পড়ে থাকে, নিতু জানেই না যে সে আসলে চেয়ার থেকে উঠে কোথায় চলে গেছে! তার কেবলই মনে হয় এলোমেলো বাতাসে তার চুল উড়ে উড়ে নাকে চোখে আছড়ে পড়ছে, সে বাঁধছে না। কারণ তপু ভাই বাঁধতে দিচ্ছে না। তপু ভাই বলছে, খোলা চুলে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে, নিতু। বাঁধবে না বললাম কিন্তু।'এই সামান্য একটুখানি মুহূর্ত এত মধুর কেন? এটা একটা সুন্দর স্মৃতি নাকি কষ্টের? অনেক ভেবেও নিতু সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এত সুন্দর সময় নিতুর জীবনে আর আসেনি অথচ সেটার কথা ভাবতে গেলে চোখ পানিতে ভরে আসে কেন?

ঋতু মাসে একবার-দুবার ফোন করত কিন্তু নিজের কোনো ফোন নম্বর কখনো দিত না। জিজ্ঞাসা করলে বলত বাসায় ফোন নেই। একবার নিতুর সাথেও কথা হলো, কিছু কথা বলার পরে কেমন যেন অপরাধী গলায় সে নিতুর কাছে জানতে চাইল, 'তপু ভাই কেমন আছে রে?' নিতু যখন বলল জানে না, তারপর কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বলেনি। সেই নীরবতাটুকুর মধ্যে নিতু অনেক কিছু শুনতে পেয়েছিল। কেন যেন মনটা বলেছিল, আপা ভালো নেই। কিন্তু আপা সব সময় মুখে বলে সে খুব আনন্দে আছে আর তার সংসার খুব সুন্দর করে গুছিয়েছে। রতনের বাবা-মা নাকি তাদের মেনে নেবে না, তাই এখানে আসে না। রতন ওখানে চাকরি পেয়েছে। আগেও রতন একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ঢাকায় গিয়ে আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছে। সরকারি দল ছাড়া বাকি সব দল তখন এক জোট হয়ে গেছে। তাদের সবার তখন একটাই দাবি যে তারা বর্তমান সরকারের পতন চায়। রতন সেসব সাংগঠনিক কাজে খুব ব্যস্ত থাকত। তাদের শহরে আসতে পারত না। কারণ সেখানে নানা রকম সমস্যা ছিল। তার মধ্যে একটা সমস্যা হলো ভাইয়া। রতনের সাথে ভাইয়ার পুরনো শত্রুতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, এটাই ছিল আপার ভয়। যদিও আপাকে বলা হয়নি কিন্তু নিতু জানত তখন ভাইয়াই বেশি ভয়ে ছিল। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন ভাইয়া বাসায় ফিরত না। নিতুর মা অস্থির হয়ে থাকতেন। চাচার কাছে গিয়ে বলতেন, 'পার্টি অফিসে গিয়ে একটা খবর নিয়ে আসো তো, ছেলেটা কদিন ধরে বাড়িতে ফেরে না, আমার কেমন ভয় ভয় করছে।' চাচা হয়তো অনিচ্ছায় যেতেন কখনো। ভাবির কথা ফেলতে পারতেন না। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই জানতে পারতেন না। ভাইয়া কোথায় থাকে না-থাকে এসব যেন খুব গোপন ব্যাপার। মাকে নির্ঘুম কয়েকটা রাত দেওয়ার পর যেদিন ভাইয়া বাসায় ফেরত আসত, কোথায় ছিল মা মরিয়া হয়ে জানতে চাইলে শুধু বলত, 'নিরাপদ জায়গায় ছিলাম।'

'নিরাপদ জায়গাটা কোথায়, বল না!'

ভাইয়া মায়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবত। তারপর অন্যমনস্কভাবে বলত, 'ঠিকই বলেছ মা, আমাদের জন্য আর নিরাপদ জায়গা বলে কিছু নেই। অন্য সব শালারা একসাথে হয়ে গেছে। কোথায় যে যাব, এই সরকার তো মনে হয় পড়ে যাবে।'

'তাহলে তোর কী হবে রিংকু?'

'কী আর হবে? যত দিন পারি পার্টির কাজ তো করতেই হবে, পরে দেখা যাবে। কিন্তু ইদানীং আমার জন্য কোথাও আর নিরাপদ নেই।'

'তাহলে তুই এসব ছেড়ে দিস না কেন বাবা?'

'ছাড়া যায় না মা। একবার ঢুকে গেলে আর বের হওয়া যায় না। ওয়ান ওয়ে মনে করতে পারো।'

'তাহলে তোর বাবা যে বলেছিল এসব লাইন ভালো না, সেটাই কি ঠিক?'

ভাইয়া আর কথা বলেনি। তার চালচলন দেখলে বোঝা যেত সে ধাওয়া খাওয়া মুরগির মতো এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে। পেপারে নানান জায়গার মারামারি, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার খবর আসত, শুধু মারামারি, ভাঙচুর আর মৃত্যু। ভাইয়ার দলের কেউ মরে গেলে বিষণ্ন হয়ে দুই হাতে তালি বাজানোর মতো করে পেপারটা মুচড়ে বন্ধ করে ফেলত সে। ভাবটা এমন দেখাত যেন সে সেখানে থাকলে একহাত দেখে নিত। আর যখন অন্য কোনো দলের কেউ মারা যেত মুখের সামনে পেপারটা আরও বিস্তৃত করে মেলে ধরে বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসত আর দাঁতে দাঁত চেপে বলত, 'দেখ শালারা আন্দোলনের মজা কত, এবার টের পাবি।' নিতুর খারাপ লাগত, মানুষ মারা যাওয়ায় কেউ এভাবে খুশি হতে পারে নাকি! সে যে দলেরই হোক না কেন। সাধারণ মানুষও তো মারা যাচ্ছিল অনেক। দুদিন আগে নূর হোসেন নামে একটি ছেলে তার খোলা বুকে আর পিঠে সাদা রঙ দিয়ে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' আর 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে রাস্তায় নেমেছিল। মিছিলের সামনের দিকে থাকা টগবগে সেই ছেলেটাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। তারপর থেকে আন্দোলন আরও জোরালো হলো। সবশ্রেণির মানুষ প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় নেমে আসত তখন, বিশেষ করে ছাত্ররা। প্রতিদিন লাশ নিয়ে মানুষ মিছিল করত। সব পার্টিই দাবি করত যে মারা গেছে, সে তাদের লোক ছিল। তারপর লাশ নিয়েও টানাহেঁচড়া লেগে যেত। বিভিন্ন রকম রিপোর্টিং হতো একই ঘটনার। পুরো সময়টাই খুব বিভ্রান্তিকর ছিল। নিতুর কাছে অবশ্য মনে হতো মানুষের মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব আছে বলেই মানুষ একটা লাশকে নিজেদের দলের বলে পরম মমতায় হাতে তুলে নিচ্ছে, সৎকার করছে। যেদিন এটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না, সেদিন বোধ হয় লাশটা রাস্তায়ই পড়ে থাকবে, শকুনে খুঁটবে, আর সবাই যে যার মতো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বলবে, আমরা কেউ ওকে চিনি না, কে মেরেছে জানি না। নিতুদের ছোট শহরে তেমন কিছু বোঝা যেত না কিন্তু এর-ওর কাছে শোনা যেত ঢাকার অবস্থা উত্তাল। ভাইয়া সেসব নিয়ে একদম

চুপ। পারতপক্ষে সে বাবার সামনে পড়ত না। কোনো দিন সকাল সকাল নিচতলা থেকে পেপার নিয়ে ওপরের ঘরে যেতে যদি বাবার সাথে চোখাচোখি হতো, বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিত। বাবা যেন বাসায় ভাইয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করতে আর রাজি ছিলেন না। কোনো কোনো সময় মনে হতো বাবা ভাইয়াকে ভুলেই গেছেন। কিন্তু আবার চাচার সাথে কথা বলতে গেলে কখনো কখনো উদাস হয়ে যেতেন। বলতেন, 'এখন দেশে যদি একটা মুক্তিযুদ্ধ লাগত আর রিংকু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে আমরা কত খুশি হতাম! কিন্তু এটা কী ধরনের কাজ করছে সে? পড়াশোনা বাদ দিয়ে মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে! এই মাস্তানরা নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরে, জানিস? এই সরকার পড়ে গেলে ওকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, দেখিস।'

নিতুর চাচা বলেছিলেন, 'ভাইজান, দেশে তো একরকম মুক্তিযুদ্ধই হচ্ছে, নাম হলো স্বৈরাচারবিরোধী যুদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের রিংকু মুক্তিযোদ্ধা নয়, রিংকু রাজাকার!'

তখন মাঝে মাঝে বাবা নিতুকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? সামনে পরীক্ষা না?'

'হ্যাঁ। ভালো হচ্ছে, বাবা।'

'পড়াশোনাটা অন্তত তুই ঠিকমতো করিস। আর দুজন তো করল না।'

'আমি করব, বাবা।'

'নিতু, তুইও কি ঋতুর মতো...' বলতে গিয়ে বাবার যেন লজ্জা লাগল। হয়তো ভয়ও পেলেন উত্তর কী আসবে সেটা ভেবে, আবার আমতা আমতা করে বললেন, 'তুইও কি ঋতুর মতো কারও সঙ্গে জড়িয়ে গেছিস নাকি?'

'না তো, বাবা।'

'ঋতুর বয়স আঠারো হয়ে গিয়েছিল তাই তোর চাচা মানা করল। বলল, কোনো লাভ হবে না। তা না হলে আমি ঠিকই ওকে খুঁজে আনতাম, থানায় যেতাম। এখন তুই কিছু করলে কিন্তু আমার চেয়ে ভয়ংকর কেউ হতে পারবে না, মনে রাখিস।'

'আমি ওরকম কিছু করব না, বাবা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।'

'নিশ্চিন্ত! সে তো আমি তোর দুই ভাইবোনকে নিয়েও ছিলাম। তাই তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। এখন তোকে নিয়ে আমার চিন্তা না করে উপায় নেই। যা-ই হোক আমি যখন যা বলব, তুই তা-ই করবি। করবি তো?'

'করব, বাবা।'

নিতু জানত না কেন তাকে দিয়ে প্রায়ই এসব প্রতিজ্ঞা করানো হচ্ছিল। সামনে তখন তার পরীক্ষা। পড়ার চাপ আর প্রতিদিন স্কুল যাওয়া সবকিছু নিয়ে সে মোটামুটি ব্যস্ত। এদিকে রাস্তাঘাটের অবস্থাও তখন খুব খারাপ। দুপুরের পরপর প্রায়ই স্কুল থেকে আসতে ভয় করত। রাস্তায় সারাক্ষণ সরকার সমর্থনকারী আর সরকারবিরোধী মিছিল লেগেই থাকত। স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তা ভালো করে বুঝেশুনে রওনা দিলেও হঠাৎ কোনো মিছিলের সামনে পড়ে যেত। দুই দলের মিছিল দুর্ভাগ্যক্রমে সামনাসামনি হলে তো আর রক্ষা নেই। ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়ে যেত, ককটেল ফাটত। রাস্তা তখন চলাফেরার জন্য বেশ ভয়ানক হয়ে গেল। নিতু আর পাড়ার আরও তিনটি মেয়ে একদিন ধাওয়ার মধ্যে পড়ে স্কুল থেকে বাসা পর্যন্ত পুরোটা পথই দৌড়ে এসেছিল। বাসায় হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকেছে কোনো রকম প্রাণ বাঁচিয়ে। মা দেখে চমকে উঠে বলেছিলেন, 'বাদ দে তো, এ রকম সময়ে আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই।'

'পরীক্ষার আগে আর মাত্র একটা সপ্তাহ ক্লাস আছে, মা। এই এক সপ্তাহ যেতেই হবে।'

স্কুলে যাওয়ার সময়ে নিতু প্রতিদিন তপু ভাইদের বাসার গলির সামনে দিয়ে যেত, যদি তপু ভাই বের হয় বাসা থেকে, হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে। 'কুকুর হইতে সাবধান' লেখা সাইনবোর্ড দেখে যে রাস্তায় আগে ওইটুকু জায়গা দ্রুত চলে যেত, তখন সেখানে হেলেদুলে ধীরে ধীরে আগাত। বান্ধবীরা বলত, 'কী হলো নিতু, পেছনে পড়ে যাচ্ছিস কেন?' নিতু আবার পা চালাত। কিন্তু তপু ভাইয়ের সাথে কোনো দিন দেখা হতো না। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পর নিতুর মনে হতো তপু ভাই বোধ হয় আমেরিকা চলেই গেছে। তারপর মন খারাপ করে সে বাসায় ফিরে আসত। নিজের ঘরে একা হলে কেমন যেন অভিমান হতো। তপু ভাই কি যাওয়ার আগে একবার বলে যেতে পারল না? যাওয়ার আগে একবার এসে জিজ্ঞাসা তো করতে পারত, নিতু, তোমার পাহাড়ঘেরা পদ্মদীঘির পাড়ে আর একবার যাবে? তপু ভাই আসলে ভুলেই গেছে যে নিতু নামে কেউ ছিল ওই পাড়ায়। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে তার ভাবনা থেকে নিতু নিজেকে বের করে নিত।

নিতুদের টেস্ট পরীক্ষা যেদিন শেষ, সেদিন পরীক্ষার হল থেকে রাস্তার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। ভীষণ শব্দের মধ্যে মেয়েরা কষ্ট করে পরীক্ষা দিচ্ছিল। ইনভিজিলেটর জানালায় মুখ বাড়িয়ে বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। পরীক্ষা যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন নিতুদের স্কুলের বাংলার স্যার দৌড়ে দৌড়ে বিভিন্ন রুমে গিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন, 'সবাই শোনেন, সরকার পড়ে গেছে, আমরা জিতেছি স্বৈরাচারের পতন হয়েছে!' সরকারি স্কুলের লম্বা বারান্দায় সরকার পতনের জন্য এ রকম উল্লাস বোধ হয় কেউ কোনো দিন দেখেনি। পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে একদল মানুষ ঢুকে পড়ল স্কুলে। বলে দিল, 'আজ স্কুল ছুটি। আমাদের বিজয় হয়েছে।'নিতুরা রাস্তায় বের হলো। এই শহরে এত মানুষ আছে নিতু কখনো ভাবেনি। ঈদ বা দুর্গাপূজার সময়েও এত মানুষের সমাগম কখনো দেখা যায়নি। প্রেসিডেন্টের নিজের এলাকায় তার পতনে মানুষের এ রকম আনন্দমিছিল নিতু কল্পনা করেনি। মিছিলের তালে তালে স্রোতে বয়ে যাওয়ার মতো নিতুরা বাসার দিকে যেতে থাকল। মাঝে মাঝে হাঁটতেও হয়নি, এমনিতেই এগিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ নানা রকমের আনন্দধ্বনি করছিল। ভিড়ের মধ্যে কেউ হঠাৎ স্লোগান দিতে শুরু করল। বাকিরা এমন করে তাল মেলাচ্ছিল যেন কত দিনের রিহার্সেল করা! উত্তেজনায় মানুষেরা নিজেদের গায়ের শীতের কাপড়, টুপি, মাফলার শূন্যে ছুড়তে থাকল আর লাফিয়ে লাফিয়ে পতনশীল কাপড়গুলো ধরছিল। একসঙ্গে তাদের মজা করতে দেখে মনে হয় সবাই সবার বহুদিনের চেনা। দৈনিক তিস্তার এক পাতার একটা কাগজ বের হয়েছিল সেদিন দুপুরে। ওপরে তারিখ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০, বিশেষ সংখ্যা। পুরো পাতাজুড়ে বড় হেডলাইন, 'স্বৈরাচারের পতন গণতন্ত্রের উত্থান'। পেপার মেলে ধরে মানুষ কতকগুলো নাম ঘনঘন উচ্চারণ করছিল, ডা. মিলন, অভি, নিরু, আমান আরও কিছু নাম যেগুলো নিতু ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না। মানুষের সাথে বয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট সেসব নিতুর কানে আসছিল। বাসার কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে নিতুর মনে হলো, আচ্ছা, ভাইয়া কোথায়? সে এখন কোথায় থাকতে পারে? প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় নিতুর সমস্ত শরীর হিম হয়ে এলো।

বাসার দরজা ঠেলে ঢুকতে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল বসার ঘরে কিছু মানুষ বসে আছে, বাবার সাথে কথা বলছে। বাবারও কি আজ অফিস ছুটি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি? বারান্দা পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বাবা তাকে ডাকলেন, অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবার অফিসের কয়েকজন, সঙ্গে আরও দু-একজন। তারা যা যা জিজ্ঞাসা করলেন নিতু জবাব দিয়ে বাসার ভেতরে চলে গেল। ওপরতলায় গিয়ে দেখে মা আর চাচি চিন্তিত মুখে বসে আছেন। নিতু ভাবল ভাইয়ার জন্য মা নিশ্চয় চিন্তায় আছেন আর চাচি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু নিতুকে অবাক করে দিয়ে চাচি, 'নিতু শোনো, আজ তোমার বিয়ে' বলে নিতুর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকলেন। চাচির মৃদু স্বরের কথাটা নিতুর কানে বোমার মতো বাজল।

সেই দিন সারা দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হলেও শুধু নিতুর দিকে তেড়ে আসছিল স্বৈরাচার।

৭

একটু আগে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেও গায়ের সোয়েটারটা খোলার প্রয়োজন পড়েনি। অথচ চাচির কথায় মেরুদণ্ড বেয়ে সরু ঘামের ধারা নিচের দিকে নেমে আসার সুড়সুড়ি নিতু স্পষ্ট টের পেল। চাচি কী বলতে চাচ্ছেন প্রথমে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল সে, তারপর চিৎকার করে উঠল, 'বিয়ে মানে?'

চাচি খাট থেকে লাফিয়ে নেমে এলো। নিতুর মুখ চেপে ধরে বলল, 'আস্তে! নিচে লোক বসে আছে, দেখোনি? বর হলো তোমার বাবার কলিগের ভাগনে। ভাইজান নিজে বিয়ে ঠিক করেছেন।'

তারপর ধীরে ধীরে নিতুর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'প্লিজ, চিৎকার কোরো না, লক্ষ্মী সোনা। কী করবে বলো, তোমার বাবা ঋতু আর রিংকুর কাজকর্মে খুবই দুঃখ পেয়েছেন। তাই হয়তো এ রকম অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'তাদের জন্য বাবা আমাকে এভাবে শাস্তি দেবেন চাচি? আমি তো কিছু করিনি! আমি তো...'

'তা তো আমরা জানি, নিতু, কিন্তু তোমার বাবাকে বোঝাবে কে?'

নিতুর আর কিছু বলতে ইচ্ছে হয়নি। সেখানে নীরব মা আর অসহায় চাচির সামনে বসে এটা-সেটার জবাব চাওয়ার কোনো মানে হতো না। তাই ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল সে। মাথা ঝিমঝিম করছিল, এসব কি বাস্তবে ঘটছে? তার কি জোরে চেঁচিয়ে কাঁদা উচিত? বাবাকে ডেকে বলা উচিত যে সে বিয়ে করবে না? নাকি আপার মতো পালিয়ে যাবে বাসা থেকে? কোথায় যাবে, কার সাথে যাবে? বাবা কিছুতেই এভাবে সবার রাগ নিতুর একার ওপরে ঝাড়তে পারেন না! পেছন থেকে মা পিঠের ওপরে আলতো করে হাত রাখলেন। চাচি পাশে বসে নিতুর হাত ধরল। কী করবে ভাবতে ভাবতে নিতু কেন যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। মা আর চাচির এই সমস্ত স্পর্শের সান্ত্বনা অসহ্য লাগছিল তখন। দুজনের হাত সরিয়ে দেয় নিতু নিজের শরীরের ওপর থেকে। অভিমানে নিজেকে বারবার বলতে থাকে, আমার কাউকে চাই না, কাউকে লাগবে না। এই একটু আগে পরীক্ষার হলে শেষ প্রশ্নোত্তরটা লিখতে গিয়ে নিতু ভাবছিল আজ থেকে সপ্তাহখানেক রেস্ট নিয়ে আবার নতুন করে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পড়তে বসবে। রাস্তায় যতক্ষণ ছিল, মানুষের মুক্তির আনন্দ দেখতে দেখতে নিজেকেও একরকম মুক্ত কিংবা স্বাধীন মনে হচ্ছিল। কিন্তু তারপর যেন ইঁদুরের মতো নাচতে নাচতে এসে ফাঁদের মধ্যে ঢুকেছে। তখন বুঝতে পারল যে আটকে পড়ার পরে হাত-পা ছুড়ে আর লাভ নেই। চাচি আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'নিতু, এমন হুট করে বিয়ে তো কতজনেরই হয়। তাই বলে সবাই তো অসুখী হয় না! তুমি দুঃখ পেয়ো না, মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিতু কিছু বলেনি, নিঃশব্দে কাঁদছিল। সারা দিন তেমন কিছু না খেলেও খিদেটা কেন যেন একটুও জানান দেয়নি। চাচি একবার খেয়ে নেওয়ার কথা বললে খাবারের ওপরেও রাগ হলো। এমনিতে আপার ওপরে রাগ করে দু-তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকার রেকর্ড ছিল নিতুর। সেবারে বোধ হয় সেই রেকর্ডটা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেই তার মনে হলো। আবার কী মনে করে চোখ-মুখ মুছে মাকে বলল, 'মা, তুমি ভাইয়ার জন্য বাবার ওপরে সময়ে-সময়ে এত জোর করতে পারো, আজ আমার জন্য একটু বলো না কেন?'

'তোর বাবা আমাকে চুপ করে থাকতে বলেছে। আর ঋতু আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে, তুই জানিস। তার পালিয়ে যাওয়ার পরে আমার আর কিছু বলার কোনো মুখ নেই। আমাকে মাফ করিস। আর শোন, কোনো মা চায় না তার এ রকম একটা বাচ্চা মেয়েকে এভাবে ভাসিয়ে দিতে।'

নিতু মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখটা নিচু করে কোলের দিকে তাকিয়ে মা কথা বলছিলেন। চোখ-নাক আঁচল দিয়ে বারকয়েক মুছে নিলেন। ফরসা নাকের চূড়াটা লাল হয়ে ছিল। সর্দি টানার আওয়াজ করতে করতে বললেন, 'গায়ে হলুদের আয়োজন নেই, পাড়ার লোককে ডাকা নেই, একটা বেনারসি পর্যন্ত নেই এটা কেমন বিয়ে?' কথার শেষে আবার কান্নার টান উঠল নিতুর মায়ের। তবু মাকে দেখে নিতুর একটুও মায়া হয়নি; বরং কেন যেন খুব রাগ লাগছিল। ভাইয়া থাকলেও কোনো লাভ হতো না। সে তারপর কিছুদিন বাসায় আসবে বলে মনেও হয়নি। কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কে জানে! হয়তো তার কোনো নিরাপদ জায়গায়। সেদিন ভাইয়ার জন্য নিরাপদ জায়গার সত্যিই খুব টানাটানি পড়েছিল।

বাবা হঠাৎ ঘরে এলেন। নিতুর তাকাতে ইচ্ছে করেনি বাবার দিকে। বাবা হন্তদন্ত হয়ে চাচিকে বললেন, 'কই, তোমরা এখনো বসে আছ? এটা তো শোক করার মতো কোনো বিষয় নয়। খুবই আনন্দের ব্যাপার, এত ভালো ছেলে পেয়েছি, ঢাকায় বড় ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে। একমাত্র ছেলে, গ্রামে বাড়িঘর, জমিজমা আছে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই? ঋতুর ব্যাপারটা জেনেও তারা রাজি হয়েছে। বোঝো না, এটা আমাদের জন্য কত বড় সৌভাগ্য! পরে এমন তো আর না-ও পেতে পারি। যাও যাও তাড়াতাড়ি রেডি করে নিতুকে নিয়ে নিচে আস...'

'কিন্তু বাবা, আমার তো সামনে পরীক্ষা...'

'তা তো আমি জানি, মা। তুমি পরীক্ষার পরেই যাবে এ বাসা থেকে। আমার কি সেসব নিয়ে চিন্তা নেই ভেবেছ? আজ শুধু কাবিন হবে আর কিছু নয়। তোমাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন আমার বিয়ে দিচ্ছেন, বাবা, আমি আরেকটু পড়ি...'

'পড়বে তো। আমি বলেছি আমার মেয়েটার পড়ার শখ। ওসব নিয়ে ভেবো না তুমি। রেডি হয়ে নাও, কিছু খেয়েছ?'

প্রশ্নের উত্তর না শুনেই নিতুর বাবা যেমন তাড়াহুড়ো করে এসেছিলেন, সেভাবে আবার বেরিয়ে গেলেন। নিতু মনে মনে বলল, আমি খেয়েছি কি না-খেয়েছি তাতে আপনার কী যায়-আসে, বাবা! আপনার কথামতো সব হলেই তো হলো। নিতুর তখন আপার কথা মনে হলো। পালিয়ে গিয়ে আপা বেঁচেছে, তার বরের বাড়ির লোকজন আস্তে আস্তে মেনে নেওয়া শুরু করেছে। চাচা বলছিলেন, রতন ভাইয়ের বাবার সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছে তার। তিনি নিজেই চাচাকে ডেকে কথা বলেছেন। সরকারি দল ক্ষমতা হারিয়েছে, আপাকে নিয়ে রতন ভাইয়ের শহরে ফিরে আসাতে কোনো অসুবিধা ছিল না তখন। আপা হয়তো একদিন ফিরেও আসবে। ভালোই থাকবে সে। মাঝখান থেকে নিতুই ফাঁদে পড়ল। আপা কি কোনো দিন সে কথা বুঝবে? যাক, নিতুকে এভাবে শাস্তি পেতে দেখলে যখন সবার ভালো লাগবে, তাহলে তাই হোক। নিতু নিজের ঘরে কাপড় বদলাতে যাওয়ার জন্য ক্লান্ত পা চালাল। মা আর চাচি অবশ্য আশা করেননি ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে। এমনিতে কেউ কোনো কারণে নিতুর চড়া গলা শোনেনি কখনো। কিন্তু আজ আশা করেছিল তাকে বোঝানো শক্ত হবে। কিন্তু তেমন কিছুই নিতু করেনি; বরং স্বাভাবিকভাবে চাচিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী পরতে হবে?' চাচি তার নিজের একটা জমকালো শাড়ি এনে দিলেন। শাড়িটার সাথে মিলিয়ে ঋতুর ফেলে যাওয়া একটা ব্লাউজ নিতুর সামনে দিলেন। নিতু ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মনে হলো সে যেন নিজে হাঁটছে না, চলন্ত পা তার শরীরের অংশ নয়, অন্য কারও ইচ্ছায় পা দুটো তার শরীরকে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শরীরটা খুব ভারী লাগল, এগোতে কষ্ট হচ্ছিল। কবে কোন একটা সিনেমায় দেখেছিল, একজন ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছে আর পেছনে একদল মানুষ ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে তাড়া করছে। যেতে যেতে পাহাড়ের শেষ মাথায় খাদের ধারে এসে তার ঘোড়া মাটিতে ছেঁচড়ে থেমে যায়। পেছনে তাড়া করা অন্য ঘোড়াদের কাছে আসতে দেখে মানুষটি ঘোড়াকে সামনে যাওয়ার জন্য লাগাম ধরে টানাটানি করে। ঘোড়াটি তখন কিছুতেই খাদে ঝাঁপ দেবে না। তাই সামনের পা দুটো উঁচু করে সশব্দে প্রতিবাদ জানায়। নিতুর নিজেকে সেই ঘোড়াটির মতো মনে হয়। তার পাগুলো জমে যাচ্ছিল। অজানা খাদে সে কিছুতেই ঝাঁপ দিতে পারে না। কিন্তু পেছন থেকে তাকে

ধাক্কা দেওয়ার মানুষের অভাব যে নেই, সে তার জানা।

নিতুর যখন শাড়ি পরা হয়ে গেছে, চাচি তার চুল বেঁধে তাকে সাজিয়েগুজিয়ে দিতে এলো। ঠিক তখনই বাসার গেটের দিকে শোরগোল শোনা গেল। দুজনে জানালায় মাথা বাড়িয়ে নিচে তাকাল। একদল ছেলেপেলে চেঁচামেচি করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। একটু দেরি হলে বোধ হয় চাচার তৈরি গ্রিলের নতুন গেটটা ভেঙেই পড়বে। চাচা দৌড়ে এলেন, ভেতর থেকে বললেন, 'কী হয়েছে, তোমরা কী চাও?'

তাদের মধ্যে দু-একটা কণ্ঠস্বর আকাশ কাঁপিয়ে বলল, 'রিংকু কই? রিংকুক বাইরত আসপার কন।'

'রিংকু কোথায় তার আমরা কী জানি? সে বাসায় নেই।'

'নাই মানে? আমরা তাক খুঁজি খুঁজি সারা শহর চষি বেড়াইতেছি। নিশ্চয় বাড়িত লুকি আছে। বাইরত আসপার কন এলা। নাইলে ভালো হবার নয় কইলাম।'

'বললাম তো রিংকু নেই বাসায়।'

'গেট খুলি দ্যান। হামরা দেখিম।'

'তোমরা দেখবে মানে, তোমরা কি পুলিশ? তোমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?'

'ওইগুলান লাগে না, চাচা। ভালোয় ভলোয় খুলি দ্যান, নাইলে হামরা কিন্তু গেটের ওপর দিয়া পার হয়াও আসপার পারি।'

বারান্দায় তখন নিতুর বাবা বেরিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'খুলে দাও, ওরা এসে দেখে যাক। চেঁচামেচিটা তো বন্ধ হবে তাতে। বাসায় একটা শুভ কাজ, ঘরে মেহমান, তার মধ্যে এসব কী উপদ্রব! খুলে দাও গেট।'

গেট খোলার সাথে সাথে পিলপিল করে ছেলের দল বাসার ভেতরে ঢুকে পড়ল। উন্মাদের মতো এঘর-ওঘর ঘুরতে লাগল। খাটের নিচে, পর্দার পেছনে, এমনকি ছাদের ওপরে পানির ট্যাংকির ভেতরেও মাথা ঢুকিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে রিংকুকে খুঁজল তারা। বসার ঘরে ঢুকে আদেশের সুরে একজন বলল, 'সবাই চুপচাপ থাকবেন। এত লোক ক্যান বাসায়, বিয়া লাগছে নাকি?' নিতুর বাবার কলিগরা আর সাথে যারা এসেছে, সবাই চুপসে গেল। শুধু নিতুর বাবা ব্যস্ত ছিলেন বারান্দায় অস্থির পায়চারিতে। আর চাচা থেমে থেমে তাকে অনুসরণ করছিলেন। ছেলের দল ওপরে উঠল, নিতুর ঘরে গিয়ে একজন আরেকজনকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বাহ্! আইজকা দ্যাখ খুব সাজগোজ করা হইছে দারুণ লাগতেছে!' অন্য আরেকজন ধমকে উঠল, 'ওই, তাড়াতাড়ি যে কাজে আসছিস সেইটা কর।'দুজনে ঝুঁকে খাটের নিচে খুঁজল। উঠে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে বলল, 'শালা নির্ঘাত পলাইছে!'

নিতু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছেলেদের অস্থির ছোটাছুটি দেখছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল রিংকুর ঘরে ঢুকেছে তারা। লোভি একটি গলা বলছে, 'বাপরে, কী ঘর বানাইছে মাইরি! দেখ্ পার্টি কত টাকা ছিটাইছে উয়ার পেছনে এ তো শালা রাজপ্রাসাদ লুকি রাখছে কুঁড়েঘরের মধ্যে!' উৎসাহ পেয়ে আরেকটি গলা বলে উঠল, 'বহুত টাকা খাইছ বাপধন, এইবার তোমার দিন শ্যাষ।' দূর থেকেই বোঝা গেল রিংকুর ঘরে কী সব টানাহেঁচড়া চলছে। একটু পরে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে নিতুর ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল তারা। তাদের আক্ষেপ শোনা গেল, 'বাড়ির অন্য কোনোখান থেকি তো নেওয়ার মতো কিছুই নাই।' নিচে গিয়ে নিতুর বাবা আর চাচার সামনে হাতের মিউজিক সিস্টেম আর স্পিকারগুলো দেখিয়ে একজন বলল, 'রিংকুর ঘর থেকি নিয়া গেলাম। আইজ থেকি সাত দিন আমাদের উৎসব। গান বাজাব। রিংকুর সাহস থাকলে গিয়া আমাদের কাছ থেকি ফিরি আনতে কইয়েন।' বাকিরা জোরে হেসে উঠল যেন খুব মজার কোনো কৌতুক বলা হয়েছে। তারা বেরিয়ে গেলে নিতুর চাচা লাফিয়ে গিয়ে গেট লাগাল। বাবা বসার ঘরে ফিরে এলেন। বিব্রত মুখে জোর করে হাসি টেনে বললেন, 'আজকালকার ছেলেপেলেরা কত বেয়াদব হয়ে গেছে দেখেন! তবে আমার এই ছোট মেয়েটা কিন্তু একদম অন্য রকম। সে আজ পর্যন্ত কখনো আমার কথার অবাধ্য হয়নি।'

আতঙ্কিত অতিথিরা আড়ষ্টতা কাটিয়ে নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করলেন। একজন আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনি তো পুলিশে খবর দিতে পারতেন।'

'কী লাভ বলেন? এসব ছেলেদের দৌড় আমার জানা আছে। আর আজকে পুলিশের কি আসার সময় আছে? তারা তো এখন রাস্তার পাবলিক সামলাতেই ব্যস্ত।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কাজি সাহেবকে খবর দিয়েছেন তো?'

'দিয়েছি। রাস্তায় ঝামেলা, তাই হয়তো দেরি হচ্ছে।'

'চলে আসবেন,' নিতুর চাচা মাঝখানে ফোড়ন কাটার মতো বলেন। অতিথিদের মধ্যে একজন হতাশ গলায় বললেন, 'সত্যি, আপনার ছেলেটার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।'অন্যরা ওই বিষয়টিতে একমত হলেন। ধীরে ধীরে শান্ত গলায় নিজেদের মত জানাতে থাকলেন। সেদিনের পর থেকে তার কপালে কী আছে এ নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। শুধু নিতুর বাবাকে দেখে মনে হলো নিতুর বিয়েটা নিয়েই তার সব চিন্তা। ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলেই তিনি বাঁচেন। কী করলে কী হতো, কী করলে আজকের এই দিন দেখতে হতো না এসব নিয়ে অতিথিদের আলোচনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তবে সেই আলোচনার মাঝখানে কাজি সাহেব চলে এলেন। তিনি আসার পরে আর দেরি করা যায় না। রাতের খাবারের সময় হয়ে গেল তখন প্রায়। চাচা এসে চাচিকে বললেন, নিতুসহ নিচে আসতে। নিতুর মা এতক্ষণে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিতু চেনা সিঁড়ি ধরে নিজেই নেমে এলো। চাচির হাত সরিয়ে দিল ঘাড় থেকে। নিচে যত এগোচ্ছিল মায়ের কান্নার শব্দ ততই তীব্র হচ্ছিল। নিতুর ইচ্ছে করছিল এমন দূরত্বে যায় যেন এই কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া না যায়। সে কারণেই হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে হেঁটে বসার ঘরের সামনে উপস্থিত হতে তেমন সময় লাগেনি। কিন্তু মায়ের কান্নার শব্দ সেখান থেকেও কানে বাজল। অতিথিদের মধ্যে একজন বললেন, 'মা তো কাঁদবেনই, কী আর করবেন, মেয়ের বিয়ে হয়ে মেয়ে চলে যাবে। আরেক মেয়েকে তো নিজে হাতে বিদায় দিতেও পারেননি।' নিতু চোখ তুলে তাকায়নি। এসব কথার পিঠে বাবা-চাচারাও কোনো কথা বলবে না, সে জানত। নিতু সেই যে চোখ নামিয়ে রেখেছে তো নামিয়েই রেখেছে। তাই জানতেও পারেনি কার সাথে বিয়ে হয়ে গেল। তাকে শুধু যা যা বলা হলো সে যন্ত্রের মতো করতে থাকল। একটা সময়ে তার মনেও ছিল না যে এটা তার নিজেরই বিয়ে হচ্ছে। শুধু মনে হচ্ছিল যা হওয়ার হয়ে যাক তাড়াতাড়ি। সব শেষ করে এরা চলে গেলেই ভালো। শাড়ি-গয়না সব গা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বাবার আর বাসার সবার কথা চিন্তা করে চুপচাপ মুখ বন্ধ করে ছিল। মাথা নিচের দিকে থাকায় সবার জোড়া জোড়া পা দেখতে পাচ্ছিল। তারা কাজি সাহেবের কথার ফাঁকে ফাঁকে এমন জোরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলছিলেন যে মনে হচ্ছিল সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা ভালো না হয়ে পারেই না। তার মধ্যেও একেক সময়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কোনো রকমে বিয়ের কাজটুকু শেষ হলে নিতুকে আর ধরে ওঠাতে হয়নি। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। ঘরে গিয়ে খাটের এক মাথায় বসল। জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল। তার মনে হলো সেদিন তার জীবনের সব আনন্দ আর রহস্য শেষ হয়ে গেল। এরপর আর কিছু দেখার নেই, জানার নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই। তার ছোট পুকুরের মতো শান্ত জীবন চিরকালের জন্য শান্ত হয়ে গেল। আর কোনো ঢেউয়ের সম্ভাবনা নেই সেখানে। বাইরের জমাট অন্ধকারের সাথে তার নিজের কোনো পার্থক্য নেই। সে-ও ওই অসীম অন্ধকারেরই একটা অর্থহীন অংশ।

আশপাশের বাসার মেয়েরা কীভাবে যেন জেনে গেল নিতুদের বাড়িতে কী হচ্ছে তখন। কয়েকজন নিতুর ঘরে চলে এলো তাকে

দেখতে। নিতুর গাল টিপে কেউ বলল, 'এত উদাস ক্যান, আইজই চলি যাবা নাকি!' কেউ বলল, 'বলা নাই কওয়া নাই, হুট করি হয়া গেল?' আবার কেউ 'বর আজ এখানে থাকবে নাকি, নিতু?' বলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। বাকিরাও এ-ওর দিকে চোখ টিপে হাসল। তাদের হাসি দেখে নিতু ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। অচেনা একটা লোক আসতে পারে, তখনই, ওই ঘরে, বলতে পারে যে নিতুর সাথে তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে নিতুর সঙ্গে যা খুশি করতে পারে। নিতুর মনে হলো তখনই সে নিজেকে এমন কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারত যে কেউ তাকে আর দেখতে না পায়। সে আছে কিন্তু সে নেই, এমন হতে পারে না? একটু পরে মেয়ের দল চলে গেল। মা আর চাচি ওপরে আসেনি। তারা মেহমানদের খাওয়াতে ব্যস্ত। বাসার সবাই একরকম নিতুর কথা ভুলেই গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। আরও অনেক পরে চাচি এসে রাতে খাওয়ার জন্য সাদাসাধি করছিল। নিতু বলে দিয়েছিল খাবারের কথা তাকে যেন বলা না হয়। চাচি ডাকাডাকি বন্ধ করে বলল, 'তোমার কি অনশন শুরু হয়ে গেল? এবার কদিন চলবে?'

একসময় সত্যি সেই অপ্রত্যাশিত সময়টাও চলে এলো, যখন চাচি একজন মানুষকে নিয়ে তার ঘরে এলেন। সেই প্রথম নিতু মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখল। নিতুর নিজের পরিণতিসহ বাবা, আপা আর ভাইয়ার ওপরে রাগ তখন এত বেশি যে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার মানসিকতা নেই। তবু একনজরে বেটে আর কালো লোকটিকে তার কাছে খুব কুৎসিত মনে হলো। মনে হলো কোথা থেকে যেন তাকে আক্রমণ করতে আসছে লোকটা, সবার সামনেই আর নিতু প্রতিবাদ করার অধিকারও হারিয়েছে। চাচি হাসিমুখে বলল, 'নিতু, এ হলো বাদল, তোমার বর। একদিনেরই ছুটি নিয়ে এসেছে। কালই চলে যাবে। তোমরা তাহলে কথা বলো, কেমন?'

মায়ের চেয়েও বেশি যার ওপর নির্ভর করা যায়, সেই চাচিকে ভয়ানক নিষ্ঠুর লাগল তখন নিতুর কাছে। যাওয়ার সময়ে দরজার কপাট দুটো টেনে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। লোহার কড়াগুলো সশব্দে দরজার ওপর পড়ল, পড়ে দুবার বাড়ি খেল। আর তারপর থেকে সব নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে লোকটিই প্রথম কথা বলল, 'তুমি বিয়ের কথা জানতা না, তাই না?'

'না।'

'আমাকে তো আজকে আসার জন্য এক সপ্তাহ আগে বলছে ছুটি নিতে। কিন্তু তোমাকে বলা হয়নি কেন? তুমিও কি তোমার বোনের মতো কারও সাথে পালায়ে চলে যাচ্ছিলে নাকি?'

নিতু কোনো কথা বলেনি। এসব কথার কোনো জবাব নেই। আর নিতু যদি মুখ খোলে তো কত বিষ যে গড়িয়ে পড়বে তার সীমা নেই। তাই চুপ করে থাকল। একসময় নিতুর দুই ঘাড়ে হাত রেখে নিতুকে ঝাঁকিয়ে সে বলতে লাগল, 'বিয়ে হয়ে গেল বলে কি মন খারাপ?'

নিতু শুধু বলল, 'না, আসলে আমি জানতাম না তো, তাই।'

'জানতা না তো কী হইছে, এখন তো জানলা।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আমাকে তোমার ভাল্লাগেনি, না? এ জন্য মন খারাপ, আমি বুঝি। কাকে তোমার ভালো লাগে?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, সে রকম কিছু নয়।'

'আমাকে আপনি বলতেছ কেন?'

'অচেনা কাউকে প্রথমে তো আপনিই বলি।'

'অচেনা মানে? একটু আগে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল না?'

নিতু চুপ করে থাকল। বাদল মুখের সামনে এসে বলল, 'নিতু, তুমি খুব সুন্দর। তুমি আসলে তোমার ছবির চেয়েও সুন্দর। কারও কারও ক্যামেরা ফেস অনেক ভালো হয়, সামনাসামনি দেখতে পেতনির মতো। তুমি তা নও। ছবিতে তোমাকে এত সুন্দর লাগতছে দেখে আসলে আমি টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবতেছিলাম সামনাসামনি কী যে দেখব! তবে এখন বুঝতে পারতেছি চিন্তার কিছু ছিল না। তোমার জন্য নিশ্চয় এখানকার অনেক ছেলে পাগল হয়ে আছে। আর তাই তোমার বাবা তোমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠছেন, তাই না?'

'না, সে রকম কিছু না।'

কোনো কারণ ছাড়াই নিতুর বাম চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। একটাই তো ফোঁটা, নিতু ভাবল বাদল হয়তো খেয়াল করেনি। তাই মোছার জন্য হাত না উঠিয়ে মাথাটা বামদিকে একটু কাত করে রাখল।

'ও বুঝছি, বলতে চাও না। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বলবা। আমি অবশ্য সব কথা সরাসরি, মুখের ওপরে বলি। আমার কোনো কিছু নিয়ে কোনো রাখঢাক নেই। আর একটা কথা, আমি কান্নাকাটি একদম পছন্দ করি না। আমার সামনে কখনো ভ্যানভ্যান করে কাঁদবা না। এখন যাও, গিয়ে দরজার খিলটা লাগায়ে দিয়ে আসো।'

নিতু চমকে নিজের বাম গালে হাত দিয়ে পানিটা তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। ওটা তার ইচ্ছাকৃত কান্না নয়। কাউকে দেখিয়ে কাঁদার স্বভাব তার নেই। নিতু মনে মনে হাসল। লোকটার কী ভালো লাগে না লাগে কত পরিষ্কার করে বলল অথচ নিতুর কথা জানতে চাওয়ার কোনো আগ্রহই দেখাল না। বাবা খুব ভালো ছেলে পেয়েছেন নিতুর জন্য যাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাননি। তিনি নিশ্চয় এ বাড়ির নিচেরতলায় অনেক দিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন আজ। বাবা তার পিতৃত্বের দায় পরিশোধ করেছেন। এখন নিতুর পালা। নিতু যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে দরজার খিল লাগাল।

৮

দশ-বারো দিন নিতুকে কোথাও দেখা যায়নি। নিজের ঘর থেকে বেরই হয়নি। ছাদে যেতে ভালো লাগেনি। মা কি চাচি ঘরে এলে কারও সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করেনি। অনশনের ব্যাপারে নিতু সত্যিই সেবারে আগের রেকর্ড ভেঙেছিল। তৃতীয় দিন গভীর রাতে চাচি জবরদস্তি তাকে কিছুটা খাওয়াতে পেরেছিল। তারপর আবার একভাবে পড়ে ছিল বিছানায় উপুড় হয়ে। চাচি বারবার এসে বলে গিয়েছিল, 'নিতু, চুলে জটা ধরে যাবে। যাও উঠে পড়ো।' নিতু ওঠেনি। মনে জোর পায়নি আর শরীর তো চলছিলই না। মনে মনে ভাবছিল, এভাবেই পড়ে থাকতে থাকতে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না সে? এমন পৃথিবীতে সে থাকতে চায় না, যেখানে সবাই তার বিপক্ষে। কেউ যাকে ভালোবাসে না তার তো আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বাসার প্রতিটা মানুষের বিচরণের শব্দ, খোলা জানালায় বয়ে আসা উত্তরের হিম বাতাস, মধ্য দুপুরে একটা-দুটো ফেরিওলার ডাক, সব কিছু নিষ্ঠুর লাগত। সবকিছুতেই খামোখা কান্না পেত। শিরশিরে বাতাসে শরীরে কাঁপুনি উঠে যেত, তবু উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছে করত না। কোনো না কোনোভাবে নিজেকে ক্রমাগত শাস্তি দিতে ইচ্ছে হতো। মনে হতো শীতের বাতাস এসে তার হাড়ে হুল ফুটিয়ে যাক, সেটাও তার একরকম শাস্তি। আবার কখনো কান্নার দমকে শরীর কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ থেমে যেত। কারও মুখ যেন সামনে আসত। মনে হতো তাকে সব বলা যায়, কিছুটা ভার দেওয়া যায়। কে সে?... তপু ভাই! চোখ বুজলে দেখা যেত সেই পদ্মদীঘির পাড়ে পা ছড়িয়ে তপু ভাই বসে আছে। তার কাছে জানতে ইচ্ছে করত, এখন কি শীতের পাখিরা এসেছে? মনে হতো বলে, একবার দেখিয়ে আনলে না আমাকে! ভাবার চেষ্টা করত, তপু ভাই কি বলেছিল যে শীতের পাখিরা এলে তাকে আবার নিয়ে যাবে? কিছুই কেন যেন ঠিকমতো মনে পড়ত না। না খেয়ে থাকতে থাকতে হয়তোবা মাথা কাজ করত না। নাকি সত্যিই সে সব ভুলে যাচ্ছিল! আলনার দিকে চোখ গেলে ওপরের তাকে আপার সালোয়ার-কামিজগুলো পাট পাট করে ঝোলানো। নিতু একদিনও ধরেনি, ইচ্ছেই হয়নি। বাসায় থাকলে আপা এর মধ্যে কতবার বলত, 'তুই কিন্তু আমার জামায় হাত দিবি না। সেবার ব্রোকেটের কামিজটা চাচি এত শখ করে বানিয়ে দিল, তুই নিয়ে

গিয়ে পরে গলার কাছে ফাঁসিয়ে এনে দিলি।' আপার মুখে এ কথাটা জামা নষ্ট হওয়ার পর থেকে বহুবার শুনেছিল নিতু। যতবার শুনত, ততবার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ঋতু থামার পাত্রী ছিল না। তার মতো করে সে তার নিয়মকানুন বলেই যেত, 'আর শোন, আলনার এই ওপরের তাক কিন্তু আমার। এখানে তোর কাপড় রাখবি না একটাও।' নিতুর মনে হতো আপা আসুক, এসে খানিক বকাবকিই না-হয় করে যাক। বিছানায় উপুড় হয়ে সে কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবতে থাকত ঋতুর কথা। কাপড়চোপড়ের খুব শখ ছিল ঋতুর। আর সেসবের জোগান দেওয়ার জন্য ছিল রিংকু। আপার সেই সারি সারি কাপড় একইভাবে পড়ে থাকল আলনায়। মাঝখান থেকে আপা কোথায় চলে গেল! বাথরুমে আপার টুথব্রাশটাও গাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। নিতু ফেলে দেয়নি। ড্রেসিং টেবিলে আপার চিরুনি, সাজগোজের কিছু জিনিস আয়নার ধার ঘেঁষে লাইন করে থাকত। নিতু শুধু এদিক-ওদিক করে প্রতিদিনের ধুলোর স্তর মুছে নিত। ঋতুর আগলে রাখা সম্পত্তি তো দূরের কথা, শক্ত হয়ে থাকা টুথব্রাশটাও নিতু ফেলতে পারত না কিছুতে। আপার চলে যাওয়ার দিনটা যত দূরে সরে যাচ্ছিল, তার ফেলে যাওয়া জিনিসের মূল্য নিতুর কাছে ততই বেড়ে যাচ্ছিল। সেই ঘরে আপা হাসত, তার দুটো পা হেঁটে বেড়াত, তার শরীর এ ঘরের বাতাস টানত, কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াত...ভাবতে ভাবতে আবার গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ত নিতু।

স্কুলের বান্ধবীরা একদিন দল বেঁধে নিতুকে দেখতে এলো। অবাক হলো ওরা। বলল, 'আরে, আমরা তো ভেবেছিলাম এসে দেখব তুমি গয়নাগাটি পরে ঝমঝম করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার এমন অবস্থা কেন?' একজন বলল, 'বর পছন্দ হয়নি, নিতু? নাকি নিয়ে যায়নি বলে রাগ?' সংশোধন করে অন্যজন বলল, 'রাগ কী রে, বল বিরহ।' আরেকজন কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বর তোমার সাথে কী কী করল বলবা না?' হাসতে হাসতে তারা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময়ে মনে করিয়ে দিল, 'পরীক্ষার ফরম ফিল আপের কথা আবার ভুলি যাইয়ো না যেন। আগামী সপ্তাহেই কিন্তু। চলি আসবা।' নিতু মাথা নাড়ল। তারা চলে গেলেই আবার বিছানায় এলিয়ে দিল শরীর। নিতু আসলে ভুলেই গিয়েছিল তার ফাইনাল পরীক্ষার কথা। তখন মনে পড়লেও মনে হলো কী হবে আর পরীক্ষা দিয়ে! কেউ কি চাইত যে সে ঠিকঠাকমতো পরীক্ষা দিক? নিতুর বাবা তখন পরম তৃপ্তিতে বারান্দায় পায়চারি করতেন। মাঝেমধ্যে হাত দুদিকে ছুড়ে গলা কেশে পরিষ্কার করতেন। নিতু ওপর থেকে বাবার বিচরণের সমস্ত শব্দ শুনতে পেত। বাবার কথা বলার ভঙ্গি বদলে গিয়েছিল তখন। কোনো খেলায় শেষ চালে জিতে যাওয়ার মতো খুশি লেগে থাকত তার গলায়। শুনলে নিতুর গা জ্বলে যেত। নিচের বারান্দায় বসে চাচা একদিন নিতুর বাবাকে বললেন, ভাইজান, 'এভাবে নিতুর বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হলো? সে তো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।'

'কয়েক দিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তবু। তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে এভাবে ব্যাপারটা মনে হয়...'

'ঋতু কি আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল যাওয়ার আগে?'

'কিন্তু একজনের অপরাধে আরেকজনকে...'

'আমার যা ভালো মনে হয়েছে, আমি তাই করেছি। কয়েকটা দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। কত দিন না খেয়ে থাকবে?'

তবে এটা ঠিক যে নিতুর ঠিক হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। নিতু তার নিজের ঘরে নিজেকে আটকে রাখল। তার এই নীরব প্রতিবাদে মা আর চাচির বুক ফেটে যেত। একদিন হাঁফাতে হাঁফাতে চাচি এসে বললেন, 'নিতু, শোনো, শোনো কে ফোন করেছে'

'কে?'

'আরে ঋতু! সে এখানে এসেছে। শ্বশুরবাড়িতে উঠেছে। রতনের বাসার সবাই তাকে মেনে নিয়েছে। গলা শুনে মনে হলো খুব খুশি। যাক, সে ভালো আছে।'

'ও।'

'কিসের 'ও'! ওঠো তো তুমি, বুঝতে পারছ না ঋতু এখানে আসবে দু-এক দিনের মধ্যে। ঘরবাড়ি গোছগাছ করো, তোমাকে এভাবে দেখলে তার খুব কষ্ট হবে, ওঠো।'

'দেখুক। সে-ই তো দেখবে। তার জন্যই তো আজকে আমার এই অবস্থা, চাচি।'

'কেন এভাবে ভাবছ, নিতু? মানুষের বিয়ে হয় না? আগে আর পরে। তোমার না হয় একটু আগেই হয়েছে। আর ঋতু তো ভালো আছে, আমাদের খুশি হওয়া উচিত।'

জানালার বাইরে সাদা মেঘের উড়ে যাওয়া দেখে নিতুর মনে হলো, সত্যিই তো, তার খুশি হওয়ার কথা। ভীষণ খুশি হওয়ার কথা। আপাকে নিয়ে একসময় কত খারাপ খারাপ খেয়াল আসত! বেশির ভাগ সময়েই মনে হতো আপার সাথে আর কোনো দিন দেখা হবে না। রতন ভাই আপাকে কোথায় যে গুম করে দেবে! আপার মুখ সামনে আসতে না আসতেই নায়িকা রেখার মুখ চলে আসত। রেখার ওমরাওজান সিনেমার কথা ভাবতে ভাবতে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। আপাই জোর করে একদিন ভাইয়ার ঘরে নিতুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে ওমরাওজান দেখার জন্য। সেই সিনেমা মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক হয়ে বসে গেল তারপর থেকে। মনে হতো এই শহরে কোনো দিন আসতে পারবে না আপা। কখনো টেলিফোনে কথা হলেও মনে হতো আপা কিছু লুকাচ্ছে, সে সুখে নেই। মনে হতো, ভাইয়ার মতো রতন ভাইও হয়তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আপা একা হয়ে গেছে, কষ্টে আছে। অথচ আজ আপার সুখে থাকার খবর শুনে এ রকম অশান্তি লাগছে কেন? আপা খারাপ থাকলেই কি সে খুশি হতো? নিজের ভাবনার জন্য খুব লজ্জা লাগল। সাদা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনের ওপর থেকে কালো পর্দা সরে যেতে লাগল। সেই আগেকার মতো ছাদে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল। মেঘের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চোখটা বুলিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। পৌষের চড়া রোদ জানালা গলে বিছানার ওপরে এসে পড়ে ছিল। সেই রোদ গায়ে মেখে অনেক দিন পরে নিজে থেকে উঠে বসল সে। এলোমেলো ছড়ানো চুলগুলো পেঁচিয়ে খোঁপা করতে গেল, খোঁপার প্যাঁচ শেষ করার সাথে সাথেই বারবার খুলে পড়ছিল। মনে মনে হাসল আর ভাবল, চাচি যে কী বলে! এত ঝরঝরে, স্কেল দিয়ে টানা সরলরেখার মতো চুলে কখনো জটা ধরে?

তার আগ পর্যন্ত ওই কদিনের মধ্যে নিতুকে একবার মাত্র ঘর থেকে বের হতে হয়েছিল। চাচি এসে খুব টানাটানি করে নিয়ে গিয়েছিল বাদলের ফোন ঢাকা থেকে। আগেও ফোন করেছিল, নিতু যায়নি দেখে চাচি বলেছে, বাসায় নেই। শুনে বাদল উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল, 'পরীক্ষার জন্যই তো সে সেখানে থেকে গেল, অথচ কোথায় আবার টইটই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' চাচি বানিয়ে বলেছিল যে নিতু পড়ার কাজেই বাইরে গেছে। বান্ধবীর কাছ থেকে নোট আনতে। আর তারপর আরেক দিন ফোন করল ভরা সন্ধ্যায়। সময়টাই ছিল এমন যে বলা যায়নি নিতু নেই। তাই নিতুকে ফোন ধরতে যেতে হয়েছিল। বিরক্তি লুকিয়ে ধীরে ধীরে নিতু বলেছিল, 'হ্যালো।'

'যাক্, আজকে তো দেখতেছি বাসায় আছ! তা, কেমন আছ?'

'ভালো, আপনি ভালো আছেন?'

'আছি। তোমার বাবা তো বললেন যে তুমি নাকি পড়ালেখা নিয়েই থাকো। পড়াশোনা করতেছ তো ঠিকমতো?'

'জি।'

'শোনো, শুধু পরীক্ষার জন্য তুমি ওখানে পড়ে আছ। এ কথাটা মনে রাখবা। তা না হলে আমার মা তো বাড়িতে একা, সেখানেই তোমাকে রেখে আসতাম। আমার তো এখানে নতুন চাকরি, শেয়ারের বাড়িতে থাকি। যত দিন বাসা নিতে না পারি, তুমি দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে থাকবা।'

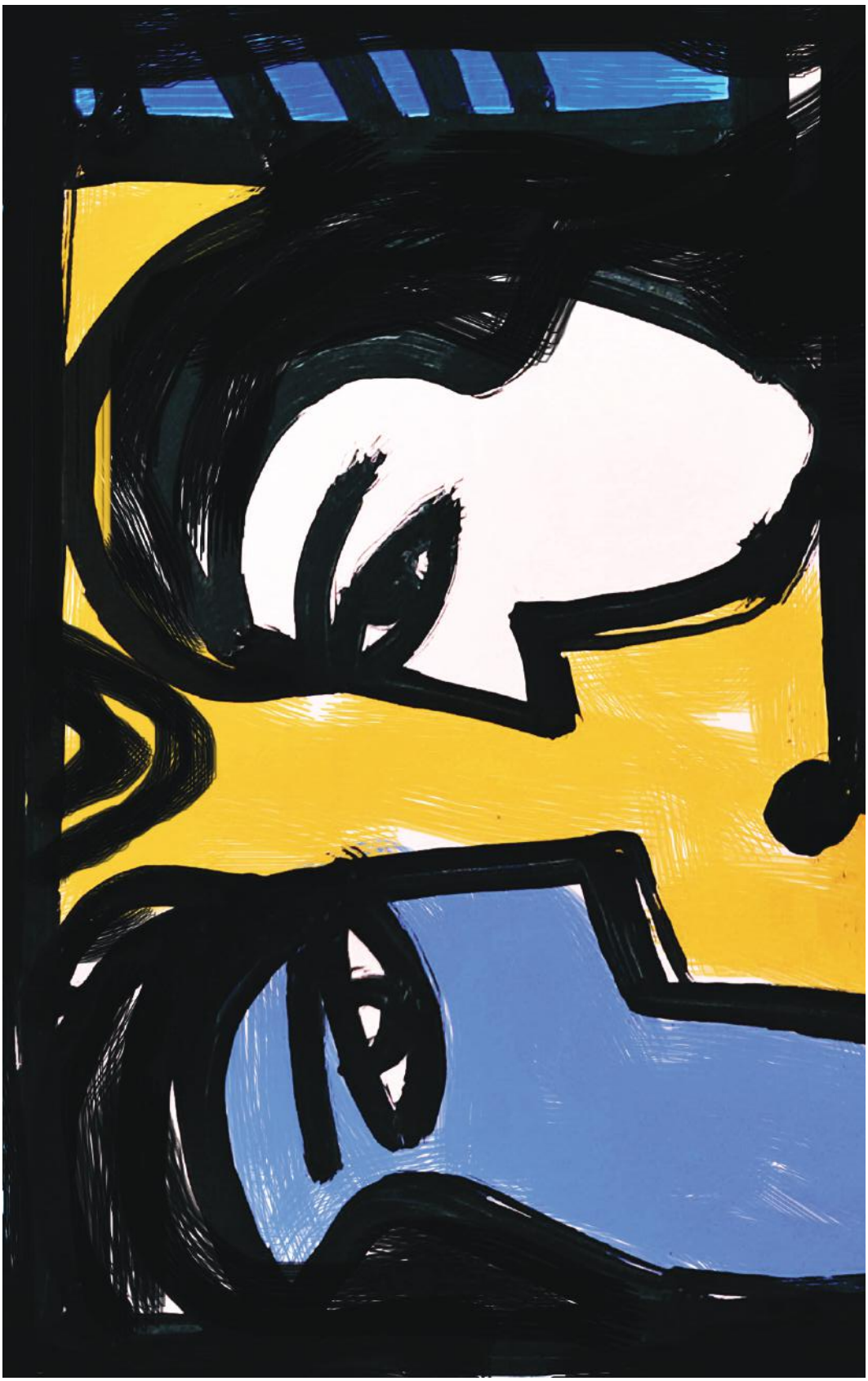

'জি।'

'কী, তখন থেকে শুধু জি জি করে যাচ্ছ? আমার সাথে কথা বলতে তোমার অসুবিধা?'

'জি না।'

'সেদিন ফোন করে তোমাকে পাইলাম না। অফিস থেকে তো আর সব সময় ফোন করা যায় না। তুমি যখন-তখন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করবা না। আমি পছন্দ করি না। বাসাতেই থাকবা, বুঝলা? তুমি নিশ্চয় এখন আরও সুন্দর হয়ে গেছ, তাই না? বিয়ের পর তো তেমনই হওয়ার কথা। কী সব হরমোনাল ব্যাপারস্যাপার আছে না?'

নিতু কোনো জবাব দেয়নি। ফোন কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মনে হলো ওপাশে বাদলের মুখে লালা এসে পড়েছে। ভীষণ লোভী গলায় কথা বলছিল। নিতু অবাক হয়ে ভাবছিল, এই মানুষটি যা যা বলবে, তাকে শুনে যেতে হবে। লাইন কেটে দিলে সে আবার ফোন ঘোরাবে। তার অধিকার নেই বলার যে আপনার কথাবার্তা আমার কাছে কুৎসিত লাগে। আমি কথা বলব না। দুদিন আগে তার জীবনে যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এখন এটা কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসা? যা বলবে তা-ই করতে হবে তাকে। তার পছন্দটা সে বলবে কিন্তু নিতুর পছন্দের কী হবে? সেটা জানার কোনো আগ্রহ দেখেনি সে বাদলের। তার সাথে কী করে কথা বলা যায়? একদিন সত্যি তার সঙ্গে চলেও যেতে হবে ভাবতে রাগে-দুঃখে নিতুর চোখ ফেটে পানি এসে গেল। তবু ফোন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ ওদিক থেকে আদেশ-নির্দেশের ফিরিস্তি শেষ না হয়। বাদল ফোন রাখলে চাচিদের ঘর থেকে বেরিয়ে আমলকীগাছের নিচের উঠোন পেরিয়ে কোনো রকমে নিতু বারান্দায় উঠেছে। তখন যেন সামনে এগোনোর আর কোনো শক্তি ছিল না তার পায়ে।

সেদিন সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরোতেই পারেনি। সারা দিন ঘন কুয়াশায় আকাশ মোড়ানো। তাই সন্ধ্যার আগে আগেই চারদিকে থমথমে রাতের আভাস। মেঝের সিমেন্ট উপড়ে লাল ইট বেরিয়ে পড়া সিঁড়িতে পা দিতেই নিতুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। একদিন বাদল এসে বলবে, নিতু, চলো। তারপর এই সিঁড়ির শেষ ধাপটা পেরিয়ে চলে যেতে হবে। কিছু বলার থাকবে না। কেউ আটকাতে পারবে না। কান্না এসে ধাক্কা দিলে গলার কাছে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তার মাঝে আবার অভিমান এসে কান্নাটাকে থামিয়ে দিল। ভালোই হবে। নিতুর বাবা-মা তো তা-ই চেয়েছিল। তারা তো এটাই চেয়েছিল যে নিতু খুব কষ্ট পাক। একটা অচেনা লোকের সাথে ঘরে ঢুকে নিতু দরজা বন্ধ করে দিক, একটা অচেনা বাড়িতে চলে যাক। সবাই তাই চেয়েছে। তাই হোক।

দুদিন পরে সত্যিই ঋতু এলো। সঙ্গে তার বর রতন। চাচি আর মা সারা দিন ধরে নতুন জামাইকে খাওয়ানোর জন্য অনেক কিছু রাঁধল। নিতুর বাবা অফিস থেকে এসে ঘরে ঢুকলেন। তার কথাবার্তায় অস্বস্তি লেগে থাকল। যেন মেয়ে আসাতে আনন্দিতও নন, আবার মানাও করতে পারলেন না। ঋতু এসেই মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর পেছনে নিতুকে দেখে তাকেও জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকল। নিতুর বাবা বিব্রত ভঙ্গিতে রতনের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো রতনকে তার ভালোও লেগে গেল। ভালো লাগার কারণ এখন সে সেখানেই তার বাবার নাইট কোচের ব্যবসায় ঢুকে পড়ছে। ব্যবসাটাকে আরও বড় করবে। ছাত্ররাজনীতি করে তার বহু মানুষের সাথে জানাশোনা হয়েছে, সুতরাং তার জন্য কাজটা সহজ হবে। সে এখন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। রিংকুর মতো বখে যাওয়ার দিন শেষ তার। মেয়ের সংসার দাঁড়িয়ে যাওয়ার খবর শুনতে কার না ভালো লাগে। নিতুর বাবা-মাও খুশি। অনেক দিন পরে দেখা হওয়ার আবেগ সামলে নেওয়ার পরে জানা গেল ঋতু সত্যি ভালোই আছে। তার কথাবার্তা শুনলেও বোঝা যায় সে সুখে আছে। রতনের আর শ্বশুরবাড়ির সুনাম তার মুখে লেগে আছে। সেখানকার সবাই তাকে পছন্দ করে। চাচি বলল, 'আমাদের ঋতুর যা চেহারা, পছন্দ না করে উপায় আছে?' ঋতুর মা কেঁদে কেঁদে বললেন, 'ঋতু, তুই ফিরে এলি মা কিন্তু আমার রিংকুটা যে কোথায় আছে, কেমন আছে তার একটা খবরও জানি না।' ঋতু এক ফাঁকে নিতুকে টেনে নিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। সামনে বসিয়ে জানতে চাইল, 'তোর কী হয়েছে বল তো? চেহারার এ রকম অবস্থা করলি কী করে?'

'কই?'

'কই মানে? চোখের নিচে তুই আয়না দেখিস না? বাদ দে, বর পছন্দ হয়নি?'

'জানি না।'

'তুই না বললেও আমি জানি, তুই ভালো নেই আর এ জন্য আমিই দায়ী। আমি খুব স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিলাম রে তোর কথা একবারও ভাবিনি।'

ঋতুকে অসহায় দেখাল। নিতু সেদিকে মনোযোগ দেয়নি। ঋতু তাকে জড়িয়ে ধরল। বোনের ছোঁয়ায় আর নিজেকে ধরে রাখা গেল না। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে নিতু। বলল, 'কেন তোমরা সবাই মিলে আমার সাথে এমন করলে আপা? আমি তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি। আমি তো আমার মতো ছিলাম।'

'নিতু, ছেলেটাকে কি তোর সত্যিই ভালো লাগেনি?'

'লাগেনি বললে কী করবে আপা? পারবে সবকিছু বদলে দিতে? বাবা আমাকে খাঁচার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। এখন কী করবে তুমি? বলা নেই কওয়া নেই, বাসায় এসে শুনি বিয়ে। এভাবে হয় নাকি, আপা?'

'আমি বুঝি নিতু, তবু কয়েকটা দিন দেখ। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যায় না। আমাকে মাফ করিস। আমার জন্যই আজ তোর এই অবস্থা।'

নিতু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকল। বোঝে না তার কেন এমন হচ্ছে, সব জমানো কান্না আপার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। এত দিন মনে মনে আপাকে যত অভিশাপ দিয়েছে, সে সবের জন্য অনুতাপ হলো। যার ওপর রাগ তাকেই সব জানাতে হবে, এমনটা সে আগে ভাবেনি। নালিশের মতো গড়গড় করে বলতে চাইল মন। বাদল সেদিন কেমন জোর করে টান মেরে তার শাড়ি খুলে ফেলেছিল সে কথা বলতে ইচ্ছে করল। কোমরের কাছে শাড়ির এক জায়গায় ফেঁসে গিয়েছিল। নিতু ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চাচির শাড়ি চাচিকে ফেরত দিয়ে এসেছে। চাচি পরেও আর নিতুর কাছে কিছু জানতে চায়নি। ঘাড়ের কাছে বাদল কামড়ে দিয়েছিল। নিতু কোনো শব্দ করেনি। তারপর কয়েক দিন হাই নেকের জামা পরে, ওড়না গলায় পেঁচিয়ে নিতু বিছানায় পড়ে থেকেছে। বাদলের ছোঁয়ায় কোনো আদর ছিল না; একরকম খিদে ছিল বটে। বাদল কাছে এসেছিল কিন্তু কখনো নিতুর মুখের দিকে তাকায়নি। নিতুর বুক আর কোমরে তার চোখ অস্থির ঘোরাফেরা করছিল। তার কথায় কোনো ভালোবাসা ছিল না, কেবল আদেশ। সে যেন সেই আগেকার দিনের মতো নিতুকে কিনে নিয়েছে। নিতুর জীবনে এরপর কী হবে না-হবে, সে কোথায় যাবে না-যাবে, সব সিদ্ধান্ত এখন থেকে বাদল নেবে। একদিনের জন্য কোথা থেকে এসে অদ্ভুত একটা মানুষ হইহই করে চর দখলের মতো নিতুকে দখল করে চলে গেল, কেউ মানা করল না; বরং সবাই খুশিই হলো। নিতু মনে মনে এই সব কথা আওড়াল আর ঋতুর বুকে মাথা রেখে খুব কাঁদল। তার মনে হলো কিছুই বলার দরকার নেই, আপা যেন এমনিতেই সব বুঝে যাচ্ছে। মাথায় হাত বুলিয়ে আপাও মনে মনে অনেক কথা বলছিল। নিতু শুনতে পাচ্ছিল।

খাওয়ার পরে রাতে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেও পরদিন সকালে ঋতু আবার এসে উপস্থিত। সে একা আর সাথে একটা বড় ব্যাগ। এসেই বারান্দায় চাচিকে দেখে ঘোষণা দিল, 'তোমাদের সাথে কয়েকটা দিন থাকতে এলাম, চাচি।'

'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু রতন কই?'

'আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কাল হয়তো আসবে একবার।'

'তাকেও আমাদের এখানে থাকতে বলো।'

'থাকবে থাকবে, তার কিছু ব্যবসার কাজ আছে তো, তাই চলে গেল।'

তারপর দুমদাম করে ওপরে উঠে গিয়ে নিতুকে বলল, 'অ্যাই, ওঠ। যা রেডি হয়ে নে, আজ না তোর পরীক্ষার ফরম ফিলাপ, তাড়াতাড়ি কর।'

আপা কীভাবে জেনে গেল কে জানে। নিতু বাধ্য হয়ে উঠল বিছানা থেকে। স্কুলে গেল। সেখানে থাকার পুরো সময়টা নিতু চুপচাপ। কে জানে কে আবার কী বলে! কেউ কিছু না বললেও নিতুর মনে হলো সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিছুদিন আগে পাড়ায় নিতুর চেয়েও বছরখানেকের ছোট রুমুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সে সারা পাড়ায় শাড়ি পরে বরকে নিয়ে ঘুরছিল। এবাড়ি-ওবাড়ি গিয়ে বরকে দেখাচ্ছিল। একদিনের মধ্যে তার চেহারা বদলে গিয়েছিল। তার চলাফেরায় তখন গয়না আর জরি-চুমকির কাজ করা ভারী শাড়ির খসখস শব্দ। চকচকে গয়না দেখিয়ে একে-ওকে বলছিল, কোনটা কার পছন্দ, কে কোনটা দিয়েছে। তার খুশি দেখে খুব ভালো লাগছিল নিতুর। তারপর থেকে যতবার রুমুকে দেখেছে কেবল আনন্দে ভাসতে দেখেছে। মনে হতো, এই বিয়েটাই একটা বিষয় যার জন্য রুমু এত দিন ধরে অপেক্ষা করছিল। নিতুর কেন তেমন হয় না? সে কি কখনো রুমুর মতো হতে পারবে? ফরম ফিলাপ হয়ে গেলে স্কুলের মেয়েরা বলল, 'ওমা, তোমার শুনলাম বিয়ে হয়েছে, দেখে তো বোঝাই যায় না!' কী আশ্চর্য! বিয়ে হলে কি গায়ে লেখা থাকবে নাকি যে দেখেই বোঝা যাবে? তাদের এসব ফালতু কথা নিতুর অসহ্য লাগল। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে দেখে মনে হয় কত সুখী! কারও যেন কোনো চিন্তা নেই, গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব। নিতু কেন ওদের মতো চিন্তাহীন হতে পারে না? কোনো রকমে ফরম ফিলাপ শেষ করে সে বাসার দিকে পা চালায়। শুধু নিতুর প্রিয় ভারতী ম্যাডাম ফরম ফিলাপের সময় কাছে এসে বললেন, 'শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে হয়ে গেল? দেখো মেয়ে, পড়াশোনাটা আবার ছেড়ে দিয়ো না যেন!'

সেদিন বেশ রাতে দুই বোন যখন জেগে জেগে গল্প করছিল, তখন হঠাৎ গেটের বেল বাজল। এত রাতে কে আসতে পারে ভাবতে ভাবতে নিতু নেমে এসে দেখে রিংকু। প্রায় মাস দুয়েক পরে বাসায় ফিরে এলো সে। নিতুর দিকে একটু হেসেই ওপরতলায় চলে গেল। নিতু পেছনে পেছনে এসে দেখল সে ঋতুর সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে। তার চোখমুখ উদভ্রান্ত। কোথায় কোথায় পালিয়ে থেকেছে এ কদিন কে জানে, গালের হাড় বেরিয়ে গেছে, কাপড়চোপড় ময়লা। রিংকু নিতুকে আসতে দেখে বলল, 'নিতু, আমি ভাত খাব। দেখ তো গিয়ে রান্নাঘরে কী আছে।'

'এত দিন কোথায় ছিলে, ভাইয়া?'

'সে অনেক জায়গায়। যা তাড়াতাড়ি আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমি ভাত দিচ্ছি। তুমি কাপড় বদলে এসো।'

দুই বোন বসে ভাইকে দেখছিল। রিংকু বড় বড় লোকমা তুলে খেতে লাগল। দেখে মনে হলো অনেক দিন ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। খিদেটা যখন একটুখানি কমে এল, তখন একটু থামল। ঋতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কালই শুনলাম যে রতন ফিরে এসেছে। তখনই বুঝলাম বাসায় এলে তোকে দেখব। রতন তো শুনলাম রাজনীতি করাও ছেড়ে দিচ্ছে। এমনিতে অন্য পার্টির হলেও ছেলে ভালো।'

নিতু বলল, 'ভাইয়া, তুমি যে ফিরে এলে, অসুবিধা হবে না? একদল ছেলে এসেছিল একদিন তোমার খোঁজে। আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম। ওরা যদি আবার আসে?'

'না, অসুবিধা নেই। সব শান্ত হয়ে গেছে। নেতাকে দিয়ে বলিয়ে ম্যানেজ করেছি। কী আর করব, ওদের পার্টিতে জয়েন করতে হবে, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল।'

'ব্যস?'

'ব্যস। এটাই তো রাজনীতি, যেদিকে বৃষ্টি আসবে সেদিকে ছাতা মেলে ধরো, ব্যস, হয়ে গেল। আর আমার পার্টি তো ফিনিশ। এখন এদের দলে যোগ দিলে অন্তত আমার জানটা বাঁচে। আমি কাজ জানা মানুষ, তাদেরও লাভ, আমারও লাভ, কথাবার্তা সব হয়ে গেছে প্রায়। সে জন্যই তো ফিরে আসতে পারলাম। কদিন পরেই দেখবি ফুলের তোড়া দিয়ে ওই ছেলেপেলেই আমাকে বরণ করতে আসবে।'

ঋতু বলে, 'ভাইয়া, তুমি কি জানো যে বাবা নিতুর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে?'

'বলে কী! কার সাথে?

'তার কলিগের ভাগনের সাথে।'

'তাই নাকি? বলেছিলাম না, বাবা একটা হিটলার? এবার বুঝলি?'

নিতু আর ঋতু দুজনই চুপ করে থাকল। রিংকু বলতে লাগল, 'ক্লাস নাইনে উঠে আমি বললাম, বাবা, আমি আর্টস পড়ব। তিনি বললেন, না, তোকে সায়েন্স পড়তে হবে। তখন থেকে আমার পড়ার ইচ্ছেটাই গেল চলে। সারা জীবন সবার ওপরে তিনি'

ঠিক তখনই বারান্দায় বাবার গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'এত রাতে কে কথা বলে ওখানে?'

নিতু বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'বাবা, আমরা। ভাইয়া এসেছে।'

'এত দিন পরে সুপুত্র কোথা থেকে উদয় হয়েছে? শোনো, নেতাটিকে বলে দিয়ো, বাসায় যেন কোনো আজেবাজে ছেলেপেলে তাকে খুঁজতে না আসে। ঘরভর্তি মেহমানের সামনে আমার মানসম্মান কিছু রাখল না সেদিন।'

হিটলারের গলার শব্দে ভাইয়ার হাত থেমে গেল। মুখের মধ্যে ভাত থাকলেও মুখ আর নড়ল না। দুই ঠোঁট চেপে থাকল। বাবার গম্ভীর চিৎকার ভাইয়া তো শুনতে পেলই, পাশের বাসার মানুষেরাও হয়তো শুনেছিল। তাই নিতু তার নির্দেশ নতুন করে ভাইয়ার কাছে আওড়ানোর কোনো দরকার আছে বলে মনে করল না। শুধু আসন্ন ঝগড়ঝাঁটির আশঙ্কায় চুপ করে থাকল। চেঁচামেচি শুনে নিতুর মা ঘুম থেকে উঠে এলেন। রিংকুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

৯

আগে প্রায়ই চাচিদের বাসার ফোনের লাইনে ঝামেলা হতো। দিনের পর দিন ফোন ডেড হয়ে পড়ে থাকত। চাচা নিজে যেত বা রিংকুকে পাঠাত টেলিফোন অফিসে। বারবার অভিযোগ করার পরেও কোনো লাভ হতো না। তারপর হঠাৎ কোনো দিন লাইনম্যান এসে উপস্থিত হলে চাচা নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করত। তাকে, 'ভাই, চা-মিষ্টি খেয়ো'বলে কিছু টাকা ধরিয়ে দিত ফোন ঠিক হয়ে যাওয়ার পর। অথচ সেই সময় ফোন আর নষ্টই হচ্ছে না। নিতু প্রার্থনা করত ফোনটা যেন জনমের মতো নষ্ট হয়ে যায়। দু-চার দিন পরপর বাদলের ফোনের অত্যাচার আর সহ্য হতো না তার। পরীক্ষার পরে বাদলের সাথে রওনা দিতে হবে ভাবলে মনে হতো পরীক্ষা শেষ হলে নিতু নিরুদ্দেশে চলে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে ভাবতে গেলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত। সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে আর তারপরের দুর্দশার কল্পিত দৃশ্য চোখের সামনে এলে কান্না পেত খুব। ভাবত কেমন হবে যদি মনে করে সে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর কোনো অপরিচিত বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিল। ভাবতে দোষ কী যে সে সেই বাসার কাজের মেয়ে হয়ে গেল? ছদ্মবেশে সেখানে থাকতে শুরু করল। সংসারের কাজকর্ম নিতু তো সব জানেই, কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তারপর অনেক দিন পরে সেই বাসার লোকেরা আবিষ্কার করল যে নিতু পড়ালেখাও জানে! সবাই নিশ্চয় ভীষণ অবাক হবে। পড়াশোনা জানে তো জানে, তাই বলে একেবারে এসএসসি পাস। এ রকম রোমাঞ্চকর কল্পনায় নিতুর বহু সময় কেটে যেত। পরীক্ষার পড়া এমনিতেও খুব একটা এগোত না। নিজেকে কাজের মেয়ের চরিত্রে কল্পনা করে খুব মন খারাপ হয়ে

যেত। আবার বাদলের হাত ধরে চলে যাওয়ার চেয়ে এ রকম একটা পরিণতি অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে মেনেও নিতে ইচ্ছে করত। তারপর একের পর এক বঞ্চনার দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেত আর কেঁদে ভাসাত। সারক্ষণ আতঙ্কে থাকত, এই বুঝি ফোন এলো! চাচিকে তার নাম ধরে ডাকতে শুনলেই পেটের ভেতরে গুড়গুড় করত। আর সত্যিই যখন বাদলের ফোনের জন্য ডাক আসত, তখন নিতুকে যেতেই হতো। একবার ইচ্ছে করে না যাওয়ার জন্য অনেক কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। চাচিকে বলেছিল বলতে যে সে পাশের বাসায় গিয়েছে। আর পরে নিজেই সে কথা ভুলে গিয়ে বাদলকে বলেছিল যে সে বাথরুমে ছিল। বাদল উকিলের মতো জেরা করতে শুরু করেছিল, 'ঠিক করে বলো তুমি তখন কোথায় ছিলা, বাথরুমে নাকি পাশের বাসায়?'

'আমি গোসল করছিলাম।'

'তুমি কি গোসল করতে যমুনায় গিছিলা যে এতক্ষণ লাগল? আমি আধা ঘণ্টা পরে আবার ফোন করে শুনি তুমি নাকি পাশের বাসায় গেছ?'

'ও হ্যাঁ, গোসল করে আমি পাশের বাসায় গিয়েছিলাম মনে হয়।'

'মনে হয় মানে কী, গেছিলা নাকি যাওনি? আর সে বাসায় তুমি কেন যাও? কে আছে সেখানে? কোনো ছেলে আছে?'

'না, ওটা তো শেফাদের বাসা। আমাদের স্কুলে পড়ে, ওরা চার বোন, ভাই নেই।'

'তোমার এখন দিনরাত পড়াশোনা করার কথা আর তুমি পাড়া বেড়াচ্ছ? তার চেয়ে আমি তোমাকে আমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি।'

'না না, আমি অন্য কোথাও যাই না, আমি তো বাসাতেই...'

'তোমার গুণ্ডা ভাই আর ঘর পালানো বোন নাকি ফেরত আসছে? বাহ্! একেবারে চাঁদের হাট বসছে নিশ্চয় তোমাদের বাসায়। সেখানে কি আর পড়াশোনার পরিবেশ আছে?'

'কিন্তু আমি তো আমার ঘরেই থাকি।'

'বুচ্ছি বুচ্ছি, শোনো শুক্র-শনিবারের সাথে মিলায়ে একদিন ছুটি পাইলে আমি চলে আসব। প্রতিদিন রাতে আমার তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা করে। আমি জানি, ওই দিনই তোমার প্রথম, তাই না?'

নিতু আর কোনো উত্তর দেয়নি। এসব কথা বাদলের মুখে খুব অশ্লীল শোনাত। স্কুলে মেয়েরা এ ধরনের কথা বলে হেসে গড়াগড়ি খেত। নিতুও তাদের সাথে হেসে গড়িয়ে পড়ত একসময়। বাদলের কর্কশ গলায় এসব শুনলে সে রকম কোনো আনন্দ হতো না। বাদলের টেলিফোনে নিতুর শোনা সবচেয়ে প্রিয় কথা হলো, 'আচ্ছা, রাখি।' এটা বলেই বাদল ঠাস করে টেলিফোন রেখে দিত। নিতুর 'আচ্ছা' কিংবা 'ঠিক আছে' শোনার জন্য তার আর সময় থাকত না। প্রথমে একদিন নিতু 'ঠিক আছে' বলে দেখল ডায়াল টোন শোনা যাচ্ছে। তারপর থেকে আর বলত না। 'আচ্ছা রাখি' শুনলেই তার ভালো লাগত।

কথা বলে ফিরে এলে আরেক যন্ত্রণা। চোখ-মুখ কালো দেখলে চাচি আর আপা খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'বাদল কী বলে নিতু যে তোর মুখ ওরকম হাঁড়ির মতো হয়ে যায়?' আর ভাইয়া সামনে থাকলে বলত, 'মনে তো হচ্ছে ব্যাপারস্যাপার সুবিধার না। আমাকে বল, তারপর দেখ শালার কী করি।' রিংকু ফিরে আসার পর থেকে অনেক বদলে গিয়েছিল। সারাক্ষণ বাসায় থাকত। দিনের বেলা বসে বসে রেডিও শুনত। মিউজিক সিস্টেম চলে গেছে বলে কোনো দুঃখ ছিল না। বলত, 'দেখিস, ওই শালাদের পার্টির টাকা দিয়েই আবার কিনব।' আসার দু-চার দিন পর থেকে আরেকটি নতুন ব্যাপার হলো। নিজের ঘরের দরজার কড়া দুটোতে একটা বড় তালা লাগিয়ে রাখত সে। বারান্দায় বসে থাকলেও তালা লাগানো, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিত না। নিতুর মা ঘর পরিষ্কার করার কথা বললে বলত, 'আমিই পরিষ্কার করে নেব।'তিনি অবাক হয়ে যেতেন। এক গাস পানিও যাকে ঢেলে খাওয়াতে হতো, সেই ছেলে কিনা ঘর আর বাথরুম পরিষ্কার করছে? মনে মনে ভাবতেন, বেশ কিছুদিন বাসার বাইরে থেকে তো ভালোই উন্নতি হয়েছে ছেলের! নিজের কাজটা অন্তত করতে শিখেছে। নিতুও লক্ষ করেছে আগে ভাইয়া আপাকে অন্তত ঘরে ঢুকতে দিত, তখন আপার জন্যও ঢোকা মানা। ভাইয়ার সব গোপন ব্যাপার জানার অধিকার একমাত্র আপারই ছিল। তখন আপার কাছেও ভাইয়ার ঘরটা রহস্যময় একটা এলাকা হয়ে উঠেছিল। আরও একটা ব্যাপার সে খেয়াল করেছিল, ভাইয়ার খিদে অনেক বেড়ে গেছে। সে অনেক বেশি খাবার চেয়ে নিচ্ছিল মায়ের কাছ থেকে। রান্নাঘরে মায়ের আঁচলের পাশে আয়েশ করে সে তখন খুব কমই খেতে বসত। খাবারগুলো নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিত। তারপর আবার একসময় এঁটো বাসনপত্র রান্নাঘরে রেখে যেত। এসব দেখে অবাক লাগত নিতুর। কারণ ভাইয়া নিজের ঘরে বসে এক কাপ চা খেলেও নিতু ঘর গোছাতে না যাওয়া পর্যন্ত সেই চায়ের কাপ সেখানেই পড়ে থাকত। চায়ের তলানি শুকিয়ে চামড়ার মতো হয়ে কাপে দাগ বসে যেত। আর তখন তার চেয়েও তাজ্জব করা ঘটনা হলো শুধু বাসার খাবারে ভাইয়ার আবার কখনো কখনো কুলাত না। রাতের দিকে বেশির ভাগ বাইরে থেকে প্যাকেটে করে খাবার এনে দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে টুক করে নিজের ঘরে ঢুকে যেত সে। সত্যি, ফিরে আসার পরে ভাইয়ার খিদে খুব বেড়ে গিয়েছিল।

এক রাতে ভাইয়া খাবার নিয়ে এসেছে ভেবে গেট খুলতে গিয়ে নিতু দেখল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বাদল। তাকে দেখে নিতু ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল নিতু। আর নিতুকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাদল ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এসে পড়লাম।'

'সে কী! কালও তো টেলিফোনে কথা হলো, আসবেন, বলেননি তো?'

'তাতে কী হইছে? আমি আসাতে তোমার অসুবিধা হইল নাকি? আর শোনো, তুমি আজকে, এই মুহূর্ত থেকে আমাকে আপনি বলা ছাড়ো। আমার বয়স কি বেশি লাগে তোমার কাছে? নিজেকে একেবারে কচি খুঁকি মনে করো? বারো বছরের পার্থক্য কোনো ব্যাপার না। আমার বাবা-মায়ের বয়সের পার্থক্য ছিল সতেরো বছর। হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুখী সংসার।'

নিতু ঝুঁকে বাদলের হাত থেকে ব্যাগ নিল। ব্যাগ ভারী দেখে নিতুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাদল হয়তো অনেক দিন থাকবে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার সময়ে তারা প্রথম পড়ল রিংকুর সামনে। বাদল হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর পেছনে পেছনে নিতু ব্যাগ টেনে টেনে ওঠাচ্ছে দেখে রিংকুর মুখ থেকে এমনিতেই বেরিয়ে গেল, 'বাহ্!' নিতুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বাবা সাংঘাতিক চিড়িয়া জোগাড় করেছে তোর জন্য। তোর ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি, একদম ফকফকা।'

বাদল হাত বাড়িয়ে দিল রিংকুর দিকে, 'শ্যালক নাকি? সম্পর্কে ছোট হলেও বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়ই হব। এমনিতে অবশ্য আমার বয়স খুব বেশি না। তা কবে ফেরা হলো?'

'এই তো কয়েক দিন আগে।'

'পার্টি তো এক্কেবারে ডুবছে, না? খুব ধরপাকড় চলতেছে ঢাকায়। অভি আর নিরুকে খোঁজা হচ্ছে। তাদের অবশ্য পাওয়া যাবে না, বর্ডার পার হয়ে গেছে এতক্ষণে। তোমার কী অবস্থা? সেদিন তো গুণ্ডাপাণ্ডা কিসিমের কিছু ছেলেপেলে আসছিল বাসায়। তোমারে পাইলে খুব পিটাইত...হা হা হা।'

'রাজনীতি নিয়ে আপনার খুব আগ্রহ, না?'

'না না, ওটা তো ভাই তোমার ডিপার্টমেন্ট।'

রিংকু বাদলকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির সামান্য খালি জায়গা কাজে

লাগিয়ে দ্রুত নেমে গেল। মুখে বিরক্তি। আর সে চলে যাওয়ার সাথে সাথে নিতু দেখে বাদলের মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। যেন এতক্ষণ একটা সাজানো ভঙ্গি মুখে সাইনবোর্ডের মতো টাঙানো ছিল। কেবল নিতুর সামনে তার আর প্রয়োজন নেই। ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে বলল, 'তোমার ভাইটা তো দেখি আস্ত একটা বেয়াদব!'

নিতু কিছু বলেনি। বাদলের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে যেটা জানতে চাওয়া জরুরি তা হলো বাদল এখন খাবে কি না। তাদের সবার রাতের খাওয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। নিতু বলল, 'আপনি কি ভাত খাবেন?'

'তুমি আবার আমাকে আপনি করে বলতেছ? রাস্তার মাঝখানে বাস একবার দাঁড়াইছিল, তখন আমি খাইছি। আর আমি এইখানে খাইতে আসি নাই। হ্যাঁ, খাইতে অবশ্য আমি আসছি, তোমাকে।'

'আচ্ছা, এ কথাগুলো আপনি এমন করে বলেন কেন?'

'কেন? ভালো লাগে না তোমার, না? শোনো, ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমের কথা বলা আমার স্বভাবে নাই। ওই সব ভালোবাসাটাসার আমি ধার ধারি না। আমি তো কবি-সাহিত্যিক না। আমি সাধারণ মানুষ। যেটা সত্যি সেটা বললাম, ব্যস। তোমার ভালো লাগতে পারে, না-ও লাগতে পারে। আমার করার কিছু নাই। এখন যাও দরজা বন্ধ করে আসো, ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস আসতেছে। এই উত্তরবঙ্গে এত শীত, মানুষ থাকে কেমন করে এখানে?'

নিতু দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বিছানায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো গোছাচ্ছিল। কেমন অস্বস্তি লাগে, তার একার, নিজস্ব আধিপত্য চর্চার ঘর যেন বেদখল হয়ে গেল। একটা অপ্রত্যাশিত সঙ্গী তার ঘরের প্রিয় জায়গাগুলোতে অনায়াসে ঘোরাফেরা করছে, মানা যায়? থেকে থেকে তার নড়াচড়ার শব্দে সে চমকে চমকে উঠছে। বইগুলো একটার ওপরে আরেকটা নিয়ে নিতু পড়ার টেবিলের দিকে গেল।

'আচ্ছা নিতু, বইগুলো বিছানায় কী করতেছিল?'

'দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে পড়ছিলাম।'

'আশ্চর্য! তাহলে চেয়ার-টেবিল আছে কী করতে? বিছানায় গড়াগড়ি করে পড়ে শয়তানেরা। পড়ার ইচ্ছা না থাকলে মানুষ ওইরকম শয়তান হইতে চায়।'

নিতু কোনো কথা বলেনি। তার এত দিনের অভ্যাস এই মানুষটা বদলাতে চাচ্ছে কেন? নিতুর মধ্যে একটাও ভালো স্বভাব সে খুঁজে পায় না। নিতু যা যা করে সবকিছুতেই তার আপত্তি। নিতুর বিশ্বাস করতেও কান্না পাচ্ছিল, এই লোকটার সঙ্গে সংসার করতে হবে। ভালোবাসা অবশ্য সে আশা করত না। এ রকম লোকের জন্য তার নিজের ভালোবাসা আসাটাও এক বিরল ব্যাপার হবে। ছোটবেলা থেকে নিতু দেখে আসছিল যে আপা সবকিছু নিয়ে বেশি চেঁচামেচি করে বলে মা তাকে সাবধান করে বলতেন, 'শোন, বোবার কোনো শত্রু নেই।' সেই মুহূর্তে বাদলের সাথে শত্রুভাব কমানোর জন্য নিতু মায়ের সেই বাণী পালন করছিল। তার ঘাড় জড়িয়ে ধরে বাদল বলল, 'কিছু বলো না কেন, নিতু, আমি ভালো মানুষ না, তাই না? তুমি কেমন মানুষ চাইছিলা?' নিতুর চোখে পানি চলে এলো। সে কেমন করে এ রকম একটা মানুষকে বোঝাবে যে কেমন মানুষ সে চেয়েছিল! নিতুর চোখের পানি খেয়াল করার সময় বাদলের ছিল না। নিতু টের পাচ্ছিল তার কামিজের নিচে বাদলের হাত ঢুকে যাচ্ছে।

ভোরে বাদল দৌড়ে এসে নিতুকে ঝাঁকিয়ে ডাকল। নিতু টের পেয়েছিল যে বাদল ঘুম থেকে উঠে বাইরে গেছে। সকালে হাঁটা নাকি তার অভ্যাস। রাতে ঘুমানোর আগে বলেছিল যে খুব ভোরে তাকে উঠতে হয়। না হলে তার ধারণা সে মারা যাবে। ভোরের পরে বিছানা নাকি কাঁটার মতো হয়ে যায়। কাঁটাগুলো সমানে তার পিঠে খোঁচা দিতে থাকে। আর তার সাথে থাকতে হলে নিতুকেও এই অভ্যাস করতে হবে। সকালে উঠতে হবে। আজ ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সে বলেছিল, 'নিতু, এটা তোমাদের বাড়ি। ঘুমায়ে থাকলে থাকতে পারো কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাওয়ার পরে এই সব চলবে না বলে দিলাম। বাড়ির বউ সূর্য ওঠার পরেও এ রকম পড়ে পড়ে ঘুমাবে, ইম্পসিবল!' রাতে বাদল ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও নিতু অনেকক্ষণ ধরে নখ দিয়ে খাটের পাশের দেয়ালের ওপর আঁচড় কাটছিল। দেয়ালের সাদা চামড়া ছোট ছোট টুকরো হয়ে মেঝের ওপরে চাক চাক পড়ে ছিল। আর ভোরে তখন নিতুর চোখ ভরা ঘুম। তা ছাড়া ঘন কুয়াশার ভেতরে মেঘে ঢাকা সূর্যকে টেক্কা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবু বাদলের ঝাঁকানিতে নিতুকে লাফিয়ে উঠতে হলো।

'কী হয়েছে?'

'নিতু, তোমার ভাই তো একটা ভয়ানক জিনিস!'

'কেন? কী করেছে সে?'

'তার ঘরে কে থাকে?'

'সে-ই থাকে, আর কে থাকবে?'

'মানে, কোনো মেহমান আসছে?'

'আরে বাবা, না।'

'তাহলে সে তার ঘরে কাউকে লুকায়ে রাখছে। তোমরা জানো না।'

'কী যে সব বলছেন সকাল সকাল!'

'আমি ঠিকই বলতেছি। বারান্দায় হাঁটতে গিয়া স্পষ্ট শুনলাম ভেতরে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। দরজায় টোকা দিলাম, আলাপ বন্ধ।'

'ভাইয়া হয়তো টিভিতে কোনো সিনেমা দেখছে।'

'এই ভোরবেলা কেউ সিনেমা দেখে? তাহলে আমি টোকা দেওয়ার পরেও দরজা খুলল না কেন?'

'হয়তো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর দরজার শব্দ শুনতে পায়নি।'

'বাদ দাও। শোনো নিতু, তোমার পরীক্ষা শেষ হইলেই আমি তোমাকে নিয়া যাব। এই বাড়ির অবস্থা ভালো না। বিয়ের দিন একপাল ছেলে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। বাসা থেকে জিনিস উঠায়ে নিয়ে গেল, শাসায়েও গেল। তখন না হয় সে বাড়ি ছিল না, কিন্তু এখন আবার কোন ঘোগের বাসা বানায়ে রাখছে ঘরের মধ্যে কখন যে কী হয়, তোমাদের কোনো ধারণাই নাই, বুঝলা? আমার তো এখনই চলে যাইতে ইচ্ছা করতেছে। ভাবছিলাম শনিবার নাইট কোচ ধরব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আজকেই চলে যাই।'

নিতু মনে মনে ভাবল ভালোই হয়েছে, শাপে বর হয়েছে। ভয় পেয়ে বাদল যদি আর না আসে, সেটাই ভালো। মনে মনে নিতু ভাইয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ। বাদলের দিকে তাকিয়ে দেখল বিছানায় পা ঝুলিয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছে। মুখে ভয়ের ছাপটা স্পষ্ট, কপালে সামান্য ঘাম। এমনিতে শীতের কথা ভেবে হয়তো দুদিন থাকার জন্য ব্যাগভর্তি শীতের কাপড় এনেছিল। নিতুর অত ঠাণ্ডা লাগত না, কিন্তু ঢাকা থেকে কেউ এখানে এলে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। বাদল এবার ভাইয়া আর শীত দুটোর ভয়ে ভেগে যাবে ভেবে তার আনন্দ হলো। আর এটা ভাবতেও মজা লাগল যে লোকটা এমনিতে সারাক্ষণ খুব হম্বিতম্বি করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব ভীতু। তবে বাদলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও নিতুর মাথায় ভাইয়ার ঘরের ব্যাপারটা ঘুরছিল। সত্যিই তো, এক মাস ধরে ভাইয়ার ঘরে তালা কেন? নিতুর মনে নতুন করে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল।

নাশতার টেবিলে বাবা কিংবা চাচার সাথে কথা বলার সময়ে বাদলকে দেখে মনেই হতো না যে সে নিতুর সাথে এমন চেঁচামেচি করে কথা বলতে পারে। তাদের সবার সামনে ভেজা বেড়াল হয়ে থাকত। বললেও কেউ বিশ্বাস করত না সে নিতুর সাথে কীভাবে

কথা বলে। কেউ মনে হয় তাকে বিয়ের রাতে বেড়াল মারার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিল, আর সে তা প্রয়োগ করেছিল নিতুর ওপরে। বাবা আর চাচাকে ভাইয়ার ঘরে ভোরের আলাপ-আলোচনার বিষয়টা বাদলের হয়তো বলার ইচ্ছে ছিল। খুব নিরীহ মুখ করে শুরু করেছিল, 'আমার আবার সকালে হাঁটার অভ্যাস। তো, আজ সকালে যেই বের হইছি বারান্দায়' ঠিক সেই সময়ে ভাইয়া রান্নাঘরে এলো আরেকটা রুটি নিতে। ভাইয়াকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে কথা বন্ধ হয়ে গেল বাদলের। 'বারা-ন্দা-য়' বলার পরে মুখ আর বন্ধ হয়নি, হাঁ হয়ে ছিল। চাচা বললেন, 'বারান্দায় ঠাণ্ডা লাগল?' সে জ্ঞান ফিরে আসার মতো তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বারান্দায় খুব কুয়াশা ছিল।' রিংকু একঝলক তার দিকে তাকিয়েও না দেখার ভান করে রুটি নিয়ে চলে গেল। রিংকু বাবার সাথে খেতে বসত না। তার তাকানোর বিষয়টা কেউ ধরতে না পারলেও বাদল ঠিকই ধরেছিল যে তাকে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া হয়ে গেল। বাদলের এত সাহস ছিল না যে তারপরও রিংকুকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে।

সেদিন দুপুরের পরে ঋতু এলো নিতুর বর দেখতে। ঋতুকে দেখেই বাদল অবাক হয়ে গেল, 'এইটা কী! এ তো দেখি একদম ফটোকপি!' বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেও ঋতু বাদলের মধ্যে এক চেহারা ছাড়া খারাপ লাগার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। মনে মনে খুশিই হলো নিতুর জন্য। আর যাওয়ার সময়ে নিতুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমি খুব টেনশনে ছিলাম। তোর বরকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। চেহারাটাই সব নয় নিতু, মানুষটা ভালো হলেই হলো। মন খারাপ করিস না।'

নিতু চুপচাপ ঋতুর কথা শুনল। ঠিক করল কাউকে আর কিছুই বলবে না। বলে কোনো লাভ নেই। বাদল খুব ভয় পেলেও একটা কিছুর টানে সে রাতেও থেকে গেল। সন্ধ্যা হতে না হতেই অবশ্য ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিল। শীতে সে নাকি জমে যাচ্ছিল। পরের দিন ভোরে বাদল হাঁটতেও বেরোল না। বিছানার হুল ফোটানো কাঁটা পরাজিত হলো। বাদলের কথা প্রলাপের মতো মনে হলেও ভাইয়ার বদলে যাওয়া অনেক আচরণের সাথে মিলিয়ে তার ঘরে কারও থাকার সম্ভাবনাটা নিতু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারল না। পরদিন সকালে বাদল চলে গেলেও নিতু কড়া নজর রাখছিল ভাইয়ার ঘরের দিকে। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই সে খামোখা বারান্দার ওই কোণে দাঁড়িয়ে থাকল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ভেতরে কোনো শব্দ হয় কি না। বই নিয়ে বারান্দার এমাথা-ওমাথা হাঁটলও খানিকক্ষণ। কিছুই ধরতে পারল না। নিতু অবশ্য সুযোগ পেলেই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। কয়েক দিন পরে এক দুপুরে ভাইয়ার ঘরের দরজায় নিতু প্রায় নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দরজার দুটো কপাট হাট হয়ে খুলে গেলে নিতু চমকে উঠল। আরেকটু হলে ভেতরের দিকে পড়ে যাচ্ছিল। হাতের বই ঝুপ করে মেঝেতে। নিতু ঝুঁকে ওঠায়ওনি। দুই কপাটে ভাইয়ার দুই হাত ব্যারিকেডের মতো দেখাল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সোজাসুজি সে তাকিয়ে ছিল নিতুর দিকে।

'অ্যাই, তুই এখানে কী খুঁজিস?'

'কিছু না, ভাইয়া।'

'শোন, যা খুঁজছিস সেটা নেই, চলে গেছে।'

'চলে গেছে মানে?'

'চলে গেছে মানে চলে গেছে। অভি আর নিরু ভাইকে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ঘরে, প্রায় দেড় মাস। নাম শুনিসনি? ডক্টর মিলনের নাম শুনেছিস তো? তোর বর টিকটিকির মতো লেগে গেল পেছনে, বুঝলি? শীতের ভেতর মধ্যরাতেও শালা আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। এরপর আর রিস্ক নেওয়া যায়? শালা যদি পুলিশে খবর দিত! নিজেকে শালা ম্যাকগাইভার মনে করছিল। তার-টার কিছু একটা দিয়ে আমার দরজার লকটা খোলার চেষ্টা করল কয়েকবার। দুই রাত খুব ঝামেলা করল শালা টিকটিকি। তাই ওদের জন্য আবার নতুন জায়গা খুঁজে বের করতে হলো, বুঝলি? আর তুই এখন বায়োনিক ওম্যানের মতো আমার ঘরের দরজায় কান লাগিয়ে কী শোনার চেষ্টা করছিলি? কোনো লাভ নেই আর।'

নিতু কোনো জবাব না দিয়ে হাঁ করে শুধু শুনল। সারা বাংলাদেশের পুলিশ যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ডক্টর মিলনের খুনের জন্য, সেই অভি আর নিরু তাদের বাসায় নিতুর ঘরের মাত্র কয়েক ফুট দূরে আরাম করে দেড় মাস কাটিয়ে গেল! হিমশীতল মেঘলা দুপুরেও নিতুর গলার কাছে ঘাম জমে গেল। বাবা জানলে কী হতো? আর পুলিশ জানলে? বাদলের কথাটা কানে বাজল নিতুর, তোমার ভাইয়া তো ভয়ানক জিনিস! বাদল কি পুলিশ পাঠাবে তাদের বাসায়? কে জানে! সে ভেবেছিল বাদল সন্দেহপ্রবণ আর কথায় কথায় জেরা করা বাদলের অভ্যাস, তাই এসব আবোলতাবোল বকছে। কিন্তু তখন রিংকু বলাতে তার মুখ সাদা হয়ে গেল। এত কিছু বলার পরেও দরজার সামনে তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রিংকু মুখের সামনে তুড়ি মেরে বলল, 'কী রে, কী হলো? স্ট্যাচু অব লিবার্টি হয়ে গেলি নাকি?'

নিতু কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে ফেরত এলো। শীতে আর ভয়েও।

১০

নিতু যা ভেবেছিল তাই, বাদল আর আসেনি তার পরীক্ষার আগে। ফোন করেছিল অনেকবার, বারবার দিনের হিসাব শোনাত নিতুকে। ঠিক কত দিন পরে, কোন সময় সে এসে নিতুকে নিয়ে চলে যাবে, এ কথাটা যে সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কতবার বলত তার সীমা নেই। নিতু চুপচাপ শুনত। মনে মনে ভাবত, কয়েক দিনের ভেতরে এই শহরে কি সারা দেশে একটা কোনো লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে যেতে পারে না যাতে তার যাওয়া পিছিয়ে যায়? এই তো কদিন আগেই শুনেছিল একটা উল্কাপিণ্ড নাকি গ্রহাণুপুঞ্জ ধেয়ে আসছে। এসে সোজা পড়বে পৃথিবীর ওপরে আর তারপরে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পৃথিবীটা, আলাদা করে চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো কিছুর। তাই না-হয় হোক! সবাই মরল, নিতুও মরল, সেটাই ভালো। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও তেমন কিছু ঘটেনি। সারা দিন মাথা গুঁজে পড়াশোনা করার পর বিকেলের দিকে মাথা ঠাণ্ডা করতে নিতু ছাদে যেত। বেশির ভাগ দিনেই সূর্য মেঘের আড়ালে, দিনের বেলায়ও ঘন কুয়াশায় চারদিক থমথমে হয়ে থাকত। আকাশের দিকে কয়েক ফুট পরে আর কিছুই নজরে আসত না। কেবল রহস্যময় ধূসরতা, দেখলে মনে হতো একটা ভারী কোনো ঢাকনা দিয়ে নিতুদের বাড়ির চারদিকটা ঢাকা। কল্পনা করতে ভালো লাগত এই ঢাকনার বাইরে কিছু আছে, দূরে। কিন্তু কোথায় বা কী তত দূর নিতুর কল্পনা পৌঁছাত না। ধূসর আকাশ দেখলে তার কেবলই মনে হতো একটা আস্ত আকাশের রহস্য তখন তার জীবনে। সামনে কী আছে তার কপালে, সে কিছুই জানত না।

নিতুর মা বেশ কয়েকবার রিংকুকে বলেছিল, 'রিংকু, একবার বাদলদের বাড়ি গিয়ে দেখে আয় না কেমন বাড়িঘর—'

'কেন?'

'বাহ্, তোর বোন দুদিন পরে সেখানে যাবে, তুই আগে থেকে দেখে আসবি না একটু?'

'তা, তোমরা কিছুই না দেখেশুনে ওর বিয়ে দিলে কোন দুঃখে? ও কি ঋতুর মতো পালিয়ে যাচ্ছিল?'

'না, তা তো যায়নি। তোর বাবা বলল ভালো পাত্র পেয়েছে। তুই তো তোর বাবাকে চিনিস। তার ওপরে কোনো কথা বলা যায়?'

'তাহলে তো হয়েছেই, এখন আমি গিয়ে দেখে এসে কী করব?'

'আশ্চর্য, তুই ওর বড় ভাই, ওকে নিয়ে তোর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই?'

'আমি ওই টিকটিকির বাড়িতে যেতে পারব না।'

‘টিকটিকি মানে?’

‘সে তুমি বুঝবে না, মা।’

নিতুর মা কিছুই বুঝতে পারেননি, বোনের নতুন বরকে একজন টিকটিকির মতো ছাদে হামাগুড়ি দেওয়া একটা প্রাণী মনে করছে কেন। বহুক্ষণ ভেবেও ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়নি। তিনি যেমন কখনোই রিংকুর মতিগতি বোঝেন না, তেমনি এ কথাকেও দুর্বোধ্য একটা কিছু বলে ভাবতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। কী আর করা, নিতু নিজে গিয়েই তার শ্বশুরবাড়ির সব অবস্থা জানবে। তার আগে জানার কোনো উপায় নেই। তবু তিনি এটা জেনে খুশি যে নিতু চলে যাওয়ার আগে তার বাবা আর চাচা মিলে যে বিদায় অনুষ্ঠান করবে, সেখানে বাদল তার মাকে নিয়ে আসবে। সুতরাং অন্তত নিতুর শাশুড়িকে দেখলেও মায়ের মনটা কিছুটা শান্ত হবে। একটা আন্দাজ তো করতে পারবেন যে নিতু কোথায়, কেমন পরিবেশে, কার কাছে থাকবে।

অনুষ্ঠানের আগের দিন যথারীতি উঠোনে আর ছাদে শামিয়ানা টাঙানো হলো। বাসার ছাদ থেকে তার ফেলে ঝুলানো হলো লাল-নীল ছোট ছোট বাতি। উঠোনের মাঝখানে একটা বাঁশ থেকে দড়ি চলে গেছে চারদিকে। দড়িতে নানান রঙের কাগজের ত্রিভুজ বাতাসে পতপত করে উড়ছিল। নিতুর বাবার আপত্তি সত্ত্বেও চাচা অনুষ্ঠানের প্রায় পুরো খরচ জোর করে ধরিয়ে দিলেন। বারবার বলতে লাগলেন, ‘আমার একটা মেয়ে থাকলে কি আমি করতাম না, ভাইজান? আর নিতু তো আমারই মেয়ে।’এসব কথা শোনার পরে নিতুর বাবা আর আপত্তি করলেন না। উঠোনের একধারে তিনদিকে দুটো করে ইট রেখে চুলা বানানো হলো। ভোরবেলা থেকে সেই চুলায় বাবুর্চিরা বড় বড় হাঁড়ি চড়িয়ে রান্না শুরু করে দিল। নিতু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে বাড়িতে বসে বসে দুঃস্বপ্নের প্রহর গুনছিল। বারান্দায় এসে দেখল ধোঁয়ায় পুরো উঠোন ভরা, কিছুই দেখা যায় না। ধোঁয়া আর কুয়াশায় মাখামাখি উঠোনের দিকে নিতু জলভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। কাঠ দিয়ে চুলায় আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু আগুন কিছুতেই জ্বলছিল না, জ্বলতে জ্বলতে বারবার নিভেও যাচ্ছিল। এই অপচেষ্টায় কেবল ছাইরঙা ধোঁয়ায় নিতুদের উঠোন ভরে গেল। চ্যালা কাঠগুলো কুয়াশায় ভিজে জবজবে হয়ে ছিল। চাচা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কার সাথে যেন খুব চিৎকার করছিল। বিষয়, চ্যালা কাঠগুলো কাল কিনে এনে উঠোনে এভাবে খোলা ফেলে রাখা হয়েছে কেন। এদিক-ওদিক ঘি আর মসলার

গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ধোঁয়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে তামাশা দেখতে লেগে গেছে। কেউ কেউ আবার মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে নিতুকেও দেখে যাচ্ছিল। বিয়ের সাথে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে তা তারা তত দিনে জেনে গেছে। তাই নিতুর মন খারাপ করে থাকা তাদের কাছে স্বাভাবিক। চাচি পেছন থেকে এসে নিতুকে জড়িয়ে ধরল। মুখ না দেখেই চাচি বুঝে গেছে সে একটু সান্ত্বনা চায়। চাচি বলল, 'নিতু দেখো, এবারে আয়োজন করে তোমার বিয়ে হচ্ছে, রান্না হচ্ছে। দেখো ডেকোরেটরের লোকজন ছাদের ওপরে চেয়ার সাজাবে একটু পরে। মানুষজন আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে। আর মন খারাপ করে থেকো না। কাল তো আমাদের ছেড়ে চলেই যাবে, আজকের দিনটা অন্তত হাসিখুশি থাকো।'

নিতু চাচির কথার কোনো জবাব দেয়নি। তার আরও বেশি কান্না পেল। চোখ মুছে চাচির শরীর জড়িয়ে নিচে উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকল। পেছন থেকে ঋতুও এসে তাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তিনজন মিলে এক চোট কাঁদল তারা। নিতুর কাছে মনে হলো, এসব অর্থহীন, সবকিছু সাজানো, তখন বিয়ে এখন আবার এই অনুষ্ঠান, সবকিছ শুধু নিতুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যদিও সে কারও কোনো ক্ষতি করেনি। বাসার কাউকে আর আপন মনে হতো না তখন। অথচ তাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবলেই এক জনম কেঁদে কাটাতে ইচ্ছে হতো। যে বাবার ওপরে এত রাগ, তাকে ফেলে চলে যেতে হবে বলেও খারাপ লাগছিল। চাচা কোত্থেকে এসে বলল, 'আরে, তোমরা কী শুরু করলে, একটু পরেই তো বাদল তার মাকে নিয়ে চলে আসবে, নিতুকে তৈরি করো।' ওপর থেকেই দেখা যাচ্ছিল ব্যস্ততার মাঝে আজ অনেক দিন পরে নিতুর বাবা বিভিন্ন কাজের জন্য রিংকুকে ডাকছেন, রিংকুও দৌড়ে দৌড়ে আসছে, কাজকর্ম তদারকি করছে। কত দিন পরে বাবা ভাইয়ার সাথে কথা বলল, নিতু মনে করতে পারছিল না। এটা একটা আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু সেটা দেখেও নিতুর কেবলই কান্না পাচ্ছিল।

নিতুর চাচিদের দিকে একটা ঘর গোছগাছ করা হয়েছে বাদলের মায়ের জন্য। আসার পরে তাকে প্রথমে অবশ্য নিতুদের দিকেই বসানো হলো। দেখলে মনে হচ্ছিল সারাক্ষণ তিনি নাক সিটকে বসে আছেন। নিতুকে দেখে একঝলক খুশি দেখা গেল, তবে একটু পরে তা আবার মিলিয়ে গেল। মনে হলো টেনশনে পড়লেন। ছেলের বউ এত সুন্দর হয়েছে, এটা ঠিক ভালো হলো কি না, তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। বেশি সুন্দরীরা আবার কোনো কাজের হয় না, সারাটা দিন ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসেই তাদের সময় কাটে। নিতু লক্ষ করল ঘরে যখন নিতু ছাড়া কেউ নেই, তখন তিনি বাদলকে বলছেন, 'তুই তো কইছিলি এর ভাইবোন সব পলাইয়া গেছে। এখন আবার আইল কেমনে? খালি চেহারা দেইখা বিয়া করলি? ভাই তখন কইল শহরের ওপরে দোতলা বাড়ি, এখন তো দেখি একদম ভাঙাচোরা।' নিতুর উপস্থিতি তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। এমনিতে কথা বলেননি দেখে সবাই ভাবছিল তিনি ক্লান্ত। শুধু নিতুর কাছেই ধরা পড়ল যে বাবা তার হাত-পা বেঁধে তাকে কোনো গর্তে ফেলে দিয়েছেন। সিনেমার ডায়লগের মতো বলতে ইচ্ছে করল, বাবা, তার চেয়ে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেননি কেন?

রাতে যখন অতিথিদের খাওয়ানো হচ্ছিল, ঋতু একটা মনমরা ভাব নিয়ে এসে নিতুর পাশে বসল, 'নিচে দেখলাম তপুর বাবা-মা এসেছে। চাচা দাওয়াত দিয়েছেন হয়তো।'

নিতু চমকে ঋতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তপু ভাই এসেছে?' বলার সময়ে সে জানে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ঋতু ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহ্।'

'আপা, তুমি আশা করেছিলে যে তপু ভাই আসবে?'

'আমি তো জানিই না যে ওদের বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।'

'তোমার কি তপু ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, আপা?'

'না।'

ছোট্ট 'না', জবাবটা দিতে ঋতু বেশ সময় নিল। যেন একটু ভেবে বলতে হলো তাকে। বলার পরেও অজানা একটা ভাবনাকে অনুসরণ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। আর নিতু কৌতূহলী চোখ ঋতুর মুখের ওপরে স্থির করে রাখল। নিস্তব্ধতা ছাড়া সেখানে কিছু পেল না অবশ্য। নিতু আবার বলা শুরু করল, 'আপা, তপু ভাই তোমাকে অনেকবার খুঁজতে এসেছিল। তুমি বলতে মানা করতে, তাই বলিনি। শেষ এসেছিল যেদিন তুমি চলে গেলে।'

'জানি।'

'কী করে জানো?'

'তপু আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল।'

'কোথায়?'

'ঢাকায়, রতনের মামার বাসার ঠিকানায়। আমি জানি না, যে ঠিকানা আমরা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলাম সেটা তপু কী করে বের করে ফেলল। চিঠিতে লিখেছিল, সে তখনো আমার অপেক্ষায় আছে। আমি চলে যাওয়ার দিনে এসেছিল তারপর চাচাকে নিয়ে আমাকে খুঁজে বেরিয়েছে, মা অসুস্থ, এসবও লিখেছিল।'

'তুমি উত্তর দাওনি?'

'না, সেই চিঠির কোনো উত্তর হয়, পাগলি? আমি তো রতনকে বিয়ে করেছি তত দিনে। রতন আমাকে ভালোবাসে, আর কতজনকে ঠকাব বল! তবে তার চিঠি পেয়েই আমি এখানে ফোন করে চাচির সাথে কথা বলেছিলাম। মায়ের অসুস্থতার কথা জেনে খুব খারাপ লাগছিল।'

'তুমি সুখে আছ, আপা?'

'হ্যাঁ। তুইও সুখী হবি, দেখিস।'

আপার মুখে 'সুখী হবি, দেখিস' শুনে নিতুর সামনে বাদল আর তার মায়ের মুখ ভেসে উঠল। ভেতরে-ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস দানা বাঁধলেও আপার সামনে তা গোপন করল। নিতুর শাশুড়ি এমনিতে কোনো কিছুতেই খুশি না। মুখ দেখলে মনে হচ্ছিল তার কেবলই বিরক্ত লাগছে। বাবুর্চিদের রান্না ভালো হয়নি বলেও বেশ কয়েকবার মন্তব্য করা হয়ে গেছে।

'এই তরকারি তোমরা খাও কেমনে, খালি ঝোল, তরকারিতে এত পানি দেওনের দরকারটা কী পড়ল? মনে হয় যেন সাঁতরাইয়া খাইতে হইব।'

'এখানকার তরকারি আসলে এমনই।'

'সেইটাই তো কই, আজব রুচি এইখানকার মাইনষের।'

'আপনার কষ্ট হচ্ছে, মাকে বলব ভুনা করে রাঁধতে।'

'কইও। আমার তো শরীরটা ভালো ঠেকে না, আইজ-কাইলের মধ্যে বাসে ওঠা সম্ভব না। দুই-তিন দিন পরে যাব।'

'জি, আমি বলে দেব।'

মাথা নিচু করে সায় দিলেও নিতুর অদ্ভুত লাগছিল। এরা তাড়াতাড়ি বাসা থেকে চলে গেলেই সে বাঁচে। তাতে করে তাকেও চলে যেতে হবে, সে জানত। কিন্তু এখন যতবার তার শাশুড়ির ব্যবহারে মা অথবা চাচি বিব্রত হচ্ছেন, ততবার সে নিজেই যেন লজ্জিত। যদিও এতে তার কোনো হাত নেই; বরং আরও বেশি করে গলা ফাটিয়ে বলতে পারত যে দেখো, তোমরা আমাকে কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু তেমন কিছু করতে ইচ্ছে হয়নি; বরং খানিকটা অস্বস্তি লাগছিল। রাতে বাদল ঘরে আসার আগে শাশুড়ি নিতুকে বলল, 'তোমার চাচার তো কোনো পোলাপাইন নাই। তাইলে বাড়িঘর তো মনে হয় তোমরাই পাইবা, নাকি?'

'আমরা একসাথেই থাকি।'

'এখন তো একসাথেই রইছ। আমি কইতেছি, চাচার মরণের পরে

তোমরা ছাড়া আর তো কেউ নাই সম্পত্তি দাবি করার।'

'না, তা তো নেই।'

'তোমাদের ভেতরে মাইয়ারা সম্পত্তি পায়-টায় তো? নাকি আবার তোমার ওই মস্তান ভাইটাই সব নিয়া নেবে?'

'আমি আসলে এসবের কিছু জানি না।'

'জানো না মানে? জানতে হইব। স্বামী মারা যাওয়ার পরে এত বছর বাপের বাড়িতে সব সম্পত্তি আমি আগলাইয়া বইসা আছি না? না হইলে বাদলারে পড়ালেখা করাইতে পারতাম?'

চুপ থাকা ছাড়া নিতুর কিছু করার ছিল না। কারণ এই সব জটিল বিষয়ে সে কিছু জানত না। এখন এসবের উত্তর কী দেবে। তিনি হয়তো অনেক ঠেকে শিখেছেন। রাতারাতি নিতুর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাই চুপ করে থাকাই নিতুর কাছে সহজ মনে হলো। তবু অবাক লাগল, এ বাড়িতে যে তিনি অতিথি তা মনেই হয় না। যেন কত দিনের পরিচিত, অনায়াসে সোজাসুজি বৈষয়িক ব্যাপারে নাক গলাতে পারেন। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বাদলের মায়ের ব্যবহারে তার লজ্জা পাওয়ার কী আছে! অথচ তার লজ্জা লাগছিল।

বাদল এসে বলল, 'প্রেশারের ওষুধ খাইছ মা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কোনো সমস্যা নাই তো? কিছু লাগবে?'

'কিছু লাগবে না।'

'চলো, তাইলে তোমারে ঘরে দিয়া আসি।'

তারা চলে গেলে নিতু সহজ হয়ে বসল। সেই প্রথম তাদের দুজনের মধ্যে একটা ভালো কিছু তার চোখে পড়ল। নিতু নিজেকে বলছিল, হতে পারে সে তাদের কেবল খারাপ চোখেই দেখে, তাদের সবকিছুই নিতুর কাছে খারাপ লাগে। এই তো পাওয়া গেল ভালো একটা ব্যাপার, বাদল তার মায়ের ব্যাপারে খুব সচেতন। এমন করে কথা বলছিল, যেন যে বাদলকে চেনে সে নয়, চোখ-মুখ আদুরে হয়ে গেল। বরাবর নিতুর কাছে যে হম্বিতম্বি করে আসছিল, মায়ের সাথে কথা বলতে গেলে তেমন না। বেশ মিষ্টি গলাও তাহলে বাদলের ছিল। বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছেন বলে সেই রাগ বাদল বা তার পরিবারের ওপরে ঝাড়া হয়তো ঠিক হবে না। নিতু তাদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে লাগল।

সারা দিন লোকজন নিতুর ঘরে এসে তাকে দেখে গিয়েছে, শুভকামনা জানিয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়ে শাশুড়ি পাশে বসে ছিলেন। নিতুর সৌভাগ্য যে কারও সামনে তিনি তেমন মুখ খোলেননি। নিতুর অভিজ্ঞতায় বাদল ছাড়া আর কারও জন্য তার তেমন কোনো হাসিমুখ বা মিষ্টি ভাষা নেই।

তিন দিন পরে শেষ পর্যন্ত সেই সময় এলো যে নিতু সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। ঋতু আগের দিন এসে সব গোছগাছ করে দিয়েছিল। নিতুর তেমন কোনো কাজ ছিল না মন খারাপ করে বসে থাকা ছাড়া। দুপুরে মনে হলো এত বেশি কান্না পাচ্ছে; বরং একটু ছাদে যাওয়া যাক। ছাদে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেখানকার অনেক ঘটনা ছবির মতো চোখের সামনে আসছিল। সিঁড়িঘরের যেদিকে ছায়া পড়ে, সেখানে দাদি বেঁচে থাকতে তাদের পিকনিক হতো। দাদি, ঋতু আর নিতু। রিংকু শুধু খাওয়ার সময়ে দৌড়ে আসত। পুরনো লোহার কড়াইয়ের ওপরে দাদির হাতে বানানো মাটির চুলায় রান্না হতো শুধু তাদের তিনজনের জন্য। কড়াইয়ের কান দুটো ধরে বাতাসের গতিবিধি অনুযায়ী চুলাকে এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে যাওয়া যেত। ঋতু আর নিতু অসীম উৎসাহে মায়ের রান্নাঘর থেকে চ্যালা কাঠ টেনে ছাদে আনত। পানি, ডাল-চাল যা লাগে বয়ে বয়ে এই ছাদের ওপরে আনতে হতো। দাদির হাতের সেই খিচুড়ির স্বাদ এখনো নিতুর মুখে লেগে আছে। যেদিন খিচুড়ি রান্না হবে, সেদিন আগেই নিতুর মাকে দাদি বলে দিত, 'আইজ কিন্তু আমাদের তিনজনার রান্না করার দরকার নাই বউ, আইজ আমরা জুদা হইলাম।' তারপর ছাদের ওপরে পিকনিক। যতক্ষণ চুলায় আগুন, তাদের দুই বোনের উৎসুক দুই জোড়া চোখ হাঁড়ির হলুদ বুদবুদের ওপরে স্থির। আর দাদির হাতে বাঁশের চোঙা, থেকে থেকে চুলার আগুনে ফুঁ দিতে ব্যস্ত। মুখ সরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে লালচে চোখের পানি মুছে মুচকি হাসত দাদি। নিতুর কাছে সে হাসির অর্থ ছিল, এই তো হয়ে গেল, আর একটু! দাদি যখন ঘোষণা দিত, 'যাও এইবার থালা নিয়াইসো,' সিঁড়িতে দুই বোনের হুড়োহুড়ি লেগে যেত। তারপর ছাদের ওপরে বসে খাওয়া। খাওয়ার সময়ে দাদি তার জীবনের কোনো গল্প বলত। বিয়ের পরে প্রথম প্রথম রান্না করতে কেমন কষ্ট হতো, শাশুড়ি রান্না খেয়ে কী বলত, কোন দিন কী পুড়ে ছাই হলো, বাসায় কেউ খেতে পারল না- নানান সাফলতা আর লজ্জার কাহিনি। সেসব কথা বলার সময়ে তার মুখটা হয়ে যেত একবারে লাজুক কিশোরীর মতো। সব গল্পের শেষে একটু হেসে বলত, 'আল্লাহ্ যা করে ভালোর জন্যই করে, বুঝলেন আপুরা?' ছোট্ট হাত দিয়ে উত্তপ্ত খিচুড়ি লোকমা বানিয়ে মুখে পুরতে পুরতে নিতু দাদির মুখের লালচে মেঘ দেখত। চুলার তাপে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠা কোঁচকানো চামড়া দেখতে টানটান লাগত। দাদির গল্প, খিলখিল হাসি আর দীর্ঘশ্বাস ওই ছাদে তখনো ভাসছিল। নিতু যেন সামান্য লাফিয়ে লাফিয়ে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারবে তাদের।

কখনো আবার আপা চিৎকার করে নিতুকে ডাকছে। অথচ ধেয়ে আসা শব্দতরঙ্গ নিতুর কানেই যাচ্ছে না। কোন চিন্তায় ডুবে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আপা এসে হয়তো বেণি ধরে টেনে বলছে, 'কী রে, ডাকছি কখন থেকে, কথা কানে যায় না?' আপার পেছনে ছুটছে তাকে ধরার জন্য সারা ছাদময়। নিচের বারান্দায় শেভিং ফোম লাগানো মুখ বাড়িয়ে ভাইয়া বলছে, 'তোরা কী শুরু করলি, ছাদ মনে হচ্ছে ভেঙে পড়বে।' কোনো দিন মরিচের গুঁড়ো আর লবণ বাটিতে নিয়ে ঋতু এসে বলত, আয় পেয়ারা খাই। সেদিন নিতুর মুখে পেয়ারার স্বাদ বেড়ে যেত। বলত, 'সত্যি আপা, নিচে গিয়ে সেই রান্নাঘর থেকে এসব আনতে ইচ্ছে করে না, এমনিতেই খাই কিন্তু মরিচ দিয়ে ভীষণ মজা লাগছে।' ঋতু রাগ দেখিয়ে বলত, 'অলস কোথাকার, নিচে গিয়ে লবণ-মরিচ এনে খাবি, তা-ও পারিস না!' ভাইয়া ছোটবেলায় সিঁড়িঘরের ছায়ায় বসে তারে টাঙানো ঘুড়ির সুতোর মধ্যে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে কী যেন সব লাগাত। নিতু হাত দিতে গেলেই ধমকে উঠত। সেই ধমকটা তখন কানে বাজল। আবার একটু পরে নিতুর ছোট হাত সামনে বেড়ে গেলেই চোখ পাকিয়ে বলত, 'অ্যাই, আবার? কাচের গুঁড়ো আছে, হাত দিবি না, বলেছি না?' একবার পাড়ারই একটা কাঠের ফার্নিচারের ছোট ফ্যাক্টরিতে গিয়ে নিতু হাতে করে সেখানে পড়ে থাকা লম্বা একটা কাগজ এনেছিল। শক্ত কাগজটা বাদামি রঙের, ওপরে বালু আর আঠার মতো কিছু লাগানো, ঘষা দিলেই যেন চামড়া উঠে যাবে। কেন যেন সেটা দেখে মনে হয়েছিল ভাইয়ার ভালো লাগবে। বাড়ি ফিরে ভাইয়াকে দেওয়ার জন্য খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখল ছাদে বসে সে ঘুড়ির সুতোয় মালিশ করছে। নিতুর হাতে সেই কাগজটা দেখে ভাইয়ার সে কী খুশি! হাত বাড়িয়ে নেওয়ার সময় চোখ গোল গোল করে বলেছিল, 'শিরিষ কাগজ! কোথায় পেলি, নিতু?' তারপর নিতুর ওপরে খুশি হয়ে তাকে সুতোয় মালিশ করার আঁঠালো জিনিসটা একটু ছুঁতে দিয়েছিল। নিতু ধরে দেখেছিল কেমন শক্ত শক্ত আঠা, দানাগুলো আঙুল থেকে ছাড়ছেই না। একটুও মজা লাগেনি, হতাশ হয়েছিল সে। বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'আঙুল থেকে ছাড়ছে না কেন?' ভাইয়া হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ছাড়বে কেন, বেলের আঠা দিয়েছি না?'

আবার হয়তো রোদের মধ্যে খুব জোরে বৃষ্টি এসে গেল; নিচের উঠোন থেকে চিৎকার করে চাচি বলল, 'নিতু, ছাদে আমার শাড়ি, ইশ্ ভিজে গেল, দৌড়ে যাও তো---' নিতু দোতলা থেকে বড় বড় লাফ মেরে, একবারে তিনটা-চারটা সিঁড়ি ভেঙে এসে দেখল পাশাপাশি দুটো তারে 'এম' অক্ষরের মতো করে মেলে রাখা চাচির কড়কড়ে শুকনো শাড়িতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ে বল

প্রিন্টের মতো হয়ে গেছে। শাড়ির গায়ে বলগুলো বড় হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তার থেকে শাড়ি ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে ঝোড়ো বাতাসে নিতুর সারা শরীরে শাড়ি পেঁচিয়ে গেল। বাতাসের ঝাপটায় চোখও খোলা গেল না। দ্রুত শাড়ির প্যাঁচ খুলতে গিয়ে চাচির গলা আবার শুনতে পেল, 'নিতু, শাড়ি এনেছ?' 'আসছি' বলে চিৎকার করে নিতু শাড়ির এলোমেলো প্যাঁচসহই বাড়ন্ত বৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সিঁড়িঘরের দিকে দৌড়াল।

হাজার হাজার মুহূর্তকে একটিমাত্র ফ্রেমে বেঁধে রাখলে দেখতে যেমন হবে নিতুর সামনে তখন সেই ফ্রেমটাই ঝুলছিল। এই ফ্রেমটা খুব গোপনে সেখান থেকে সে সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে অদৃশ্য জিনিস। কেউ জানবে না। সে না চাইলেও তার সাথে এটা চলে যাবে। হয়তো কখনো অব্যবহারে ওপরে ধুলো জমে যাবে, তাতে কী! সে যখন খুশি বের করে মুছে নিয়ে দেখবে। ছবিগুলো তার সাথে কথা বলবে, হাসবে, কাঁদবে। এই যেমন তার একটু আগে বলছিল। একটি ছবিও তো স্থিরচিত্র নয়, হাজার ছবির মধ্যে যখন যেটাকে খুশি সেটাকেই করা যায় গতিময়। মন ভরে দেখা হয়ে গেলে আবার সযতনে গোপন করে ফেলবে। তার এই সতেরো বছরের জীবনে এ ছাড়া তো আর কিছুই ছিল না, যাকে সে নিজস্ব সম্পদ বলতে পারত।

আমলকী আর পেয়ারাগাছে একটি পাতাও অবশিষ্ট নেই তখন। কেবল ভৌতিক হাত-পায়ের মতো ডালপালাগুলো চারদিকে প্রবহমান। খটখটে শুকনো ছাদের কোথাও গালিচার মতো শ্যাওলা নেই। এদিক-ওদিক ছাদ ফুঁড়ে যে আগাছাগুলো বেরিয়েছিল তা-ও অতিথিদের খাওয়ানোর দিন শামিয়ানা টাঙানোর আগে বেশ ভালো করে শিকড়সহ সাফ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও তখনো ঝাড়ুর কাঠির অর্ধবৃত্তাকার দাগ দেখা যাচ্ছিল। দাগে দাগে কাটাকাটি হয়ে ছিল জায়গায় জায়গায়। নিতুর চোখের পানি ছাদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ তার খটখটে শরীরে শুষে নিল। যেই ছাদ নিতুকে অসংখ্য সুন্দর মুহূর্ত দিয়েছিল তাকে দেওয়ার মতো নিতুর কাছে এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মানুষ আসে, মানুষ চলেও যায়, এ রকম শুকনো ছাদ পড়ে থাকে। হয়তো কোথাও একটু ক্ষয়ে যায়, তবু বয়সের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি নিয়ে। শুধু নিতুর কেন, তার মা, দাদি, আপা কিংবা ভাইয়া সবারই কি অগুনতি প্রিয় মুহূর্ত ওই ছাদের ওপরের বাতাসে খেলছিল না?

কালবৈশাখী ঝড় দু-এক দিন খুব তোড়জোড় করে এসেছিল। মনে হলো বাইরে যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। অনেক তর্জন-গর্জন চলল, কিন্তু বৃষ্টি আসেনি। শুধু ধুলায় সবকিছু ঢেকে যাওয়াতে চারদিক আরও মলিন, আর বিষণ্ন হয়ে গেল। যখন-তখন হু হু বাতাস এসে ধুলোকে উসকে দিচ্ছিল। ধুলাগুলো ভয়হীন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদেরও যেন নিতুর মতো দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে কোনো দিকে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ধুলো একা একা তো কোথাও যেতে পারে না, উঠতে পারে না, বসতে পারে না, বাতাস তাকে ভাসায় আর নামায়। নিতুকে সাহায্য করার মতো কোনো হাওয়া নেই, যা তাকে পলকা করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আর কোনো দিন বাস্তব জীবনের কঠিন বেড়াজালে বাঁধা পড়তে দেবে না। রাস্তার পাশে একগাদা ধুলো ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণিঝড়ের মতো একটা কেন্দ্র বেছে নিয়ে দশ-বারো ফুট ওপরে উঠে গেল। ধুলার সেই ঘূর্ণির দিকে নিতু একভাবে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ঘূর্ণি একটু সরে গেলেই রাস্তায় একটা মোটরবাইক দেখা গেল। বাইকে বসে তপু। প্রথমে ধুলোর ঝড়ের পেছনে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া রাস্তায় মনে হলো আবছা কল্পনা। ধীরে ধীরে ঘূর্ণি দুর্বল হয়ে তপু ভাই স্পষ্ট হলো। নিতুর জীবনে এর মধ্যে কত কিছু বদলে গেল, তবু কয়েক মাসের সব স্মৃতি এক পলকে হাওয়া হয়ে গেল তার। যেন উড়ে উড়ে বসা চিকন ধুলোর স্তরের ওপরে উত্তেজনার প্রলেপ সমস্ত বিবেচনা শক্তি আড়াল করে দিল। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি, বারান্দা আর উঠোন পেরিয়ে গেটের কাছে যেতে তার একটুও সময় লাগল না। সে আসলে জানেই না কী করে ছাদ থেকে গেট পর্যন্ত চলে এলো। আর দিনটাকে মনে হচ্ছিল যেন তপু ভাইয়ের সাথে সেই পদ্মদীঘিতে যাওয়ার পরের দিনমাত্র! মাঝখানে কিছু নেই, কোনো দুর্ঘটনার কোনো অস্তিত্ব নেই। গেট খুলে হাঁফাতে হাঁফাতে নিতু বলল, 'তপু ভাই, তুমি!'

'কেমন আছ? অনেক দিন পরে তোমাকে দেখলাম, নিতু।'

নিতুর মনে পড়ল, হ্যাঁ, অনেক দিন।

'এত দিন পরে এলে তপু ভাই! এত দিন আসোনি কেন?'

'আমি তো এখানে ছিলাম না। তোমরা সব ভালো?'

'আপা ফিরে এসেছে।'

'তাই? আমি কিন্তু ঋতুর খোঁজে আসিনি, নিতু। আমি এখন তাকে আর খুঁজি না। তোমাকে বলেছিলাম না, আমেরিকা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, সে জন্য এত দিন ঢাকায় ছিলাম। টোফেল কোচিং করতে হলো, পরীক্ষা দিলাম তারপর ভর্তি, ভিসা--- সেসব অনেক ঝামেলার ব্যাপার। তবে সব শেষ। এই তো, কাল রাতে এলাম বাসায়। এর মাঝে অবশ্য এক-দুই দিনের জন্য এসেছিলাম একবার। আবার চলে গিয়েছি। যা-ই হোক, সাত দিন পরে আমার ফ্লাইট। সবার সাথে দেখা করা দরকার। আজ তোমাকে দেখতে এলাম। ভাবলাম, দেখি তুমি সেই পদ্মদীঘির পাড়ে যেতে চাও কি না। শীতের পাখি দু-একটা এখনো আছে মনে হয়। যাবে?'

ভেতর থেকে চাচির গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'নিতু, রেডি হওনি? কোথায় গেলে?'

নিতুর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। গালের পানির ধারার ওপরে হাত ঘষতে ভুলে গেল। চাচির গলা শুনে তপু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি নিতু? আর কাঁদছ কেন?'

'তপু ভাই, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আজ আমি চলে যাচ্ছি।'

'বলো কী! এরই মধ্যে তোমার বিয়ে হয়ে গেল?'

'তোমার বাবা-মা এসেছিল অনুষ্ঠানের দিনে।'

'তাই? তারা তো মনে হয় জানে না যে আমি তোমাদের চিনি। তাই বলেনি। তা ছাড়া আমিও তো আর এখানে ছিলাম না যে জানব। এই কয়েক মাস আসলে খুব ব্যস্ত ছিলাম। কারও সাথে যোগাযোগ তেমন একটা হয়নি। ভালো বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়ই তোমার।'

'তুমি যদি শুধু একটা দিন আগে আসতে, তপু ভাই! আমি পদ্মদীঘি যেতাম তোমার সাথে।'

কথাটা বলতে বলতেই বাদলের কথা মনে পড়ল। নিজের কথা নিজের কানেই মিথ্যে হয়ে ধরা দিল। নিতু জানত সে কখনো তপু ভাইয়ের সাথে যেতে পারত না। সে জানত সেই পদ্মদীঘিতে তার এ জনমে আর কখনো যাওয়া হতে পারে না। তবু তপুকে সামনে পেয়ে মিথ্যে আফসোসটা জানাতে ইচ্ছে করল। মিথ্যে হলে কী, তার নিজের জানায় সবচেয়ে বড় সত্যি। তাই বলতেই থাকল, 'আমার কতবার ইচ্ছে হয়েছিল সেই দীঘিতে আর একটাবার হলেও যাই। দিনের পর দিন ভেবেছি আজ হয়তো তুমি আসবে আর আমি তোমাকে বলব সেখানে নিয়ে যেতে।'

'এখন তুমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছ, সেখানে অনেক নতুন জিনিস দেখবে। মন খারাপ কোরো না। আনন্দে থেকো। আর হ্যাঁ, কে জানে, ওরকম একটা দীঘি তো সেখানেও থাকতে পারে!'

'তুমি আবার কবে আসবে তপু ভাই?'

'তিন-চার বছরের আগে তো না। তুমি আজই যাচ্ছ, ব্যস্ত নিশ্চয়। আমি তাহলে আসি। ভালো থেকো, নিতু।'

তপু কেন যেন নিতুর শেষ কথা না শুনেই মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে দিল। উৎসুক নিতু তপুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, চোখগুলো একটু বিষণ্ন কী? নিতুর মুখ থেকে যন্ত্রের মতো বেরিয়ে যাওয়া ভাবলেশহীন 'তুমিও ভালো থেকো' কথাটা আর তপুর কানে পৌঁছাল না। তার চোখ তখন রাস্তায়। সামনের দিকে।

রুমা মোদক

অমীমাংসিত

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

সারারাত নির্ঘুম থাকার পর ভোর পেরিয়ে পুরোদস্তুর সকালের রোদের তখন শহরময় ছড়িয়ে পড়ার ব্যস্ততা। এই তেড়ে আসা চৈতের রোদ খুব বেয়াড়া। রেসের মাঠের দুরন্ত ঘোড়ার মতো দৌড়ায়। বড় তাড়া তার। দ্রুত মানুষকে দিনের ব্যস্ততায় ডেকে আনার তাড়া। যে তাড়ায় ত্যক্ত বিরক্ত মানুষ, তবু মুক্তি চায় না এর থেকে। কিংবা এ এক অনিবার্য খাঁচা, দরজা খুলে দিলেও প্রয়োজনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বের হতে চায় না মানুষ নিজেও। প্রতিদিন এই তাড়ায় আত্মসমর্পণের সত্য নির্বিকার মেনে নিয়ে মানুষ রাতে ঘুমাতে যায় আর সকালে জাগে। এ সময়েই আমার শরীরে হানা দেয় অবসন্ন তন্দ্রা। জেটলগ। আটলান্টিকের ওপাড়ে তখন গভীর রাত নামছে, যে রাতের নিয়ম থেকে এখনো বের হতে পারেনি আমার শারীরবৃত্তীয় অভ্যাস। আরও কয়েকদিন লাগবে দিন আর রাতের এই আহ্নিক গতির সাথে মানিয়ে নিতে। চোখ খোলা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে আমার। ঢাকার রাস্তায় তীব্র হর্ন বাজিয়ে, হকারদের বাণিজ্যিক সুরে, আর কর্মস্থলমুখী ব্যস্ত দৌড়াতে থাকা মানুষের পায়ের ছাপে ছাপে ব্যস্ত দিন শুরু হয় আর আমি দরজা জানালায় ভারী পর্দায় অন্ধকার টেনে এনে তখন ঘুমাই। কড়া স্লিপিং পিল আর হার্ড ড্রিংকসের পরিপূরক ক্রিয়ায় আমি ঘুমের কাছে হেরে যাই। গ্লাসের গায়ে বরফের আঁচে জমে থাকা ফোঁটা ফোঁটা স্মৃতি যখন গলে গলে পড়ে শেষ রাতের ক্লান্তিতে।

একটা কুকুরের অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ যথারীতি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আধখেঁচড়া ভাঙা ঘুমে আমি স্থান কাল বিভ্রান্ত হই। ধাতস্থ হওয়ার কয়েক মিনিট আমাকে বাস্তবের মাটিতে ফেরায়, মধ্যকাশে ভোকাট্টা হওয়া ঘুড়ির মতো এলোমেলো পদক্ষেপে আমি জানালার পর্দা সরিয়ে ঢাকা শহর দেখি। ততক্ষণে তার ব্যস্ততা শেষ হতে চলেছে। নিয়ন বাতিগুলো না নিভলেও নিভে এসেছে চারপাশের হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের বাতিগুলো। জানালার কপাটের ভেতরে মানুষের ক্লান্ত নৈশব্দ ঘুম বাইরের পৃথিবীকে একটু জিরিয়ে নেয়ার ফুরসত দিয়েছে। দুয়েকটা গাড়ি এর মাঝে হুঁসহাঁস চলে যাচ্ছে রাতের গভীরতার বুকে উপেক্ষার চির ধরিয়ে। কুকুরটা তখন আবার পরিচিতস্বরে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এ শহরের নাম ঢাকা। নিউ ইয়র্ক নয়। সারাদিন জানালার কাচ কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হর্ন আর অনেক ব্যস্ত শব্দ ঘুম ভাঙাতে পারেনি অথচ একটা কুকুর এখানেও মধ্যরাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল ঠিক।

প্রশ্নপত্রে উত্তর দেওয়া আবশ্যিক প্রশ্নটির মতো আমার নূরীকে মনে পড়ে। এই রোগ আমার পুরনো। মধ্যরাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা। ব্রংক্সের বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে কতদিন কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য বের হতে গেলে নূরী আটকিয়েছে আমাকে। নিউ ইয়র্কের বাইরে তখন উইন্টার, বোধহয় মাইনাস টেন। তুষারের টিলা জমে জমে কাফনের মতো সাদা কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে ব্যাক ইয়ার্ডে, গার্ডেনে, কাঠের সিঁড়িতে। সেখানে কুকুররা ভবঘুরে নয়, রাতদুপুরে কারো দরজায় ঘেউ ঘেউ করে না। মানুষ তবু আশ্রয়হীন হয়ে ঠাঁই নেয় রিহ্যাবে। কুকুররা থাকে খুব যত্নআত্তিরে। ধনীর দুলালের মতো এরা মাটিতে থাকে না পিঁপড়ের ভয়ে, মাথায় থাকে না উকুনের ভয়ে। কোলে কোলে মাত্রাতিরিক্ত আদরে আহ্লাদে প্রাণী জন্মের অধিকার ভোগ করে এরা। এই ঢাকার একটি পরিবারের এক মাসের বাসা ভাড়ার চেয়ে বেশি দামের চামড়ার বেল্ট গলায় বেঁধে এরা মনিবের সাথে পার্কে ইভনিং ওয়ার্কে যায়। সুপার শপের প্যাকেটজাত খাবারের খরচ এই ঢাকার মধ্যবিত্তের খাবারের খরচের চেয়ে বেশি। আলাদা প্যাট হাউজে উষ্ণ ওমে ঘুমায়। আর আমি কি না দরজায় এদের ঘেউ ঘেউ শুনি। নূরীর দুহাতে তৈরি করা ব্যারিকেডে আমি আমার ভ্রান্তি টের পেতাম, প্রায় রাতেই।

কিন্তু আমি তো ঘুমিয়ে আছি ঢাকায়, গুলশানের ভাড়া ফ্ল্যাটে। কখন ঘুমিয়েছিলাম, এখন কখন ঘুম ভাঙল ঠাওর করতে না পারলেও গভীর রাত টের পাই। মোবাইলে সময়টা দেখে নেয়া যায়। পেট চোঁ-চাঁ করছে। কমলদার বাসা থেকে আসা খাবারের বাটিগুলো না খুলেই ফ্রিজে তুলে রেখেছি। তীব্র খিদে বিষয়টি মনে করিয়ে দেয় ছেলেবেলার গণিত পরীক্ষার হলে হঠাৎ মনে পড়া সূত্রের মতো। বের করে ওভেনে দিতে হবে। কুকুরটির আওয়াজ তীব্র হয়। অবিশ্রাম ডেকে যাচ্ছে কুকুরটি। ভ্রম ভেবেই পরবর্তী করণীয়তে প্রবেশ করি আমি। খিদে... ফ্রিজের খাবার খোলা... ওভেনে দেয়া...। কুকুরটি ডেকেই চলে। ঘেউ ঘেউ... ঘেউ ঘেউ...।

আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। এত ঢাকা শহর। দেখাই যাক দরজা খুলে। এত কাছে শোনা যাচ্ছে কুকুরটার ঘেউ ঘেউ, যেন নিউ ইয়র্কের পার্কে কোনো প্রৌঢ়ের কাঁধে, আর আমি সেই প্রৌঢ়। বাঁদিকে লিফট। গ্রাউন্ড বটমে আঙুল দিয়ে মিনিট খানেক অপেক্ষা করতেই কাজের বেটি রহিমার মতো লিফট এসে থামে। কি রাতদুপুর, কি দুপুররাত, কি ভোর। এর বিরাম নেই। ভেতরে দুজন ভদ্রলোক, মাথায় টুপি হাতে জায়নামাজ। সময়ের যথার্থ সৈনিক। ক্লিন শেভড গাল থেকে গড়িয়ে আসা ব্র্যান্ডের আফটার শেভের মোহময় ঘ্রাণ। লিফটের ভেতরটা গন্ধে মাখামাখি হয়ে স্পষ্ট জানান দিচ্ছে এই সম্ভ্রান্ত এলাকার নাগরিকদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের বার্তা। ভাত হয়েছে কি না জানার জন্য যেমন হাঁড়ির একটা দুটো ভাত টিপে দেখলেই চলে। এদের দেখলে জানা যায় ঢাকার উঠতি শ্রেণিকে। এই বাংলাদেশের সাথে আমার পরিচয় নেই।

নিচে নেমে কুকুরটির সাথে দেখা হয়ে যায় আমার। সত্যি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘেউ ঘেউ করছে সে। দুজন লোক মসজিদমুখী হাঁটা দিলে কুকুরটির ঘাড়ে হাত বুলাই। অনেকদিন পর দেশি নেড়ি কুকুরের সাথে দেখা হলো আমার। কুকুরটি যেনো আমার অপেক্ষায় ছিল। ঘাড় উঁচু করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখে চোখ রেখে বলল, চল। এই আহ্বানে এমন নির্দেশ, আমার সাধ্য নেই অবজ্ঞা করি। কুকুরটির সহযাত্রী হয়ে আমি হাঁটতে থাকি... হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে যে বাসার সামনে দাঁড়াই তার ভেতর থেকে একটানা পড়ার সুর। টিনের ভাঙাচোরা গেটের সামনে টিমটিমে ফিলিপস বাতি ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। তার নিচে মাধবীলতার ঝোপে থোকা থোকা অতীত। গেট নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই দুটুকরো টিনে আসলে যাত্রাপালার পর্দার মতোই ঠুনকো। উন্মত্ত হয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেই রাজা রানী মন্ত্রি উজির সব সাধারণ মানুষ হয়ে যায়। একবার নিউ ফিল্ডে কার্নিভালের মাঠের যাত্রাপালার প্যান্ডেল ভেঙে দিয়েছিল উন্মত্ত জনতা। নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে। উফ... পোড়া ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে কী কান্না রাজা উজির মন্ত্রীদের...।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে আমি দরজায় টোকা দিই। এটা নূরীদের বাসা। কত এসেছি। কুকুরটা এখানে নিয়ে আসলো আমাকে! দরজা খুলে আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে যায় নূরী। সব সময় নূরীর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির কাছে হার মানি আমি। কায়সার ভাই একদিন আমাদের বাবলীদের ছাদে দেখে ফেললে নূরী তৎক্ষণাৎ আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করে ডাকতে শুরু করে, শুধু তাই না ব্যাগ থেকে দুপ্রস্থ কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলতে থাকে, দেইখেন দেরি কইরেন না। অনেক কষ্টে নোট করছি। নিজে এখনো পড়ি নাই বলে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কায়সার ভাই আর নূরীকে ছাদে ভালোবাসাবাসি করার জন্য রেখে যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম, নূরী কি সব সময় ব্যাগে নোট নিয়ে ঘুরে? নাকি ও জানত এখানে কায়সার ভাই আসবে? কৌতূহলটি অমীমাংসিতই রয়ে যায় আমার কাছে। মার্কিন মুলুকের ব্যস্ত জীবন, উপমহাদেশীয় ছকে ছেলেমেয়ে মানুষ করা, বাড়ি কেনা, গাড়ি কেনা ইত্যাকার নিয়ম মানতে মানতে কোনোদিন নূরীকে এই অগুরুত্বপূর্ণ অথচ অমীমাংসিত প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়নি আর। নূরী আসলে কাকে ভালোবাসতো, আমাকে নাকি কায়সার ভাইকে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত প্রশ্নটিরই তো মীমাংসা করা হয়নি কখনো। কতদিন ভেবেছি, মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছি একদিন জিজ্ঞেস করবোই নূরীকে। পারিনি। কেন পারিনি? অপ্রিয় কোনো সত্য শুনে বয়ে বেড়ানোর মতো মনের জোর ছিল না আমার।

আজ আমাকে দেখেই বাইরের বাতির সুইচ অফ করে দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দেয় নূরী। এইভাবে আইসা ঢুকলেন, আব্বা আম্মা কেউ এখনো ঘুমায় নাই। যদি কায়সার ভাই দেখত! কদিন ধইরা দেখতেছি কায়সার ভাই সারারাত জাইগা কী জানি করে।

ঘুমায় না। নূরী বলতে থাকে...।

কায়সার ভাই শহরে তখন একই সাথে ভয় আতঙ্ক আর সম্ভ্রমের নাম। স্বৈরাচারবিরোধী মিছিল, মিটিংয়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ আর আধিপত্য তার। শহরের তরুণদের সাহসের উৎস সে। তুখোড় বক্তা আর দুঃসাহসের যৌথ যোগ্যতায় শহরে কায়সার ভাই কিংবদন্তি তখন। পুলিশের গাড়ি বরাবর ককটেল ছুড়ে মারা, হরতালের দিন খোলা দোকানের শাটার চোখ রাঙিয়ে বন্ধ করে দেওয়া, রিকশা আটকে চাকার পাম্প ছেড়ে দেওয়া এমনকি শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র গাড়িটিতে আগুনও ধরিয়ে দিয়েছিল কায়সার ভাই।

সেবার শহরে স্বৈরাচারী শাসক আসবে রাষ্ট্রীয় সফরে। সরকারি দপ্তরে দপ্তরে যুদ্ধাবস্থার মতো সতর্কতা। যেন যে কোনো সময় হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলে ধ্বংস করে দেবে সিস্টেম সমেত সব ইট পাথরের স্থাপনা। কয়দিন ধরে শহরে ১৪৪ ধারা। সব সরকারি দপ্তরে আর্মড পুলিশ। কড়া পাহারায়।

আমাদের ডেকে পাঠান কায়সার ভাই। বাড়ির মূল ঘরের বাইরে ছোট্ট একটা ঘর। চারদিকে বাঁশের বেড়ায় দৈনিক পত্রিকার আঠালেপা আড়াল। সেখানে রাজ্জাক, ববিতা, নুতন, জাম্বুবানের হরেক কিসিমের ছবি আর সংবাদ। আমাদের চারজনের এলোমেলো বসা সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। পরিকল্পনা হয়, এই শহরেই শেষ রাত হবে স্বৈরাচারী জান্তার। দেশ জাতির উদ্ধারকর্তা হবে কায়সার ভাই। নতুন যুগের যোদ্ধা কায়সার ভাই। সে রাত ছিল বিপুল স্বপ্নময় উন্মাদনার। বিশাল উত্তেজনার। আমরা চারজনই অন্ধ বিশ্বাসে ঝাঁপ দিয়েছিলাম দেশের ইতিহাস বদলে দেওয়ার নেশায়। হাতবোমা বানানোর ট্রেনিং ছিল আমাদের। পরপর কয়েকদিন সারারাত সবার সব ট্রেনিং একত্র করে তৈরি করা হয় যে বিস্ফোরক, আমরা নিশ্চিত হই এটি একটি স্টেজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি, কায়সার ভাই, মিজান এবং হিরণ্ময়।

সব ঠিকঠাক ছিল। শুধু আমার এবং কায়সার ভাইয়ের মাঝখানে নূরী। কায়সার ভাই পাড়ার বড়ভাই, যে বড়ভাই নূরী কয় কদমে কলেজে যায় আর কয় কদমে ফিরে হিসাব রাখে তার দিকে চোখ তুলে তাকায় এমন দুঃসাহস মফস্বল শহরে কয়জনের থাকে! আমি তাকিয়েছিলাম। আমি। আমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত চর ছিলাম কায়সার ভাইয়ের। কলেজের বারান্দায় নূরীর হাতে কায়সার ভাইয়ের চিঠি গুঁজে দেওয়া... ঈদের দিনে বাসা পর্যন্ত গিয়ে ভিউকার্ড আর সাথে কাচের চুড়ি পৌঁছে দেওয়া... আমাকেই সবচেয়ে ভরসা করতেন কায়সার ভাই।

আমি ঘরে ঢুকে নূরীকে জাপটে ধরলে নূরী কপট ধমক দেয়, কী করো আহমেদ ভাই। কায়সার ভাই জানলে তোমারে জ্যান্ত কবর দেবে। আমি নূরীকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করি না যে থানায় সব পরিকল্পনার খবর জানিয়ে দিয়েছি। আমি নূরীর বাসা পর্যন্ত আসতে আসতে পুলিশ হয়তো বেঁধে নিয়ে গেছে কায়সার ভাইকে।

প্রতিদিন আমি ঢুকলেই ঘেউ ঘেউ করত কুকুরটা। সেদিন আটা গুড়ের গুল্লির সাথে আলপিন মেখে খেতে দিয়েছিলাম কুকুরটাকে। নূরীদের বাসা খাঁ খাঁ। ঘরে ঘরে বিশাল তালা। বহুদিন কেউ বাস না করার নিঃসঙ্গতা বাড়িটিকে লক্ষ্মীছাড়া করে দিয়েছে। নূরীর ভাইয়েরা সবাই দেশের বাইরে। কেউ ফেরে না, কারো ফেরার তাড়া নেই। বাঁশবেতের বেড়া নেই, দুবাড়ির মাঝখানে সুউচ্চ দেয়াল। দেয়ালের পাশেই মরে পরে আছে কুকুরটা। সেই কুকুরটা। আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে যে। এক সময় প্রতিদিন যে আমার শত্রু ছিল আজ এতদিন পর তাকে চিনতে পারলাম না আমি! নিজের হাতে তাকে হত্যা করেছিলাম সে রাতে।

কায়সার ভাইদের বাড়ি। আগের মতো ভাঙাচোরা টিনের ঘর নেই, পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে কেউ আমার মতো অপরিচিত আগন্তুকের দিকে ফিরেও তাকায় না। হয়তো প্রতিদিন এ সিঁড়ি বেয়ে কত এমন আসে যায়। চল্লিশ বছরে সব বদলে গেছে। কেউ চেনে না আমাকে। কায়সার ভাইয়ের ভাইগুলো তখন হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে ডাংগুলি খেলত উঠানে। কায়সার ভাইকে দেখতে এসেছি শুনে অব্যক্ত এক বিস্ময় ঝুলিয়ে তারা ভেতরের একটা কক্ষের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। তাদের বিস্ময় বলে, কায়সার ভাইকে কেউ এখন আর খুঁজতে আসে না। দশ ফুট বাই বারো ফুট হবে খুব বেশি হলে, বাড়ির ছোট্ট একটা ফেলনা ঘরে মলিন বিছানায় শুয়ে কায়সার ভাই। স্ট্রোক করেছিল বছর কয় আগে, ভাইদের কেউ একজন জানালেন। ডেমন শিয়া। কিচ্ছু মনে করতে পারেন না। কিন্তু আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন। নূরী কই নূরী, এমন জড়ানো জিহ্বায় উচ্চারণ করলেন আমি এবং কায়সার ভাই ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই এই বাক্য বুঝে। আমরা দুজনেই বুঝলাম কারণ আমরা দুজনেই জানি চল্লিশ বছর পর অনিবার্য কোন প্রশ্নটা উচ্চারণ না করলেও আমাদের দুজনের মাঝে অনড় পাথর হয়ে থেকেই যাবে। অমীমাংসিত কিংবা মীমাংসিত রহস্যের কিছুই হয়তো এখন আর যায় আসে না এর উত্তরে। তবু আমি বলি, এই বলতেই তো চল্লিশ বছর পর ফেরা আমার। নূরীকে কবর দিয়ে এসেছি। ইচ্ছে ছিল একদিন সব জানতে চাইব নূরীর কাছে, সব সত্য বলে দেব, হয়তো ক্ষমাও চাইব। মহামারী অতর্কিত আততায়ীর মতো সেই সুযোগ দেয়নি আমাকে। নূরীর লাশটিও দেখতে দেয়নি কায়সার ভাই। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। কায়সার ভাই বুঝে কি না কে জানে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে কান বেয়ে চুলে বালিশে মাখামাখি হয়ে যায়।

সম্ভবত তার ভাইয়ের বউই হবে। তরুণী বউটি চায়ের কাপ সাজানো ট্রে পাশের টেবিলে রেখে টিস্যু দিয়ে কায়সার ভাইয়ের চোখের জল মুছে দিতে দিতে ধমকের সুরে বলে, কান্দেন ক্যান ভাইজান? রাজ্যের বিরক্তি ভ্রুর গোড়ায় এনে আমাকে বলে, এই ভাইয়ার এক রোগ, কাউরে দ্যাখলেই খালি কান্দে। নেন চা নেন...।

কিযী তাহ্‌নিন

ব্যাঙের বিয়ে

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

আজ মীনাকুমারী আর দিলীপকুমারের বিয়ে। কাল সকালে সিদ্ধান্ত হলো যে আজ তাদের বিয়ে দেওয়া হবে। বিকেলে ওই হলদে ডোবা থেকে খপ খপ করে তাদের ধরে নিয়ে এলো সুশান্ত। প্রতিবছরই তাদের বিয়ে হয়, মানে মীনাকুমারী আর দিলীপকুমারের। বর বৌয়ের নাম একই থাকে। কিন্তু পাত্র পাত্রী এক নয়। কিংবা হয়তো এক। গেল বছরের মীনা বৌয়ের সঙ্গে হয়তো দুবছর আগের বর দিলীপকুমারের বিয়ে হচ্ছে। বোঝা তো মুশকিল। কারণ বিয়ের দিন রাতে তাদের ডোবায় ছেড়ে আসা হয়। ডোবায় বাস করা বর-বৌ সব মিলেমিশে যায়। তবে এ বছরের মীনাকুমারী আর দিলীপকুমার বেশ তরতাজা, বড়সড়, দেখতেও আরাম লাগছে। সুশান্ত তাদের বিশাল ডেকচিতে বসিয়ে রেখেছে, ঢাকনা চাপা দিয়ে। মাঝে মাঝে কীসব পোকামাকড় খেতে দিচ্ছে। মর্জিনার দায়িত্ব হলো বর-বৌকে বিয়ের পোশাক পরিয়ে দেওয়া। সেই কতবছর আগে শেফালি রানী দুটো কাপড় সেলাই করে রেখেছে বর কনের। তাই দিয়েই চলছে। প্রতিবছর বিয়ের অনুষ্ঠানের পর ধুয়ে কেঁচে সেই পোশাক রেখে দেওয়া হয়। হলুদ চকচকে কাপড়ে নীল জরি বসানো, বর-বৌয়ের বিয়ের পোশাক। পেছন দিক থেকে বর-কনের পাদুটোকে চেপে ধরে তাদের কাপড় পরিয়ে দেয় মর্জিনা। সেজেগুজে হাড়ির মধ্যে বিয়ের পোশাক পরে বসে আছে মীনাকুমারী আর দিলীপকুমার। ইয়াবড় দুটো সোনা ব্যাঙ।

আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ চলছে, তবু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। খটখটে জমি, টগবগ তেলে ভাজা পাঁপড়ের মতন তপ্ত আকাশ, একটু ঠান্ডা হাওয়ার আশায় মন কাঁদে। প্রতিবছর এমনিতেই এ অঞ্চলে ব্যাঙের বিয়ে দেয় সবাই। নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভেতর যে জয়পুর গ্রাম সেখানেই আয়োজন হয়। ছাতরাবিলের পাশে আয়োজন করে প্রতিবছর মীনাকুমারী আর দিলীপকুমার নামের দুটো ব্যাঙের বিয়ে দেয় গ্রামের মানুষেরা। এবং এই ব্যাঙের বিয়ের কারণেই যে গ্রাম বৃষ্টিতে টলটল করে, ফসল ফলে, এতো মিথ্যা নয়। শেফালী রানী সেই কত বছর ধরে নিজ উদ্যোগেই সব আয়োজন করে। হিন্দু আর মুসলমান, ওই বেলগাপুরহাটে বাস করা তিনটে খ্রিস্টান পরিবার সবাই আসে বিয়েতে। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী কটা টাকা দেয়। চেয়ারম্যান আর জমির মালিকেরা দেয় মোটা অঙ্ক। লাভ তো তাদেরই। বৃষ্টি না আসলে জমি তো একটুকরা বোবা মাটির দলা ছাড়া আর কিছু না। এই বছর কেমন দয়াহীন, এক ফোঁটা বৃষ্টি হলো না। কে যেন বলল, 'মীনাকুমারী আর দিলীপকুমারের বিয়ে দেওন দরকার।' আসলেও এবার তো বিয়ে হয়নি। সবাই ছোটে শেফালী রানীর বাড়ি। হাঁপানিতে বড্ড ভুগেছে এই শীতে শেফালী রানী। শরীর দুর্বল। কিন্তু বিয়ে তো দেওয়া দরকার। 'জোগাড় যন্ত্র কর, হামি তো আছিই।' সেই বলা সেই কাজ। এতদিন ধরে বিয়ে দিচ্ছে, জোগাড়যন্ত্রে সবাই পাকা। শেফালী রানী উঠোনে মোড়া পেতে বসে বলে বলে দেয় সব। কাল বিকেলে বর বৌকে তুলে নিয়ে আসা হয় ডোবা থেকে। প্রতিবছর এ কাজটা সুশান্তই করে।

শেফালীরানীর তদারকিতে ছায়ামণ্ডপ, পুষ্পমাল্য, গায়েহলুদ, আশীর্বাদ, ধান-দূর্বা সব কিছুর আয়োজন করে গ্রামের লোকেরা। আসগর বাবুর্চি ল্যাটা খিচুড়ি, বেগুন ভাজি আর শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজমেখে এক ভর্তা তৈরি করছে সবার জন্য। সবাই কতকিছু করছে, কত আয়োজন, মর্জিনার জন্য তেমন কোনো কাজ থাকেনা। এক কোণে বসে আয়োজন দেখছিল সে। শেফালী রানী ইশারা করে ডাকে। মীনা আর দিলীপকে কাপড় পরিয়ে দিতে বলে। 'হামার ট্রাঙ্কের ভিতর আছে, দেখ।' মর্জিনা হাড়ির মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে থাকা সোনা ব্যাঙ দুটির দিকে তাকিয়ে ভাবে, আহারে এদের কত সুখ। না চাইতেই বিয়ে। তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে, আগেও যেন কোথায় দেখেছে ওদের। এত চেনা!

কতবছর পর বিয়েতে এসেছে মর্জিনা। ঢাকা থেকে এক সময় আসতেই ইচ্ছে হতো না এখানে। কালো, মোটা, দাঁত উঁচু বলে ব্যাঙাচি বলে ডাকত এ গ্রামের মানুষজন, তুচ্ছ করে, হাসতে হাসতে, 'এই ব্যাঙাচি কই যাস?' বলত এই মানুষজনই। আর এখন কী দরদ দিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দেয়। ইস। বদমাইশ স্বামীটা যখন একদিন চৌকির কোণায় দড়ি দিয়ে বেন্ধে ইচ্ছেমতন পিটাল, 'তুই তো শালী দেখতে কালাকুত্তার গু, থু। তোর মুখে মুততেও মন চায়না।' এই গ্রামের মানুষজন তখনও তো দূর থেকেই উহু আহা করেছিল। ঢাকা যেয়ে গার্মেন্টস, পার্লার আর মানুষের বাড়ি কাজ করে সে এখন ভালো আছে। ক্লাস এইট পাশ করেছে সে, এ জীবনে চলার মতন জ্ঞানবুদ্ধি তার আছে। কামরাঙ্গীরচরের বস্তির জীবন সে বেছে নেয়নি। কাঁঠালবাগান ঢালে এক রুমের ফ্ল্যাটে থাকে। সারা দিনে পাঁচ ছয় বাসায় কাজ সেরে এসে যখন নিজের চৌকিতে শুয়ে ভনভন করে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে, স্মার্টফোনে বাজতে থাকে 'ও আমার বন্ধু গো চিরসাথে পথ চলার' আনন্দ হয়। ঘেন্নাও, গ্রামের ওই বোকা কুৎসিত লোকগুলোর জন্য। আর ফ্যানের বাতাসে যখন কপালের স্টেপকাট চুলগুলো এলোমেলো হয়, খানিকটা মায়া হয়। গ্রামের ওই হেরে যাওয়া মানুষগুলোর জন্যই, যাদের এখনো আকাশে তাকিয়ে থাকতে হয় বৃষ্টির অপেক্ষায়। পুরনো কথা মর্জিনা বেশি ভাবে না, এইসব সস্তা দুঃখের কথা জসিম শাবানার সিনেমার গল্প হিসেবে ভালো। জীবনে বাঁচতে গেলে প্রচুর ফুর্তি থাকতে হবে, প্রচুর। আর সালাউদ্দিন যখন থেকে জীবনে আলো হয়ে এলো, মানুষের প্রতি ঘেন্না রাগ এগুলো কমতে শুরু করেছে।

সালাউদ্দিন মর্জিনাকে বুঝিয়েছে যে, তার জীবনে সালাউদ্দিনের মতন এক মানুষ আছে, এ শহরে থাকার ঘর আছে। গ্রামের ওই বোকা লোকগুলোর সঙ্গে কী তার তুলনা চলে। মর্জিনা অবাক হতো, ইমোতে পরিচয় হওয়া ভুল নম্বরে পাওয়া এক মানুষ, তার মতন মোটকা কালো মানুষের জীবনের এমন গভীর ভাঁজে জড়িয়ে গেল ন্যাপথলিনের সুঘ্রাণের মতন। কীভাবে? সেবার যখন গ্যাস্ট্রিকের ব্যাথায় অচল হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো, চিকিৎসার জন্য বিকাশে দশ হাজার টাকা পাঠাল সালাউদ্দিন। এত মায়ায় ভরা মানুষের সঙ্গে এই অসুন্দর জীবনে দেখা হবে, মর্জিনা কী কখনো ভেবেছে!

সালাউদ্দিনের জীবনে কী আর কম দুঃখ? বিয়ের আগের দিন হবু বৌ পালিয়ে গেল। এই যে দুবাইতে থাকে, কী খায়, কেমন থাকে কে জানে? ছুটির দিনের বিকেলে দুবাইয়ের সোনার গয়নার দোকান ঘুরে ঘুরে ভিডিও কলে মর্জিনাকে দেখায়, 'কও দেখি পাখি তোমার কোন ডিজাইন পছন্দ?' ভালোবাসায় মরে যেতে ইচ্ছে করে মর্জিনার। সালাউদ্দিনের কথামতন নিজের গ্রামে নতুন করে যাতায়াত শুরু করেছে মর্জিনা। সবাইকে ক্ষমা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আব্বা আম্মা নাই, কিন্তু ভাই-বোনের কাছে এসে থাকে কদিন, ছুটি পেলে। আর গ্রামের মানুষেরা সালাউদ্দিনের কথা জানবার পর থেকে মর্জিনার কদর বেড়েছে। শহরের মানুষদের প্রতি ভারী ভক্তি এ অঞ্চলের সবার। সুগন্ধি মাখা, আত্মপ্রত্যয়ে ঝিকমিক করে হেঁটে চলা মর্জিনাকে তারা শহরের মানুষই ভাবে এখন।

সালাউদ্দিন দুবাই থেকে এলো অবশেষে। মর্জিনার সঙ্গে একবেলা দেখা করে এলিফ্যান্ট রোডের রাঁধুনি রেস্টুরেন্টে। মোরগ পোলাও আর চার কাপ দুধ চা খায় দুজন মিলে। মর্জিনার হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে চট্টগ্রাম যায় সালাউদ্দিন। বাপ-মাকে বলতে হবে, বিয়ের আয়োজন করতে হবে। ৩৫ বছরের তালাকওয়ালা পাত্রীর সঙ্গে কেউ কী আর ছেলের বিয়ে দিতে চায়! সালাউদ্দিন বলে, 'ভালোবাসা থাকলে সবই সম্ভব।' সম্ভব করলও। রাজি করাল সবাইকে। তার বড় চাচা হাসপাতালে, সুস্থ হলেই বিয়ের আয়োজন শুরু হবে। সালাউদ্দিন জানাল মর্জিনাকে যেতে হবে চট্টগ্রাম, সেখানেই বিয়ে হবে। মর্জিনার ভাই-বোন অনুরোধ করেছে, বিয়ের পর নতুন জামাই নিয়ে মর্জিনা যেন জয়পুর গ্রামে আসে। যাবে মর্জিনা। দুবাই ফেরত সালাউদ্দিনের সামনে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াবে, ভাবলেই আনন্দ হয়।

বিয়ের জন্য একটা লাল সুটকেস কিনে তাতে এটাসেটা ভরে রাখে মর্জিনা। সালাউদ্দিনের জন্য একটা গোলাপি শার্ট কিনেছে। সেটা ভরে রাখে সুটকেসে। গুছায়, এলোমেলো করে, নতুন করে সাজায়

সবকিছু আবার। কিন্তু গেল তিন মাস ধরে সালাউদ্দিনকে আর খুঁজে পাচ্ছে না সে। ইমোতে সালাউদ্দিনের সেই নম্বর আর নেই, কত নামে সে খুঁজেছে, ইমোতে, ফেসবুকে। সালাউদ্দিন নেই। মর্জিনার এ শহরের সবচেয়ে কলিজার টুকরা বান্ধবী ফরিদা সেদিন রাতে মর্জিনার বাসায় আসে। সালাউদ্দিনের একটা খবর পেয়েছে সে। এক অনলাইন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, 'চট্টগ্রামে এক মেসে বন্ধুদের হাতে সালাউদ্দিন নামের এক প্রবাসী ব্যক্তি খুন হয়েছে। খুনের পর সালাউদ্দিনের ব্যাগে থাকা এক লাখ টাকা নিয়ে খুনিরা পালিয়েছে।'

সবাই এ গল্পটা জানল। মর্জিনাই জানাল। গ্রামের মানুষেরা সত্যিই বড্ড কষ্ট পেল এবার। সালাউদ্দিন তো তাদেরও গর্ব ছিল, দুবাই থাকা এক পাত্র। মুখের কথা! মর্জিনাকে ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখে সবাই। আহারে।

বিয়ের সময় হয়েছে। হাড়িতে নির্লিপ্ত বসে থাকা বর-কনের দিকে তাকিয়ে থাকে মর্জিনা। সুশান্ত আসে, 'দিদি আমি ওদের নিয়ে যাই।' 'দাঁড়া আমি নেই।' টুপ করে দুহাতে চেপে তুলে নিল মীনাকুমারী আর দিলীপকুমারকে। মণ্ডপে নিয়ে যাচ্ছে ওদের, সোনাব্যাঙ দুটোর দিয়ে তাকিয়ে মর্জিনার মনে পরে গেল সালাউদ্দিনের হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনাটা। যে ঘটনাটা সে লুকিয়ে রেখেছে সবার থেকে। গেল মাসে সালাউদ্দিনের নাম ধরে ইমোতে খুঁজতে খুঁজতে পেল একটা নতুন আইডি। আইডির ডিসপ্লেতে একটা ছবি, বিয়ের ছবি। সাদা লাল বিয়ের পোশাক পরে সালাউদ্দিন আর তার সবুজ ঘাসের ডগার মতন কচি বৌ। সালাউদ্দিনই তো? শুধু চুলগুলো একটু কম মনে হচ্ছে? নাকি ছবির আলোর কারণে এমন? কে জানে? সালাউদ্দিনের হারিয়ে যাওয়ার দুটো গল্প রয়েছে মর্জিনার কাছে। যেকোনো একটি গল্প সত্যি। মর্জিনা বাঁচিয়ে রাখল প্রথম গল্পটিকে। ভালোবাসার মানুষ মরে গেছে, এ গল্পটায় সম্মান আছে। জিতে যাওয়ার সুখ আছে।

বিয়ে শুরু হয়েছে। জড়সড় হয়ে মণ্ডপে বসে আছে বর-বৌ। দিলীপকুমারের ঝুলে যাওয়া চোয়াল, আর মীনাকুমারীর পিটপিট করা অসহায় চোখ, মর্জিনার খুব চেনা মনে হয়। এমনটা আগেও কোথাও দেখেছে সে নিশ্চিত। বিয়ের মন্ত্র পাঠ হচ্ছে। সবার চোখ ভিজে ভিজে যায় এমন খরায়। দুটো সোনাব্যাঙের বিয়ে হচ্ছে, তুমুল বৃষ্টির আশায়।

দেশ রূপান্তর ■ ঈদ সংখ্যা ২০২৩

উপন্যাস ■

তৌহিন হাসান

গোলাপ

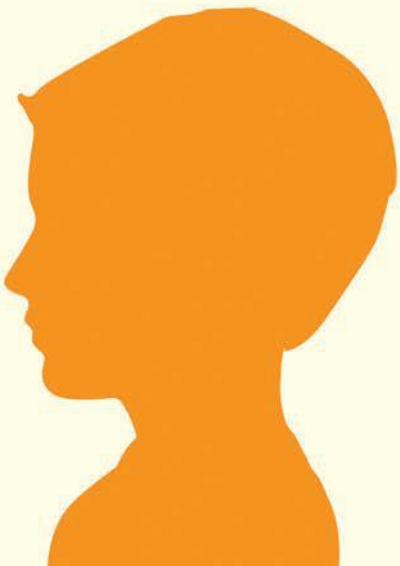

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

১

এখন ভোর। সূর্য ওঠেনি। তবে সূর্যের লালাভ আলো আকাশটাকে রাঙিয়ে দিতে শুরু করেছে। এ রকম ভোরে, প্রতিদিন, কারওয়ান বাজারের গলিতে আসতে শুরু করে বাহারি আকারের ট্রাক। দেশের নানা জেলা শহর থেকে মালামাল নিয়ে আসে ওরা। শাক-সবজি থেকে শুরু করে মুরগির ডিম, চাল-ডালের বস্তা, ফলমূল এমনকি গাদাগাদি করে মানুষও। এই বাজারে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে মানুষও বেচা-কেনা হয়; প্রকৃত বিকায় ওদের শ্রম। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে একটা করে ঝুড়ি ও একটা শাবল বা কোদাল। ওদের জায়গা হয় বাজারঘরগুলোর বাইরে, রাস্তার ধারে, যেখানে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকে ওরা। জামার আস্তিন গুটিয়ে হাতের পেশিগুলো ফুলিয়ে কেউ কেউ তাদের শরীরের কর্মক্ষমতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। কারওবা শরীরে কোনো জামার বালাই থাকে না। ওদের কালচে-পোড়া শরীরের পেশির ভাঁজ তখন সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। যাদের শরীরের পেশিতে কোনো ভাঁজ পড়ে না কিংবা কেউ কেউ, যারা বৃদ্ধ কিংবা নিতান্তই কিশোর বা নাবালক, তাদের দিকে প্রথমে কেউ খুব একটা তাকায় না। 'কেউ' বলতে দালাল। দিনচুক্তিতে ওদের কিনে নেয় তারা। পেশিবহুল মানুষগুলো আগে আগে বিক্রি হয়ে যায়। যারা বাকি থাকে, সূর্য ওঠার পর তারাও কেউ কেউ আর অবশিষ্ট থাকে না। কম দামে নিজেদের বিক্রি করে দেয় তারা নতুবা একটা দিন তাদের কাজহীন থাকতে হবে—এই আশঙ্কায়। এই শহরে শ্রম অনেক সস্তা। ফলে প্রতিদিন এ রকম ভোরে কিছু মানুষ কিছু মানুষের কাছে দিনচুক্তিতে বিক্রি হয়ে যায়। তারপর দিনভর, সন্ধ্যা অবধি, কখনো কখনো অধিক রাত পর্যন্ত তাদের শ্রমে শহরের উন্নয়নকাজ চলতে থাকে।

বাবলুর বয়স নিতান্তই কম। তাই সে শ্রম বিক্রির তালিকায় একেবারেই পড়ে না।

রাস্তার মাঝখানটায় যে আইল্যান্ড চওড়া রাস্তাটাকে দুই ভাগ করেছে, তার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আইল্যান্ডটি আগে ছিল সরু। সরু হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে— এই আশঙ্কা দেখিয়ে সড়ক বিভাগ আইল্যান্ডটি চওড়া করার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল বছর চারেক আগে। কাজ শুরু হয়ে আজ অবধি শেষ হয়নি। ফলে আইল্যান্ডটির দুপাশে লম্বা সারিতে ইটের গাঁথুনি বসলেও মাঝখানটায় এখনো ফাঁকা, সেখানে মাটি। এই সুযোগে ঘরবাড়িহীন উদ্বাস্তু কিছু মানুষ, টোকাই, নেশাখোর যুবক, যাদের এই শহরের ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই, তারা রাতের বেলা এখানে ঘাঁটি গেড়ে রাত যাপন করে। বিষয়টা খুবই সহজ। আইল্যান্ডের মাখখানের কিছু মাটি সরিয়ে নিলেই লম্বা একটা খাদ তৈরি হয়। দুই পাশে ইটের গাঁথুনি, মাঝখানে খাদ। এই খাদে লম্বা করে শরীর এলিয়ে দিলেই তাদের হয়ে যায়। গড়িয়ে এপাশে বা ওপাশে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। এই ঘুমানোর বন্দোবস্তর কোনো মালিকানা নেই। যে আগে এসে রাতে জায়গা দখল করতে পারে, ওই রাতের জন্য তার ঘুমানোর জায়গা ওটি। তবে নেশাখোররা এসে মাঝে মাঝে খুব ঝামেলা করে। তারা মাঝরাতে এসে জায়গা না পেয়ে জোর জবরদস্তি-খিস্তিখেউড় শুরু করে দেয়। মাঝে মাঝে মারামারির ঘটনাও ঘটে। গত রাতে কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাবলু এখানে ঘুমানোর জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। বাবলু ভাবল, আহা! ভাগ্যও বটে। এই ভাবতে ভাবতে চট করে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, পরে কোনো নেশাখোর এসে তাকে না আবার তুলে দেয়—এই ভেবে।

আকাশটায় এখন ফকফকা আলো। কারওয়ান বাজারে ট্রাক আসার সংখ্যা কমে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রাক আসছে বটে, এসেই তারা ঢুকে পড়ছে বাজারের ভেতর। খুব ভোরে যেসব ট্রাক এসেছিল তারা মাল নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে অনেক আগে। ফলে বাজারের ভেতর ট্রাক ঢুকে মাল নামানোর মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। আগের ট্রাকগুলোর নামিয়ে রাখা, রাস্তার পাশে জড়ো করা বস্তাগুলো কুলিরা একে একে নিয়ে জমা করছে আড়তে। এর মধ্যেই পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। বাজারের শেষ ট্রাকটি আসে বরফ ঢাকা মাছ বোঝাই করে। আইল্যান্ডের পাশ ঘেঁষে সাঁই করে ছুটে গিয়ে একটু সামনে বাজারের মোড় ঘুরতেই বাবলুর চোখে-নাকে-মুখে এসে লাগে মাছের বোটকা গন্ধ আর এক ঝাপটা ধুলো-ময়লা। এক ঝটকায় উঠে বসে সে। 'খানকির ট্রাক'। মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায় বাবলুর। এত সুন্দর খাদে কী আরামের ঘুমটাই না হয়েছিল। যেন এ রকম আরামের ঘুম সে অনেক দিন ঘুমায় না। ভাগ্যের জোরে আবার কবে এই ঘুমানোর জায়গাটা পাবে কে জানে। বয়সে ছোট বলে অনেকেই 'এই ছ্যামড়া ওঠ' বলে তার ঘুমানোর জায়গাটি দখল করে নেয়। অনেকে আবার কান ধরে টেনেহিঁচড়ে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়। তখন দু-একটা গালি মেরে ওখান থেকে সরে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

বাবলুর বয়স আট বা তারও কম বা একটু বেশি।

এভাবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বাবলুর মেজাজ একটু খারাপ হলেও শরীরে একটা আরাম আরাম অনুভূতি হয়। বেশি ভালো ঘুম হলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে। তাই দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে একটা বড় করে হাই তোলে সে। সূর্য উঠে গেছে। আইল্যান্ডে যারা রাতে ঘুমিয়েছিল তারা অনেকেই উঠে তাদের দিনের কাজে চলে গেছে। তারপরও দু-চারজন এখনো ঘুমিয়ে আছে। দু-চারটা খাদের মধ্যে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা ঘুমন্ত শরীরগুলো দেখে বাবলু ফিক করে হেসে ফেলে। দূর থেকে ওর কাছে কবরে পড়ে থাকা শবদেহের মতো মনে হয়। বাবলু জানে, আরও অনেক পরে ওদের ঘুম ভাঙবে। না ভাঙলে পাছার মধ্যে টহল পুলিশের লাঠির বাড়ি পড়লে আর ঘুমানোর উপায় থাকবে না। নেশাখোরদের ঘুম ও দেখলেই চেনে। বাবলু উঠে এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়। রাস্তার ওপারে, বাজারের কোনায় চায়ের দোকানগুলো খুলেছে। কারওয়ান বাজারে যারা মাল কিনতে এসেছে, চায়ের জন্য তাদের বেজায় ভিড়। দোকানিরা চা বানিয়ে দম ফেলার সময় পায় না। এটাই তাদের ব্যবসার একটা ভালো সময়। এই ঝটকার ব্যস্ততা কমলে আবার অফিস শুরুর সময় আরেকটা ঝটকা আসবে। সেটা সকাল আটটা থেকে নয়টার সময়। অফিসে ঢোকার মুখে নিম্নস্তরের কর্মচারীরা চায়ের এই টং দোকান থেকে চা খেয়ে অফিস শুরু করে।

বাবলু একটা চায়ের দোকানের আশপাশ থেকে কিছু কাগজ কুড়িয়ে নেয়। তারপর দোকানের স্টোভ থেকে কাগজগুলোতে আগুন ধরায়। কাগজগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, সেই ছাই হাতের তালুতে ডলে ডলে সে ছাইয়ের পাউডার বানায়। তারপর চায়ের টং দোকানের এক কোনায় বসে দাঁত মাজতে থাকে।

গণি, আলফু আর নারায়ণ কাল রাতে কোথায় ঘুমিয়েছিল বাবলু জানে না। বিকেলের পর থেকেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি বাবলুর। সবাই একসঙ্গে বিকেলে ঢাকা মেডিকেলের পেছনে ছিল। ওখানে হাসপাতালের ফেলে দেওয়া ওষুধের কৌটা-স্যালাইনের বোতল-সিরিঞ্জ পাওয়া যায়। আলফুর কথা শুনে ওরা গিয়েছিল ওখানে। কিন্তু কিছু পায়নি, ফেলে দেওয়া রক্তভেজা গজ-ব্যান্ডেজ ছাড়া। ভাঙারির দোকানে এসবের কোনো দাম নেই। আলফু বলেছিল, ভাঙারি দোকানে সিরিঞ্জের দাম আছে। কিন্তু ওরা যাওয়ার আগেই যে অন্য টোকাইরা সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে, সেটা ওরা ভাবতেই পারেনি। শুধু শুধু একটা ধাপ্পা খেলো। আর আলফু খেলো ওর চৌদ্দগুষ্টির গালি। গণি খুব ভালো ভালো গালি জানে। ওদের মধ্যে কেউ গালি খাওয়ার যোগ্য হলে, মাঝে মাঝে গণি অন্যদের থামিয়ে দিয়ে, ওদের হয়ে একাই গালিগালাজ করে দেয়। কালও তাই হয়েছিল। তারপর ওরা শামসুন্নাহার হল-টিএসসি হয়ে গিয়েছিল শাহবাগ। সেখানেই বাবলু ওদের হারিয়ে ফেলে। ভিড়ের মধ্যে বাবলু যখন নিজেকে একা আবিষ্কার করে, অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সে গ্রিন রোডে ভাঙারি কাদের মিয়ার দোকানে চলে আসে। তারপর সারা দিনের সংগ্রহ বেচে দিয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে কারওয়ান বাজার। তখন ওর পকেটে ছিল সারা দিনের রোজগার এক শ আটচল্লিশ টাকা।

বাবলুর দাঁত মাজা শেষ হয়।

চায়ের দোকানগুলোতে বেজায় ভিড়। রিকশাওয়ালা, কুলি, ঠেলাগাড়িওয়ালা, সবজি বিক্রেতা, পিকআপ ভ্যান-স্কুটার ড্রাইভার সবাই এখানে সকালের নাশতা সারে পাউরুটি আর কলা দিয়ে কিংবা একটা মাখনরুটি বা দুইটা শিঙাড়া বা কেক। কেউবা একটা টোস্ট, সঙ্গে দুধ-চিনি বেশি দিয়ে চা। রিকশাওলারা আরাম করে চা খায়। দিনের রিকশা চালানোর শুরুতেই তারা যেন শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। সবজি বিক্রেতাদের পুরো কাপ চা খাওয়ার সময় নেই।

বাবলু চায়ের টং দোকানের কোনায় রাখা পানির গ্যালন থেকে মগ দিয়ে পানি তুলে কুলকুচি করে। পিচ করে কুলকুচির পানি রাস্তায় ফেলে। গতকাল রাতে কেনা আধা প্যাকেট বিস্কুট তার পকেটে আছে। সকালের নাশতাটা তার এই আধা প্যাকেটেই হয়ে যাবে। সঙ্গে একটা কলা হলে ভালো হতো। বাবলু আগে যখন আরেকটু ছোট ছিল, তখন চা দোকানদারের কাছে একটা বিস্কুট বা কলা বা শিঙাড়া চাইলেই পেত। কিন্তু এখন বাবলু বড় হয়ে গেছে। কেউ কিছু চাইলে মাগনা দেয় না। পকেটে টাকা ছিল না বলে একবার বাবলু মোসলেম মিয়ার দোকানে গিয়ে একটা টোস্ট বিস্কুট চেয়েছিল। মোসলেম মিয়া দুইটা টোস্ট দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিন ড্রাম পানি তাকে দিয়ে আনিয়েছিল ওয়াসার পানির পাম্প থেকে।

এখন অবশ্য বাবলুর পকেটে একশ আটচল্লিশ টাকা আছে। চাইলেই সে কলা কিনে খেতে পারে।

শহরের প্রধান সড়ক ব্যস্ত হতে শুরু করেছে। রাস্তায় কিছু কিছু গাড়ি চলছে। রিকশা, ভ্যান, টেম্পো, প্রাইভেট কার, দু-চারটা মিনিবাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে পুরো শহর। নির্জনতা বলে কিছু থাকবে না। ঝাঁকে ঝাঁকে গাড়ির বহরে মানুষ কাজে-অকাজে ছোটাছুটি করবে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। শহরজুড়ে কিলবিল করবে মানুষ। এর মধ্যেই বাবলুকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে। এই যুদ্ধের কোনো ধরন নেই। উদ্দেশ্য একটাই, পৃথিবীজুড়ে মানুষ প্রজাতির মধ্যে টিকে থাকা। টিকে থাকার জন্য খাদ্যের অন্বেষণ। কখনো কাজ করে, কখনো হাত পেতে চেয়ে-চিন্তে আবার কখনো কখনো চুরি-পকেটমারিংও যে বাবলু করে না, এমনও না। কিন্তু সে পথে ও এখনো পারদর্শী হয়ে ওঠেনি। একবার পকেট মারতে গিয়ে ধরা খেয়ে বাবলু যে মারটা খেয়েছিল, মারের ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে সারারাত ওর ইচ্ছে হয়েছিল, হিংস্র কুকুরের মতো শহরের সবাইকে একবার করে কামড়ে দিয়ে আসে। আর চিৎকার করেছিল, 'মা, আমারে তোমার কাছে নিয়া যাও।' তখন বাবলু ওর চারপাশে গণি, আলফু আর নারায়ণের খিকখিক হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তর শুনতে পায়নি। কারণ বছর কয়েক হলো ওর জীবন রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তারপর থেকে ও শুধু জেনেছে, টিকে থাকতে হবে। কে তাকে শিখিয়েছে টিকে থাকার কৌশল?—কেউ শেখায়নি। মানুষ তার নিজের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে শেখে। বাবলুও ধীরে ধীরে শিখছে। হয়তো আরও অনেক কিছু শিখতে হবে।

পুলিশের একটা বড় গাড়ি এসে থামে কারওয়ান বাজারের গলিমুখে। দুজন ট্রাফিককে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি চলে যায়। দুজনের একজন রাস্তার দক্ষিণের ট্রাফিক ছাউনির দিকে হাঁটতে থাকে। অন্যজনের ডিউটি বাজারের গলিমুখের এই মোড়ে। সে চা খাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে, স্যুয়ারেজের ড্রেনের ওপর পাতা টং দোকানগুলোর দিকে আসে। টং দোকনের সামনের পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসতে বসতে, হাত দুটো পেছনে বাঁকিয়ে মুখটাকে জলহস্তীর মতো হাঁ করে একটা বড় হাই তোলে সে। ট্রাফিকের চোখ-মুখ দেখে বোঝা যায়, রাতে ভালো ঘুম হয়নি। চোখের চারপাশে তখনো ঘুম লেগে আছে। মাতালের মতো মুখ বাঁকিয়ে অস্পষ্ট গলায় চা দোকানিকে একটা কড়া লিকারের চা দিতে বলে এবং দোকানের সামনে ঝুলে থাকা একটা পাউরুটির প্যাকেট ছিঁড়ে নেয়। চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খাওয়া ভোরের শহরে একটি জনপ্রিয় সকালের নাশতা।

বাবলুর ভীষণ প্রস্রাব চেপেছে। বাবলু খিঁচ মেরে তলপেটটাকে সামান্য চেপে রাখে। সুযোগ এবং জায়গা ঠিকঠাকমতো মিলে গেলেই সে প্রস্রাবের কাজটা সেরে নেবে। যেখানে-সেখানে প্রস্রাব করতে বাবলুর ভালো লাগে না, যদিও পুরো শহরটা তার জন্য একটা বিশাল মূত্রখানা। কিন্তু বাবলুর জন্য চাই একটা বিশেষ জায়গা এবং একটা মোক্ষম সুযোগ। কারণ বাবলুর ভালো লাগে শহরের বড় বড় বিল্ডিংয়ের গায়ে প্রস্রাব করে দিতে আর এখানে-সেখানে পার্কিং করে থাকা সুন্দর সুন্দর ঝলমলে গাড়িগুলোর গায়ে। যদিও পুরো কাজটা তাকে করতে হয় বিল্ডিংয়ের দারোয়ান ও গাড়ির ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে। বাবলু এদিক-সেদিক একবার তাকিয়ে নেয়। যেরকম-সেরকম বিল্ডিং হলে তার চলে না, বাবলুর চাই সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং—ঝকঝকে কাচে মোড়ানো, ধবধবে রঙ পলিশ করা, আঁকাবাঁকা নকশাঘেরা অফিস কিংবা বাড়ি। কিন্তু আশপাশে সে রকম কোনো বিল্ডিং চোখে পড়ল না বাবলুর।

ট্রাফিক পুলিশটা চায়ের টং দোকানের পাশে রাখা বেঞ্চিতে বসা বাবলুর দিকে ঘুমঘুম চোখে একবার তাকায়। ডিউটি শুরু হতে আরও আধা ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে চা খেয়ে শরীরটাকে একটু চাঙা করা দরকার—ঘুম কাটানো দরকার। সেই সঙ্গে নোংরা খিস্তি-খেউরগুলো মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিতে হবে তাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রিকশা-টেম্পো-মোটরগাড়ির জট বাড়তে থাকলে ট্রাফিক পুলিশ যতটা না হাতের ডান্ডা নেড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ির ড্রাইভারগুলোর দিকে তকিয়ে খিস্তি-খেউর করে। তাতেই অনেকটা কাজ হয় কিংবা হয় না। আজকাল এই শহরের রাস্তায় গাড়ির ড্রাইভারগুলোও ট্রাফিক পুলিশের খিস্তি-খেউরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খুব একটা গা-করতে চায় না। কাপ হাতে নিয়ে শব্দ করে চায়ের কড়া লিকারে প্রথম চুমুকটা দেয় ট্রাফিক পুলিশ।

– নাম কী?
– বাবলু।
– কী করোস?
– টোকাই।
– বাড়ি কই?
– শরীয়তপুর।

ট্রাফিক পুলিশ আর কোনো প্রশ্ন করল না; বরং উদাস হয়ে পাউরুটি সে চিবোতে থাকে আর একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিতে থাকে। বাবলু ভেবেছিল ট্রাফিক পুলিশ তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করবে। বাবা কী করে, সেটাও জিজ্ঞেস করবে—ভাইবোন কয়জন, কোথায় থাকে, আয়-রোজগার কত। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ সে রকম কিছুই জিজ্ঞেস করল না। বাবলু ট্রাফিক পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়ে তার চা খাওয়া দেখতে থাকে।

– আপনের বাড়ি কই? বাবলু জিজ্ঞেস করল।

ট্রাফিক পুলিশ কোনো উত্তর দিল না, তাকাল না পর্যন্ত বাবলুর দিকে। আপনমনে সে চা শেষ করে। চা শেষ হলে চায়ের দোকানদার মোসলেম মিয়া একটা কম দামি সিগারেট এগিয়ে দেয় ট্রাফিক পুলিশের দিকে, সঙ্গে একটা ম্যাচবাক্স। ট্রাফিক পুলিশ ম্যাচের বাক্স হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকে, কিন্তু সিগারেট ধরায় না। তার চোখ স্থির হয়ে আছে একটা ছোট আকারের ট্রাকের দিকে। ট্রাকটা মাল বোঝাই করছে। ট্রাফিক পুলিশ সেদিকে সরু চোখে তাকিয়ে তারপর সিগারেটটা ধরায় এবং পাউরুটি-চা-সিগারেটের বিল না দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় ট্রাকটার দিকে—শিকারি বাঘ যেমন শিকারের দিকে শান্তভাবে এগোয়। বাবলু বুঝে যায় এর পরে কী ঘটবে, প্রতিদিন সকালে এই দৃশ্য তার দেখা। বাবলু সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে অন্যদিকে চলে যায়।

প্রস্রাবের বেগ ভীষণ রকমভাবে চেপেছে বাবলুর। চায়ের দোকান থেকে উঠে সে হাঁটতে থাকে। কিছু দূরেই একটা দশতলা বিল্ডিং। ধবধবে সাদা। চারদিক থেকে নীল রঙের কাচের জানালায় ঢাকা। বাবলু জানে এ রকম বিল্ডিংয়ে বড়লোকরা চাকরি করে। বিল্ডিংয়ের

পাশের দিকে মোতা যায়, ধবধবে সাদা দেয়াল। সাদা দেয়ালে মুতলে খুব সুন্দর দাগ হয়– বাবলু নুনু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশা করে তখন। বিল্ডিংয়ের এপাশ থেকে দারোয়ানকে দেখতে পায় না বাবলু। এটা একটা ভালো সুযোগ। বাবলু প্যান্টের জিপার খুলতে যাবে, ঠিক তখন একটা মেরুন রঙের গাড়ি এসে থামে একেবারে ওর পাশ ঘেঁষে। বাবলু ছিটকে এক পাশে সরে যায়। গাড়ি থেকে নামেন এক ভদ্রলোক। নেমে হন্তদন্ত সোজা অফিসের মূলগেটের দিকে চলে যান। অফিসের কোনো বড় কর্তা হবেন হয়তো। ড্রাইভার গাড়িটা বাবলুর পাশেই পার্ক করে, একবার হাই তুলে, হেলতে-দুলতে চলে যায় মোসলেম মিয়ার চায়ের দোকানের দিকে। বাবলু কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং চোখ পড়ে গাড়িটার শরীরে। চকচকে নতুন গাড়ি। রং মেরুন হলেও, তার গায়ে স্পষ্ট চেহারার প্রতিফলন দেখা যায়। বাবলু নিজের চেহারাটা কয়েকবার, নানা ভঙ্গিতে দেখে নেয় গাড়িটার চকচকে শরীরে তাকিয়ে। তারপর ধীর পায়ে গাড়িটার পেছন দিকে চলে আসে সে, যেন ড্রাইভার ওকে দেখতে না পায়। বাবলু একটা বড় করে দম নেয়। তার হাফপ্যান্টের জিপার খুলে, নুনু বের করে, নাচিয়ে নাচিয়ে গাড়িটার গায়ে প্রস্রাব করতে থাকে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা ভঙ্গিতে নাচাতে থাকে তার ছোট্ট নুনু। আহ! এই শান্তি বাবলু কোনো দিন কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। গাড়ির মেরুন রঙের শরীর বেয়ে সড়সড় করে প্রস্রাব বেয়ে বেয়ে পড়তে থাকে। তাই দেখে বাবলু ফিক করে হেসে ওঠে। আহ! বড়লোকের গাড়ি।

– ওই মাদারচোদ-খানকির পো...

গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ বাবলুর কাণ্ড দেখে চা ফেলে ছুটে আসে। এত সাবধানতার পরও কীভাবে ড্রাইভারের চোখে পড়ল সে, কিছু বোঝার আগেই বাবলু প্যান্টের জিপার টেনে বন্ধ করে ফেলল, তখনো প্রস্রাব পুরোটা শেষ করতে পারেনি সে। কিছুটা প্যান্টের ভেতরটা ভিজিয়ে দিল বোধ হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাবলু এক দৌড়ে গলির মুখে ঢুকে অন্য গলিতে হাওয়া হয়ে গেল। ড্রাইভার বাবলুর টিকিটিও ছুঁতে পারল না।

২

অল্প অল্প করে রোদ বাড়তে শুরু করেছে। ব্যস্ত হয়ে পড়ছে শহরের অলিগলি। কিলবিল করছে মানুষ। কে কোথায় ছুটছে, কোন দিকে ছুটছে, কেন ছুটছে–কেউ কারওটা জানে না। আপাতদৃষ্টিতে সবাই কেবল ছুটছে, শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। ছোট এই শহরে মানুষ কেবল ছুটছে এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখছে–বিশাল অট্টালিকা থেকে শুরু করে নোংরা বস্তির চাটাই ঘরে, যে যেভাবে-যে রকমভাবে পারছে। টিকে থাকাই যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আদিম যুগে গুহার অন্ধকারে টিকে থাকার লড়াই শুরু করেছিল মানুষ, আজও তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার জিনে। শুধু টিকে থাকতেই গ্রাম থেকে ধেয়ে আসছে মানুষ শহরের দিকে। গ্রামে জীবন টিকছে না। সেখানকার মানুষগুলো যেন শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। চোখের মণি ফ্যাকাসে, হাতের নখ গাছের বাকলের মতো শুকনো খড়খড়ে, পায়ের পাতায় জমেছে শ্যাওলা। উপায় নেই। মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে হবে। শহরে বরং টিকে থাকা সহজ। চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা উপায়। মানুষের ভিড়ে–পায়ের তলায় পিষ্ট হলেও প্রাণ নিয়ে অন্তত টিকে থাকা যায় এখানে। অনাহার, ঘুমহীন, ক্লান্তিহীন, আশ্রয়হীন–তবুও টিকে আছে মানুষ এখানে। কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করে নিচ্ছে টিকে থাকার জন্য। কেউ কেউ টিকে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে নাগরিক হয়ে উঠছে। কারও কারও বদলেছে জামা, জুতার ফিতা, ঠোঁটের হাসি, মুখের ভাষা। কেউ কেউ শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। কারও কারও স্বপ্ন ছেঁড়া কাঁথার নিচে, দেশি মদের বোতলে, জুয়ার আড্ডায়, বেশ্যা নারীর আঁচলের নিচে। তবু টিকে থাকছে মানুষ। যেমন টিকে আছে বাবলুর মা খাইরুন বেগমও।

আলতাব মাঝি গ্রামের ভিটামাটির মায়া ছেড়ে তার পরিবার নিয়ে শহরে এসেছিল বছর আটেক আগে। পরিবার বলতে তার বউ খাইরুন বেগম ও একমাত্র শিশুছেলে বাবলু। বাবলুর বয়স তখন চার। বাপ-দাদার ভিটা ছেড়ে আসবে কি আসবে না–এই ভাবতে ভাবতে যখন গোলার ধান শেষ হয়ে এলো, মহাজনের সুদের টাকা বাকি পড়ে গেল, গোয়ালের দুইটা গরুর একটা মরে গেল– মাথায় যেন হাত পড়ল তার। হাতে টাকা নেই, নিজের জমি নেই, সারের দাম বেশি বলে জমি বর্গা নিয়ে পোষায় না, মহাজনের চড়া সুদ, কামলা খাটার মতো গ্রামে কাজ নেই। তাই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে, টিকে থাকতে তখন একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল তার–শহরের দিকে ছোটা। লঞ্চে চেপে পদ্মা পাড়ি দিলেই ঝলমলে শহর। চারদিকে মানুষ আর মানুষ। আর মানুষ মানেই সেখানে কোনো না কোনো কাজ আছে। কাজ থাকলেই উপার্জন।

লঞ্চের ডেকের কোনায় গুটিসুটি মেরে বসা আলতাব মাঝি যখন হাতের আঙুলের কড়ায় মুরগির খোঁয়াড়, পুকুরপাড়ের দুইটা কড়ুইগাছ, এক গোলা ধান ও গোয়ালের শেষ গরুটার বিক্রির টাকার হিসাব মেলাতে মেলাতে মগ্ন, খাইরুন বেগম আড়চোখে তাকিয়ে হঠাৎ জানতে চেয়েছিল,

–শহরে উঠবেন কই?

আলতাব মাঝি টাকার হিসাব আঙুলের কড়ায় রেখে উত্তর দিয়েছিল,

–উত্তর ভিটার মনু শেখ একটা ছাপড়াঘর ঠিক করে রাখছে।

–কাজ-কাম দিব কিছু?

–বলল তো, একটা ব্যবস্থা হবে।

–ভিটামাটি ছাড়া তো সব বেচে দিছেন।

–রেখেইবা লাভ কী?

এই উত্তরে খাইরুন বেগম আর কথা খুঁজে পায়নি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তীরের ফলার মতো লঞ্চের পানি কেটে যাওয়া ঢেউয়ের দিকে। পদ্মা ভীষণ শান্ত। পানির স্রোত নেই, নাব্যতাও তলানিতে। কিন্তু এই পদ্মাই আবার বর্ষায় অন্যরূপ নেয়, তীর ভাঙতে ভাঙতে ঢেউয়ের গর্জনে উত্তাল হয়ে ওঠে, যেমন এখন খাইরুনের বুকের ভেতরটা ভীষণ উত্তাল। আলতাব মাঝির কথার ওপর কথা বলার সাহস তার কোনোকালেই ছিল না। যদিও সে বোঝে, গ্রামে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শহর সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। যায়ওনি কোনো দিন। মানুষের মুখে গল্প শুনে শুনে কল্পনায়ও শহরের অবয়ব আঁকতে পারেনি কখনো। শহর কেমন, সেখানের মানুষগুলো কেমন, তারা কীভাবে কথা বলে, কী খায়–সে প্রশ্ন সে কখনোই করেনি আলতাব মাঝিকে। শুধু এক রাতে বিছানায় ওকাত হয়ে শুয়ে থাকা আলতাব মাঝির কাছে জানতে চেয়েছিল,

–শহরে যে যাবেন, ওইখানে থাকতে পারমু তো?

–পারমু না ক্যান? কাজ জোটাইতে পারলে ঠিকই পারমু।

–সবাই যে বলে, শহর নাকি আমাগো গাঁয়ের মতো না।

–এর জন্যই তো ওইটা শহর।

–ঢাকা শহর?

আলতাব মাঝি উত্তর দেয়নি নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল খাইরুন বেগম খেয়াল করেনি। সে আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। বাবলু অনেক ছোট। খাইরুনের খুব শখ ছিল বাবলুকে স্কুলে ভর্তি করাবে। গ্রামের মতি মাস্টারের একটা স্কুল আছে, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা আধচালা টিনের স্কুল। মতি মাস্টার একাই স্কুল চালান। ঘুরে ঘুরে একাই এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে গিয়ে বাচ্চাদের পড়ান। গ্রামের বাচ্চারা অ-আ আর নামতা শেখে সেখানে। মতি মাস্টার তার জন্য কোনো টাকাপয়সা নেন না। খাইরুন ভেবে রেখেছিল, আর একটা বছরে পা দিলেই মতি মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে বাবলুকে। কিন্তু এর মধ্যেই আলতাব মাঝি খাইরুন বেগমকে না জানিয়ে শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল। এমনকি খাইরুন বেগম জানতও না পুকুরপাড়ের দুইটা পুরনো কড়ুইগাছ বিক্রি করে দিয়েছে আলতাব মাঝি। করাতিরা যখন গাছ কাটতে এসেছিল, তখনই খাইরুন বেগম জানতে পেরেছিল গাছ দুটো বিক্রি হয়ে গেছে। তার পরদিন বিক্রি হয়ে গেল গোয়ালের শেষ গরুটা। আলতাব মাঝির কাছে জানতে চাইলে, সেদিন রাতে

সে জানতে পেরেছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। গ্রামে জীবন একেবারেই চলছে না।

গ্রামের ভিটায় ছোট ভাইসহ মা, বউ আর বাবলুকে নিয়ে ছিল আলতাব মাঝির সংসার। ছোট ভাই আর মাকে রেখে আলতাব মাঝি যখন লঞ্চঘাটে যাওয়ার জন্য ভ্যানে চেপেছিল, পেছন থেকে মা কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,

—আর কি ফিরবি না বাপ?

আলতাব মাঝি তার কোনো উত্তর দেয়নি। তবুও বৃদ্ধ মা শরীর টেনে টেনে বড় রাস্তার কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিল আলতাব মাঝিকে বিদায় দিতে। ছোট ভাই সঙ্গে ছিল মাল-বস্তা টানাটানির জন্য। ভ্যানে বসেই চোখ ভাসাচ্ছিল খাইরুন বেগম। সেই ভেজা চোখ লঞ্চে ওঠার পরও শুকায়নি। কেঁদেই যচ্ছিল সে।

আলতাব মাঝি কয়েকবার ধমক দিয়েও থামাতে পারেনি খাইরুন বেগমকে। তার কান্না পরে থেমেছিল মাঝ নদীতে আসার পর। মাঝ নদীতে পদ্মা এখন ভীষণ শান্ত। ঢেউ নেই, স্রোত নেই, জলের শব্দ নেই। কে জানে, হয়তো ম্যাড়মেড়ে পদ্মার এমন চেহারা দেখেই খাইরুন বেগমের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। অথচ, জন্মের পর থেকে খাইরুন বেগম কতই না যুদ্ধ করেছে এই পদ্মার ঢেউয়ের সঙ্গে। বর্ষায় স্রোতে নদীর পার ভাঙতে ভাঙতে দুইবার তাদের বাড়ির ভিটাও তলিয়ে গিয়েছিল পদ্মার ঢেউয়ের সঙ্গে। বাপ-চাচারা মিলে বাঁধ দিয়েও ঠেকাতে পারেনি পদ্মার ভাঙন। সেটা যদিও ছোটবেলাকার কথা। পরে তো বয়স চৌদ্দ পেরোনোর আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আলতাব মাঝির সঙ্গে।

সারা দিন পার করে লঞ্চ সদরঘাটে ভিড়েছিল বেলা তিনটার পর।

শহরে নেমে কিছুদিনের মধ্যেই একটা কাজ জোটাতে পেরেছিল আলতাব মাঝি। আসলে জুটিয়ে দিয়েছিল গ্রামের উত্তর ভিটার মনু শেখ। সে আলতাব মাঝির ছোটবেলাকার বন্ধু। সেই থেকে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান বাবলুকে নিয়ে শহরে টিকে থাকার প্রথম যুদ্ধটা শুরু করতে পেরেছিল আলতাব মাঝি। মনু শেখ তার পরিচিত একটা রিকশা গ্যারেজ থেকে একটা রিকশা জোগাড় করে দিয়েছিল আলতাব মাঝিকে। সেই দিয়ে শুরু। যদিও মাস সাতেক সে রিকশা চালিয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিল। গা-গতর আর পরিশ্রমে তার পোষাচ্ছিল না। কিন্তু শুরু হিসেবে এ-ই অনেক বেশি। গ্রাম থেকে যারা শুধু পেটে-ভাতে টিকে থাকতে ঢাকা শহরে আসে, তাদের জন্য প্রথম কাজ হিসেবে রিকশা চালানোই সহজলভ্য। কিন্তু জটিলতা একটাই, গ্যারেজ ম্যানেজ করা। পরিচিত যোগাযোগ ছাড়া রিকশা পাওয়া যায় না বললেই চলে। মনু শেখের পরিচিত গ্যারেজ ছিল বলেই আলতাব মাঝি বেঁচে গিয়েছিল। মাস সাতেকে সে খুব একটা টাকা জমাতে না পারলেও গ্রাম থেকে বেচাবিক্রির টাকাটা সে সযত্নেই আগলে রেখেছিল। সেই সঙ্গে রিকশা চালিয়ে সঞ্চিত অল্প কিছু টাকা। সেটাই পরে পুঁজি হিসেবে কাজে দিয়েছিল ছোট একটা চায়ের দোকান দিতে গিয়ে। কাজ আর টুকিটাকি ব্যবসার খুঁটিনাটি সে জেনে নিয়েছিল শাহবাগ চত্বরের চায়ের দোকানদার টুকু মিয়ার কাছ থেকে। রিকশা চালিয়ে প্রায় সময় সে টুকু মিয়ার দোকানে বিশ্রাম নিত। নিজের আগ্রহেই জিজ্ঞেস করে করে এটা-সেটা জেনে নিয়েছিল। টুকু মিয়া দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ। ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের। ব্যবহারও ভালো। আলতাব মাঝিকে সে বিশেষভাবেই পছন্দ করত। ফলে খুব সহজেই আলতাব মাঝি রিকশা চালানো ছেড়ে দিয়ে ছোট একটা চায়ের দোকান দিতে সাহস করতে পেরেছিল। টুকু মিয়াও দোকানের বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে প্রথমবার মালামাল তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি আলতাব মাঝির। মেধা ও বুদ্ধির সর্বোচ্চ খরচ করে একটু একটু করে ব্যবসাকে চালিয়ে নিতে পেরেছিল সে।

তারপর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। বাবলু এখন একা। এখন তার কেউ নেই। ঠিকানা নেই, সংস্থান নেই, জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই। যেন চৈত্রের লু হাওয়ায় এক টুকরো পলিথিন ব্যাগের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে সে বাতাসে বাতাসে। বাবা অলতাব মাঝি তাকে ছেড়ে চলে গেছে অনেক আগে, মা-ও অন্যের সংসারে এখন। সেখানেও বাবলুর ঠাঁই হয়নি। সেটা আরেকটা গল্প। ফলে বাবলুর এখন যেটা আছে, সেটা হলো শুধু প্রাণ নিয়ে এই শহরে কেবল টিকে থাকার সংগ্রাম। টিকে তাকে থাকতেই হবে। তবে এই টিকে থাকা জীবনটা ঠিক মানুষের মতো কি না, বাবলু সেটা জানে না। জানার ইচ্ছাও হয়নি কখনো।

বাবলু কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক হাঁটা হাঁটি করে। সকালের অর্ধেক প্যাকেট বিস্কুট পেট থেকে উধাও হয়ে গেছে। যদিও পকেটে এখনো এক শ আটচল্লিশ টাকা আছে। কিন্তু এই টাকা সে এখনই খরচ করতে চায় না। মোসলেম মিয়ার চা দোকানে দুই ড্রাম পানি টেনে দিলেই একটা পাউরুটি পাবে সে—এটা জানা কথা। শুধু কলাটা নিজের টাকায় কিনতে হবে। সেটাও ব্যাপার না। পকেটে টাকা আছে। একটা-দুইটা কলা কেনা কোনো ঘটনাই না। এ জন্যই মনে হয় আজকে মনটা উদাস উদাস লাগছে। পকেটে টাকা থাকলেই তার আলস্য বেড়ে যায়। এসব কাগজ-পলিথিন-ফেলে দেওয়া পানির বোতল-ভাঙা জিনিসপত্র কুড়াতে তার ভালো লাগে না। তাই আজ তার সিদ্ধান্ত, একা একা এই শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াবে। মাঝে মাঝে শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা লেকের ওপর ব্রিজে দাঁড়িয়ে বড় বড় বিল্ডিং দেখতে তার ভালো লাগে, বড় বড় মার্কেট, দামি দামি চকচকে গাড়ি, সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরা ছেলেমেয়ে। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করে এইসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে গিয়ে একটু কথা বলতে, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। বাবলু জানে, সেটা সম্ভব না। ওই সব ছেলেমেয়ের কাছে বাবলু একটা টোকাই। টোকাইদের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম নেই ওদের।

বাবলু বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। একটু একটু করে রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ছে। এখন স্কুলের সময়। এসময় শহরের ছেলেমেয়েরা গাড়ি করে স্কুলে যায়। তাই রাস্তায় গাড়ির খুব ভিড় থাকে। বাবলু সেসব গাড়ি দেখতে দেখতে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। মাঝে মাঝে সে কৌতূহলী চোখ নিয়ে গাড়ির গ্লাসের ভেতর উঁকি দেয়, বাচ্চাদের ভেংচি কাটে কিংবা চোখ বড় বড় করে হাত-পা ছুড়ে নাচ দেখিয়ে আবার দৌড়ে পালায়—চিড়িয়াখানায় বানররা যে রকম করে। বড়লোকদের ভেংচি কাটতে বাবলুর ভালো লাগে। যেমন ভালো লাগে বড় বড় বিল্ডিং, চকচকে গাড়ি, মসৃণ রাস্তায় প্রস্রাব করে দিতে। ভীষণ শান্তি লাগে তার—কেন লাগে বাবলু জানে না। বড়লোকের বাচ্চাদের, চকচকে গাড়ি কিংবা সুন্দর কিছুর প্রতি তার কোনো ঘৃণা আছে কি না, অনেকবার বাবলু ভেবেছে। না, নেই। বড়লোক মানেই তার কাছে অন্য প্রজাতির মানুষ। বাবলু জানে খোদা বড়লোকদের আলাদা করে বানিয়েছে। তাই তারা সুন্দর সুন্দর জামা পরে, চকচকে গাড়ি কেনে, বড় বড় বিল্ডং বানিয়ে থাকে। এখানে বাবলুর কোনো হাত নেই। তাই নিজের জীবন নিয়ে বাবলুর কোনো হতাশা বা দুঃখবোধ নেই; বরং সে তার জীবন নিয়ে যথেষ্ট খুশি। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তরই তার ছোট্ট মগজে মেলেনি কখনো—খোদা এই পৃথিবীতে দুই প্রজাতির মানুষ কেন তৈরি করেছিল?

বড় রাস্তার ডানদিকের গলিটা চলে গেছে অভিজাত আবাসিক এলাকার দিকে। মোড়ে একটা সিটি করপোরেশনের ডাস্টবিন। অভিজাত এলাকার ডাস্টবিনগুলো বাবলুর অপছন্দ। কেউ ঠিকমতো ময়লা ফেলে না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে চারদিকে। এটা না থাকলে এই এলাকাকে বাবলু স্বর্গই বলত। বাবলু নাক চেপে ডাস্টবিন পার হতে গিয়ে তার চোখে পড়ল একটা ফুলের তোড়া। দোমড়ানো-মোচড়ানো হলেও ফুলগুলো তখনো টাটকা। ডাস্টবিনের পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। কেউ বাড়ির ময়লার সঙ্গে ছুড়ে ফেলেছে এখানে। কাল রাতে আশপাশের কোনো বাড়িতে মনে হয় পার্টি ছিল। পার্টি কী জিনিস—বাবলু যদিও তা ভালো করে জানে না। তবে শব্দটার সঙ্গে সে পরিচিত। বড়লোকেরা পার্টিতে ছোট ছোট জামাকাপড় পরে গান ছেড়ে দিয়ে দল বেঁধে নাচে আর মাল খায়। মাল মানে মদ। সেটা সে শুনেছে নারায়ণের কাছ থেকে। সঙ্গে

আরও খারাপ খারাপ কথাও শুনেছে। সেখানে অনেক মেয়ে নাকি নেংটাও থাকে। ধুরু! সেসব কিছু এখন না ভেবে, বাবলু ফুলের তোড়াটি তুলে আনে ডাস্টবিনের পাশ থেকে। অনেকগুলো ফুল এখনো ভালো আছে। বাবলু সেখান থেকে একটা গোলাপ রেখে দিয়ে বাকি তোড়াটা আবার ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। এই একটা ফুল এখনো অনেক বেশি টাটকা আছে এবং বেশ বড়। বাবলু ফুলটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। এই আবাসিক এলাকাটা বাবলুর খুব পছন্দ। রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বাড়ির সামনে সাজানো বাগান, সেখানে সারা বছর ফুল ফুটে থাকে, কোনো কোনো বাড়ির সামনে ফোয়ারা থেকে কী সুন্দর পানির ঝিলিক ওঠে। বাবলু গেটের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সেসব হাঁ করে দেখে। দেখতে তার ভালো লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে, বাবলু একটা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে বাড়িটার মূল গেট হাঁ করে খোলা ছিল। বাবলু গেটের বাইরে থেকে ভেতরে উঁকি দেয়। হালকা আকাশি রঙের দোতলা বাড়িটার সামনে অনেকখানি জায়গা। তার মাঝখানে একটা ফুলের বাগান। এপাশের ছোট রাস্তায় একটা চকচকে সাদা গাড়ি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। চকচকে গাড়ি দেখলেই বাবলুর প্রস্রাবের বেগ পেয়ে যায়। তার ওপর গাড়িটা ধবধবে সাদা। ইশ্! গাড়িটার গায়ে যদি মুতে দেওয়া যেত, বাবলু আনমনে ভাবল আর মনে মনে একটু হাসল। ঠিক তখন তার চোখ গিয়ে পড়ল একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে, ঠিক যেন তার বয়সী। মেয়েটার গায়ে স্কুলের নীল রঙের ড্রেস। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে চুলের বেণি দুলিয়ে দুলিয়ে সাদা গাড়িটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। পেছন পেছন আসলেন মেয়েটির মা, হাতে স্কুলের ব্যাগ ও টিফিন ক্যারিয়ার-পানির ফ্লাস্ক। স্কুলে যাবে বলে মা কপালে চুমু খেয়ে মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে বাবলুর খুব ভালো লাগল। বাবলু জানে তারা বড়লোক। বড়লোকের বাচ্চাদের কপালেই এমনটি জোটে। বাবলুরও মা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে নেই। মায়ের নিজের ঘর আছে। মায়ের জামাই আছে। কিন্তু বাবলু তাকে বাবা বলে ডাকে না। বাবলু তার মার কাছে যেতে পারে না, তাই খুব বেশি দেখাও হয় না। বাবলু তার মাকে দেখতে গেলে তার সৎবাবা বাবলুকে মারতে আসে। গালিগালাজ করে। বাবলুর খুব ইচ্ছে করল মেয়েটির কাছে যেতে, মেয়েটিকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। মেয়েটির হাত নিশ্চয়ই তার হাতের মতো বিশ্রী রকম খসখসে না। বাবলুর মনে হলো, হাতের গোলাপ ফুলটি যদি মেয়েটির হাতে তুলে দেওয়া যেত– মেয়েটির হাতেই ফুলটি মানাতো ভালো। ফুল যে বাবলুর হাতে মানায় না, এটা বাবলু জানে। পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটিকে বাবলুর ভীষণ ভালো লেগে গেল। এই ভাবতে ভাবতে বাবলুর হঠাৎ কী যেন হলো। মাথায় একটা খেয়াল চেপে বসল তার। মুহূর্তেই বাবলু আন্দাজ করে নিল গাড়িটি মেইন গেট দিয়ে বের হয়ে রাস্তার কোন জায়গাটা দিয়ে যেতে পারে। সেই আন্দাজমতো সে দৌড়ে গিয়ে হাতের গোলাপটি রাস্তায় বিছিয়ে রেখে আসল–যদি মেয়েটির চোখে গোলাপটি পড়ে যায়! যদি মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে ফুলটি কুড়িয়ে নেয়–বাবলুর তখন খুব ভালো লাগবে! কিন্তু বাবলু আগের জায়গায় ফিরে এসে, রাস্তার পাশে একটা রেইনট্রিগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে গাড়িটি হুস করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। যাওয়ার আগে রাস্তায় পেতে রাখা গোলাপটিকে গাড়ির চাকাগুলো পিষে দিয়ে গেল বাবলুর চোখের সামনে। রাস্তায় পিষে যাওয়া ফুলটির দিকে তাকিয়ে বাবলুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটির মায়ের কথা ভেবে নিজের মায়ের কথা হঠাৎ করে খুব মনে পড়ে গেল বাবলুর।

৩

– থাকোস কই?

লোকটা ভুরু কুঁচকে তাকাল নারায়ণের দিকে। নারায়ণের সাহস গণি-আলফু-বাবলুর চেয়ে অনেক বেশি। কখনো কোনো কিছুতে ভয় পায় না সে, দেখতেও গাট্টাগোট্টা। লোকটা যখন দুপুরে ওদের তেহারি খাইয়ে নীলক্ষেত থেকে আজিমপুর কলোনিতে নিয়ে এসেছে, তখন থেকেই নারায়ণের মেজাজ খারাপ। লোকটাকে তার সুবিধার মনে হচ্ছে না এখন। সব দোষ আলফুর। তেহারির লোভে হুড়হুড় করে লোকটার সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল তেহারির দোকানে। নারায়ণ একবার 'যামু না' বলতে চেয়েছিল। কিন্তু গণিও যখন আলফুর পিছু পিছু তেহারির দোকানে ঢুকল, নারায়ণ আর না করতে পারেনি। অবশ্য উপায়ও ছিল না। তেহারির গন্ধে পেটের ক্ষুধাটা ততক্ষণে তারও চাগিয়ে উঠেছিল।

– কই থাকি, এইটা দিয়া আপনের কাম কী?

নারায়ণ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল। তারপর এক হাত নেড়ে নাকের সামনে উড়তে থাকা একটা মাছিকে তাড়াতে লাগল।

– আগে ভাষানটেক বস্তিতে থাকত। পরে ওর বাপ ওরে খেদায়া দিছে। এখন আমাগো লগে থাকে।

আলফু নারায়ণের হয়ে উত্তর দিয়ে দেয়।

– তুই?

– আমি আর গণি থাকি রায়েরবাজার বস্তিতে। সব সময় থাকি না। মাঝেমধ্যে যাই। ওইখানে ভাল্লাগে না। এর লাইগা আমরা একলগে থাকি। আমি, অয়, গণি আর বাবলু। আমরা চার ফ্রেন্ড।

– আরেকজন আছে? ওইটা কই?

আলফু মাথা চুলকায়। সে নিজেও ঠিক জানে না, বাবলু এই মুহূর্তে কোথায় আছে।

– বলতে পারি না। কাল সন্ধ্যায় কই জানি গেছিল, এরপর থেকে আর দেখা হয় নাই। তয় আজকে দেখা হইবই হইব। আমাগো ঘুইরা-ফিইরা ঠিকই দেখা হয়।

নারায়ণ মেজাজ খারাপ করে সবার কথা শুনছিল। সে বুঝতে পারছে না এই লোকটা কে। কেনইবা ওদের আদর করে তেহারি খাওয়াল। আর এখানে, এই ঘুপচি বস্তিতেইবা কেন নিয়ে এলো। আবারও মনে মনে আলফুর দোষ দিল সে। সব সময় আগে আগে বাড়ে আর বেশি কথা বলে। গণি সব সময়ই কম কথা বলে। আর কম কথা বলে বলেই সে গালিটা ভালো দিতে পারে। কথাগুলোই তার মুখে গালি হয়ে বের হয়। নারায়ণের ইচ্ছা করছিল গণিকে দিয়ে লোকটাকে কিছু গালি খাওয়াতে।

– আজকে কই দেখা হবে সবার?

লোকটা আবার প্রশ্ন করল ভুরু বাঁকিয়ে। নারায়ণ যেন আর ধৈর্য চেপে রাখতে পারল না, রাস্তার কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠল সে,

– সেইটা দিয়া আপনে কী করবেন? আপনে কি পুলিশ না মাস্তান? আমরা পুলিশ-মাস্তান ডরাই না।

লোকটা ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি তৈরি করে তাকাল নারায়ণের দিকে। এতক্ষণ ধরে সে কষিয়ে কষিয়ে পান চিবাচ্ছিল। হঠাৎ করে হাসির চোটে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানের পিক থুতুর মতো ছিটিয়ে পড়ল চারদিক। লোকটা ঠোঁটের কোণে পানের কষ মুছতে মুছতে বলল,

– আমি পুলিশ না। মাস্তানও না।

– তাইলে এত কথা জিগান ক্যান? আমাগো যাইতে দেন। কাম আছে।

লোকটা কথার আশপাশ দিয়ে গেল না, যেন সে শুনতেই পায়নি; বরং সরাসরি বলল,

– তোগো আমার দরকার। তোগো লগে একটা বিজনেস আছে। করলে ম্যালা ট্যাকার কাম।

এইবার নারায়ণ কিছুটা সিরিয়াস হলো। লোকটাকে বোঝার চেষ্টা করল। কী বিজনেস হতে পারে–সেটাও ভাবতে লাগল। আলফু একটা ভোদাই, মাথায় বুদ্ধি কম। ওকে দিয়ে যেকোনো কাজ করানো সম্ভব। গণিকে লোভ দেখালেই হলো। কিন্তু নারায়ণ সে রকম না। যেকোনো বিষয় সে আগে বোঝার চেষ্টা করে। আজকে

বাবলুটা সঙ্গে নেই। বাবলু থাকলে নারায়ণের সুবিধা হতো। বাবলুর মাথায় বুদ্ধি আছে। তাই নারায়ণ মাঝে মাঝে বাবলুর পরামর্শ নেয়। লোকটা আরাম করে গাল চুলকাচ্ছিল। আরও কিছু বলবে বলে মনে হয়। নারায়ণ সরু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। আগে সবকিছু ভালো করে শোনা দরকার। আলফুর মতো আগ বাড়িয়ে কিছু করার অভ্যাস নারায়ণের নেই। তা ছাড়া বাবলুর সঙ্গে পরামর্শ না করে নারায়ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। লোকটা গাল চুলকানো থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল,

– আমার লগে যদি কাম করোস, তাইলে কালকে আরেকবার আসিস। এইখানে। আবার তেহারি খাওয়ামু।

– আচ্ছা আসমু।

আলফু তড়িঘড়ি করে উত্তর দিয়ে দিল।

– তাইলে এখন যা। আমার নাম আব্দুল হক। মনে থাকব?

নারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিল না। সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল কলোনির ঘুপচি ঘর থেকে।

আবদুল হকের জন্ম পুরান ঢাকায়। ছোটবেলায় কাজ করতেন মোটর গ্যারেজে। পরে নিজেই একটা মোটরগাড়ির গ্যারেজ দিয়েছিলেন বিয়ের পর। যদিও প্রথমে ছোট পরিসরে, পরে সেটাকে তিনি আরও বড় করেছেন শ্রম আর বুদ্ধি খাটিয়ে। থাকেন আজিমপুর সরকারি কলোনিতে। তার দূরসম্পর্কের এক ভায়রা সরকারি অফিসার। কলোনিতে তার কোয়ার্টার ভাড়া নিয়ে আবদুল হক থাকেন। ভায়রা থাকে গুলশানে। এই কলোনির অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা কোয়ার্টার ভাড়া দিয়ে শহরের নামীদামি এলাকায় থাকে। ভায়রা সম্পর্ক বলেই আবদুল হক খুব সহজেই বাসাটা ভাড়া পেয়েছিলেন। নইলে সরকারি কোয়ার্টারে বাসা পাওয়া খুব কঠিন।

ধোলাইখালে আবদুল হকের গাড়ির পার্টসের দোকান। আর বাংলামোটরে তার গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টার। ধোলাইখালের হক সাহেব বললে পুরো ঢাকা শহরে তাকে এক নামে চেনে সবাই। পৃথিবীর এমন কোনো গাড়ি নেই যে তার পার্টস হক সাহেবের ওয়ার্কশপে পাওয়া যায় না। পাওয়া না গেলেও আব্দুল হক সেটা বানিয়ে দিতে পারেন। তা ছাড়া তিনি 'মোটরগাড়ি সার্ভিসিং সেন্টার মালিক সমিতির সভাপতি। বোঝাই যায় তিনি অনেক ক্ষমতাওয়ালা ব্যক্তি। বাবলু-আলফু-নারায়ণ-গণিরা এটা না বুঝলেও, এটা তারা বোঝে যে আব্দুল হকের অনেক টাকা। নইলে কেউ মাগনা খাওয়ায়? অন্তত এই তথ্য ওদের জানা নেই। আব্দুল হকেরও চোখ ভালো। খুঁজে খুঁজে বাবলুদেরই পেয়েছেন। শুধু বাবলুদেরই না, স্থানভেদে তিনি বিভিন্ন এলাকায় এ রকম টোকাই গ্রুপ তৈরি করে রাখেন। তাদের কাজে লাগান।

আব্দুল হক বিচক্ষণ ব্যক্তি। খুব অল্প সময়ে তিনি নামডাক করেছেন। শ্বশুরের যৌতুকের টাকায় তিনি ধোলাইখালে মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপ দিয়েছিলেন বছর সাতেক আগে। প্রথমে খুব একটা চলেনি ওয়ার্কশপ। ধারদেনা করেও সুবিধা করতে পারছিলেন না। পরে হক সাহেবের মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। তিনি বিভিন্ন এলাকায় টোকাই গ্রুপ তৈরি করলেন। দেশের রাজনৈতিক সংকটে হরতাল-অবরোধ হলে তিনি টোকাইদের রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। ওদের কাজ ছিল রাস্তায় গাড়ি পেলেই ঢিল মেরে গাড়ির গ্লাস ভাঙা। প্রতিটা গাড়ির জন্য তিনি টোকাইদের দিতেন এক শ টাকা করে। ব্যস। টোকাইরাও মহা উল্লাসে গাড়ির গ্লাস ভাঙায় মেতে উঠল। তার কিছুদিন পর থেকেই গাড়িওয়ালারা ছুটে আসতে লাগল হক সাহেবের ওয়ার্কশপসহ অন্যান্য সার্ভিসিং সেন্টারে। ফলে ওয়ার্কশপে গাড়ির গ্লাসের চাহিদা বেড়ে গেল। দামও বাড়ল। আব্দুল হকও চায়না থেকে ইমপোর্ট করা শুরু করলেন গাড়ির গ্লাস। হু হু করে ব্যবসাও বাড়তে থাকল। বুদ্ধিটা তার বছর পাঁচেক আগের। এর মধ্যেই তিনি ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। এখনো হরতালে তিনি টোকাইদের একই কাজে ব্যবহার করেন। টোকাইদের মধ্যে যারা একটু বড়, বুকে সাহস বেশি, তাদের হাতে তিনি এখন ধরিয়ে দেন গানপাউডার, একটা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে যথেষ্ট। তার জন্য তিনি দেন এক হাজার টাকা করে। সেই পোড়া গাড়িই আবার হক সাহেবের ওয়ার্কশপে আসে রিপিয়ারিংয়ের জন্য। ব্যস, আব্দুল হকের ব্যবসাও চলতে থাকে।

সামনে হরতাল আসছে। তাই আগে থেকে বাবলুদের তিনি তৈরি করে রাখতে চাইছেন।

আজিমপুর কলোনি থেকে বের হয়ে আলফু, গণি ও নারায়ণ বাবলুকে খুঁজতে থাকল। ওরা জানে খুঁজতে খুঁজতে বাবলুকে ওরা পেয়ে যাবে। গত রাতে বাবলু কোথায় ঘুমিয়েছে ওরা জানে না। কিন্তু যে যেখানেই থাকুক না কেন, ওদের গতিবিধি সীমিত কয়েকটি এলাকায়। বাবলু যে মাঝে মাঝে অভিজাত এলাকায় একা একা ঘোরাঘুরি করে, এটাও ওদের জানা। বাবলু বলে, ওই সব এলাকায় প্রস্রাব করতে তার ভালো লাগে। কত সুন্দর সুন্দর, কত বাহারি ডিজাইনের বাড়ি। ওই সব বাড়ির বাউন্ডারি দেয়ালে বাবলু প্রায়ই প্রস্রাব করে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা ডিজাইন করে দেয়াল ভেজায়। এই সব গল্প ও আবার আলফু-গণি-নারায়ণদের বলে। বলে বাবলু আরাম পায়। কেন পায়, তা সে জানে না। আলফু-গণি ও নারায়ণ এসব শুনে হেসে একজন আরেকজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। গণি তখন বাবলুর মাথায় টোকা মেরে বলে,

– বড়লোকগো বাড়ি-গাড়ি দেখলে বাবলুর নুনু চুলকায়। তাই মোতে।

আবার সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আলফু, গণি ও নারায়ণ হাঁটতে হাঁটতে ফুলার রোডে চলে এলো। এই রাস্তাটা ওদের বেশ পছন্দের। বিকেলবেলা এই রাস্তার দুইধারে ছেলেমেয়েরা জোড়া জোড়া বসে থাকে। এটা-সেটা খায়। বেশি খায় কোলা ড্রিংকস। ওরা কোলা বা পানির বোতল কুড়িয়ে নেয়। পরে ভাঙারি দোকানে গিয়ে সের দরে বেচে। ইনকাম খারাপ না। মাঝে মাঝে জোড়া ছেলেমেয়েরা ওদের এটা-সেটা খেতেও দেয়।

– তুই কালকে আবার আসবি বললি ক্যান?

নারায়ণ আলফুর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

– মাগনা তেহারি খাওয়াইলে যামু না ক্যান? তুই মাগনা তেহারি খাওয়াবি?

– বলল যে আমাগো লগে তার বিজনেস আছে? লোকটারে দেখেই আমার ধান্দাবাজ মনে হইছে।

– কী জানি, হইতেও পারে। আমি এত বুঝি না।

আলফু নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল।

– আমি যামু না, তোরা গেলে যা। তার লগে আমার কোনো নিজনেস নাই।

নারায়ণ হাত নেড়ে সাফ জানিয়ে দিল কথাটা। গণি এতক্ষণ চুপ ছিল।

– আমাগো লগে ধান্দাবাজি করলে আব্দুল হকের বিচি দুইটা টাইনা ছিঁইড়া ফালামু। শালা মাদারচোদ! আমাগো এখনো চিনে নাই।

নারায়ণ খিক খিক করে হাসতে থাকল। বলল,

– আলফুরটাও ছিঁড়িস, ওই শালার তেহারি খাওয়ার বেশি শখ।

ওরা ফুলার রোডের শেষ মাথায় একটা চায়ের দোকানের পাশঘেঁষা ফুটপাতে সারি হয়ে বসে, ফুল প্লেট তেহারিটা মনে হয় সবার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছিল। সবারই একসঙ্গে চায়ের তৃষ্ণা পেয়ে গেছে। নারায়ণ পকেট থেকে সিগারেট বের করে। বয়সে বড় বলে ও সিগারেট খায়। গণি মাঝে মাঝে সেখান থেকে দু-একটা টান নেয়। আলফু সিগারেট টানতেই পারে না, শুধু খুকখুক করে কাশে। কিন্তু বাবলু কখনো সিগারেট হাতে নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি। আলফু চা আনতে উঠে যেতেই নারায়ণ সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল,

– বাবলুরে আজকে খুঁইজা বের করতেই হবে। ওরে দরকার।

– ক্যান? কী হইছে?

গণি নারায়ণের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে এক টান দিয়ে আবার ফিরিয়ে দিতে দিতে জানতে চাইল।

– কারণ দুইটা। এক হইল, আব্দুল হকের কাছে কাইল তেহারি খাইতে যামু কি না, সেইটা নিয়া বাবলুর সঙ্গে পরামর্শ করা। হক ব্যাটার মতলব কী, আগে বোঝা দরকার। তারপর তেহারি...

– আরেকটা?

– আজ থেইকা আমরা রাতে এক লগে থাকমু। রাইতেও এক ছাদের নিচে ঘুমামু। আজকে বাবলুরে পাই না, কাইল তোরে পাই না, আরেক দিন আমারে খুঁইজা পাবি না–এখন থেইকা এই সব আর চলবে না।

ততক্ষণে আলফু চা নিয়ে এসেছে। নারায়ণের কথা শুনে গণি একটু অবাক হয়ে তাকাল,

– বাসা ভাড়া করবি নাকি? এ ছাদ কই পাইলি?

– সেইটা বলার জন্যই তো বাবলুরে খুঁজতাছি। বাবলু থাকলে ভালো হইত।

চায়ের সঙ্গে আলফুর হাতে একটা ছোট বিস্কুটের প্যাকেট। দাঁত দিয়ে সে প্যাকেটটা ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল, সেটা দেখে নারায়ণ খেঁকিয়ে উঠল,

– শালা, খানকিরপো। একটু আগে তেহারি খাইয়াও এখন তার বিস্কুটের ক্ষিধা লাগছে।

– বিস্কুট ছাড়া চা খাইতে ভাল্লাগে না।

আলফু প্যাকেটটা ছিঁড়ে বাকি দুইটা বিস্কুট নারায়ণ আর গণির দিকে দেয়। নারায়ণ আলফুর হাতের বিস্কুট হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলে,

– টাউন বাজারে আড়তের একটা ছাউনি পাইছি। রাইতে আমরা ওইখানেই থাকমু।

– কার ছাউনি?

গণি চায়ে বিস্কুট ডোবাতে ডোবাতে জানতে চায়।

– মিরণ কাকার। বুইড়ারে অনেক কষ্টে রাজি করাইছি। খালি কইছে, কোনো মাল যদি চুরি হয়, তাইলে প্রত্যেকের পাছায় একটা করে বাঁশ ঢুকায়া দিব।

নিজে বলে নিজেই খিকখিক করে হাসতে থাকে নারায়ণ।

কারওয়ান বাজারের বড় বড় পাইকারি আড়তগুলো মাঝরাতের পর থেকে আড়তে মাল তোলে বলে রাত-দিন এই সব আড়ত খোলা থাকে। ভোরের আগেই শহরের নানা এলাকা থেকে পাইকাররা এসে আড়ত থেকে মাল কিনে যার যার এলাকায় নিয়ে যায়। সে রকম পাইকারি একটা আড়তের মালিক মিরণ ব্যাপারী। তার আরও দুইটা ছোট ছোট আড়ত আছে কারওয়ান বাজারে। রাতে সেসব বন্ধ করে তিনি মূল আড়তে বসেন। নারায়ণ আগে এই আড়তে মাল তোলার কাজ করত। কিন্তু বয়সের তুলনায় বেশি পরিশ্রম বলে কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মিরণ ব্যাপারীর সঙ্গে নারায়ণের যোগাযোগ ছিল আগের মতোই। সন্ধ্যার পর ঘুপচি আড়তগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলে আড়তের বারান্দায়, খোলা জায়গায় জুয়াড়ি আর নেশাখোরদের আড্ডা বসত আগে। অনেকে আবার রাস্তার পতিতা ভাড়া করে নিয়ে আসত। হাতে টাকাপয়সা কম থাকলে কয়েকজন মিলে একজন পতিতা নিয়েও রাত পার করত। মাঝে মাঝে গাঁজার আসরে গান-বাজনাও হতো। ফলে আড়তের যারা কর্মচারী রাতে আড়তের ছাউনির ভেতরে ঘুমাত, তাদের রাতের ঘুম বলতে গেলে হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাই গেল কয়েক বছর হলো, মার্কেট কমিটি ছোট আড়তগুলোতে রাতের বেলা আনসার নিয়োগ করেছে। তারপর থেকে সেই উপদ্রব এখন আর নেই। রাতের বেলা পুরো আড়ত একরকম ফাঁকাই পড়ে থাকে। সেখানেই মিরণ ব্যাপারীর আড়তের খুপরিতে নারায়ণ রাতের ঘুমানোর জায়গা হিসেবে বন্দোবস্ত করতে পেরেছে। শর্ত শুধু, মাঝেমধ্যে মিরণ ব্যাপারীর বড় আড়তের টুকটাক কাজ করে দিতে হবে। সে না হয় ওদের চারজনের কেউ না কেউ করে দিতে পারবে–এই ভেবে নারায়ণ মিরণ ব্যাপারীকে নিশ্চিত করে জায়গাটা নিয়েছে। তারপরও বিষয়টা নিয়ে বাবলুর সঙ্গে একটু আলাপ করার দরকার আছে নারায়ণের। কিন্তু আজ সারা দিন বাবলুকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না ওরা।

– শালার বেটা, বড়লোকগো পাড়ায় গেছে। আবার ওর নুনু চুলকানি উঠছে।

চা শেষ করে গণি বিরক্তি নিয়ে বলল।

– গেলে গেছে। মুইতা আবার ফিইরা আসব। টেনশনের কী?

আলফু পিচ করে রাস্তায় থুতু ফেলল একবার। চা খাওয়ার পর এটা একটা বদভ্যাস আলফুর।

– চল, তাইলে ওইদিকে গিয়ে বাবলুরে খুঁজি...

নারায়ণ সবাইকে প্রস্তাব দিল অভিজাত এলাকার দিকে যাওয়ার। কিন্তু সেখান পর্যন্ত তাদের আর যেতে হলো না বাবলুকে খুঁজতে। তার আগেই কাঁটাবনে দেখা হয়ে গেল বাবলুর সঙ্গে। বাবলু অভিজাত এলাকা থেকে অনেক আগেই ফিরেছিল। পরে এদিকে না এসে চলে গিয়েছিল কমলাপুর, তার মাকে দেখতে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি বাবলুর। রেলওয়ে কলোনিতে ঢুকে মায়ের বাসার চৌহদ্দিতে পা রাখার আগেই বাসার ভেতর থেকে মোখলেস পুলিশের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল সে। বুকের ভেতর কলিজা শুকিয়ে গিয়েছিল তার। ফলে আর ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি, মাকে ডাকার সাহস হয়নি বাবলুর। বাসার বাইরে, একটু দূরে কিছুক্ষণ একা একা বিষণ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছিল সে। শাহবাগ-কাঁটাবনের দিকে নারায়ণদের দেখা পাবে বলে এদিকটায় সে একা একা ঘোরাঘুরি করছিল। তখনই নারায়ণরা সবাই একসঙ্গে বাবলুকে দেখতে পেয়েছে কাঁটাবন মসজিদের মোড়ে।

নারায়ণ, গণি, আলফু ও বাবলু। ওরা চার বন্ধু। বাবলু প্রথমে ওদের বন্ধু ছিল না। পরে ওরাই বাবলুকে ওদের দলে টেনে নিয়ে বন্ধু বানিয়েছিল। বাবলুর সঙ্গে ওদের তিনজনের পরিচয়ের একটা গল্প আছে।

৪

বাবলুর বাবা আলতাব মাঝি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার পর, গায়ে খাটার কাজ পেয়েছিল। দিনচুক্তি কামলা। বছরখানেকের মধ্যেই গায়ে খেটে-পিঠে সয়ে কিছু টাকা জমিয়ে রাস্তার পাশে, ড্রেনের ওপর একটা চা-পান-বিড়ি-বিস্কুটের টং দোকান দিতে পেরেছিল সে। যদিও অল্প পুঁজি, কিন্তু নিজের দোকান। একটু একটু করে ব্যবসা ভালো চলছিল। বাবলুর মা খাইরুন বেগম গ্রামের তীব্র অভাব-অনটনের কথা ভুলে গিয়ে এই শহরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বাবলুকে দিয়েছিল বস্তি এলাকায় এনজিওর একটা স্কুলে। চায়ের টং দোকানের সুবাদে দোকানের আশপাশের দু-চার অফিসের পিয়ন, সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে আলতাব মাঝির বেশ ভালো ভাই-খাতির হয়ে গিয়েছিল তত দিনে। একটু পড়াশোনা শিখে বাবলু বড় হলে এসব অফিসেরই কোনো একটিতে চাকরি পাবে– এমন স্বপ্ন মনে মনে বুনতে শুরু করেছিল আলতাব মাঝি। মাঝে মাঝে সে নিজের দোকানের দিকে তাকাত আর মনে মনে ভাবত, দোকানটাকে একটু বড় করা দরকার। কাস্টমার তো তার দিন দিন বাড়ছে। দোকান বড় করতে হলে পুঁজিও দরকার। এই নিয়ে ছিল আলতাব মাঝির রাত-দিন চিন্তা। এর মধ্যেই 'মাঝি' পদবি ছেড়ে আলতাব হয়ে গেল আলতাব মিয়া। চেহারার জেল্লা বাড়তে থাকল, লম্বা চুল রাখল। চুলে ঝুঁটি করে চায়ের দোকানে বসত। লম্বা চুলের ঝুঁটির জন্য কাস্টমাররা আলতাবকে পছন্দ করত। কাস্টমার বলতে শহরের রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যানচালক, সিএনজি ড্রাইভার এমনকি মাঝে মাঝে স্কুল-কলেজের সদ্য সিগারেটের অভ্যাস করা ছেলেরা, আশপাশের অফিস-আদালতের ছোটখাটো বাবুরাও এসে চা খেত আলতাব মিয়ার চায়ের দোকানে।

কিন্তু একদিন–একটু-আধটু টাকার মুখ দেখতে না দেখতেই আলতাব মিয়া তার টং দোকানের পাশের কোনো এক অফিসের সিকিউরিটি গার্ডের মেজো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলল। সন্ধ্যার টিমটিমে আলোয় বাবলু তখন বিছানার ওপর স্কুলের পড়া পড়ছিল। বাবলুর মা খাইরুন বেগম কাঁথায় ফুল তুলছিল। এমন সময় আলতাব মিয়ার সদ্য বিয়ে করা বউকে দেখে খাইরুন বেগম কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। এ কে? যখন জানল ঘরে সতীন এসেছে, বাবলুর মা 'ও আল্লাগো' চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সিকিউরিটি গার্ড হারুন মিয়া আলতাবকে বেশ পছন্দ করত বলেই মেয়েকে তুলে দিয়েছে তার হাতে, সঙ্গে কিছু অর্থকড়ি যাতে আলতাব মিয়া দোকানটাকে আরেকটু বড় করতে পারে। নিজেরই মেয়ের জামাই তো। দোকান আরও বড় হলে তার মেয়েই সুখে থাকবে। হয়তো এই টাকার লোভে কিংবা টং দোকানটাকে বড় করার স্বপ্নেই আলতাব মিয়া এই বিয়েতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু হারুন মিয়ার এক কঠিন শর্ত তাকে মানতে হয়েছিল। আগের ঘরের বউ ও ছেলেকে রাখা যাবে না। আলতাব মিয়া ভেবে দেখল, শহরে টিকে থাকাই আসল। বউয়ের বদলে তো সে আরেকটা বউই পেয়েছে। বছরখানেকের মধ্যে সন্তানও সে নিতে পারবে। মাঝখানে তার দোকানটা বড় হবে, ব্যবসা বাড়বে, বস্তিঘর ছেড়ে সে টিনের চালাঘরে উঠবে।

সেই থেকে বাবলু ও বাবলুর মা ঘরছাড়া। বাবলুর বাবা আলতাব মিয়া আর কোনো খোঁজ রাখেনি বাবলু বা বাবলুর মায়ের।

প্রথম কয়দিন বস্তির এক খালার এক রুমের ঘরটায় থেকে খাইরুন বেগম তার একমাত্র ছেলে বাবলুকে নিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। খাইরুন বেগম বুঝে গিয়েছিল এই বস্তিতে তার আর বাবলুর ঠাঁই নেই। বস্তির প্রতিটি ঘরের মানুষ জানে এই কাহিনি। কিন্তু কেউ একটু সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসেনি। আসবেই বা কী করে? প্রত্যেকের জীবনের গল্পই তো নানা কাহিনিতে ভরা। কে কাকে সহানুভূতি জানাবে? তা ছাড়া এ রকম ঘর থেকে বের করে দেওয়া মহিলাদের সংখ্যা এই বস্তিতে নেহাতই কম নয়। তাই এই কাহিনিতে খাইরুনের ঘটনায় কেউ গা করেনি।

রাস্তায় বের হয়ে খাইরুন বেগম ও বাবলুর কিছুদিন চলল রাস্তার মানুষের কাছে হাত পেতে। তখন বাবলুর বয়স সাত কি আট। কোনো রকম খেয়ে-পিঠে চলছে। বড় সমস্যা থাকা নিয়ে। এত বড় আকাশের নিচে কোথায় ঘুমাবে তারা! রাত হলেই যেন ভারী আকাশটা চেপে বসে খাইরুন বেগমের শরীরের ওপর। কিছুদিন নির্ঘুম রাত কাটিয়ে ওরা চলে এসেছিল রেলস্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে কত মানুষ তাদেরই মতো। ছেলে-বুড়ো-জোয়ান। তাদেরই এক কোনায় বাবলুকে নিয়ে জায়গা হয়েছিল খাইরুন বেগমের।

খাইরুনের শরীর তখনো ফুরিয়ে যায়নি। দেখতেও খারাপ না। মাঝারি স্বাস্থ্য। গায়ের রঙ একটু চাপা হলেও খুব সহজে চোখে পড়ে। এ রকম যৌবন নিয়ে এক যুবতী তার শিশু ছেলেকে নিয়ে রেলস্টেশনে সংসার পেতেছে, আশপাশের ছেলে-ছোকরাদের চোখে পড়াটাই স্বাভাবিক। এ যেন তাদের জন্য আশীর্বাদ। এ রকমটি তাদের খুব একটা চোখে পড়ে না। তাই তারা কারণে-অকারণে খাইরুনের আশপাশে ঘুরঘুর করে। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে চায়। বাবলুর দিকে খেয়াল রাখে। তাদের চোখ কেবল খাইরুনের দিকে। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যারা সংসার পাতে তাদের মুখশ্রী দেখলেই বোঝা যায়। ও মুখেদের দিকে রস নিয়ে তাকানো যায় না। কিন্তু খাইরুনের বেলায় সে রকম না। দেখলেই বোঝা যায়, এ নিতান্তই বিপদে পড়ে রেলস্টেশনে সংসার পেতেছে কিংবা শহরে নতুন, থাকার জায়গা নেই।। প্ল্যাটফর্মেও অন্যান্য মুখশ্রী থেকে খাইরুন যেন আলাদা। কয়েক দিনের মধ্যেই খাইরুন সেটা টের পেয়ে গেছে। খাইরুন প্ল্যাটফর্মের যে পিলারের পাশে চাটাই বিছিয়েছে, তার পাশেই থাকে এক বুড়ি। দিনভর ভিক্ষা করে রাতের ঘুম এইখানে। প্রথম কয়েক দিন বুড়ি খাইরুনকে দেখে কিছু জানতে চায়নি, শেষে না জিজ্ঞেস করে একদিন পারল না,

– ও বেটি! তোর বাড়ি কই?

খাইরুন কোনো উত্তর দিল না। বাবলু আশপাশে নেই। কোথায় গেছে খাইরুন জানে না। হয়তো মানুষের কাছে চেয়ে-চিন্তে কয়টা টাকা নিয়ে আসবে। এ কয়দিন মায়ের সঙ্গে রাস্তায় চলতে চলতে হাত পেতে চাওয়ার সিস্টেমটা বাবলু আয়ত্ত করে নিয়েছে। কারণ বাবলু বুঝে গেছে, এভাবেই চেয়ে-চিন্তে টিকে থাকতে হবে। নইলে খাবারের জোগাড় নেই।

– কথা কস না ক্যা? সোয়ামি কই?

– খেদায়া দিছে।

খাইরুন বুড়ির দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল।

– সেইটা তো আমি প্রথমবেলা দেইখাই বুঝছি। পোলা কি এই একটাই?

– হ।

– আহারে পোলাডা কত সুন্দর। বড়ই মায়া লাগে।

খাইরুন কোনো উত্তর দেয় না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রেললাইনের দিকে। এই রেললাইনটা সোজা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, কে জানে। একটু পর মনে হয় কোনো ট্রেন ছেড়ে যাবে। লোকজন ব্যাগ-লাগেজ-বস্তা নিয়ে স্টেশনে আসছে। এ সময়টা লোকজনের খুব চাপ থাকে। বুড়ি একনাগাড়ে বকবক করেই যেতে থাকে,

– মারে, সংসার যে এইখানে পাতছোস, বেশিদিন টিকতে পারবি না। জায়গাটা ভালো না। এই বয়সে কম তো দেখি নাই। অন্য কোথাও যা গা...

কথাগুলো খাইরুন শুনে না শোনার ভান করে স্টেশনে আগত যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পৃথিবীতে খোদা কত রকমের মানুষ বানিয়েছে। কারও চেহারার সঙ্গে কারও কোনো মিল নাই। সবাই যে যার গন্তব্যে যাচ্ছে। শুধু তার কোনো গন্তব্য নেই। খাইরুনের চোখ ভিজে আসে।

– ওই মাতারি, কী কই শুনছোস? অন্য কোথাও যা গা...

খাইরুন এইবার বুড়ির দিকে তাকায়।

– ক্যান?

– কী কইছি শুনোস নাই? এই জায়াগা ভালো না। টিকতে পারবি না।

– ক্যান, কী হইছে?

– তোর মাথায় কি বুদ্ধি নাইরে মাতারি? এই জায়গাডা ভালো না। বুঝোস নাই? তোরে খাবলায়া খাবলায়া খাইব। তোর রূপ আর গতরের স্বাস্থ্য-গোস্তই হইল তোর কাল। আশপাশের জোয়ান পোলাগো নজর পড়ছে। বুঝোস নাই?

– না, বুঝি নাই।

খাইরুনের একটু রাগ লাগে। কেন তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে? কেন তাকে জোয়ান ছেলেরা খুবলিয়ে খাবে? কী অপরাধ তার? স্বামীর কাছেই বা কী অপরাধ ছিল? কেন তাকে তাড়িয়ে দিল তার স্বামী? কেন তার ঘরে সতীন এনে তুলল? কিসের অভাব ছিল আলতাব মিয়ার? খাইরুন কোনো উত্তর খুঁজে পায় না।

– তোর রূপ-যৌবন তো ভালো। পোলাপান চাইট্টা চাইট্টা খাইব। দেখোস না, সবাই খালি তোর দুধের দিকে তাকায়া থাকে। দুধও বানাইছোস মাতারি, এক্কেবারে কচি ডাবের মতন...

বুড়ি ফোকলা দাঁতে খিক খিক করে হাসতে থাকে।

খাইরুন আর কথা বাড়ায় না। জানতেও চায় না কিছু। এইখানে ঠাঁই জুটেছে, এইখানেই থাকবে সে। আর যাবেই বা কোথায়? এদিকের লাইন খালি হয়ে গেছে। একটু আগে যে প্যাসেঞ্জারগুলো এসেছিল, ভিড় ছিল, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম খালি। অন্য লাইনে ট্রেন এসেছে। যাত্রীরা নামছে। ততক্ষণে বুড়ি উঠে চলে গেছে তার ভিক্ষার থলেটি নিয়ে। এখন খাইরুন একা বসে আছে। বাবলুর এখনো ফেরার নাম নেই। এই লাইনে আর কোনো ট্রেন

আসবেও না, যাবেও না। তাই এই লাইন ঘেঁষে প্ল্যাটফর্মের অস্থায়ী বাসিন্দারা আসতে শুরু করেছে। যে যার জায়গামতো ঘুমাবার আয়োজন করছে। খাইরুন তাদের এক এক করে দেখে। কারা তাকে খুবলিয়ে খাবে? যারা প্ল্যাটফর্মে ঘুমানোর আয়োজন করছে তাদের বেশির ভাগই দিনমজুর বা ভিক্ষুক। সকলেই প্রায় পৌঢ় বয়সী। ছেলে-ছোকরাও যে নেই, তা নয়। তারা এত সকালে ঘুমানোর আয়োজন করে না। তারা আসে রাত একটু গভীর হলে। পিলারের কোনায় কোনায় বা রেললাইনে বসে গাঁজা বা হেরোইন খায়। খেয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। গত কয়েক দিনে খাইরুন অনেক কিছুই দেখেছে বা শিখেছে। বুড়ির কথা যে খাইরুন ফেলে দিয়েছে তা-ও নয়। কিছু উঠতি ছেলে-ছোকরা যে কয়দিন ধরে তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, এটা সে ভালোই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তারই বা কী করার আছে? এখান থেকে সে যাবে কোথায়?

বাবলু ফিরেছে। এক হাতে একটা মুড়ির ঠোঙা। ফিরেই সে মার হাতে বাইশ টাকা তুলে দেয়। হাত পেতে পেয়েছে সে। খাইরুন কিছু বলে না। বাবলু মার পাশে বসে।

হঠাৎ হুইসেল বেজে ওঠে। খাইরুন জানে, এটা রেলপুলিশের হুইসেল। কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মজুড়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে যাবে। কিন্তু যারা প্ল্যাটফর্মে বিছানা পেতে শুয়ে আছে প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা করে চাঁদা তুলবে। গত কয়েক রাত খাইরুনও দিয়েছে। প্রথম প্রথম এই নিয়মটা বুঝতে পারেনি খাইরুন। প্রথম দিন তো এক মাঝবয়সী পুলিশের এক ঘা-ও খেয়েছে। এখন সে নিয়মিত চাঁদা দেয়। হুইসেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে দশ টাকার একটা নোট হাতের মুঠোয় পুরে রাখে। পুলিশ এলেই যেন হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে পারে। বাবলু এখনো রেলপুলিশের হুইসেলে অভ্যস্ত হতে পারেনি। হুইসেল বাজলেই বাবলু কেমন জড়সড় হয়ে যায়।

আজকের রেলপুলিশটা তাগড়া জোয়ান। একে আগে দেখেনি খাইরুন। প্ল্যাটফর্মের এক কোনা থেকে পুলিশটি টাকা তুলতে শুরু করে। এক হাতে লাঠি নাচায় আর মুখে হুইসেল বাজাতে থাকে। যেন প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকা তোলা খুব আনন্দের কাজ। জোয়ান পুলিশটি খাইরুনের সামনে আসতেই খাইরুন হাতের মুঠো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশটি একটু যেন থমকে যায়। তাকিয়ে থাকে খাইরুনের দিকে। বুঝতে পারে এই যুবতী প্ল্যাটফর্মের মানুষ না। খাইরুন হাতের মুঠো বাড়িয়ে টাকা ধরে থাকে। তার বুক ঢিপ ঢিপ করে। পুলিশ এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? খাইরুনকে এখান থেকে উঠিয়ে দিবে নাকি?

– নতুন নাকি?

খাইরুন মাথা নিচু করে মাথা নাড়ে।

– গ্রাম থেইকা আইছোস?

– জে না।

– তাইলে?

– সোয়ামি খেদায়া দিছে।

পুলিশটি রেললাইনের দিকে পিচ করে থুতু ফেলে। হাতের লাঠিটি বাবলুর পেটে খোঁচা দিয়ে বলে,

– পোলা কি তোর?

– হ।

পুলিশটি আবারও পিচ করে রেললাইনে থুতু ফেলে। হাতের লাঠিটি আরও বেশি করে নাচাতে থাকে।

– থাক তোরে টাকা দিতে হইব না। আইজ থেইকা তুই ফ্রি...

বলেই পুলিশ পাশের ভিক্ষুক বুড়ির কাছে গিয়ে টাকা নিল। তারপর চলে গেল পরের পিলারটির কাছে। হুইসেল বাজিয়েই চলেছে সে। তাই দেখে বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসে।

– তুই তো বাঁইচা গেলিরে মাতারি। তোর ওপর পুলিশের নজর পড়ছে।

– কী কন?

– বোঝোস নাই? তোরে ফ্রি থাকতে দিছে। আমার কি আর তোর মতো রূপ-যৌবন আছে যে ফ্রি থাকতে দিব?

বুড়ি খিক খিক করে হাসতে থাকে। খাইরুন কোনো উত্তর দেয় না। বাবলু ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত একটু বাড়লে প্ল্যাটফর্মে ছেলে-ছোকরাদের আনাগোনা শুরু হয়। ওরা সাধারণত আসে পুলিশ চলে যাবার পর। ওরা পুলিশকে কোনো চাঁদা দেয় না। পুলিশও ওদের খুব একটা ঘাঁটায় না। পুলিশের নজর প্ল্যাটফর্মে যারা কাপড় বা চাটাই বিছিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করে তাদের ওপর। কয়েকটা ছেলে-ছোকরা খাইরুনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। আড়চোখে তাকায়। খাইরুন গায়ের কাপড় আরও ঠিকঠাক করে। এই যন্ত্রণা তাকে প্রতিদিন সহ্য করতে হয়। এর মধ্যে কালো করে একটা জোয়ান ছেলে আছে। ওর দিকে তাকালেই খাইরুনের বুকটা হিম হয়ে আসে। ছেলেটা কীভাবে যেন খাইরুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শরীরের ঠিক কোথায় তাকাচ্ছে, খাইরুন বুঝে উঠতে পারে না। সে আরও বেশি আড়ষ্টবোধ করে। কালোমতো ছেলেটা আজ নেই। কিন্তু তার জায়গায় জুটেছে নতুন দুজন। তারা খাইরুনকে ঘিরে পাক খেতে থাকে। খাইরুনের ভয় করে। বুড়িটাও ঘুমিয়ে গেছে। নইলে বুড়িকে ডাকা যেত। ছেলে দুটো যেন তার কাছে আসতে চাইছে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের অনেকেই এখনো ঘুমায়নি। ঘুমানোর আয়োজন করছে। তাই হয়তো কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে গেলে যদি কাছে আসে? গায়ে হাত দেয়? খাইরুন তখন কী করবে?

হুইসেল বাজাতে বাজাতে সেই পুলিশটি খাইরুনের দিকে আবার এগিয়ে আসতে থাকে। পুলিশটিকে দেখে ছেলে দুটো সরে যায়। একসময় তাদের আর দেখা যায় না। খাইরুনও বুকে একটু সাহস পায়। একবার ভাবে, পুলিশটিকে সব খুলে বলবে কি না... কিন্তু বলে কী লাভ? পুলিশ কেন তার কথা শুনবে? প্ল্যাটফর্মে ফ্রি থাকতে দিয়েছে–এটাই তো বেশি। ততক্ষণে পুলিশটি খাইরুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

– নাম কী তোর?

– খাইরুন বেগম।

– আইচ্ছা। তোর কোনো ডর নাই। কেউ তোরে এইখানে কিচ্ছু কইব না। আমি আছি। আমার নাম মোখলেস।

বলেই পুলিশটি আবার হুইসেল বাজাতে বাজাতে চলে যায়। খাইরুন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আসলেই খাইরুন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এর পরের কয়দিন ছেলে-ছোকরারা আর তার ধার ঘেঁষেনি। বলতে গেলে ধার ঘেঁষার সুযোগ পায়নি। কেউ খানিকটা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে গেলেই কোথা থেকে মোখলেস পুলিশ এসে হাজির। দিন নেই রাত নেই মোখলেস পুলিশ খাইরুনকে পাহারা দিয়েই চলেছে। কিছু দিন যেতেই বিষয়টা খাইরুনের নজরে এলো। তত দিনে বুড়ির সঙ্গে খাইরুনের একটু সখ্য হয়েছে। একদিন বুড়িকে বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বুড়ি ফোকলা মুখে খিক খিক করে কিছুক্ষণ হাসল,

– বুঝলি না মাতারি, যত দিন তোর শরীরে ওই স্বাস্থ্য-গোস্ত আছে, তত দিন তোর নাগরও আছে।

আবারও বুড়ি খিক খিক করে হাসতে লাগল। ইদানীং বুড়ির এই খিক খিক হাসিটা খাইরুনের বড় অসহ্য লাগে। কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেই গা-গতর নিয়ে খোঁচা দিবে আর খিক খিক করে হাসবে।

হাসার কারণটা অবশ্য কদিন পরেই টের পেল খাইরুন বেগম।

এক বিকেলে একটা গরম মোগলাই পরোটা নিয়ে মোখলেস পুলিশ হাজির। কোনো ভূমিকা না করেই বসে পড়ল খাইরুনের পাশে। এদিকে বুড়ি নেই। বাবলুও কোথায় গেছে কে জানে। খাইরুনের আড়ষ্ট হবার কথা, কিন্তু হলো না। কারণ দিনের পর দিন এই মোখলেস পুলিশই তাকে স্টেশনের ছেলে-ছোকরাদের হাত

থেকে আগলে রেখেছে। তাই খাইরুনের একটা ভরসা তৈরি হয়েছে মোখলেস পুলিশের ওপর।

– মোগলাই খাবি?

খাইরুন মোখলেস পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বহুদিন তাকে এইভাবে কেউ খাবারের কথা বলেনি।

– এই নে খা। আমার বড়ই প্রিয়। চান্স পাইলেই খাই।

খাইরুন এক টুকরো পরোটা মুখে দেয়।

– তোর সোয়ামি তোরে ভাগায়া দিল ক্যান?

– হে আরেকটা বিয়া করছে।

– হ। আমি এইটাই আন্দাজ করছিলাম। আমারও তোর মতো কপাল পোড়া। আমি আমার বউরে ভাগায়া দিই নাই। কিন্তু হে গেছে গা...

– ক্যান?

– গেছে গা মানে হইল নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরছে।

– হায় আল্লা! কন কী?

– হ। আমি বউরে মারি নাই, কাটি নাই। একটা ফুলের টোক্কাও দিই না। ক্যান যে গলায় দড়ি দিল! মাবুদ আল্লা জানে। সেই থিকা আমি একলা। কে আমারে রাইন্ধা দেয়! কে বাইড়া দেয়! কেউ নাই।

– খুবই আফসোসের কথা।

– খাইরুন! আমি তোরে বিয়া করতে চাই। আমার ঘর আছে, খাট আছে। চাল-চুলা সব আছে। খালি দেখোনের কেউ নাই।

খাইরুন চমকে ওঠে। এ কেমন কথা! এভাবে কেউ বিয়ের কথা বলে? এভাবে কি বিয়ে করা যায়? খাইরুন আবার বিয়ে বসবে–এ রকম চিন্তা তার মাথাতেও কখনো আসেনি। তা ছাড়া তার তো বাবলু রয়েছে। সারা জীবন বাবলুকে নিয়েই কাটিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিল খাইরুন। মাঝখানে কোথা থেকে কোন মোখলেস পুলিশ এসে তাকে কী কথা শোনাল! খাইরুন যেন কিছুই ভাবতে পারছে না। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ততক্ষণে মোগলাই পরোটা খাওয়া শেষ। মোখলেস পুলিশ দুইবার হুইসেল বাজিয়ে উঠে চলে যায় খাইরুনের উত্তরের অপেক্ষা না করে। যেন খাইরুনকে ভাবার জন্য সময় দিয়ে গেল। খাইরুন যে খুব বেশি সময় পেল ভাবনার জন্য তা-ও না। তার পরের সপ্তাহেই মোখলেস পুলিশ কাজি ডেকে খাইরুনকে বিয়ে করে ঘরে তুলল এবং বাবলুকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে মোখলেস পুলিশ কেনইবা পালবে? সেই থেকে বাবলুর জীবন শুরু হলো রাস্তায়-স্টেশনে-পার্কে কিংবা বাজারের গলি-ঘুপচিতে।

প্রথম কয়েক দিন বাবলু রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই ছিল। মাকে নিয়ে প্রথমে যেখানটায় উঠেছিল সেখানে। মায়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাবলু সেই ভিক্ষুক বুড়িকেও আর খুঁজে পায়নি। হয়তো সে প্ল্যাটফর্মের এই ঠিকানা বদলে ফেলেছে। রাত হলে বাবলু ওখানেই ঘুমায়। ছোট বলে হুইসেলওয়ালা পুলিশরা তার কাছ থেকে চাঁদা নিত না।

একদিন বিকেলবেলা, লাইনঘেঁষা উঁচু প্ল্যাটফর্মে পা ঝুলিয়ে বসেছিল বাবলু। হঠাৎ তার চোখে পড়ে দূরের রেললাইনের ওপর একটা পাউরুটি ও একটি কলা পড়ে আছে। বাবলু সেদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে। কেউ কি পাউরুটি-কলা ফেলে দিয়েছে? নাকি কেউ ওখানে রেখে গেছে? রেললাইনের ওপরই বা রাখতে যাবে কেন? বাবলু ভাবে। ইচ্ছে হলেই তুলে নিয়ে আসা যায়। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাবলু উঠে একটু এগিয়ে যেতেই, কাছ থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল,

– ওই খানকির পোলা, হাত বাড়াবি না।

বাবলু থমকে যায়। পেছনে তাকিয়ে দেখে প্রায় তারই বয়সী তিনটা ছেলে একটা জায়গায় জটলা পাকিয়ে আছে। তাদের মধ্যেই কেউ বাবলুকে শাসিয়েছে। বাবলু ভয়ে পিছিয়ে যায়। বাবলু ওদের দিকে তাকাতেই ওদের মধ্য থেকে একজন বাবলুকে কাছে ডাকে। বাবলু এগিয়ে যায়।

– পাউরুটি-কলা কি তোর বাপ রাইখা গেছে?

একজন খিস্তি করল।

বাবলু মাথা নাড়ে। ওদের মধ্যে গাট্টাগোট্টা ছেলেটা বাবলুর দিকে এগিয়ে আসে।

– আমরা হইছি তিনজন। এক লোক একটা কলা আর আধ প্যাকেট পাউরুটি তিনজনরে দিছে খাইতে। এখন আমরা কম্পিটিশন লাগছি। যে আগে দৌড়ায়া গিয়া ওই পাউরুটি-কলা ছুইতে পারব– পুরা কলা আর ভাগের পাউরুটি হইব তার। লাগবি কম্পিটিশন? চাইলে লাগতে পারোস।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল গাট্টাগোট্টা ছেলেটা। বাবলু বুঝতে পারছে না কী করবে। সে কি দৌড়ের কম্পিটিশন করবে, নাকি করবে না। ততক্ষণে ছেলে তিনটা একটা লাইনে দাঁড়াল দৌড় কম্পিটিশনের জন্য। বাবলুও কী মনে করে ওই লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুরু হলো দৌড়। বাবলু জীবনে কখনো দৌড়ায়নি। দৌড়ানোর অভ্যাস তার নেই বললেই চলে। একটু দৌড়ে সে হাঁপিয়ে পড়ল। ফলাফল, পাউরুটি-কলা পেয়ে গেল মাথায় কোঁকড়া চুলের ছেলেটা। আর বাবলু দৌড় শেষ করল সবার শেষে। পরে জানা গেল মাথায় কোঁকড়া চুলের ছেলেটার নাম গণি। আর গাট্টাগোট্টা যে ছেলেটা বাবলুকে দৌড়ের লাইনে দাঁড় করিয়েছে, ওর নাম নারায়ণ। আর অন্য জনের নাম আলফু।

সেই থেকে বাবলু ওদের বন্ধু হয়ে ওদের দলে ভিড়ে গেল।

৫

– আকাশের ওপরে যে থাকে, সে কে?

বাবলু আনমনে আকাশের অন্ধকারে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্নটি করে। কিন্তু প্রশ্নটি ঠিক কাকে উদ্দেশ করে করল, সেটা কেউ বুঝতে পারল না; বরং বাবলুর গলার স্বর যে একরকমের বিষণ্নতায় ভেজা ছিল, সেটা সবাই আন্দাজ করতে পারল।

বাবলু, নারায়ণ, গণি ও আলফু রাতে মজিদের দোকানে ভাত খেয়ে কারওয়ান বাজারে আড়তের ছাউনিতে চলে এসেছিল। এখানকার বড় বড় পাইকারি ও খুচরা দোকান দিনরাত খোলা থাকে। বেচা-বিক্রি চলে। আড়তের গলির ভেতর ছোট ছোট দোকানগুলো সারারাত বন্ধ থাকে, খোলে ভোরের আগে মাল নামিয়ে ট্রাকগুলো চলে যাওয়ার পর। রাতেরবেলা দোকানগুলোর ছাউনির নিচে ও আশপাশে বেশ কিছু খোলা জায়গা থাকে, আড়তের ছোট ছোট দোকানগুলোর ফাই-ফরমায়েশ খাটা ছেলেগুলো সেখানে চাটাই বিছিয়ে ঘুমায়। মিরণ ব্যাপারীর আড়তের যে ছাউনি বাবলু-নারায়ণরা রাতে থাকার জন্য পেয়েছে, মাথার ওপর এক টুকরো ছাউনি থাকলেও, তার অর্ধেকটাই ছেঁড়া। তার নিচে শুয়ে থাকলে ওই ছেঁড়া ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যায়। বাবলু, নারায়ণ, গণি ও আলফু পাশাপাশি সটান শুয়ে আছে। চারজনের চোখ অন্ধকার আকাশের দিকে। সেখানে চাঁদ নেই, কোনো তারাও দেখা যাচ্ছিল না। এই শহরের নোংরা বাতাস, ধুলো আর গাড়ির ধোঁয়া আকাশের তারাগুলোকে ঢেকে রাখে প্রত্যেক রাতে।

– ওইখানে আল্লা থাকে। আমাগো যে বানাইছে।

বাবলুর প্রশ্ন শোনার পর আলফু উত্তর দেয়।

– ছোটবেলায় মা বলত, ভগবান থাকে।

বাবলুর দিকে কাত হয়ে ফিরে উত্তর দেয় নারায়ণ। কিন্তু তখনো বাবলুর একদৃষ্টি আকাশের অন্ধকারে। বাবলু প্রশ্নটা করেছিল নিজেকে, যদিও অন্য সময় এ রকম প্রশ্ন বাবলু আপনমনেই করে। ফলে অন্যদের উত্তরে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয় না, যেন সে কারও উত্তরই শুনতে পায়নি।

– তোর কী হইছে?

নারায়ণ বাবলুর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

– কিছু না।

বাবলুর এ রকম উদাস ভাব দেখে গণির মেজাজটা একটু খারাপ হয়। কোথায় শুয়ে শুয়ে তারা মজার কথা বলবে, হাসি ঠাট্টা-তামাশা করবে, তা না, আকাশে কী আছে সেইটা নিয়ে বাবলুর বেহুদা প্রশ্ন। মেজাজ খারাপ করে চাটাইয়ের শেষপ্রান্ত থেকে গণি খেঁকিয়ে ওঠে,

– আকাশে আমার ধোন থাকে।

গণির মেজাজ দেখে হেসে ওঠে সবাই–কেবল বাবলু ছাড়া। বাবলুর মনে এ রকম অনেক অনেক প্রশ্ন। কিন্তু সেগুলো সে কাকে জিজ্ঞেস করবে, কার কাছ থেকে ঠিক ঠিক উত্তর পাবে, তাকেই সে খুঁজে পায় না। শুধু মাঝেমধ্যে আপনমনে নিজেকেই প্রশ্নগুলো করে যায়, যদি নিজের মন থেকে উত্তরগুলো বেরিয়ে আসে কখনো। উত্তর না পেয়ে দিন দিন আরও নতুন নতুন প্রশ্ন তার মাথায় জন্ম নিতে থাকে। ফলে মাঝে মাঝে নিজের মাথাটাকে বাবলুর একটা মালগাড়ির বোঝা মনে হয় এত এত প্রশ্নের কারণে।

– খোদা কি একজন, নাকি আরও আছে?

বাবলু আবার জানতে চায়।

– একটাই। খোদারে নিয়া কথা কইতে হয় না। পাপ হয়।

আলফু আবার বিজ্ঞের মতো ভারী গলায় উত্তর দেয় বাবলুকে শুনিয়ে।

– তাইলে সে দুই রকম মানুষ বানাইছে ক্যান?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই বাবলুর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

– কী কস, বুঝি না।

– এই যে আমরা গরিব, আর ওই মাইয়ার বাপ-মারা ধনী।

– কোন মাইয়া?

আলফু এদিক কাত ফিরে ভুরু কুঁচকে জানতে চায়। কিন্তু বাবলু আলফুর প্রশ্নে বরাবরের মতো নিশ্চুপ থাকে। বাবলুর এ রকম প্রশ্ন শুনে উঠে বসে নারায়ণ। অন্ধকার ছাউনিতে কারও মুখ ভালো করে দেখা না গেলেও নারায়ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাবলুর দিকে, অন্ধকারে বাবলুর মুখটা বোঝার চেষ্টা করে।

– সব ভগবানের ইচ্ছা রে। আমাগো কিছু করোনের নাই। ভগবান আমাগো গরিব কইরা বানাইছে।

আলফুর কণ্ঠে যেন হতাশা ঝরে পড়ে।

– আমার ধোনের ইচ্ছা। আবার মুখ খারাপ করাইস না কইলামু। নইলে পাছায় কিন্তু আমার পোন্দা খাবি খানকিরপো। হয় ঘুমা, নইলে অন্য কথায় যা...

গণি আবারও মেজাজ খারাপ করে খেঁকায় এই সব আলাপচারিতা শুনে। পরে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে, ঘুমানোর সময় মুখে গালি আনতে তার এমনিতেও ভালো লাগে না। নারায়ণ বুঝতে পারে বাবলুর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কী সেটা, সেটা সে আন্দাজ করতে পারল না। নারায়ণ জানে, বাবলু একেবারেই গণি আর আলফুর মতো না। ও অন্য রকম–ঠিক কেমন, তা-ও সে বর্ণনা করতে পারবে না। হয়তো সে কারণেই বাবলুকে সে বিশেষভাবে পছন্দ করে। নারায়ণ বাবলুকে এসব নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে আরও জানে, বাবলু ঠিকই সময়মতো ওকে সব খুলে বলবে। অথবা সে-ই একা পেলে বাবলুর কাছ থেকে সব জেনে নেবে।

বাবলু আগের মতোই অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল নিশ্চুপ হয়ে। তার চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর নেই। চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠতে থাকল মেয়েটির মুখ। গায়ে নীল-সাদা রঙের স্কুলের পোশাক। দুই কাঁধে ঝুলে থাকা বেণি। আর তাকে বেশি তাড়িত করতে থাকল মেয়েটির কপালে মেয়েটির মায়ের চুমু। বাবলুরও খুব ইচ্ছে করে তার মার কাছে ছুটে যেতে, মাকে গিয়ে বলতে, 'মা, আমার কপালে একটা চুমা দাও।' কিন্তু বাবলু জানে, সেটা কখনোই আর ঘটবে না। তার সৎবাবা মোখলেস পুলিশ বাবলুকে দেখলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তার ওই বাড়ি যাওয়া নিষেধ। মা পাই পাই করে তাকে তা বলে দিয়েছে, সে যেন কোনোভাবে মোখলেস পুলিশের বাড়ি না যায়। তাই বাবলুও খুব একটা যায় না। তার অত ঠ্যাকা পড়েনি মোখলেস পুলিশের মার খেতে! তবুও মনে পড়ে, একবার মাকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল মোখলেস পুলিশের হাতে। সেদিন মায়ের বাড়ির উঠানে গিয়ে সে মাত্র উঁকি মেরে ডেকেছিল, 'মা।' পাশেই চাপকলে তখন অজু করছিল মোখলেস পুলিশ। আর দেখে ফেলেছিল বাবলুকে। বাবলুর কণ্ঠ শুনে অজু রেখে ছুটে এসে খপ করে ধরে ফেলেছিল বাবলুকে। পরে এক হাতে চুলের মুঠি ধরে, পাশে পড়ে থাকা একটা কঞ্চি দিয়ে আচ্ছা রকম পিটিয়েছিল।

– খানকির পোলা, জারজের বাচ্চা। আবার আইছোস তোর মারে দেখতে...

ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল বাবলুর মা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল বাবলুর গায়ের ওপর বেদম পিটুনি। চোখ ফেটে জল এসেছিল তার। কিন্তু কিছু বলার সাহস হয়নি তখন। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে মোখলেস পুলিশের মার খেতে হবে তাকেও। তার চেয়ে মার খেয়ে বাবলুর হাত-পা একটু শক্ত হোক। মা হিসেবে তো কিছুই সে করতে পারবে না। হাত-পা শক্ত হয়ে যেন দুনিয়াতে অন্তত টিকে থাকতে পারে। তারপরও বাবলু দমে যায় না, তার মন মাঝে মাঝে উথাল-পাথাল করে। মাকে যখন ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে, বাড়ির উঠানের আড়ালে গিয়ে উঁকি দেয়, দেখে, মোখলেস পুলিশ বাড়ি আছে কি না। কিন্তু মাকে ডাকার সাহস হয় না। চুপচাপ আবার ফিরে আসে সে। এটাই হয়তো বাবলুর একমাত্র সান্ত্বনা, মায়ের বাড়ি গিয়েছিল সে।

– কালকে কখন যাবি? টাইম ঠিক করছস?

আলফু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টায়। বাবলুর প্রশ্নে সবাই কেমন ঝিমিয়ে গিয়েছিল। গণি তো মেজাজ খারাপ করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। নারায়ণ গায়ের গেঞ্জি খুলে নেড়ে নেড়ে গায়ে বাতাস করছিল। বাবলু আগের মতোই শুয়ে আছে চিত হয়ে। আগের মতোই নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বাবলু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় অলফুর দিকে।

– কে যাইতে কইছে? কই?

– সন্ধ্যায় কইলাম না তোরে, আবদুল হকের কাছে। তেহারি খাওয়াবে কালকে।

– অ।

বাবলুর চোখে-মুখে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

– শালার বেটার ধান্দাটা বুঝতে পারতেছি না। নইলে এইভাবে কেউ মাগনা তেহারি খাওয়ায়?

নারায়ণ একইভাবে গায়ের গেঞ্জি নাড়াতে নাড়াতে বলে।

– মাদারচোদের বাপের হোটেল মনে হয়।

গণি খিক খিক করে হেসে ওঠে।

– আমাগো দিয়া মনে হয় কোনো কাজ-কাম করাইব।

বাবলু নির্লিপ্তভাবে বলে।

– ঠিক কইছস বাবলু। আমিও সেইটা ধারণা করছি।

নারায়ণ বাবলুর কথায় সায় দেয়।

– তোরা যাইবি না? তাইলে আমি একলাই যামু।

আলফু বিরক্ত হয়ে জানায়।

– তুই গেলে যামু। তুই তেহারি খাইবি, আমরা একলা একলা বাল ছিঁড়মু নাকি?

কয়েকটা দিন ধরে আবদুল হক ডেকে ডেকে ওদের দুপুরে তেহারি খাওয়াচ্ছেন, তার জীবনের নানা গল্প শোনাচ্ছেন। মাগনা যে তেহারি খাওয়াচ্ছেন না, সেটা ওরা ঠিকই টের পাচ্ছিল, কিন্তু

আন্দাজ করতে পারছিল না কেন। মাগনা তেহারির লোভ সামলাতে পারছিল না বলে ওরা প্রায় যাচ্ছে আবদুল হকের ডাকে। একদিন নারায়ণ বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল,

– শালায় কোনো ছিনতাই-টিনতাইয়ের কাজে আমাগো ঢুকায়া দিব না তো? এই শহরে কিন্তু এই সব চলে। আমার খালাতো ভাই একটা আছে, জন্মের খবিশ! একটা দলে সঙ্গে ছিনতাই করে।

– খুন-খারাবির কাজে যদি লাগায়ে দেয়?

আলফু চোখ গোল গোল করে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলে। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক দেখা যায়। গণি রাস্তায় পড়ে থাকা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছিল, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল,

– ইটের মধ্যে রাইখা আবদুল হকের বিচির থেঁতলায়ে দিমু। আমারে চিনে নাই...

– না মনে হয়। আবদুল হকরে দেইখা সে রকম মনে হয় না। তয় লোকটা ভালো না, এইটা বুঝছি।

বাবলুর উত্তরে আলফু যেন একটু স্বস্তি ফিরে পায়। আবদুল হক যে লোক ভালো না, এতে তারও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনা পয়সায় তেহারির লোভ সে সামলাবে কী করে? গণি তখনো কান চুলকে যাচ্ছিল, বাবলুর কথায় তেমন ভরসা পাচ্ছিল না যেন।

ওরা বসে ছিল ফুলার রোডের সেই চায়ের দোকানে। তেহারি খাওয়ার পর ওদের চায়ের তৃষ্ণা পায়, তখন ওরা আজিমপুর কলোনি থেকে হেঁটে হেঁটে ফুলার রোডের এই চায়ের দোকানে চলে আসে। আগে দিন শেষে ওদের ঠিকানা ছিল নীলক্ষেত মার্কেটের পেছনে, যেখানে ওরা ওদের কুড়ানো বস্তার মাল বিক্রি করত। কিন্তু আবদুল হক আজকে ওদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের আর প্লাসটিকের বোতল কুড়িয়ে মাল বিক্রি করতে হবে না। তিনি তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেবেন অচিরেই। তারপর থেকে সবার মনে খটকা লাগতে শুরু করেছে। তেহারি খাওয়ার পরপরই তাই তারা চলে এসেছে এখানে। এখানটা খুব নীরব এলাকা, তাই মন ভরে কথা বলা যায়, আশপাশে কান পাতার কেউ নেই।

– আমি আর আবদুল হকের তেহারি খাওয়ার মধ্যে নাই। শালার ধান্দা ভালো না।

সাফ কথা জানিয়ে দেয় নারায়ণ। আবদুল হককে নিয়ে কথাবার্তা গণির যে খুব একটা ভালো লাগছে না, সেটা তার কান চুলকানোর ধরন দেখে বোঝা যায়। আলফু কিছুটা হলেও চিন্তায় পড়ে যায়, বিনা পয়সার তেহারি খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে–এটা ভাবতে তার ভালো লাগছিল না। বাবলুর একেবারে মন নেই ওদের আলোচনায়। সে তাকিয়ে ছিল রাস্তায় পড়ে থাকা একটা আধখাওয়া বিস্কুটের টুকরোর দিকে, একটা কালো পিঁপড়া সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা রেখা বরাবর। বাবলু ফুঁ দিয়ে পিঁপড়াটাকে সরিয়ে দেয়, পিঁপড়াটা আবার কামড়ে ধরে বিস্কুটের টুকরোটাকে। বাবলু আবার ফুঁ দিয়ে পিঁপড়াটাকে সরিয়ে দেয়। বাবলুর কাছে যদিও মনে হচ্ছিল এটা একটা খেলা, কিন্তু সে ঠিকই বুঝতে পারছিল, খাদ্যের জন্য কী সংগ্রামটাই না করে যাচ্ছিল পিঁপড়েটা।

– গোলাপ ফুলের দাম কত করে রে?

বাবলুর এমন প্রশ্নে ওরা সবাই একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাবলুর দিকে। প্রসঙ্গ ছাড়া হঠাৎ এমন প্রশ্নের কারণ ওরা কেউ বুঝতে পারল না। আলফু ফিক করে হেসে দিয়ে বলল,

– গোলাপ ফুল দিয়া কী করবি? তেহারি বাদ দিয়া ফুল খাবি?

বাবলু কোনো উত্তর দিল না। নারায়ণ জানাল,

– পাঁচ টাকা। ক্যান?

– ক্যান আবার? ভাব উঠলে অয় ফুল পোন্দাইব।

গণির কথা শুনে খিক খিক করে হাসতে লাগল আলফু। কিন্তু নারায়ণ কটমট করে তাকাল গণির দিকে, কিন্তু এতে গণির কোনো ভ্রুক্ষেপ হলো না। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

– কই যাস?

নারায়ণের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাবলু হাঁটতে শুরু করল শাহবাগ মোড়ের দিকে। ওখানে এই এলাকার সবচেয়ে বড় ফুলের মার্কেট।

৬

রাস্তার এপারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু, ওপারে দেয়ালঘেরা বাড়িটার মূল গেট। গেটটি বন্ধ। বাবলু আজও একটি গোলাপ নিয়ে এসেছে ফুলের দোকান থেকে কিনে। রাস্তার ঠিক এক পাশে, যে পাশে গাড়ির জানালায় বসে মেয়েটা, সেখানে পেতে রেখেছে। আর মনে মনে প্রতীক্ষা করছে, আজ যেন ফুলটি মেয়েটার চোখে পড়ে, মেয়েটা যেন ফুলটি হাতে তুলে নেয়। বাবলুর চোখের পাতা যেন ফেলতেই চাইছে না, যদি এর ফাঁকে গাড়িটি সাঁই করে বেরিয়ে যায়–এই ভয়ে। গেটটি এখনো খোলেনি। বাবলু কল্পনা করতে লাগল, চকচকে সাদা গাড়িটি থাকবে ভেতরের ফুলবাগানের ঠিক পাশে। মেয়েটি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ে গাড়িটির দরজার কাছে আসবে, গাড়িটির দরজা থাকবে আগে থেকেই খোলা। কিছুক্ষণ পর পিছু পিছু আসবেন মেয়েটার মা, তারপর মেয়েটার কপালে একটা চুমু খাবেন। মেয়েটা গাড়িতে উঠে মাকে টাটা দিতে দিতে গাড়িটি হুশ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরে চোখের আড়ালে চলে যাবে। মেয়েটা আজও গোলাপটি দেখবে কি, দেখবে না, বাবলু জানে না। তাই সে পলকহীন তাকিয়ে আছে রাস্তায় পেতে রাখা গোলাপটির দিকে। মাঝে মাঝে চোখ রাখছে গেটের দিকেও। তার বুকটা দুরু দুরু করছে। আগের দুদিন বাবলু একটা করে গোলাপ রেখে আসছিল ঠিক একই জায়গায় কিন্তু একবারও মেয়েটার চোখে পড়েনি ফুলটি। কিংবা হয়তো পড়েছিল, হয়তো মেয়েটা হাতে তুলে নেয়নি। পর পর দুদিনই গাড়ির চাকা রাস্তায় পিষে দিয়েছিল বাবলুর পেতে রাখা গোলাপকে। কিন্তু তবুও বাবলু হাল ছাড়েনি। সে আবারও একটা গোলাপ নিয়ে এসেছে আর এখন অপেক্ষা করছে গেট দিয়ে গাড়িটি বেরিয়ে আসার।

কিছু মাস ধরে দেশের রাজনীতি অস্থির হয়ে উঠেছে। বিরোধী দল সরকারবিরোধী আন্দোলনের নানা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে নানা অজুহাতে। ঘনঘন হরতাল ডাকছে। জ্বালাও-পোড়াও করছে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য। সরকারি দল সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছিল দিন কয়েক আগে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে বিরোধী দল। তারপর থেকে রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুটা থমথমে হয়ে আছে। সবাই আশঙ্কা করছে, যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। দুই দলের সংলাপ যে হবে না, সাধারণ মানুষ সেটা আরও আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল। তবে এবার যদি বিরোধী দল হরতাল ডাকে, সেখানে বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটতে পারে–এ রকমটাই কানাঘুষা চলছে চারদিকে, চায়ের দোকান থেকে জুমাবারের খুতবা অবধি। দেশের সাধারণ মানুষ এই সব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও, তাদের ভোগান্তি সবচেয়ে বেশি। রাস্তায় গাড়ি পুড়বে, দোকানপাট ভাঙচুর হবে, কিছু মানুষ মরবে, বাজারে জিনিসপাতির দাম বাড়বে, স্কুলপাট বন্ধ হবে, কিন্তু আন্দোলন চলবে। যদিও দুই দলই জনগণের কল্যাণের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য রাজনীতি করে চলেছে দিনের পর দিন। তবে সাধারণ মানুষের মুক্তি করে আসবে–এটা কেউ নিশ্চিত করতে পারছে না। এদিকে সরকারি দল জ্বালাও-পোড়াও ঠেকানোর জন্য বিরোধী দলের পেছনে পুলিশ বাহিনীকে বিশেষ নিয়োগ দিয়েছে, ফলে রাস্তায় বেড়ে গেছে পুলিশের টহল ও তল্লাশি। যেকোনো সময় রাস্তায়-গলিতে-পাবলিক বাসে, মার্কেট-মন্দির-মসজিদে চোরাগোপ্তা হামলার আশঙ্কাও করছে সাধারণ মানুষ–দিনে দিনে বাড়ছে সংকট। যেকোনো দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল ডেকে বসতে পারে বিরোধী রাজনৈতিক দল, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন আবদুল হক। তিনি বাবলুদের তৈরি করে রেখেছেন। পরবর্তী হরতালের অপেক্ষায় তাদের হাতখরচের ব্যবস্থা করেছেন। এবারের হরতালটা ভালো করে কাজে লাগাতে চান তিনি। হয়তো

ভাবছেন, এবারের অনির্দিষ্টকালের হরতাল তার জন্য সুসময় বয়ে নিয়ে আসতে পারে। তাই বাবলুদের পেছনে তার এত অর্থ ও সময় বিনিয়োগ। বাবলুরা রাজনীতি বোঝে না। আপাতত আবদুল হকের কাছ থেকে হাতখরচের টাকা পেয়েছে, একবেলা তেহারি-কাচ্চি বিরিয়ানি খাচ্ছে–এতেই তারা খুশি। প্রথমে আবদুল হকের কাছ থেকে বাবলুরা একটু দূরে সরে গেলেও আবদুল হক কৌশলে তাদের আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি জানতেন, টাকাই সব সমাধানের মূল চাবিকাঠি। আরও ভালো জানতেন, দলে ভেড়ানোর জন্য কী করে বাবলুদের মতো টোকাইদের টোপ খাওয়া মাছের মতো একটু একটু করে টেনে ডাঙায় তুলতে হয়। শুধু বাবলুরা না, সারা শহরজুড়ে এলাকাভিত্তিক তার এ রকম আরও কিছু টোকাই বাহিনী তৈরি করা আছে। হরতালের সময় তিনি সবাইকে দল ভাগ করে রাস্তায় নামিয়ে দেন।

– বাবলু মিয়ার কাহিনি কী?

পিচ করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানের পিক রাস্তায় ফেলতে ফেলতে একদিন জানতে চেয়েছিলেন আবদুল হক। কিছুদিন ধরে বাবলু একটু মনমরা হয়ে থাকে–এটা আবদুল হকের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি ভাবছিলেন, এই সময়ে মনমরা হয়ে থাকাটা কোনো কাজের কথা না; বরং সবাইকে চাঙা থাকা চাই। টোকাইদের চাঙা থাকা মানে হুলোড়, আর ওদের হুলোড় মানেই হরতালের মাঝে অনবরত গাড়িতে ইটপাটকেল।

– কোনো কাহিনি নাই।

বাবলু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিল।

– কী হইছে রে নারায়ণ?

– অয় এক মাইয়ার প্রেমে পড়ছে।

নারায়ণ উত্তর দেওয়ার আগেই আলফু উত্তর দিয়ে দেয়।

– কস কী রে?

আবদুল হক হাসতে হাসতে পানের পিক ফেলতে গিয়ে বুকের ওপর জামার বোতামে মাখিয়ে ফেলেন।

– কথা সত্য। বড়লোকে মাইয়া। বাড়ি আছে, সাদা রঙের গাড়ি আছে। দেখতে পরীর মতো।

আবদুল হক খিক খিক করে হাসতে গিয়েও চেপে গিয়েছিলেন। এ সময় বাবলুকে ক্ষেপানো ঠিক হবে না। তার হাসিতে বাবলু দল থেকে ছুটে যেতে পারে–এই আশঙ্কায়।

– বাদ দেন ওর কথা।

নারায়ণ যদিও কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই বাবলু সেখান থেকে উঠে চলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে এ রকম কথাবার্তা বাবলুর মোটেও পছন্দ হয় না। আলফুকে একা পেলে সে নির্ঘাত একচোট নিয়ে নেবে–দু-চার ঘুষিও হতে পারে সেটা।

আচমকা বাড়ির মূল গেটটি খুলে গেল ঘড় ঘড় শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে বাবলুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল ইঞ্চি দুয়েক। এর কিছুক্ষণ পর ওর দমটাও কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে গেল, যখন সাদা গাড়িটা মূল গেট দিয়ে বের হয়ে ডানের রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই ব্রেক কষে থেমে গেল, তখন। বাবলু গাছের আড়াল থেকে দম বন্ধ অবস্থাতেই দেখল, মেয়েটাকে গাড়ির দরজা খুলে এক লাফ দিয়ে নামতে। নেমে মেয়েটা গোলাপটি হাতে তুলে নিয়ে এদিক-ওদিক না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসল আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা না করে চোখের আড়াল হয়ে গেল ডান দিকের রাস্তা ধরে। বাবলুর যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। মেয়েটা সত্যিই তার গোলাপটি তুলে নিয়েছে। কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর বিশ্বাস করতে। তারপর খুশিতে হেসে উঠল বাবলু, হাত-পা ছুড়ে নাচতে লাগল বানরের বাচ্চার মতো, রাস্তার পাশে খোলা জায়গায়। বাবলু নাচতে নাচতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এখন থেকে রোজ একটা করে গোলাপ কিনে রাস্তার ঠিক একই জায়গায় পেতে রাখবে, মেয়েটা যেন রোজ রোজ সেটা তুলে নেয়। কিন্তু বাবলু কোনো দিন মেয়েটার সামনে গিয়ে বলবে না, এই গোলাপ সে প্রতিদিন ওর জন্য কিনে রাস্তায় রেখে যায়। এমনকি মেয়েটার মুখোমুখিও হবে না। ভেবে দেখল, সেটা ঠিক হবে না। ড্রাইভার তাকে দেখলে ধরে মারতেও পারে কিংবা মেয়েটাও গাল-মন্দ করতে পারে। এমনও হতে পারে, তারপর থেকে মেয়েটা হয়তো আর ফুলই নিল না। বাবলু সেটা চায় না। তা ছাড়া বাবলু জানে, সে আর মেয়েটা এক রকম মানুষ না–তারা আলাদা আলাদা।

এসব ভাবতে ভাবতে মেয়েটার মায়ের মুখ বাবলুর চোখে ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে মেয়েটার কপালে চুমু খাওয়ার মুহূর্তটাও। হঠাৎ, ঠিক এখন, বাবলুর খুব আদর পেতে ইচ্ছে করল–ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচলের নিচে মুখ লুকাতে। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়লেই মোখলেস পুলিশের মুখটা বীভৎস মুখোশের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাবলুর। বাবলু তখন ভেতরে-ভেতরে দমে যায়, ক্লান্তবোধ করে। কিন্তু আজ সে মায়ের কাছে যাবেই। মোখলেস পুলিশ বাড়ি আছে কি না, বাবলু জানে না। তবুও সে যাবে। আগে উঁকি দিয়ে দেখবে মোখলেস পুলিশ বাড়ি আছে কি না, যদি না থাকে, তাহলেই সে মাকে ডাকবে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাবলু ভাবছিল, মাকে সে মেয়েটির কথা বলবে কি না। পরে ভাবল, না, থাক। মেয়েটার কথা সে কাউকে জানাবে না। মেয়েটা তার প্রতিদিন কেনা গোলাপের মধ্যেই থাকুক।

এসব ভাবতে ভাবতে বাবলু তার মায়ের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

মোখলেস পুলিশের ঘরে সুখেই দিন শুরু করেছিল খাইরুন বেগম, বাবলুর মা। মোখলেস পুলিশ বলতে গেলে রাস্তা থেকেই কুড়িয়ে খাইরুন বেগমকে সংসার দিয়েছে। সেই সংসারে একটা ঘর আছে, খাট আছে, আলমিরা, চুলা থেকে শুরু করে টেলিভিশন পর্যন্ত। এর বেশি খাইরুন বেগম তার জীবনে আর কী চেয়েছে? বরং এসবই তার কল্পনার চাইতে বেশি। একটু থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তই তার জীবন। মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু বাবলুটাকেই সে হারিয়েছে। এ ছাড়া খাইরুন বেগমের কোনো উপায় ছিল না। বুকের ভেতর পাথর বেঁধে সে তার একমাত্র বুকের ধন বাবলুকে ভুলে থাকছে। আসলেই কি থাকছে? মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু মোখলেস পুলিশের চোখের দিকে তাকালেই বুকচাপা কান্নার জল শুকিয়ে যায় খাইরুন বেগমের।

মোখলেস পুলিশের আগের বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এ নিয়ে খাইরুন বেগম মোখলেস পুলিশকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু বহুবার জানতে ইচ্ছে করেছিল কেন তার বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। এত দিন জিজ্ঞেস করতে না পারলেও এই কয়েক মাসে খাইরুন বেগম বুঝে গিয়েছে তার আগের বউয়ের গলায় দড়ি দেওয়ার কারণ। একদিন যখন প্রথমবার খাইরুন বেগমের গায়ে মোখলেস পুলিশ হাত তুলেছিল। কারণটা খুবই সামান্য। ডিউটি থেকে ফিরে এসে মোখলেস পুলিশ সময়মতো খাবার পায়নি বলে। খাইরুন বেগম জানত না এত তাড়াতাড়ি মোখলেস পুলিশ ফিরবে। রোজ তো বিকেল বিকেল ফেরে, খেয়েদেয়ে আবার সন্ধ্যা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে। সেদিন ফিরেছিল দুপুরের আগেই। খাবার মাত্র চুলায় তৈরি হচ্ছিল। খাবার না পেয়ে যেন জানোয়ার হয়ে গিয়েছিল মোখলেস পুলিশ। খাইরুন বেগমের চুলের মুঠি ধরে বেদম মার মেরেছিল। সেই মারে খাইরুন বেগম তিন দিন জ্বরে ভুগল। সেই প্রথম মোখলেস পুলিশের ভেতরের জানোয়ারটাকে দেখতে পেয়েছিল খাইরুন বেগম। সেই থেকে শুরু, মাঝে মাঝেই এ রকম মার চলে। কারণে-অকারণে। আবার যখন রেলস্টেশন থেকে মদ গিলে আসে, সেদিন তো কথাই নেই। খাইরুন বেগমের কপালে মার অনিবার্য। তবুও সংসার করে যাচ্ছে খাইরুন বেগম। তা না হলে কে তাকে এই শহরে থাকতে দেবে, খেতে দেবে। মারের চেয়ে একমুঠো ভাতের মূল্য খাইরুন বেগমের কাছে অনেক বড় কিছু।

– মা।

খাইরুন বেগমের হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল।

বাবলু মোখলেস পুলিশের বাড়ির কাছে আসতেই এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখল কেউ আছে কি না। কিছুক্ষণ চুপ থাকল। বোঝার চেষ্টা করল কেউ তাকে দেখেছে কি না। যখন বুঝল আশেপাশে কেউ নেই। দরজা খুলে উঁকি দিল উঠানে। মাকে দেখতে পেল দরজার কাছে বসে মাথা নুয়ে কুলায় চাল বাছছে। প্রথমে মৃদুস্বরে মাকে ডাকল। তাতেই মা মুখ তুলে বাবলুর দিকে তাকাল।

– তোমার সোয়ামি বাসায়?

বাবলু জানতে চাইল।

– না। তুই আইছস ক্যান?

বাবলুর মা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, যেন বাবলু একটা আতঙ্ক।

– তোমারে দেখতে ইচ্ছা করছে মা।

– আয়। হে বাসায় নাই। কখন আয়া পড়ে ঠিক নাই।

– তাইলে যামু গা?

– আইছস ক্যান বাপ? তুই জানস না হে মানুষটা ভালো না।

– তোমারে দেখতে ইচ্ছা করলে আমি কী করুম?

বাবলু মায়ের পাশে এসে বসে। বাবলুর খুব ইচ্ছে করছে মাকে বলে কপালে একটা চুমু খেতে। কিন্তু পারে না, গলা দিয়ে কথাগুলো আসে না তার। কেন আসে না, তা সে জানে না। বুকটা কেমন যেন দুরু দুরু করতে থাকে। সে কি মাকে একটু জড়িয়ে ধরবে? বুঝতে পারছে না। মায়ের সঙ্গে তার এই কয়েক মাসে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। চাইলেও সে সহজ হতে পারছে না মায়ের কাছে। তাহলে মোখলেস পুলিশই কি তার মাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে? নাকি মা-ই সরে গেছে তার কাছ থেকে? বাবলু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

খাইরুন বেগম পরম মমতায় বাবলু মাথায় হাত রাখে।

– কিছু খাবি?

– না।

বাবলু মায়ের কোলে একটা হাত রাখে। বাবলুর বুক ভেঙে কান্না আসছে। সে কি কেঁদে ফেলবে? না, কাঁদা ঠিক হবে না। মা যদি তার কাছ থেকে সরেই যায়, তাহলে কেঁদে কী হবে? তার জীবন এখন একা। এই জীবনে তার কেউ নেই। কেউ নেই বললে ঠিক হবে না। গণি-আলফু-নারায়ণরা আছে। ওরা আছে বলেই বাবলু একা এখনো এই শহরে টিকে আছে। বিপদে-আপদে ওরাই এখন সব। বাবলু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। কী জানি তার বলতে ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ খাইরুন বেগম উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তেই তার মুখের অবয়ব বদলে যায়। পাশে পড়ে থাকা একটা কঞ্চি তুলে নেয় হাতে।

– হারামির বাচ্চা... তুই আইছস ক্যান!

বলেই বেদম মার শুরু করে খাইরুন বেগম। সপাৎ সপাৎ কয়েকটা কঞ্চির বাড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়ায় বাবলু।

– আমার সংসারে আগুন জ্বালাইতে আইছস। শুয়োরের বাচ্চা। বাইর হইয়া যা আমার বাড়ি থেইকা।

– মা... ও মা...

বাবলু বুঝে উঠতে পারে না হঠাৎ মায়ের কী হয়েছে। বাবলু একটু ভয় পেয়ে যায়। মা কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল? খাইরুন বগেম বেদম মারতেই থাকে বাবলুকে। পিঠে চাকা চাকা দাগ পড়ে যায়, তবুও খাইরুন বেগম থামে না।

– এক্ষুনি বাইর হইয়া যা আমার বাড়ি থেইকা।

বাবলু এক দৌড়ে উঠান পেরিয়ে যায়। ঠিক তখন চোখে পড়ে উঠানের আরেক কোনায় একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের কাণ্ড দেখছে। বাবলু ততক্ষণে রাস্তায় চলে এসেছে। সারা শরীর জ্বলছে তার। বাবলু দাঁড়িয়ে একটু দম নেয়। তারপর কাঁদতে কাঁদতে উল্টোদিকে হাঁটা দেয়।

খাইরুন বেগমের চোখ ফেটে পানি আসে। ছেলেটা কত দিন পর তার কাছে এলো। একটু আদরও করতে পারল না। উল্টো মারতে হলো। শেফালি মাগীটা আর আসার সময় পেল না।

শেফালি পাশের বাড়ির আয়নাল বক্সের শালি। মাস দুয়েক ধরে এখানে বেড়াতে এসেছে। যাবার নামটি নেই। এই দুই মাসে শেফালির সঙ্গে মোখলেস পুলিশের অনেক ভাব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই তারা কী নিয়ে ফুসুর ফুসুর করে। হাসাহাসি করে। মাঝে কয়েক দিন মোখলেস পুলিশ শেফালিকে সিনেমা দেখিয়ে এনেছে। মোখলেস পুলিশ বাড়ি থাকলে কীভাবে যেন শেফালি টের পেয়ে যায়। ছুটে চলে আসে। ঘরে বসে দুজন ফুসুর ফুসুর করে। খাইরুন বেগম না বোঝার ভান করে তখন উঠানে বসে থালাবাসন মাজে কিংবা রান্নাঘরে বসে এটা-সেটা নাড়ানাড়ি করে। মোখলেস পুলিশের ভয়ে ঘরে ঢোকার সাহস হয় না। খাইরুন বেগম সব বোঝে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। মোখলেস পুলিশের ভয়ে তার জীবনটা ইঁদুরের মতো হয়ে গেছে। সব জেনে-বুঝেও তাকে চোখ-মুখ বুজে গর্তে লুকিয়ে থাকতে হয়।

– ভাবি, মোখলেস ভাই বাড়ি আসে নাই?

খাইরুন বেগম মাথা নাড়ে। শেফালি হাতের মোবাইল তুলে মোখলেস পুলিশকে মিসডকল দেয়।

– এখনই আয়া পড়ব। একটু বসি।

শেফালি উঠানের মোড়ায় বসে পড়ে। শেফালি একটা বেশ্যা মাগী, এটা খাইরুন বেগম বুঝে গিয়েছে। তারপরও সে যেন কিছু বুঝতে পারেনি, এ রকম ভান করে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। শেফালি উঠানে বসে গুন গুন করে বাংলা সিনেমার গান গাইতে গাইতে মোখলেস পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

শেফালি আসায় একদিক থেকে ভালো হয়েছে। মোখলেস পুলিশ এখন বাড়ি ফিরবে। এটা খাইরুন বেগম জানত না। শেফালিকে দেখেই খাইরুন বেগম কঞ্চি তুলে বাবলুকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা না হলে, মোখলেস পুলিশ এসে যদি দেখতে বাবলু খাইরুন বেগমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, তাহলে খাইরুন বেগমের আস্ত থাকত না। বাবলুকেও এক চোট মার খেতে হতো। মোখলেস পুলিশ এখনো বাড়ি ফেরেনি, তবুও আজকে বাবলু আসার খবরটা শেফালির মাধ্যমে মোখলেস পুলিশ জেনে যাবে। তারপর কী হবে খাইরুন বেগম জানে না। তবে সে প্রতি মুহূর্তে মোখলেস পুলিশের মারের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই মার খেয়েই তাকে এই সংসার করতে হবে। এটা নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে খাইরুন বেগম। ভাবতে ভাবতেই মোখলেস পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি আসে। খাইরুন বেগম রান্নাঘর থেকে আড়চোখে মোখলেস পুলিশকে দেখে।

– এতক্ষণ লাগল আইতে সোনাপাখি? সেই কখন থিকা বইসা আছি?

শেফালি যেন গাল ভারী করে।

– পুলিশের কাম, বোঝো না? চলো চলো ঘরে চলো। আবার ডিউটিতে যাইতে হইব।

মোখলেস পুলিশ শেফালিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। এই দৃশ্যও খাইরুন বেগমের চোখ এড়ায় না। কিছুক্ষণ পর শোবারঘরের জানালা বন্ধ হয়ে যায়। খাইরুন বেগমের চোখ ফেটে পানি আসে। ময়লা শাড়ির আঁচলে সে চোখ মোছে। এখন ঘণ্টাখানেক তাকে রান্নাঘরের এটা-সেটা নাড়ানাড়ি করতে হবে। এ ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। চুলায় ভাত চড়িয়ে দিয়েছে। পানিতে বলক উঠছে। সে চুলার আগুনটা আরেকটু কমিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মোখলেস পুলিশের সংসার ছেড়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু যাবেটা কই? বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে খাইরুন বেগম ধারণা করল, আজকে মনে হয় শেফালি বাবলুর আসার খবরটা মোখলেস পুলিশকে দেবে

না। যাক, তাহলে একদিন মারের হাত থেকে সে বেঁচে গেল।

বাবলু দাঁড়িয়ে আছে ফার্মগেট ওভার ব্রিজের ওপর। ব্রিজের রেলিং ধরে নিচে তাকিয়ে আছে। ছোট-বড় কত গাড়ি সাঁই সাঁই করে ছুটছে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। মানুষজন কিলবিল করছে রাস্তায়। কতো মানুষ থাকে এই শহরে। সবারই ঠিকানা আছে। জীবনের নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু বাবলুর কিছু নেই। একটা মা আছে, সেটা থেকেও নেই। মায়ের কথা মনে পড়তেই তার সারা গা জ্বালা করতে লাগল। উঠানের কোণে ওই মেয়েটা কে ছিল, যাকে দেখেই মা তাকে এত মার মারল। সে কি মোখলেস পুলিশের কেউ? বাবলু জানে না। বাবলু কেবল মায়ের কোলে হাতটি রেখেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু শুতে। তা আর হলো না। তার আগেই মা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিল। মা কি তাকে ইচ্ছে করেই মেরেছিল? বাবলুর তা মনে হয় না। ওই মেয়েটিকে দেখেই মা তাকে মেরেছে। বাবলু এখনো বিশ্বাস করে, মা তাকে মারতে পারে না।

৭

– মা, দেখো একটা গোলাপ।

– কে দিল?

– কেউ দেয়নি, পেয়েছি।

– কোথায়?

– রাস্তায়।

– তোমাকে না বলেছি রাস্তার জিনিস কুড়াতে নেই।

– ফুল তো!

– এখন থেকে আর কখনো রাস্তার জিনিস কুড়াবে না। মনে থাকবে?

– আচ্ছা।

মেঘনা ছুটে গেল তার রুমে। পড়ার টেবিলে একটা বইয়ের পাশে রাখল গোলাপটি। সেই সকালে পেয়েছে। এখন দুপুর। পাপড়িগুলো কেমন নেতিয়ে গেছে। হয়তো খুলে পড়ে যাবে এখনই। মেঘনা গোলাপের একটা পাপড়ি ছিঁড়ে নিয়ে তার ডায়েরির ভাঁজে রেখে দিল। বাকি ফুলটা রাখল একটা গাসে পানি ঢেলে, তার মধ্যে। যাতে ফুলটা তাড়াতাড়ি মরে না যায়।

স্কুল থেকে ফিরেছে মেঘনা। স্কুল ড্রেস বদলে খেতে বসল তার বিছানায়। মা তাকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় মেঘনার বাবা বাসায় ফিরলেন। সঙ্গে আরও তিনজন। তারা ড্রইংরুমে বসে আলাপে মেতে ওঠেন। মেঘনার ঘর থেকেও তাদের সেই আলাপ শোনা যায়। মেঘনার মা রুমের দরজাটা একটু চাপিয়ে দেন।

– আমাদের একটু চা করে দাও তো।

ড্রইংরুম থেকে মেঘনার বাবার গলা শোনা যায়। ততক্ষণে মেঘনার খাওয়া শেষ। মেঘনার মা মা তড়িঘড়ি করে উঠে চলে যান। মেঘনা খেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে। এখন সে ঘণ্টাখানেক ঘুমাবে। কিছুক্ষণ পর মিস আসবেন তাকে পড়াতে। এটাই তার রুটিন।

মেঘনার বাবা রায়হান কবির রাজনীতি করেন। অবসরে লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কলাম লেখেন বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায়। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ছাত্রজীবনে রাজনীতির সূত্র ধরেই মেঘনার মা শাহানা আক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়। শাহানা আক্তার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক। রাজনৈতিক আদর্শের মিল, একই পার্টির সদস্য এবং মিটিং-মিছিলে দেখা হতে হতে তাদের মধ্যে একটা সময় প্রেম বিষয়টা কাজ করতে শুরু করে। অবশ্য যতটা না প্রেম, তারচেয়ে বেশি ছিল বন্ধুত্ব। শাহানা আক্তার ভালো গান করতেন। তাদের রাজনৈতিক সব আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ছিল সংগীত। যেকোনো আন্দোলনেই তারা ট্রাক ভাড়া করে গণসংগীতের অনুষ্ঠান করে শহর ঘুরে বেড়াতেন। লিফলেট বিলি করতেন। সেসব গণসংগীত আয়োজনের নেতৃত্ব দিতেন শাহানা আক্তার। একদিন শাহানা আক্তারকে রায়হান কবিরের ভালো লেগে যায়, যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা যৌন নিপীড়নের ঘটনায় তারা মাঠে নেমেছিলেন আন্দোলনে। তারা শিক্ষকের বিচার দাবি নিয়ে বিশ্বাবদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছিলেন, অনশন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তারা ধর্ষণবিরোধী পথনাটকসহ গণসংগীত করেছিলেন। তার নেতৃত্বেও ছিলেন শাহানা আক্তার। তার মুখে সেদিন ধর্ষণবিরোধী স্লোগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় নামিয়ে এনেছিল। রায়হান কবির তখন সিনিয়র ছাত্র নেতা। তিনি কেবলই দেখছিলেন শাহানার কণ্ঠে তীব্র স্লোগান। সেদিনই শাহানা আক্তার রায়হান কবিরের চোখে পড়ে যান। রায়হানরা তখন কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্ষণের বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। ধর্ষণকারী সরকার দলের শিক্ষক প্যানেলের নির্বাচিত ছিলেন। তাই ঘটনার সঙ্গে সরকার ও বিরোধীদলীয় রাজনীতি জড়িয়ে পড়েছিল। বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য খুবই বিব্রতকর। না তারা এদিক সামাল দিতে পারছে, না ওদিক। কিন্তু রায়হানরা যখন দেখলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, তখন তারা চেষ্টা শুরু করলেন দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দিতে। এতে সরকারের ওপর চাপ বাড়বে। কিন্তু এরই মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা সব বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তারপর ধীরে ধীরে ধর্ষণ বিষয়টাও ধামাচাপা পড়ে যায়।

সেই বন্ধের মধ্যে একদিন রায়হান কবিরের সঙ্গে দেখা হয় শাহানা আক্তারের। সেটা পার্টি অফিসে। শাহানা আক্তার খুব আফসোস করছিলেন আন্দোলনটাকে সফল করতে না পেরে। রায়হানকে বলেছিলেন আন্দোলনের ধরন পাল্টাতে। এ যুগে সেই মান্ধাতা আমলের বুলি আউড়ানো আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীরা সম্পৃক্ত হতে চায় না। সব যেন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। এভাবে আন্দোলন করে কখনোই কিছু হবে না। তাই আন্দোলন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। যেকোনো উপায়েই সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কথাটা রায়হান কবিরের ভালো লেগেছিল। কিন্তু পার্টির অন্যান্য নেতা এর বিরোধিতা করলেন আড্ডার ছলে। বললেন, এভাবেই আন্দেলন করে যেতে হবে। ফল একদিন আসবেই। কিন্তু শাহানা এই মতের বিরোধিতা করলেন। তার ধারণা, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পর্টির সঙ্গে আর সম্পৃক্ত নেই। মুখে বুলি আউরে আন্দোলনের দিন শেষ। মূল ধারার রাজনীতিতে জনগণ তাদের আদর্শ ঠিক ধরতে পারছে না। এই সুযোগ নিচ্ছে সরকারি দল কিংবা বিরোধীরা। গণতন্ত্রের নামে তারা দল ভারী করছে। কিন্তু গণতন্ত্রের দেখা পাচ্ছে না জনগণ। জনগণ যেন কুয়াশার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কিছু। সেই কিছুটাই তাদের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। জনগণ যদি উপকৃত না-ই হয়, তাহলে তারা কোনো দলেই ভিড়বে না। তাই পার্টির উচিত জনগণকে নিয়ে ভাবা। জনগণ কী চায়, তার কাছাকাছি যাওয়া। রায়হান শাহানার কথায় একমত হলেন। কিন্তু অন্য নেতারা কোনো জবাব দিলেন না। বা তাদের নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করলেন না। শাহানার মনে হলো, আসলে তাদের এটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। যখন আন্দোলন করা দরকার, তখন একটা ফরম্যাটে আন্দোলন করা হচ্ছে। এটা যেন পার্টির রুটিন কাজ। শাহানা আর কথা বাড়ালেন না। বেরিয়ে পড়লেন পার্টি অফিস থেকে। পিছু পিছু রায়হান।

– আমার মনে হয় কি রায়হান ভাই, আমাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগেই একটু একটু করে চরমপন্থা বিস্তার ঘটছে। সামনে এর পরিণতি হবে কিন্তু ভয়াবহ।

রায়হান একটু থতমত খেয়ে যান। এ রকম একটা প্রসঙ্গ শাহানা

এই মুহূর্তে তুলবে রায়হান ভাবতেই পারেনি।

– হঠাৎ এ রকম একটা প্রসঙ্গ?

– এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবছি না। ইরাকে এই যে মার্কিন আগ্রাসন... কারণ কি জানেন?

– না, আমি জানি না।

– আচ্ছা এসব টপিকস এখন থাক। চলেন কোথাও বসে চা খাই। পার্টি অফিস থেকেই মাথাটা ধরে আছে।

রায়হান আর কথা বাড়ান না। রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানের টুলে বসেন ওরা। চা খেতে খেতেই রায়হান আড়চোখে শাহানাকে দেখেন। আহামরি সুন্দরী না, কিন্তু কী এক ভীষণ দীপ্তি ওর চোখে-মুখে। সেই থেকে রায়হান শাহানার প্রেমে পড়ে যান। এরপর ঘনঘন ওদের দেখা হতে থাকে। নানা বিষয় আলোচনায় আসে। নিজেদের মধ্যে নানা ভাব ও চিন্তা বিনিময় হতে থাকে। একটা সময় দুজনেই বুঝে যায় একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তার দু মাস পরেই তারা বিয়ে করেন। সেও এক যুগ আগের কথা। তার দুই বছর পরেই তাদের কোলজুড়ে আসে মেঘনা।

শাহানা ঘর সংসার আর মেঘনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রায়হান ধীরে ধীরে রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। পাশাপাশি ছোটখাটো ব্যবসা। শাহানা রাজনীতি থেকে একটু সরে এলেও নিয়মিত তিনি খোঁজ-খবর রাখেন কোথায় কী হচ্ছে। মাঝে মাঝে রায়হানের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপও হয় তার। সময় পেলে ছোটখাটো রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যান তিনি। এখন অবশ্য নামের তোমন কোনো প্রসার নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বামরা যেন একপেশে হয়ে গেছে। রায়হানরা চেষ্টা করছেন দলীয় কার্যক্রমের আরও ব্যাপ্তি ঘটাতে। নতুন করে কর্মী জোগাতে, কিন্তু তেমন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক প্রধান দুই দলের দিকেই বেশি ঝুঁকছে ছাত্রছাত্রীরা। এর পেছনে কাজ করছে পুঁজিবাদী টাকা ও কর্মীদের ওপর নানা প্রলোভন। ফলে তারা আদর্শের দিকে না ঝুঁকে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আরেকটা বিষয়ে রাহয়ান খেয়াল করেছেন, খেয়াল বলতে শাহানাই চোখে আঙুল দিয়ে রায়হানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখনকার তরুণ সমাজের পড়াশোনার দিকে আগ্রহ অনেক কম। একটা সময় ছিল রায়হান-শাহানারা রাজনীতির ওপর বিস্তর পড়াশোনা করতেন–মার্কস-লেনিন-মা-ও সেতুংয়ের মতো নেতাদের জীবনী তাদের অনুরণিত করত। তাদের সময় নানা রকম আদর্শবাদী বই পাওয়া যেত। তারা বলতেন টেক্সট বুক। শিক্ষাহীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব নয়। অনেককে সেই সময়ে আদর্শবাদী রাজনীতি ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলতে শোনা যেত। সে যা-ই হোক। দেশের কথাই ভাবত সবাই। কিন্তু এখন, পড়াশোনা তো নেই বলতে গেলে। বইও আজকাল পাওয়া যায় না। রাজনীতি করতে হলে এখন কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। যে কেউ যখন-তখন রাজনীতিতে ঢুকে যেতে পারে। সেখানে কোনো আদর্শের বালাই নেই। যেকোনো নেতার পায়ের কাছে বসে থাকলেই সে রাজনৈতিক কর্মী। মাঝে মাঝে রায়হানের হাঁসফাঁস লাগে। কী লাভটা হলো সারা জীবন রাজনীতি করে। শাহানার কথা তার আবারও মনে হলো। সেই মান্ধাতা আমালের সেন্টিমেন্ট ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে বাম রাজনীতিকে বেশিদূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব না। এখনো তারা রুটিনমাফিক মিছিল-মিটিং করে। এভাবে হবে না–রায়হানে এত দিনে বুঝে গেছে। মাঝে মাঝে রায়হানের খুব হতাশ লাগে। কিন্তু জানেন এবং বিশ্বাস করেন, কমরেডদের হতাশ হতে নেই।

আজকে রায়হানের তিনজন রাজনৈতিক বন্ধু এসেছেন বাসায়। জরুরি একটা রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছে। মেঘনাকে খাইয়ে দিয়ে শাহানাও তাদের সঙ্গে অংশ নেন। এসব আলাপ রায়হান পার্টি অফিসেও করতে পারতেন। কিন্তু পার্টির বয়স্ক মেম্বাররা আজকাল কোনো রিস্ক নিতে চান না। প্রথাগত আন্দোলনই তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। রায়হান বিকল্প খুঁজছেন। পার্টিকে আবার দাঁড় করাতে হবে। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। তার কাছে মনে হয়, দেশ ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অন্ধকারটা কি কেউ বুঝতে পারছেন না। চরমপন্থীদের আগ্রাসনের একটা ছোঁয়া অনুভব করছেন তারা। তাহলে কী ঘটতে যাচ্ছে সামনে–কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারছে না।

৮

বাবলু যাচ্ছিল কারওয়ান বাজারের দিকে, হাঁটছিল ফার্মগেট বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে ফুটপাত ধরে। আলফু-গণিদের সঙ্গে দেখা হবে ওখানে, কারওয়ান বাজারের গলিতে, সে রকমই কথা ছিল ওদের। কদিন ধরে কিছু ভালো লাগছে না বাবলুর। আগের মতো রাস্তায় কাগজ-প্লাসটিকের বোতল কুড়াতে হচ্ছিল না, সেটা একটা কারণ হতে পারে। আবদুল হক ওদের হাতখরচ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার ঘুরেফিরে অভিজাত এলাকার সেই বাড়িটা, মেয়েটার কথা প্রায় মনে পড়তে থাকে বাবলুর, নাকি মেয়েটার মায়ের আদর–কে জানে! তবে কী এক তীব্র টান বাবলু অনুভব করে, সেটা সে নিজের কাছেই ব্যাখ্যা করতে পারে না। তবুও সে প্রতিদিন একটা করে গোলাপ রেখে আসে রাস্তার ওপর। মেয়েটা ফুলটা তুলে নেওয়া পর্যন্ত দেখে সে ওখান থেকে ফিরে আসে। ফুটপাতের ড্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবলুর মনে হতে থাকে, বাকি জীবন তাকে হয়তো এভাবে ফুল কিনে যেতে হবে একটা করে, রেখে আসতে হবে মেয়েটার বাড়ির সামনের রাস্তায়–এর থেকে যেন তার কোনো নিস্তার নেই। নেশার মতো একটা ঘোর কাজ করতে থাকে ওর মনের ভেতর। কিন্তু বাকি জীবন কত দিন? কত দিনে একটা জীবন হয়? বাবলুর অঙ্কের জ্ঞানে বাকি জীবনের হিসাব সে করতে পারে না।

ফার্মগেট পার হতেই রাস্তার পাশে একটা সাদা গাড়ি পার্ক করা চোখে পড়ল বাবলুর। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গেল সে। অনেকক্ষণ ধরে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, প্রস্রাবের বেগ চেপেছিল বোধ হয়, গাড়িটা দেখে আরও চাপ বাড়ল। আশপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কি না। না নেই। গাড়ির ভেতরে ড্রাইভারও নেই। তারপরও কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটার পাশে, গাড়িরটাকে পাশ কাটিয়ে অন্য গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে। মাঝ রাস্তার পাশে সাদা গাড়িটা এমনভাবে পার্ক করা, পেছনের ছুটে আসা গাড়িগুলো এখানে এসে ব্রেক কষতে হচ্ছে পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে অন্য গাড়িগুলো পাশ কাটতে একটু দেরি হতেই মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছিল জ্যাম। বাবলু তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সব দেখছিল। এর মাঝে একজন ট্রাফিক পুলিশ এসে দাঁড়াল গাড়িটার পাশে, ড্রাইভারকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল কিছুক্ষণ। ড্রাইভার আশপাশে নেই। ট্রাফিক পুলিশ সাদা গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

–স্যার, মামলা দিয়া দেন।

বাবলু পুলিশের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল। পুলিশ তাকাল না পর্যন্ত বাবলুর দিকে। আনমনে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত উঁচিয়ে পেছনে আসা গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা দিতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, পেছনের মোড়ে গাড়ির একটা জটলা লেগে গেছে। পুলিশ হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে গেল সেদিকে। এই সুযোগে বাবলু আবার গাড়িটার বেশ কাছাকাছি চলে এলো, তাকিয়ে রইল পুলিশের চলে যাওয়া রাস্তার দিকে, লক্ষ রাখল পুলিশ পেছন ফিরে তাকায় কি না। না, পুলিশ পেছনের দিকে তাকাচ্ছে না। খুব দ্রুততার সঙ্গে প্যান্টের জিপার খুলে গাড়িটার গায়ে মুতে দিল বাবলু। মুততে মুততে তার মনে পড়ল, মেয়েটার বাড়িতেও একটা সাদা গাড়ি আছে। দেখতে অনেকটা এই গাড়িটার মতোই। ধুর! আফসোস করল বাবলু–এটা আগে মনে পড়লে সেটা সাদা গাড়িটার গায়ে মুততে যেত না, সামনে কিছু দূরে আরেকটা একটা ধূসর ছাই রঙের গাড়ি পার্ক করা ছিল। যাক! এটাই শেষবার–সাদা রঙের গাড়ি, আর কখনো সাদা রঙের গাড়ির গায়ে মুতবে না সে,

এ রকমটাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে। মেয়েটার নাম কী? বাবলু জানে না, চাইলে সে একটা মনগড়া নাম দিয়ে দিতে পারে। কী নাম? শেফালি? ঝর্ণা? মরিয়ম? কোনো নামই বাবলুর মনঃপূত হচ্ছিল না। অভিজাত এলাকার মেয়েদের নাম কী হয়, বাবলু ধারণা করতে পারল না। ততক্ষণে মোতা শেষ করে সে আবার হাঁটা দিল কারওয়ান বাজারের দিকে।

আলফু-গণি-নারায়ণরা কারওয়ান বাজারে আছে। কোথায় সেটা, খুঁজে বের করতে হবে। বিকেলে সবার একসঙ্গে আবদুল হকের ওয়ার্কশপে যাওয়ার কথা। তিনি ওদের যেতে বলেছেন। আলফু ইতিমধ্যে আবদুল হকের ভক্ত হয়ে গেছে। বরাবরই খাবারের লোভ তার। নারায়ণ একটু বুদ্ধিমান, সে আবদুল হককে খুব একটা পছন্দ করছে না। আবদুল হকের প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, ব্যাটায় একটা ধান্দাবাজ। বাবলু অবশ্য এখনই কিছু ভাবছে না। আবদুল হক ধান্দাবাজ হলেইবা তার কী! শুধু দেখতে হবে, তিনি কেন ডেকেছেন—কোনো আকাম না করান ওদের দিয়ে। শহরের মানুষগুলো তার কাছে বরাবরই ধান্দাবাজ ধরনের। সবাই কোনো না কোনো ধান্দা করে এই শহরে টিকে আছে। হয়তো কেউ কেউ ভালো, কিন্তু বাবলুর কাছে বেশির ভাগই খারাপ ধান্দাবাজ। কারণ সে তার আশপাশে যাদেরই দেখেছে, কাউকে তার ভালো মানুষ মনে হয়নি। বাবলু জানে, এই শহরে সব চলে। শহরজুড়ে যারা অসহায়, ভিক্ষা করে বেড়ায়, তারাও কোনো না কোনো ধান্দাবাজ লোকের হয়ে কাজ করে। নইলে এই শহরে ভিক্ষা করার জায়গাটুকুও সে পেত না। এ রকম দুজনের নাম বাবলু জানে—একজন কানা গাফফার মিয়া, ফার্মগেটের ওস্তাদ। আরেকজন ফকিরাপুলের নাসির শেখ। যদিও দুজনের কাউকে সে চোখে দেখেনি, কিন্তু তাদের কীর্তিকলাপ সে জানে। তাদের মতো এই শহরে অনেকেই রাস্তায় কাগজ-প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে ভাঙারি দোকানে বেচে চলে। নান্নু গত বছর হারিয়ে গিয়েছিল, নান্নাকে বাবলুরা চিনত। পরে শুনেছে নান্নুকে কানা গাফফার মিয়ার লোক ধরে নিয়ে একটা পা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে, ল্যাংড়া বানিয়ে শহরে ভিক্ষা করাচ্ছে। নান্নুর সঙ্গে পরে আর ওদের দেখা হয়নি। শোনা কথা হলেও বাবলু জানে, এসবই সত্যি। চোখের সামনে মাঝে মাঝে মাজিদা খালার সঙ্গে বাবলুদের দেখা হয়। মাজিদা খালাকেও কানা গাফফার মিয়ার লোক চোখে ওষুধ ঢেলে দিয়ে দুই চোখ কানা করে দিয়েছিল। মাজিদা খালাও এখন ভিক্ষা করে। এই গল্প মাজিদা খালার মুখ থেকে শুনেছে বাবলুরা। এ রকম, যারা এই শহরে ভিক্ষা করে, তাদের সব টাকা জমা দিতে হয় ওস্তাদের কাছে। সেখান থেকে ওস্তাদরা ওদের প্রত্যেককে দৈনিক হারে হাতখরচ দেন, থাকা-খাওয়া যার যার।

কারওয়ান বাজারের মতি মিয়ার চায়ের দোকানে এসে থামল বাবলু। পিপাসা পেয়ে গিয়েছিল, একটু ক্ষুধাও। আশপাশে তাকিয়ে দেখল, আলফু-গণি-নারায়ণরা কেউ নেই। বাবলু মনে হয় ওদের আগে এসে পড়েছে। মতি মিয়ার দোকানে উঁকি দিয়ে দেখল পানির ড্রামগুলো ভরা। ভেবেছিল ওয়াসার কল থেকে দুই ড্রাম পানি টেনে দিয়ে একটা কলা-পাউরুটি নিয়ে খাবে। যদিও পকেটে ত্রিশ বা বত্রিশ টাকা আছে। সেটা সে এখন খরচ করতে চায় না। ততক্ষণে মতি মিয়া আড়চোখে একবার তাকাল বাবলুর দিকে,

– কই আছিলি? দেখি নাই যে...

– এদিক আসি নাই।

– লাট সাহেবের বাচ্চা। কামের সময় খুঁইজা পাই না।

– আলফু-গণিরা কই? দেখছেন?

– ওরাও তো তোর মতো লাট সাহেব।

– একটা কলা খাই?

মতি মিয়া ড্রামের ওপর ছিঁড়ে রাখা একটা কলা হাত বাড়িয়ে দিল। কলার বোঁটার দিকে অর্ধেকটা পচা। কেউ ছিঁড়ে রেখেছে বা ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাই কলার বোঁটার দিকে পচন ধরে গেছে।

– এই কলা খাই না।

– তাইলে ট্যাকা দিয়া কিন্যা খা।

বাবলু কলাটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। একটা বড় সাইজের ভালো কলা ছিঁড়ে নিল কাঁদি থেকে। পকেট থেকে বের করে দিল দুই টাকা। মতি মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। অন্য কাস্টমারের জন্য চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে, মুখ না ঘুরিয়ে, হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল সে। বাবলু আরও দুই টাকা পকেট থেকে বের করে ড্রামের ওপর রেখে, কাচের বয়াম থেকে দুইটা বিস্কুটও বের করে নিল। পকেটে টাকা থাকলে বাবলুর তেজ বেড়ে যায়। মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার খেতে এখন আর ইচ্ছে করে না। বাবলু পানির ড্রামের ওপর বসে, পা দুলিয়ে দুলিয়ে বিস্কুটে কামড় দিয়ে কলা খেতে লাগল। বাবলু জানে আলফু-গণি-নারায়ণরা যেখানেই থাকুক, কারওয়ান বাজারে আসলে মতি মিয়ার চায়ের দোকানে আসবেই। এটা বাবলুকে খুঁজে পাওয়ার আরেকটা ঠিকানা। তা ছাড়া ওদের বলাই ছিল, কারওয়ান বাজারের গলিতে এলে এখানেই ওকে পাওয়া যাবে।

আবদুল হক কিছুদিন ধরে অস্থিরতায় ভুগছেন। ইদানীং হরতাল খুব একটা জমছে না। সাধারণ মানুষ হরতালে অংশগ্রহণ করছে না কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা রাস্তায় তেমন গণ্ডগোল পাকাতে পারছে না অথবা সরকারি দলের কর্মীরা মাঠে সশস্ত্র সরব বা সরকারের পুলিশ বাহিনী কোনো হরতাল সফল হতে দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে গেল দুইটা হরতালে মাত্র কয়েকটা গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে রাস্তায়, কয়েকটা গাড়িতে মাত্র আগুন জ্বলেছে—তা-ও হাতে গোনা। সেখান থেকে মাত্র একটা গাড়ি এসেছে তার ওয়ার্কশপে। এভাবে ব্যবসা চালানো যাবে না, ভাবতে ভাবতে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আরেকটা চেয়ারে পা দুটো পেতে নাচাচ্ছিলেন আবদুল হক। সামনে আবার দিন দুয়েকের হরতালের ডাক দিয়ে রেখেছে বিরোধী দল। আবদুল হক বুঝতে পারছেন না, এবার কী হবে! এভাবে দিনের পর দিন চললে দেশে হরতাল বলে কিছু আর থাকবে না। হরতাল না থাকলে তার বা তাদের ব্যবসায়ও মন্দা। এবার তিনি ভাবছিলেন গাড়ির গাসের একটা বড় চালান আনবেন চায়না থেকে। কিন্তু হরতালের ভাব-গতি দেখে এলসিটা খোলেননি। তা ছাড়া আরেকটা সমস্যা সামনে হাজির হয়েছে ইদানীং, আগে এ রকমটা ছিল না। গাড়িতে পেট্রলবোমা। তাতে পুরো গাড়ি বা বাস পুড়ে কয়লা হয়ে যায় আগুন নেভানোর আগেই। গাড়ির ভেতরে থাকা মানুষগুলো বের পর্যন্ত হতে পারে না, তারাও পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। এ রকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে গত কয়েক মাসে—হরতাল ছাড়াই, দিনের আলোয়। কারও বুঝতে বাকি ছিল না, এসব কাদের কাজ। হরতাল-অবরোধ-মিছিলে যখন সুবিধা করতে পারছিল না বিরোধী দল, সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এই উদ্ভাবন। অনেকে বলাবলিও করেছে, তাতে নাকি বিদেশি কিছু মৌলবাদী ইসলামি সংগঠনের গুপ্তচরেরাও জড়িত, সেখানে তাদের আর্থিক জোগান আছে। তার জন্য বিদেশ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকার ফান্ড আসে। সেসব টাকা বিলি-বণ্টন হয়, দেশে জ্বালাও-পোড়াও হয়, মানুষ মরে, জানমালের ক্ষতি হয়, তাতে ইসলামের কী লাভ হয়—আবদুল হক বুঝতে পারেন না। আবদুল হক রাজনীতি বোঝেন, কিন্তু এ রকম রাজনীতির হিসাব মেলাতে গিয়ে তার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। শুধু অসহায়ের মতো দেখেন, কদিন পর পর পত্রিকায় কঙ্কাল হয়ে যাওয়া কালচে-পোড়া গাড়ির ছবি ছাপা হচ্ছে, পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোর চেহারা চেনা যাচ্ছে না—এ রকম খবরের শিরোনাম হতে থাকে দেশে ও বিদেশের খবরের কাগজগুলোতে। রাজনীতির এ রকম দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেননি তিনি। ফলে হরতালের চালচিত্র এখন আর আগের মতো নেই বা বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তবুও আরও দু-একটা হরতাল তিনি দেখতে চান। তা ছাড়া সামনে সিজন। নির্বাচন আসছে। হরতাল তো মাত্র শুরু। এখনই যদি এ অবস্থা হয়। সামনে কী আছে কপালে, কে জানে। আবদুল হক কোনোভাবেই তার ব্যবসা ও হরতালের হিসাব মেলাতে পারছিলেন না। একবার ভাবছিলেন, গাড়ির গাসের চালানটা নিয়ে আসবেন চায়না থেকে, পরে যা হয় হবে। কিন্তু তাতেও যেন ভরসা পাচ্ছেন না। এ রকম দোটানায় থেকে থেকে আবদুল হকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে কয়েকটা দিন ধরে।

তিনি বাবলু-আলফু-গণি-নারায়ণকে আসতে বলেছেন। অল্প বয়সের টোকাইয়ের একটা সুবিধা আছে। ওদের নিয়ে পুলিশি ঝামেলা কম হয়। হরতালে পুলিশ সাধারণত অল্পবয়সী পিকেটার ধরতে চায় না, তাতে অযথা ঝামেলা বেশি–কোর্টে চালান করার পরও ঝামেলা হয়, বয়সের কারণে। কিন্তু গাড়ির গাস ভাঙা এত সহজ না। গায়-গতরে একটু শক্তি লাগে। তাও দেখা যাক, কী হয়। আজকাল তো হরতালের ওপরেও ভরসা নাই। দিব্যি গাড়িঘোড়া চলে। কোনো অ্যাকশন নেই। বিরোধী দলের যে কী হইছে, আজকাল পিকেটিংও করতে পারছে না। ঠিকমতো পিকেটিং করতে না পারলে হরতাল ডাইকা লাভ কী? আবদুল হকের মাথায় ঢোকে না, আনমনেই গজরাতে থাকেন তিনি। তবুও আবদুল হক মনে মনে একটা অঙ্ক কষলেন। কয়েকটা পয়েন্ট ঠিক করলেন, যেখানে পিকেটিং হতে পারে। বাবলুদের ওইদিকে পাঠিয়ে দেবেন তিনি, এ রকমটাই পরিকল্পনা তার।

বাবলু-নারায়ণ-গণি-আলফু এলো আবদুল হকের গ্যারেজে। আবদুল হক ওদের দেখে দুবার খুক খুক করে কাশলেন। তিনি ওদেরই অপেক্ষা করছিলেন।

– তেহারি খাওয়াবেন বলছিলেন।

আলফু মুখ ফসকে, তর সইতে না পেরে বলে ফেলল। আবদুল হক তার কথায় কোনো সাড়া দিলেন না। হাতের ইশারায় ওদের বসতে বললেন। বাবলু আবদুল হককে দেখে একটু বোঝার চেষ্টা করল। তিনি কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত, বুঝতে পারল সে। তাকে অন্যদিনের মতো লাগছিল না; বরং আগের থেকে অনেক বেশি গম্ভীর লাগছিল। অন্যদিন তিনি বাবলুদের সঙ্গে তামশা-মশকরা করতেন, গালভরা থাকত পান, আর ঘন ঘন সিগারেট বের করতেন পকেট থেকে। এখন কেমন চুপচাপ পা গুটিয়ে বসে আছেন ওদের সামনে। বাবলু ঘাড় ঘুরিয়ে নারায়ণের দিকে তাকাল একবার। নারায়ণ লোকটাকে নিয়ে কিছু ভাবছে কি না, আন্দাজ করার চেষ্টা করল। আলফু বসে বসে পেট চুলকাচ্ছে। তার অন্য কিছু নিয়ে তেমন কোনো ভাবনা নেই।

– পরশুদিন হরতাল। তোদের একটা কাজ দিব। করতে পারলে ট্যাকা পাবি। অনেক ট্যাকা। পারবি?

– পারুম।

আলফু বাকিটা না শুনেই রাজি হয়ে গেল, হয়তো অনেক টাকার কথা শুনে। নারায়ণ তাকাল বাবলুর দিকে। গণির কোনো ভাবান্তর নেই। ওরা যা করবে তার সবকিছুতেই আছে গণির। ফলে তার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। বাবলু আবদুল হককে নিয়ে নানা কিছু ভাবতে লাগল। কী কাজ হতে পারে, আবদুল হক যে তাদের ডেকে ডেকে মাগনা তেহারি খাওয়াচ্ছেন না, মাঝে মাঝে হাতখরচ দিচ্ছেন, তাও যে এমনি এমনি না, সেটা সে অনেক আগেই আন্দাজ করে রেখেছিল। তবুও তার মনে একটাই সাহস ছিল, ওরা একসঙ্গে থাকে। ও একা হলে একটা চিন্তার বিষয় ছিল।

– কী কাম?

বাবলু আবদুল হকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

– হরতালে পিকেটিংয়ের সময় গাড়ি ভাঙতে হইব। প্রত্যেকটা গাড়ির জন্য পঞ্চাশ টাকা।

– গাড়ি ভাঙমু? ক্যামনে?

আলফুর চোখ কপালে উঠল। এ রকম কথা আগে সে জীবনেও শোনেনি।

– কাজটা সহজ। হরতালে তো গাড়ি ভাঙে-পোড়ে। দেখোস নাই?

– হ, দেখছি।

আলফু মাথা নাড়ল।

– তোরা ভাঙবি গাড়ির কাচ। হরতালে কোনো গাড়ি চলব না। গাড়ি বাইর হইলেই ইটা নিয়া ঢিলায়া গাড়ির কাচ ভাঙবি। পারবি না? সহজ কাজ। একটা করে গাড়ির জন্য পঞ্চাশ টাকা।

নারায়ণ তাকাল বাবলুর দিকে। কিন্তু আলফু হাঁ করে তাকিয়ে রইল আবদুল হকের মুখের দিকে, যেন সে নতুন করে আবার দেখছে তাকে। গণি কান চুলকাচ্ছিল আপনমনে, বাবলু আর নারায়ণ যা করবে সে-ও তাই করবে, তাই এসবে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

এই শহরে হরতাল-মিছিল-গাড়ি ভাঙচুর নতুন কিছু না, বাবলুরা সবাই তা জানে। প্রতি হরতালে কিছু না কিছু গাড়ি ভাঙচুর হবেই। অনেক দেখেছে তারা। ছোটখাটো–জনা বিশেক মানুষের মিছিল থেকে হঠাৎ করেই দুচার জন মিছিলের স্লোগানে উত্তেজিত হয়ে আশপাশ দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির ওপর হামলে পড়ে তারা। ইটপাটকেল পথের ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কিংবা কেউ কেউ হয়তো পকেটে বা হাতের ব্যাগে ইটের টুকরো নিয়ে মিছিলে আসে, গাড়ির জানালায় ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ততক্ষণে গাড়ির কাচ ভেঙে চৌচির। এ রকম পরিস্থিতি বাবলুদের সামনে আগে অনেকবার পড়েছে, ওরা শুধু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। ওরা হয়তো এমন, কিন্তু অনেক টোকাই উৎসবের আনন্দের মতো গাড়ি ভাঙচুরে যোগ দেয়, বুঝে না-বুঝে স্লোগানে গলা ফাটায়। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আবার এদিক-ওদিকে পালিয়েও যায়। কিন্তু বাবলুদের এসব ভাঙচুর ভালো লাগে না। তাই ওরা সেখানে যোগ দেয় না।

– এক শ টাকা কইরা দিবেন।

নারায়ণ তাকাল আবদুল হক সাহেবের দিকে, দরদাম করার ভঙ্গিমায়।

– না, পঞ্চাশ। পরেরবার পাবি বেশি। তারপর আরও বেশি...

নারায়ণ আর কথা বাড়াল না, বাবলুও না। যদিও এ কাজ তারা আগে কখনো করেনি। হরতাল মানে টোকাইদের জন্য উৎসব। পুরো শহর তখন তারা ঘুরে বেড়ায়। নানা জায়গায় নানা রকম মিটিং-মিছিল চলে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা হয় সেখানে, যদিও তার কিছুই বোঝে না তারা। মিছিল শেষে কিংবা মিছিলের মধ্য থেকে এখানে-ওখানে গাড়ি ভাঙা দেখে, গাড়ি পোড়ানোও দেখে। গাড়ি পোড়ানোটা গত কয়েকটা হরতালে দেখেছে। আস্ত বাস পুড়িয়ে দিয়েছে মিছিলকারীরা। মাঝে মাঝে তারা ভাবে, এটা একটা আজব দেশ। গাড়ি পোড়ে, গাড়ি ভাঙে, তাতে আশপাশের মানুষের কোনো বিকার নেই। সেসব দেখতে দেখতে সবাই পাশ কাটিয়ে যে যার কাজে চলে যায়, মাঝেমধ্যে পুলিশ এসে একটু ধাওয়া-টাওয়া দেয়, এ পর্যন্তই। ফলে কাজটা তাদের জন্য খুব একটা কঠিন মনে হলো না।

ততক্ষণে সবার জন্য তেহারি এসে গিয়েছিল। সবার আগে আলফু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর।

৯

শাহবাগের কোনায় চা-পান-বিড়ির দোকানে বসে চা খাচ্ছেন আবদুল হক। টেনশনে ঘন ঘন সিগারেটও খাচ্ছেন। ভাবছেন আজকের হরতালটা জমবে কি না। যদিও পোলাপান ভালোই পিকেটিং করছে। বাবলুরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের ছেলেরা। কিছুক্ষণ আগে কয়েকটি হাতবোমা ফুটেছে শহবাগ মোড়ে। আবদুল হক খোঁজ নিয়ে জেনেছেন রাস্তায় গাড়ি নেমেছে অনেক। কিন্তু শাহবাগের দিকে গাড়ি আসছে কম। আবদুল হক সিগারেট শেষ করে একটা পান মুখে দিলেন। ভাবছেন, বিরোধী দলের ছেলেরা এখনো হরতাল করতে শিখে নাই। একটা জায়গায় এত টাইট দিলে তো হবে না। হরতাল জমবে না, গাড়ি যদি এদিক না আসে, গাড়ি যদি না পোড়ায়, গাড়ি যদি না ভাঙে। তাইলে তো সরকার টলবে না। দুই-চারটা লাশ পড়তে হবে। ছাগলের দল এইদিকে পিকেটিং করতেছে, ওই দিকে মিরপুর রোডে গাড়ির জ্যাম। এইটা হইল কিছু? শাহবাগে এই মুহূর্তে পিকেটিং লুজ করা

দরকার। কিছু গাড়ি আসুক, ভাঙচুর হোক। দুইটা লাশ পড়ুক। তবেই না হরতাল। লাশ না পড়লে সরকারের গদির কিছুই হবে না। আবদুল হক পিচ করে পানের পিক ফেলেন। পিকেটিংয়ের আসল সূত্র হচ্ছে মাঝে মাঝে টাইট দিয়ে মাঝে মাঝে একটু লুজ দিতে হয়। এর মাঝেই দু-চারটা গাড়ি ভাঙচুর হয়ে যাবে। এ রকম ভাবতে ভাবতেই আরও দুইটা ককটেল ফুটল। কোথা থেকে দাঙ্গা পুলিশের একটা দল ধাওয়া করল পিকেটারদের। আবদুল হক একটু সড়ে দাঁড়ালেন। পান মুখে থাকতেই আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এখন একটা চান্স তৈরি হবে। পিকেটাররা সরে গেলে কিছু গাড়ি আসবে এদিকে। আবদুল হক খিলগাঁওয়ে ফোন দিলেন খবর জানার জন্য। ওদিকে দুইটা বাস পোড়ানো হয়েছে। বাসে যাত্রী কম ছিল। শুধু হেলপার আগুনে পুড়ে মারা গেছে। একটা প্রাইভেট কারের গাস ভেঙেছে পিকেটাররা। 'মাত্র একটা' ভাবল আবদুল হক। একটা-দুইটা প্রাইভেটের গাস ভেঙে কি আর ব্যবসা করা যাবে। আবদুল হক কড়া করে টান দিলেন সিগারেটে।

আধা ঘণ্টার মধ্যে শাহবাগ ছেয়ে গেল গাড়িতে। পিকেটাররা এখন আর নেই। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। পুলিশের নিরাপত্তা পেয়ে এদিকে গাড়ি আসছে। আবদুল হক হিসাব মেলালেন। কিছু গাড়ি ভাঙচুর হবে এখানে। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নিশ্চিত হওয়ার কারণও আছে। তিনি পিকেটারদের চিনে রেখেছিলেন। তারা বিভিন্ন দিকে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করছে। আবদুল হক জানেন কিছুক্ষণ পর পুলিশ কমে যাবে। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে। ঠিক তখন যদি পিকেটাররা ককটেল ফোটাবে। আবদুল হক উত্তেজনায় হাতের আঙুল মটকালেন।

আবদুল হককে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হঠাৎ করে শাহবাগের এক কোনা থেকে ককটেল ফোটা শুরু হলো। দিকবিদিক ছুটতে গিয়ে গাড়ির জ্যাম লেগে গেল শাহবাগ মোড়ে। এরই অপেক্ষায় ছিলেন আবদুল হক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশারা করলেন। বাবলুরা রাস্তার পাশে জমিয়ে রাখা ইট ছোড়া শুরু করল গাড়িগুলোর দিকে। বাবলুদের মধ্যে ভয় বা দ্বিধা কিছুই কাজ করল না। একটা গাড়ির কাচ ভাঙলে আরও উৎসাহে আরেকটা গাড়িতে ঢিল ছুড়ছে ওরা। যেন এটা একটা খেলা। দূর থেকে আবদুল হক শুধু গাড়ি গুনছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দাঙ্গা পুলিশ চলে এলো। পিকেটারদের দিকে দুবার ধাওয়া করে তৃতীয়বার টিয়ার শেল ছুড়তে লাগল। শাহবাগ হয়ে গেলে রণক্ষেত্র। একবার পুলিশ ধাওয়া করে, আরেকবার পিকেটাররা। এভাবে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলতে থাকল। এর মধ্যেই গোটা দশেক গাড়ি ভাঙচুর হয়ে গেছে। আবদুল হক আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আশপাশে তাকালেন। বাবলুরা কোথায়। ওরাই বোধ হয় গোটা চারেক গাড়ির কাচ ভাঙতে পেরেছে। আবদুল হক তাতেই খুশি। আশপাশে বাবলুদের দেখতে পেলেন না।

নারায়ণ গাড়ির কাচ ভেঙেছে দুইটা। বাবলু একটাও ভাঙতে পারেনি। ওদিকে আলফু ও গণি একটা একটা করে দুইটা গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে। প্রথমে বিষয়টা মজাই লেগেছে, কিন্তু হঠাৎ করে দাঙ্গা পুলিশের টিয়ার শেলের ধোঁয়ায় ওরা দিকবিদিক ছুটে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নারায়ণ কোনদিকে দৌড়ে গেছে বাবলু খেয়াল করতে পারেনি। বাবলু প্রথম ইটটি ছুড়েছিল ঠিকই কিন্তু গাড়ির কাচে লাগাতে পারেনি। ততক্ষণে নারায়ণ দুইটা গাড়িতে ইট ছুড়ে গাস ভেঙে ফেলেছে। বাবলু আরেকটি ইট হাতে নিতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। দু-চারটা কষে চড়ও খেল। তারপর কিছুক্ষণের জন্য তার আর কিছু মনে নেই। পরে সে নিজেকে আবিষ্কার করল পুলিশের ভ্যানে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। যখন চোখ মেলল, তখন তার গা গোলাচ্ছে। মাথার ভেতরটা টনটন করছে। চড়টা যে বেকায়দায় বাবলুর ঘাড়ে লেগেছে এখন সে বুঝতে পারল। ঘাড় নাড়াতে পারছে না সে। পুলিশের ভ্যানের ভেতরই সে একবার বমি করে দিল। ভ্যানের ভেতর একটা পুলিশ বসা ছিল। বাবলুর বমি করা দেখেই সে রেগে উঠে এলো।

– মাদারচোদ, বমি করস। বাইরে মাথা দে...

বলেই একটা কষে লাথি দিল বাবলুর তলপেট বরাবর। লাথি হয়তো আরও দু-চারটা জুটত, কিন্তু তার আগেই কয়েকটা পুলিশ দুজন পিকেটারকে ধরে ভ্যানে তুলল। বাবলুকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে পিকেটার দুজনকে বসতে দিল ভ্যানের কোনায়। তারপর গাড়ি রওনা দিল সোজা থানার দিকে।

আবদুল হক ঘড়ি দেখলেন। মাত্র দুপুর হয়েছে। হরতালটা এখন থেকে একটু থিতিয়ে আসবে। পিকেটারদের অনেকে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে চলে গেছে। তিনি হিসাব রাখতে পারলেন না শাহবাগে মোট কয়টা গাড়ি ভাঙা হয়েছে। টিয়ার শেলের ধোঁয়া তার চোখেও একটু ঢুকেছে। তারপর থেকেই চোখ জ্বালা করতে করতে দুচোখ লাল হয়ে গেছে। দুপুরের পর সাধারণত হরতাল একটু ঝিমিয়ে আসে। মানুষজন দুপুরের পরেই গাড়ি বের করে। পিকেটাররাও একটু যেন ক্লান্ত হয়ে পার্টি অফিসের দিকে জড়ো হয়। বিকেলের দিকে হরতালের আমেজ আর থাকে না। ফলে যা করার দুপুরের আগেই করে ফেলতে হয়। আবদুল হক গাড়ি ভাঙার হিসাব করা শুরু করলেন। খিলগাঁও থেকে খবর এসেছে ওখানে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ছয়টা। মিরপুর রোডে তিনটা, কাকরাইলে এগারোটা। আবদুল হক ভাবলেন, খারাপ না। এর মধ্যেই আট-দশটা গাড়ি তার ওয়ার্কশপে ঢুকবে। আবদুল হক টিয়ার শেলের ধোঁয়া খেয়ে কাঁটাবনের দিকে চলে এসেছেন। বাবলুদের খোঁজও নিতে পারেননি। রাস্তায় আলফুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও একটা গাড়ির গাস ভেঙেছে জানিয়েছে। কিন্তু বাবলু আর নারায়ণের খোঁজ সে দিতে পারল না। তিনি আলফুকে নিয়ে নীলক্ষেতের দিকে হাঁটা দিলেন। তার ধারণা বাবলুরা কাজ শেষ করে নীলক্ষেতের দিকেই আসবে।

পুলিশের ভ্যান থানায় এসে থামতেই দেখা গেল অনেক আসামির ভিড়। নানা জায়গা থেকে পিকেটারদের ধরে লকাপে ভরে রেখেছে পুলিশ। বাবলুকেও ভরল। ছোট্ট একটা লকাপ, তার মধ্যে জনা ত্রিশেক। দাঁড়ানো বা বসার জায়গা নেই। বাবলু বুঝতে পারল এরা সবাই আজকের দিনের পিকেটার। বাবলু এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। এক কোনায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ছোট্ট মানুষ বলে এঁটেসেঁটে বসার একটু জায়গা হয়ে গেল।

– তোরেও ধরছে?

বাবলু চমকে উঠল। ডান দিকে তাকিয়ে দেখল নারায়ণ। দেয়ালে হেলান দিয়ে খিক খিক করে হাসছে।

– তুই তো দৌড় দিয়া পালাইছস। আমারে পুলিশ ধইরা ফেলছে।

বলল বাবলু।

– দৌড় দিয়াই তো ভুল করছি। দৌড়াইতে গিয়া পুলিশের গায়ের ওপর গিয়া পড়ছি।

বলেই নারায়ণ খিক খিক করে হাসতে থাকে। থানার লকাপে ঢোকানোর পর বাবলু একটু ভয় পেয়েছে। থানার লকাপ সম্পর্কে বাবলুর ধারণা খুব একটা ভালো না। যেদিন মোখলেস পুলিশ তার মাকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছে, বাবলুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই থেকে পুলিশ জিনিসটাই তার কাছে খারাপ কিছু। শেষ পর্যন্ত সেই পুলিশের লকাপেই তার জায়গা হলো। প্রথমে যতটুকু ভয় সে পেয়েছিল, নারায়ণকে দেখার পর তার ভয় কিছুটা কমেছে। নারায়ণ বুদ্ধিমান ছেলে। কিছু একটা ব্যবস্থা সে করেই ফেলবে।

– কোনো উপায় নাই। পুলিশের ডান্ডার বাড়ি খাইতে হইব মনে হয়।

নারায়ণের মুখে তখনো হাসি। সেই হাসি দেখে বাবলুর গা জ্বালা করতে লাগল।

– ক্যান, ডান্ডার বাড়ি ভয় পাস?

বাবলু কোনো উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল আরেক দিকে। নারায়ণ দেয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে আছে, যেন তার কোনো কিছুতে কোনো বিকার নেই। বাবলুর মেজাজ খারাপ হতে থাকে আবদুল হকের ওপর। ও আগে থেকেই বুঝেছিল, এর মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে। নারায়ণের ওপর আস্থা রেখে আবদুল

হকের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ঠিক হয়নি।

পুরো থানার ভেতরটা মানুষের চেঁচামেচিতে গমগম করছে। লকাপে যেন মানুষের জায়গা হচ্ছে না, বশির ভাগই তরুণ। তাদের মধ্যে কে মিছিল থেকে গাড়ি ভাঙচুরে ছিল, কে ছিল না, কে রাস্তায় টায়ার পুড়িয়েছিল, কে সারকারবিরোধী স্লোগান দিয়েছিল, তার কোনো বাছ-বিছার নেই। এই থানার ভাগে পড়েছে, অন্তত শখানেক পিকেটার গ্রেপ্তার করতে হবে। ওপরমহলের নির্দেশ। যদিও মাত্র জনা চল্লিশেকের মতো তারা গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসতে পেরেছেন। থানার ওসির যেন দম ফেলার সময় নেই, তিনি ওয়াকিটকি নিয়ে কেবল থানার ভেতর-বাইর করছেন। তার আগেই তিনি আরেকটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন এলিফ্যান্ট রোডের দিকে। এই থানায় তিনি নতুন পোস্টিং। পারফরম্যান্স না দেখাতে পারলে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে উঠতে পারে, এই ভেবে তিনি অনেকটাই বিচলিত।

থানার লকাপে বাবলু ও নারায়ণের একটা রাত ঘুমিয়ে না-ঘুমিয়ে কেটে গেল।

আবদুল হক গম্ভীর মুখে ওয়ার্কশপের চেয়ারে বসে আছেন। পান চিবুচ্ছেন মুখটা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে। পাশে রাখা লম্বা টুলে বসে আছে আলফু ও গণি। বাবলু ও নারায়ণ তখনো থানার লকাপে আটক আছে। সেটা নিয়ে আবদুল হকের চেহারায় চিন্তার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। যদিও আবদুল হক সকালে একবার থানায় গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। পুলিশের এক এসআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। থানা থেকে বলা হয়েছে বাবলু ও নারায়ণসহ আরও কিছু টোকাই এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীকে পলিটিক্যালি আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ আছে। তাই এই মুহূর্তে কিছু করা সম্ভব না। তাদের কাউকে কাউকে দল বেঁধে কোর্টে চালানের প্রস্তুতি চলছে। থানা থেকে বের হতে গিয়ে থানার এসআই আবদুল হকের মুখের ওপর ভুরু কুঁচকে তাকালেন,

– আপনের কী হয়?

– আমার দোকানের কর্মচারী। পোলাপান, বোঝেনই তো স্যার। হরতালে ফাঁইসা গেছে।

– ও।

এসআই কিছু না বলে আরেক দিকে চলে গেলেন। থানায় আটকদের আত্মীয়-স্বজনদের আনাগোনায় গমগম করছে। কে যে কার আত্মীয়, কে যে কার জন্য তদবির করতে এসেছে বোঝা মুশকিল। সকাল থেকে বিরোধী দলের নেতারা আসতে শুরু করেছেন তাদের কর্মীদের ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হচ্ছে না। ওসি কারও কথাই শুনছেন না; বরং আদালতের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আর জানিয়ে দিচ্ছেন, তাদের কিছু করার নেই, এটা পলিটিক্যাল কেস। আবদুল হক বুঝতে পারলেন, তিনি নিরুপায়। তার কথা এখন পুলিশ শুনবে না। অন্যদিন হলে আলাদা বিষয় ছিল।

– পুলিশের মায়রে চুদি। আপনে বাবলু আর নারায়ণরে ছুটায়া আনেন। আজকেই আনবেন।

গণি উত্তেজিত হয়ে আবদুল হকের দিকে তাকাল। আলফু বসে আছে মাথা নিচু করে।

– আরে ধৈর্য রাখ। পোলাপনগো কোর্টে চালান হয় না। আর দুই দিন গেলে এমনিতেই ছাইড়া দিব।

– পুলিশ জাতটাই খাচ্চর।

আলফু নিচু গলায় টিপ্পনী কাটল।

– দরকার হইলে আমি আবার যামু নে থানায়। এত টেনশন নিস না।

আবদুল হক গণিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

– সব দোষ আপনের। আপনেও খাচ্চরের জাত।

গণি চোখ বড় বড় করে নাক ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকল। আবদুল হক পিচ করে পানের পিক ফেলে কিছুক্ষণ গলা খাঁকারি দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি চিন্তা করছেন অন্য। হরতালটা জমে নাই। সরকার খুব শক্ত হাতে মিটিং-মিছিল হরতাল সামাল দিয়ে ফেলছে। পুলিশ রাস্তায় সব সময় থাকে অ্যাকশন মুডে। এবার হরতালে ব্যাপক ধর-পাকড় করেছে। সিগারেটে কড়া টান দিতে দিতে আবদুল হকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এই ধর-পাকড় সামনের হরতালে প্রভাব ফেলবে। নেতাকর্মীরা মাঠে কম থাকবে। গাড়ি ভাঙচুর করতেও সাহস করবে না। এর আগের হরতালে এত ধর-পাকড় হয়নি। তার মানে সরকার একটু একটু করে শক্ত হচ্ছে। তার ফলাফল কার জন্য ভালো বা খারাপ হবে, সেটা নিয়ে আবদুল হকের মাথাব্যথা নেই। তিনি তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন না, এটা ভালোই বুঝে নিলেন।

আবদুল হকের এমন উদাস ভাব দেখে আলফু ও গণি 'দি নিউ মডার্ন' ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে থানার দিকে হাঁটা দিল। ওরা ভাবল, বাবলু ও নারায়ণের সঙ্গে কোনোভাবে একটু দেখা করা যায় কি না। ওরা কেমন আছে, কে জানে। শুনেছে থানার লকাপে কেউ গেলে পুলিশ তাকে ধরে খুব পেটায়। ওদের কপালে কী ঘটেছে আলফু ও গণি বুঝতে পারল না। কিন্তু নারায়ণের ওপর ওদের আস্থা আছে। বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে ও। হয়তো পুলিশও ম্যানেজ করে ফেলতে পারবে।

– পুলিশের পা চাইপা ধরলে, ওগো ছাড়ব?

আলফু জানতে চাইল।

– মনে হয় না। ঘুষ দিলে ছাড়তে পারে।

– টাকা পামু কই?

– আগে যাই থানায়, গিয়া দেখি কী অবস্থা।

ওরা থানার কম্পাউন্ডে পৌঁছাতেই দেখল অনেক মানুষের ভিড়। এদের সবারই কেউ না কেউ থানার লকাপে আটক আছে। তারা এসেছে তাদের স্বজনকে ছাড়িয়ে নিতে। কেউ কেউ আবার ছুটছে কোর্টের দিকে। থানা থেকে কিছু আসামিকে কোর্টে চালান করা হয়েছে। এখনো কিছু লকাপে আছে। আলফু ও গণি কী করবে বুঝতে পারছিল না। থানার গেটের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। যদিও সেখান থেকে লকাপ দেখা যায় না।

– এইখানে কী?

এক পুলিশ সিপাই তেড়ে আসল আলফু-গণির দিকে। ওরা একটু সরে যায় ভয়ে।

– আমাগো দুই বন্ধু লকাপে আছে।

গণি সাহস করে বলে ফেলল।

– কী করছে? চুরি? না ছিনতাই?

– ওরা ভালো। কিছু করে নাই। পুলিশ এমনি ধইরা লকাপে ভইরা রাখছে।

গণি প্রতিবাদ করে।

– থানা কি তোর বাপের বাড়ি? খানকির পোলা, যা ভাগ...।

পুলিশের সিপাই গণির দিকে যেন হাত উঁচিয়ে তেড়ে আসতে চাইল মারতে। গণি এক দৌড়ে সরে গেল সেখান থেকে, আলফুও পিছু নিল গণির। ওরা বুঝে গেল, বাবলু আর নারায়ণের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। ওরা কিছুক্ষণ থানা কম্পাউন্ডের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। থানার ভেতরে আরেকবার ঢোকার সাহস পেল না। তা ছাড়া ওদের কথার গুরুত্বও কেউ দেবে না। সব দোষ আলফুর, ভাবল গণি। তেহারির লোভে আবদুল হকের সঙ্গে তাদের পরিচয়। তার কথামতো কাজ করতে গিয়ে আজকে বাবলু ও নারায়ণ থানা-হাজতে। হরতাল ওরা অনেক দেখেছে কিন্তু কখনো এ ধরনের ভাঙচুরের কাছে তারা ছিল না। কেন যে টাকার লোভে ওরা এ কাজ করতে গিয়েছিল, এখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল গণির। এখন বাবলু ও নারায়ণের যদি জেল হয়ে যায়, তাহলে এই জীবনে গণির সঙ্গে ওদের আর দেখা হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে গণির চোখ ভিজে আসতে চাইল।

তিন দিনের মাথায় বাবলু ও নারায়ণ থানা-হাজত থেকে ছাড়া পেল।

তাদের সঙ্গে যেসব পিকেটাররা আটক হয়েছিল, একে একে তাদের বেশির ভাগই কোর্টে চালান হয়ে গেছে। কিন্তু বয়স কম, রাস্তার টোকাই বলে ওদের কোর্টে চালান করেনি। ছেড়ে দিয়েছে। বাবলুর সঙ্গে লকাপে আরও অনেকেই ছিল গাদাগাদি করে, যাদের বাবলুরা চেনে না। বয়সে তারা বড়। মনে হয় তারা রাজনীতি করে। রাজনীতি করে না এমন তিনজনও ছিল, কথাবার্তায় বাবলুরা বুঝতে পেরেছে ওরা সাধারণ পথচারী। জ্বালাও-পোড়াওয়ের মধ্যে ওদের ধরে নিয়ে এসেছে পুলিশ। গতকাল পুলিশ ওদেরও কোর্টে চালান করে দিয়েছে। বাবলুরা রাজনীতি বোঝে না। তবে আবদুল হকের কথায় পা দিয়ে বাবলুদের যে এই হাল হয়েছে, এটা বুঝতে পেরেছে। বাবলু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনোই সে আবদুল হকের পাল্লায় পড়বে না। কোনোভাবেই না।

বাবলু আর নারায়ণ থানা থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল কারওয়ান বাজারের দিকে।

– আবদুল হক শালা একটা কুত্তার বাচ্চা।

নারায়ণ দাঁতে দাঁত পিষে কথাটা বলল। বাবলু কোনো উত্তর দিল না। তবুও নারায়ণ তাকাল বাবলুর দিকে।

– এখন কই যাবি?

বাবলু আনমনা হয়ে ছিল থানা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই। তাই শুধু অল্পস্বরে উত্তর দিল,

– মার কাছে যামু।

– আবার তোর সৎবাপের ঠ্যাঙানি খাইতে মন চাইছে?

বাবলু তার কোনো উত্তর না দিয়ে রাস্তার সামনের বাঁক ধরে রেলওয়ে পুলিশ কলোনির দিকে হাঁটা দেয়। নারায়ণ দাঁড়িয়ে পড়ে। ও বুঝতে পারল বাবলুকে এখন আটকানো যাবে না। মায়ের বিষয়ে বাবলু অনেক গোঁয়ার। তাই নারায়ণ বাবলুকে পেছন থেকে আর ডাকল না। সে একাই হাঁটা দিল কারওয়ান বাজারের দিকে, যদি আলফু আর গণিকে পাওয়া যায়। ওরা এখনো জানে না যে নারায়ণ ও বাবলু থানা থেকে ছাড়া পেয়েছে। আলফু আর গণির কথা মাথায় আসতেই নারায়ণের মেজাজ খারাপ হলো। শালারা আবদুল হকের ঘরে বসে কাচ্চি বিরিয়ানি খাচ্ছে কি না, কে জানে। আলফু হারামজাদা যে এত লোভী, সেটা নারায়ণ আগে বুঝতে পারেনি। আলফুর কথাতে সায় দিয়েই ওরা আবদুল হকের খপ্পরে পড়েছিল। আলফু শালারে একটা জন্মের শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই ভাবতে ভাবতে সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কারওয়ান বাজারের দিকে।

বাবলু থানায় যত দিন আটক ছিল, প্রতি রাতেই তার মায়ের কথা মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে, যদি আর কোনো দিন সে ছাড়া না পায়, তাহলে সে আর কোনো দিন মাকে দেখতে পাবে না। এটা ভেবেই প্রায় রাতে তার কান্না পেয়েছিল। কিন্তু সেটা সে নারায়ণকে বুঝতে দেয়নি। মাঝে মাঝে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেও ঘুমের মধ্যে। কিন্তু চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি তার। বাবলু জানে, শুকনো চোখেও কাঁদা যায়। বাবলু সেটা খুব ভালো রপ্ত করেছে। নাকি এমন কান্নায় বাবলুর অভ্যাস হয়ে গেছে, কে জানে!

কয়টা বাজে এখন? সাড়ে ১১টার মতো, বাবলু আন্দাজ করল। বেলা ২টা-৩টার দিকে মোখলেস পুলিশ ডিউটি থেকে বাসায় খেতে আসে। এটা বাবলু জানে। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে আবার চলে যায় স্টেশন ডিউটিতে। তার আগেই যেতে হবে। তাহলে মাকে একটু পাওয়া যাবে। মার কাছে গিয়ে বাবলু খেতে চাইবে, ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে তার। থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাবলু কিছু খেতে পারেনি। নারায়ণ যদিও শিঙাড়া আর পুরি খেয়েছে। কিন্তু বাবলুর কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি। আর এখন পেট চুঁই চুঁই করছে ক্ষিধায়। মোখলেস পুলিশ হয়তো এখনো বাসায় ফেরেনি, কিন্তু ওই মেয়েটা যদি বাসার আশপাশে থাকে, তাহলে তো মা বাবলুকে দেখেও না দেখার ভান করতে পারে। কী জানি, ঘরে না-ও ঢুকতে দিতে পারে। মেয়েটা কে? মোখলেস পুলিশের কিছু একটা হয়, ধারণা করল বাবলু। সেদিন মায়ের হাতে মার খেয়ে এটা বাবলু বুঝে গেছে। মেয়েটা ভালো না, বাবলু নিশ্চিত হয়।

বাবলু মোখলেস পুলিশের বাড়িতে উঁকি দিল। উঁকি দিয়েই তার চোখ ছোট হয়ে গেল। উঠানে বসে সেই মেয়েটা সবজি কাটছে। আশপাশে তার মা নেই। বাবলু কিছু বুঝে উঠতে পারল না। এই মেয়ে এখানে কেন বসে সবজি কাটছে? কলতলা থেকে গোসল সেরে মাথা মুছতে মুছতে উঠানে ঢুকল মোখলেস পুলিশ। বাবলুর রক্ত হিম হয়ে এলো। একটু পিছিয়ে এলো সে। মাকে আর ডাকা যাবে না। মোখলেস পুলিশ বাড়িতে। এখন বাবলুর ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তারপরও সে গলা বাড়িয়ে আরেকবার উঁকি দিল উঠানের আশপাশে। মাকে যদি একটু দেখা যায়। কিন্তু মাকে দেখা গেল না। বাবলু ফিরে চলল। রাস্তায়ই দেখা হয়ে গেল পাশের বাসার খালার সঙ্গে।

– মার কাছে আইছিলি?

– হ।

– তোর মা তো আর এই সংসারে নাই। পুলিশ বেডায় তারে খেদায়া দিছে।

– কী কন?

বাবলুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মাকে মোখলেস পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? মা তাহলে এখন কোথায়?

– ওই যে শেফালি মাগী, পাশের বাসার দস্তগীর কন্ডাক্টরের শালি। মোখলেস পুলিশ হেরে বিয়া করছে।

– তাইলে মা কই গেছে?

– কইতে পারি না। দেখলাম বোঁচকা নিয়া কানতে কানতে কই জানি গেছে গা...

বাবলুর মাথায় আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে মোখলেস পুলিশের টুঁটি চেপে ধরতে। বাবলু রাগে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। চোখ ফেটে পানি আসছে। মা কোথায় যেতে পারে, বাবলু ভাবার চেষ্টা করল। প্রথমেই তার মনে এলো রেলস্টেশনের কথা। বাবলুর বাবা যখন বাবলুকেসহ তার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ওরা রেলস্টেশনেই উঠেছিল। মা প্রথমে ওখানেই যেতে পারে। বাবলু ছুটল রেলস্টেশনের দিকে।

১০

মোখলেস পুলিশের বাসা থেকে বের হয়ে খাইরুন বেগম তার বোঁচকা নিয়ে রেলস্টেশনে চলে এসেছিল। যদি সেই ভিখারি বুড়ির দেখা মেলে, এই ভেবে। এই শহরে ভিখারি বুড়িই বলতে গেলে তার একমাত্র পরিচিত আপনজন, এর বাইরে আর কাউকে সে চেনে না। বুড়িকে পেলে সে কিছু মনের দুঃখের কথা বলতে পারত, কিছু পরামর্শ নিতে পরত। যদিও বুড়ি কথায় কথায় খ্যাট খ্যাট করে, অশ্লীল ইঙ্গিতে কথা বলে তার সঙ্গে; তবুও বুড়িকে তার আপন আপন লাগে। তা ছাড়া সবার আগে এই মুহূর্তে তার বাবলুকে দরকার। বাবলু রেলস্টেশনের আশপাশে থাকে কি না, খাইরুন বেগমের জানা নেই। বুড়ির কাছে কোনো খবর আছে কি না, সেটাও সে বুঝতে পারল না। এত বড় শহর, সে খুব একটা চেনেও না। আর বাবলু কোথায় কোথায় রাতে থাকে, কোথায় ঘোরাঘুরি করে, সেটা সে কখনো জেনে নিতে পারেনি বাবলুর কাছ থেকে। মোখলেস পুলিশের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে সে বাবলুকে খুব একটা কাছে পায়নি। ছেলেটা মাঝে মাঝে তার কাছে আসত, কিন্তু মোখলেস পুলিশের ভয়ে সে বাবলুকে তার ঘরে ঢুকতে দিতে পারেনি কখনো। এমন কপালের লিখনও যে বিধাতা তার কপালে লিখে রেখেছিলেন, সেটা সে আগে কখনো দুঃস্বপ্নেও আনেনি। রেলস্টেশনের এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকল খাইরুন

বেগম। মোখলেস পুলিশ এখানে ডিউটি করে। মোখলেস পুলিশের চোখে পড়তে চাইল না বলে খাইরুন বেগম মুখজুড়ে ঘোমটা টেনে রেখেছে। পুরো স্টেশনের এমাথা থেকে ওমাথা দুবার চক্কর দিয়েও সে ভিখারি বুড়ির দেখা পেল না। ভাবল, রাত অবধি অপেক্ষা করবে কি না। রাতে নিশ্চয়ই বুড়ি এখনো স্টেশনেই ঘুমায়। কিন্তু ভাবনাটা তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না মোখলেস পুলিশের কথা মনে পড়তেই। মোখলেস পুলিশ রাতে একবার হলেও চক্কর দেবে পুরো স্টেশনজুড়ে, জায়গার চাঁদা তুলবে। খাইরুন বেগমকে দেখলে সে কী করবে কে জানে! রাতে স্টেশনে থাকার জন্য চাঁদা চাইবে তার কাছে? নাকি স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দেবে? যা-ই করুক, সে আর মোখলেস পুলিশের মুখোমুখি হতে চায় না। তার ওপর মোখলেস পুলিশের এত মাসের অত্যাচার সে ভুলে যেতে চায়। সে সব ভুলে যাবে। সে বুঝে গেছে, এই শহরের জীবন অন্তত তার জন্য না।

পরেরদিন ভোরে খাইরুন বেগম রেলস্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল কারওয়ান বাজারের দিকে। একবার বাবলুর মুখে কারওয়ান বাজারের নাম শুনেছিল সে। বাবলুর সঙ্গে আরও কয়টা ছেলে থাকে, যদিও খাইরুন তাদের কাউকে চেনে না, দেখেওনি কোনো দিন। কথায় কথায় বাবলুর মুখ থেকে শোনা। তখন সে জানতেও চায়নি, ওরা কারা; কোথায় থাকে, কী করে। এখন এত বড় শহরে সে কোথায় বাবলুকে খুঁজে পাবে, বুঝতে পারল না। খাইরুনের চোখ দিয়ে অবিরত পানি ঝরতে থাকল। রাতে সে রেলস্টেশনেই ছিল। স্টেশনের শেষ মাথায় একটা পিলারের আড়াল ঘেঁষে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। রাতে মোখলেস পুলিশ স্টেশনে চক্কর দেয়নি, ডিউটিতে আসেনি হয়তো। এক বদলি পুলিশ চাঁদা তুলেছিল মোখলেস পুলিশের হয়ে, সম্ভবত লাভলু মিয়া। তাকে খাইরুন বেগম চেহারায় চেনে, মোখলেস পুলিশের সঙ্গে চাকরি করে, যদিও নামটা ঠিক আছে কি না, মনে করতে পারছিল না। কিন্তু সে খাইরুনের কাছাকাছি এসেও পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল, চাঁদা না চেয়েই। মোখলেস পুলিশের বউ হিসেবে লাভলু মিয়া তাকে চেনার কথা, চিনেছিল কি না, কে জানে। চিনলে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল, একটু কথা বলা-খোঁজখবর নেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু লাভলু মিয়া তা করেনি, চাঁদাও চায়নি। কেন? খাইরুন বেগম বুঝতে পারেনি। তাকে যে মোখলেস পুলিশ তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এটা হয়তো লাভলু মিয়ার জানা ছিল না। অথবা সে খাইরুন বেগমকে চিনতে পারেনি। বাকি রাত লাভলু মিয়া তার আশপাশে আর আসেনি। ভিখারি বুড়ির দেখাও পায়নি খাইরুন বেগম। রাতে বুড়ি স্টেশনে ফেরেনি। বুড়ি স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে কি না, বুঝতে পারল না সে; কিংবা অন্য কোথাও রাতে ঘুমানোর বন্দোবস্ত করেছে কি না, তাও আন্দাজ করতে পারেনি তখন।

বাবলুর কথা মনে পড়তে পড়তে খাইরুন বেগমের চোখ আবার ভিজে এলো। অনেকক্ষণ ধরে চোখ মুছতে মুছতে শাড়ির আঁচলের কোনা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। তার কোলে কাপড়-চোপড়ের একটা বোঁচকা। হাতে টাকা-পয়সা নেই বললেই চলে। ভাগ্যিস রেলস্টেশন থেকে বের হওয়ার পর, স্টেশনের কাছেই ভিখারি বুড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার। তখন ভোর কেটে সকাল হয়ে গিয়েছিল। একটার পর একটা ট্রেন এসে থামছিল স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, কিছু ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছিল শহর ছেড়ে। এ সময়টা মানুষজনে গিজগিজ করতে থাকে স্টেশনজুড়ে। ভিখারিদেরও আনাগোনা বাড়তে থাকে। বুড়ি হয়তো তাই স্টেশনের দিকেই আসছিল। খাইরুন বেগমকে দেখেই একগাল হাসল বুড়ি।

– কী রে বেটি, বিয়ার পর তো আমারে ভুইলা গ্যাছস। খানকি বেটি। একবারও দেখতে আইলি না আমারে। এই বুড়ি বাঁইচা আছে, না মইরা গেছে...

– ভুলি নাই গো খালা।

– হ। ভুলোস নাই...খানকি মাগী। এখন ক, সংসার কেমন করতাছস?

– সংসার আমার নাই খালা। আমারে খেদায়া দিছে মোখলেস পুলিশ।

ভিখারি বুড়ি খিক খিক করে হাসল। গালভর্তি পান, মুখের ভেতর জিবটাকে ঘুরিয়ে এনে পানের দলা 'থু' করে পাশের দেয়ালে ছুড়ে দিয়ে আরেক দফায় হাসল সে।

– এইডা তো আমি আগেই জানতাম। হারামির বাচ্চা একটা লুইচ্চা বদমাইশ।

– এখন আমি কই যামু খালা? আমার পোলাডারেও খুঁইজা পাইতাছি না। হাতে টাকাও নাই।

– স্টেশনে আমার লগেই থাক।

– এইখানে থাকুম না খালা। মোখলেস পুলিশ এইখানে ডিউটি করে।

– হ। তাও ঠিক। তাইলে কই যাবি?

– আমারে একটা বুদ্ধি দ্যাও।

– আমার কি আর বুদ্ধি দেওনের মতো বয়স আছে রে মাগী? দ্যাখ, কপাল তোরে কই নিয়া যায়! গা-গতর তো খারাপ না, রসে টস টস করে এখনো। চেহারাও ভালো, খানকিপাড়ায় ভালো দাম পাবি।

ভিখারি বুড়ি খিক খিক করে হাসতে হাসতে চলে গেল স্টেশনের গেটের দিকে। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে শাড়ির আঁচল হাতড়ে কয়েকটা পঞ্চাশ টাকার দলা খাইরুনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,

–এই শহর তোর মতো সুন্দর মাগীর লাইগা ভালো না। তার ওপর স্বামীও নাই। শরীর বাঁচাইতে পারবি না রে বেটি। হয় খানকিপাড়ায় গিয়া শরীর বেচ, নইলে গ্রামে যা গিয়া।

খাইরুন বেগম রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল কারওয়ান বাজার, যদিও কারওয়ান বাজার সে খুব একটা ভালো চেনে না। কিন্তু তাকে আসতে হলো এখানে, বাবলুকে তার খুঁজে পেতে হবে যে করেই হোক। এই জীবনে বাবলু ছাড়া তার আর কেউ নেই। এই শহরকে তার কাছে রাক্ষস বলে মনে হতে থাকল। এই শহর তার জীবনের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। তার চেয়ে গ্রামেই খাইরুন সুখে ছিল। যদিও অভাব ছিল কিন্তু বেঁচে থাকার আনন্দ ছিল সেখানে। এই শহরে সেটা নেই। নিজেকে মাঝে মাঝে মৃত মনে হতো খাইরুনের কাছে, মনে হতো বুকের ভেতরে কোনো প্রাণ নেই তার। এই জীবন সে চায় না। শহরের জীবন মানে যুদ্ধ। যুদ্ধ হলো টাকা উপার্জনের লোভ। এই লোভই তার সংসার কেড়ে নিয়েছে, বাবলুকেও হাতছাড়া করেছে। খাইরুন আর এই শহরে থাকতে রাজি হলো না। শুধু বাবলুকে পেলেই সে ওকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে যাবে।

সারারাত বাবলুর চোখে ঘুম ছিল না। মোখলেস পুলিশ তার মাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এটা ভাবতে গিয়েই বাবলুর চোখ ভিজে আসছিল। মা এখন কোথায় আছে বাবলু জানে না। রাস্তায় রাস্তায় সারা দিন সে মাকে খুঁজেছিল। এত বড় শহরে তার মাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, এটাও সে জানে। প্রথমে যদিও বাবলু রেলস্টেশনে গিয়েছিল, দুই পাক ঘুরে না পেয়ে অস্থির হয়ে স্টেশনের বাইরে এসেও খুঁজেছিল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু মার দেখা পায়নি সে। মা আর কোথায় কোথায় যেতে পারে, বাবলু কোনো ধারণা করতে পারল না। মা ছাড়া বাবলুর আর কেউ নেই। সেই মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মোখলেস পুলিশ। লোকটাকে আগে থেকেই পছন্দ হতো না বাবলুর। মা যে কেন ওর ঘরে গিয়েছিল, বাবলু চিন্তা করে পেল না। এখন মাকে সে হারিয়েছে। বাবলু বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করছিল। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। বুকের ওপর পাথরের মতো ভারী কিছু একটা চেপে বসে আছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যেন সে নিশ্বাসও নিতে পারছে না। ফুঁপিয়ে কান্না আসছিল ওর। ভাবল, পরদিন, সারা দিন নারায়ণকে নিয়ে সে মাকে খুঁজতে বের হবে। দরকার হলে পুরো শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। যে করেই হোক, মাকে তার খুঁজে পেতে হবে।

ভোরে ঘুম ভাঙলে বাবলু প্রথমেই দৌড়ে গেল ফুলের দোকানে।

একটা গোলাপ কিনে আবার ছুট দিল অভিজাত এলাকার দিকে, মেয়েটার বাড়ি। গত চার দিন সে গোলাপ রেখে আসতে পারেনি। মেয়েটা হয়তো জানেও না, মাঝে সে তিন দিন থানার হাজতে ছিল। বাবলু প্রতিদিন মেয়েটার জন্য গোলাপ রেখে আসতে চায়। থানার হাজতে প্রতিরাতেই মেয়েটার কথা মনে হয়েছে বাবলুর, সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও মনে হয়েছে। গোলাপ না রেখে আসতে পারার জন্য কষ্টও হয়েছে। তাই আজকে সে ভুল করল না। ঠিক সময়ে রাস্তার ঠিক জায়গায় গোলাপটি রেখে এলো। কিন্তু আজ বাবলুর অনেক তাড়া। তাই সে গোলাপটি রেখে মেয়েটির জন্য আর অপেক্ষা করল না। আবার ছুটে ফিরে এলো। নারায়ণকে নিয়ে তার মাকে খুঁজতে বের হবে সে। মেয়েটি গোলাপ পাবে কি পাবে না, বাবলু জানে না। বাবলু ছাউনিঘরে ফিরে দেখে নারায়ণ তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। বাবলু ধাক্কা দিয়ে নারায়ণকে ঘুম থেকে জাগাল,

– ওঠ।

– কী হইছে?

নারায়ণ বিরক্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে খেঁকিয়ে উঠল।

– রাতে কইছিলাম না, মারে খুঁজতে বাইর হমু।

গত রাতেই বাবলু নারায়ণকে বলে রেখেছিল। আলফু আর গণি কোথায় বাবলু জানে না। থানা থেকে বের হওয়ার পর ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি বাবলু আর নারায়ণের। তবে ধারণা করেছে, ওরা হয়তো আবদুল হকের গ্যারেজে রাতে ঘুমিয়েছে। ওরা থাকলে বাবলু ওদেরও সঙ্গে নিয়ে নিত। কিন্তু আপাতত নারায়ণ সঙ্গে আছে, এতেই বাবলু বেশ সাহস পাচ্ছে। নইলে একা একা বাবলু তার মাকে কোথায় খুঁজত কে জানে! নারায়ণ ঘুম থেকে উঠে বসল। চোখ দুটো ভালো করে কচলে বলল,

– কই যাবি?

– জানি না।

বাবলু নিরস কণ্ঠে জবাব দিল।

বাবলুর মন দ্বিধান্বিত হয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, মা গ্রামের দিকে রওনা হয়েছে। সে চাইলে হয়তো মাকে খুঁজে বের করতে পারবে। না পেলেও গ্রামে গিয়ে ঠিকই পাবে। মোখলেস পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে যেহেতু, গ্রামে ফিরে যাওয়া ছাড়া মায়ের আর গতি নেই। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাওয়ার আগে মাকে খুঁজে পেলে বাবলু কী করবে। এই শহরে তো মায়ের থাকার আর কোনো জায়গা নেই। বাবলুর নিজের থাকারই ঠিক নেই যে, মাকে তার সঙ্গে এনে রাখবে। মাকে খুঁজে পেলে সে মাকে নিয়ে কোথায় যাবে! কোথায় মাকে নিয়ে উঠবে! বাবলু এসব ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে কামড়াতে লাগল ঠোঁটের কোনা। নারায়ণের চোখে মনে হয় তখনও ঘুম কাটেনি। বারবার চোখ কলোচ্ছে সে। মাঝে একবার হাই তুলে বাবলুকে জিজ্ঞেস করেছিল,

–কোনদিকে যাইতাছি আমরা?

বাবলু কোনো উত্তর দেয়নি। বাবলু যাচ্ছিল রেল স্টেশনের দিকে, মাকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে। না পেলেও ভিক্ষুক বুড়িকে অন্তত আশেপাশে পাওয়া যাবে। সে কোনো কিছু জানলেও জানতে পারে। না জানলে, বাবলু সোজা রওয়ানা দিবে লঞ্চঘাটের দিকে। সন্ধ্যায়-রাতে গ্রামের দিকে লঞ্চ ছাড়ে। গ্রামে গেলে মাকে লঞ্চেই যেতে হবে। সুতরাং শেষ ভরসা লঞ্চঘাঠ। কিন্তু বাবলু ভাবছে অন্য কথা। মা যদি গ্রামে ফিরে যায়, বাবলু মায়ের সঙ্গে গিয়ে কী করবে গ্রামে। বাবলু জানে, সে কখনই গ্রামে ফিরে যাবে না। এই শহর, শহরের অভিজাত এলাকা, কানাগলি, নোংরা ডাস্টবিন আর মানুষের খিস্তি-খেউরে বাবলু নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এসব নিয়েই বড় হচ্ছে বাবলু, এসব মোকাবিলা করেই বাবলুকে আরো বড় হতে হবে। শহরে টিকে থাকার সংগ্রাম বাবলু জেনে গেছে। গ্রাম এখন আর বাবলুকে টানে না। বাবলুর হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে আসে। ভীষণ ক্লান্ত লাগতে থাকে তার। মায়ের মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর ভেসে ওঠে একটা গোলাপ। সারাদিন রোজগার থেকে জমানো টাকা দিয়ে কেনা একটা গোলাপ। বাবলু এটাও জানে না, এই গোলাপ কিনেই বা তার কি হবে।

এই গোলাপও বাবলুর কাছ মনে হতে থাকে, গ্রামে ফিরে যাওয়ার মতো এক তীব্র অনিশ্চয়তা।

মারুফ রসূল

বাকশাল : ইতিহাস ও রাজনীতির অলিগলি

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আজও বাকশালই সম্ভবত সবচেয়ে সংবেদনশীল শব্দ। গত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া, অর্থনৈতিক উত্থান-পতন, শ্রেণির বিনাশ-বিন্যাস কিংবা সমাজ-সংস্কৃতির নানা পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর যাত্রাপথেও 'বাকশাল' শব্দটিকে আমরা সঙ্গে রেখেছি– শরণ হিসেবে তো নয়ই, এমনকি স্মরণের উদ্দেশ্যেও নয়-বরং আমাদের যাবতীয় ব্যর্থতার দায়গুলো চাপানোর জন্য। রাজনীতি তো বটেই, পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর হাহাকারসর্বস্ব বাংলাদেশের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিষ্ঠান, এমনকি নির্দলীয় ঘোষিত শিক্ষিত সিভিল সোসাইটিও নিজ নিজ ব্যর্থতা গোপনের বয়ান রচনাকালে বাকশালকে অযৌক্তিকভাবে আক্রমণ করেছে। ফলে পঁচাত্তর-পরবর্তী আদর্শহীন রাজনীতি ও ফাঁকা মূল্যবোধের সংস্কৃতিযাত্রার যে চলমান মর্মন্তুদ চিত্রমালা আমরা দেখি– বাকশাল সেখানে তপোক্লিষ্ট বোধিসত্ত্ব, বোদলেয়ারের দণ্ডিত পঙ্‌ক্তিমালার মতো। 'একনায়কতন্ত্র', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণ', 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ' বা 'ক্ষমতা কুক্ষিগত করা'-বাকশাল সম্পর্কিত ইত্যাদি মূঢ় ও মিথ্যা শব্দবাণে গত সাড়ে চার দশকে বেড়ে উঠেছে প্রায় চার-পাঁচটি প্রজন্ম; যাদের কাছে এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি কেবল নেতিবাচকই নয়, আলোচনারও অযোগ্য।

আমারে ইতিহাস অভিজ্ঞানে যদি সততা থাকে, তবে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে– মুজিবচরিতমানসের রাজনৈতিক ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে ওঠা প্রধানতম শিল্পটির নাম গণতন্ত্র। তার রাজনৈতিক মনস্থিতার পরিচয়পত্র যদি হয় জনগণ, তবে তার সবার্থসাধক বিকাশের নাম গণতন্ত্র। কী সংগঠন পরিচালনা, কী সরকারব্যবস্থা-প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই ছিল তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এমনকি যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সংগঠনের ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব।

তবে রাষ্ট্র ও রাজনীতিবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের যে তাত্ত্বিক কাঠামোগত ধারণাটি পাওয়া যায়, বঙ্গবন্ধুর চর্চিত ও কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের স্বরূপ, আমার মতে, তা থেকে খানিকটা সম্প্রসারিত-ভিন্ন নয়, সম্প্রসারিত। গণতান্ত্রিক মুখোশে অরাজনৈতিক, প্রাসাদ-পরিকল্পিত ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকা জনবিচ্ছিন্ন ক্ষমতার যে জগদ্দল পাথরটি বহুযুগ ধরে এ উপমহাদেশের বুকে চেপে বসে আছে-বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল ছিল তারই বিরুদ্ধে একটি সাহসী রাজনৈতিক উদ্যোগ। কেবল ভোটাধিকার, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার দায়-দায়িত্বহীন বিস্তৃতি আর ক্যালেন্ডার গুনে নিয়মিত নির্বাচন হলেই যে সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, বা হলেও সেটা টেকসই হয় না-এ সত্য গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশটি বছরের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস পড়লেই জানা যায়। অন্ধের হাতি দেখার মতো এই উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকারব্যবস্থা হিসেবে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। না তাতে সংযোজিত হয়েছে স্থানীয় জন-আকাঙ্ক্ষা, না তার সম্প্রসারণ ঘটেছে স্বদেশিয়ানায়, না তা রূপান্তরিত হয়েছে দেশকালের জনভাষ্যে। ইতিহাস সাক্ষী– গণতন্ত্রকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়েই এ উপমহাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, বিদেশি রাষ্ট্রের বৈরী স্বার্থের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে, শান্তিরক্ষার নামে আধিপত্যবাদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে, সামরিক ও মোল্লাতন্ত্রের নির্মম-নগ্ন বিস্তার ঘটেছে এবং দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিদেশি এজেন্ট তৈরি হয়েছে। যে গণতন্ত্রের লেবাসে পাকিস্তান দীর্ঘ ২৩ বছর বাংলার মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, স্বাধীন দেশে ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদের রক্তেভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এক লহমায় তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন জাতির জনক। পরিবর্তে তিনি প্রণয়ন করেছিলেন শোষিতের গণতন্ত্রব্যবস্থার বীজমন্ত্র-গত শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে যা ছিল এক নতুন সংযোজন। এ কারণেই স্বাধীন দেশের গণ-পরিষদে 'শোষিতের গণতন্ত্র' কথাটি বঙ্গবন্ধু প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ০৪ নভেম্বর সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে স্পিকার মুহম্মদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংবিধান

বিলের (গৃহীত) ওপর প্রধানমন্ত্রী ও গণপরিষদের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে শোষিতের গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন-আদতে এটা ছিল তার বাকশালব্যবস্থার ভিত্তিস্তম্ভ। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশ এমন একটি অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয়-যার খাদ্যের জন্য পরনির্ভরতা, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আর কর্মহীন ছিন্নমূল মানুষের আপেক্ষিক গুরুত্ব অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। গ্রামীণ দারিদ্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানি আয় নেমে এসেছিল একেবারে শূন্যের কোঠায়; অন্যদিকে স্থায়ী সম্পদ আহরণের ক্ষমতা হয়ে পড়েছিল ভয়াবহভাবে সংকোচনশীল। তার ওপর ছিল যুদ্ধফেরত, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত আর স্বজন হারানো অগণিত মানুষের মানসিক অস্থিতিশীলতা আর চূর্ণ-বিচূর্ণ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সুযোগ পেয়েছিল মাত্র ১৩১৪ দিন। এটুকু সময়ের মাঝেই তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের এমন এক দর্শন-যার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়, বরং এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সংযোগ রয়েছে। তাকে খুঁজতে হয়েছে এমন একটি সামাজিক সাম্যাবস্থার রাজনৈতিক পন্থা-যার সঙ্গে এ দেশের মানুষের জীবনসংগ্রাম সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর বাস্তবায়নে তার সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছিল তাৎক্ষণিক ও জরুরি নানা উদ্যোগ, নিতে হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নবিষয়ক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানা পদক্ষেপ। আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শূন্য অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে একটি টেকসই ও স্বনির্ভর উন্নয়নের স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাগুলোও তৈরি করতে হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী-তার এ যাত্রাপথটিও নিষ্কণ্টক ছিল না। ছিল না কারণ, বুলিসর্বস্ব গণতন্ত্রের চটকদারি বটিকা তো তিনি জনগণকে গেলাতে চাননি। তার অগ্নিশুদ্ধ করতলে আঁকা আছে বাংলার মানুষের দুঃখ, বঞ্চনা আর অমিত জয়োল্লাসের মানচিত্র। বিলেত বা পাকিস্তানের মুখস্থ গণতন্ত্র যে জনগণের মুক্তি আনতে পারেনি-বঙ্গবন্ধু তো ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী। গ্রিক দেবতা অরফিউসের মতো তাকেও পেছনে তাকাতে হয়েছিল-ফলে গত শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রতিবিন্দুর ভূমিকা। ক্ষমতায় থেকেই তিনি ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছিলেন। জনগণের পক্ষ থেকে তার উত্থাপিত ন্যায্য প্রশ্নমালায় বিব্রত হয়েছিল তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন আর আধিপত্যবাদী সেনানিবাস। তারা বুঝে গিয়েছিল-বাহাত্তরের সংবিধানে লিপিবদ্ধ 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' কেবল কথার কথাই নয়; আদতে তা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ইশতেহার। এসব কারণেই নিজেদের ক্ষমতাবাদী অস্তিত্বের প্রশ্নে তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ ও পাকিস্তান শাসনামলে তারা তো ব্যবহৃত হয়েছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কল বা ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে। সে সময়ের ক্ষমতাসীনরা নিজেদের টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের একটি প্রভু-প্রতিকৃতি গড়ে তুলেছিল জনগণের সামনে। বিশেষ করে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র নানা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে জনগণের জন্য ক্ষমতার যে নরকসরণি তৈরি করেছিল-স্বাধীন দেশে তা এক মুহূর্তেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

পাশ্চাত্যের খোসা আর কেতাবি শাঁস ছাড়িয়ে গণতন্ত্রের নির্ভেজাল বীজটিই বঙ্গবন্ধু বপন করতে চেয়েছিলেন এ দেশের মাটিতে, চেয়েছিলেন বাংলার আলো-হাওয়া-জলে এ দেশের মানুষের যত্নেই তা বেড়ে উঠুক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর শোষিত গণতন্ত্র ছিল বাংলার মানুষের আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র কবচকুণ্ডল-এ আমার নিছক বক্তব্য নয়, প্রামাণ্য উপলব্ধি।

দুই

বিশ শতকে গোটা পৃথিবীর রাজনীতি নানা বাঁকে মোড় নিয়েছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ ও ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও সরকারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ, ঘটনাবহুল ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের এ কুড়ি শতকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ।

দেশটির যাত্রালগ্নে রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি হিসেবে বাকশালব্যবস্থার সারাৎসার অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মতোই মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলোর সরকারপদ্ধতি ও তার বিবর্তন-রূপান্তরগুলো তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের যে গালভরা শব্দমালা গোটা বিংশ শতাব্দীজুড়ে বিরাজমান ছিল এবং বর্তমান শতকে অঢেল সীমাবদ্ধতা নিয়েও জীবিত আছে, আদতে তা কতটুকু কার্যকর-তারও একটি খতিয়ান দাঁড় করানো প্রয়োজন। গত শতকেই সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যে নবতরঙ্গ তৈরি করেছিল, তাতে ফুটে উঠেছিল ব্যক্তি মানুষের শ্রেণিচরিত্র-ফলে স্বভাবতই গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি হয়েছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

কিন্তু গোটা একটি শতকও ঠিকঠাক পেরোতে পারেনি-তার আগেই সমাজতন্ত্র নানা ধরনের প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নিজেরাও প্রয়োজনমতো অন্যের জন্য ফাঁদ পেতেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখি-সমাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় পরিচালিত রাষ্ট্রও জেনোসাইডের মতো নৃশংস অপরাধের নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও তারা জন্ম নিয়েছে একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ।

তাই বলে গণতন্ত্রের চরিত্র ভালো হয়ে যায়নি। আবার সমাজতন্ত্রও বিশ্ব থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। বরং এ দুটি রাজনৈতিক ধারণার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে আরও অনেক রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সরকারপদ্ধতি। রাষ্ট্র, তার নাগরিক, নাগরিকের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। সংযোজন, বিয়োজন, সংমিশ্রণ ও সম্প্রসারণ ঘটেছে নানা তত্ত্ব ও মতবাদের। একেকটি রাষ্ট্র একেকরকম সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নিজেদের প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই আবার বিভিন্ন সময় সেটা বদলেছে নিজেদেরই প্রয়োজনে। তা ছাড়া এমন নজিরও পাওয়া যায়যেখানে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের ইচ্ছামতো রাষ্ট্রব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রের ওপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (২৮ জুলাই ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর ১৯১৮) পর পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক ধারণায় একটি ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। পাল্টে গিয়েছিল সে সময়ের মানুষের মনমানসিকতা আর বদলে গিয়েছিল ইউরোপের সেদিনকার মানচিত্র। স্বাধীনতা লাভ করা রাষ্ট্রগুলো একে একে জায়গা করে নিয়েছিল বিশ্ব মানচিত্রে। ধর্মের কলের মতো ধসে পড়েছিল দীর্ঘদিনের অমানবিক সাম্রাজ্যব্যবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্র-দর্শনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিশেষত মার্কিনি গণতন্ত্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র ধারণার বাইরে কিছু স্বতন্ত্র ধারণা জন্ম নিয়েছে। স্বতন্ত্র হলেও এগুলো মৌলিক ছিল না; কারণ সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের ডালপালা থাকলেও এদের শেকড় ছিল নিজ নিজ মুক্তিসংগ্রামের দার্শনিক ইতিহাসে প্রোথিত। আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের 'কামালবাদ' এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক সুকর্ণ প্রবর্তিত 'নির্দেশিত গণতন্ত্র'– দুটি ধারণারই মূল লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন, মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে তারা যে পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন, তাতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নানামাত্রিক মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে স্ব স্ব জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন সম্পৃক্ত ছিল। বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তুরস্ক ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইন্দোনেশিয়া বেশ সোচ্চার হয়েছিল। একই সঙ্গে নিজস্ব ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বলয় গড়ে তোলার একটি জোর প্রচেষ্টা ছিল তাদের মাঝে। তবে বিদেশি শক্তি তো বটেই-কামাল পাশার 'কামালবাদ' ও সুকর্ণের 'নির্দেশিত গণতন্ত্র'-দুটো ধারণা রাষ্ট্রের ভেতরেই তাদের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক

প্রশাসনের তীব্র বাধা ও অসহযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল। এর অন্যতম একটি কারণ ছিল আদর্শের গতিপথ। আদর্শিক সৌধই একটি ব্যবস্থাকে তার অনন্যতায় নিয়ে যেতে পারে-এটা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত। বাকশাল এ কারণেই তার আদর্শের প্রশ্নে কোনো আপস করেনি। যে মৌল আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল-তা তো কেবল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসেই তৈরি হয়নি; বরং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পুরো সময়টি জুড়েই এ আদর্শিক সৌধগুলো গড়ে উঠেছিল সংগ্রামের আবহে আর স্বাদেশিকতার বৈদগ্ধ্যে। তারই করতলে বিকশিত হয়েছিল মুজিববাদ- যেখানে সুকর্ণের মতো ধর্ম বা সেনাশ্রিত কোনো রাজনৈতিক আপস সমীকরণ যেমন ছিল না, তেমনি কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্ধ অনুকরণও ছিল না। একদিকে বাংলার মানুষের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসবোধে নির্মিত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে জনমানসিকতায় দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিকভাবেই বিরাজমান 'বাঙালি মুসলমান' পদবাচ্যের খানিকটা আত্মরক্ষামূলক আধা-সাম্প্রদায়িক মহড়া-এ দুয়ের মাঝখানে মুজিববাদ ছিল একটি রাজনৈতিক স্রোত, যার পরিপূর্ণ বিকাশের নামই বাকশাল।

এ কারণে ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে মার্কিন ও সোভিয়েত বলয়ের বাইরে গিয়ে দেশ ও জনগণের মৌলিক পরিচয়পত্রের আদলেই বাকশালব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছিল-কিন্তু তার গাঠনিক সংকেত মার্কিন বা সোভিয়েতের সঙ্গে মেলে না। কারণ ওসব দেশের জনগণের মানসিক বিবর্তন আর বাংলার মানুষের মনোজগতের বিবর্তন তখনো এক ছিল না, আজও নয়। সমস্যা আলাদা হলে তার সমাধানও আলাদা হতে বাধ্য।

তিন

বাকশাল কোনো হঠাৎ-আবির্ভূত ব্যবস্থা ছিল না। এমন নয় যে, তৎকালীন সরকার রাতারাতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বাকশালব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা শুরু করে দিয়েছিল। 'বাকশাল' একটি নাম মাত্র কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার যে পরিকল্পনা ও পদ্ধতি এ নামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সূত্রপাত আরও আগে। সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রে সকলের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ বাহাত্তরের পর থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ ততটা প্রকাশ্য না হলেও, রাজনীতির ক্ষেত্রে একেবারে শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল। দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্য বা জাতীয় সরকারের কথা তুলেছিল। দেশের তৎকালীন নানা সংকট সমাধানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মীরাও বহুবার রাজনৈতিক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু ঐক্যের এ আলোচনাটি রাজনৈতিক বৃত্তে যতখানি সক্রিয় ছিল, প্রশাসনিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা দৃশ্যমান ছিল না। আবার এ ঐক্য বা রাজনৈতিক সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি ঠিক কী হবে, এর ভিত্তি কী হবে সে সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত কিন্তু বাকশাল প্রতিষ্ঠার আগে আমরা পাই না। একমাত্র বাকশালব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই এ ক্ষেত্রে একটি সার্বিক সমন্বয় তৈরি হয়েছিল। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম যেমন ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি চূড়ান্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল; বাকশালব্যবস্থার প্রবর্তনও তা-ই স্বাধীনতা-পরবর্তী নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৭৫ সালে এর খসড়া কাঠামোটি চূড়ান্ত হয়েছিল। পার্থক্য শুধু এটুকুই-মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের উপসংহার; কিন্তু বাকশাল ছিল মুক্তিসংগ্রামের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার ভূমিকাপত্র। পরবর্তীতে সংযোজন-বিয়োজন-সম্প্রসারণ বা বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে হয়তো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিকভাবে একে আরও পরিপূর্ণ করে তোলা যেত। কিন্তু সে সুযোগটি বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো মন দিয়ে পড়লে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের একটি অপস্রিয়মাণ রাজনৈতিক ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যনির্ভর দুটো স্তরও খুঁজে পাওয়া যায়। একটি মুক্তিসংগ্রামে তার নেতৃত্বের ধরন, অন্যটি স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালনা-পদ্ধতি। মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার সময় বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা-সহকর্মীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত যে অবস্থান ছিল; স্বাধীন বাংলাদেশে তার আকাশ-পাতাল রকমফের ঘটেছিল-এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে মুক্তিযুদ্ধ করা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোও রাতারাতি বদলে যায়নি। এ কারণেই আমি মনে করি-জাতির জনকের নেতৃত্বে একটি যূথবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামটি পরিচালিত হলেও; যত সরলভাবে এ একতার কথা আমরা বলি, আদতে বিষয়টি তত সরল ছিল না।

বাকশাল কোনো হঠাৎ-আবির্ভূত ব্যবস্থা ছিল না। এমন নয় যে, তৎকালীন সরকার রাতারাতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বাকশালব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা শুরু করে দিয়েছিল। 'বাকশাল' একটি নাম মাত্র কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার যে পরিকল্পনা ও পদ্ধতি এ নামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সূত্রপাত আরও আগে

বিষয়টিকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের লেন্স দিয়ে দেখি বলে আমাদের চোখে সরল ঠেকে-কারণ ঘটনাটি তিনি সম্ভব করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত জটিলতাগুলো বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার পর-একেবারে শুরুতেই এবং রাজনৈতিকভাবে। ফলে বঙ্গবন্ধুকে তার নেতৃত্বেরও রূপান্তর ঘটাতে হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় আমাদের ঐতিহাসিকগণ এ রূপান্তরটিকে নজরে আনেন না বলেই আমার মনে হয়েছে। ১৯৪৮-৭১ সালে ঠিক করে রাখা অ্যাপারচার আর শাটার স্পিডেই আমরা ১৯৭২-৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার পরিচালিত বাংলাদেশের ছবিটি তুলি। ফলে ঠিকঠাক ছবিটি পাই না; যা পাই-সেটা হয় আন্ডার এক্সপোজড, না হয় ওভার এক্সপোজড।

নবগঠিত রাষ্ট্রে তখন অর্থনীতি ও অবকাঠামোর পুনর্গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে শরণার্থীদের ফিরে আসা, তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রাখা এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতিও তৎকালীন সরকারকেই চালাতে হয়েছে। তা ছাড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি তো ছিলই। এ কাজগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ-আরেকটু পরিষ্কার করে বললে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ছাড়া যে কোনো বিকল্পই ছিল না-সেটা কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তার নেতারাই জানতেন। আবার বঙ্গবন্ধুও জানতেন-যে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় নানা ভেদাভেদ পাশ কাটিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; স্বাধীন দেশে তাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক

এ্যাপ ২টি গুগল প্লে স্টোর
থেকে ডাউনলোড করে
যথাযথ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে
হিসাব খোলা ও লেনদেন করা যাবে

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

www.agranibank.org

প্রতিক্রিয়া থাকবে। যদিও স্বাধীন দেশে তার বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতি-ভাষণ পড়ে মনে হয়-তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, কিছু দলের আদর্শিক ভরকেন্দ্র অবশ্যই অভিন্ন থাকবে; অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হবে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের দর্শনকে কেন্দ্র করেই। মুক্তিযুদ্ধকালীন গড়ে ওঠা আদর্শিক ঐক্যের আপাতসরল সংজ্ঞাটি যে স্বাধীন দেশে খাটবে না-এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তা নাহলে স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে আদর্শের প্রশ্নে যে জটিলতাটি তৈরি হয়েছিল, তার সমাধান বঙ্গবন্ধু বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের জন্য তেমন কঠিন ছিল না। কেননা, বিরোধী দলগুলো অন্তর্বর্তীকালীন, সর্বদলীয় বা জাতীয়-যে নামেই তখন সরকার গঠনের দাবি তুলুক না কেন, প্রত্যেকের প্রস্তাবিত সরকারব্যবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন কেন্দ্রে এবং আওয়ামী লীগ পেয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব।

এমনকি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ভেঙে যখন দুভাগ হলো, তখনো দুপক্ষই চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আশ্রয়। জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও কোনোভাবেই চায়নি বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কোনো সরকার গঠন করতে-অন্তত স্বাধীন বাংলাদেশের একেবারে প্রথম পর্যায়ে। সুতরাং বিরোধীদলীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে হরেদরে একটি সরকার গঠনের সুযোগ বঙ্গবন্ধু ও তার দলের ছিল-এবং সেটা গ্রহণ করলে ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধু কিংবা দল পারত, এমনকি তাতে বিলীন হয়ে যেতেও দ্বিধা করেনি। নাহলে যে রাজনৈতিক দলগুলো বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রে রেখেই বাহাত্তর সালে জাতীয় সরকার গঠন করতে চাইছিল, বছর না ঘুরতেই তাদের অনেকেই কীভাবে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীবিরোধী ষড়যন্ত্রে হাত পাকাতে শুরু করেছিল? এ জন্যই বলছি, বাহাত্তর সালের রাজনৈতিক আবহ খোলা চোখে বাকশাল-উপযোগী মনে হলেও কার্যত ওটা ছিল চোরাবালিসাদা চোখে বালির মতোই দেখায় বটে, কিন্তু পা দিলেই সর্বনাশ। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও আদর্শিক বিচারে আলু নয়, বরং আলুবোখারার সন্ধানই করেছিল। এ সন্ধানপ্রক্রিয়াও কিন্তু বাকশালেরই নথিভুক্ত। এ জন্যই আমি মনে করি-ঘোষণা না এলেও বা 'বাকশাল' শব্দটি উচ্চারিত না হলেও, বাহাত্তর সাল থেকেই এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল-যার মূল লক্ষ্যই ছিল একটি আদর্শিক ঐকতান খুঁজে বের করা।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সর্বদলীয় বা জাতীয় সরকারের দাবি তুলে আসছিল। অর্থাৎ তারা সকলে মিলে কেবল সরকারেরই অংশ হতে চেয়েছিল; কেননা রাষ্ট্রের সংকট নিরসনে বিরোধী দলগুলোর কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই তৎকালীন রাজনীতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায় তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবি তুলেছিল স্বাধীনতাবিরোধী, মুনাফাখোর, মজুদদার ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় নানা সংকট মোকাবিলার তাগিদে। কারণ তৎকালীন সংকটগুলো একা সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না; তার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনও জরুরি ছিল

হিসেবে আওয়ামী লীগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি তো হতোই না; বরং লাভ হতো। কারণ, বিরোধীদলীয় প্রস্তাবে তো বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে। তাহলে এ সুযোগটি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেনি কেন?

এর শুলুক-সন্ধানেই বাকশালসংক্রান্ত ঐতিহাসিক একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। বাকশালবিষয়ক আলোচনায় আমার মতো অনেকেই হয়তো অগ্রজদের মুখে শুনে থাকবেন-বাহাত্তর সালেই যদি বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে দিতেন, তবে এ নিয়ে আর কোনো সমস্যাই হতো না। এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো-স্বাধীন দেশের জনমনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আবহ তখন বাকশালব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। আনত শ্রদ্ধা রেখেই অগ্রজদের এ বক্তব্যের বেশ কয়েকটি অংশের সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করি। এ ক্ষেত্রে আমার যুক্তি হলো-জনমনস্তত্ত্ব যদি সর্বসাধারণের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য হয়, তাহলে পঁচাত্তর সালের জনমানসিকতাও সর্বাংশেই বাকশালব্যবস্থাটি অনুমোদন করেছিল।

দ্বিমতের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি-অর্থাৎ তৎকালীন রাজনীতি বা রাজনৈতিক আবহ-খানিক সূক্ষ্ম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বাকশাল যেহেতু একটি জাতীয় সরকারব্যবস্থাই ছিল এবং বাহাত্তর সাল থেকেই বিরোধী দলগুলো এ ধরনের সরকার গঠনের দাবি তুলে আসছিল, সুতরাং সেটাই বোধহয় বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণার সর্বোত্তম সময় ছিল। আগেই বলেছি, এতে আওয়ামী লীগের পক্ষে লাভও হতো বিস্তর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেমন বালি আর চোরাবালির পার্থক্যটি করতে পারতেন, তার দল আওয়ামী লীগও সে সময় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই আলু আর আলুবোখারার পার্থক্যটি করতে পেরেছিল। আদর্শের তোয়াক্কা না করে আলু যেমন সকল ব্যঞ্জনের উত্তম অনুষঙ্গ হতে পারে, তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এমন অনেক দলই ছিল-যারা যে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গেই মিশে যেতে সেখানেও তাদের বিভ্রান্তিকর আদর্শ ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবি তুলেছিল স্বাধীনতাবিরোধী, মুনাফাখোর, মজুদদার ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় নানা সংকট মোকাবিলার তাগিদে। কারণ তৎকালীন সংকটগুলো একা সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না; তার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনও জরুরি ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের একেবারে প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে একা এ আন্দোলনটি করার চেষ্টা করেছিল; কারণ তৎকালীন সংবাদমাধ্যমে এ দলের নেতৃবৃন্দের এমন কিছু জোরালো বক্তব্য পাওয়া যায়-যেগুলো সরকারদলীয় নেতারা সাধারণত বলেন না। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু নিজেই রাষ্ট্রীয় নানা সংকটের প্রসঙ্গে নিজ দল, তৎকালীন প্রশাসন, সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে বিরোধী দলের নেতাদের চেয়েও শক্ত ও চাঁছাছোলা সমালোচনা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের এ উদ্যোগটির সঙ্গে একমত ছিল সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর)। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ দুটো দলকে অন্য দলগুলো থেকে আলাদা করা যায়-কারণ, তারা মন্ত্রিসভায় নয়, রাজনৈতিক ময়দানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল। অর্থাৎ নিজস্ব রাজনীতির প্রশ্নে এ দুটো দল নিজ নিজ জনসমর্থন ও সংগঠনের ওপরই নির্ভর করেছিল-আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় যাবার ইচ্ছা তাদের ছিল না। এ ক্ষেত্রে ন্যাপের (মোজাফফর) চেয়ে সিপিবির অবস্থান তুলনামূলকভাবে দৃঢ় ছিল বলেই আমি মনে করি।

আদর্শিক ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্যের ধারাটি আমরা পাই ১৯৭২ সালের মে মাসে-স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠনের মাত্র

‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০%-৭০% ভর্তুকিতে ১২ ক্যাটাগরির কৃষকদেরকে কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে।

দেশের ৬৪টি জেলার সব উপজেলায় কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এ প্রকল্প কাজ করছে

ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্রের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১ম বিল্ডিং, ৩য় তলা, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

সাড়ে তিন মাসের মাথায়-গণ-ঐক্যজোট গঠনের মধ্য দিয়ে। আদর্শিক ঐক্য বলতে মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে দলীয় আদর্শ ও সংজ্ঞায়নের পরিধিই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও সিপিবি-তিনটি দলই নতুন রাষ্ট্র পরিচালনায় এ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের একেবারে সূচনালগ্নেই। সুতরাং এটা বলার কোনো অবকাশই নেই যে, আওয়ামী লীগ সংকট সামলাতে না পেরে গণ-ঐক্যজোটে আগ্রহী হয় বা সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর) নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পেরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। গণ-ঐক্যজোট হয়েছিল নির্বাচনের আগেই এবং তার সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্কই ছিল না। তা ছাড়া আদর্শিক সূত্রে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রেও নির্বাচনের কোনো ভূমিকাই ছিল না। বাহাত্তর সালেই যেহেতু গণ-ঐক্যজোটের কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিসংগ্রামের আদর্শের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলের পরিচয়পত্রগুলো তখন থেকেই পরিষ্কার। হ্যাঁ, তারপরও অনেক দল গঠিত হয়েছিল বটে; কিন্তু যাদের উদ্যোগে এগুলো গড়ে উঠেছিল, স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক গবেষণাগারে তাদের প্রত্যেকেরই আদর্শিক পরীক্ষার প্রতিবেদনটি ছিল। ফলে সময় গেলেও গণ-ঐক্যজোটের পরিধি বড় হয়নি-অর্থাৎ না কোনো দল এতে যুক্ত হয়েছে, না কেউ বাদ পড়েছে; বরং সময়ের বিবর্তনে এক সময় এ জোট একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিকব্যবস্থায় রূপান্তরিক হয়েছিল-যার নাম ছিল 'বাকশাল'।

বাকশাল কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না– পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাই চিরায়ত হতে পারে না। রাজনীতিতে যেটুকু চিরন্তন– তা হলো আদর্শ। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আদর্শ থাকে– যার সঙ্গে সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক-জাতিগত-অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে। যার যার আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই তাদের রাষ্ট্রপরিচালনা নীতিগুলো তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে নীতিগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে– ঘটাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু রাষ্ট্রের মূল আদর্শের সঙ্গে সে পরিবর্তন যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে, শুরু হয় আলোচনা-আন্দোলন

চার

বাকশালসংক্রান্ত যাবতীয় মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য-তথ্য-তত্ত্বালোচনা শুরুই হয় চতুর্থ সংশোধনীকে ঘিরে; অন্যদিকে বিষয়টি যেহেতু আইনসংক্রান্ত তাই আমরা নিজে বোঝার চেষ্টা না করে সাধারণত আইনজ্ঞদের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি। পরের মুখে টক-মিষ্টি-ঝাল খাওয়ার ঐতিহাসিক বদভ্যাসের কারণেই আমাদের মগজের শিরা-উপশিরায় ইতিহাসসংক্রান্ত নানা বিভ্রান্তি জমে আছে। এ বিভ্রান্তি নিরসনে না আমাদের নিজস্ব কোনো উদ্যোগ আছে, না ইতিহাসবেত্তাগণ কোনো সুযোগ রেখেছেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে-তবে যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে দেয়া অপপ্রচারের তুলনায় তার সংখ্যা নিতান্তই কম।

এখানে এ কথাটিও জানিয়ে রাখা ভালো-ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না, সময়ের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালেই আমাদের সংবিধানের এ চতুর্থ সংশোধনীটির যৌক্তিকতা বহাল থাকবে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানের যৌক্তিকতাও সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গেছে এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিকব্যবস্থারও নানা বদল ঘটেছে পৃথিবীতে, এখনো ঘটছে। সুতরাং ৪৭ বছর পরেও আমাদের সংবিধানের একটি সংশোধনী কিংবা একটি রাজনৈতিকব্যবস্থা আদ্যোপান্ত যৌক্তিক থাকবে-এটা হতে পারে না। তবে সে সময়ের (১৯৭২-৭৫) আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় এবং জনকল্যাণের নিমিত্তে চতুর্থ সংশোধনী অবশ্যই যৌক্তিক ছিল-এ কথাটি আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি।

জন-আকাঙ্ক্ষার সরকারি অনুবাদ বঙ্গবন্ধু কোনো দিন গ্রহণ করেননি, সে প্রয়োজনও তার হয়নি। কেননা তিনি তো জানতেন-সংসদের একবেলা অধিবেশনে যে খরচ হয়, তাও বাংলার গরিব মানুষের টাকা। বাংলার মানুষকে তিনি নিজের হাতের তালুর মতোই জানতেন; তার জনতাগভীর ভাবনায় বাংলার মানুষই ছিলেন এক শাশ্বত সিলমোহরুএ জনঘনিষ্ঠতাই ছিল তার বিপ্লবের দরজা। ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজের সংযোগ পথে তিনি কোনো নীতিবাগীশ বুদ্ধিজীবী, মধ্যস্বত্বভোগী আমলা কিংবা উচ্চাভিলাষী সেনাতন্ত্র রাখতে চাননি; এমনকি চূড়ান্ত দুর্দিনেও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর রক্তপায়ী কথামালার প্রতিরূপায়ণকে তিনি প্রশ্রয় দেননি।

চতুর্থ সংশোধনী ভুল ছিল কিংবা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল বিতর্কিত-কারা বলেন এ কথাগুলো? সত্যি বলতে 'কারা বলেন' সেটা বিবেচ্য নয়, 'কীভাবে বলেন' সেটাই ভেবে দেখা দরকার। সংবিধানের একটি সংশোধনী কিংবা রাজনৈতিক কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কেউ দ্বিমত করতে পারেন, সমালোচনা করতে পারেন-ব্যবস্থাটি ব্যর্থ ছিলুএ মর্মে বই গবেষণাপত্রও লিখতে পারেন। এ অধিকার যে কারোই আছে; কিন্তু ওই যে 'কীভাবে বলেন' তার স্বরূপটা যখন খুঁজতে যাই, তখন চোখ কপালে ওঠে। ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর মন্তব্য, নথিপত্রের পর্যালোচনা না-থাকা বা থাকলেও তার মর্মোদ্ধারে ওপর-চালাকি আর সবশেষে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে কতগুলো কাল্পনিক বাক্যমালার ঘনঘোর সর্বনাশ। এতে চতুর্থ সংশোধনী বা বাকশালব্যবস্থার ইতিহাস যতখানি না উঠে আসে, তার চেয়েও প্রকটভাবে উঠে আসে সংশ্লিষ্ট লেখকের দীনতা আর রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা। দক্ষ ক্রীড়াবিদ কি খেলায় জেতার জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন? নিলে তার দক্ষতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

তখনকার সাধারণ মানুষ চেয়েছিলেন রাষ্ট্রে বিরাজমান সংকটের আশু সমাধান, চেয়েছিলেন ন্যায্যমূল্যের ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা আর স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি। এ সংকট সমাধানের দায়িত্ব তারা তুলে দিয়েছিলেন তাদেরই পরীক্ষিত নেতা শেখ মুজিবের হাতে। আর গণ-মানুষের এ নেতা নির্ভুলভাবেই জানতেন-একটি স্বাধীন দেশের রাজনীতিকে গণমুখী করতে হলে রাষ্ট্রের সার্বিক কাঠামোকেই গণমুখী করতে হয়। একটি দেশের রাজনীতিবিদগণ ভীষণ জনসম্পৃক্ত হয়েও রাষ্ট্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবেন না, যদি সে রাষ্ট্রের বিচার ও নির্বাহী বিভাগ, বিশেষত সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র হয় ঔপনিবেশিক ও জনবিচ্ছিন্ন। আবার উল্টোটাও কখনোই সম্ভব নয়। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুগপৎ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর

আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এতে সাধারণ মানুষের যে কোনো আপত্তি ছিল না সে তো আগেও প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি- কিন্তু সমাজের সনদনির্ভর 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক' ও প্রশাসনের 'ক্ষমতাসীনদের' আপত্তি ছিল।

এ কারণেই বাকশালের অযৌক্তিক সমালোচনা কিংবা তথ্য-প্রমাণ-তত্ত্ব ছাড়াই ব্যবস্থাটিকে বাতিল ঘোষণা করণেওয়ালাদের সিংহভাগই এসেছেন সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি থেকে। বাংলার কৃষক-শ্রমিক আজ পর্যন্ত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বা বাকশাল বিষয়ে কোনো যুক্তিহীন নেতিবাচক সমালোচনা করেছেন– এমন নজির আমার হাতে নেই। প্রিয় পাঠক, এ মুহূর্তে আপনার যদি মনে হয়ে থাকে, কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণি কি সংবিধান-সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে মতামত দেবেন; তাহলে বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে রাখি– আমাদের এ ভুল ধারণাটিও ওই তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদেরই তৈরি করা।

ফলে সাধারণ মানুষের চতুর্থ সংশোধনী বা বাকশালব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট দূরভিসন্ধিমূলক প্রতিক্রিয়া বা ক্ষোভ না থাকলেও; জাত খোয়ানোর অন্যায় আক্রোশে ফুঁসে উঠেছিলেন তারাই– যাদের স্বার্থ ও আভিজাত্যে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল চতুর্থ সংশোধনী ও বাকশাল।

স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে ওঠা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিত্তবান শ্রেণি, ঔপনিবেশিক বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র আর সেনা-মনস্তত্ত্বের জাত্যাভিমানে আক্রান্ত শিক্ষিত শ্রেণি... এরাই পরবর্তীতে কলম ধরেছিল বাকশালকে বিতর্কিত একটি ব্যবস্থা হিসেবে প্রজন্মের কাছে চিহ্নিত করতে। কারণ মাটিতে পা না-পড়া এ অভিজাত শ্রেণিটি ঠিকই বুঝেছিল– বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব তাদের আর 'অভিজাত শ্রেণি' হিসেবে সমাজে খবরদারি করতে দেবে না, সাধারণ মানুষের কাতারে তাদের নামিয়ে আনবেই। তাদের প্রজাতান্ত্রিক পরিচয়পত্রে বাকশালব্যবস্থা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিল– স্বাধীন বাংলাদেশে তারা জনগণের প্রশাসক নয়, জনগণের সেবক।

এ কারণেই আমি মনে করি, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক ধারণায় বাকশাল একটি ক্র্যাক, যার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃত সংজ্ঞায়ন। এ সংজ্ঞায়নটি যদি স্বাধীন বাংলাদেশে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত– তাহলে আমাদের আজকের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের 'সাহেবরা' নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামতো কর্মকর্তা আর কর্মচারী শিরোনামে অসাংবিধানিক ভেদরেখা টানতে পারতেন না। বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী সেনাতন্ত্র বুলেটের সূত্রে ক্ষমতার অঙ্ক কষতে পারত না।

বাকশাল কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না– পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিকব্যবস্থাই চিরায়ত হতে পারে না। রাজনীতিতে যেটুকু চিরন্তন– তা হলো আদর্শ। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আদর্শ থাকে– যার সঙ্গে সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক-জাতিগত-অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে। যার যার আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই তাদের রাষ্ট্রপরিচালনা নীতিগুলো তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে নীতিগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে– ঘটাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু রাষ্ট্রের মূল আদর্শের সঙ্গে সে পরিবর্তন যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে, শুরু হয় আলোচনা-আন্দোলন। স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ নির্ধারিত হয়েছে আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে। সময়ের সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হলেও আদর্শের পরিবর্তন কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আধুনিক করে গড়ে তোলা যেমন আইনপ্রণেতাদের দায়িত্ব, তেমনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে মূল দর্শন– মহান মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ, তাকে সমুন্নত রাখাটাও তাদেরই দায়িত্ব। সে দায়িত্বের প্রেক্ষিতেই প্রণীত হয়েছিল বাকশাল। সময়ের প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট কিছু আদর্শকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

রাজনৈতিকব্যবস্থা হিসেবে বাকশালের সাফল্য-ব্যর্থতা বা আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা হতেই পারে; কিন্তু সে আলোচনার জন্য প্রথমে শব্দের রাজনীতির দেয়ালটি ভাঙা জরুরি বলেই মনে করি। 'শব্দের রাজনীতি' কথাটি আমি ব্যবহার করলাম কারণ, দীর্ঘসময় ধরে 'বাকশাল' শব্দটিকে কতগুলো নেতিবাচক প্রপঞ্চ দিয়ে ঘিরে রেখেছে আমাদের চলমান রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর অবৈধ সামরিক শাসকগোষ্ঠী থেকে শুরু করে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এমনকি এ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও গণমাধ্যমের একটি অংশ 'বাকশাল' শব্দটিকেই বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতির বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, আজও করছে। সুতরাং পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের একটি বড় অংশের কাছেই বাকশাল উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচকভাবে। এ সম্পর্কে যাও বা কিছু লেখা আছে, তাতে হয় তথ্য গোপন করা হয়েছে, না হয় বক্তব্যের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। বাকশাল যেহেতু ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির ক্ষেত্রে মুক্তিসংগ্রামের আদর্শকেই প্রেক্ষণে রেখেছিল, তাই স্বাধীনতাবিরোধী অপ-রাজনৈতিক দলগুলোর গাত্রদাহের অন্ত ছিল না। তা ছাড়াও আদর্শহীন রাজনীতিই যাদের মূল পেশা, যে দলেরই হোক না কেন– ছলে বলে কৌশলে বাকশালকে বিতর্কিত করার চেষ্টা তারা আজও চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এভাবে আদর্শহীন অপ-রাজনীতি আর শ্রেণির জাত্যাভিমানের কিছু বাতিল এজেন্ডা দিয়ে চাইলেই একটি রাজনৈতিকব্যবস্থাকে বিতর্কিত করা যায় না। হয়তো সাময়িকভাবে তার প্রকৃত ছবিটা অস্পষ্ট করে দেয়া যায়; কিন্তু তত্ত্বের সৎ-নির্যাসকে কখনোই ধ্বংস করা যায় না। চার্চিল থেকে শুরু হওয়া ব্রিটিশ পাগলামি আজ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যকে এতটুকু টলাতে পারেনি; গাদা-গুচ্ছের ডলার খরচা করেও মার্কিন প্রশাসন চেগুয়েভারার অব্যর্থ সংগ্রামকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে পারেনি। এটাই সভ্যতার নিয়ম। যারা সিআইএ-আইএসআই বানিয়েছিল, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিপ্লবের সামনে তারা দাঁড়াতেও পারেনি; আর স্বাধীন দেশে এদের খুদ-কুঁড়ো টোকানো এজেন্টরা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের ইতিহাস হাপিস করে তাকে বিতর্কিত করে ফেলকে– অঙ্কটা অত সরল নয়।

যে সময়, যে প্রেক্ষাপট আর যে বাস্তবতাগুলো সামনে রেখে বাকশাল প্রণীত হয়েছিল– সে সময়, সে বাস্তবতায় এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থা হতে পারত বলে আমি মনে করি না। শুধু আমি কেন, যারা গত সাড়ে চার দশক ধরে ভুল তথ্যে আর বিকৃত বয়ানে বাকশালের নিন্দা-মন্দ করেছেন, তারাও ওই সংকটগুলো সমাধানে কোনো বিকল্প রাস্তা দেখাতে পারেননি। চতুর্থ সংশোধনীর অনেক ধারা অনেক দিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল, নিন্দা করার দল সেগুলো কিন্তু ক্ষমতায় থেকেও বাতিল করেনি।

মুক্তিসংগ্রামের আদর্শের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে বাকশালের অনেকাংশ আজকের বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান রাজনীতির দুর্ভিক্ষপীড়িত অবয়ব বা জনগণের ওপর সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্রের ভৌতিক কুলকুচি নিয়ে যে সহৃদয় গুণীজনরা গণমাধ্যমে কপাল চাপড়ান– বাকশালব্যবস্থাটি নিয়ে তারা একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে পারেন। রাজনীতি ও জনমনস্তত্ত্বের কতগুলো শ্লোক সেখানে রয়ে গেছে– যা থেকে শোষিতের গণতন্ত্র আর গণমুখী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বীজমন্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব, আবারও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

ঔপনিবেশিক উন্নাসিকতা, ব্যবস্থার বাতাবরণ, আমলাতন্ত্রের আঁধার আর প্রতিষ্ঠানের প্রভুত্ব ঝেড়ে ফেলে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল স্বভূমিজাত সংস্কৃতির সাংবিধানিক সেতু, যা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব কমিয়ে আনবে।

'মানুষ'– এ বিশেষ্যটিই ছিল বাকশাল বর্ণমালার প্রথম স্বরবর্ণ। গত সাড়ে চার দশক ধরে এ স্বরবর্ণের তথ্যটিই প্রজন্মের কাছে গোপন করে ক্রমাগত ভুল তথ্য বিলি করেছিল একদল অমানুষ।

সাব্বির জাদিদ

দরবেশ ও নগরপিতা

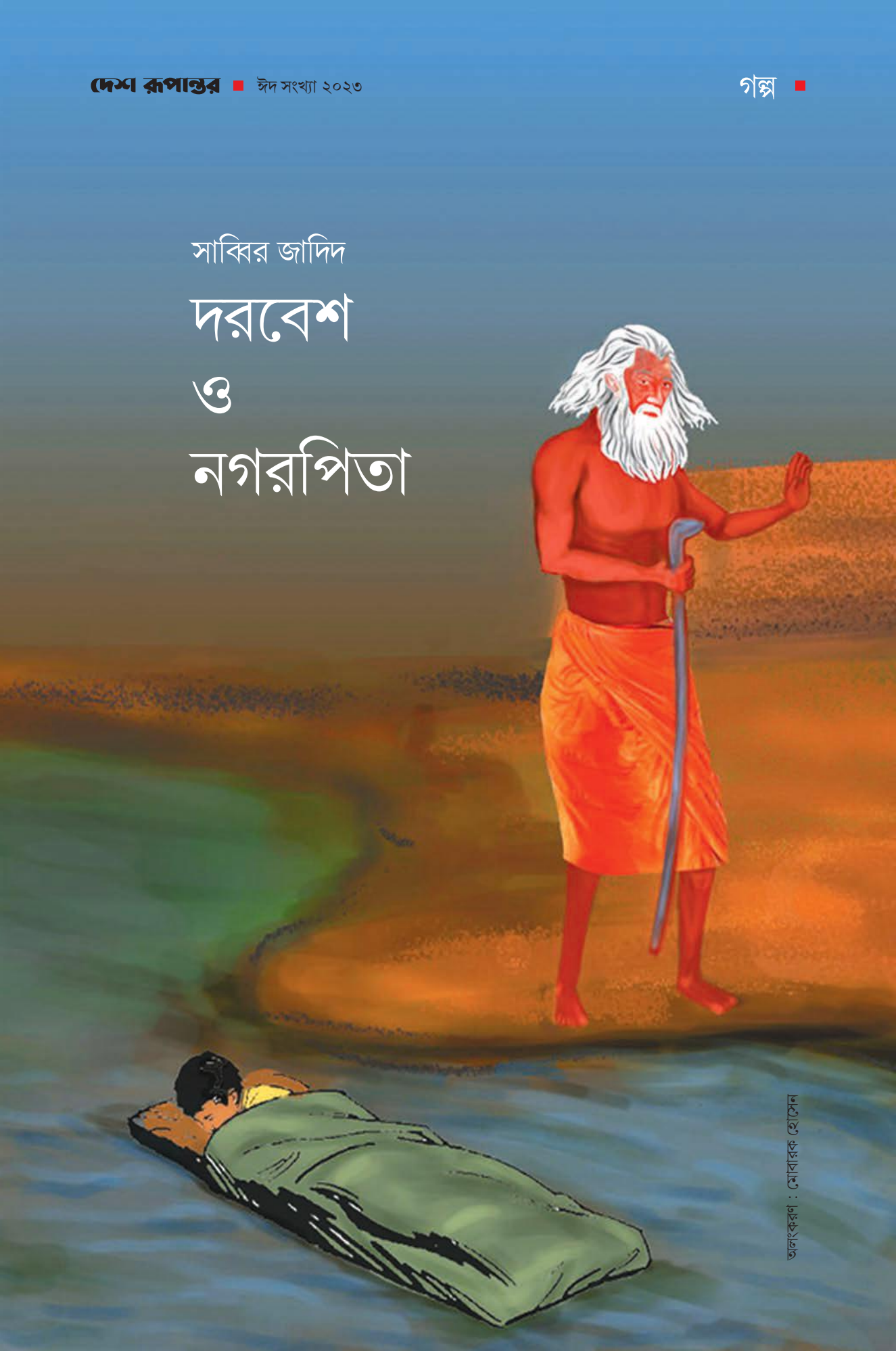

অলংকরণ : মোবারক হোসেন

নগরে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট বিস্ময়কর এক দরবেশের আবির্ভাব ঘটেছে। দরবেশের মাথায় বিদ্যুৎপ্রভ শুভ্র চুল। আনাভিলম্বিত একই বর্ণের উজ্জ্বল শ্মশ্রু। গায়ে জড়ানো এক খণ্ড সাদা বস্ত্র। যখন তিনি প্রার্থনায় মগ্ন হন, বিস্রস্ত বস্ত্রের ফাঁক গলে কাঁখতলির শুভ্রতা দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রার্থনা শেষে যখন তিনি মুখচন্দ্রে হস্ত সঞ্চালন করেন, আংটির পাথর থেকে বিচ্ছুরিত হয় বিদ্যুৎবিভা। দরবেশের হাতে সাপের ফণার মতো বাঁকা এক লাঠি। শোনা যাচ্ছে, দরবেশ নিজে যেমন অলৌকিক, অলৌকিক তার বাঁকানো লাঠিটাও। সুরমা রঙের লাঠিটা মাটিতে রেখে মন্ত্র পড়লেই নাকি অজগর হয়ে যায়। শুধু কী তাই, লাঠির বাড়ি পড়লে পাথর থেকে ফুল ফোটে। সাগরে আঘাত করলে রাস্তা হয়। অসুস্থের গায়ে স্পর্শ করলে রোগমুক্তি মেলে। দরবেশ কোথা থেকে এসেছেন, কেউ জানে না। কয়দিন থাকবেন, পরবর্তী গন্তব্য কোথায়, তাও জানে না কেউ। শুরুতে অবশ্য কেউ পাত্তা দেয়নি। লোকমুখে অনেক কিছুই শোনা যায়। যাচাই করতে গেলে বেরিয়ে আসে জোচ্চুরি। কিন্তু এই দরবেশ যে জোচ্চর নয়, প্রমাণ হয় দুদিন পরেই।

নগরের কৃষকনেতার পুত্র জঙ্গলে খেলতে গিয়ে সাপের ছোবল খেলে বেশ একটা হুলস্থূল পড়ে যায় কৃষক পল্লিতে। বৈদ্য-ওঝা-কবিরাজ– কেউই বিষ নামাতে পারে না। বালকের মা আছাড়িবিছাড়ি করে কাঁদে। বাবার বুকের মধ্যে তুফান বয়। বালকের ছোট বোনটা ভাইয়ের মাথার কাছে বসে ভাই ভাই করে ডাকে। মায়ের চোখের পানি, বাবার বুকের পাথর, বোনের মুখের মায়াবী সম্বোধন আর কৌতূহলী জনতার দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে বালক ক্রমেই নীল হয়ে যেতে থাকে। দুঃখী এবং হতাশ কৃষককুল নিরুপায় হয়ে কলার ভেলা প্রস্তুত করতে শুরু করে। নদীপথে অজানায় ভাসতে ভাসতে যদি বালকের রুহ দেহের মায়ায় প্রত্যাবর্তন করে!

যখন পশ্চিম দিগন্তে ছোপ ছোপ লালিমায় সন্ধ্যা নেমে আসে, যখন বালকের নিথর শরীর ভেলার ওপর রাখা হয়, যখন মায়ের গলাছেঁড়া চিৎকারে নিমগাছের পাখিরা ভয়ে উড়াল দেয়, যখন বাবার বুকের ভেতর থেকে কেবল ভাতের বলক ওঠার শব্দ হয়, যখন ছোট বোন বাতাসে দুলতে থাকা ভাঁটফুলের মতো ফোঁপায়, ঠিক তখন পশ্চিমের লালিমার ভেতর থেকে পৌরাণিক গল্পের ত্রাণকর্তার মতো আবির্ভূত হন দরবেশ। হাতে তার বাঁকানো লাঠি। আংটির পাথরে নূরের ঝিলিক, চেহারায় অপার্থিব সৌন্দর্যের বিভা। গায়েবী প্রত্যাদেশের মতো দরবেশ দূর থেকে আওয়াজ করেন– থামো!

জনতা চমকে উঠে পশ্চিমে তাকায়। পশ্চিমের লালিমা ফুঁড়ে অদ্ভূতদর্শী মানুষটার বেরিয়ে আসতে দেখে গা শিরশির অনুভূতি হয় সকলের। মায়ের মন বলে– পারবেন। উনি পারবেন ছেলেকে বাঁচাতে।

ছেলের নিশ্চল শরীর তখন ভেলায় ভাসতে প্রস্তুত। দরবেশ হাঁটুপানিতে নেমে দশ আঙুলের দশটি আংটি ছোঁয়ান নীল হয়ে ওঠা ছেলের নাসিকায়। শেষে, লাঠির বাঁকানো ফণা তার বুকের ওপর, যেখানে রুহ থাকে, ঘোরাতেই আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে বালক। যেন এক প্রশান্তিময় ঘুম থেকে জেগে ওঠা তার। জনতা ফেটে পড়ে হর্ষধ্বনিতে– দরবেশ বাবার জয় হোক! দরবেশ বাবার জয় হোক! বাবা-মা লুটিয়ে পড়ে ত্রাণকর্তার কদমে– আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। ছেলের জীবনদাতা। দরবেশ বিড়বিড় করেন– জীবন দেয়ার মালিক ঈশ্বর। আমি অসিলামাত্র।

এরপর দিন যত যায়, নগরে দরবেশকে নিয়ে কিংবদন্তি ছড়াতে থাকে। দরবেশ কোথাও স্থির থাকেন না। তিনি এখানে যান, ওখানে গিয়ে বসেন, আবার হাঁটেন, কখনোবা ধানের পাকা বাইলের ওপর প্রশান্তচিত্তে ইবাদত করেন। বালকেরা দরবেশের পিছু পিছু দৌড়ায় আর আব্দার করে– ও দরবেশ বাবা, একটা জাদু দেখাও তো! দরবেশ তার লাঠি মাটিতে রাখেন। অমনি ভয়ংকর এক সাপ হয়ে যায় নিরীহ লাঠিটা। বাচ্চারা ভয় পেয়ে দূরে ছিটকে যায়। কেউ কেউ চিৎকার করে। কয়েকজন কেঁদে ফেলে। দরবেশ সাপটা মুঠোর মধ্যে নেন। অমনি তা আবার হয়ে যায় লাঠি। তখন কাঁদতে থাকা বাচ্চা দুটো ছুটে আসে লাঠির কাছে– আবার সাপ বানাও তো দেখি। আর সাপ না। সাপ দেখে তোমরা ভয় পাও। এবার অন্য কিছু দেখ। দরবেশ লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করেন। পাথর ফেটে কমলা রঙের ফুল ফোটে। বাচ্চারা ফুল নেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লাগায়। দরবেশ সবার হাতে একটা করে ফুল তুলে দেন।

একজন বলে– ওই যে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক পাখি, ওগুলো নামিয়ে আনো তো! আমরা খেলব।

দরবেশ বলেন, পাখিদের নিয়ে খেলতে নেই। পাখিরা আকাশের সৌন্দর্য। ওরা উড়ে বেড়াক।

ছেলে নবজীবন পাওয়ার পর থেকেই কৃষকনেতা দরবেশের পেছনে লেগে আছেন। একটাই তার আকুতি– দরবেশ বাবা যেন তার পর্ণকুটিরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। যতদিন খুশি ততদিন। তিনি থাকতে দরবেশ বাবার থাকা-খাওয়ার কোনো চিন্তা নেই।

দরবেশ মুচকি হাসেন– ওরে মূর্খ, আমার অন্নের জোগানদাতা স্বয়ং প্রভু।

তবু আমার স্ত্রীর বড় সাধ– আপনি আমাদের বাড়িতে আশ্রম খুলুন। তার হাতের সুস্বাদু পাচ্য গ্রহণ করুন। আমরা থাকতে আপনার সেবার কোনো কমতি হবে না। আপনার হাতে আমার ছেলের পুনর্জন্ম হয়েছে।

ঠিক আছে, যাহ! সপ্তায় একদিন তোর বাড়িতে থাকব। তোর স্ত্রীকে গিয়ে বল সংবাদটা।

সপ্তাহের একদিন মঙ্গলবার দরবেশ কৃষকনেতার বাড়িতে অবস্থান করেন। সেই দিনে বাড়ির স্ত্রীটির চোখ-মুখ বেয়ে উপচে পড়ে আনন্দ। তার হাতের রেখায় লুকানো রান্নার যত কারিশমা আছে, সবই খুলে খুলে সাজায় দরবেশের খাবারের থালায়। এমন খোদাবন্দ মানুষের সেবাযত্নে স্বর্গ নিশ্চিত।

ওই একদিনই দরবেশকে কাছে পায় নগরবাসী। তাদের কত জিজ্ঞাসা, কত কৌতূহল, কত চাওয়া, কত আব্দার, দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত কত না বলা কথা– অথচ দরবেশের সামনে গেলে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। যার অলৌকিক নিশ্বাসের মৌতাতে নক্ষত্র খসে পড়ে ঘাসে, পাখিরা নেমে আসে মাটিতে, মাছেরা উঠে আসে ডাঙায়– তার সামনে বাগযন্ত্র বিকল হলে সে দোষ নগরবাসীর না। তবু এক মঙ্গলবারে গৃহকর্তা হওয়ার সাহসে দরবেশের সামনে বঞ্চনার গল্প পাড়েন কৃষকনেতা। জনতার সামষ্টিক ক্ষোভ জমাট বেঁধে তার একলা কণ্ঠে বিদ্রোহের ধ্বনি তোলে। এই নগরের বাবারা ভালো নেই। বিশেষ করে ঘরে যাদের কন্যাসন্তান আছে, তাদের আত্মা কণ্ঠনালির কাছে আটকে থাকে সব সময়। নগরপিতার পেয়াদারা প্রতি রাতে একেকজন মেয়েকে তুলে নিয়ে যায় নগরভবনে। রাতভর তাদের ওপর চলে অগ্নিবর্ষণ। কেয়ামততুল্য রাতটি কাটানোর পর তারা যখন ফিরে আসে জনপদে, শুধু দেহই ফেরে তাদের, প্রাণ রেখে আসে নগরপিতার বিছানায়। এই অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলবার শক্তি কারও নেই। নগরভবনের গোপন কক্ষে একটি ভয়ংকর কূপ আছে বলে শোনা যায়। নগরবাসী এর নাম দিয়েছে অভিশপ্ত অন্ধকূপ। নগরপিতার সমালোচক অথবা বিরোধীদের শেষ ঠিকানা হয় এই অন্ধকূপ।

বৃত্তান্ত শুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন দরবেশ। দশ আঙুলের দশটি আংটি থেকে অগ্নিলাভা বের হতে থাকে যেন। বাঁকানো লাঠিটা অজগর হওয়ার ইচ্ছায় হাতের মধ্যে মোচড়ামুচড়ি করতে থাকে।

আর? মেঘ গমগম কণ্ঠে প্রশ্ন রাখেন দরবেশ। তিনি নগরপিতার আরও অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে চান।

এবার লোকদের দূরত্বঘটিত ভীতি দূর হয়ে যায়। তারা সমস্বরে বলে– অন্যায্য করের ভারে আমরা বিপর্যস্ত, বাবা। নগরপিতার প্রমোদলীলার যাবতীয় খরচ আমাদেরকে বহন করতে হয়। নগরপিতার লালসার লকলকে জিভ, হোক সেটা ওপরের অথ বা নিচের, শান্ত করতে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয় আমাদের অর্থ ও কন্যারা...

জনতার অভিযোগ সমাপ্ত হয় না, তার আগেই অর্ধসমাপ্ত খাবারের থালা রেখে আচমকা উঠে দাঁড়ান দরবেশ। তারপর হনহন করে বেরিয়ে যান কৃষকনেতার আশ্রম ছেড়ে। জনতা হয়রান হয়ে চাওয়াচাওয়ি করে মুখ– তারা বেফাঁস কিছু বলে ফেলেনি তো!

পরের মঙ্গলবার দেখা মেলে না দরবেশের। জনতা ভাবে, হয়তো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তিনি! তারা দ্বিতীয় মঙ্গলবারের জন্য

অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় মঙ্গলবারেও লোকালয়ে ফেরেন না দরবেশ। লোকেরা ভাবে– দরবেশে বাবার হলোটা কী! দুই পক্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দরবেশ বাবা অস্তিত্বে না এলে জনতা হা-হুতাশ করতে থাকে। তারা ভাবে– নগরপিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে তারা বোধহয় ঈশ্বরপ্রেরিত এক মূল্যবান উপহার হারিয়ে ফেলল।

এসব আফসোস ও হা-হুতাশের মাঝে নতুন অভিশাপ নেমে আসে নগরের ওপর। এক সকালে তারা অনুভব করে– খাদ্যপণ্যের দাম তাদের হাতের নাগালে নেই। আগে মুঠোভরা মুদ্রার বিপরীতে থলেভরা খাবার পাওয়া যেত। এখন থলেভরা মুদ্রার বিপরীতে মুঠোভরা খাবারও জোটে না হায়। যারা ফসল ফলায়, সবজি উৎপাদন করে, কন্যাদের মতো উৎপাদিত খাদ্যশস্য ছিনিয়ে নিয়ে যায় পেয়াদারা। নগরের অলিতে-গলিতে শোনা যায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। মানবশরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়। মাতৃস্তনে দুধ না পেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে মরতে থাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। এখানে ওখানে পড়ে থাকে মৃতদেহ। আশরাফুল মাখলুকাতের দেহখাঁচা ধরে টানাটানি করে কুকুর শেয়াল। চিল-কাক-শকুনের কালো ডানায় ছেয়ে যায় নগরের নীল আকাশ। পচা মাংসের গন্ধে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে জনপদে। কিন্তু প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে তৈরি হয় বিরাট ফাটল। মাংসের আশায় ঠোকর দেয়া তাদের প্রতিটি ঠোঁট হাড্ডির গায়ে ঠকঠক করে বেজে ওঠে।

নগরজুড়ে দুর্ভিক্ষের মাতম চলে, অথচ উঁচু পাঁচিলের ওপাশের নগরভবনে তার কোনো আঁচ লাগে না। নগরপিতার একটাই শুধু অসুবিধা– নগরে নাদুস-নুদুস ডবকা মেয়ের অভাব। কারণ, দুর্ভিক্ষে মেয়েদের শারীরিক সুষমা লোপাট হয়েছে। মানবতার এই দুর্দিনে লাঠি হাতে পুনরায় আবির্ভূত হন দরবেশ। জনতা তার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে– যিনি কৃষকনেতার মৃত ছেলের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় ঊষর মাটির গর্ভ থেকে খাদ্যশস্যও বের করতে পারবেন। দরবেশের দয়া হয় মনে। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নগরীর ঝোপঝাড়ের কচুর পাতায় লাঠি ছোঁয়ান, ভোরে পাতার সঙ্গে ঝুলতে দেখা যায় রান্না করা পাখির মাংসের সুস্বাদু সালুন। ফল পাড়ার মতো মাংসের সেই টুকরোগুলো নগরবাসী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এমন স্বাদ সে খাবারের, পৃথিবীর কোনো জিহ্বা তা আস্বাদন করেনি। এমন সুবাস সে খাবারের, পৃথিবীর কোনো নাসিকা তা অনুভব করেনি। এমন রং সে খাবারের, পৃথিবীর কোনো চোখ তা অবলোকন করেনি। লোকেরা বলাবলি করে– খোদাপ্রদত্ত এমন একজন দরবেশ যাদের থাকে, তাদের আর দুঃখ-তাপের কী ভয়! সত্যিই, দরবেশের অলৌকিকত্বে দুর্ভিক্ষের সেই ভয়ংকর দিনগুলো হেসেখেলে পাড়ি দেয় নগরবাসী। তারপর এক সময় সুদিন আসে। আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে। নগরের মাঠ ফসলের জন্য যুবতী নারীর মতো কামার্ত হয়ে ওঠে। জনতা দরবেশের কাছে গিয়ে বলে, আমাদের আর পাখির মাংসের দরকার নেই। প্রতিদিন একই স্বাদের খাবার খেতে খেতে আমরা বিরক্ত। বৃষ্টি নেমেছে। আমরা মাঠে শস্য ফলাব। আমরা উৎপাদন করব তরকারি, কাঁকড়, গম, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ বিদায় হলো, মাঠে মাঠে ফসল ফলল, কিন্তু নগরবাসী ফিরে পেল না প্রকৃত জীবনের স্বাদ। এখনো তাদের কন্যারা সম্ভ্রম হারায় নগরভবনের বিছানায়, এখনো তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, অন্ধকূপের ভয়ে এখনো তারা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে। এরই মধ্যে ঘনিয়ে আসে নির্বাচনের দিনক্ষণ। নগরের কৃষকেরা একত্রিত হয় কৃষকনেতার বাড়িতে। নেতাকে তারা নগরপিতার বিপক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষমতার পালাবদল না ঘটলে নিপীড়িত কৃষককুলের মুক্তির কোনো পথ নেই।

এই প্রথম কৃষকনেতার কাঁধে হাত রাখেন দরবেশ। মাথা দুলিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন। দরবেশের হাতের স্পর্শে কৃষকনেতার কাঁধ শীতল হয়ে যায়। গরমে শরবত খাওয়ার প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সেই তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি। নির্বাচনে তিনি লড়বেন নগরপিতার বিরুদ্ধে। দরবেশ ও সমগ্র কৃষককুল তার সঙ্গে। এই সুযোগ বারবার আসবে না। পিতা হতে পারলে তিনি নগরের চেহারাই বদলে দেবেন। কৃষকের মুখে তিনি হাসি ফোটাবেন। ধর্ষিতাদের দেবেন বীরাঙ্গনার সম্মান। জনগণ এবং নগরভবনের মাঝখানে রাখবেন না বৈষম্যের কোনো পাঁচিল।

দিন যায়। রাত আসে। প্রবল উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার ভেতর ঘনিয়ে আসতে থাকে নির্বাচনের দিনক্ষণ। জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। নগরপিতার পতন ঘটাতে তারা বদ্ধপরিকর। কৃষকনেতার প্রতীকে সিল মারার জন্য প্রস্তুত আছে তাদের স্বাধীন সার্বভৌম আঙুল। আর আছে দরবেশ বাবার আশীর্বাদ। এবার তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবেই।

নির্বাচনের আগের দিন সন্ধ্যায় নগরজুড়ে যখন টালমাটাল অবস্থা, ঠিক তখন দরবেশের অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় নগরপিতা। দরবেশের মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তি নেই। সবটাই তার জাদুর ভেল্কি। জাদু দেখিয়ে জনগণের মাথা খেয়েছে সে। ভেল্কি দেখানো অমন জাদুকরের অভাব নেই নগরভবনে।

তবে প্রতিযোগিতা হোক। দেখা যাক বিজয়ী হয় কে!

নগরপিতা ঘোষণা দেন– আগামীকাল নির্বাচনের দিন হবে প্রতিযোগিতা। একই দিনে দুই খেলা– ভোটের এবং জাদুর। জনতা খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে ভোট দিয়ে আসবে। এতে আনন্দ বাড়বে দ্বিগুণ।

দরবেশ রাজি। সেই রাতে তিনি লাঠির গায়ে হাত বুলিয়ে, চুমু খেয়ে ঘুমাতে যান। পরদিন সকালে ভোটের মাঠের দুই প্রান্তে দাঁড়ায় দুই দল। একদিকে নগরপিতা, অপরদিকে কৃষকনেতা। একদিকে জাদুকর, অপরদিকে দরবেশ। রাতারাতি পঞ্চাশজন জাদুকর জড়ো করে ফেলেছে নগরপিতা। তাদের হাতে নানা ধরনের রশি।

ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া
প্রতিষ্ঠাতা, হামদর্দ পাবলিক কলেজ

কলেজ কোড: ১১৭০ EIIN: 134209

স্থাপিত: ২০১০

হামদর্দ পাবলিক কলেজ

১৫১/৮, গ্রিন রোড (পাছপথ সিগন্যাল), ঢাকা-১২০৫।

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে অধ্যয়নের সুযোগ!

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা
বিজ্ঞান: ৪.০০; ব্যবসায় শিক্ষা: ৩.০০
মানবিক বিভাগ: ২.৫০

আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান: ৮০০; ব্যবসায় শিক্ষা: ২০০
মানবিক বিভাগ: ১০০

কলেজের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মেধাভিত্তিক সেকশন বিন্যাস। অ্যাডমিশন ব্যাচ গঠন করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বুয়েট, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে) ভর্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা;
- নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রমের পর প্রাইভেট-এর বিকল্প হিসেবে ACP (After Class Programme)- এর ব্যবস্থা;
- পিছিয়ে পড়া, দুর্বল শিক্ষার্থীদের স্পেশাল ক্লাসের ব্যবস্থা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের সান্ধ্যকালীন পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক নিবিড় পরিচর্যা;
- শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শ্রেণি শিক্ষক ও গাইড টিচারের নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ;
- ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য English Language Club-এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক Spoken Class (i1class.com)-এর ব্যবস্থা;
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষা-সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রয়েছে বিজ্ঞান, বিজনেস, আইটি, ল্যাঙ্গুয়েজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ, মেডিটেশন, সমাজ কল্যাণ ও ডিবেট ক্লাবসহ মোট ১৬টি ক্লাব;
- কলেজে রয়েছে এক ঝাঁক তরুণ, অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক, যারা তাদের পাঠদানে শতভাগ নিবেদিত।

"পল্লীকবি জসীমউদদীন-এর জন্য বার্ষিকী"-তে প্রধান অতিথির ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা-এর কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর এ টি এম মোয়াজ্জেম হোসেন।

কলেজের ক্লাস কার্যক্রম

এক নজরে ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় হামদর্দ পাবলিক কলেজের ফলাফল

- মোট পরীক্ষার্থী: ৪২৯ জন
- পাশের হার: ১০০%; মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার: ৭৯%
- জিপিএ-৫: ৩৩৮ জন; গোল্ডেন জিপিএ-৫: ৬৭ জন
- ভর্তিকৃত ৪২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছিল ১৯৮ জন; এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৩৮ জন; যা এসএসসির তুলনায় প্রায় দিগুণ।

এইচএসসি-২০২২ পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যে উদ্ভাসিত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এইচএসসি-২০২২ পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যে অভিভূত বিনিময় কালেজ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করছেন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি লে. জেনারেল আবু তৈয়ব মোহাম্মদ জহিরুল আলম, অতিরিক্ত আইজিএস, পিএসসি (অব.)।

হামদর্দ পাবলিক কলেজ, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ও সারাদেশের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

	হামদর্দ পাবলিক কলেজ	ঢাকা শিক্ষাবোর্ড	সারাদেশ
পরীক্ষার্থী	৪২৯ জন	২,৭৬,৯৩৪ জন	১২,০৩,৪০৭ জন
পাশের হার	১০০%	৮৮%	৮৬%
জিপিএ-৫ এর সংখ্যা	৩৩৮ জন	৬২,৪২১ জন	১,৮৬,০০০ জন
জিপিএ-৫ এর হার	৭৯%	২২.৫%	১৫.৪৫%

স্বপ্ন যেখানে সত্যি হয়
হামদর্দ পাবলিক কলেজ

কলেজে রয়েছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানাগার, আইসিটি ল্যাব, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি

কলেজের শিক্ষকবৃন্দ

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবরেটরি

রসায়ন ল্যাবরেটরি

জীববিজ্ঞান ল্যাবরেটরি

লাইব্রেরি

আইসিটি ল্যাবরেটরি

একনজরে কলেজের ফলাফল (২০১৫-২০১৯)

সাল ও ব্যাচ	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	জিপিএ-৪.০০ ও তদূর্ধ্ব	পাশের হার
২০২২-১১তম ব্যাচ	৪২৯ জন	৩৩৮ জন	৯১ জন	১০০%
২০২১-১০ম ব্যাচ	৩১৩ জন	২৪৯ জন	৬৪ জন	৯৯.৬৮%
২০২০-৯ম ব্যাচ	২৯৫ জন	২২৪ জন	৭১ জন	১০০%
২০১৯-৮ম ব্যাচ	১৯৫ জন	৭৪ জন	১২১ জন	৯৯.৩২%
২০১৮-৭ম ব্যাচ	১৪৮ জন	৪৫ জন	১০২ জন	১০০%
২০১৭-৬ষ্ঠ ব্যাচ	১৩৪ জন	৬২ জন	৭২ জন	১০০%
২০১৬-৫ম ব্যাচ	১৪২ জন	৯৬ জন	৪৬ জন	১০০%
২০১৫-৪র্থ ব্যাচ	১০৬ জন	৬৬ জন	৪০ জন	১০০%
২০১৪-৩য় ব্যাচ	৯৯ জন	৯৮ জন	০১ জন	১০০%
২০১৩-২য় ব্যাচ	৯৮ জন	৫১ জন	৪৬ জন	৯৯%
২০১২-১ম ব্যাচ	১৪ জন	০১ জন	১৩ জন	১০০%

■ কলেজের ভালো ফলাফল করার পিছনে রয়েছে- শৃঙ্খলা, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, হামদর্দ বাংলাদেশ-এর নিবীড় পরিচর্যা

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামদর্দ পাবলিক কলেজের সাফল্য (২০১৯-২০২১)

প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী
বুয়েট/ কুয়েট/ চুয়েট/ কুয়েট/ বুটেক্স ও অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৮১ জন
সরকারি মেডিকেল কলেজ	৭৩ জন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০২ জন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৯৫ জন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬ জন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭ জন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৬৫ জন
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬২ জন
হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	৬৫ জন
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী/ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী (কমিশন অফিসার)	০৮ জন
অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	৪২৯ জন

ভর্তি ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ

হামদর্দ পাবলিক কলেজ

১৫১/৮, গ্রিন রোড (পাছুপথ সিগন্যাল) ঢাকা ১২০৫।
ফোন: ২২২২৪৮৫১৮, ০১৬১১-৪৬৬৩৭৬, ০১৮২৪-৫৫৭৮১২

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
www.hamdardpubliccollege.edu.bd
www.facebook/hamdardpubliccollegehpc

বিপরীতে দরবেশ একা এবং তার হাতে একটিমাত্র লাঠি। খেলা শুরু হয়। জাদুকররা পালাক্রমে তাদের রশি ছেড়ে দেয় মাটিতে। সেগুলো বাঘ-সিংহ-কুমির-সাপ-হায়েনা হয়ে তেড়ে আসে দরবেশের দিকে। কৃষকেরা ভয়ে আঁতকে ওঠে, কিন্তু দরবেশ নির্ভার। যখন একেকটা জন্তু দরবেশের ছায়ার কাছে চলে আসে, যখন ভয়ে আতঙ্কে নগরের কৃষককন্যারা চোখ বন্ধ করে ফেলে, ঠিক তখন, তখনই দরবেশ ছেড়ে দেন হাতের লাঠি। অমনি পাহাড়ের মতো বিশাল এক অজগর হয়ে যায় নিরীহ লাঠিটি। অজগর অলস ভঙ্গিতে হাঁ করে আর জাদুকরদের সব হিংস্র প্রাণী উড়ে উড়ে ঢোকে তার মুখের মধ্যে। দিনভর চলে এই খেলা। কৃষকেরা দরবেশের সাফল্যে এতটাই আত্মহারা, তারা ভুলে যায় আজ একটি বিশেষ দিন। এই একটি দিনের উদাসীনতায় পাঁচ বছরের জন্য তাদের জীবন আবার আটকে যাবে জুলুমের চোরাবালিতে।

খেলায় খেলায় গড়ায় বেলা। দরবেশের অজগরের কাছে কুপোকাত হয় নগরভবনের বাঘ-সিংহ-হায়েনা। কৃষকেরা দরবেশকে নিয়ে হর্ষ-উল্লাসে মাতে। ঠিক তখন, সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে দিতে ছুটে আসে ময়দানে– আজকের নির্বাচনে পূর্বের নগরপিতাই নবনির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নারীরা হায় হায় করে ওঠে। যুবকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ভোটই দিল না অথচ ভোট গণনা সম্পন্ন হয়ে গেল! নগরপিতার পেয়াদারা ব্যালট বক্স খুলে খুলে দেখায়, বক্স ভর্তি ব্যালট পেপার। সবগুলো সিল নগরপিতার প্রতীকে।

জনতা বিক্ষোভ শুরু করে। কারচুপির এই নির্বাচন তারা মানবে না। মুষ্টিবদ্ধ হাতে স্লোগান দিতে দিতে তারা নগরভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নগরভবনের প্রতিটি ইট আজ ধুলোয় মেশাবে– এমনই প্রতিজ্ঞা তাদের শক্ত চোয়ালে।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য লাল হয়ে উঠলে নগরভবন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে সশস্ত্র পেয়াদা। তাদের মারমুখী ভঙ্গি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ভীতিসঞ্চার করে অপ্রশিক্ষিত, অসংঘবদ্ধ জনতার হৃদয়ে। বাধার মুখে পিছু হটতে গিয়ে তাদের মনে পড়ে দরবেশের কথা। এতদিনে সকল কাজে তারা দরবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই দুঃসময়ে, পেয়াদারা যখন বজ্র হয়ে নামতে যাচ্ছে তাদের মাথায়, তখন দরবেশকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বাচনী ডামাডোলের ভেতর তারা লক্ষ্য করেনি, ভোটের ফলাফল ঘোষিত হলে আপন নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে মুষড়ে পড়েছেন দরবেশ। প্রাচীন এক আমগাছের ছায়ায় একলা বসে মাটিতে বিষণ্ণতা ঝরাচ্ছেন তিনি।

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন চিৎকার করে– দরবেশকে আমগাছের নিচে দেখেছি। চলো তার কাছে যাই। রাজার পেয়াদাদের কবল কেবল তিনিই আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।

বিক্ষিপ্ত জনতা ছুটে আসে দরবেশের কাছে। বোকামির অভিঘাত তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি দরবেশ। তখনো তিনি ধ্যানী ঋষীর মতো অবনত মস্তকে বসে আছেন মাটিতে। জনতার হট্টগোল ঘোর ভাঙায় দরবেশের। তারা আর্তনাদ করে বলতে থাকে– আমাদেরকে রক্ষা করুন, দরবেশ বাবা। পেয়াদাদের হাতে পড়লে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

ঘুমন্ত সিংহের মতো আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠেন দরবেশ। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে লাঠির ভরে উঠে দাঁড়ান তিনি। জনতার মাথার ওপর দিয়ে ঘনঘোর দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখেন, পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে পেয়াদার দল। তাদের মধ্যমণি খোদ নগরপিতা। দরবেশের চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তার ওই চোখের তারায় জ্বলে ওঠে তুর পাহাড়ের আলো। মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে জনতাকে তিনি ইশারা করেন অনুসরণের।

খুব আয়েশী ঢঙে, যেন কোথাও কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক নেই, কোথাও ঝরছে না কোনো আহত পাখির পালক, এমন ভঙ্গিতে চলতে থাকেন দরবেশ। তার পেছন পেছন চলতে থাকে নগরের কৃষককুল, ভীতি যাদের আপাদমস্তক গ্রাস করে রেখেছে।

সহসা দরবেশের সামনে তিমির পিঠের মতো জেগে ওঠে এক নাব্য নদী, যার ঢেউ পেয়াদার অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর। জনতা আহাজারি করে ওঠে– পেছনে ঘাতক, সামনে নদী, এখন উপায়? দরবেশ নির্ভার। নদী থেকে উঠে আসা উছলা হাওয়ায় তার চুল ওড়ে, বস্ত্র দোলে। আলুলায়িত বস্ত্র সামলে তিনি এগিয়ে যান নদীর কাছে। টাখনু ভেজা জলে পা ডুবিয়ে তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করেন নদীর বুকে। অমনি করাতকলের নৈপুণ্যে চড়চড় করে দুই ভাগ হয়ে যায় নদীটি। মাঝখানে রাজপথ। দরবেশ পেছন ফিরে জনতাকে দেখেন। তার ঠোঁটে স্মিত হাসি। তখনো উড়ছে মাথার কাশবন। জাদুকরী সম্মোহনে তিনি আহ্বান করেন– আসো তোমরা।

জনতার মধ্যে এবার দ্বিধা। এ সত্যিই পথ নাকি গোলকধাঁধা? রাজার পেয়াদার সঙ্গে তবু যুদ্ধ করা যাবে, কিন্তু জলের সঙ্গে? তারা দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। দরবেশের হাসি এবার প্রসারিত হয়। তিনি একাই পা রাখেন অলৌকিক রাজপথে। তারপর হাঁটতে থাকেন সামনের দিকে। দুপাশের থমকে থাকা জল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দরবেশের হেঁটে যাওয়া। এরপর আর সন্দেহ করা যায় না। এরপর সন্দেহ করা পাপ। জনতা এবার পড়িমড়ি উঠে আসে অথবা নেমে আসে রাজপথে। হাঁটতে থাকে দরবেশের পিছু পিছু। কেউ কেউ পানির গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে– সেগুলো এখন কাচের দেয়াল।

জনতা যখন মাঝনদীতে, নগরপিতা ও তার পেয়াদারা নদীর কূলে এসে দাঁড়ায়। দরবেশ ও জনতার ওপর তারা এতটাই ক্ষিপ্ত, পরিণতি না ভেবে তারা পিছু নেয় জনতার। আর তখন পূর্বের ভয় পুনরায় ফিরে আসে জনতার মাঝে। নদীর বুকে রাস্তা রচিত হতে দেখে তারা ভেবেছিল, এই পথই তাদের মুক্তির উপলক্ষ। কিন্তু ঘাতকের দলও যখন সেই রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ পায়, তখন আর মুক্তির কোনো আশাই অবশিষ্ট থাকে না। কেউ কেউ দরবেশের কাছে গিয়ে আক্ষেপ করে– ওরাও তো আসছে! আজ সব অভিযোগের বিপরীতে দরবেশ শুধু হাসেন।

জনতা কি একটু বিরক্ত হয়? তারা ফাটল ধরা হৃদয় নিয়ে দরবেশের সঙ্গে পার হয় নদী। সূর্য ডোবে। পাখিরা ব্যস্ত কিষাণীর মতো ঘরে ফেরে। দূরে কোনো এক রাখাল বালক বিষাদের বাঁশি বাজায়। আর পেছনে শোনা যায় উন্মত্ত সৈন্যদের হুংকার– ধর ওদের। সবগুলোকে খতম কর।

জনতা যখন নদীর ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়, নগরপিতা ও সৈন্যরা তখন মাঝনদীতে। কৃষকদের কেউ কেউ আর্তনাদ করে– এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে বেঘোরে প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে ঘরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই ভালো ছিল। এখানে আমাদের লাশটাও হয়তো শেয়াল-কুকুরের পেটে যাবে। শিশুরা কাঁদে। শিশুর মায়েরা আহাজারি করে। এ সময় আবার দৃশ্যপটে হাজির হয় দরবেশের লাঠি। সৈন্যদের অবস্থান দেখে নিয়ে দরবেশ নদীর বুকে লাঠির ঘাই মারেন। অমনি দুপাশের থমকে থাকা জল কলকল শব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। জলের আলিঙ্গনের মাঝে সলিল সমাধি হয় নগরপিতা ও তার সৈন্যদের। পথ মিশে যাওয়ার পরও নগরপিতার অন্তিম আর্তনাদ জলের ওপর ভেসে থাকে অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই আর্তনাদ শুনবার মতো ধৈর্যশীল কোনো হৃদয় পাওয়া যায় না নদীতীরে।

উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা। দরবেশের অনুকম্পায় অবশেষে মুক্তির দিশা মিলল তাদের। মুক্তিরদিশারী দরবেশকে পারলে তারা মাথায় তুলে নাচে। আকাশে তারা ফোটে। নদীর কূলে ঘাসের গন্ধ ছোটে। কয়েকটি বাদুড় ওড়াউড়ি করে নীল শামিয়ানার নিচে। উল্লসিত জনতা ক্লান্ত হয়ে এক সময় বসে পড়ে ঘাসের মাদুরে। তখন তাদের ঘরের কথা মনে হয়। ঘরের গবাদি পশুর কথা মনে হয়। লাউয়ের মাচা আর মটরশুঁটির কথা মনে হয়। এখনই তাদের ঘরে ফেরা দরকার। এতক্ষণে নিশ্চয় শেয়াল এসে উৎপাত শুরু করেছে মুরগির খোঁয়াড়ে। তারা দরবেশকে অনুরোধ করে– দরবেশ যেন নদী চিরে ঘরে ফেরার রাস্তা বানিয়ে দেয়। কিন্তু এত উপকারী দরবেশ, যিনি জালেমের হাত থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করেছেন, তিনি এবার বেঁকে বসেন রাস্তা বানাতে।

জনতা হায় হায় করে ওঠে– তাহলে আমরা ঘরে ফিরব কীভাবে? দরবেশ গমগমে কণ্ঠে বলেন– তোমাদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছি। এবার নিজের পথ নিজেই নির্মাণ করে নাও।

অন্ধকারে পা বাড়ান দরবেশ। একটু পর নিকষ আঁধারে দরবেশের জাদুকরী আংটির চলন্ত আলোই দেখা যায় শুধু।

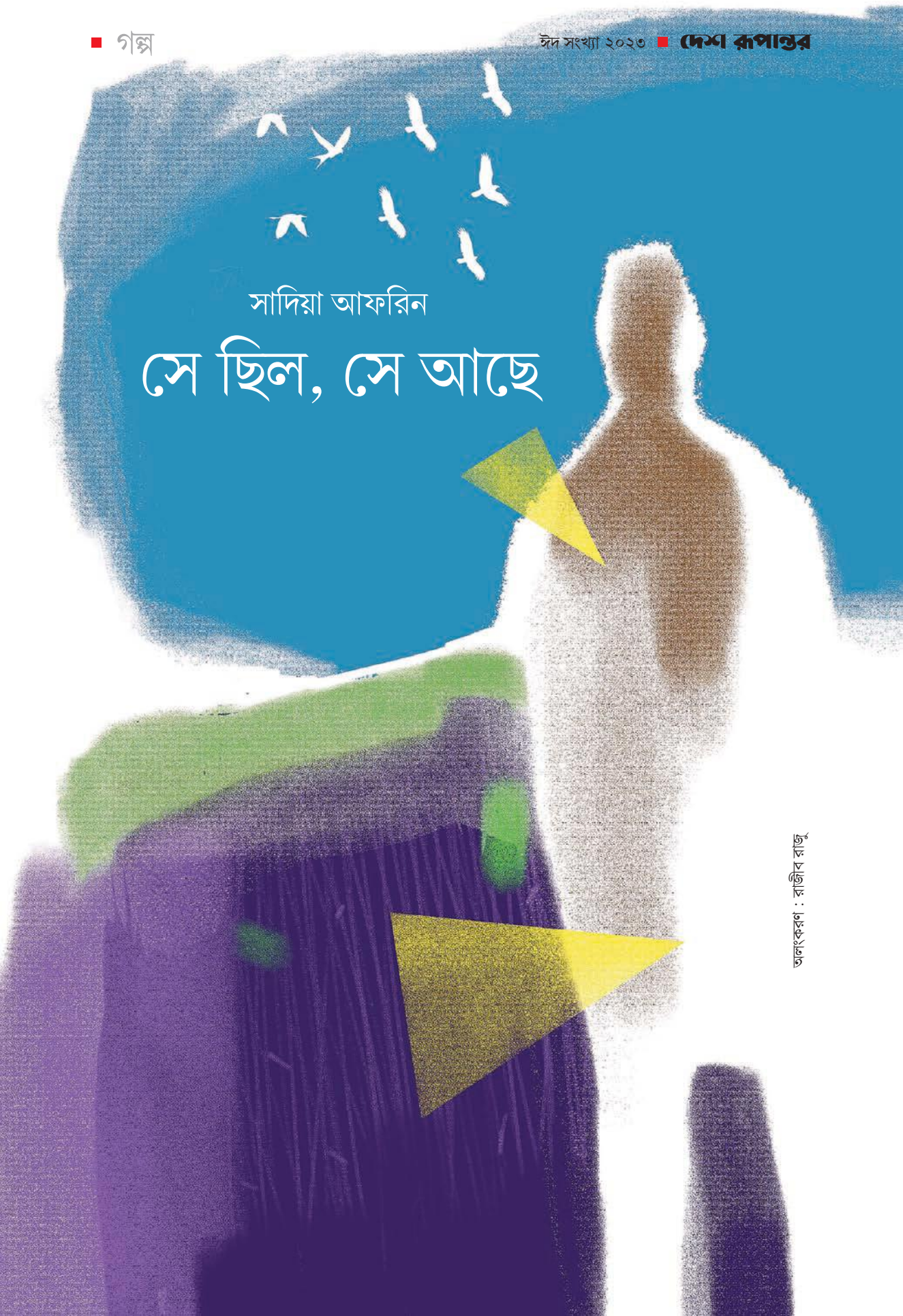

সাদিয়া আফরিন

সে ছিল, সে আছে

অলংকরণ : রাজীব রাজ

হ্যালো মুনিয়া, খবর শুনেছো?
কী খবর মোহসীন ভাই?
রঞ্জু... রঞ্জু মারা গেছে!
রঞ্জু! কোন রঞ্জু?
আমাদের রঞ্জু। সুকন্যা প্রজেক্টের রঞ্জু।
কী বলছেন মোহসীন ভাই? কখন? কীভাবে মারা গেছে?
কিছুক্ষণ আগে ওর প্রোফাইলে কেউ একজন লিখেছে। কারণ স্পষ্ট না। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক! এখন তো কমবয়সী ছেলেপেলেরা হরদম হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়!
মোহসীন ভাই আমার ঊর্ধ্বতন। উনি কথা বলে যাচ্ছেন আর এদিকে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। মাথা কাজ করছে না। চোখের সামনে রঞ্জুর মুখ। ছায়াছবির পর্দার মতো অসংখ্য টুকরো দৃশ্য একের পর এক এসে জড়ো হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই তো রঞ্জু আছে! এই তো হাসছে! বাঁধভাঙা কান্নায় আমার কণ্ঠ জড়িয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কাঁপছে। নিজেকে সংযত করলাম।
আহা! এই সেদিন ছেলেটি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে এলো। ওকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি আমি।
কত দিন ছিল আমাদের সঙ্গে? দুই বছর?
না, দুই বছরের একটু বেশি। ভার্সিটি থেকে বের হয়েই আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিল।
হুম। বয়স খুব বেশি হয়নি। ত্রিশ/বত্রিশ! এর বেশি কোনোমতেই না।
ত্রিশ হবে। আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করার পরপরই বিয়েও করল। ওরই এক কাজিনকে। একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না রঞ্জু মারা গেছে!
ছেলেগুলো এত অল্প বয়সেই এভাবে ঝরে যাচ্ছে! মানা যায় না।
মোহসীন ভাইয়ের পর শিল্পী, রাহাত, মৌসুমী একে একে সবার ফোন। সবাই খুব শোকাহত, যেন হারিয়েছে প্রিয় এক বন্ধুকে! রঞ্জুসহ আমরা সবাই একই টিমে কাজ করেছি। আমি ছিলাম ওদের সবার ঊর্ধ্বতন। তবে আমি ঊর্ধ্বতন কম বন্ধু ছিলাম বেশি। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা ছিল চমৎকার। টিমের সবাই কাজের প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করেছি, পাশে দাঁড়িয়েছি এবং দিন শেষে এর ফলাফল সবাই মিলে উপভোগ করেছি। আমরা বেশ কটি নতুন প্রজেক্ট হাতে পেয়েছিলাম যেখানে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল।
রঞ্জু ছিল উদ্যমী ও পরিশ্রমী। কিছু মানুষ থাকে না যাকে নিয়ে সবাই নিঃসন্দেহ থাকে যে সে এক দিন অনেক ওপরে যাবে! রঞ্জু ছিল সে রকম। আর ছিল প্রচণ্ড হিউমারাস! ওর অনুপস্থিতিতে অফিসটা ঠিক জমত না। ঝলমলে উপস্থিতি আর হিউমার দিয়ে যেকোনো পরিস্থিতিকে প্রাণবন্ত করে তোলার বিশেষ ক্ষমতা ও রাখত। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ এক দিন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভালো পদ ও উচ্চ বেতনে রঞ্জু চলে গেল। রঞ্জুর এই চলে যাওয়া আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা ওর মতো মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষ যে ছোট একটি এনজিওতে সারা জীবন পড়ে থাকবে না সেটি জানা কথা!
রঞ্জু মারা গেছে– এই সত্যিটি আমাকে পিষে দিচ্ছে। কেউ এসে বলুক খবরটি মিথ্যে! কেউ এসে বলুক রঞ্জু বেঁচে আছে। আমি দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছি কারণ আমি তো শুধু একজন প্রাক্তন সহকর্মীকেই হারাইনি, হারিয়েছি এমন একজনকে যে আমার ছিল, যে আমার আছে। থাকবে আমার হয়ে।
রঞ্জু আন্তর্জাতিকে চলে যাওয়ার পর আমাদের টিমটা কেমন গতিহীন হয়ে পড়ল। যদিও টিম না বলে বলা উচিত আমি। হ্যাঁ আমি। আমি রঞ্জুকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম কোথাও না যাক। ও হয়তো বুঝে গিয়েছিল দিন দিন ওর ওপর আমার নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে! হয়তো বুঝে গিয়েছিল ওকে ছাড়া শুধু নতুন প্রজেক্টগুলোই না ব্যক্তি আমার সামনে এগিয়ে যাওয়াও কঠিন। আর তাই হয়তো ও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সত্যি সত্যি ওকে হারিয়ে আমি ভীষণ শক্তিহীন হয়ে পড়লাম; এমনই অক্ষম, নাজুক যে মনে হতো কেউ আমার একটি হাত কেটে নিয়েছে! অফিসে একটা নীরব ছায়া আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। মৌসুমী ডেস্ক বদলে রঞ্জুর ডেস্কে আসতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। মনে মনে চেয়েছি রঞ্জুর ডেস্ক ফাঁকাই থাক, অন্য কাউকে সেখানে আমি দেখতে চাইনি। একটা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে মৌসুমীকে মানা করেছিলাম। আমার এই আচরণে মৌসুমী আহত হয়েছিল কিন্তু আমি সেটিকে আমলে নিইনি।
আন্তর্জাতিকে যাওয়ার পর রঞ্জুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে আসে। প্রথম কিছুদিন অসম্পূর্ণ কাজগুলোর সুবাদে যতটুকু যোগাযোগ হতো এরপর তা নেমে আসে উৎসবে-পার্বণে-বিশেষ দিনের একটা টেক্সট মেসেজে। যদিও আমি মনে মনে চাইতাম রঞ্জু আমাকে লিখুক, একটা ফোন দিক, অন্তত ফেসবুকে মন্তব্য করুক। ও তা করেনি। কাজের বাইরে স্বপ্রণোদিত হয়ে ও কখনো কোনো যোগাযোগই তৈরি করেনি। আমি যতটুকু যোগাযোগ করেছি সেসব ক্ষেত্রেও রঞ্জু ছিল খুবই মাপা। ওর সাড়া না পেয়ে একসময় আমাকে থেমে যেতে হয়েছে। এমনিতে স্বভাবজাত দুষ্টুমি-হাসি-ঠাট্টায় সারাক্ষণ অফিস মাতিয়ে রাখলেও ব্যক্তি রঞ্জু নিজেকে কখনোই উন্মুক্ত করেনি। বুঝতে দেয়নি ওর ব্যক্তিগত জীবন, প্রেম, ভালোবাসা। কথা প্রসঙ্গে জেনেছি ও নিম্নবিত্ত পরিবারের একা রোজগেরে ছেলে। বাবা-মা-ভাই-বোনসহ বিশাল পরিবার। পুরো পরিবার চালাতে ওর যেমন একটা ভালো বেতনের চাকরি দরকার, তেমনি দরকার চাকরিটিকে টিকিয়ে রাখা। তাই হয়তো চাকরি জীবনকে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে মাখাতে চায়নি। তাই হয়তো সচেতনভাবেই আমাকে এড়িয়ে গেছে! রঞ্জুর ইচ্ছে ছিল খুব দ্রুত একটা ভালো অবস্থানে যাওয়ার। অর্থনৈতিক টানাপড়েন কাটিয়ে দেশের বাইরে পড়তে যাবে এমন ইচ্ছের কথাও বলেছিল কিন্তু তাই বলে হঠাৎ চাকরি বদল, তাও আমাকে কিছুই না জানিয়ে! মানতে কষ্ট হয়েছিল আমার।
সবচেয়ে বেশি আহত করেছিল যে ব্যাপারটি তা হলো বর্তমান কর্মস্থলে ও রেফারি করেছিল মোহসীন ভাইকে। রঞ্জু কি ভেবেছিল আমাকে জানালে এই চাকরি ছাড়া সহজ হবে না? কিংবা আমাকে এড়ানোর জন্যই কি অন্যত্র চাকরি খুঁজছিল? জানি না। কিন্তু আমারই বা কী করার ছিল? রঞ্জুকে দেখে ভাবনাগুলো হঠাৎ বদলে গেল। ওকে শুধু সহকর্মী ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বলে এমনটি কখনো হয়নি যে রঞ্জুর সঙ্গে আমি আদিখ্যেতা করেছি বা আমার অনুভূতির কথা ওকে জানিয়েছি। তবে আমার সহজাত আচরণ ও শরীরী ভাষায় ও কখনো কিছু আন্দাজ করে থাকলেও থাকতে পারে। মনের ওপর ১০০% নিয়ন্ত্রণ কে কবে করতে পেরেছে? রঞ্জু আমার ভাবনায় ছিল, ছিল অনুভবে যদিও কখনো কেউ হয়ে ওঠেনি। তবে আমি খুব করে চাইতাম ও আমার কেউ হয়ে উঠুক– একান্ত আপন কেউ।
সেই রঞ্জু আজ চলে গেছে।
সংবাদটি জানার পর থেকে ইতস্তত ছোটাছুটি করছি। নিঃশ্বাস নিতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘরে একফোঁটা বাতাস নেই। কনকনে ঠাণ্ডা শীতে এসি ছেড়ে ভেতরের দলা পাকানো অস্থিরতাগুলোকে চেপে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরপর ওর ফেসবুক প্রোফাইল চেক করছি। দুদিন আগে ওর শেষ পোস্ট ছিল। নারী সহকর্মীদের সঙ্গে। বন্ধুদের হাস্যরস সামলে দিব্যি প্রতিটি মন্তব্যের উত্তর দিয়েছে। সেই ছবিগুলোর নিচে গত কয়েক ঘণ্টায় শুধু শোকের মাতম– কেন চলে গেল রঞ্জু এই অবেলায়?
যে যাওয়ার সে তো যাবেই! বেলা-অবেলার এই ছকবাঁধা তো মিছেমিছি! জীবনকে যাত্রা আর মৃত্যুকে গন্তব্য ধরে নিয়ে মাঝের সময়টুকুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে চাওয়ার এক চিরাচরিত রীতি আমাদের। নির্ভাবনা, নির্ভরশীলতার সময়টুকুর নাম শৈশব। রোমাঞ্চ, ভালো লাগা আর প্রশ্নের সময়টুকু কৈশোর। উৎসাহ, স্বপ্ন আর উদ্যমের দিনগুলো আমাদের তারুণ্য। কর্মময়-অর্জনের সময় যৌবন। আর সব যখন থেমে আসে সেটি বার্ধক্য। সময় আর বয়সের কি সন্ধি! কেউ যৌবনে চলে গেলেই আমরা ভাবি এ-যাওয়া বড় অসময়ে! কিন্তু অনন্তলোকের এই যাত্রা তো অবশ্যম্ভাবী। সবাই যাবে। আমিও যাব। আচ্ছা কেমন হবে যদি আমিও হঠাৎ চলে যাই! আমার জন্যও কি এমন শোকের পাহাড় জমা হবে কারও মনে? আমিহীন এই নগরে কেউ কি দুঃখের রঙ মেখে হবে নীল? কেউ কি ভেবে আকুল হবে এই আমাকে? আব্বা, আম্মা, ছোটন, ফুলকি কি

FBCCI

FBCCI BUSINESS EXCELLENCE AWARD 2023

ন্যাশনাল লাইফের সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিনের এফবিসিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ

জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'সার্ভিস ক্যাটাগরীতে' ১৩ মার্চ ২০২৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ন্যাশনাল লাইফের সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিনের হাতে 'এফবিসিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড - ২০২৩' তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপি ও সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন।

এই অর্জনে ন্যাশনাল লাইফ পরিবার গর্বিত ও অনুপ্রাণিত।

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

করবে ওরা? আবা-আম্মা হয়তো কষ্ট পাবেন এই ভেবে যে তাদের আগেই আমি চলে গেলাম। ছোটন, ফুলকি সাময়িক শোক কাটিয়ে বছরান্তে জাগতিক হুলোহুলির এক ফাঁকে হয়তো বোনকে মনে করবে! তারপর আবার থিতু হবে সংসারে। কিন্তু এমন কাউকে তো দেখছি না যার জীবনে আমিহীনতা জন্ম দেবে গভীর দুঃখবোধ, যে দুঃখবোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে জীবনভর, এই পৃথিবীকে মনে হবে পাষাণপুরী, পূর্ণিমার চাঁদটিকেও মনে হবে বড় ম্লান!

কেউ একজন রঞ্জুর জানাজার সময় জানিয়েছে। সকাল দশটা। তারপর সাভারে রঞ্জুর পারিবারিক কবরস্থানে ওকে দাফন করানো হবে। প্রযুক্তির এই বিষয়টা দারুণ! ভাবনার আগেই অনেক তথ্য সামনে চলে আসে। রঞ্জুকে শেষবার দেখতে যাব কি না জানতে চেয়ে মৌসুমী মেসেজ দিল! ওরা সকালে সাভারে যাচ্ছে। আমি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে বলে মানা করে দিলাম।

শেষ দেখা! পৃথিবীর পাট চুকিয়ে কেউ একজন গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে সেই দেখাকে শেষ দেখা বলে লোকে অথচ এই দেখা কি সুখকর কিছু? শেষ দেখা হতে পারে সেটি যে দেখাটি মনের গভীরে থেকে যায়। তা যেকোনো সময়ই হতে পারে। হতে পারে কোনো এক পলকে কাউকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল। তারপর আরও শত শতবার দেখা হলেও ওই নির্দিষ্ট মানুষটিকে মনে করার সময় মানসপটে ভেসে ওঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ওই বিশেষ মুহূর্তটি! আবার উল্টোটাও হতে পারে। কারও কারও সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে গভীর বিষাদ অথবা ব্যথাতুর এক অবয়ব। মোদ্দা কথা হলো, আমি কাউকে কীভাবে মনে করতে চাই বা কীভাবে মনে করতে পছন্দ করি। চোখের দেখা তো ফুরায় কিন্তু মনের দেখা– সে তো অসীম।

গত সেপ্টেম্বরে আমি ও রঞ্জু দুজনেই যার যার প্রতিষ্ঠান থেকে একটি জাতীয় পর্যায়ের ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলাম। ওর সংগঠনের হয়ে রঞ্জু কথা বলেছিল। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। চা পর্বে ওর ঊর্ধ্বতনের সঙ্গেও আলাপ হলো। ঊর্ধ্বতন রঞ্জুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। আত্মপ্রত্যয়ী এক রঞ্জুকে দেখলাম সেদিন। আনুষ্ঠানিক কোনো বিদায় হয়নি আমাদের। জরুরি কাজে দ্রুতই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল ওকে। আমার বক্তব্যের মাঝখানেই ছোট্ট একটি বার্তা, খবধারহম. টৎমবহঃ পধষয. ঞবধশ ঃড়ুড়ঁ ংড়ড়হ!

সেই শেষ দেখা।

রঞ্জুর প্রোফাইল থেকে ওর স্ত্রীর প্রোফাইলটিতে গেলাম। রঞ্জু বলেছিল মেয়েটি ওরই এক কাজিন। আমাদের সঙ্গে কাজ শুরুর পরপরই হঠাৎ এক দিন জানাল ও বিয়ে করেছে। পরিবারের পছন্দে হুট করে বিয়ে হওয়ায় অফিসের কাউকে জানাতে পারেনি। ওর সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে প্রথম দেখি অফিসের পিকনিকে। ওই একবারই। মেয়েটি রঞ্জুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। মৌসুমীরা হাসাহাসি করছিল এই বলে যে রঞ্জু যাদের যাদের সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটি নাকি তাদের দিকে শকুনের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে! রঞ্জুর কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে কি না শুধু এই গোয়েন্দাগিরি করার জন্যই নাকি ও পিকনিকে এসেছে! যতক্ষণ দেখলাম তাতে রঞ্জু ও মেয়েটির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ভাববিনিময় চোখে পড়ল না। মনে হলো দুজনে যেন আলাদা দুটি দ্বীপ!

এক দিন অচেনা নম্বর থেকে ছোট্ট একটি মেসেজ– রঞ্জু আমার। শুধুই আমার।

প্রেরকের নাম নেই যদিও, কিন্তু বুঝতে ভুল হলো না সে কে। মেয়েটি কেন আমাকে এই বার্তা পাঠাল? আমি কি রঞ্জুর দাম্পত্যে ইস্যু হয়ে উঠেছি? এ ঘটনার কয়েক মাস পরই রঞ্জু আন্তর্জাতিকে চলে গিয়েছিল। মেয়েটির ওই মেসেজটুকু না পেলে আমি হয়তো কোনো দিনই জানতাম না রঞ্জুর জীবনে আমি কোথাও আছি। এমনকি এখনো জানি না ওদের দুজনের মাঝখানে আমি ঠিক কীভাবে এসেছিলাম? এমনকি হতে পারে পিকনিকের দিন আমার কোনো আচরণ মেয়েটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল!

কেউ একজন লিখেছে, এভাবে শেষ করে দিলে নিজেকে? কেন রঞ্জু? মুক্তির পথ তো ছিল!

চমকে উঠলাম। রঞ্জু শেষ করে দিয়েছে নিজেকে? হার্ট অ্যাটাক নয়! এও কি সম্ভব! এমন প্রাণচঞ্চল, উদ্যমী একজন মানুষ! মন্তব্যগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। হার্ট অ্যাটাক নয় তাহলে কী? যে মৃত্যুযন্ত্রণা কয়েক ঘণ্টা ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি সে যন্ত্রণা মুহূর্তেই যেন শতগুণ বেড়ে গেল। এখন অনেক অনেক বেশি অসহনীয় লাগছে রঞ্জুর মৃত্যু। কারণ শুধু রঞ্জু নয়, আমি আরও একজনকে নিয়ে ভাবছি। ভাবছি দুজন মানুষের চেহারা, আচরণ, চাকরির অভিজ্ঞতা, বিয়ে এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও কি এমন মিলে যেতে পারে?

সেই ইন্টারভিউয়ের দিন প্রথম দেখাতেই চমকে উঠি। ইন্টারভিউ বোর্ড যখন রঞ্জুকে নানা প্রশ্ন করে ঝালিয়ে নিচ্ছে, আমি তখন চট দেখে নিই সিভিটা। স্থায়ী ঠিকানা চাঁদপুর। নাহ শিমুল নয়। শিমুলের বাড়ি পটিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চার বছরের সিনিয়র। সেবার আমরা অনার্সে ঢুকলাম শিমুলরা মাস্টার্সে। ঝড়-বাদলের এক রাতে শহর থেকে আমরা দুজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বাসস্টপে নেমেছিলাম। সে রাতে রাস্তার বাতিগুলো উধাও। হয়তো বিদ্যুতের তার কেটে গিয়েছে সন্ধ্যার ঝড়ে! আশপাশে কোনো রিকশা নেই। বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি অন্ধের মতো হাঁটছি। হাঁটছি না রীতিমতো দৌড়াচ্ছি! দশ মিনিট হাঁটলেই আমার হল। হঠাৎ কেউ একজন বলে উঠল, আজ রাতে মনে হয় না আর বিদ্যুৎ আসবে!

ভূত নাকি! আমি চমকে উঠে জানতে চাই, কে? কে?

শিমুল। মাস্টার্স। নৃবিজ্ঞান।

ওহ! খেয়াল করিনি আপনাকে।

আপনাকে বাসে দেখলাম তারপর একা একা নামতে দেখে ভাবলাম এগিয়ে যাই। এত অন্ধকার! ঝড়-বৃষ্টির রাত! আপনি কি প্রায়ই রাত করে ফেরেন?

নাহ। আমার বাবা আজকে ইন্ডিয়া গেলেন। আমি এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। আপনি?

আমার টিউশনি শেষ করতে দেরি হয়ে গেল।

শিমুল সেদিন আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হল পর্যন্ত এসেছিল। এরপর থেকে কোথাও দেখা হলেই জানতে চাইত কেমন আছি। ইতস্তত আমি একবাক্যে উত্তর দিয়ে সরে পড়তাম। সেই শিমুল এক দিন আবার আমার হলের সামনে। ওকে দেখে যেন পুরো জমে গেলাম! মুখে কোনো রা নেই। শিমুল জানতে চাইল, 'হাঁটবে আমার সঙ্গে?' কিছু না বলে আমি হাঁটতে শুরু করি। এরপর আমরা হেঁটেছি পুরো ক্যাম্পাস। রোদে, বৃষ্টিতে, কুয়াশায়, শীতে দুজনে মিলে উদযাপন করেছি প্রকৃতির সব আয়োজন। একসময় আর সব জুটির মতোই আমরাও চেয়েছি একটি পরিণতি।

শিমুলের ছিল বড় পরিবার, অনেক দায়িত্ব। বড় দুই বোন ও ছোট দুই ভাইয়ের যথাযথ ব্যবস্থা না করে বিয়ে করতে পারবে না– এমনটাই বলেছিল আমাকে। যেমনটা বলে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা। চেয়েছিল সংসার গুছিয়ে দেশের বাইরে পড়তে যাবে। পাস করার কিছুদিন পর ছোট একটা এনজিওতে চাকরিও পেল। আমি তো মহাখুশি। এই বুঝি স্বপ্ন এসে ধরা দিল জীবনে! প্রথম মাসের বেতন পাওয়ার পর শিমুল বাড়ি গেল পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। আর ফিরে আসেনি।

খবর পেয়েছিলাম বাড়ির লোকজন শিমুলের অমতে ওর বিয়ে ঠিক করেছিল স্কুল পড়ুয়া এক কাজিন বোনের সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে ওর বয়সের ব্যবধান প্রায় এক যুগ। শিমুল রাজি না হওয়ায় ওর মা বিষ খাওয়ার হুমকি দেয়। পরিবারের সঙ্গে না পেরে সেই বিষ ও নিজেই খেয়ে নিয়েছিল। সেই শিমুল ফিরে এসেছিল আমার কাছে রঞ্জু হয়ে। শুনেছি পৃথিবীতে দুজন মানুষের চেহারা অবিকল এক রকম হলেও হতে পারে। একজনের জীবনের দু-একটি ঘটনাও হয়তো অন্য আরেকজনের সঙ্গে মিলে যেতে পারে কিন্তু তাই বলে জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে এত মিল! এমনকি মৃত্যুও?

বুকের ভেতর হারানোর ব্যথা জমেছে। আমি কি তবে হারানোর ব্যথা বয়ে বেড়ানোর জন্যই জন্মেছি? প্রথমে শিমুল তারপর রঞ্জু– নাকি দুজনেই এক? যে চলে গিয়েছিল সে কে? যে ফিরে এসেছিল সে কে? আজ যে চলে গেছে সেই বা কে? শিমুল না রঞ্জু? শিমুলকে আমি ভালোবেসেছিলাম, পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রঞ্জুকে? আমি কি ব্যক্তি রঞ্জুকে ভালোবাসতাম? নাকি রঞ্জু আমার কাছে শুধুই ছিল শিমুলের ছায়া?

দিনরাত ২৪ ঘন্টা Sonali e-Wallet আপনার সেবায়

ডিজিটাল বাংলাদেশে স্মার্ট ব্যাংকিং

সোনালী ব্যাংক এ

টাকা উত্তোলন এখন ঝামেলাবিহীন

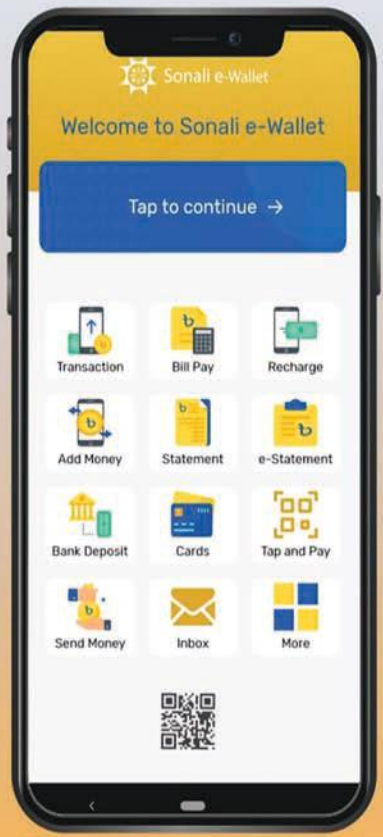

অ্যাপ ডাউনলোড করুন এখনই

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

চেকের বিকল্প হিসেবে
QR কোড দিয়ে
ব্যাংকের যে কোন শাখায়
নগদ টাকা উত্তোলন করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

App For ATM Card Based Payment Service

প্লে স্টোর/ অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড
করতে টাইপ করুন Qpay Bangladesh

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
RUPALI BANK LIMITED

Qpay

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

সুবিধা সমূহঃ

- ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT)
  অন্য ব্যাংকে তাৎক্ষনিক ফান্ড ট্রান্সফার।
- মোবাইল টপ-আপ
  যেকোনো মোবাইল অপারেটরে রিচার্জ যে কোন সময়।
- ওয়ালেট ট্রান্সফার
  মোবাইল ওয়ালেটে ফান্ড ট্রান্সফার।
- QR পেমেন্ট
  বাংলা QR কোড স্ক্যান করে মার্চেন্ট পেমেন্ট।
- ক্যাশ বাই কোড
  যে কোন Q-Cash নেটওয়ার্কের ATM থেকে কার্ডলেস টাকা উত্তোলন।
- বিল পেমেন্ট
  DESCO, DPDC, ওয়াসা, গ্যাস, আকাশ ডিটিএইচ ইত্যাদি ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সুবিধা ।
- ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট
  Q-Cash সদস্যভূক্ত ব্যাংকের জন্য তাৎক্ষনিক ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট।
- স্টেটমেন্ট
  ATM কার্ডের স্টেটমেন্ট দেখার সুবিধা।

RUPALI BANK LIMITED
Assures Better Service

লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ ০১ মার্চ ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের ৭টি বিভাগের ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- লেবুজাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৪০,০০০ মে.টন মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।
- মাল্টা ও অন্যান্য লেবুজাতীয় ফল উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের এলাকায় বাইরের ২৫% কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রকল্প এলাকার ২০টি সরকারী নার্সারীতে লেবুজাতীয় ফলের মাতৃবাগান স্থাপন ও চারা উৎপাদনের দক্ষতা প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা।
- প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের বিশেষ করে মহিলা কৃষকদেরসহ অন্যান্য কৃষকদের আয় ১০% বৃদ্ধি করা ও ৮-১০% বেকারত্ব দূর করা।
- সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট ও কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৫০০০টি পুরাতন বাগানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন ১৫২০% বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

- ✓ লেবুজাতীয় ফসলের (মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী
- ✓ পুরাতন লেবুজাতীয় ফল বাগান পরিচর্যা
- ✓ নার্সারী ব্যবস্থাপনা, চারা উৎপাদন ও উন্নয়ন
- ✓ অফিসার ও কৃষক প্রশিক্ষণ
- ✓ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও মাঠ দিবস
- ✓ জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মশালা

পাভেল পার্থ

মেনকীফান্দা আন্দোলন জঙ্গল ও জীবন রক্ষার লড়াই

রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকে বেশ কিছু অন্যায় আর অমিল শুরু হয়। যেমন জোরজবরদস্তি করে কোনো ঐতিহাসিক জনপদ ছিনিয়ে নিয়ে তাতে রাষ্ট্রের একতরফা মালিকানার সিলছাপ্পর মেরে দেওয়া। এসব জবরদস্তির আবার বেশ জানকাড়া নাম থাকে। খেলার মাঠ, বিনোদন পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য, বিমানবন্দর, সেনানিবাস, বাজার, বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প, কারখানা কত কী! সব মিলিয়ে অভিধানে রাষ্ট্রের এ জোরজবরদস্তির নাম লেখা হয় 'উন্নয়ন'। মাত্র দুশো বছরে উন্নয়নের মারদাঙ্গায় উন্মত্ত রাষ্ট্র কত কী না করেছে। কিন্তু বনের তলায় গাছ নাই আর জনগণের পাছায় তেনা নাই। সব উধাও। এ যেন এক আজব জাদু, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের লীলাখেলা। জনতার জান কি জবানে কোনো রক্ত কি উচ্চারণ থাকবে না। সব চেছে শুষে টেনে নেওয়া হবে। চাপিয়ে দেওয়া হবে একটার পর একটা দুঃসহ দুঃশাসন। কেবলমাত্র দুনিয়ার ইতিহাসটা জনতাই ধরে রাখে বলে, এখনো জাতিরাষ্ট্রই সত্য হিসেবে একমাত্র নয়। জনতা যুদ্ধ করে, টিকে থাকার সংগ্রাম। মাটির কোপে, ধানগুছিতে, দামা-খ্রামের বাজনায়, চু আসরের উন্মত্ততায়, বীজদানা জমা রাখবার মানতে এ লড়াই কাল থেকে আমাদের কালে টেনে নিয়ে যায়। এরই নাম সভ্যতা, এরই নাম পৃথিবীর ক্রমবিকাশ। বাংলাদেশের আদিবাসী জনতা ক্রমবিকাশের এ ব্যাকরণ বুকের জানবাজি রেখে ঠিক রাখে। কিন্তু রাষ্ট্র বারবার এর সীমানা ও চৌহদ্দি তছনছ করে দেয়। উল্টেপাল্টে ফেলে। জনতা রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে। জনতার ঐক্যবদ্ধ চোখরাঙানি আর যুক্তির রক্তপ্রবাহ দেখে রাষ্ট্র চুপসে যায়। রাষ্ট্র বাধ্য হয়, জনতার রায় মেনে নেয়। এভাবেই টিকে আছে এখনো আমাদের মাটি, অরণ্য, জলধারা কি সমাজ জীবন। আজ আমরা আগ্রাসী-বিদেশি প্রজাতির বিরুদ্ধে সংগঠিত দুনিয়ার প্রথম সংগঠিত লড়াইয়ের কাহিনি শুনব। মেনকীফান্দা আন্দোলন। একাশিয়া, ম্যাঞ্জিয়াম, ইউক্যালিপটাস, ইপিলইপিল, নেপিয়ার ঘাস, শিশু এসব গাছের জন্ম ও ধর্ম বাংলাদেশের ভূগোল ও সংস্কৃতি উপযোগী নয়। এসব বৃক্ষপ্রজাতিকে উদ্ভিদ-পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আগ্রাসী' প্রজাতি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এসব গাছ আমদানি করেছে। প্রাকৃতিক বন কেটে এসব ক্ষতিকর গাছ ছড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রকে চাপ দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক। পরবর্তী সময়ে দেশীয় লুটেরা রাজনীতিবিদ ও দখলদাররা আদিবাসী অঞ্চলে অরণ্যকে খুন করে এসব গাছ লাগানোর ব্যবসায় নিজেদের ব্যাটাগিরিকে টেনে এনেছে। রাষ্ট্রের আছে বন্দুক, বন বিভাগ আর বাঙালি ব্যাটাগিরি। কিন্তু এসব আগ্রাসী গাছের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দেশের আদিবাসী জনগণ, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে, সাহস আর যুক্তির মমতায়। রাষ্ট্রীয় আগ্রাসী বৃক্ষসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'মেনকীফান্দা আন্দোলন' আমাদের প্রাণ ও প্রকৃতির দর্শন ও পরিবেশ-সংগ্রামের দিকনির্দেশনা। ১৯৯২-১৯৯৩ এর দিকে যখন এ আন্দোলন জোরদার হয়, রাষ্ট্র তখন এ আন্দোলনের দর্শন ও ভাষ্য বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি বা রাষ্ট্রের সে যোগ্যতা তখনো তৈরি হয়নি। রাষ্ট্র তখন মরিয়া হয়ে এ আন্দোলন দমাতে চেয়েছে। পারেনি। দেশব্যাপী নিম্নবর্গের জনতা মনেপ্রাণে এই আগ্রাসী গাছের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বিস্ময়করভাবে রাষ্ট্র ২০১০ সালে তা মানতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্র প্রথম 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২' এর মাধ্যমে আগ্রাসী প্রজাতি নিষিদ্ধ করেছে। ২০১০ সালে আইনটির খসড়া তৈরি হয়েছিল। সফল হয়েছে মেনকীফান্দা আন্দোলনের আওয়াজ ও ইশারা। কিন্তু এটি তখনই সফলতার দিকে এগুবে যখন আমরা সবাই

মিলে বাংলাদেশকে পুরোপুরি আগ্রাসী প্রজাতিমুক্ত করতে পারব। আর এটি সম্ভব। মেনকীফান্দা আন্দোলনই বারবার বলে দেয় এই সম্ভাবনার সূত্র ও সাহসী নির্দেশনা।

দ্রোহের মেনকীফান্দা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরের সীমান্তসংলগ্ন টিলাভূমির এক শালবনকেন্দ্রিক মান্দি-হাজং অঞ্চল মেনকীফান্দা। উচ্চতায় তেমন একটা বড় নয়, কিন্তু বিস্তৃতিতে মেনকীফান্দা বেশ বৈশিষ্ট্যময়। মেনকীফান্দার পাহাড়ে শালবনের ভেতর নিজস্ব ঐতিহ্যগত ভূমিতে নিজেদের জীবন গড়েছিলেন মান্দিরা, গারো নামে যারা দাপুটে ব্যবস্থায় পরিচিত। বহিরাগত বাঙালি দাপট, দাপুটে আইন ও ব্যবস্থা, বন বিভাগের নিরন্তর হামলা ও নিপীড়নের ফলে সেই জঙ্গল আর নেই, নেই জঙ্গলে মানুষের আপন অধিকার। বিনাশ হয়েছে জঙ্গল, উচ্ছেদ হয়েছে মান্দি বসত। স্থানীয় মানুষেরা বন বিভাগের সর্বনাশা জঙ্গল বিনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন রুখে। বন বিভাগের বিনাশী খপ্পর থেকে পরিবেশ, প্রতিবেশ আর আপন প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার এই মেনকীফান্দার লড়াইয়ের কথা আমাদের চলতি ইতিহাসে প্রান্তিক ও আড়াল। পরিবেশযোদ্ধা অজিত রিছিলরা কখনোই আমাদের বীর হয়ে ওঠেন না। মেনকীফান্দা পরিবেশ আন্দোলন আমাদের এই পরিবেশ বিপন্ন সময়ে আপন প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষার লড়াইয়ের ইশারা ও ইমান মজবুত করবে।

একজন অজিত রিছিল

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বাঙালি জমিদারদের সঙ্গে স্থানীয় মান্দিদের মেনকীফান্দা পাহাড় নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়। প্রায় ১০ বছর এই মামলা চলে। জমিদারের পক্ষে জমিদারের গোমস্তারা এই মোকদ্দমা চালান। ১৯৫৮ সালে এই মামলা শেষ হয়। জমিদারের বিপক্ষে থাকায় অনেক মান্দিকে তখন নানান ভাবে নিপীড়ন করা হয়। মান্দিদের পক্ষে মামলা চালানোর জন্য সুরেশ সাংমাকে খুন করে জমিদার বাহিনী। জমিদার বাহিনীর হাতে মারাত্মক আহত হন এরণ মাস্টার। এরপর জমিদার বাহিনীর অবিরত নিপীড়ন থেকে বাঁচতে গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে মান্দি-হাজংরা উচ্ছেদ হয়ে যান, নিখোঁজ হয়ে যান। বলা হয়ে থাকে যে, মান্দিরা ভারতে চলে গেছেন।

মেনকীফান্দার মোট ১৩৩ একর জায়গা ছিল মান্দিদের। মেনকীফান্দার ১০-১২টি টিলায় মান্দিরা থাকতেন। মান্দিদের যেহেতু আখিং প্রথা ছিল, অর্থাৎ, জমি সব সামাজিক জমি আর যেহেতু দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে মান্দিদের কোনো পরিচয় ছিল না, তাই, ভূমি মালিক বা ভোগদখলকারীর নামেও মান্দিরা সেরকমভাবে জায়গা জমি রেকর্ড করেননি। এরপর আসে মহামান্য বন বিভাগ। বন বিভাগের জন্য এ জায়গা জমির ৫/৭টি টিলাভূমি ছেড়ে মান্দিরা নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য হন। এরপর আবার ৩০টি মান্দি পরিবারের নামে মামলা হয়। পাকিস্তান আমল থেকেই বন বিভাগ প্রাকৃতিক জঙ্গল কাটার উদ্যোগ নেয়।

১৯৬০-১৯৬১ সালেও বন বিভাগ অনেক চেষ্টা করেছিল প্রাকৃতিক শালবন কেটে আগ্রাসী অচিন গাছ লাগাতে, কিন্তু মান্দিদের আন্দোলনের জন্য তা পারেনি। এ নিয়েও বন বিভাগ মান্দিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। প্রাকৃতিক জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করার বন বিভাগীয় এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য যেমন প্রাণবৈচিত্র্য বিনাশ একই সঙ্গে তা স্থানীয় আদিবাসীদেরও উচ্ছেদ করা।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২-১৯৭৩ সালের দিকে বন বিভাগের মেনকীফান্দা বিটের তৎকালীন বনরক্ষী মো. দেওয়ান ও মো. আবদুস সাত্তারের সহযোগিতায় মেনকীফান্দার পাহাড় থেকে প্রচুর শালগাছ কাটা হয়। মূলত পার্শ্ববর্তী এলাকার বহিরাগত বাঙালিদের ইটভাটাতে পোড়ানোর জন্য এইসব জঙ্গল উজাড় করা শুরু হয়। মেনকীফান্দা গ্রামের অজিত রিছিল প্রথম সংগঠিত ভাবে এর প্রতিবাদ করেন। একদিন অজিত রিছিল ১৪টি কাটা শালগাছ ভর্তি গাড়িকে আটকান। কিন্তু তৎকালীন ইটভাটার মালিক জালাল এমপি ও মো. চুন্নুদের ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে সমানে শালবন চলে যায় ইটের ভাটায়। থানা ও বন বিভাগের সঙ্গে হাত করে চলতে থাকে মেনকীফান্দা শালবন উজাড় ও মান্দি গ্রাম উচ্ছেদ। অজিত রিছিল স্থানীয় মান্দিদের নিয়ে প্রতিরোধের দল গঠন করতে থাকেন।

অগ্নিগর্ভ সীমান্ত শালবন

মেনকীফান্দা অগ্নিগর্ভ অঞ্চল। হাতীখেদা আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, চিকন চাল আন্দোলন, টংক বিদ্রোহ, নানকার আন্দোলনসহ মেহনতি মজদুর জনতার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি নেত্রকোনার এ সীমান্ত অঞ্চল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে ন্যায়ের জন্য লড়াই করা এখানকার মাটি ও জলের সংস্কৃতি। ১৯৮১-১৯৮২ সালে তথাকথিত উপনিবেশিক বন আইন (১৯২৭) এর মাধ্যমে মান্দিদের ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষিত ভূমি বন বিভাগের আওতায় আনা হয়। এমনকি মেনকীফান্দা গ্রামটিও (মেনকীফান্দা মৌজা, জেল নং-১১৯) মান্দিদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সম্মতি কি আলাপ ছাড়াই নিজেদের মালিকানা আয়ত্তে নিয়ে নিল বন বিভাগ। দলিল দস্তাবেজের কারসাজি। এ সময় সবচেয়ে বেশি শালবন উজাড় হলো। গাছ-গাছড়া যা ছিল সব শেষ, বর্ষাকালে কেবলমাত্র নিচে কিছু ঝোপজঙ্গল জন্মাত। এ সময় মহামান্য বন বিভাগ মেনকীফান্দার মান্দিদের ধারে এক ভয়াবহ উচ্ছেদ নোটিস পাঠায়। নোটিসে বন বিভাগ থেকে বলা হয়, **বেআইনিভাবে বাংলাদেশের বনভূমি আপনারা ভোগদখল করছেন, তাই কেন আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে না কারণ দর্শান।** অজিত রিছিল স্থানীয় মান্দিদের নিয়ে এর প্রতিবাদ করেন। অজিত রিছিল ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর প্রতিবাদপত্র পাঠান, বন বিভাগ থেকে সেই একই কথা বলা হয় যে, এসব জায়গা বন বিভাগের নামে রেকর্ড। বন বিভাগ মান্দি বসতি উঠিয়ে শালবনের সব গাছ তুলে ফেলে জায়গাটি সাফ করে। এমনকি শালের কপিস পর্যন্ত তুলে ফেলে। বন বিভাগ শালবন সাফ করে প্রথম মেনকীফান্দা পাহাড়ে আগ্রাসী গাছের চারা লাগাতে যায়। বন বিভাগ আগ্রাসী প্রজাতির বিদেশি গাছ একাশিয়া, ম্যাঞ্জিয়াম লাগাতে গেলে মান্দিরা বাধা দেন। এ সময় বন বিভাগ আন্দোলনকারী মান্দিদের ওপর নানান নিপীড়ন চালাতে থাকে, অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়।

১৯৯৩ সালের ৪ এপ্রিল ময়মনসিংহ বন বিভাগের বাতেনশাহী বন বিট ৪০০-৪৫০ বাঙালিকে বাইরে থেকে মিথ্যে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ভাড়া করে ও জোড় করে আনে। বন বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের দিয়ে সব মান্দিকে জানে শেষ করা। আর মান্দি গ্রাম উচ্ছেদ হলেই বন বিভাগ বিদেশি আগ্রাসী একাশিয়া, ম্যাঞ্জিয়াম গাছগুলো লাগাতে পারবে শালবনের জায়গায়। লাঠিসোঁটা অস্ত্রশস্ত্র সমেত চার পাঁচশ বাঙালি জমায়েত নিয়ে বন বিভাগ একা এলেও কথা ছিল, বন বিভাগের সঙ্গে ছিল বিডিআরের ব্যাটা সেনাদের দল। সকাল থেকেই অস্ত্রশস্ত্র আর দলবলসহ বন বিভাগ চলে আসে মেনকীফান্দা পাহাড়ের পাদদেশে। বিডিআরের সেনারা সমানে ধমকাতে থাকে আর অশ্লীল ভাষায় মান্দিদের ওই মুহূর্তেই মেনকীফান্দা ছেড়ে চলে যেতে বলে। মান্দিরা যদি না যায় তবে সব মান্দিকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। অজিত রিছিলরাও দমে যান না। পরিবেশ, প্রতিবেশ আর আপন প্রাণবৈচিত্র্য ও জীবন রক্ষার এ লড়াইয়ে জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে চান এ মাটি, এ জঙ্গল। কোনো আগ্রাসী, বিদেশি গাছে তো আর মায়ের শরীর ভরে দেওয়া যায় না। তাই অজিত রিছিল গ্রামের ২৮ জন মান্দি নারী-পুরুষ নিয়ে বন বিভাগ, বিডিআর আর বহিরাগত বাঙালিদের সশস্ত্র মহড়া ও হুমকির সামনে দাঁড়ান। নিচে অস্ত্রশস্ত্র আর বিশাল লটবহর নিয়ে রাষ্ট্র আর মেনকীফান্দা পাহাড়ের ওপরে নিজস্ব

কিছু স্ফী-মিলআম, তীর-ধনুক আর আপন বৈচিত্র্য রক্ষার শপথ নিয়ে মাত্র ২৮ জন মান্দি নারী-পুরুষ। অজিত রিছিল বিপক্ষ দলকে বারবার আহ্বান জানান মেনকীফান্দা দখল করতে আসার। আগত বাঙালিদের কারোই সাহস ও ইচ্ছেও হয় না শুধু শুধু যুদ্ধ ও দাঙ্গা বাধাবার। বহিরাগত বাঙালিদের প্রায় সবাই বুঝতে পারেন বন বিভাগ তাদের কেবল ব্যবহারের জন্য ও মান্দি খুনের জন্যই এনেছে। এ ঘটনায় বন বিভাগের ভাড়া করে আনা দরিদ্র বাঙালিরা পিছু হটে আসে। বন বিভাগ ও বিডিআরও ক্ষান্ত হয়। অজিত রিছিলরা প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুর্গাপুর উপজেলা চত্বরে আসেন। উপজেলা চত্বরে গণজমায়েত থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, **আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের ফিরিয়ে দিতে হবে, শালবনের জায়গায় কোনো বিদেশি, আগ্রাসী গাছ লাগানো যাবে না, প্রাকৃতিক জঙ্গলের বিনাশকারী বন বিভাগসহ জড়িত সবার দৃষ্টান্ত মূলক বিচার করতে হবে, প্রাকৃতিক জঙ্গলে আদিবাসীদের নিজস্ব অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।**

গণজমায়েত শেষে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসের কার্যালয় ঘেরাও করেন এবং বাঙালি-বিডিআর-বন বিভাগ কর্তৃক হুমকি ও উচ্ছেদের মহড়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি পেশ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে। এ ঘটনার পর পরই অনেক বলেকয়ে তৎকালীন ময়মনসিংহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রোস্তম আলী আসেন। রোস্তম আলী মেনকীফান্দা সরেজমিনে দেখতে যান, বন বিভাগ যে মান্দিদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে তিনি তা দেখতে পান। এরপর একটি শান্তি আলোচনায় বসতে অজিত রিছিলরা সরকারকে বাধ্য করান। শান্তি আলোচনায় বন বিভাগের তৎকালীন বনপ্রধান অজিতদের উসকানমূলক কথা বলেন, যা, মূলত বন বিভাগের স্বভাব। সিসিএফ চেয়ার টেবিল আনতে বললে, অজিতরা বলেন, **আমরা জঙ্গলের সন্তান এই মাটিই আমাদের চেয়ার টেবিল। আমাদের আর কোনো চেয়ার টেবিল নাই।** সিসিএফ যখন অজিতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেন তখন অজিতরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, **শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আমাদের কোনো যুক্ততা নাই, আমরা জঙ্গলকে গাছকে ভালোবাসি, জঙ্গলকে বাঁচাতেই আমাদের এই মরণপণ লড়াই, আর মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকিয়ে দেওয়া হয় তখনই সে লড়াকু হয়ে ওঠে, বন বিভাগকে তা ভাবতে ও জানতে হবে।**

কিন্তু সিসিএফরা মান্দিদের কোনো কথাকেই গুরুত্ব না দিয়ে সমানে তাদের নিজস্ব মতামত অজিতদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে অজিতরা সেই আলোচনা থেকে উঠে আসেন। শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর আরও বন বিভাগীয় নিপীড়ন নেমে আসে মেনকীফান্দা গ্রামের আদিবাসীদের জীবনে। এর পর পরই বন বিভাগ আগ্রাসী একাশিয়া আর ম্যাঞ্জিয়ামের উদ্ভট বনায়ন(!) শুরু করে মেনকীফান্দার শালবনকে উজাড় করে। অজিত রিছিলদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলতেই থাকে।

জেল-জুলুম ও রক্তের দাগ

১৯৯৩ সালের ২২ আগস্ট সন্ধ্যায় দুর্গাপুর থানার তৎকালীন ওসি মো. বিল্লাল ও ইব্রাহীম দারোগা বলা নেই কওয়া নেই তিন জন নারী ও একজন মান্দি পুরুষসহ অজিত রিছিলকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর থানায় নিয়ে যায়। সেখানে চলে নানান নিপীড়ন। বিদেশি গাছ লাগানোতে আর বাধা দেওয়া হবে না এবং আর কোনো আন্দোলন করা হবে না এই মর্মে জোরপূর্বক মারধর করে অজিত রিছিলের কাছ থেকে কাগজে টিপসহি নেওয়া হয়।

১৯৯৩ সালের ২৪ আগস্ট তৎকালীন ভূমি সচিবসহ নাগরিক নেতা ও বিশিষ্টদের নিয়ে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়, যার আগামাথা কিছুই অজিতরা জানতে পান না। এই ঘটনার পর পরই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বেশ কিছু বাম রাজনৈতিক দল অজিত রিছিলদের পক্ষে কথা বলেন। উবিনীগ, নিজেরা করি, এলআরডি-সহ বেশ কিছু বেসরকারি সংগঠন, ক্যাথলিক মিশনারি ও মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়টিকে তাদের কয়েকটি সেমিনারে উপস্থাপন করেন। উবিনীগ, এলআরডি, নিজেরা করি আয়োজিত ভূমি অধিকার বিষয়ক একটি সেমিনারে অজিত রিছিলকেও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কেউই আর এ বিষয়টিকে নিয়ে খুব বেশিদূর আগাতে চাননি। জেল ও মামলা মোকদ্দমা থেকে রেহাই পেতে অজিত রিছিলদের বেশ সময় ও ঝক্কি পোহাতে হয়।

এর ভেতরই বন বিভাগ মেনকীফান্দার পাহাড়ের পর পাহাড় শালবন কেটে আগ্রাসী বিদেশি একাশিয়া ম্যাঞ্জিয়ামের ব্যবসায়িক বাগান গড়ে তোলে। মেনকীফান্দা পাহাড়ের ফারংপাড়া, গোপালপুর, মেনকীফান্দা, বারোমারী, ভরতপুর, পূর্ব কামারখালী, লক্ষ্মীপুর গ্রামের মান্দিরা এখনো আপন জঙ্গলের স্বপ্ন দেখেন। এখনো প্রতিরোধ করতে চান বন বিভাগীয় দাপটকে। মেনকীফান্দা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অজিত রিছিল ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত শিক্ষক এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একজন নির্ভীক সদস্য। আন্দোলনের পর বন বিভাগ তাদের সব দাবি মেনে না নিলেও পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ২০০০ সালের পরের দিকে বন বিভাগ নিজস্ব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে কেবলমাত্র আর আগ্রাসী প্রজাতির চারাকে গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন দেশীয় বনজ ও ফলদ গাছকেও প্রাধান্য দিয়েছে। যা আগে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। জীবনের শেষ বয়সে দুরারোগ্য রোগে ভুগে পৃথিবীর প্রথম আগ্রাসী প্রজাতির বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক অজিত রিছিল মেনকীফান্দা ছেড়ে চেকমাং পাহাড়ে চলে যান। অজিত রিছিল সারা জীবন নিশ্চিহ্ন মান্দি এলাকায় সত্যিকারের মাস্টার হিসেবেই প্রতিদিন আপন জঙ্গল ও জীবনকে খুঁজে ফিরেছেন, ছাড়েননি বিপন্ন মেনকীফান্দার পাহাড়কে, বিপন্ন আবিমাকে।

রাষ্ট্রীয় আইনে আগ্রাসী প্রজাতি!

মেনকীফান্দা আন্দোলনকে পাত্তা না দিলেও রাষ্ট্র দীর্ঘসময় পর আগ্রাসী গাছ নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ দেশের প্রথম আইন যেখানে আগ্রাসী প্রজাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনের ২ নম্বর ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আগ্রাসী (Invasive) প্রজাতি অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ইকোসিস্টেমের বহির্ভূত প্রজাতি যাহাকে তাহার ইকোসিস্টেমের বাহিরে অন্য কোনো ইকোসিস্টেমে স্থানান্তর করিলে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়। আগ্রাসী প্রজাতি উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য অর্গানিজম (যেমন মাইক্রোবস্) হইতে পারে।" আমরা জানি প্রতিটি শব্দই রাজনৈতিক ও সামাজিক। বন্যপ্রাণী আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র যখন 'আগ্রাসী প্রজাতি' শব্দটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেছে তখন আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হলাম আমাদের বাস্তুসংস্থানে বহিরাগত প্রজাতি মারফত অনেক আগ্রাসন ঘটেছে। রাষ্ট্র তার প্রতিবেশীয় রাজনৈতিক অবস্থান এই 'আগ্রাসী' শব্দ ধারণার ভেতর দিয়ে প্রথম প্রকাশ করে। বন্যপ্রাণী আইনে এই 'আগ্রাসী' শব্দ প্রত্যয়কে গ্রহণ করা আইনটির এক শক্তিশালী দিক। তবে বাংলাদেশের জন্য কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহকে রাষ্ট্র আগ্রাসী মনে করছে তার একটি তালিকা অবশ্যই আইনটির তফসিল হিসেবে থাকা দরকার। যেসব আগ্রাসী প্রজাতি বাংলাদেশে বহাল আছে তাদের অধিকাংশেরই অনুমোদন ও আমদানি রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ঘটেছে। রাষ্ট্রের অবিবেচক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অরণ্য আর প্রতিবেশধারায় যে সর্বনাশ ঘটেছে আগ্রাসী প্রজাতির মাধ্যমে এর সুস্পষ্ট তদন্ত ও ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হওয়া জরুরি। মেনকীফান্দা আন্দোলনের সময় বন বিভাগ স্থানীয় আদিবাসী জনগণের সঙ্গে যে চরম অন্যায় করেছে তার তদন্ত ও সুবিচার নিশ্চিত হওয়াও জরুরি। মেনকীফান্দা আন্দোলনের যে দাবিসমূহ আজও পূরণ হয়নি তা পূরণে রাষ্ট্রকে সোচ্চার ও সাহসী হওয়া জরুরি। মেনকীফান্দার পাহাড়ে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই রচিত হোক অরণ্যের মুক্তি ও মমতার বিজ্ঞান।

মাইলস্টোন কলেজ

EIIN:108572

৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১ এবং ডিয়াবাড়ি (মেট্রোরেল স্টেশন-১ সংলগ্ন), তুরাগ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। www.milestonecollege.com, www.milestonecollege.edu.bd, www.facebook.com/MilestoneCollegeUttara

- **শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** ২০০৮ সালে ঢাকা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন দ্য নিউ ইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্সেস'র সদস্য স্কুল হিসেবে স্বীকৃত।
- **এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফলাফল** (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সন):

এইচএসসি	২০২২ সালে পরীক্ষা দেয় ৩২২২ জন, পাস করে ৩২২১ জন। পাসের হার ৯৯.৯৭%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ২৭৩৪ জন, জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৮৪.৮৮%। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১০ম ও ৭ম স্থান অর্জন করে।
এসএসসি	২০২২ সালে ১৬৭৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, পাসের হার ৯৯.৮২%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ১২৫০ জন পরীক্ষার্থী। এসএসসিতে ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে। তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে এসএসসিতে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাইলস্টোন কলেজের অবস্থান **প্রথম**।
জেএসসি	২০১৯ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। ২০১৭ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৮৪৮ জন। জেএসসিতে ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১৩তম, ৭ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৬%। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৪র্থ স্থান এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে ৩য় স্থান অর্জন করে।

- দেশসেরা কলেজগুলোর অন্যতম একটি মাইলস্টোন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা কর্নেল নুরন্ নবী (অব.)। ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল নুরন্ নবী; যিনি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বপ্নকারিগর নুরন্ নবী স্যার বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন মাইলস্টোন কলেজের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে। মূলত: এই প্রাজ্ঞজনের সঠিক দিক নির্দেশনা আর সার্বিক পরামর্শে মাইলস্টোন কলেজ এগিয়ে থাকছে সেরাদের সেরা হওয়ার পথে।

- **বিশেষ সুবিধা:** মফস্বল এলাকার ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনের ক্লাস পৃথক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
- **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** মাইলস্টোন কলেজের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ৪৫০ জন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষক-কর্মকর্তা [ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ২ জন অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ, সরকারি কলেজের প্রাক্তন ২ জন অধ্যক্ষ, ২ জন কর্নেল (অব.), ৩ জন লে. কর্নেল (অব.), ৫ জন মেজর (অব.), ৯ জন সহযোগি অধ্যাপক, ৯১ জন সহকারি অধ্যাপক এবং ৩৩৫ জন প্রভাষক ও সিনিয়র শিক্ষক] শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উত্তরাস্থ মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও উত্তরা ৩য় প্রকল্পে ডিয়াবাড়িতে (**মেট্রোরেল স্টেশন-১ সংলগ্ন**) ২৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস। খেলাধুলার জন্য বিশাল মাঠ, মানসম্মত শিক্ষার জন্য অবকাঠামোগত সকল প্রকার সুবিধাদি এবং সার্বিক নিরাপত্তাসহ সবুজ শ্যামল মনোরম পরিবেশে অবিস্থত সুবিশাল ক্যাম্পাসটিতে ১৮০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

– মোহাম্মদ জিয়াউল আলম, অধ্যক্ষ

মযহারুল ইসলাম বাবলা

পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক

আমাদের দেশে পাকিস্তানি আমলে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং কার্যক্রম রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীন দেশেও কার্যক্রমটি সক্রিয় ছিল। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সেটা মোটামুটি বলবৎ থাকলেও পরবর্তীতে ওই কার্যক্রম ক্রমেই স্থবির হয়ে যায়। ভারতে কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের সক্রিয় ও ব্যাপক কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাবে সেখানকার সকল শ্রেণির মানুষের সচেতনতার প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। তাদের মধ্যে সেই সচেতনতার সুফল ঘরে ঘরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৌঁছে গেছে। সে কারণে প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলায় প্রতিটি পরিবারে একটি বড়জোর দুটির অধিক সন্তান কারো নেই। কলকাতাসহ কলকাতার শহরতলি এবং জেলাগুলোতে প্রতিটি পরিবারেই এটি দৃশ্যমান। ভারতের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, শিক্ষাবঞ্চিত অবাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তেমন প্রভাব ফেলেনি। ধর্মের অজুহাতে তারা বরাবরই ওই বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং আছেও।

আমাদের এখানে তো যৌথ পরিবার ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও টিকে আছে। পশ্চিম বাংলায় যৌথ পরিবার বহুপূর্বেই ভেঙে গেছে। সেখানে পরিবারমাত্রই ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা। এর বাইরে ভাই-বোনেরা তো পরের কথা বাবা-মায়েরা পর্যন্ত পরিবারভুক্ত নয়। তারা সন্তানদের সঙ্গে একত্রে থাকার অধিকার হারিয়েছে। বয়োবৃদ্ধ বাবা-মায়েরা শত প্রতিকূলতায় পৃথক বসবাস করছেন। বিয়ের পর সন্তানরা পিতা-মাতার দায়দায়িত্ব উপেক্ষার পাশাপাশি একত্রেও বসবাস করে না। স্ত্রীর তাগিদে বা চাপে বাধ্য হয় পৃথক হতে। ব্যতিক্রম থাকলেও সেটা অতিনগণ্য। আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব সেখানে এতটাই সক্রিয় যে, সে সমস্ত ঘটনা দেখে-শুনে আমাদের হতবাক হতে হয়। আমাদের এখানেও তার প্রভাব ক্রমান্বয়ে পড়ছে বটে, তবে অত ব্যাপক আকারে এখনো বিস্তার লাভ করেনি। আমাদের এখানে বিত্তবান শ্রেণির সন্তানরা বিদেশে থাকায় তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের শেষ আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম হয়ে পড়েছে। বিত্তহীনদের তো দুরবস্থার অন্ত নেই। গত বছর বেশ ক'বার কলকাতায় যাওয়া হয়েছিল। কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায়ও গিয়েছিলাম। সর্বত্রই একই দৃশ্য। বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা সন্তানহীন দুর্বিষহ একাকিত্বে প্রবল প্রতিকূলতায় জীবন সায়াহ্নের সময়গুলো পার করছেন।

এবারে আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মুক্তিযোদ্ধা মো. জয়নাল আবেদীন ভাই। বিক্রমপুরের ক'জন পশ্চিমবঙ্গবাসী পরিচিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। তারা সবাই জয়নাল ভাইয়ের থেকে বয়সে আট-দশ বছরের বড়। প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে দেখি প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় থাকা স্বামী-স্ত্রীতে বসবাস করছে। দুজনে মিলেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরকন্না করছেন। অসুস্থ স্ত্রী কিংবা স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার পাশাপাশি ঘরকন্নার কাজেও ব্যস্ত দেখেছি। তাদের সবারই এক বা দুই সন্তানের অধিক সন্তানাদি নেই। প্রায় সবারই এক ছেলে কিংবা এক ছেলে-এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলের বিয়ের আগ পর্যন্ত একমাত্র ছেলেকে নিয়েই ছিল তাদের সংসার। ছেলে যেমন সংসার চালানোর দায়িত্ব পালন করত পাশাপাশি সংসারের সামগ্রিক কাজও তদারকি করত। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে ছেলের জন্য পিতা-মাতারা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উপযোগী ঘর নির্মাণ করেছেন। যাতে যুগোপযোগী আধুনিক আবাসে বৌমার কষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাবা-মা-ই নিজেদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ এবং রাষ্ট্রীয় ঋণদান সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ছেলের আবাসন পরিপাটি করে দিয়েছেন। কিন্তু বিধিবাম। ছেলের বিয়ের ছয় মাস-এক বছরের মাথায় বৌমার প্ররোচনায়, জেদ ও কৌশলে ছেলেকে নিয়ে দূরের ভাড়া বাসায় কিংবা ক্রয়কৃত ফ্ল্যাটে বাবা-মাকে একলা ফেলে চলে যাবার অজস্র ঘটনা নিত্য ঘটছে। সন্তানদের পিতা-মাতা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সেখানে অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে রেশন তোলা, বাজার করা, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাসের সিলিন্ডার আনা, সেবা খাতের বিল পরিশোধসহ সামগ্রিক কর্মযজ্ঞ অসহায় বৃদ্ধ পিতাকেই করতে হয়। পিতা অসুস্থ থাকলে মাকেই বাধ্য হয়ে সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। তাদের সেই কষ্টকর অমানবিক জীবনযাপন দেখার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে কলকাতায়।

নদীয়ার ফুলিয়াতে গিয়েও দেখেছি আমাদের কথাসাহিত্যিক হরিপদ দত্তের পরিবারের ক্ষেত্রেও অভিন্ন দশা। রোগেভুগে বার্ধক্যে হরিপদ দাদা নিরুপায়ে দেশ ছেড়ে পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন বেশ ক'বছর পূর্বে। তার পরিবার ওখানে থাকলেও তিনি ভিসা নিয়ে বছরে দু'তিনবার পরিবারকে দেখতে যেতেন। শেষে নিরুপায়ে স্থায়ীভাবে চলে যান। বাংলাদেশে সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক হরিপদ দত্ত এখন গ্রাম-মফস্বলসদৃশ ফুলিয়ায় সামাজিক জীবন বিচ্ছিন্ন একজন অতি-সাধারণ মানুষমাত্র।

গভীর দুঃখে হরিপদ দাদার স্ত্রী আমাকে বলেছেন, 'ছেলেকে জন্ম দিলাম, পরম স্নেহে মানুষ করে তুললাম। আপনার দাদা তো ঢাকায়। আমি একা সন্তান দুটিকে সমাজে যোগ্যরূপে গড়ে তোলার পর যখন বৌমা বলেন, আমরা নাকি আমাদের কর্তব্য করেছি, যেটা সব বাবা-মাই করে থাকেন। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী একান্তই স্ত্রীর, অন্য কারো নয়। স্বামীর প্রতি সকল অধিকার একমাত্র স্ত্রীরই। আরো বলেছে অকারণে মায়াকান্না করে আমার স্বামীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না।' ছেলে চলে যাবার পর থেকে বৌদি প্রচণ্ডরকম ভেঙে পড়েছেন। তবে হরিপদ দাদা বাস্তবিক গুণসমৃদ্ধ মানুষ, তিনি বাস্তবতাকে মেনে স্ত্রীর পাশে থেকে দু'জনের সংসারের যাবতীয় কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন।

জয়নাল ভাইয়ের অগ্রজপ্রতিম বিক্রমপুরের ফটিক দে'র নিউ আলীপুরের বাসায় গিয়েছিলাম। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে মওলানা ভাসানীর সংগঠনে সক্রিয়ভাবে যুক্ততার কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হবার পর পালিয়ে কলকাতায় চলে যান, তুখোড় ফুটবলার ফটিক দে। দেশে না ফিরে ওখানেই স্থায়ী হয়ে গেছেন। সরকারি চাকরি করতেন। এখন অবসরে। নিউ আলীপুরে পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাট কিনে একত্রে একটি বড় ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করছেন। তার বাসা চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাকে ফোন করলে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে বলে প্রায় ছুটে এসে আমাদের দোতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে ওঠেন। ঘরে ঢোকামাত্র গৃহকর্মী বলে ওঠে, 'জল নেই, জল ছেড়ে আসো।' ফটিক দে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে গেলেন জল ওঠানোর মেশিন ছাড়তে। অল্প পরেই ফিরে এলেন। ওই গৃহকর্মীর ওপর অধিক নির্ভরশীলতার সুযোগেই গৃহকর্মীটি আদেশের সুরে তাকে জল তোলার নির্দেশ দিতে পেরেছিল। তার স্ত্রী অসুস্থ। এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে স্বামীর সংসারে আর ছেলে বিয়ের পর পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক স্থানে বসবাস করছে। ছেলে এবং বৌমাকে নিয়ে একত্রে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, সে আশায় দুটি ফ্ল্যাটকে একত্র করে বড় একটি ফ্ল্যাট করেছিলেন। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে, ডাক্তারের কাছে তাকেই ছুটতে হয়। সংসারের সমস্ত কাজ নিজেই করেন। এমনকি রান্নার কাজও। গৃহকর্মীটি কেবল ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, থালা-বাসন পরিষ্কারের কাজ করে। বাকি সমস্ত কাজ তাকেই এই বৃদ্ধ বয়সে করতে হয়। ছেলের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। ছেলের প্রশংসা করলেও, বিয়ের পর ছেলের ওপর আর তাদের অধিকার থাকেনি। বৌমার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে ছেলের কিছুই করার জো'টি নেই। তাই আক্ষেপে ফটিক দাদা বলেছেন, "আমাদের পশ্চিম বাংলার সিংহভাগ ছেলেই 'পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক'।"

ছেলে-বৌমা এবং শাশুড়িকে নিয়ে একত্রে বসবাসের পরিবারেও গিয়েছিলাম। বাড়িতে কাজের লোকের সমস্ত দায়িত্ব বৃদ্ধা শাশুড়িকেই পালন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ঘরকন্নার সমস্ত কাজ। বৌমার উপস্থিতিতে স্তুতির গীত গাওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না। নয়তো বৌমার আশ্রয়টি তাকে হারাতে হবে, এই আশঙ্কায়। কলকাতার হাল আমলের অনেক চলচ্চিত্রে, টিভি সিরিয়ালে বৌমাদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হওয়া শ্বশুর-শাশুড়িদের বিষয়গুলো দেখানো হয়; সেটা যে কেবল করুণ রসের বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে দেখানো হয়, তা নয়। ওই সকল ঘটনা পশ্চিম বাংলার পারিবারিক পরিমণ্ডলেরই বাস্তবতার খণ্ডচিত্র। কেব্‌ল টিভির কল্যাণে আমরা কলকাতার ক'টি বাংলা ভাষার টিভি চ্যানেল দেখে থাকি। জি-বাংলা নামক চ্যানেলের 'দিদি নাম্বার ওয়ান' নারীদের কুইজ অনুষ্ঠানেও অনেক নারী তাদের পারিবারিক জীবন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চোখের জল ফেলেন। সম্প্রতি প্রচারিত ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া ষাট বছর বয়সী এক নারী তার অভিজ্ঞতায় বলেছেন, তাদের একমাত্র ছেলেসন্তান বিয়ের বছরখানেক পরে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তাও প্রায় এগারো বছর পূর্বে। এই এগারো বছরে ছেলে একটিবারও প্রৌঢ় বাবা-মাকে দেখতে আসেনি, কোনো খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়নি। অর্থকষ্টে, রোগেভোগে তারা জর্জরিত। নিরুপায়ে গয়নাগাঁটি বেচে বাড়ির সামনের ঘরটিতে মুদি দোকান খুলে দোকানের আয় দিয়েই কোনোক্রমে ডাল-ভাত খেয়ে জীবনরক্ষা করছেন। মহিলার ষাটোর্ধ্ব স্বামীকে দোকানের সদাইপাতি পাইকারি বাজার থেকে কাঁধে বহন করে আনতে হয়। অথচ ছেলেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাদের জীবনের সকল সঞ্চয় তারা ব্যয় করেছিলেন। সেই ছেলে এখন তাদের সংবাদ নেবার তাগিদও অনুভব করে না। জীবন অভিজ্ঞতার এসব কথা বলতে গিয়ে মহিলা শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। উপস্থাপিকা রচনা ব্যানার্জী পর্যন্ত চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোকদের এই নিষ্ঠুর অনাচার পশ্চিম বাংলার পারিবারিক সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেবল মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ক্ষেত্রেই নয়। এটা প্রায় সকল শ্রেণির মধ্যেই ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়েছে।

ফুলিয়া রেলস্টেশনে গামছা বিক্রেতা আদি ঢাকার দোহারের একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারদের দোহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুরো পরিবার সৈয়দপুর হয়ে কলকাতায় এবং পরে শান্তিপুরে স্থায়ী হয়েছেন। তাদের পেশা ছিল তাঁতশিল্প। শান্তিপুরে গিয়ে তাঁত পেশায় যুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পর আর দেশে ফিরে আসেননি। সরকারি খাসজমিতে বন্দোবস্ত নিয়ে সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন। শিয়ালদা-শান্তিপুর লোকাল ট্রেনে গামছা ফেরি করেন। তার বয়সও সত্তরের ওপরে। এই বৃদ্ধ বয়সে কেন এত কষ্ট করে যাচ্ছেন, ছেলেরা কী করে? এমন প্রশ্নে তার মুখটি মলিন হয়ে ওঠে। দুই ছেলে এখানে তাঁতশিল্পের কারিগর। তিনিই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে তাঁতশিল্পে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিধিবাম। ছেলে দু'জন স্থানীয় [তার ভাষায় ঘটি] পরিবারে বিয়ে করে দ্রুতই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে পৃথক সংসার পেতেছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা কী খাবে, কীভাবে চলবে সে বিষয়ে সকল দায়দায়িত্ব উপেক্ষা করে আলাদা বসবাস করছে। জীবন রক্ষায় বাধ্য হয়ে তাকে বৃদ্ধ বয়সে গামছার পোঁটলা কাঁধে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গামছা বিক্রি করতে হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার পারিবারিক জীবনে আত্মকেন্দ্রিকতার সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে সবাই যার যার তার তার। পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য বলে কিছু নেই। পরিবারের দায়িত্ব চরম নিষ্ঠুরতায় এড়িয়ে পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোকেরা জন্মদাতা, প্রতিপালনকারী পিতা-মাতাকে অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে কেটে পড়ছে, স্ত্রীর পরামর্শে-জেদে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষের মধ্যকার আত্মকেন্দ্রিকতার বৈপরীত্য অতীতেও ছিল কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর-অমানবিক হয়তো ছিল না। বিশ্ব পুঁজিবাদী দর্শন ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতার অভিমুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফাবাদী এই দর্শন ঘরে-ঘরে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পর্যন্ত বিস্তার নিশ্চিত করেছে। তাই ব্যক্তিগত উন্নতির ইঁদুর দৌড়ে শামিল হওয়া, ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে মত্ত হবার ঘটনাগুলো জাজ্বল্যমান। পুঁজিবাদ পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করারই দর্শন। এই দর্শনই পশ্চিম বাংলা জুড়ে ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। তাই তার নৃশংস নমুনা দেখে এলাম। পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোকেরা ওই দর্শনেরই শিকার। স্ত্রীর প্ররোচনাও ওই পুঁজিবাদের দীক্ষা। সে দীক্ষা বিচ্ছিন্নতার, সামষ্টিক ভাবনার বিপরীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অভিমুখে বিরামহীন ছুটে চলা। পুঁজিবাদের প্রবল প্রসারে পশ্চিম বাংলার ন্যায় আমাদের দেশও আক্রান্ত হয়নি, হবে না, পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোকদের আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটবে না, তেমন নিশ্চয়তার দাবি আমরা করতে পারব না। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অনুরূপ ঘটনা আমাদের এখানেও ঘটছে। স্বল্প মাত্রার কারণে অতটা মোটাদাগে দৃশ্যমান নয়। অপ্রতিরোধ্য পুঁজিবাদকে সম্মিলিতভাবে ঠেকাতে পারলেই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সমষ্টিগত মানবিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া আমাদের সামনে তো বিকল্প পথের আর কোনো সন্ধান নেই।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সবাইকে আন্তরিক

শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন

আলহাজ্ব জাফর আহমেদ

ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।

আল কোরআন- সূরা বাক্বারাহ- ২৭৫

স্বাচ্ছন্দ্য হোক জীবনের পথচলা

৫০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

১০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

১০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

আমাদের সেবা সমূহ...

- অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- আধুনিক কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান।
- দক্ষ জনবল দ্বারা দ্রুত কার্যকর ও বিনীত সেবা প্রদান।
- দ্রুত সময়ে বীমা দাবি নিষ্পত্তিকরণ।
- **Trust App** এর মাধ্যমে পলিসির তথ্য সহজে জানতে পারা।
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দ্রুত কর্মী/কর্মকর্তাদের পেমেন্ট এবং গ্রাহকদের প্রিমিয়াম গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যিওরেন্স লিঃ

تراست إسلامي لائف إنشيورنس لميتيد

TRUST Islami Life Insurance Ltd.

প্রধান কার্যালয়: পল্টন চায়না টাউন (১৮ তলা পশ্চিম টাওয়ার), ৬৭/১ নয়া পল্টন (ভি আই পি রোড), ঢাকা- ১০০০। ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৮৮৭০, ৪৮৩১৮২২৯

E-mail : info@trustislamilife.com

Web : www.trustislamilife.com

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সবাইকে আন্তরিক
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা
বনফুল
বনফুল এন্ড কোং

মমতাজ™
হারবাল প্রোডাক্টস
মমতাজ নং-১
কোণ মেহেদী
হাত রাঙায় মন ও রাঙায়
www.facebook.com/mumtazherbalproducts
www.youtube.com/c/MumtazTV
www.mumtazherbal.com

বহুল কাঙ্খিত
'পদ্মা সেতু' সংযুক্ত
৩০০ ফিট ঢাকা-মাওয়া
এক্সপ্রেসওয়ের সাথে নতুন
প্রজন্মের জন্য নতুন
পৃথিবীর প্রত্যাশায় গড়ে
উঠছে অপ্রতিদ্বন্দ্বি
আবাসন প্রকল্প
'নতুনধরা'

আবাসনে আস্থার আদর্শ...

নতুনধরা™

নতুন প্রজন্মের নতুন পৃথিবী

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক (EIA) অনুমোদনপ্রাপ্ত
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্টার্ড
- জেলা প্রশাসন কর্তৃক দায়মুক্তি সনদপত্রপ্রাপ্ত
- বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপারস্ এসোসিয়েশন-এর সদস্য
- জেলা প্রশাসন কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল অনুযায়ী জমি ক্রয় ও মিউটেশন করার অনুমোদনপ্রাপ্ত একমাত্র কোম্পানী
- আইএসও ৯০০১ : ২০১৫ সার্টিফাইড
- ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সদস্য
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত
- বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সপ্রাপ্ত
- ট্রেডমার্ক রেজিস্টার্ডকৃত কোম্পানী

নতুনধরা এসেটস্ লিমিটেড
(নতুনধরা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

কর্পোরেট হেডকোয়ার্টারস্:
৫৫, নিক টাওয়ার (৭ম, ৮ম ও ৯ম তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮ ০২ ২২৩৩৮৮৯০৯, ২২৩৩৮৮৯১০, মোবাইল: ০১৭০৮ ৪৫৪৫৫১-৬২
গুলশান অফিস:
লেক ভিউ গার্ডেন, বাড়ী # ১/বি (৪র্থ তলা), রোড # ৩৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

ISO 9001
ISO 9001:2015 Certified Company

www.notundhora.com

বিচিত্রার সম্পাদক প্রয়াত শাহাদাৎ চৌধুরীর সঙ্গে লেখিকা বিজলী হক ও অন্য কর্মীরা

ঈদ পোশাকের ফ্যাশন ফটোগ্রাফি

বিজলী হক

অধুনা লুপ্ত বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদাৎ চৌধুরীর হাত ধরেই বাংলাদেশে ঈদ পোশাকের ফ্যাশন ফটোগ্রাফির যাত্রা শুরু। আশির দশকের মাঝামাঝিই তার উদ্যোগে পোশাকের ফ্যাশন ক্যাটালগ ও ঈদ বাজার প্রকাশ পায়। বলা যায় এটা বাংলাদেশের পোশাকের ফ্যাশন যাত্রায় একটা মাইলস্টোন। ঈদ পোশাকের ক্যাটালগ বের করার পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল অসাধারণ। শুধু ঢাকা শহরের ফ্যাশন হাউজ বা ডিজাইনারদের পোশাক দিয়ে এটা প্রকাশ হতো এমন নয়। এই আয়োজনে পুরো দেশের ফ্যাশন ডিজাইনার ও ফ্যাশন হাউজগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকত। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও নরসিংদী থেকে পোশাক, শাড়ি পাঠিয়ে অনেকেই এ আয়োজনে অংশ নিত। আমাদের তৈরি ঈদ ক্যাটালগ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে বাসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছেও চাহিদা ছিল। ক্যাটালগ প্রকাশের আগেই শাহাদাৎ ভাইয়ের কাছে চাহিদাপত্র আসত এত এত কপি দরকার।

শবেবরাতের আগে থেকেই ঈদফ্যাশন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। প্রতিযোগিতা ঘোষণা হওয়ার পর দেশের নানা জায়গা থেকে পোশাক আসতে শুরু করত। আমরা ট্যাগ লাগিয়ে প্যাকেট করে হাজার হাজার পোশাক গুছিয়ে রাখতাম। আর যারা পাঠাতেন তাদেরও একটা করে টোকেন দিতাম। আমরা ২০ থেকে ২৫ জনের একটা টিম এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজমসহ অনেক বিভাগের শিক্ষার্থীরা খন্ডকালীন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত। শাহাদাৎ ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে পুরো প্রক্রিয়াটা হতো। এই দেড় মাস আমাদের মধ্যে একটা উৎসবের আনন্দ বয়ে যেত। বিশাল হাঁড়িতে দুপুরে রান্না চলত। সবাই একসঙ্গে আসন পেতে খাচ্ছি, একসঙ্গে কাজ করছি। দারুণ একটা সময় কাটত।
বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পোশাক নির্বাচন করা হতো। পোশাক নির্বাচনে বিচারকদের মধ্যে যারা ছিলেন তারাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত গুণি মানুষ। এদের মধ্যে রফিকুন নবী স্যার, সৈয়দ আবুল বারক আলভী, সুবর্ণা মুস্তাফা, আফজাল হোসেন, শম্পা রেজা, শাকিলা জাফরের মতো গুণী মানুষরা ছিলেন।

সে সময়ে এখনকার মতো ফ্যাশন ডিজাইনের কোনো ইনস্টিটিউট ছিল না। শুধু মাত্র বিজিএমই ছাড়া। সেখান থেকেও এক্সপার্টদের আনা হতো। এত ফ্যাশন হাউজ বা ডিজাইনার ছিল না। হাতে গোনা আড়ং, কারিকা, ইস্টওয়েস্ট ডিসপ্লে, নিপুণ, সেতুলি, বেন টেক্সটাইল, কুমুদিনীর মতো কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্তীকালে ঈদ পোশাকের ক্যাটালগ দেখে দেশের বাইরে থেকে অনেক অর্ডার আসত। আমাদের টিমে ছিলাম আমি, ইস্তাম্বুল হক, এমদাদ হক, আরিফ রহমান, শিবলি ভাই, সুমি শাহাবুদ্দিন, শাশা (শাহাদাৎ ভাইয়ের মেয়ে) শামীম আজাদ আপা। ৩ দশক ধরে এভাবে ঈদ ক্যাটালগ ও ঈদ বাজার প্রকাশ হয়েছে। এরপর মৌসুমী ক্যাটালগও করেছিলেন শাহাদাৎ ভাই। বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তিনি খুব ভাবতেন।

পোশাকের মডেল সবাই হয়েছেন মূলত যারা মিডিয়া বা গণমাধ্যমে

সুপরিচিত ছিলেন। আসলে শাহাদাৎ ভাই অসম্ভব জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাউকে বলেছেন– তাদের যত কাজ থাক না কেন তার ডাককে অগ্রাহ্য করতেন না। তখন আমাদের ঈদ ক্যাটালগে মডেল হয়েছেন ববিতা, চম্পা, সুচন্দা, শাকিলা জাফর, আঁখি আলমগীর, শিমূল ইউসুফ এরকম অসংখ্য মানুষ। আসলে কার নাম বলব আর কাকে বাদ দেব। সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ঈদ পোশাকের মডেল হয়েছেন মৌসুমী, ফেরদৌস, রিয়াজ, রিচি সোলায়মান, তানিয়া, রিয়া, সুইটি, তারিন শিমূল, নোবেল। সবার নাম এই মুহূর্তে মনেও পড়ছে না।

শহীদুল খান বাদল ও নায়লা আপার বাসায় আমরা সব পোশাক স্টোর করতাম। ওখানেই ফটোশ্যুট হতো। একজন মেকআপ আর্টিস্ট ভাড়া করা হতো। তিনি সবার মেকআপ করে রেডি করে দিতেন। কোরিওগ্রাফির কাজটা প্রথম দিকে করতেন শামীম আজাদ আপা। তিনি ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার পর আমি করেছি। ৬/৭ দিন ধরে ফটোশ্যুট হতো। শাহাদাৎ ভাই নিজেও একজন ভালো ফটোগ্রাফার ছিলেন। সবকিছুতেই তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। তিনিও অনেক সময় ফটোশ্যুট করতেন। তার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন ফটোগ্রাফার আল মাজি। পরবর্তী সময়ে রফিকুর রহমান রেকু, ডেভিড বারিকদার, তুহিন হোসেন ফটোগ্রাফি বিভাগে যুক্ত হয়েছিলেন। ছবি বাছাই করে পেইজ মেকআপের কাজগুলো অত্যন্ত সুনিপুণভাবে করতেন সাবু ভাই ও রেজা ভাই। শাহাদাৎ ভাই চারুকলা ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা করেছেন। তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি ও সিম্পেসিটি ছিল। গ্রাফিকসের সৃজনশীলতার কাজগুলো করতেন দেশালের কনক আদিত্য আর বুয়েটে পড়াশোনা করতেন শাহারিয়া ইকবাল রাজ ভাই তারা।

ক্যাটালগের কাজ শেষ হওয়ার পর আমার টোকেন দেখে দেখে কাপড় ফেরত পাঠাতাম। বিয়েবাড়ির মতো আমরা আনন্দে থাকতাম। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা একে অপরের কাছ

লেখিকা এবং প্রয়াত এমদাদ হক ও ইস্তাবুল

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কষ্ট পেতাম। আমাদের মধ্যে একটা ভালো টিম ওয়ার্ক ছিল। আমরা এক একজন এক একটা কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। আমরা এক পরিবারের তিন ভাইবোন ছিলাম। আমি, এমদাদ ও ইস্তাম্বুল। একসঙ্গে কাজে যেতাম। আবার কাজ

বিজলী হক ও মডেল উপস্থাপিকা ফিমা

প্রয়াত শাহাদাৎ চৌধুরীর সঙ্গে সহধর্মিণী, লেখিকা বিজলী হক ও অন্যরা

শেষ করে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। যেমন প্রয়াত এমদাদ হক যেহেতু ব্র্যাক সেরিকালচার, গ্রামীণ উদ্যোগ, আড়ং, বাংলার মেলার মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করত। এর ফলে মার্কেটিংয়ে বেশ দক্ষ ছিল। মার্কেটিংয়ের বিষয়টা তিনিই সামলাতেন। সঙ্গে লেখালেখি ও ছবির ক্যাপশনও তিনি করে দিতেন। অন্যদিকে ইস্তাম্বুল সাহিত্যে পড়ত যার ফলে লেখালেখির পাশাপাশি শিল্প নির্দেশনার বিষয়েও অংশ নিত। আর সবকিছুর সমন্বয় করতেন আমার মেন্টর শাহাদাৎ ভাই।

ঈদ বাজার-এর থেকে ঈদ ক্যাটালগই বেশি ছাপা হতো। তিন থেকে চার বার করে ছাপা হতো। অর্ডার আসত আর ছাপা হতো। ক্যাটালগে যেসব প্রতিষ্ঠানের ছবি ছাপা হতো পরবর্তী সময়ে তারা অনেক অর্ডারও পেত। সে সময়ে কে-ক্র্যাফট, নিপুণ, আড়ং, কারিকা, সেতুলি, ইস্কাটনের টিএমসি ভবনে অনেকগুলো শাড়ির দোকান, রাজশাহীর দোয়েল সিল্ক, সপুরা সিল্ক, বেইলি রোডের টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরসহ আরও কয়েকটি শাড়ির দোকান, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেন টেক্সটাইল, রুবি আপার অরণ্য, সায়হাম টেক্সটাইল, প্রাইড, পারফেক্ট টেক্সটাইল, ক্যাটসআই, মেনজ ক্লাব। এদের ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম তৈরি হয়।

সেই সময়ে বিচিত্রা ঈদ ফ্যাশন ক্যাটালগ-এর যে ফ্যাশন ট্রেন্ড তৈরি করে দিয়েছিল– সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়নি। শাহাদাৎ ভাইয়ের ভাবনায় আনন্দধারা বিউটি কনটেস্ট হয়েছিল বাংলাদেশে। সেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা থেকে জনপ্রিয় নায়িকা মৌসুম, পপি, মৌ, চৈতি, চুমকিসহ আরও অনেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেরা সুন্দরী। যদিও পরবর্তী সময়ে এটা এশিয়াটিকের ব্যানারে লাক্স সুন্দরী নামে প্রতিষ্ঠা পায়। আসলে শাহাদাৎ চৌধুরী এমন একজন

অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর, ফটোগ্রাফার ডেভিড বারিকদার ও বিজলী হক

দূরদর্শী ও প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন। বলা যায় তিনি বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির স্বপ্নদ্রষ্টা।

অনুলিখন : **মহসিনা লাইজু**

ঈদের বাহারি আহার

করোনাকাল কাটিয়ে এবারের ঈদের আনন্দটা যেন একটু বেশিই। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঈদ-আনন্দ ভাগাভাগি করার মজাও আলাদা। তাই ঈদের আনন্দ বিশেষ অর্থবহ করতে পরিবারের সদস্যদের জন্য তৈরি করুন মজাদার ঈদের খাবার।
রেসিপি দিয়েছেন **সুরাইয়া জাহান**

সুইট ডিলাইট

উপকরণ
সাদা চমচম ৬ পিস, হুইপ ক্রিম আধা কাপ, চিনি ২ টেবিল চামচ, স্ট্রবেরি ফ্লেভার ১ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. সাদা চমচমকে আড়াআড়িভাবে কেটে রাখুন।
২. এখন হুইপ ক্রিম, চিনি, স্ট্রবেরি ফ্লেভার ভালো করে মিশিয়ে নিন।
৩. পরিবেশন পাত্রে সাদা চমচমের ওপর সুন্দর করে নজেল দিয়ে ডিজাইন করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শাহি জর্দা

উপকরণ

বাসমতী চাল ২৫০ গ্রাম, পানি ১ কাপ, এলাচ ৪ পিস, লং ৮ পিস, দারুচিনি ৪ পিস, ফুড কালার ১ টেবিল চামচ, ঘি ২০০ গ্রাম, বাদাম কুচি (কাঠ ও কাজু বাদাম মেলানো) ৪ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, মোরব্বা আধা কাপ,পেস্তা বাদাম কুচি ১ চা চামচ,কমলা বাটা ১ টেবিল চামচ, মাল্টা বা মোসাম্বির রস আধা কাপ,চিনি ১ কাপ, কাঠবাদাম কুচি, পেস্তা বাদাম কুচি, কিশমিশ, তবক, বেবি সুইট সাজানোর জন্য আধা কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. বাসমতী চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
২. হাঁড়িতে পানি গরম করে এলাচ, লং, দারুচিনি দিন। এরপর ফুড কালার মিশিয়ে দিন।
৩. হাঁড়ির পানি ফুটে উঠলে তাতে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন।
৪. ৭ থেকে ৮ মিনিট বেশি আঁচে সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ফ্যানের নিচে রেখে দিন।
৫. অন্য হাঁড়িতে ঘি গরম করে তাতে বাদাম কুচি, কিশমিশ, মোরব্বা দিয়ে হালকা করে ভাজুন।
৬. এতে মাল্টার রস, চিনি ও অরেঞ্জ পেস্ট দিয়ে দিন।
৭. ঘন হলে সেদ্ধ করে রাখা চাল দিয়ে আলতো হাতে নেড়ে গোলাপজল দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিটের জন্য দমে রাখুন।
৮. চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে বাদাম, কিশমিশ, বেবি সুইটস, তবক দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ল্যাব-ই-শিরিন

উপকরণ

আপেল ২ পিস, কালো আঙুর ৫০ গ্রাম, সবুজ আঙুর ৫০ গ্রাম, বেদানা ১ পিস, কলা ২ পিস, জেলো পাউডার ২ ধরনের, কাস্টার্ড পাউডার আধা কাপ, তরল দুধ দেড় লিটার, চিনি আধা কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. সব ফল ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিন।
২. একটি বাটিতে তরল দুধ, কাস্টার্ড পাউডার, চিনি মিশিয়ে একটা মিশ্রণ বানান।
৩. বানানো মিশ্রণ চুলায় দিয়ে ঘন করে নিন।
৪. ঠাণ্ডা হলে ফল মিশিয়ে রাখুন।
৫. জেলো পানি মিশিয়ে তৈরি করে রাখুন।
৬. পরিবেশন পাত্রে প্রথমে দুধ ও ফলের মিশ্রণের লেয়ার দিন।
৭. এরপরের ধাপে জেলো দিন। তারপর দুধ ও ফলের মিশ্রণ দিন।
৮. সব শেষ লেয়ারে জেলো দিয়ে সাজিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।

বাসন্তী পোলাও

উপকরণ

চাল আধা কেজি, ঘি আধা কাপ, আদা ও রসুন বাটা মেলানো ১ চা চামচ, কাজু বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ আধা চা চামচ, পানি ৫ কাপ, লবণ ১ চা চামচ, এলাচ ৪ পিস, দারুচিনি ২ পিস, লং ৮ পিস, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, বাদাম কুচি ১ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. চাল ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট।
২. হাঁড়িতে পানি, হলুদ দিয়ে পানি ফুটিয়ে নিন।
৩. এই পানির মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাদাম কুচি, ঘি বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে দিন।
৪. অল্প আঁচে রান্না করুন।
৫. চাল সেদ্ধ হলে ওপরে ঘি দিয়ে নামান।
৬. পরিবেশন পাত্রে ঢেলে পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাদাম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

মাটন চুই কষা

উপকরণ

খাসির মাংস ২ কেজি, টক দই আধা কাপ, তেল আধা কাপ, আস্ত এলাচ ৪ পিস, ছোট দারুচিনি ৩, লং ১০টি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা বাটা আধা টেবিল চামচ, রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, টালা জিরার গুঁড়ো ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৪ টেবিল চামচ, আস্ত কাঁচা মরিচ ৫টি, চুই ঝালের টুকরো ৬টি, আস্ত রসুন ৪টি, লবণ দেড় চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. খাসির মাংস কারি কাট করে কেটে ধুয়ে টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ২ ঘণ্টা।
২. হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে গরম মসলার ফোড়ন দিন।
৩. এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। লালচে হলে তাতে সব গুঁড়ো ও বাটা মসলা দিয়ে দুবার কষান।
৪. এরপর মেরিনেট করা মাংস দিয়ে দিন সঙ্গে চুই ঝাল ও রসুন দিয়ে দিন।
৫. এরপর অল্প আঁচে ঢেকে রান্না করুন।
৬. ৩০ মিনিটের মধ্যে মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে তাতে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

চিকেন রোস্ট

উপকরণ

দেড় কেজির মুরগি ২টি, টক দই আধা কাপ, পেস্তা বাদাম বাটা আধা কাপ, ধনেগুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, জিরার গুঁড়ো ১ চা চামচ, এলাচ ৪টি, দারুচিনি টুকরো ২টি, লং ৮টি, চিনি ১ চা চামচ, ঘি আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা আধা কাপ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লবণ ১ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. মুরগির মাংস রোস্টের আকারে কেটে ধুয়ে টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন।
২. হাঁড়িতে ঘি গরম করে তাতে আস্ত গোটা গরম মসলার ফোড়ন দিন।
৩. এরপর পেঁয়াজ বাটা ও আদা রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন।
৪. কষানো হলে বাকি সব বাটা, গুঁড়ো মসলা ও দুধ দিয়ে আবার কষান।
৫. মেরিনেট করে রাখা মুরগির মাংস দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন।
৬. মুরগি সেদ্ধ করতে পানির প্রয়োজন হলে তবেই পানি দিন।
৭. সেদ্ধ হয়ে মাখা-মাখা হলে লেবুর রস, চিনি ও পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে নিন।

মাটন লেগ রোস্ট

উপকরণ

মাটন লেগ দেড় কেজির ১টি, টক দই আধা কাপ, গরম মসলা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচের বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, টালা জিরার গুঁড়ো ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জায়ফল বাটা ১টি, জয়ত্রী বাটা ১ টেবিল চামচ, মৌরি ১ চা চামচ, পানি আধা লিটার। আস্ত কাঁচা মরিচ ৬টি, লবণ ১ চা চামচ, চিনি ১ চা চামচ, ঘি আধা কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. মাটনের লেগটাকে কাঁটা চামচ দিয়ে ভালো করে কেচে নিন।
২. পানি, মৌরি, ঘি, বাদাম কুচি বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে মাটন লেগকে সারা রাত ফ্রিজে মেরিনেশনের জন্য রেখে দিন।
৩. ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করে তাতে মৌরির ফোড়ন দিন।
৪. এরপর মেরিনেশন করে রাখা মাটন লেগ দিয়ে অল্প আঁচে দুই পিঠ ভাজুন। মাটন থেকে পানি বের হয়ে শুকালে আরও পানি দিয়ে দিন। অল্প আঁচে ৪ ঘণ্টা ভরে দুই পিঠ উল্টিয়ে রান্না করুন।
৫. মাটন সেদ্ধ হয়ে ঝোল টেনে গেলে নামিয়ে পরিবেশন পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আলুর চপ

উপকরণ

সেদ্ধ আলু ২ কাপ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতা কুচি ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১টি, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, লবণ ১ চা চামচ, ব্রেডক্রাম আধা কাপ, চিজ ১ টেবিল চামচ, ডিম ২টি, তেল আধা কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. আলু সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিন।
২. ব্রেডক্রাম, চিজ, ডিম ও তেল বাদে বাকি সব উপকরণ আলুর সঙ্গে ভালো করে মাখুন।
৩. এরপর ছোট গোলা করে বানিয়ে তার ভেতরে চিজ দিয়ে দিন এবং লম্বাটে আকারে তৈরি করুন।
৪. এরপর ডিমে ডুবিয়ে, ব্রেডক্রামে কোট করে ফ্রিজের নরমাল তাপমাত্রায় আধা ঘণ্টা রেখে দিন।
৫. কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে লালচে করে ভেজে পরিবেশন করুন।

গাজরের শরবত

উপকরণ

গাজরের রস ২ কাপ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ, পানি ২ কাপ, লবণ এক চিমটি।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. চিনি ও পানি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।
২. চিনি গলে গেলে এর মধ্যে বাকি সব উপকরণ দিয়ে দিন।
৩. সামান্য বরফকুচি দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।

অনুলিখন : মহসিনা লাইজু

চিনি বাদ, মিষ্টি স্বাদ

ZERO CAL

বাদামের শরবত

যা যা লাগবে

দুধ, কাঠ বাদাম, জাফরান, জিরোক্যাল

কীভাবে বানাবেন

৩/৪ কাপ কাঠ বাদাম ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এবার চুলায় ৪ কাপ দুধ জ্বাল করে দুধের সাথে ব্লেন্ড করে রাখা বাদাম ও ৪/৫ স্যাশে জিরোক্যাল মিশিয়ে নিন। অল্প পরিমাণ জাফরান দুধের উপরে ছিটিয়ে দিন। এবার মিশ্রণটি ঠান্ডা করে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

ব্রেড পুডিং

যা যা লাগবে

ডিম, দুধ, ব্রেড, ভ্যানিলা এসেন্স, জিরোক্যাল

কীভাবে বানাবেন

৫-৬ স্যাশে জিরোক্যাল দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করে নিন। ব্রাউন ক্যারামেলটি গরম থাকতেই প্যানে ঢেলে ঠান্ডা করে নিন।২ কাপ তরল দুধ, টুকরো করে কাটা ৩ পিস পাউরুটি, ১/৪ কাপ গুঁড়া দুধ, ৪-৫ স্যাশে জিরোক্যাল,৪টি ডিম ও ২-৩ ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণটি ক্যারামেল এর উপরঢেলে পাত্রের ঢাকনা বন্ধ করে দিন।এবার বড় পাত্রে দেড় কাপ পানি দিয়ে পুডিং-এর পাত্রটিবসিয়ে বড় পাত্রটিও ঢেকে দিন। মিডিয়াম লো ফ্লেমে ৪০ মিনিট ভাপে রাখুন। ঠান্ডা হলে ঢাকনা খুলে একটি প্লেটে উল্টো করে ঢেলে নিয়ে পরিবেশন করুন।

তেহারি

উপকরণ

গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ ১ কাপ, গরম মসলা ১ চা চামচ, আস্ত জিরা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঠ বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ১২টি, ধনেগুঁড়ো ২ চা চামচ, জিরার গুঁড়ো ২ চা চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, চাল ১ কেজি, তেল ১ কাপ, লবণ দেড় চা চামচ।

যেভাবে রান্না করবেন

১. চাল ছাড়া সব মসলা ও মাংস একসঙ্গে মাখিয়ে তেলে ভেজে সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।
২. কষানো হলে একটু বেশি পানি দিয়ে সেদ্ধ করুন।
৩. সাধারণভাবে মাংস রান্না করতে যদি ২ কাপ পরিমাণ পানি লাগে এখানে ৩ কাপ পরিমাণ পানি দিতে হবে।
৪. মাংস সেদ্ধ হলে চামচ দিয়ে মাংস তুলে সেই পানিতে চাল সেদ্ধ করুন।
৫. চাল সেদ্ধ হলে তাতে মাংস মিশিয়ে, বেরেস্তা দিয়ে ১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে নিন তেহারি।

আস্ত মুরগির রোস্ট

ঈদের খাবারের একাল-সেকাল

নাজমা হুদা

ঈদের দিন সকালে নানাবাড়িতে খেজুর গুড়ের একটা ক্ষীর হতো। কাঁসার বাটিতে করে পরিবেশন করা হতো। সেই ক্ষীরের ওপরে ঘন দুধের সর থাকত। সঙ্গে থাকত পুর দেওয়া তেলের পাকন পিঠা। ঈদের সকালের সেই ক্ষীরের স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি।

সময়, বয়স আর রুচির সঙ্গে সঙ্গে ঈদের খাবারের বৈচিত্র্য বদল হয়েছে। আমার শৈশবের ঈদ আর ঈদের খাবার বড় রঙিন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিলো। বাবার দেশ ছিল ভারতের উত্তর প্রদেশের বিহারে। সেখানকার ঈদের খাবারে রয়েছে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ। খাবারের মধ্যে পোলাও, দুই রকমের কোরমা, ঝাল গোশত, কয়েকরকম কাবাব হতো। চাঁদরাত থেকে ঈদের রান্না শুরু হয়ে যেত। যে বাড়িতে যত ভালো রান্নার হতো, সে বাড়িতে অতিথি সমাগমও বেশি দেখা যেত। এখন তো রোস্টের পিস হয়। ঈদের সময় আমার দাদাবাড়িতে আস্ত মুরগির রোস্ট করা হতো। নেসেস্তার হালুয়া, নারিকেল দুধ দিয়ে পোলাও রান্না করত। এই পোলাও রান্নায় কোনো পানি ব্যবহার হতো না। খাসির লেগ রোস্টও করত। দাদাবাড়িতে কিশমিশের পুর দিয়ে এক ধরনের টিকিয়া কাবাব বানানো হতো। ঈদে বাড়িতে আসা মেহমানদের জন্য খাসা শরবতও তৈরি করত। অনেকটা লাবাং টাইপের। এর মধ্যে জাফরান ও পেস্তাবাদাম দেওয়া হতো। অপূর্ব সে স্বাদ।

আমার নানাবাড়ি ছিল কুষ্টিয়ায়। যদিও আমার বেড়ে ওঠা ঢাকার গ্রিনরোডে। তারপরও শৈশবে রোজার ঈদ করতে কুষ্টিয়ায় নানাবাড়িতে যেতাম। ঈদের দিন সকালে নানাবাড়িতে খেজুর গুড়ের একটা ক্ষীর হতো। কাঁসার বাটিতে করে পরিবেশন করা হতো। সেই ক্ষীরের ওপরে ঘন দুধের সর থাকত। সঙ্গে থাকত পুর দেওয়া তেলের পাকন পিঠা। ঈদের সকালের সেই ক্ষীরের স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি। ভোররাত থেকেই নানি ও মামিরা ক্ষীর তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এ ছাড়াও আমাদের শৈশবে হাতে কাটা সেমাই দুধ বানাত। কারও কারও বাড়িতে লাচ্ছা সেমাই ও জর্দাও হতো। জর্দার ওপরে পেস্তা বাদাম দেওয়া থাকত। সুস্বাদু ও সুঘ্রাণ আজও মনে গেঁথে আছে। অনেকে ঈদের দিন বুটের হালুয়াও তৈরি করত। আমার সেই বয়সে মনে হতো শবেবরাতে তো বুটের হালুয়া খেয়েছি, আবার ঈদে কেন?

আমাদের বাড়িতে ঈদের দিন সেমাই, জর্দা, কয়েক রকমের মাংসের পাশাপাশি একটা আখনির পোলাও রান্না করত। পোলাওর সব মসলা একটা কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে হাঁড়িতে পানি দিয়ে সিদ্ধ করা হতো। সেই পানি দিয়ে পোলাও রান্না করত আমার মা। এখনকার মতো সেই সময়ে রোস্টের এত প্রচলন ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে নতুন ধরনের অনেক খাবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির ছিল সিরাজগঞ্জে। ঈদের দিন পোলাও-মাংসের পাশাপাশি সে অঞ্চলে সকাল বেলা মাসকলাই ডাল দিয়ে

আখনি পোলাও

একটা পাতলা খিচুড়ি রান্না হয়। খেতেও বেশ মজা। এ ছাড়া ঝাল টিকিয়া কাবাব তৈরি হতো। খিচুড়ির সঙ্গে এটা খেতে খুব ভালোই লাগত।

খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়ে যায়। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে হওয়ায় বিয়ের আগে কখনোই রান্নাঘরে ঢুকিনি। বিয়ের পর মায়ের লিখে দেওয়া রেসিপি দেখে দেখে রান্না করতাম। খুব একটা ভালো হতো না। এখনকার মতো প্রশংসাও জুটত না। পারিবারিকভাবেই প্রয়াত সিদ্দিকা কবীর আপার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। বলা যায় তার অনুপ্রেরণায় আমার রান্নার প্রতি অনুরাগ। তখনো সিদ্দিকা আপা সেভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেননি। সিদ্দিকা আপার জন্য এক দিন হাঁড়িকাবাব তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে আমি কাবাবটা তৈরি করতাম। উনি কাবাবটা খেয়ে এত প্রশংসা করলেন, যার ফলে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। সম্ভাবত ১৯৭৬ সালে সিদ্দিকা আপার রান্নার বইটা প্রথম বের হয়। যেদিন বইটা বের হয় তার পরের দিনই বইটা আমার জন্য তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই বইটা দেখে দেখে আমি নানারকমের রান্না করা শুরু করি।

দিন দিন ঈদের রান্নায় অনেক ফিউশন হচ্ছে। এখন মোগলাই, মেক্সিকান অ্যারাবিয়ানসহ নানা ধরনের রান্না হয়। আগে ঈদে সেমাই-জর্দা আর ফিরনিতে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন ঝাল-মিষ্টি দুটোই দেখা যায়। সকালে একরকম নাশতা থাকে, বিকেলে আরেকরকম। ঈদে আমি একটা কাবাবই বিরিয়ানি করতাম। শিক কাবাব বানিয়ে সেটা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করতাম। অনেক সুস্বাদু ছিল। মুজাফিরি সেমাই তৈরি করতাম। ক্ষীরের মধ্যে বেবি সুইট ও পেস্তা বাদাম দিয়ে। এখন সেমাইয়ের পরিবর্তে অনেকে কাস্টার্ড, খাবসা, টিরামিশু, পুডিং, লাবাই শিরিন, শাহি টুকরো বহু কিছু তৈরি করে। অ্যারাবিয়ান অনেক ডেজার্ট তৈরি করে অনেকেই। ইউটিউবে দেশ-বিদেশের অনেক রান্না আছে। যে কেউ যেকোনো দেশের রান্না নিজেই দেখে দেখে করে নিতে পারছে। যার ফলে ঈদের রান্নায় স্বাদ ও বৈচিত্র্য দুটোই যোগ হয়েছে। মিষ্টিজাতীয় খাবারে বেশি বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে।

মোহাল্লাবিয়া

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাভাবেই সেমাই রান্না হয় ঈদের দিন। তবে এখন হাতে কাটা সেমাই রান্না সেভাবে আর দেখা যায় না। ঈদের খাবারে চিকেন বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি, পাক্কি বিরিয়ানি, নবাবই বিরিয়ানি নানা ধরনের বিরিয়ানি রান্না হয়। বিশেষত্ব হলো ঈদের খাবারে এখন মাছও যোগ হয়েছে। স্টিম ফিশ, ফিশ কোপ্তা, গোল্ড ফিশ রান্না হয়। যা আগে দেখা যেত না। ঝাল খাবারের মধ্যে আলুর চপ, চটপটি এসবও কারও কারও বাড়ির ঈদ রান্নার তালিকায় থাকে।

আমার ভাই রেজা আরেফিন আজকের কাগজের সাংবাদিক ছিলেন। উনি একদিন বললেন তুমি তো অনেক রান্নাবান্না করো, আমাদের পত্রিকায় রেসিপি দিতে পারো। তার কথামতো রেসিপি দেওয়া শুরু করি। রোজায় ও ঈদের সময় আলাদা করে পোলাও-মাংস বিরিয়ানির রেসিপি দিতাম। এরই মধ্যে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা থেকে রেসিপি দেওয়ার জন্য বলল। সেখানে বেশ কয়েক বছর রেসিপি দিলাম। ঈদ ও কোরবানির মতো বিশেষ উপলক্ষে আলাদা করে আয়োজন থাকত। এরপর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ঈদের রান্না হিসেবে নানা ধরনের রান্নার রেসিপি দিয়ে চলছি। এখন ঈদ রান্নায় যে বৈচিত্র্য এসেছে সেটা আমার কাছে ভালোই লাগে।

অনুলিখন : **মহসিনা লাইজু**, ছবি : **উম্মাহ কিচেন**

রুপালি পর্দার কালজয়ী জুটি

চলচ্চিত্রের জুটিপ্রথা বহু পুরনো। চলচ্চিত্রের সাফল্যের পেছনে জনপ্রিয় জুটির দারুণ যোগাযোগ রয়েছে; বিশেষ করে পুরনো দিনে জনপ্রিয় জুটি নিয়ে দর্শকের ছিল তুমুল আগ্রহ। সেই আগ্রহ রুপালি পর্দা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও আলো ফেলত। তেমনি কিছু কালজয়ী জুটির গল্প নিয়ে এই আয়োজন। লিখেছেন **মাসিদ রণ**

ঢালিউডের সর্বকালের সেরা জুটি

রাজ্জাক-কবরী

সময়কাল ১৯৬৭। সুভাষ দত্তের পরিচালনায় মুক্তি পায় 'আবির্ভাব'। এর মাধ্যমেই রুপালি পর্দায় আসেন রাজ্জাক-কবরী। শুরু হয় তাদের সফলতা, দর্শকপ্রিয়তা। ১৯৬৯ সালে কাজী জহিরের 'ময়নামতি' ও মিতার 'নীল আকাশের নিচে', ১৯৭০ সালে নজরুল ইসলামের 'দর্পচূর্ণ', মিতার 'দীপ নেভে নাই', কামাল আহমেদের 'অধিকার' চলচ্চিত্রে রাজ্জাক-কবরী জুটির প্রেমের অনবদ্য উপস্থাপন দর্শকের মনে তুমুলভাবে স্থান করে নেয়। সে সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। একদিকে পাকিস্তানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু সিনেমার রমরমা বাজার, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জেগে উঠছে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম, বাঙালির মধ্যে বিকশিত হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা। সেই পরিস্থিতিতে উর্দু সিনেমার জনপ্রিয় জুটি শবনম-রহমান ও শাবানা-নাদিমের বিপরীতে পাল্লা দিয়ে এগোতে থাকে রাজ্জাক-কবরী জুটি। স্বাধীনতার পরেও সমানতালে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে রাজ্জাক-কবরী জুটির। তাদের অভিনীত 'রংবাজ' ছবিটিকে 'ট্রেন্ড সেটার' হিসেবে ধরা হয়। সেই সিনেমায় লাস্যময়ী কবরীর দেখা পায় দর্শক। সুপারহিট হয় সিনেমাটি। এই ছবির 'সে যে কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না...' গানটি দর্শকের মুখে মুখে ফেরে। প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি হিসেবে আজও নক্ষত্রসম রাজ্জাক-কবরী। তাদের মুখের প্রেমময় সংলাপকে পর্দার এ পাশের প্রেমিক-প্রেমিকারা সব সময়ই নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। নিজেদের জীবনের আবেগঘন মুহূর্তে সেসব সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। পৌরুষদীপ্ত চেহারার অভিনেতা রাজ্জাক আর মিষ্টি হাসির মধু ছড়ানো কবরীর সিনেমাগুলোকে অনুসরণ করেই কাটিয়ে দেওয়া

যায় জীবনের বর্ণিল সব হলুদ বসন্ত। তারা ষাটের অধিক সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে 'নীল আকাশের নিচে', 'ময়নামতি', 'ঢেউয়ের পর ঢেউ', 'পরিচয়', 'অধিকার', 'বেইমান', 'অবাক পৃথিবী', 'সোনালী আকাশ', 'অনির্বাণ', 'দীপ নেভে নাই'সহ অসংখ্য সিনেমা এখনো সে যুগের দর্শকের মনের কোঠায় জমা হয়ে আছে। পরে 'আমাদের সন্তান' ছবিতে রাজ্জাক-কবরীকে দেখা গেছে বয়স্ক বাবা-মায়ের ভূমিকায়।

এখন পর্যন্ত রাজ্জাক-কবরী জুটিই দেশের চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা জুটি। নায়করাজ রাজ্জাক বললেন, 'কবরীর সঙ্গে আমাকে একের পর এক জুটি করে দর্শকদের হলমুখী করেই রেখেছেন

শাবানা ও আলমগীর

যারা, আমি প্রত্যেকের কাছেই ঋণী। ঋণী আমার সহকর্মী কবরীর কাছেও।' কবরী বললেন, 'একটা সময় ছিল, আমি এবং রাজ্জাক একসঙ্গে একের পর এক চলচ্চিত্রে কাজ করতে করতে দর্শকের কাছে বোরিং জুটি হিসেবেও আখ্যায়িত হয়েছিলাম। তবে, আমাদের জুটির চলচ্চিত্রই দর্শক বেশি দেখতেন। হলের মালিকদের কাছে রাজ্জাক-কবরীর সিনেমা গেলে চোখ বন্ধ করে সেই সিনেমা প্রদর্শন করতেন। কারণ, তারাও জানতেন বোরিং জুটি হলেও ব্যবসাসফল হয় চলচ্চিত্র।'

শাবানা-আলমগীর

পরিচালক এহতেশামের হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্রে পদার্পণ করেন মিষ্টি মেয়ে 'রত্না'। পরিচালক সেই 'রত্না' বদলে নাম দিলেন 'শাবানা'। সেই থেকে শুরু হলো বাংলা চলচ্চিত্রের এক লক্ষ্মীদেবীর যুগ, যা ছিল একটানা সত্তর-নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত দুর্দান্ত প্রতাপে। শাবানা বেশ কয়েকজন নায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন আলমগীর। আলমগীর-শাবানা জুটি এখন পর্যন্ত গ্রামবাংলা ও নগরের প্রায় সবার কাছেই সামাজিক ও পারিবারিক ছবির জনপ্রিয় জুটি। দেশীয় চলচ্চিত্রের জুটি প্রথার ইতিহাসে 'আলমগীর-শাবানা' জুটি হয়ে সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাদের অভিনীত ছবি ১২৬টি, যার বেশির ভাগই ব্যবসাসফল। এসব ছবিতে কখনো গরিব-দুঃখী এক নারী, কখনো শহরের আধুনিক মেয়ে, কখনো স্বামীভক্ত বাংলার চিরচেনা স্ত্রী, কখনো ভাবি, কখনো মা, কখনো এক প্রতিবাদী নারী– এমন সব চরিত্রে অভিনয় করে পুরো সময় দর্শকদের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেন শাবানা। তিনি এমনই এক দুর্দান্ত অভিনেত্রী ছিলেন, যিনি সব অভিনেত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুরস্কৃত হয়েছেন। আলমগীরও কোনো অংশে কম যাননি। সহকর্মী অনেকের কাছেই ভালো লাগার অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে আলমগীরের নামটাই উচ্চারিত হয় আগে। তাদের কাছে আলমগীর মানেই অভিনয়ে ভিন্নতা, পর্দায় প্রাণবন্ত উপস্থিতি। শুধু সহকর্মীই নয়, কোটি কোটি ভক্তের মাঝেও যেন এই একই ভাবাবেগ তৈরি করে। পরপর নয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন এই কিংবদন্তি নায়ক।

এখনো টিলিভিশন পর্দায় দর্শক যখন আলমগীর-শাবানা জুটির ছবি দেখেন তখন অন্যকিছুতে আর মন থাকে না । দর্শকের মাঝে এই আগ্রহ নিয়ে আলমগীর বললেন, 'আসলে টিভি দর্শকের রেসপন্সটা তো সত্যিকার অর্থে খুব কম পাই। তবে আমাদের জুটির ছবি যখন হলে হলে মুক্তি পেত, তখন যে পজিটিভ রেসপন্সটা আসত তা সত্যিই খুব ভালো লাগত।'

নাঈম-শাবনাজ

১৯৯০ সাল। প্রয়াত বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা এহতেশাম তার নতুন চলচ্চিত্র 'চাঁদনী'র জন্য দুজন নতুন মুখ বাছাই করেন। সেই দুজনই হলো নবাব পরিবারের ছেলে নাঈম আর বিক্রমপুরের মেয়ে শাবনাজ। প্রথম ছবিতেই জুটি হিসেবে ব্যাপক সাড়া ফেলেন নাঈম-শাবনাজ। এরপর তারা একের পর এক অভিনয় করেন

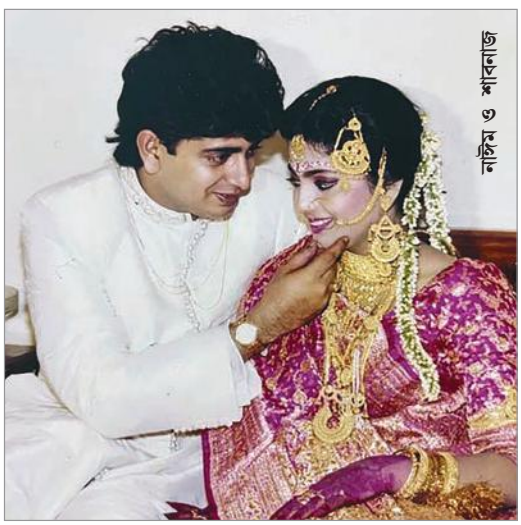
নাঈম ও শাবনাজ

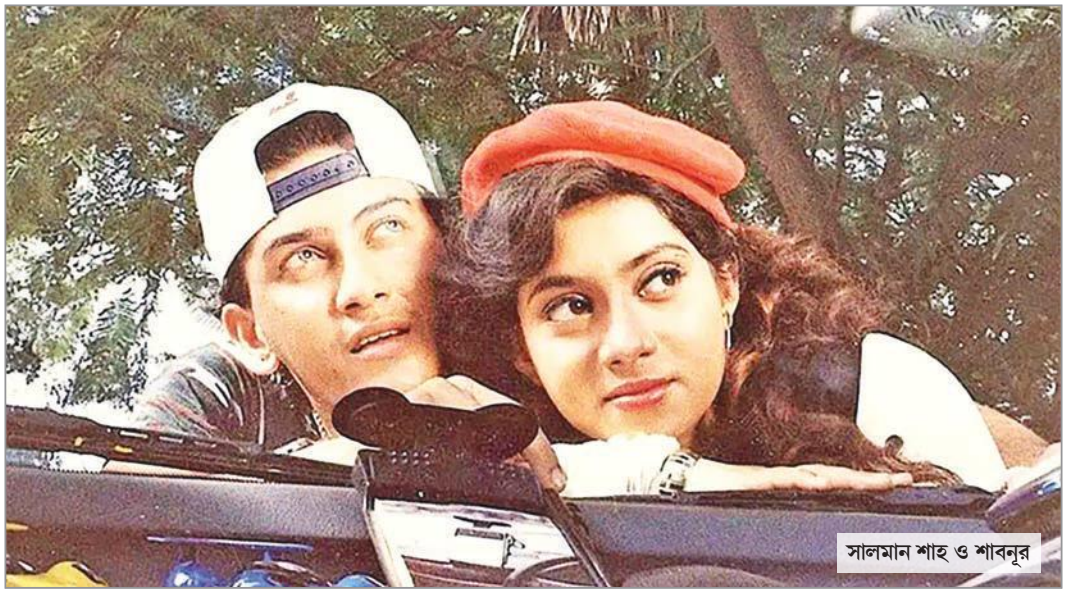
সালমান শাহ ও শাবনূর

‘লাভ’, ‘চোখে চোখে’, ‘দিল’, ‘টাকার অহংকার’, ‘ঘরে ঘরে যুদ্ধ’, ‘সোনিয়া’, ‘অনুতপ্ত’সহ আরও বেশ কয়েকটি ছবিতে। প্রতিটি ছবিই জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল হয়েছিল। নাঈম-শাবনাজের আগমনের আগে কিছুটা হলেও দুঃসময়ে পড়েছিল দেশীয় চলচ্চিত্র। কিন্তু সেই দুঃসময়টা বেশিদিন টিকতে পারেনি। নাঈম-শাবনাজের মাধ্যমেই নব্বইয়ের দশকের বাংলা চলচ্চিত্র আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। শুরু হয় চলচ্চিত্রের নতুন স্বর্ণযুগের। যার রেশ ধরে আগমন সালমান শাহ, মৌসুমী ও শাবনূরের মতো মহাতারকার। চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে গিয়েই ঘনিষ্ঠ হন নাঈম-শাবনাজ। শুরু থেকেই তাদের প্রেমকাহিনি মিডিয়ায় প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী সেসব অস্বীকার করলেও অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনা ভেঙে ১৯৯৬ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন এ জুটি। এরপর ২০০০ সালের প্রথম দিকে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা শুরু হলে নীরবে এ জগৎ থেকে আড়ালে চলে যান তারা। নব্বইয়ের দশকের বাংলা চলচ্চিত্র, এমনকি সার্বিক বিচারে বাংলা চলচ্চিত্র যাদের কাছে ঋণী, তাদের অন্যতম এ দুজন এখন নিভৃত জীবন নিয়ে ভালো আছেন। চলচ্চিত্র তারকাদের জীবনে স্বাভাবিক যে কালিমার রেশ থাকে, তার কোনো ছিটেফোঁটাও নেই তাদের ব্যক্তিজীবনে। বিয়ের পর দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগের বেশি সময় পেরিয়ে আসা এ জুটির সময় কাটে দুই মেয়ে, সংসার আর ব্যবসা নিয়ে।

সালমান শাহ-মৌসুমী

নব্বইয়ের দশক। বাংলাদেশি চলচ্চিত্র তখন সর্বজনীনতা হারিয়ে শ্রেণিবিশেষের বিনোদন মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। চলচ্চিত্রের অক্সিজেন বলে খ্যাত বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয় সিনেমা হল থেকে। হঠাৎ করেই নব্বইয়ের শুরুর দিকেই আবির্ভাব হয় বাংলা চলচ্চিত্রের সাড়া জাগানো নায়ক সালমানের। তার হাত ধরে চলচ্চিত্র আবার গতি পায়, পরিচালকরা নতুনভাবে লড়াইয়ে নামেন, ইন্ডাস্ট্রিও লাভের মুখ দেখতে থাকে। শুরুর দিকে সালমানের সঙ্গী ছিলেন মৌসুমী। মাত্র চারটি ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন সালমান-মৌসুমী জুটি। তবুও অভিনয়দক্ষতা, সৌন্দর্য, ফ্যাশন সচেতনতা ও ব্যক্তিত্ব গুণে এ জুটি আজও সমান জনপ্রিয়। সালমানকে যেমন ‘স্টাইল অবতার’ হিসেবে স্বীকার করা হয়, মৌসুমীও তেমনি এখনো দ্যুতি ছড়াচ্ছেন। তাদের প্রথম ছবি ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ মুক্তির পর পরই তারা হয়ে উঠেছিলেন দর্শকদের কাম্য জুটি। এ ছবিটি মূলত ভারতের আমির-জুহির ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’ ছবির বাংলা সংস্করণ। ছবিটি মূল ছবির প্রযোজক ও পরিচালকের অনুমতি নিয়েই তৈরি

সালমান শাহ ও মৌসুমী

করা হয়েছিল। ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছিল তোজাম্মেল হক বকুলের ‘বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না’ ছবির পর রেকর্ড ব্যবসাসফল ছবি, যা দেখতে সারা দেশের মানুষ হলে ভীড় করেছিলেন। প্রথমবার যেসব হলে ছবিটি মুক্তি পায়, তার অধিকাংশ হলেই পুরো ৪ সপ্তাহ হাউসফুল ব্যবসা করে। সালমান-মৌসুমী জুটির সর্বশেষ ছবি ‘দেনমোহর’ মুক্তি পায় ১৯৯৫ সালের ৩ মার্চ, ঈদুল ফিতরে। এটি ছিল সালমান খানের হিন্দি চলচ্চিত্র ‘সনম বেওয়াফা’র অফিশিয়াল রিমেক। ‘দেনমোহর’ও তুমুল জনপ্রিয়তা পায় দর্শক মহলে। এরপরই ব্যক্তিগত মান-অভিমানের কারণে দূরে সরে যান সালমান-মৌসুমী জুটি। সিদ্ধান্ত নেন একসঙ্গে অভিনয় না করার। সালমান জুটি বাঁধেন শাবনূরের সঙ্গে, মৌসুমী-ওমর সানীর সঙ্গে। এ দুই জুটির ছবির মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা হতো। জুটিতে জুটিতে এমন প্রতিযোগিতা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল।

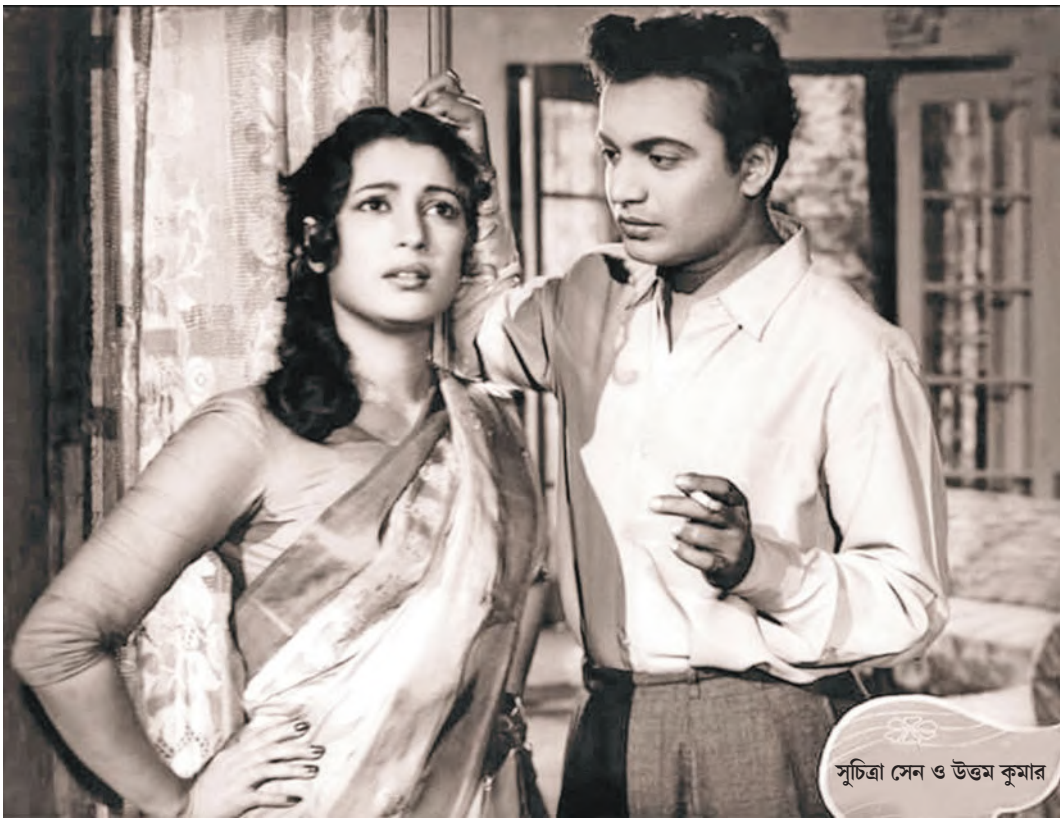
সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার

সালমান শাহ-শাবনূর

১৯৯৪ সালে 'তুমি আমার' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সালমানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন শাবনূর। প্রথম ছবিতেই ব্যাপক সফলতা পায় এ জুটি। যার ফলে পরিচালক-প্রযোজকরা একের পর এক ছবিতে নিতে থাকেন তাদের। সালমান অভিনীত ২৭টির মধ্যে ১৪টি ছবিতেই তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন শাবনূর। ঢাকাই ছবির জগতে অন্যতম সফল এই মহাকাব্যিক রোমান্টিক জুটি ভক্তদের কতটা ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল, তা তো সবাই জানেন। তরুণদের পোশাকে সালমানের কালোত্তীর্ণ ফ্যাশন, কণ্ঠে সালমানের সিনেমার গান। সালমানের মাথায় কাপড় প্যাঁচানো, হ্যাট, চশমা, গেঞ্জি– কী নকল হয়নি না তখন তরুণদের মাঝে! সবাই ভাবত তাদের মধ্যে বাস্তবেও বোধ হয় ভিন্নরকম সম্পর্ক ছিল। এসব নিয়ে কম কথাও রটেনি সিনেমাঙ্গনে। কিন্তু শাবনূর জানালেন, 'সালমান শাহ আমার খুবই প্রিয় ছিল। সে আমাকে পিচ্চি বলে ডাকত। আমি তো তখন অনেক ছোট ছিলাম। সালমান বলত, এই পিচ্চি এদিক আয়, আমার তো কোনো বোন নেই। এই পিচ্চি তুই আমার ছোট বোন।' সালমান বেঁচে থাকলে হয়তো আরেকটি উত্তম-সুচিত্রা জুটি হতে পারত সালমান-শাবনূর জুটি। তাদের দিয়ে বানানো যেত 'হারানো সুর', 'সাগরিকা', 'সপ্তপদী'র মতো অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র। শাবনূরও এমনটাই বললেন, 'উত্তম-সুচিত্রার মতো আমরাও দর্শক হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। সালমানের হঠাৎ চলে যাওয়ায় আমরা চলচ্চিত্রকে মনে রাখার মতো কিছুই দিতে পারলাম না।' কথাটা কতটুকু সত্য, তা বিবেচনা করার দায়িত্ব দর্শকদের। তবে যে কটি সিনেমায় একসঙ্গে তারা ছিলেন, তার মধ্যে 'তোমাকে চাই', 'জীবন সংসার', 'স্বপ্নের ঠিকানা', 'আনন্দ অশ্রু', 'স্বপ্নের নায়ক'সহ প্রায় প্রতিটিই এখনো দর্শক দারুণভাবে মনে রেখেছেন।

টালিউডের সর্বকালের সেরা জুটি

বাংলা সিনেমার কথা বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমার প্রসঙ্গ না আনলেই নয়। সেখানেও যুগে যুগে অনেক জনপ্রিয় জুটি গড়ে উঠেছে। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে যে দুই জুটি তারা হলেন উত্তম-সুচিত্রা ও প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটি।

উত্তম-সুচিত্রা

বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন। ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসংখ্য জুটির আবির্ভাব হলেও তাদের পেছনে ফেলতে পারেনি, ভবিষ্যতেও হবে কি না, তা সন্দিহান। আজও তারা উজ্জ্বল হয়ে আছেন বাংলা চলচ্চিত্রে। উত্তম-সুচিত্রা জুটি বেঁধে দর্শককে উপহার দিয়েছেন ৩০টিরও অধিক চলচ্চিত্র, যার প্রায় সবগুলোই ব্যবসায়িক মানদণ্ডে 'সুপারহিট্'। পঞ্চাশ-ষাট ও সত্তর এই তিন দশক রুপালি পর্দায় তো ছিলেনই, স্যাটেলাইট টেলিভিশন আর ভিডিও প্রযুক্তির কল্যাণে উত্তম-সুচিত্রা জুটি জনপ্রিয় পরের প্রজন্মগুলোর কাছেও। রোমান্টিকতায় ভরপুর এ জুটি বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। কীভাবে রোমান্টিক বাতাবরণ তৈরি করে উত্তেজনায় কাঁপিয়ে দিতে হয় সবাইকে। দুজনই পরলোকে গেলেও এতটুকু জনপ্রিয়তা কমেনি এ কালজয়ী জুটির। যত দিন বাঙালি থাকবে, বাংলা চলচ্চিত্র থাকবে, তত দিনই এই জুটি অমর হয়েই থাকবেন।

উত্তম-সুচিত্রা জুটি রুপালি পর্দার এমনই এক প্রেমিক-যুগল, যা চিরদিনের। এই জুটির পঞ্চাশের দশকের কোনো ছবির একটি রোমান্টিক দৃশ্য দেখলেও আজকের প্রেমিক হৃদয়ে তোলপাড় ওঠে। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি সংলাপ যেন কাল অতিক্রম করে চলে গেছে বহুদূর। আজকের স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনস কিংবা কম্পিউটার প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগেও উত্তম-সুচিত্রার রসায়ন তরুণ প্রজন্মকে মুগ্ধ করে।

উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রথম হিট ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর'। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া হাসির এ ছবিটিতে উত্তমকুমার কিংবা সুচিত্রা সেন কেউই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেননি। এ ছবিটি যখন মুক্তি পায়, তখন ছাপানো পোস্টারে উত্তম-সুচিত্রার কোনো পাত্তাই ছিল

না। ছবির প্রদর্শকরা ব্যবসায়িক মানদণ্ডে চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীকে পোস্টারের প্রধান মুখ বানিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিটিতে উত্তম-সুচিত্রার রোমান্টিক অভিনয় বাংলা সিনেমার জগতে যেন এক প্রলয়ের ডাক দিয়ে যায়। একটি চমৎকার রোমান্টিক জুটির জন্য হাপিত্যেশ করে ফেরা কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্প যেন পেয়ে যায় এক কোরামিন। যে কোরামিন কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পকে স্বর্ণ সময়ে প্রবেশ করায়। এরপর 'পথে হলো দেরী', 'মরণের পর', 'শাপমোচন', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'হারানো সুর', 'সবার উপরে', 'সূর্যতোরণ', 'চাওয়া-পাওয়া', 'সপ্তপদী', 'জীবনতৃষ্ণা', 'রাজলক্ষ্মী', 'শ্রীকান্ত', 'ইন্দ্রাণী', 'চন্দ্রনাথ', 'আলো আমার আলো'র মতো ৩০টির বেশি ছবিতে এই জুটি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলচ্চিত্রে রোমান্টিসিজমের ধারাটাই পাল্টে দেন সম্পূর্ণরূপে। হয়ে যান নারী-পুরুষের সম্পর্কের রোমান্টিকতার ধারণায় বাঙালির চিরকালীন এক আইকন।

রোমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তম-সুচিত্রা নিজেদের নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক জগতে। তাদের জনপ্রিয়তা ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনায় আজও কোনো ক্লান্তি আসার কথা নয়। সুচিত্রার পোশাক অনুকরণ করতেন সেকালের যুবতীরা প্রায় সবাই। তার শাড়ি পরা কিংবা চুল বাঁধার কেতা ছিল সেই সময়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কলকাতা, ঢাকার বাঙালি সমাজে আভিজাত্য ও ফ্যাশন-সচেতনতার প্রতীক। উত্তমকুমারের চুলের কেতাও অনুকরণীয় ছিল যুবকদের মধ্যে। তার শার্টের কলার কেমন ধাঁচের কিংবা তার স্যুটের কাটিং সবই ছিল অনুকরণীয়।

প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা

১৯৯৪ সালে প্রথমবার বাংলা বিনোদন জগতের অন্যতম সেরা জুটি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে একসঙ্গে দেখা যায়। নাগপঞ্চমী ছবিতে তারা প্রথমবার একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন। এই ছবির হাত ধরে এক নতুন হিট জুটি পেয়েছিল টলিউড। সেই শুরু এরপর একটার পর একটা হিট ছবি উপহার দিয়ে গেছে এই জুটি। তিন দশক ধরে তাদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখা গেছে। এখনো তাঁদের জনপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয়নি। দেখতে দেখতে তারা একসঙ্গে ৫০টি ছবিতে একসঙ্গে একে অন্যের বিপরীতে কাজ করে ফেলেছেন। একসঙ্গে জুটি বেঁধে একের পর এক হিট ছবি উপহার দেওয়ার পর এই অনস্ক্রিন জুটি ঠিক করেন তারা আর একসঙ্গে কাজ করবেন না। সাময়িক বিরতি নেবেন। এরপর বেশ কিছু বছর তাদের আর পর্দায় জুটি বাঁধতে দেখা যায়নি। এতটা সময়ের পর যখন ২০১৬ সালে 'প্রাক্তন' ছবির মাধ্যম শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের জুটি প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটিকে পর্দায় ফিরিয়ে আনলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো সেই আগের ম্যাজিক বা চার্মটা থাকবে না এই জুটির। কিন্তু একি! ছবি যে সুপার ডুপার হিট করে গেল আবারও! এরপর আবার ২০১৮ সালে 'দৃষ্টিকোণ' ছবি। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ছবিও হিট। ফলে পর্দায় এই দুই তারকা একে অন্যের সঙ্গে যতটা সহজে সাবলীলভাবে অভিনয় করেন ঠিক ততটা সহজভাবেই দর্শকরা তাদের গ্রহণ করেন। তাদের জনপ্রিয়তা এখনো এতটুকু ম্লান হয়নি।

বলিউড ইতিহাসে কালজয়ী জুটি

সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির বড় ক্ষেত্র মুম্বাইভিত্তিক চলচ্চিত্র শিল্প বলিউড। সেখানেও দর্শক অনুভূতিকে চরমভাবে নাড়া দিতে সৃষ্টি হয় কালজয়ী কিছু জুটি। অনস্ক্রিনে যাদের কেমিস্ট্রি দর্শকরা শুধু গ্রহণ করেননি; বরং মনে গেঁথে রেখেছেন যুগ যুগ ধরে। এমনই জুটি নিয়ে গবেষণা করে টাইমস অব ইন্ডিয়া সর্বকালের সেরা ১০ জুটির তালিকা করেছে।

রাজ কাপুর-নার্গিস

বলিউড ইতিহাসের সাদাকালো পর্দায় রাজ কাপুর ও নার্গিস ছিলেন দুর্দান্ত রোমান্টিক জুটি। বড় পর্দায় তাদের যৌথ কেমিস্ট্রি দর্শকদের কাছে জীবন্ত হয়ে ফুটি উঠেছিল। অভিনয়ে তাদের মধ্যে জড়তার কোনো লেশ ছিল না। তবে রাজ ও নার্গিসের রসায়ন শুধু পর্দাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা বাস্তব জীবনেও একে ওপরের প্রেমে মজে ছিলেন দীর্ঘ দিন। ষাটের দশকে হিন্দু মুসলমান এ জুটির বেপরোয়া প্রেম ছিল সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত বিষয়। রাজ বিবাহিত ছিলেন আগেই, তবে তাতে মোটেও আটকে থাকেনি তাদের প্রেম। তারা জুটি হয়ে 'আওয়ারা' (১৯৫১), 'আগ', 'বারসাত', 'আন্দাজ', 'শ্রী ৪২০' ছবিতে অনবদ্য অভিনয় করে দর্শক হৃদয়ে আজও জীবন্ত হয়ে আছেন।

গুরু দত্ত-ওয়াহিদা রেহমান

হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগে গুরু দত্ত ছিলেন খ্যাতিমান অভিনেতা। তার অভিনীত 'কাগজ কি ফুল' আর 'পিয়াসা' ছবি দুটি যথারীতি অমর হয়ে আছে। তবে এই ছবি দুটির

প্রসেনজিৎ ও ঋতুপর্ণা

রাজ কাপুর ও নার্গিস

সাফল্যের পেছনে রয়েছে গুরু দত্ত ও ওয়াহিদার অসামান্য উপস্থিতি। গুরু দত্ত কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্তের সঙ্গে বিবাহে জড়ালেও, ওয়াহিদার সঙ্গে গুরুর ছিল তুমুল প্রেম। পরে অবশ্য গুরু দত্তের সঙ্গে গীতার বিচ্ছেদ হয়েছিল।

দিলীপ কুমার-বৈজয়ন্তীমালা

ষাটের দশকে রোমান্টিক জুটির অন্যতম স্বাক্ষর হয়েছিলেন কিংবদন্তি হিরো দিলীপ কুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। তবে দেবদাস-চন্দ্রমুখী এই জুটির সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ পেশাদার। বৈজয়ন্তীমালা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের। বর্তমানে দীলিপ কুমার সায়রা বানুর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ জীবন কাটাচ্ছেন।

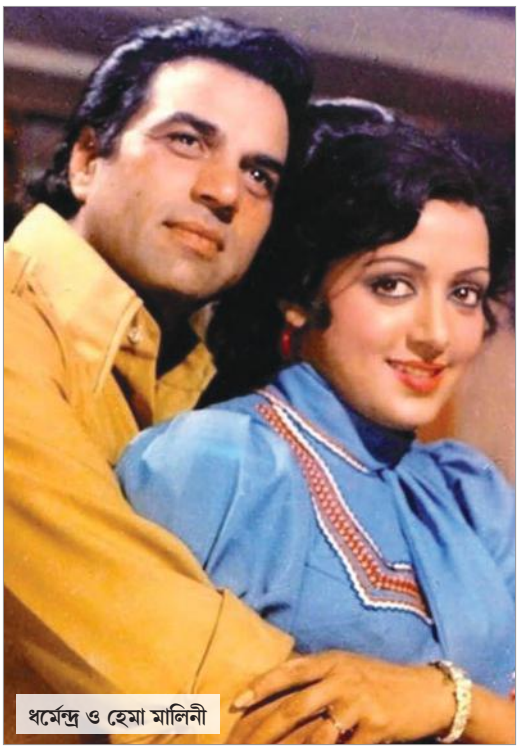
ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী

রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর

হার্ডথ্রব সুপারস্টার রাজেশ খান্নার চ্যাম্পিয়নের তকমা লেগেছিল রোমান্টিক রোলের বদৌলতেই। পর্দায় সর্বকালের সেরা জুটির মধ্যে বাঙালি রূপসী শর্মিলা ও রাজেশ অন্যতম। এই জুটি 'রূপ তেরা মাস্তানা', 'আরাধনা', 'অমর প্রেম', 'দাগ' ছাড়া আরও অনেক ফিল্ম করেছে স্মরণীয়।

ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী

ধর্মেন্দ্র ছিলেন পাঞ্জাবের বরপুত্র। আর হেমা ছিলেন দক্ষিণের লাস্যময়ী রানি। ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী ও ধর্মেন্দ্রর জগৎ বিখ্যাত জুটির কথা কোনো বলিউড প্রেমীর অজানা নয়। তারা জুটি হয়ে ৪০টির বেশি ছবি করার রেকর্ড করেছেন। পর্দায় তারা যেমন অনবদ্য, তেমনি বাস্তব জীবনেও ছিলেন সেরা প্রেমিক জুটি। শুধু এটুকু বললে হয়তো কম বলা হবে। তাদের প্রেমিক জুটিদের আইকন বললেও বেশি বলা হবে না। পরে অনেক চড়াই-উতরাই পার করে তারা একে অপরের জীবন সাথি হন।

অমিতাভ বচ্চন-রেখা

বলিউডের প্রায় সব সেরা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করছেন বলিউডের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' অমিতাভ। তবে রেখা ছিলেন তার সেরা রোমান্টিক জুটি। 'সিলসিলা' ছবির মধ্য দিয়ে অমিতাভ জয়া ভাদুড়ির সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হলেও, রেখার সঙ্গে মেতেছিলেন তুমুল প্রেমে।

ঋষি কাপুর-নিতু সিং

বলিউডের 'লাভার বয়' ঋষি কাপুর ও নিতু সিং একসঙ্গে কাজ করেছেন প্রায় ডজনখানেক চলচ্চিত্রে। সব প্রযোজকের কাছে এই জুটি ছিল সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত। ১৯৭৯ সালে বলিপাড়ার তুমুল সরগরম তুলে গাঁটছড়া বাঁধেন এই জুটি। তাদের বিবাহের মধ্য দিয়ে নিতুর ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটে।

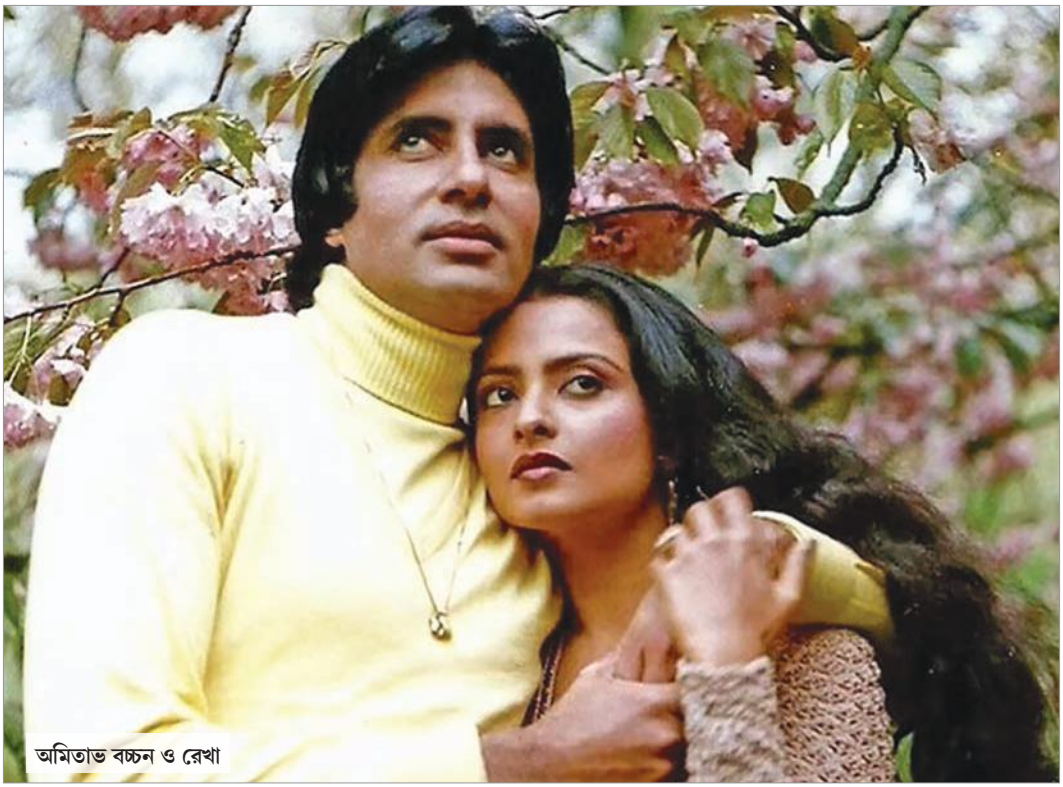
অমিতাভ বচ্চন ও রেখা

অনিল কাপুর-মাধুরী দীক্ষিত
আশির দশকের শেষভাগ ও নব্বইয়ের দশকের বড় একটা সময়জুড়ে বলিউড মাতিয়ে রেখেছিলেন 'হট' জুটি মাধুরী ও অনিল কাপুর। আবেগঘন দৃশ্যে অনিলের সঙ্গে মাধুরী ছিলেন সব সময়ই সাবলীল। তবে সে সময় অনিলের সঙ্গে শ্রীদেবীর বেশ রসায়ন ছিল। তবে মাধুরী-অনিল দর্শক মনে জায়গা পায় জীবন্ত হয়ে।

আমির খান-জুহি চাওলা
বলিউডের সবচেয়ে ম্যাজিক হিরো 'মি. পারফেক্টশনিস্ট' খ্যাত আমির খানের প্রথম ছবি 'হোলি' আর জুহির প্রথম ছবি 'সালতানাত'। কিন্তু দর্শকরা এখনো মনে করেন জুহি ও আমিরের প্রথম ছবি 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'। তাদের অনস্ক্রিন রসায়ন নিয়ে দর্শক সব সময়ই আলোড়িত ছিলেন।

শাহরুখ খান-কাজল
দর্শকের কাছে আর যা-ই হোক, কাজল-শাহরুখ জুটির রসায়ন নিয়ে কোনো ব্যাখ্যারই দরকার নেই! ফিল্মে কাজলের বিপরীতে শাহরুখ মানেই সুপারহিট, তাদের রেকর্ড তেমনটাই বলে। 'বাজিগর' থেকে 'কাভি খুশি কাভি গম' পর্যন্ত সব সময়ই জারি থেকেছে এই রেকর্ড। 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' ছবির কথা তো বলাই বাহুল্য! এমনকি 'কাল হো না হো' বা 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে কাজলের গেস্ট অ্যাপেয়ারেন্স, সেগুলোও পেয়েছে সুপারহিটের খেতাব।

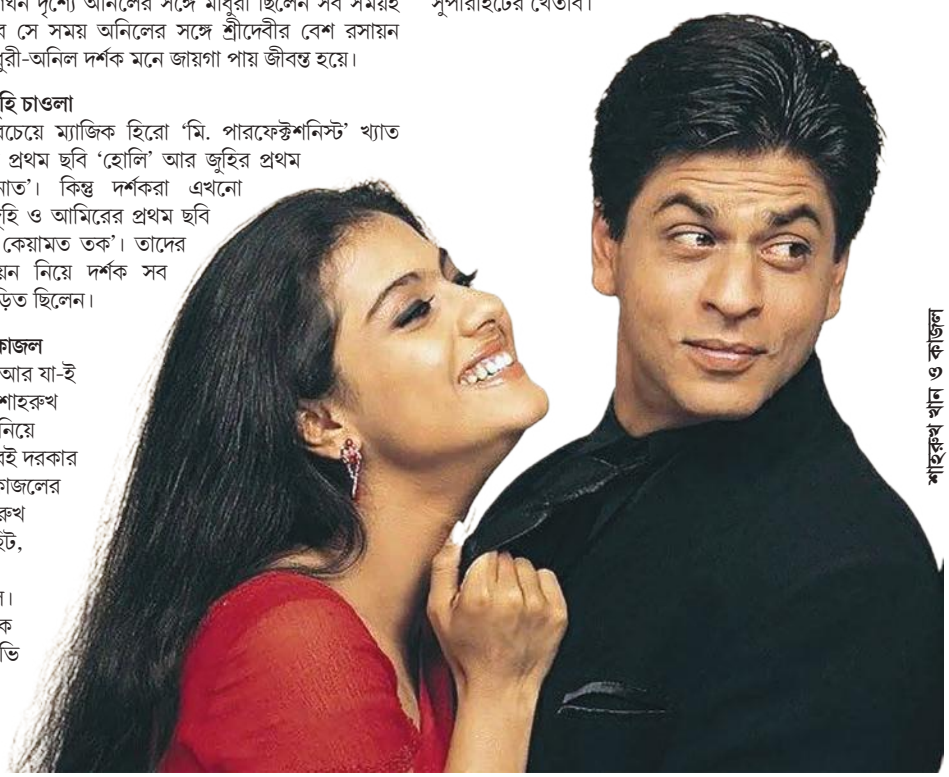
শাহরুখ খান ও কাজল

মেসি রূপকথার গল্প

সুদীপ্ত আনন্দ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

বাঙালির শ্রেষ্ঠতম কবি যে আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন কখনো, লিওনেল মেসি জানেন কি না কে জানে। তবে কবিগুরুর এই পঙ্‌ক্তিগুলো তো সার্বজনীন। তো বলা যায়, সেই পঙ্‌ক্তিগুলো হৃদয়ে গেঁথে গত বছর ১৭ নভেম্বর দোহায় পা রেখেছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার। তার বয়স যত, তার চেয়ে বেশি শিরোপা সাজানো নিজেদের শোকেসে। দলীয় স্বীকৃতির পাশে সাতবার ব্যালন ডি'আর জয়ের স্বীকৃতি, ফিফা বর্ষসেরার স্বীকৃতিগুলোও রোশনাই ছড়ায় সেই শোকেসে। ৩৫-এ পা রাখার আগেই ক্লাব ও জাতীয় দলের জার্সিতে জিতেছিলেন ৪১টি শিরোপা। তারপরও একটা আক্ষেপ তাড়িয়ে করে বেড়িয়েছে বাঁ পায়ের জাদু ছড়ানোর প্রথম দিন থেকেই। পরম আরাধ্য বিশ্বকাপটাই যে ছুঁয়ে দেখা হয়নি! মেসির জন্মের আগের বছর আর্জেন্টিনা সর্বশেষ হয়েছিল বিশ্বসেরা। এরপর থেকে বিশ্বকাপ মানেই আর্জেন্টাইনদের কাছে শুধু বিষাদময় স্মৃতি। তাই সবকিছুর পরও মেসির সেরাত্ব নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। মরুর বিশ্বকাপ মেসির কাছে কেবল আক্ষেপ ঘোচানোর নয়, ছিল অমরত্ব লাভের মঞ্চ ও শেষ সুযোগ। দোহার আট স্টেডিয়ামে ২৯ দিনে হয়েছে ৬৪টিতে রোমাঞ্চকর ম্যাচ। যার শেষটা ১৮ ডিসেম্বরের মহা ফাইনাল। লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে ধ্রুপদি লড়াইয়ে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে মেসি ঠিকই পেয়ে যান অমরত্ব। মানুষের হৃদয়ে পাকাপাকি জায়গা করে নেওয়ার এতদিনের হাহাকারের শেষটা হয় আবেগে ভেসে। আহা, বিশ্বের সবচেয়ে দামি আড়াই লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের আঠারো ক্যারেট সোনার ছয় কেজির কিছু বেশি ওজনের শিরোপাটায় যখন পরম যত্নে চুমু এঁকে দিলেন মেসি, সেই মুহূর্তটা দেখার অপেক্ষাটা ছিল বহুদিনের। মেসির বিশ্বকাপের প্রতিটি মুহূর্ত গোগ্রাসে গিলতে আমিও মাসজুড়ে ছুটে বেড়িয়েছি দোহার এই-প্রান্ত থেকে সেই-প্রান্ত। দেখেছি, লিখেছি, আর অভিভূত সাক্ষী হয়েছি মেসির সেরা মুহূর্তগুলোর।

কাতার থেকে দেশ রূপান্তরের জন্য আমার শেষ লেখাটার শিরোনাম ছিল– 'মরু থেকে কুড়িয়ে নিলাম অমূল্য মণিমাণিক্য'।

সেদিন লিখেছিলাম–
'আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!

শুভ দিন এসে গেছে। ঋণ শোধও হয়ে গেছে। লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে বহুদিনের জমে থাকা ঋণ শোধ করেছে ফুটবল। এই পাওয়ার অপেক্ষাতেই লিওনেল মেসি কাটিয়েছেন কত নির্ঘুম রাত। না পাওয়ার বেদনায় বারবার নীল হতে হয়েছে, হৃদয়ে ঘটেছে রক্তক্ষরণ। বালিশ ভিজেছে নোনা জলে। এ রাতেও কাঁদলেন তিনি। তবে সে জল অনেক অপেক্ষা শেষে আনন্দ অশ্রু হয়ে ঝরেছে। লিওনেল মেসি হেসেছেন, জগৎ হেসেছে। তিনি কেঁদেছেন, কেঁদে উঠেছে গোটা দুনিয়া। মুকুটে মহামূল্য সোনালি পালকটা যুক্ত হওয়ার পর আবেগে ভেসেছেন, ভাসিয়েছেনও। আমিও তাতে ভেসেছি। মরুর বিশ্বকাপ থেকে, মেসির বিশ্বকাপ থেকে ফিরছি মূল্যবান সব স্মৃতির অ্যালবাম নিয়ে। যা রোমন্থনে ধরা দেবে অমূল্য সব মণিমাণিক্য।'

এ লেখাটা লিখতে বসে বারবার ফিরে যাচ্ছিলাম মোহনীয় লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামের ভ্রাম্যমাণ প্রেস বক্সে। সে রাতে আমি যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম আকাশি-সাদার ঢেউয়ে। ৮৮ হাজার ধারণক্ষমতার এ সুবিশাল স্টেডিয়ামে আমাদের ঘরের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের মতো গ্লাসবন্দি প্রেস বক্স নেই। গ্যালারিতে দর্শকদের সঙ্গেই সাংবাদিকদের বসার ব্যবস্থা। শুধু গুটিকয় টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। পুরো বিশ্বকাপ জুড়েই সেই ডেস্ক আমাদের মতো বিশ্বকাপ থেকে আলোকবর্ষ দূরে থাকা দেশের সাংবাদিকদের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। আক্ষেপ নিয়ে দেখেছি, সেসব ডেস্ক বরাদ্দ শুধু অংশগ্রহণকারী দেশের সাংবাদিকদের জন্য। তাই বাধ্য হয়ে দর্শকদের সারিতে কোলের ওপর ল্যাপটপ রেখে সারতে হয়েছে পেশাগত দায়িত্ব। তবে ১৮ ডিসেম্বর লুসাইলের সেই রাতটা ছিল একেবারেই আলাদা। আর্জেন্টিনা আর মেসিকে নিয়ে বাঙালিদের

উন্মাদনার খবর যখন বিশ্ব মিডিয়া হয়ে পৌঁছে গিয়েছিল এডুকেশন সিটির আর্জেন্টিনার বেস ক্যাম্পে। মেসিদের কোচ লিওনেল স্কালোনির মুখেও যখন বাংলাদেশের স্তুতি বের হয়, তখন থেকেই ফিফার কাছেও যেন কদর বেড়ে গেল বাংলাদেশি সাংবাদিকদের। তার সুফলটা সেই অন্যরকম রাতেই পেলাম।

তার জন্যে অবশ্য একটা ছোট্ট নাটকও মঞ্চায়ন করতে হয়েছিল আমাকে। ফাইনালের বাঁশি বাজার অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম লুসাইলের আঙিনায়। ফাইনালের আগাম উন্মাদনার অভিজ্ঞতাটা নেওয়া ছিল মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি আগেভাগে এসে যদি কোনোভাবে ডেস্ক বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেই বাসনাও ছিল। যদিও মেইলে জানানো হয়েছিল ফাইনালেও আমার জন্য বরাদ্দ চেয়ার। স্টেডিয়ামের ভেতরের মিডিয়া সেন্টারে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থেকে টিকিটটা প্রিন্ট নিয়ে কি বুঝে পাশের ডেস্কে বসা টিকিট অফিসারের সামনে এগিয়ে গেলাম। তরুণ, ফিটফাট অফিসারটি আন্তরিকভাবে জানতে চাইলেন, 'তোমার জন্য কী করতে পারি?' আমি বিগলিত হয়ে বললাম, 'সেই প্রথম দিন থেকে দেখছি তুমি খুব পরিশ্রম করছ। আজ তো বিশ্বকাপ শেষ হচ্ছে। এবার একটু বিশ্রামের সুযোগ পাবে।' স্মিত হেসে লেবানিজ সেই সুদর্শন অফিসার গালের দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে আমার অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডটা নেড়েচেড়ে যেন একটু বিস্মিত হলেন, 'তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছ!'

'শুনেছি তোমাদের দেশে বিশ্বকাপ নিয়ে বেশ উন্মাদনা হচ্ছে। আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল নিয়ে তো রীতিমতো লড়াই চলে সেখানে, এটা কি সত্যি?' তার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম টোপটা মোক্ষম জায়গায় ফেলা গেছে। এবার সুযোগবুঝে টানটা দিতে পারলেই উঠে আসবে বিশাল মাছ।

ভিনদেশির মুখে দেশের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে। আর আমি যেহেতু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তার সঙ্গে কথা শুরু করেছি, তখন তো একটু ভাব নেওয়াই যায়। সগৌরবে বললাম, 'আরে এ তো প্রতি বিশ্বকাপেই হয়। আমাদের দেশের মানুষ ফুটবল শুধু দেখে না, ফুটবল খায়। তারা আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল বলতে রীতিমতো পাগল। আমাদের দেশে এমন একটা জেলা আছে যেখানে খেলা নিয়ে প্রতিবারই মারামারি, রক্তারক্তি হয়।' গল্পে এরপর আরও একটু রঙ মাখিয়ে বললাম, 'জানো তো, আমাদের ফুটবলের একটা দারুণ অতীত আছে। তোমাদের দেশকেও একবার হারিয়ে দিয়েছিলাম বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আমাদের দেশের মানুষের কাছে ফুটবল হচ্ছে প্রখর রোদে হঠাৎ বৃষ্টির মতো। অথচ জানো, এই আমিই কি না বিশ্বকাপে এসে দেশের মানুষের জন্য ভালো ভালো ম্যাচ রিপোর্ট লিখে পাঠাতে পারছি না।'

সে শুনে যাতে একটু ব্যথিত হয়, তাই আমার অবয়বে একটা করুণ ভাব নিয়ে আসলাম।

ও জানতে চাইল, 'কেন, কী হয়েছে? তোমার ল্যাপটপ কি নষ্ট হয়েছে? আমাদের এখানে টেকনেশিয়ানরা দ্রুত সমস্যার সমাধান করে দেবে। ডাকব তাদের?' ওকে থামিয়ে বললাম, 'আরে নাহ, ল্যাপটপ ঠিক আছে। ঠিক নেই বসার জায়গা। ফাইনাল ম্যাচও আমাকে চেয়ার দেওয়া হয়েছে। কোলে ল্যাপটপ রেখে কী যে লিখব আজকে? অথচ দেখো এই বিশ্বকাপ নিয়ে এ কাতারের মানুষেরই ততটা উন্মাদনা নেই, যতটা আছে আমাদের দেশের মানুষের।'

তরুণ অফিসারটি আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বলল, 'আচ্ছা দেখি তোমার জন্য কী করা যায়।' এই বলে পাশের কম্পিউটারে চার-পাঁচ মিনিট কী কী যেন করলেন।

আমি তো ধরেই নিয়েছি, নাহ। ভজানো গেল না অফিসারকে। ফাইনালে ডেস্ক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপরও...। একটু বাদেই তরুণ অফিসার এসে আমার আগের টিকিট নিয়ে আমার সামনেই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে বলল, যাও মেশিন থেকে নতুন টিকিট প্রিন্ট করে নাও। তোমার জন্য একটা ডেস্ক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে!' সেই তরুণের মুখটা এখনো চোখে ভাসছে। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আমার কাছে সেটা বলতে গেলে মেসির বিশ্বজয়ের মতোই একটা ব্যাপার। তবে সেই রাতটা আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত হতে যাচ্ছে, সেটা কল্পনা করিনি। ডেস্কে বসেছি ঠিকই, তবে ম্যাচের সময় যত গড়িয়েছে বারবার অনিশ্চয়তায় পাল্টে ফেলতে হয়েছে লেখার সূচনা। এ এক পাগলাটে রাত!

আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স মহা-দ্বৈরথের আগেই চৌকস দিদিয়েম দেশমকে কৌশলে একটু ভড়কে দেন স্কালোনি। বয়সে, অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও স্কালোনির মধ্যে যে প্রতিপক্ষ পড়ে ফেলার অসামান্য শক্তি আছে, সেটাই বোঝা গেল অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে সহজাত রাইট উইং পজিশন থেকে সরিয়ে লেফট উইংয়ে খেলিয়ে দেওয়ায়। আর সেই 'বুড়ো' মারিয়াই আর্জেন্টিনাকে পাইয়ে দেন লিড। এরপর বড় একটা সময় মনে হচ্ছিল খুব সহজেই মেসি পেয়ে যাবেন বিশ্বসেরার আসন। তবে ফরাসিদের একজন এলিয়েন (কিলিয়েন) এমবাপ্পে আছেন। তিনিই দিলেন হিসাবটা গড়বড় করে। সেই ম্যাচটা শেষদিকে এমন রূপে ধরা দিল, তাতে আমরা যারা ম্যাচ লিখতে বসেছি, তাদের অবস্থা অথৈ বচ। ঠিক আর্জেন্টিনার হাজার হাজার সমর্থকের মতোই আমাদের দুলতে হয়েছে অনিশ্চয়তার দোলায়। পেন্ডুলামটা যখনই আর্জেন্টিনার দিকে হেলে পড়েছে, তখনই এমবাপ্পে গোল করেছেন। এভাবেই নির্ধারিত ৯০ ও

অতিরিক্ত ৩০ মিনিট শেষে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারের ভাগ্য পরীক্ষায়। আর টাইব্রেকারের ভাগ্যটা কী করে নিজের করে নিতে হয়, তা এমিলিয়ানো মার্তিনেজের চেয়ে ভালো আর কে জানেন? অনেক নাটক, অসাধারণ সব সেভে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবল ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দিলেন আর্জেন্টাইন গোলকিপার। এরপরই শুরু হয় আকাশি-সাদার বাঁধভাঙা উৎসব। এ দৃশ্যগুলোই তো ছিল এই বিশ্বকাপ জুড়ে পরম আরাধ্য।

সেই রাতটা ছিল অদ্ভুত। সোনালি আভায় মোড়ানো ঝুড়ি আকৃতির লুসাইল স্টেডিয়ামটা মরু থেকে যেন দ্বৈবলে চলে গিয়েছিল স্বর্গে। স্বপ্নের সবুজ গালিচায় দুই জাদুকর নেমে এসে খেললেন ঐশ্বরিক ফুটবল। একজন জোড়া গোলে পথ দেখিয়েছেন, আরেকজন হ্যাটট্রিক করে ফাইনালের রোমাঞ্চটা বাড়িয়ে দিলেন বহুগুণে। তবে আগেই বলেছি, সেই রাতটা ছিল হিসাব চুকানোর। কিলিয়েন এমবাপ্পে এলিয়েনের রূপ ধারণ করলে কী হবে, এ রাতের মহারাজা তো মেসিই। ঈশ্বর সেটা আগেই লিখে রেখেছিলেন। মেসিও সেটা আগেভাগেই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন দুনিয়া জুড়ে লাখো-কোটি মেসিভক্তও। তাই তো শুরু থেকেই কাতারের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে একটা কথা, একটাই চাওয়া– 'এই বিশ্বকাপটা হোক মেসির'।

অনেক নাটকের মঞ্চায়ন, অনেক শিহরন, অনেক স্নায়ুক্ষয়ের বিশ্বকাপে সবার চাওয়াটাই পূর্ণতা পেয়েছে। আমিও অসামান্য এক ফাইনালের সাক্ষী হয়েছি।

কাতার বিশ্বকাপ যেমন মেসিকে হাত ভরে দিয়েছিল, আমারও প্রাপ্তিযোগ অনেক। আর সেটাও এই মেসিরই কল্যাণে। কাতার বিশ্বকাপ কভার করব, এই স্বপ্নটা ২০১৮ সালের পর থেকেই দেখছিলাম। ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন মেসির শেষ বিশ্বকাপ! এটা সামনে থেকে দেখতে না পারলে কি হয়? তাই স্বপ্নটাকে বাস্তব রূপ দিতেই হবে। সেটা করতে গিয়েই এসেছে বাধা। শুরুতে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র মিলছিল না। সেটা মিলে যায় বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসপিএ) কল্যাণে। আমার কর্মস্থল দেশ রূপান্তর পেছন থেকে দিয়েছে সাহস ও অতি প্রয়োজনীয় রসদ। দুয়ে মিলে স্বপ্নের প্রথম ধাপে পেরিয়ে যাওয়া আর ১৭ নভেম্বর দোহার মাটিতে পা রাখা। তার আগেই দোহা জয় করতে সদলবলে উপস্থিত হয়েছিলেন মেসি। তখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করি, অনেক আলোচনা, অনেক বিতর্কের এ বিশ্বকাপ অন্য কারও নয়। এটা শুধুই মেসির বিশ্বকাপ। হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করেছে আকাশি-সাদার দল, যখন তাদের কণ্ঠে শুনি মেসিকে নিয়ে বাঁধা গান, তখনই বুঝে যাই, এবার তিনি কিছু একটা করবেন।

সেই ভাবনায় বড়সড় ধাক্কা লাগে সৌদি আরবের কাছে হারে। মেসিও বুঝে যান, অধরা শিরোপা জিততে তাকে আরও ভয়ংকর রূপে বিস্ফোরিত হতে হবে। একই সঙ্গে পুরো দলটাকেও জাগিয়ে তুলতে হবে। হতে হবে সত্যিকারের নেতা। যেটা আগে হননি বলে কম সমালোচনা সইতে হয়নি। এবার সত্যিকারের নেতা হতে নিজেকে বদলালেন। নিয়ম মেনে মেসির জাদুকরী পা জাদু দেখানো শুরু করল। পাশাপাশি ভদ্র-নম্র তকমাটা ড্রেসিংরুমে রেখে এসে নিলেন রুদ্রমূর্তি। স্বভাববিরুদ্ধ তর্কে জড়ালেন রেফারির সঙ্গে, প্রতিপক্ষের ডাগআউটে গিয়ে দিয়ে আসলেন হুমকি, গোলের উদযাপনে করলেন বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গি; যা মেসির সঙ্গে কখনোই যায় না। তবে এবার যে তিনি স্বপ্নপূরণ করেই ছাড়বেন। আর সেটা বৃত্তে বন্দি থেকে হবে না। তাই তো তিনি '৮৬-এর ম্যারাডোনাকে নিজেতে ফিরিয়ে এনে হয়ে গেলেন মেসিডোনা। আবার সেই মেসিডোনাই কখনো কখনো সাওয়ার হলেন স্কালোনাটায়। যে গাড়ি সৌদি আরবে থমকে গিয়েছিল, সেটাই চলল বাকিটা পথ বিরামহীন গতিতে। এরপর পৌঁছে গেল লক্ষ্যে। আর এসব কিছুরই সাক্ষী হলাম, বিস্মিত হলাম এবং অবশ্যই মুগ্ধতায় ভরে উঠল হৃদয়।

আমার অতি প্রিয় ক্রীড়ালেখক মোস্তফা মামুন একবার লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর নেমে এলে ফুটবল মাঠ আর ফুটবলের মাঠ থাকে না। স্বর্গরূপ নেয়।' লুসাইল যেন সে রূপটাই ধারণ করেছিল ১৮ ডিসেম্বর রাতে। সেই স্বর্গ দখলের লড়াইটা যেমন প্রত্যাশিত ছিল, তেমনটাই হয়েছে। মেসি পারলেও এমবাপ্পে পারেননি শেষের

অঙ্কটা মেলাতে। অগ্নিপরীক্ষায় মেসিকে ছাড়িয়ে ফরাসি তারকা পেয়েছেন সর্বোচ্চ নম্বর। তবে তার দল পারেনি। একপেশে ম্যাচটাকে বারবার জমিয়ে তুলে, বিশ্বকাপের ইতিহাসের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছেন। তাতেই ম্যাচ গেছে টাইব্রেকারের ভাগ্য পরীক্ষায়। সেখানেও এমবাপ্পে পেরেছেন। তবে সতীর্থরা পারেননি বলেই টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। তাই তো স্বপ্নের সোনালি বুট জয়ের পরও ফরাসি বীরের চোখেমুখে রাজ্যের বিষাদ। এমবাপ্পের শূন্যদৃষ্টি আমার এই 'মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখতে চাওয়া' মনকেও নাড়া দিয়েছে। খুব বুঝতে পারছি, মেসিতে মত্ত এই হৃদয়ের একটা বড় অংশ এখন এমবাপ্পের দখলে। আহা! কী ভয়ংকর সুন্দর ফুটবল খেলেন এই ২৩ বছরের ফরাসি। জানি না কতশত কীর্তি নিজের করে নেবেন আসছে দিনগুলোতে। কোন উচ্চতায় শেষ হবে তার বর্ণিল ক্যারিয়ার! এমবাপ্পে আসছেন...

তবে ফাইনালের কীর্তির আগে অমরত্ব পেতে মেসি কী করেননি এ আসরে? স্মৃতিতে বারবার ফিরে আসছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৬ মিনিটে করা সেই জাদুকরী গোল। ফিরে আসছে সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বল নিয়ে সেই ঐশ্বরিক ছুট। এ আসরের অন্যতম সেরা ক্রোয়াট ডিফেন্ডার জসকো ভার্দিওলকে বোকা বানিয়ে আলভারেজকে দিয়ে গোল করানো আজীবনের সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে।

শুধু মেসি নয়, এ বিশ্বকাপ মনে থাকবে আরও অনেক ঘটনায়। পুরো গ্রুপ পর্বে অবিশ্বাস্য সব অঘটনের ঘটনা ভুলি কী করে? সৌদি আরবের রূপকথার শুরু, স্পেন-পর্তুগালকে হটিয়ে মরক্কোর সেমিফাইনালে চলে আসা, জাপানের লড়াকু ফুটবল, পর্তুগিজ রাজা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর প্রস্থান; নতুন রাজা হয়ে গনজালো রামোসের হ্যাটট্রিকে আবির্ভাব, পাঁচবারের সেরা ব্রাজিলের বিষাদের সাগরে ডুব দেওয়া, নেইমারের চোট-ঝলক, রিচার্লিসনের অসামান্য গোল, এমিলিয়ানো মার্তিনেজের ঈগলের হাত, আলভারেজের মাকড়সার পা, সুয়ারেজের কান্না, কোনো কিছুতেই কমতি ছিল না। তারপরও একটা শূন্যতা নিয়েই ফিরতে হয়েছে অসামান্য এক বিশ্বকাপের শহর থেকে। এক মাসের দীর্ঘ চলার পথে দেখা মিলেছে কতশত কিংবদন্তির। ফুটবল, ফুটবলের বাইরের অনেক তারকার দেখা মিলেছে হাতছোঁয়া দূরত্বে। দূরের তারাদের খুব কাছ থেকে দেখে বিমোহিত হয়েছি। তবে যাকে দেখার আজন্ম স্বপ্ন ছিল, সেই ম্যারাডোনার দেখা পাইনি। দুই বছর আগে আকাশের তারা হয়ে গেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল-ঈশ্বর। তাই বিশ্বকাপ জুড়েই অনুভূত হয়েছে ম্যারাডোনার শূন্যতা। প্রয়াত পেলেকেও খুঁজে ফিরেছে হাজার জোড়া চোখ। সাও পাওলোর হাসপাতালে নানা ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনবারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিল কিংবদন্তি। সুস্থ থাকলে মরুর বিশ্বকার রাঙাতে ঠিকই হয়তো হাজির হতেন ভুবনজয়ী হাসি নিয়ে। তাতে এ বিশ্বকাপটা হতো আরও বর্ণিল। এ দুই মহাতারকার শূন্যতা অবশ্য কিছুটা পূরণ হয়েছে দুই দেশের সমর্থকদের প্রচেষ্টায়। তারা না থেকেও ছিলেন ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে। মনে পড়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার পর পেলের বিশাল ব্যানার নিয়ে নেইমারদের শুভকামনা জানানোর দৃশ্য। এ দুই মহাতারকার মতো শূন্যতায় হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছে প্রিয় ইতালির অনুপস্থিতি। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বর্তমান ইউরোপসেরা হয়েও বাছাই পর্ব উতরাতে না পেরে স্বপ্নের বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছে আজ্জুরিদের। তাই যখনই দেল পিয়েরো, মাতারাজ্জিরা হাতছোঁয়া দূরত্বে এসেছেন, তখনই মনটা বিষাদে ভরে উঠেছে।

সেসব শূন্যতা অবশ্য লহমায় দূর হয়েছে মেসির জাদুতে, অসামান্য এক ফাইনালের সাক্ষী হওয়ার আনন্দে। সেই তৃপ্তি নিয়ে ফিরেছি ব্যস্ত এ নগরীতে। দিন কেটে যাচ্ছে। তবে মেসির বিশ্বকাপের স্মৃতি একবারের জন্যও ভুলতে পারছি না। মনের অ্যালবামে বারবার ফিরে ফিরে আসছে দোহার দিনগুলো। হাজারো সমালোচনা, নিন্দে-মন্দ সয়ে মরুতে কাতার ফুটিয়েছে ফুটবলের ফুল। আটটি অসাধারণ ফুটবল স্টেডিয়ামের মোহনীয় রূপও জমা পড়েছে আমার স্মৃতির কোষাগারে। মহামূল্য সেসব স্মৃতি রোমন্থনে কেটে যাবে আরও বহুকাল। একদিন বুড়ো হয়ে হয়তো আসছে প্রজন্মের কাছে শোনাতে পারব এই 'মেসি রূপকথার গল্প'।

Bank Asia Credit Card

...For Better Living

SPECIAL OFFER!

*Conditions Apply

HOME APPLIANCES
Enjoy Up to
36%
Discount

IFTAR & DINNER
Enjoy
BUY 1 GET 1
Free

SHOPPING
Enjoy Up to
20%
Discount

cards.bankasia-bd.com
16205

Bank Asia

TVS Racing

TVS

PERFORMANCE EVOLUTION #RTRevolution

Presenting the TVS Apache RTR 160 4V with

SMARTXONNECT | Super-Moto ABS | High Performance Radial Tyre

TVS Auto Bangladesh

01919194222, 01919189111

TVS Bangladesh www.tvsabl.com

Scan to know more

Apache RTR 160 4V

RACING DNA UNLEASHED

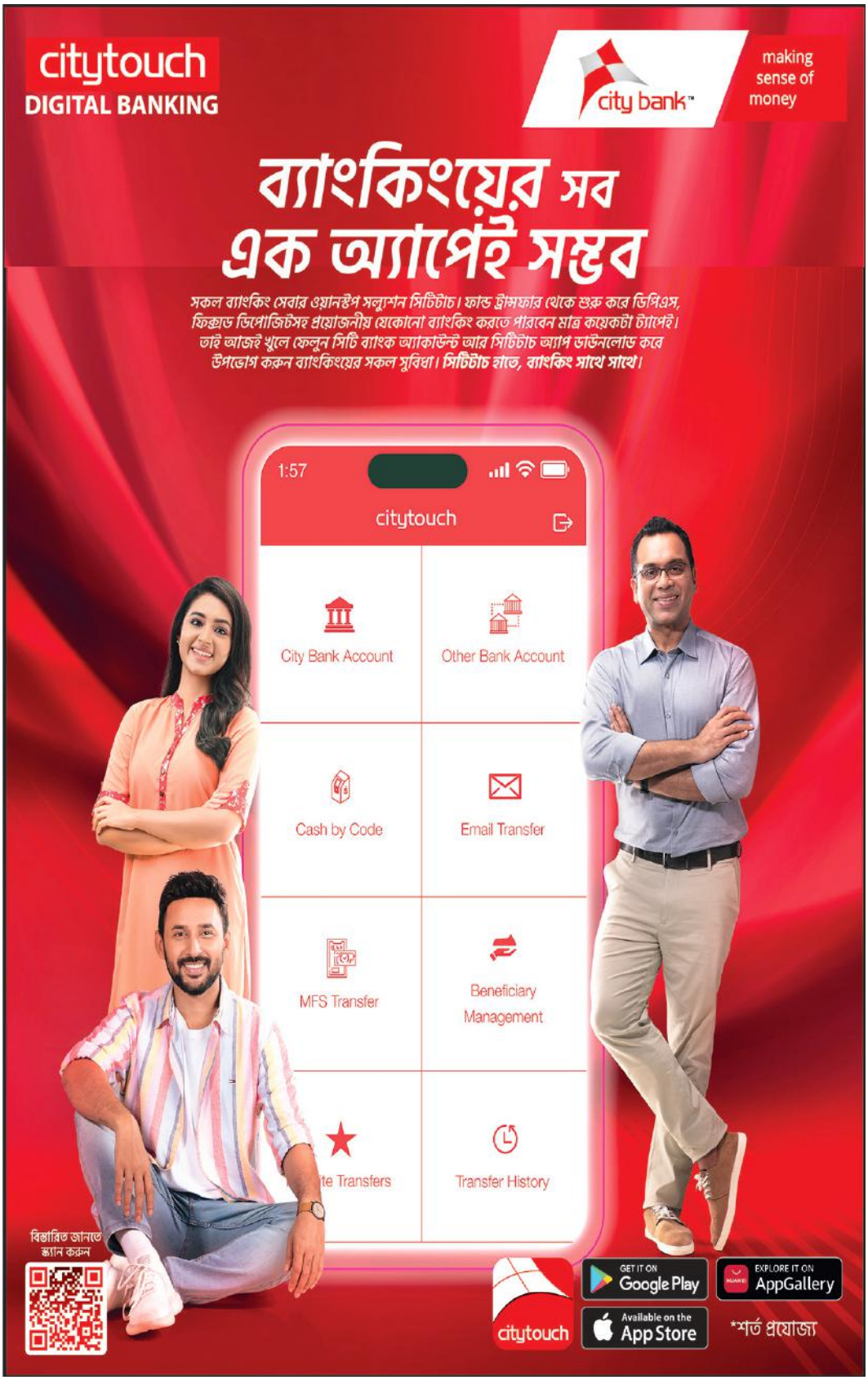
citytouch
DIGITAL BANKING
city bank
making sense of money
ব্যাংকিংয়ের সব
এক অ্যাপেই সম্ভব
সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।
1:57
citytouch
City Bank Account
Other Bank Account
Cash by Code
Email Transfer
MFS Transfer
Beneficiary Management
Transfer History
বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
citytouch
GET IT ON Google Play
Available on the App Store
EXPLORE IT ON AppGallery
*শর্ত প্রযোজ্য

জরায়ুমুখের ক্যান্সার মুক্ত
বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে

ইনসেপ্টা নিয়ে এসেছে
জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে ভ্যাকসিন

Papilovax™

Human Papillomavirus Vaccine (rDNA) BP

নতুন ও আধুনিক
প্রি-ফিল্ড সিরিঞ্জে

ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয়, বিক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক এন্টিবায়োটিক ক্রয়, বিক্রয় ও সেবন করুন।

Incepta

০১৭১৪-০৯৪১৪৮

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের

আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'

এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*

এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য

এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'

মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'

মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সূরা নিসা, আয়াত ২৫

আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'

মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'

এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'

মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'

এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সেবা সমূহ

* ইমারত ও নির্মাণ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম
* ইমারতের নকশা ও নির্মাণ বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান
* প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালা
* নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ
* ভূমি জরিপ, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও প্রতিবেদন
* উদ্ভাবিত নির্মাণ প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহকরণ

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

১২০/৩, দারুস-সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮০২৫৮০৫৫২৪৫
ইমেইলঃ dg@hbri.gov.bd
www.hbri.gov.bd

বিল্ডিং কোড অনুসরণ
নিশ্চিত করে নিরাপদ ভবন

মোঃ আশরাফুল আলম
মহাপরিচালক
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বিকাশ

যখনই চান, যেখানেই থাকুন

কার্ড থেকে বিকাশ-এ মুহূর্তেই টাকা আনুন

অ্যাড মানি

কার্ড সেভ করে রাখুন
মিনিটেই টাকা আনুন

24/7

ভিসা ও মাস্টারকার্ড থেকে
২৪/৭ টাকা আনুন

বিকাশ-এর সব সার্ভিস
উপভোগ করুন

বিকাশ, একটি ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান

*শর্ত প্রযোজ্য